বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা

(দ্বিতীয় পর্যায়)

শ্রীভূদেব চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা

[দ্বিতীয় পর্যায়]

শ্রীভূদেব চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ
২১১/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শাখা ঃ
৪৪, জনস্‌টনগঞ্জ
এলাহাবাদ-৩
চৌহাট্টা
পাটনা-৪

মূল্য ১২ টাকা

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ পক্ষ থেকে জানকীনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এন্ড পাব্‌লিশিং হাউস প্রাইভেট লিঃ, ১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড কলিকাতা-১৩ থেকে শ্রীনির্মলেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী [দাদা]

ও

শ্রীসুরুচি চৌধুরী [বৌদি]

শ্রীচরণেষু ।

পূর্বভাষ

(প্রথম সংস্করণ)

'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ-বিষয়ে লেখকের নূতন কিছু নিবেদন করবার নেই। পূর্বগ্রন্থের অনুবৃত্তি হিসেবে ভারতচন্দ্রের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-পূর্ব কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সন্ধান করেছি এই পর্যায়ে। তথ্যাদি বিষয়ে পূর্ব-সূরীদের গবেষণার 'পরে নির্ভর করেছি। আর, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক বিচিত্র সংবাদের মাঝে খুঁজে দেখেছি বাঙালির অখণ্ড-শাশ্বত জীবনধর্মকে। সাহিত্যের ভিত্তিকে আশ্রয় করে বাঙালির জীবন-স্বভাবের ইতিহাস সন্ধানই 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র একমাত্র প্রয়াস। এ-পথে বিন্দুমাত্র উৎসাহের সঞ্চার করতে পারলেও চরিতার্থ বোধ করব।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে। উনিশ শতকের বাঙালি ঐতিহ্যের প্রতি প্রথম শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলাম শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তীর শিক্ষায়। গ্রন্থারম্ভে এঁদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি। এই গ্রন্থের প্রাথমিক পরিকল্পনা বিষয়ে সংশয় যখন কিছুতেই দূর হচ্ছিল না, তখন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তকে বারে বারে প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত করেছি। তাঁদেরও আমার প্রণাম।

গ্রন্থরচনার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীবিজিত দত্ত, শ্রীসুকুমার মিত্র, শ্রীফণিভূষণ পাল, শ্রীবিমলেন্দু গুহ ও শ্রীবৈদ্যনাথ গাঙ্গুলি। ছাত্রদের কাছে সাহায্য পেয়েছি শ্রীমান্ শিশিরকুমার দাশ ও শ্রীমান্ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের কাছে। শ্রীমান্ শিশিরকুমার সূচীপত্র ও নির্ঘন্টও প্রস্তুত করে দিয়েছেন যথাপূর্ব। আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নেই; এঁদের স্নেহ-প্রীতি আমার জীবনে পরম স্মরণীয় এবং বরণীয়।

মুদ্রণবিশুদ্ধি ও পারিপাট্য বিষয়ে প্রকাশক শ্রীজানকীনাথ বসুর অক্লান্ত চেষ্টাও সফল হতে পারে নি। অতএব, এবারেও গ্রন্থকার এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ নয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছিল। সারা ভারতের বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলী এবং সংস্কৃতিমান্ ছাত্র ও পাঠকসমাজের শুভেচ্ছা নূতন সংস্করণের শিরোভূষণ হয়ে রইল। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধা ও নতি নিবেদন করছি; তাঁর উৎসাহ এবং উপদেশ কেবল এই রচনার পক্ষে নয়, লেখকের সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাক্‌বে। নতুন সংস্করণের প্রস্তুতিকালে অশেষ স্নেহের আনুকূল্য পেয়েছি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের কাছে; অনেক দুর্লভ রচনা দেখ্‌তে দিয়েও উপকৃত করেছেন তিনি। তাঁকে আমার বিনীত অভিবাদন।

বর্তমান সংস্করণে পুরাতন প্রত্যেকটি অধ্যায়ের তথ্য ও প্রকাশগত ত্রুটি সংশোধনে অবহিত হয়েছি। অনেক অধ্যায়ে নূতন তথ্যের সংযোজন করাও হয়েছে। তা ছাড়া, ঊনবিংশ অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রসঙ্গ আগাগোড়া লিখেছি নূতন করে; তাতে বিভিন্ন নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ নাটক-পরিচিতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ প্রচেষ্টায় আমার উৎসাহদাতা উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়;—তাঁকে সস্নেহ শুভকামনা জানাচ্ছি।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার প্রায় দেড় বছর পরে আবার গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। কলকাতা থেকে লেখকের দূরগমনে এই বিলম্ব অপ্রতি-বিধেয় হয়েছিল। কিন্তু, তার চেয়েও বড় ত্রুটি চোখে পড়েছে বই মুদ্রিত হয়ে যাবার পর। মুদ্রণগত এমন কিছু কিছু প্রমাদ থেকে গেছে, বই পড়তে আরম্ভ করবার আগেই যা সংশোধন করে না নিলে অর্থগ্রহণ কঠিন হতে পারে। তাই, গ্রন্থশেষে কেবল দুর্বোধ্যতার আকর প্রবল ভ্রান্তিগুলির সংশোধন নির্দেশ করা হল।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বহু অংশ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে বসে লিখেছিলাম। সে উপলক্ষ্যে ঐ মহৎ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যোৎ-সাহী কর্মনির্বাহকদের কাছে চিরবাধিত হয়ে আছি। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়ে ঋণের মাত্রা আরো বর্ধিত হয়েছে; তাঁদের আমার বিনীত নমস্কার।

ছোট্ট ছেলে বাব্‌লু আর মেয়ে মিস্টু;—তাদের সদ্য-শেখা বিদ্যার পুঁজি নিয়ে যথাক্রমে এই গ্রন্থের দীর্ঘ ইংরেজি ও বাংলা উদ্ধৃতির চয়নে সহায়তা

করেছে বহুদিন বহু ধৈর্যে। তাদের শিশুহৃদয়ের নিষ্ঠা এই রচনার সংগে জড়িয়ে রাখতে পেরে আমার পিতৃ-হৃদয় চরিতার্থ।

ভাইঝি মমতা সূচীপত্র ও নির্ঘন্ট প্রস্তুতির নীরস কাজে সহযোগিতা করেছে,—তার জন্যে রইল আনন্দিত মনের আশীর্বাদ।

পরিশেষে সকল ত্রুটি ও অক্ষমতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আর লেখকের অনুপস্থিতিতেও গ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাধ্য সাধন করেছেন যিনি, বুকল্যাণ্ড্-এর কর্মাধ্যক্ষ সেই চিরসুহৃদ্ শ্রীজানকীনাথ বসুকে জানাই প্রীতি নমস্কার।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৬ বাংলা সাল

শ্রীভূদেব চৌধুরী
দার্জিলিং সরকারি কলেজ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যে আধুনিকতা

[১]

ভারতচন্দ্রের তিরোভাব-উত্তর বাংলাসাহিত্যের বিকাশকে সাধারণভাবে আধুনিক যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে ;—আজও পর্যন্ত চলেছে বাংলা-সাহিত্যের সেই আধুনিক কাল। অথচ, এই দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর ধরে বাংলাসাহিত্যের ভাব-দৃষ্টি এবং রূপ-কল্পে একাধিক বিবর্তন ঘটেছে। আর বলাবাহুল্য, ইতিহাসের প্রত্যেক পর্যায়েই বিবর্তন-পরিবর্তনের মূলে নিহিত থাকে জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধগত পার্থক্যের প্রেরণা। অর্থাৎ, বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন-মূল্যবোধ পাল্‌টেছে বারে বারে,—সাহিত্যেরও তাই ভাবান্তর এবং রূপান্তর ঘটেছে। সাহিত্যের ইতিহাস সেই যুগ-পরিবর্তনের সন্ধান রাখে নি। ইতিহাসের দৃষ্টিতে অজস্র গতি-চাঞ্চল্যে জটিল এই দু'শ বছর আজও একই নামের অবিচল স্থানুত্বে বাঁধা। কিন্তু, ঐতিহাসিকের এই অনবধানতা সত্ত্বেও রসিক মনের সচেতনতা নির্জীব হয়ে থাকে নি ; স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য-বিকাশের এই বিভিন্ন পরিবর্তনকে তাঁরা নানা নামাঙ্ক-চিহ্নিত করেছেন। তাই দেখি, ঐতিহাসিকের বিচারে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ যদিও সূচিত হয়েছে ভারতচন্দ্রোত্তর কালে, তবু একালের নূতনত্বের উৎসাহ 'আধুনিক কবিতা'র পথ-চিহ্ন নির্দেশ করে রবীন্দ্রোত্তর যুগে। আবার, সাহিত্যের দরবারে যাঁরা মধ্যপন্থী, তাঁদের চোখে বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিকতার' সূচনা, বিকাশ ও পরিণাম,—একাধারে সবই ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। ফলে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনার সুরুতেই এই বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ইতিহাসের শৃঙ্খলা বিধান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আধুনিক যুগ সম্বন্ধে অনবধানতা

ব্যবহারিক অর্থে অব্যবহিত অধুনাতন কালের সংগে যা-কিছু যুক্ত, তাই আধুনিক। 'আধুনিক' শব্দের এই অর্থ-ব্যঞ্জনা আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল। কারণ, এই দৃষ্টিভঙ্গি আজ যা আধুনিক, কালই তা অতীতের গহ্বরে লীন;—বঙ্কিমচন্দ্রের কালে যা আধুনিক, শরৎচন্দ্রের চোখে তা 'গতানুগতিক'; রবীন্দ্রনাথের কালের আধুনিকতা 'রবীন্দ্রোত্তর যুগে' অতীতের

আধুনিকতার ব্যবহারিক অর্থ

সামগ্রী! এইভাবে আধুনিকতার কোন স্থায়ী সংজ্ঞার অভাবে সাহিত্যের "আধুনিক যুগ" অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিকতা একটি কাল-বাচক অভিধা মাত্র নয়,—নানা লক্ষণ-চিহ্নিত একটি বিশেষ অবস্থাকেই এখানে আধুনিকতা নামে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও জাতির জীবনে আধুনিকতার এই লক্ষণ নানা সময়ে পরিস্ফুট হয়েছে,—আর তখনই সেই সেই অঞ্চলে ধ্বনিত হয়েছে আধুনিক চেতনার পদক্ষেপ। ইংরেজ মন ও ইংরেজি সাহিত্যে এই আধুনিকতার সূচনা য়ুরোপীয় রেনেসাঁস যুগ থেকে। বাংলা দেশ ও সাহিত্যের জগতে এই রেনেসাঁস সূচিত হয়েছিল উনিশ শতকে।—অনেকটা এই কারণেই আজ সাধারণ ভাবে ভারতচন্দ্রোত্তর কালে, আর বিশেষ করে, উনিশ শতকের প্রথম থেকে বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিক যুগের' আরম্ভ কল্পনা করা হয়।

বিবর্তনমান-আধুনিকতার শাশ্বত স্বরূপ-লক্ষণ

এবারে আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ বিচার করে দেখব, আধুনিক চেতনার প্রতিষ্ঠা অ-মিশ্র মানবতা-বোধের বৈশিষ্ট্যে। এ-বিষয়ে প্রথমেই সতর্ক হওয়া উচিত। অমিশ্র মানবতা-বোধ, বা বিশুদ্ধ মানব-প্রীতির মধ্যেই যদিও আধুনিকতার ভিত্তি স্থাপিত, তবু, মানবতা-বোধ বর্তমান বিশ্বেরই একমাত্র সম্পদ নয়। মানবতার উপাদান সকল কালের যথার্থ সাহিত্যেরই সাধারণ ঐতিহ্য। শিল্প-সাহিত্য-মাত্রই মানুষের সৃষ্টি;— আর সকল অবস্থাতেই মানুষের অবধানতা তার নিজের সম্বন্ধেই সব চেয়ে বেশি। কেবল এই কারণেই মানুষের যেকোন সৃষ্টির মধ্যেই তার নিজের সম্বন্ধে অবধানতার,—তথা মানবতা-বোধের পরিচয় ব্যক্ত হতে বাধ্য। সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই সহজ অবধানতার ক্রমবিবর্তন ঘটেছে,—মানবতার ঘটেছে ক্রম-পরিণতি। বস্তুতঃ, মানবতাবোধের এই পরিণতির সূত্রেই আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগের সংস্কৃতি-সাহিত্যের ইতিহাস একান্ত-রূপে বিধৃত।

সাহিত্য-সংস্কৃতির আদি যুগ-লক্ষণ

আদিম জীবনের পরিবেশে প্রথম-সভ্য মানুষ নিজের সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিল, অজস্র বিরুদ্ধ শক্তির পীড়ন ও তাড়নে বাধ্য হয়ে। সেই বিরুদ্ধ বিশ্বে আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে মানুষ সেদিন অতিলৌকিক শক্তির কাল্পনিক আশ্রয় কামনা করেছিল। তারই ফলে, আদি যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি একান্তরূপে দেব-বাদ নির্ভর। প্রায় সকল সভ্য দেশেই তার শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আদিম যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদায়ও প্রতিষ্ঠিত! কিন্তু, সেই সাহিত্যেও মানবতার একটি রূপ অস্পষ্ট নয়,—সেখানে বিরোধ-তাড়িত মানুষ অসহায়তা বোধে আর্ত;—দুর্বল মানুষ আত্মরক্ষার কামনায় দৈবী-কানুনের বর্ম-রচনা করতে ব্যস্ত! বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্য চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ও মানবতার এই দুর্বল শঙ্কাতুর মনটিকেই আভাসিত করে তুলেছে।

সন্দেহ নেই, ঐ সকল দেব-বাদ-নির্ভর সাহিত্যে নীতি-উপদেশ এবং তত্ত্ব-কথাই ছিল প্রবল। তবু, যে-কারণে ঐ সকল লেখা সাহিত্যিক 'নির্মিত' হয়ে ওঠে, তা কেবল ঐ মানবিক আর্তিটুকুর জন্যেই। চর্যা-সাহিত্যেও বাঙালির দুর্বল লোক-মানসের অন্তর্বেদনা, কিরূপে আভাসিত, তার আলোচনা করা হয়েছে যথাস্থানে।

মধ্যযুগীয় চেতনার মধ্যে মানবতা সুস্থ ও বলিষ্ঠতর ভূমিকা লাভ করেছে। এ যুগে মানুষ নিজের সম্বন্ধে অধিকতর আস্থাবান হতে পেরেছে, বস্তু-বিশ্বের ওপরে তার চেতনা-স্পন্দিত অধিকার হয়েছে বহু দূর বিস্তৃত। তাই, এই যুগের মানুষের কৌতূহল তার নিজেরই চারপাশে ঘুরে ফিরেছে;—মধ্যযুগের সৃজন-ক্ষেত্রে তাই মানুষ হয়েছে সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু, এই পর্যায়েও মানুষের আত্ম-বোধ অ-মিশ্র নয়,—নিজের 'পরে তার আস্থা ছিল না অটুট। যে সকল শক্তিমান্‌কে আশ্রয় করে সে জড় জগতের বিরূপতাকে অতিক্রম করতে পেরেছে, তার প্রতি নির্বিচার শ্রদ্ধা জানিয়েই ধন্য হয়েছে একালের মানুষ। সম্পূর্ণরূপে দুর্বলতা-মুক্ত নয় বলেই শক্তির আধার মানুষকে মধ্যযুগীয় চেতনা কল্পনা করেছে দেবতার অবতার বলে। ফলে, মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির মত সাহিত্যও হয়েছে দেববাদ-নির্ভর মানবতার আধার। চৈতন্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে এই দেববাদ-নির্ভর মানবতাবোধের পরিচয় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যে মধ্যযুগীয়তা

আধুনিক যুগের মানুষ আত্ম-বিশ্বাসে বলিষ্ঠতম,—তাই, এ মানুষের যা-কিছু জিজ্ঞাসা, যা-কিছু উপলব্ধি, সবই তার নিজের চেতনার মধ্যে প্রসৃত। ফলে, এ কালের মানুষের কৌতূহল ছোট-বড়, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে মানবতার অমিশ্র,—পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়টি খুঁজে ফেরে। এই অর্থেই আধুনিক চেতনার প্রাথমিক উপাদান অবিমিশ্র মানবতা-বোধ। কিন্তু মানবতা-বোধের এই অবিমিশ্র অখন্ডতা আধুনিক-চেতনাকে কোথাও কোথাও 'স্বাধিকার প্রমত্ত' করে তোলে। তখন অনাধুনিক সাহিত্যের মানবিক উপাদান এবং আবেদনকে অস্বীকার করার উন্নাসিকতা দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রেও অতি-আধুনিক যুগে এই মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিয়েছে,—কোথাও বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের স্পর্ধিত অকারণ-নিন্দা, কোথাও আবার উনিশ-শতকীয় সাহিত্যের কিশোরোচিত অতি-উচ্ছ্বাসের প্রতি অর্থহীন অনাস্থা প্রকাশে।

আধুনিকতার পূর্বসূত্র

মুকুন্দরামের সমাজ-দৃষ্টি, কিংবা বৈষ্ণব কবিতার নর-লীলা-প্রীতি দৈবী-চেতনাশ্রিত; অথবা, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচনার স্বাভিমান ও স্বজাতি-প্রীতির অতি-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে বলেই সাহিত্য হিসেবে তা নিকৃষ্ট হতে বাধ্য নয়। সকল কালের সব সাহিত্যের মধ্যেই রসিক-চিত্ত

যা খুঁজে ফেরে, তা মানবিক কৌতূহল (Human interest)-এর রস-রূপ। আর, এই মানবিক কৌতূহল কোন পর্যায়েই অন্য-নিরপেক্ষ (Absolute) নয়, সর্বকালেই তা স্থান-কাল-পাত্রের প্রভাবে পুষ্ট এবং বিশেষিত। মনুষ্যত্বের এই বিশেষিত পুষ্টিকে একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র মনে করবার কারণ নেই।—সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ একটি ক্রমপরিণত চেতনার আত্ম-প্রকাশের ধারা,—এই ধারা অতীতকে আশ্রয় করেই বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার বর্তমানকে পেরিয়ে উৎক্রান্ত হয় ভবিষ্যতের পথে। মনুষ্যত্বের এই স্বভাব বিশ্লেষণ করে বিশ শতকের-মনস্তাত্ত্বিকও স্বীকার করেন,—

এবং ইতিহাসের শিক্ষা

"Man is a creature capable of so transcending his own limitations of sense and of subjectivity as to gain ever more knowledge about his world and about himself in that world-১"—

মানুষের বিশ্বে মানব-আত্মার এই ক্রম-বর্ধমান জ্ঞান ও উপলব্ধির ধারক মানবতার ইতিহাস;—তাই, মানুষের সাহিত্যও এই ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করেই ক্রমশঃ গড়ে ওঠে। এই কারণে, ইতিহাসের পক্ষ থেকে 'অতি-আধুনিক' ধরণের সাহিত্য বিচারের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে,—আধুনিক সাহিত্যকে অতীত-নিরপেক্ষ একটি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বরূপে অনুভব করতে গেলে, সাহিত্যের স্থায়ী মূল্যকেই খণ্ডিত করা হবে। মুকুন্দরামের সাহিত্যে মধুসূদনের মানবতাবোধের বিশুদ্ধি নেই. অথবা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের সংযত-সুন্দর রোমান্টিকতার অভাব আছে বলেই এঁদের সৃষ্টির যথার্থ স্বাদ গ্রহণে বাধা যেন না ঘটে,—ইতিহাসের ঔচিত্য-বোধের অনুসারে এঁদের আপেক্ষিক পরিবেশকে স্বীকার করেই যেন তাঁদের স্থায়ী মূল্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হই।

[২]

আধুনিকতার এই ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতা স্বীকার করে এবারে অনুসন্ধান করব আধুনিক সাহিত্যের অন্তবর্তী বিশুদ্ধ মানবতাবোধের লক্ষণগুলিকে। আগেই বলেছি,—এই পর্যায়ে মানুষই হয়েছে সাহিত্যের

আধুনিকতা, মানবিকতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

একমাত্র উপজীব্য,—কোন বিশেষ শক্তিধর মানুষ বা মহামানব নয়,—সুখ-দুঃখ. ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের বিচিত্র উত্থান-পতনে বন্ধুর সাধারণ মানুষের জীবনই হয়েছে একালের সাহিত্যের কৌতূহল-কেন্দ্র। জীবনের এই নির্বিচার বিচিত্র রূপটি যতই পুঙখানুপুঙখ ভাবে চোখে পড়েছে, মানুষের বিস্ময় গেছে ততই বেড়ে। বিশেষ মানবের অসাধারণ শক্তি, অথবা মানবতার

১। The Mature mind—H. A. Overstreet.

সাধারণ গুণাবলী অপেক্ষা নানা জনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটির প্রতি একালের কৌতূহল ক্রমশঃ বর্ধিত হয়েছে;—স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে সীমাতিক্রমী শ্রদ্ধাবোধ,—যার ঐতিহাসিক পরিণাম রূপ পেয়েছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বোধে। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পটভূমিতে আধুনিক-চেতনার এই সব ঐতিহাসিক লক্ষণের বিশ্লেষণ করে এ-কালের মনোবিজ্ঞানী বলেছেন,—সে-যুগে

"A liberating conviction was growing among men that man must discover his own destiny—not in a distant heaven, but on earth—and that his destiny must express what he is an individual,—not what he is as a member of certain social and economic class.

"The renaissance was an affirmation of individuality. It bade the human mind within himself the creative sources of his own fulfilment. In this respect, the renaissance was a necessary and salutory revolt against medeaval authoritarianism."১

আধুনিকতা ও রেনেসাঁস

এই উদ্ধৃতি থেকে রেনেসাঁস-উত্তর আধুনিকতার একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ে মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ উগ্র,—গোষ্ঠি-জীবনের প্রতি অবিশ্বাসী এবং অপরিণামদর্শী। আর একদিক থেকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে এই অতিশয় প্রীতি-দ্বন্দ্ব-প্রবণ,—মধ্যযুগীয় অন্ধ-সংস্কারের আবেগস্ফীত বিরুদ্ধতায় এই চেতনার ভিত্তি। এই কারণেই এই যুগ-চেতনার ফলশ্রুতি ঘোষণা করে একই মনোবিজ্ঞানী বলেন,—

"It was, we might say, man the adolascent emerging out of the long dependence of infancy and childhood, but it was not yet man the mature adult."

মানবতার এই বয়ঃসন্ধি-লীলা ইংলণ্ডের রেনেসাঁস-উত্তর কালের সাহিত্যে স্বয়ংস্ফুট। বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁস অনেকাংশে সেই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তা ছাড়া, নিজস্ব কারণেও গোটা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য বাঙালি-মানসের এই বয়ঃসন্ধি-সমুচিত উল্লাসে স্ফীত। এই সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ আত্ম-সচেতনা, উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি, মধ্যযুগ-বিমুখতা ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা; আর সব কিছুই ব্যাপক আবেগ-উচ্ছ্বাসের দ্বারা চিহ্নিত।

কিন্তু, ইতিহাসের কোন চেতনাই স্বয়ং-স্ফূর্ত নয়,—পূর্বাপর সম্পর্কে বিধৃত। এই স্বাভাবিক কারণের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি যুগের উৎস-বিকাশ-পরিণাম তিনটি পৃথক্ পর্যায়ে বিন্যস্ত। (১) প্রথম পর্যায় বয়ঃসন্ধির প্রস্তুতি কাল,—কৈশোর-প্রাচুর্যের পীঠমূলে যৌবন-লক্ষণের কেবল

১। ঐ।

অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে এ পর্যায়েঃ—ভারতচন্দ্রোত্তর কাল থেকে মধুসূদন-পূর্ব উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাহিত্য-ইতিহাস এই লক্ষণান্বিত। (২) দ্বিতীয় পর্যায় বয়ঃসন্ধি ও যৌবন-মুক্তির কাল;—কৈশোরাশ্রয় থেকে মুক্তি-প্রয়াসী যৌবন-শক্তির দীপ্তি মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় ভাস্বর। (৩) আর এই চেতনার পরমা পরিণতি,—তথা বাংলা সাহিত্যের স্বস্থ যৌবন-প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রবীন্দ্র-প্রতিভার যৌবনস্পর্শ থেকে শরৎচন্দ্রের প্রৌঢ়ীযুগ পর্যন্ত কাল-সীমায়!

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্তর-বিন্যাস

মানবতার ইতিহাসে বিশ শতক বয়ঃসন্ধি-সমুত্তীর্ণ পরিণত যৌবনের দাবি করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়-জীবনের সাধনাকে আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্য সেই যৌবন-পরিণতি-লোকে স্পষ্ট পদক্ষেপ করেছে। এখনও চলছে বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত সেই ধারার বিবর্তন। ইতিহাসের পাতায় যৌবন-পরিণাম পৃথক্ যুগ-চেতনার আধারে পৃথক্ বিচারের দাবি রাখে। কিন্তু, অনিশ্চিত দুর্গম পথে নিয়ত চলমান বাংলা সাহিত্যের এই সমাধুনিক যুগের বিচার স্থগিত রেখে পূর্বোক্ত রেখার অনুসরণে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত সদ্য-বিগত আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক অনুসরণই আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিকতার উৎস সন্ধানে

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা নির্দেশিত হয়েছে তুর্কী আক্রমণের সমকালে। তেমনি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রকর্ষকেও একান্ত-ভাবে য়ুরোপীয় সংসর্গের সংগে,—বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনের সংগে যুক্ত করা হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন,—

"The British conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature, and profited by it."১

ইতিহাসের গ্রন্থি মোচনের জন্য এই মন্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন প্রয়োজন।

১। Literature of Bengal.

আধুনিকতার উৎস

বাঙালির আগেই একাধিক ভারতীয় জাতি য়ুরোপীয় সংসর্গের সুযোগ পেয়েছিল। এমন কি, ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙালির মত অন্যান্য একাধিক প্রদেশও সমান সুবিধা লাভ করেছিল। তবু, বাঙালিই সেদিন প্রতীচ্য ভাবধারার উন্নত ও অভিনব জীবনাদর্শের দ্বারা সব চেয়ে বেশি লাভবান (Profited) হ'তে পেরেছিল, এ ঘটনা আকস্মিক নয়। বস্তুতঃ, বাঙালি চেতনার এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মধ্যেই অনুস্যূত ছিল আলোচ্য বাঙালি-জীবন-বিপ্লবের (Revolution) মহাবীজ। তাই, এই সর্বাত্মক ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের ইতিহাসকে সন্ধান করতে হবে জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উৎস-মূলে;—সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির তথ্য সমাহরণের মধ্যে নয়। যেমন তুর্কী আক্রমণ, তেমনি য়ুরোপীয় সংযোগও বাঙালির জাতীয় জীবনের জাগৃতি-পিপাসু মর্ম-পীড়াকে আক্ষিপ্ত করেছিল,—করেছিল উদ্বোধিত, আলোড়িত। তাই, বাঙালির রেনেসাঁসের অনুপ্রেরক শক্তিরূপে য়ুরোপীয় সংযোগকে ইতিহাস যেমন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাবে, তেমনি সে ইতিহাসের উৎস আপন আশ্রয় খুঁজবে সমকালীন জাতীয়-চেতনার মর্ম-মূলে। সেখানেই খুঁজে পাব বাঙালি জীবনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে, যার প্রভাবে অপূর্ব বিজাতীয় সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা নিয়ে বাঙালি আপন সমুন্নতির (Profited হবার) স্বয়ং-স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্কার করেছিল।

এবং অনাধুনিক পূর্বসূত্র

তাই, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উৎস-সন্ধানের জন্য অব্যবহিত পূর্ব যুগের বাংলার জীবন-ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আপাত-দৃষ্টিতে সে এক নিরবচ্ছিন্ন বিনষ্টির ইতিহাস। কিন্তু, সেই বিনষ্টির ধারাকে গভীরভাবে অনুধাবন করলেই তার অন্তর্নিহিত জাগরণ-কামনার মর্ম-পীড়া স্পষ্ট অনুভূত হবে,—প্রলয়-পয়োধি-নিমগ্ন সৃজন-বেদনারই মত।

মধ্যযুগের জীবন-স্বভাব

মধ্যযুগের বাংলাদেশের জীবন-ধর্মে এই বিনষ্টির পরিচয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে আরম্ভ করেছে সপ্তদশ শতাব্দী কাল হতে। মুস্‌লিম আক্রমণ-পূর্ব বাংলা দেশের ইতিহাস সব দিক থেকেই স্বয়ং-স্বতন্ত্রতার ইতিহাস। পাঠান শাসিত বঙ্গদেশে বাঙালির এই স্বতন্ত্রতার ধর্ম একেবারে প্রথম পর্যায়ে বিপর্যস্ত হ'লেও পরবর্তী ধাপে ধাপে পরিপুষ্ট হয়েছে। পাঠান রাজ-গোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-লোলুপতা প্রথমাবধিই বাংলাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে নি। বঙ্গ-ভূভাগের কোন এক অংশ মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির অধিকৃত হলেও, অন্যাংশে ব্যাপকভাবে বাঙালির অভ্যস্ত জীবনাচরণে কোথাও বাধা ঘটে নি। তাছাড়া, বিচ্ছিন্নভাবে আক্রান্ত নানাস্থানে, নানা সময়ে প্রথম দেড়শো বছর কাল বিশৃঙ্খলা এবং উৎপীড়ন প্রবল হলেও,—পরে তা ক্রমশঃই বাংলার

স্বকীয় জীবন-ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ যথোচিত দূর-দৃষ্টির সঙ্গে অনুভব করেছিলেন—

"..that the Ilyas Shahi' dynasty, whom he supplanted, represented Bengal's hopes and aspirations and had almost become a national institution."১

বাংলাদেশে ইলিয়াস্ শাহী শাসনের পত্তন হয় ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে। স্বয়ং হুসেন শাহ ইলিয়াস শাহী বাংলার ঐতিহ্য ও প্রতিশ্রুতিকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক এই তথ্য সমর্থন করে বলেছেন,—

"With these (Ilyas Shahi') aspirations he identified himself so whole-heartedly that his alien origin was forgotten and his Hindu subjects compared him to the incarnation of Krishna. By recalling the old aristocracy to power and position, he showed that though a new dynasty had come to power, the old traditions were to continue."২

সেকালের বাংলার জীবন-ব্যবস্থায় এই ভূমিজ-অভিজাত্যের ঐতিহ্য-পরিচয় (Tradition) মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বস্তুতঃ, সেকালের বাংলার অভিজাত ভূম্যধিকারিগণ শোষণের পরিবর্তে যথার্থ শাসন ও জনপরিপালনই করেছিলেন বেশি! ফলে, বিভিন্ন ভূম্যধিকারকে কেন্দ্র করেই সেকালের বাংলায় স্বয়ং-সম্বদ্ধ সমাজ-সংস্থা গড়ে উঠেছে,—ধর্ম, অর্থনীতি. এমনকি সংস্কৃতিগত আদর্শেরও সম্পূর্ণতা নিয়ে।

এবং মোগল-পূর্ব বাংলার সমাজ

পাঠান আমলের একেবারে প্রথম পর্যায়ের শেষেই বাংলাদেশ সর্ব-ভারতীয় রাজনীতি-অর্থনীতির সম্পর্কচ্যুত হয়েছিল; দিল্লীর শাসন-কর্তৃত্বের হাত থেকে সেদিনকার বাংলা ছিল প্রায়শঃ মুক্ত। তাই, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কোন নির্দিষ্ট মুদ্রা-মান অপেক্ষা কাঁচা মাল, বা স্থানীয় জন-স্বীকৃত মাধ্যম 'কড়ি' বহুল প্রচলিত ছিল। তাছাড়া, কাঁচা টাকা প্রচুর ছিল না বলেও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থবণ্টনের অগাধ পার্থক্য দেখা দিতে পারেনি। অপর পক্ষে, সেদিনকার বাংলা ছিল একান্তরূপে আত্ম-কেন্দ্রিক। এমন কি, বাণিজ্যাদির উপলক্ষ্যেও বহির্ভারতের সংগে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। ফলে, পারস্পরিক সমৃদ্ধির জন্যও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে একান্তরূপে একে-অপরের 'পরে নির্ভর করতে হয়েছিল। অতএব, সমাজ-দেহে

১। History of Bengal Vol. II, Ch. VII.
২। ঐ।

সংস্কৃতির একান্তবন্ধতা সহজেই সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া, সে যুগের বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসিগণের অধিকাংশই ছিল বাঙালি। একমাত্র বাংলা ভাষাই ছিল তাদের সকলের মাতৃভাষা; সেই সংগে একই পূর্ব-পুরুষানুক্রমে আগত বাঙালি জীবনাদর্শের ধারা ছিল তাদের সকলের এক ও অভিন্ন সাধারণ ঐতিহ্য।

এই সাধারণ ঐতিহ্যের অনুবর্তন করেই সে যুগের বাংলার রাষ্ট্র-শক্তি সর্বাত্মক অর্থে "National Institution" হয়ে উঠেছিল। এই ধারার পৃষ্ঠপোষক রূপে সে যুগের অভিজাত ভূম্যধিকারিগণ হয়ে উঠেছিলেন সমকালীন বাংলার "Tradition"-এর ধারক এবং বাহক।

মোগল শাসনে আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গের ভূম্যধিকার সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সংগে পুনরায় যুক্ত হল। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক ব্যবস্থার সর্বাত্মক ব্যবহার ও প্রয়োগ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের আগে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মোগল রাষ্ট্রাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অত্যাচারে পীড়িত হয়েই মুকুন্দরাম বাস্তুত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কবিকর্মের সিদ্ধি-লাভ ঘটেছিল পাঠান-বাংলার ঐতিহ্য-পীঠভূমিতে।

মোগল যুগের অভিনবতা

যাই হোক, জাহাঙ্গীরের শাসনকালে বাংলার সর্বভারতীয় সম্পর্কান্বিত হয়ে ওঠার প্রথম মুহূর্তকে ঐতিহাসিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অভিনন্দিত করেছেন,

"In one word, during the first century of Mughal rule (1557-1675) the outer world came to Bengal and Bengal went out herself to the outer world, and the economic, social and cultural changes that grew out of this mingling of peoples mark a most important and distinct stage in the evolution of modern Bengal."১

এবং বিনষ্টির ইতিহাস

উদ্ধৃত অংশে মোগল বাংলার বহির্ব্যাপ্তির যে অপূর্ব সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে তাতে বাঙালির জীবন-ব্যবস্থায় প্রবল বৈচিত্র্য, আর্থিক সমৃদ্ধি, এবং বিলাস-ব্যসনের সুবিধা হয়েছিল অবারিত। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য হবে,—এই অভিনব সুযোগের সূত্রে বাংলার সামাজিক, বা সাংস্কৃতিক জীবন নূতন কোন মূল্যবোধ, অথবা নূতনতর কোনো জীবনাদর্শের আশ্রয় খুঁজে পেয়ে ছিল কী ?—আমাদের ধারণা, বৈষয়িক সমৃদ্ধির কল্পনাতীত প্রসার এবং বিলাস-ব্যসনের নিত্য-নব প্রলোভনকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার মত মানস বলিষ্ঠতার অভাব ঘটেছিল সেকালে। ফলে, মোগলযুগের

১। ঐ Ch. XII।

ভার সমতাহীন আর্থিক প্রাচুর্য বাংলার ব্যাপকতর জীবনক্ষেত্রে বিনাষ্টির পথ করেছিল অবারিত।১

মোগল-বাংলার পূর্বকথিত অভ্যুদয় সমুন্নতির হিসেবে ঐতিহাসিক দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ঃ—(১) ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং (২) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্প্রদায় গঠন।২ প্রথমটির সম্বন্ধে ইতিহাস নিঃসন্দেহ। মোগলযুগে বাংলাদেশ সর্বভারতীয় মুদ্রা-জগতের সংগে যুক্ত হয়েছিল। ঢাকা এবং রাজমহলে মোগল টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হল এবং কেবল ১৬৮০-৮৩ খৃীঃ, এই চার বছরে,

মোগল যুগের প্রাচুর্য।

"The equivalant of eighty lakhs of rupees was thrown in to the Bengali Market every year by only one European Company (The East India Company) in the form of silver bullion coined into rupees at the Mughal mints of Rajmahal and Dacca."৩

যুদ্ধ-পূর্ব শেষ বছর ১৯৩৮ ইংরেজির মুদ্রা-মূল্যমানের তুলনায় সেকালের মুদ্রামূল্য ছিল ২০ গুণ বেশি। ওলন্দাজ বণিকদের কাছ থেকেও বাংলাদেশ প্রায় একই সময়ে সম-পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা উপার্জন করেছিল। অন্যান্য সূত্রেও প্রচুর পরিমাণ অর্থলাভ ঘটে। এই আর্থিক প্রাচুর্য বাংলা-দেশের ক্রয়-ক্ষমতাকে আশাতীত মাত্রায় বাড়িয়ে তুলেছিল। অপর পক্ষে, সার্বজনীন মুদ্রা-জগতের সান্নিধ্য-লাভের ফলে বহির্ভারতীয় বাণিজ্যের সংগে সংগে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আন্তর্বানিজ্যেরও অবাধ সুযোগ বাঙালির পক্ষে প্রসারিত হয়ে গেল। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ সে সুযোগের অপব্যবহার করে নি। তবু. আপামর বাঙালি সাধারণ এই অপ্রত্যাশিত অর্থ-সম্পদের ফল-ভোগী হতে পারে নি। অন্যদিকে এই উপলক্ষ্যেই সারাদেশে আবার অর্থনৈতিক শ্রেণী-পার্থক্য দেখা দিয়েছে,—নগর থেকে গ্রাম হয়েছে বিচ্ছিন্ন। নগরে নগরেও নতুন করে গড়ে উঠেছে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী-বিভাগ। ক্রমশঃ আর্থিক বিচ্ছিন্নতা চিত্তের বিভেদকে করেছে প্রসারিত,—সূচিত হয়েছে আত্মার বিরোধ ও অপচয়।

মোগল শাসনের সমৃদ্ধি-যুগকে ভারতবর্ষের প্রচুর অপচয়ের ইতিহাস বলে মনে করা অন্যায় নয়; ক্ষমতার অপচয়, অর্থের অপচয়, প্রচুরতম প্রাণ-শক্তির অপচয়! মোগল রাজ-ছত্রতলে বহু রাজ্য বিজিত ও সংহত হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী শান্তিলাভ সম্ভব হয় নি প্রায়ই। অর্থ-সম্পদ উপার্জিত হয়েছে তুলনাহীন পরি-মাণে। কিন্তু, বিলাস-ব্যসনে, নীতি-শৃঙ্খলাহীন ভোগ উন্মত্ততায় তার

এবং অপচয়

১। দ্রষ্টব্য—Bengal Under Akbar & Jahangir। Dr. Tapan Ray Chaudhuri।

২। ঐ।

৩। History of Bengal—ঐ।

বিনষ্টি ঘটেছে ততোধিক। যে-শক্তি রাজ্য-জয় করেছে, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে, বিজয়-শেষে সেই শক্তিই প্রমত্ত লালসায় হয়েছে অন্ধ। ফলে, বিজয়োত্তর সুশাসনের কথা ভেবে ওঠা সম্ভব হয় নি। মোগল-ভারতবর্ষ অনেক সমৃদ্ধির আকর ছিল। কিন্তু তার অন্তরালে যে সম্ভাবনার প্রতি-শ্রুতি ছিল, অপচয়ের ফলে তা বিনষ্ট হয়েছে। মোগল-বাংলায়-ও ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তিই ঘটেছিল।

মোগল 'হারেম' মোগল সাম্রাজ্যের অপরিহার্য অংগরূপে ইতিহাসকেও অতিক্রম করে কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁচেছে। বাংলাদেশের মোগল শাসন-ভুক্তির সংগে সংগেই নূতন শাসন-দণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে 'দিল্লী-ওয়ালারা' বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন; তাঁদের মন এবং চোখ ছিল দিল্লীর স্বপ্নে রঙিন্।—সেই স্বপ্নের বাস্তব-

নৈতিক জীবনে অপচয়

রূপ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত হয়েছে, —রাজমহলে, ঢাকায়, বর্ধমানে,—আরো পরে মুর্শিদাবাদে। ভারতচন্দ্রের সাধনপীঠ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগর-ও অনুরূপ মোগল নাগরিকতার অনুকৃতি মাত্র। গ্রামে-গাঁথা বাংলাদেশের প্রাণ-ধারাকে বিচ্ছিন্ন করে মাঝে মাঝে জেগে উঠেছে নাগরিকতার কূর্ম-পীঠ। সংগে ছিল সেই 'হারেম'। প্রবল শক্তির সংগে প্রবল-তর সম্পদ ও সম্ভোগের স্পৃহাকে প্রত্যক্ষ করে বাংলাদেশ স্তম্ভিত হয়েছিল। শক্তি ও সম্ভোগ সম-পদক্ষেপে চলেছিল একই সংগে, —আর তারই ফলে বাংলার সার্বজনীন নৈতিক ও সামাজিক জীবন-বোধের চোখ যেন ঝল্সে গিয়েছিল; শক্তি আর যথেচ্ছাচরণের মধ্যে পার্থক্য হয়েছিল লুপ্ত-প্রায়।

মোগল বাংলা প্রথম দীর্ঘস্থায়ী স্বস্তির স্বাদ ভোগ করতে পেরেছিল শাহজাদা সুজার শাসন কালে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রীঃ)। তাঁর রাজমহল-বাসের দুর্ভাগ্যের উল্লেখ করে ঐতিহাসিক বলেছেন, রাজ প্রাসাদের অগ্নি-দাহের ফলে সেখানে সুজার 'হারেম'-নারীদের ৭৫ জন জীবন্ত-দগ্ধ হয়েছিলেন।[১] এই হারেম-বিলাস ও তার আনুষঙ্গিক নৈতিক দুষ্কৃতি বাংলাদেশে মোগল শাসনের প্রথম থেকেই বহু ব্যাপক এবং সংক্রামক হয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে মোগল বাংলার প্রথম বৈদেশিক বাণিজ্য-বন্দর হুগলীতে পর্তুগীজ বণিক সমাজের দুর্গতির কারণ হিসেবে ঐতিহাসিক তাদের প্রাচ্য হারেম-সহযোগে "সম্পন্ন, অলস, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা"-পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন।[২]

ইতিহাসের যে কোন পর্যায় থেকে এর প্রমাণ উদ্ধার করা চলে। বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও এখানে কয়েকটি কেবল চরম দৃষ্টান্তই উদ্ধার করব। শায়েস্তা

১। ঐ Ch. XVII।
২। ঐ

খাঁ ছিলেন মোগল বাংলার একজন সার্থক-কর্মা শাসক। সুজার পরাভবোত্তর বিশৃঙ্খলা থেকে তিনিই বাংলার শাসন-ব্যবস্থাকে মুক্ত করেন। প্রায় ২৫ বছর শান্তি আর শৃঙ্খলার সংগে বাংলার রাষ্ট্রাধিকারেও ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। যৌবনে ভারতের বিভিন্ন রণ ও কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্বজয়ী হয়েছিল। কিন্তু ৬৩ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসে "He was a tired old man" এবং তাঁর ব্যক্তি-জীবন প্রধানতঃ নির্বাহিত হত "in ease and pleasure amidst his numerous harem"।[১] শক্তিমান্ বঙ্গ-শাসকের এই জীবন যাত্রা যথোচিত ফলপ্রসূ হয়েছিল। আনুমানিক ৬৬ বছর বয়সে কঠিন রোগাক্রান্ত, এবং ৮৩ বছর বয়সে "old and very feeble" বলে লক্ষিত হ'লেও, ৮২ বছর বয়সে নূতন পুত্র সন্তান লাভের সৌভাগ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত হ'তে হয় নি। সর্বজন-মান্য ব্যক্তিত্বের এই জীবন-রূপ বাংলার জাতীয় জীবনে নিস্ফল হয় নি, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

এতো কেবল ইতিহাসের একটি মাত্র দিক্। মোগল রাষ্ট্র-মণ্ডলীর প্রধানগণের চিত্তে ভোগাসক্তির চেয়ে অর্থাসক্তি কম ছিল না। আর, তাঁরা বাংলা দেশে আসবার সময়ে দৃঢ় ধারণা নিয়ে আসতেন,—এটি মোগল সাম্রাজ্যের সম্পন্নতম রাজ্যাংশ। এই সচেতনতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারই তাঁরা করতেন। ভারত সম্রাটের চাকুরী স্বীকার করে যাঁরা এ'দেশে আসতেন, তাঁদের সকলেরই মাইনেস্বরূপ জায়গির হিসেবে গোটা বাংলা দেশটাই ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। বাংলার ভূমি রাজস্ব থেকে মোগল সরকার কিছুই পেতেন না।[২] বাংলাদেশ উপ-শাসক এবং রাজ-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। তার ফলে, এ-সম্পত্তি থেকে সব চেয়ে বেশি মুনাফা আদায় করে নেবার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। লাভ যতই বেশি হ'ত, আরো লাভের আকাঙ্ক্ষা ততই হয়ে উঠত দুর্বার। এই বর্দ্ধমান বুভুক্ষা-শিখার ভূমি-নির্ভর বাঙালি-সাধারণের শোষিত জীবন অসহায় সমিধ হয়েছিল। ফলে, মোগল শাসনের প্রারম্ভ থেকেই বাংলার উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতাশালী শাসনাধিকারিগণের জীবন-চূড়ায় সম্পদ, সম্ভোগ, নীতিহীন স্বার্থ-পরতা কেন্দ্রিত হচ্ছিল,—অন্যদিকে নিম্নবর্তী জনসাধারণের জীবন-বনিয়াদে শূন্যতা এবং শুষ্কতা হয়ে উঠছিল পুঞ্জীভূত। বলা বাহুল্য, বাংলার বনেদি ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যাঁরা আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলেন তাঁরাও বিত্তার্জনের এবং ভোগ-প্রাচুর্য বৃদ্ধির এই 'মহাজন-পন্থা'ই অনুসরণ করেছিলেন। তাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে সুরুতেই বাংলাদেশে এসে মুর্শিদ কুলিখাঁ যখন অনুভব করেছিলেন,—"Like all aristrocracies, these men had now

মোগল অর্থ-লোলুপতা

১। ঐ Ch. XX।
২। ঐ Ch. XX।

fallen into indolence, negligence and improvidence",[১] তখন আশ্চর্য হবার কোন কারণই আর থাকে না।

কিন্তু, এখানেও শেষ নয়। স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে রাজ্যভোগ বণ্টন করেই দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা কখনো সন্তুষ্ট থাকেন নি,—ভারত সাম্রাজ্যের 'সম্পন্নতম অংশের' প্রতি তাঁর নিজের প্রত্যাশাও ছিল সীমাহীন। বলা বাহুল্য, এই প্রত্যাশা-পূরণের গুরু-ভারও বহন করেছে সর্বরিক্ত বাঙালি জনসাধারণ। আর, তার মাধ্যম ছিল প্রধানতঃ ভূমিজ সফল। ঔরঙ্গজীবের সময় থেকে আর্থিক প্রত্যাশাও মাত্রাতিরিক্ত হয়েছিল। তখন ভূমিজ-সম্পদের সংগে বাণিজ্যিক সম্পদের প্রতিও শাসকের লোলুপ দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অবশ্য, কোন সময়েই যে এঁরা এদিকে দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ রেখেছিলেন, একথা মনে করবার কারণ নেই। শাসন ও শোষনের সংগে চল্‌ল এবার পূর্ণমাত্রায় বাণিজ্যিক দুর্নীতি। পূর্বেই বলা হয়েছে, মোগল শাসনে বাংলাদেশ সর্বভারতীয় মুদ্রা-জগতের অন্তর্ভূত হয়েছিল বটে,—কিন্তু বাংলার অর্থ-কোষ পরিপূর্ণ হয়েছিল প্রধানতঃ য়ুরোপীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের কল্যাণে। বাংলার মোগল শাসকগণ মুনাফার অতিরিক্ত লোভে এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থায়ও যথেচ্ছাচারের প্রবর্তন করলেন। অতি-প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীতে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার (monopoly) স্থাপন,— অন্যান্য পণ্যের 'পরে যথেচ্ছ বাণিজ্য-শুল্ক প্রবর্তন ইত্যাদির দ্বারা দেশীয় এবং বিদেশীয় বণিক্‌গণের জীবন তাঁরা অতিষ্ঠ করে তুল্‌লেন। মীরজুম্‌লা (১৬৫৯-১৬৬৩ খৃীঃ) নিজেই শাসন-শক্তির পক্ষ থেকে একক-বাণিজ্য সুরু করেছিলেন, সায়েস্তা খাঁর সময়ে তার প্রসার এবং প্রপীড়ন মাত্রা অতিক্রম করে। বলা বাহুল্য, এই সুযোগে রাজকর্মচারীরাও নূতন মুনাফার জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষ্যে, বিদেশী বণিক্‌গণের সংগে বাংলার মোগল রাষ্ট্রশক্তির বিরোধ ক্রমশঃ বিদ্বেষ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার শাসকগণের যথেচ্ছাচারের জন্য এখানে বাণিজ্য প্রসার অসম্ভব বুঝে ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে যথোচিত সুযোগ পেয়ে আবার ফিরে এলেও, নির্বাধ বাণিজ্যে য়ুরোপীয় বণিকগণ বারে বারেই বাধা পেয়েছে। আর, এ ধরণের বিরোধকে কেন্দ্র করেই ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক সুযোগ রক্ষার উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে প্রথম বিশেষ ব্রিটিশ সৈন্যদল প্রেরিত হয়েছিল (১৬৮৬ খৃীঃ)।[২]

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে বিনষ্টি

ফল কথা, সীমাহীন অর্থলোলুপতা, নির্বাধ সম্ভোগ-কামনা এবং

১। ঐ।
২। ঐ Ch. XXI।

নৈতিক দুরাচার বাংলার মোগল রাষ্ট্র-কেন্দ্রগুলিকে কলুষিত করেছিল;—সেই সংগে প্রাচীনতর বঙ্গের সম্পন্ন অধিবাসিগণকে করেছিল প্রলুব্ধ। নানাসূত্রে রাজ-কর্ম-ব্যপদেশে সম্পন্ন বাঙালিরা মোগল নগরী ও য়ুরোপীয় বাণিজ্য-কেন্দ্রসমূহে বাস-পরিবর্তন করেন। যথারীতি প্রচুর বিত্তের সংগে, সুপ্রচুর নৈতিক গ্লানি তাদেরও জীবনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অন্য দিকে, গ্রামীন্ জন-জীবনের প্রাণশক্তিতেও যে ভাঁটার টান দেখা দিয়েছিল, তার কথা এতাবৎ উল্লেখ করেছি। গ্রামজীবন প্রাণ এবং ধনের সম্পদে যতই শূন্য হয়েছে,—ততই তলদেশে জমে উঠেছে জঘন্য লালসার গ্লানি। দীর্ঘজীবী এই জীবন-ধারার সামাজিক ফলশ্রুতি স্পষ্ট-বর্ণিত হয়েছে শিবনাথ শাস্ত্রীর কণ্ঠে,—"স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাঁহাদের রাজসভার দূষিত সংস্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্বনাশ হয়, তারপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে থাকে। মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে যে কুরীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে নারীর অবরোধ ও বহু-বিবাহ প্রথা. যদিও বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, এবং কৌলীন্য প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত হইয়াছিল[১], তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনীদিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং সেটা যেন একপ্রকার সম্ভ্রমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংস্রবে হিন্দু ধনীদিগের মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা। ইহা যেন প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকার্য হইত সেই যেন বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইত। ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই মহা-বিনষ্টির ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

"মুসলমান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট-ফল তোষামোদ-জীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা-পরতা। দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় অপর সকলেও তোষামোদ এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত।"[২]

এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে জাতির সংস্কৃতি-সাহিত্যের যথার্থ সমুন্নতি প্রত্যাশা করাও অন্যায়। বস্তুতঃ, মোগল-সংযোগের ফলে এ-বিষয়ে যে-সকল

১। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় কুলীনের বহুবিবাহও মোগল বহু-বল্লভতারই নবতর সংস্করণ বলে মনে করতে বাধা নেই,—এ-ছিল নির্ধনের বহু-বিলাস-প্রচেষ্টারই পরিণতি,—নূতন হারেম-সম্ভোগ-প্রথা।

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

সম্ভাবনা সহজেই অভ্যুদিত হয়েছিল. সমকালীন বাংলার সংস্কৃতি-সাহিত্যকে তা যথোচিত পরিমাণে প্রভাবিত করে নি। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই অনুভূত হওয়া উচিত যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায়-বন্ধনের সংগেও মোগল শাসনের যোগ ছিল পরোক্ষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবধারা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে সর্বাত্মক উন্নতির কারণ হয়েছিল, তার বিস্তারিত পরিচয় পূর্ব-বর্তী পর্যায়ের আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। এ সম্বন্ধে সংশয় নেই যে, এই ভাব-চেতনার কেন্দ্র-শক্তি স্বয়ং চৈতন্যদেব;—আর তাঁর জীবন-কাল নিঃশেষিত হয়েছিল বাংলার মোগল-অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে (১৫৩৩ খৃীঃ)। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন-মূল্যবোধের ঐতিহাসিক উৎস যে তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার ভাবৈতিহ্যের মধ্যে নিহিত. পূর্ববর্তী পর্যায়ের আলোচনায়, সে তথ্য বিস্তৃত বিবৃত হয়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বন্ধনের প্রচেষ্টা মূল্যত শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত ভাব-সাধনারই সহজ-পরিণতি। রাষ্ট্রিক বিবর্তনের প্রভাব যদি তার 'পরে কোথাও থাকে, তা ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। চৈতন্য-যুগে নিখিল বাংলায় ব্যাপক জীবনাদর্শবোধকেই সংহত-সীমায়িত করে সম্প্রদায়-নিবন্ধ করতে হয়েছিল, প্রধানতঃ সমকালীন পরিবেশের আচার-ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবার জন্যে। অনুরূপ কারণেই সমকালীন বৈষ্ণবেতর হিন্দু-সমাজে শ্রুতি-স্মৃতির নবতর গণ্ডি-বন্ধনের প্রবল চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের এই সম্প্রদায়-নিবন্ধতার উদ্দেশ্যও সার্থক হয় নি,—বরং সাম্প্রদায়িকতা ও দেহ-সাধনার মধ্যে তা বিনষ্টি লাভ করেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। তাতেই প্রমাণিত হয়, আলোচ্য-যুগের বাংলায় বৈষ্ণব জীবনাদর্শের প্রকটন যদি কোথাও ঘটে থাকে, তবে তা পূর্ববর্তী যুগের অনুবৃত্তি মাত্র,—আলোচ্যকালের প্রভাব তাকে পোষণ করে নি,—বিকৃত করেছে।

বিনষ্টি-যুগে প্রাচীন সাহিত্যধারা

মোগল-শাষিত বাংলার আত্ম-বিকাশের একটি নবতর সুযোগ দেখা দিয়েছিল ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্য চর্যার মাধ্যমে। মোগল রাষ্ট্রাধিকারে উচ্চশ্রেণীর বাঙালিসাধারণ প্রথমে এ-ভাষার চর্চা সুরু করেছিল। তাছাড়া. মোগল নগরীসমূহে মুসলমানী আভিজাত্যের অপরিহার্য অংগ ছিল ফারসী ভাষা ও ফারসী আদব-কায়দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সাহিত্য-সংস্কৃতির ছাপ লোক-সমাজের সীমাকে অতিক্রম করে সার্থক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। সুফী-ভাবান্বিত লোক-সংগীতের কথা ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, ঐটুকু পর্যন্তই। বাংলার প্রাণ-কেন্দ্রে মোগল-শাসন-যুগের প্রভাব-নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে স্পষ্ট রূপ পেয়েছে;—তখনকার "রাষ্ট্র প্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ

বিনষ্টি-যুগের নবীন সাহিত্য

করেছে। চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্র সমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি। তবু, বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়ে নি,—একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে পার্সি-পড়া স্মিত পরিহাস-পটু বৈদগ্ধের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানতঃ দুই ভাগ ছিল; এক মঙ্গলকাব্য, আর এক বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু, তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোন ছাপ দেখিনে, বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তাছাড়া, সেদিন অন্ততঃ শহরে রাজধানীতে পারসিক আদব-কায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল।—বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি।"[১]

তবু, বাঙালির চেতনার চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল,—সে চাঞ্চল্য নিপীড়নের বেদনা-সঞ্জাত। সাময়িক বাংলার সম্ভোগ-লোলুপতা এবং দুর্নৈতিক জীবন-প্রবাহের অখণ্ড রূপটিই আপন ছায়া ফেলেছে ভারতচন্দ্র এবং রাম-প্রসাদের মত সমকালবর্তী দুই কবির বিদ্যাসুন্দর কাব্যে;—প্রথমটিতে আছে নাগরিক আভিজাত্যের উজ্জ্বলতা,—দ্বিতীয়টি নির্জীব গ্রামীন চেতনার অন্ধ-পঙ্কিলতায় কালিমালিপ্ত। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন গ্লানিকে অতিক্রম করবার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষিতা আর্তনাদ করে উঠ্‌ছিল অসহায় ব্যক্তি-চিত্তে। তারই প্রমাণ রামপ্রসাদের জীবন-নিঃস্যন্দী সংগীতাবলী। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করেছি। এখানে শুধু অনুভব করব. —পুরণো সমাজ-ব্যবস্থার নির্জীব খোলসের মধ্যেও যথেচ্ছাচারী ভোগ-লোলুপতা যখন বিষবাষ্প উদ্গীরণ করছিল, তখন রামপ্রসাদের সহৃদয় চিত্ত-বৃত্তিকে আশ্রয় করে বাঙালি চেতনার উত্তপ্ত বেদনাবোধ আত্মপ্রকাশ করেছে। রামপ্রসাদের সংগীতাবলীর আধ্যাত্মিক মহিমা যতটুকুই থাক, তার পশ্চাদ্-বর্তী আধিভৌতিক জীবন-বেদনাই এই সাহিত্যকে সর্বকালের বাঙালিজন-চিত্ত-হর করে তুলেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কেবল আগমনী-বিজয়া সংগীতই সমসাময়িক বাংলার বাল্য-বিবাহ প্রথার বিষ-তিক্ত সামাজিক ফলকে বিদীর্ণ করে তোলে নি;—"কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত" অসহায় নির্যাতনে ক্ষুব্ধ বাঙালি গণ-চিত্তের বেদনা,—বহু বিবাহ-পীড়িত, বিমাতা-কণ্টকিত পরিবার-জীবনের গ্লানি,—'কৃষ্ণপান্তির' মত অযোগ্যজনের তবিলদারির অপ্রতিহত প্রতাপ ও যথেচ্ছাচরণের মত দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত হবার একটি প্রবল আর্তিকে করেছে অবারিত। সমকালীন বাঙালি ব্যক্তিত্বের এই ভূমি-

বিনষ্টি-যুগের জীবন-যন্ত্রণা ও নবযুগের মুক্তিবেদনা

১। কালান্তর।

তলশায়ী মুক্তি-কামনার আর্তির অতল গর্ভেই নবযুগ-চেতনার গোমুখী-উৎস লুক্কায়িত হয়েছিল। জাতীয় চেতনার এই সহজাত গোপন আর্তিই য়ুরোপীয় সমাগমের অভিনব সুযোগকে এমন উচ্ছ্বসিত আগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল,—আর সে সম্মিলন ঘটেছিল অন্তরে অন্তরেই। তাই, বাঙালি চেতনার সহজ দৃষ্টির অন্তরালে যেখানে আধুনিকতার অশ্রুত পদসঞ্চার সুরু হয়েছে,—তারই কেন্দ্র-ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই নবরূপায়নের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি-ভূমিকে অনুসন্ধান করব এবারে।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিকতার ভিত্তিভূমি

মোগল রাজত্বের বিষ-তিক্ততা অতিক্রম করে বৃটিশ-শাসনের সান্নিধ্য লাভ করার সংগে সংগে বাঙালি-জীবন নব-যুগের আলোক-স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছিল,—এমন অনুমানের চেয়ে বড় ভ্রান্তি আর কিছু নেই। ইতিহাসের গভীর অনুধাবনের পরে আর সন্দেহ থাকে না যে,—

আধুনিকতা ও বাঙালির ইংরেজ-সংসর্গ

"The political history of Bengal in the latter half of the 18th Century is essentially the history of the rise, growth and gradual establishment of British rule."[১]

কিন্তু, সেই সংগে একথাও অনস্বীকার্য যে, ভারতচন্দ্রোত্তর এই সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কালের মত ঊষরযুগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কমই এসেছে। তুর্কীআক্রোমণের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এমনি শূন্যতাময় ছিল।—কিন্তু, সে যুগের পুরোপুরি তথ্য আজও আবিষ্কৃত হয় নি। অপরপক্ষে, আলোচ্য পর্যায়ের তথ্যের প্রাচুর্য আছে; অথচ তার প্রায় সব কিছুই অনুলেখ্য। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, বাংলা-সাহিত্যে নব-যুগ-জাগৃতির আর যে-কোনো কারণই থাক না কেন, বাঙালি জীবনের সংগে প্রত্যক্ষ য়ুরোপীয় সংসর্গ, বিশেষ করে এদেশীয় ইংরেজ বণিক অথবা শাসক-দের প্রাথমিক সান্নিধ্য অন্ততঃ তার একটি মৌলিক কারণ কিছুতেই নয়।

পূর্বের অধ্যায়ে মোগল শাসনের যে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে, তার একেবারে শেষ পর্যায়ে বাংলার রাষ্ট্রাধিকারে নূতন আলোর সম্ভাবনা একটিবার মাত্র উন্মুখ হয়েছিল—যেন সেই দপ করে জ্বলে ওঠা ছিল একেবারে নিভে ডুবে যাবারই পূর্ব-সংকেত। সে-যুগ বাংলার

১। History of Bengali literature in the 19th Century—Dr. S. K. De.

মুর্শিদকুলি-আলিবর্দি খাঁর যুগ। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান হয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন,—আলিবর্দি খাঁর দেহান্ত ঘটে ১৭৫৬ খ্রীঃ। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধ কালের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা ঘটে,—পরবর্তীকালের ইতিহাসকে যা ধারণ করে রেখেছে। প্রথমটি মুর্শিদকুলি খাঁর নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও দ্বিতীয় আলিবর্দির বিভিন্ন সমর-বিজয়। প্রথমটির ফলে বাংলার মধ্যযুগীয় জীবন-ব্যবস্থায় ঘনায়মান ব্যবধান-সম্ভাবনা স্থায়ী অর্থনৈতিক পার্থক্যের পটভূমি আশ্রয় করে চিরন্তনতা লাভ করেছিল। এই নূতন ব্যবস্থায় ভূমি-স্বত্ব-ভোগী প্রজা অথবা ভূম্যধিকারী বনিয়াদি জমিদারের হাত থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হত না। তার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল 'ইজারাদার' নামক এক শ্রেণীর 'কন্‌ট্রাক্‌টার'। অকথ্য দুর্নীতি, উৎপীড়ন ও বর্বরতার সহায়তায় কয়েক বছরের মধ্যেই প্রাচীন জমিদারী ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে এরা নিজেরাই নূতন ভূম্যধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল। ঐতিহ্য-মর্যাদাহীন এই অর্থ-কীটের দল বাংলার বৃহত্তর জীবন-মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের উদর স্ফীত করেছে নির্মম শোষণের মাধ্যমে।

পূর্বসূত্র ঃ—
মুর্শিদকুলি

মুর্শিদকুলির শাসন-ব্যবস্থা এদের লোলুপ উল্লাসকে প্রশ্রয় দিয়েছে,—রাজ-সরকারের প্রাপ্য অংশটুকু মিটিয়ে দিলেই এদের যথেচ্ছাচার অবারিত নৃশংসতার রূপ নিতে পারত। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও ভূমি-কর্ষকের মধ্যেকার মধ্যযুগীয় সংযোগের শেষ সূত্রটি বিনষ্ট হল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই প্রজা-রক্ত-শোষক অর্থ-বুভুক্ষু হঠাৎ-রাজার দল বাংলার ভূম্যধিকারে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

বাংলার ব্রিটিশ-প্রভাবিত সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের পক্ষে এই ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়। কারণ, এ-যুগের বাঙালি অভ্যুদয় যতই মহৎ এবং বৃহৎ হোক,—এই সাহিত্য-সংস্কৃতি কোনো পর্যায়েই নিখিল বাঙালির সর্বজনীন জীবন-খাতে প্রবাহিত হতে পারে নি।—আমাদের আধুনিক সাহিত্য তার জন্মলগ্ন থেকেই ইংরেজি-শিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত বিত্তবান্ নাগরিক বাঙালির সম্পদ রূপেই আত্ম-প্রকাশ করেছে। বিত্ত এবং শিক্ষাহীন গ্রামীন্ বাংলার সংগে তার অসহযোগ মৌলিক। আর, বাংলার এই গ্রাম-বিমুখ নগর-সর্বস্বতার উদ্ভব ঘটেছিল ধনতান্ত্রিক মনোভাবের অন্ধ আত্ম-পরতার মধ্যে; —এই মনোভাবের সূচনাক্ষণে বাংলার পোষক নতুন জমিদার সম্প্রদায় এবং ধনলোলুপ বাঙালি বণিক্ 'নাগর'গণ দুই শ্রেষ্ঠ স্তম্ভরূপে দুদিক থেকে একে বরণ করে পুষ্ট করেছিল। মুর্শিদকুলির রাজস্ব-ব্যবস্থায় বাংলার লোক-জীবনের সংগে সম্পন্নজনের জীবনে যে ধনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা ও

এবং সাহিত্যিক
ফলশ্রুতি

সহানুভূতিহীনতার সুর, কর্ণওয়ালিশের শাসন-নিয়ন্ত্রণে সেই বিচ্ছিন্নতা পৃথক এবং স্বয়ং-স্বতন্ত্র আত্ম-প্রকাশের সুযোগ মাত্র পেয়েছিল।

আলিবর্দির বিজয় অভিযান মোগল ভারতবর্ষের ভয়ংকরতম ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ যুগে বাংলাদেশকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল,—বাংলার ইতিহাসে আলিবর্দির সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়-কীর্তি তাঁর মারাঠা প্রতিরোধে!

"Murshid Quli and Alivardi between them also gave this province a peace unknown in that age elsewhere in India.. Marhatha incursion which convulsed and transformed the face of Malwa and Gujrat, Khandesh and Berar, was felt in Bengal as merely a passing blast (1743-52); it touched the fringe of the province and at the very end (1752) only tore away Orissa from Bengal."১

আলিবর্দি

মনে রাখতে হবে, ঔরংজীবের তিরোভাবোত্তর এই যুগে দিল্লীর সিংহাসন কেবলই হস্তান্তরিত হয়েছে অন্তর্বিরোধের জুয়াখেলায়;—আর সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল এই মত্ততার নেশা। সর্বত্রই ছিল অন্তঃসংঘাত,—সর্বত্রই ছিল বিশৃঙ্খলা, ভঙ্গুরতা এবং বিনষ্টি। বাংলার মাটিতেও এই বিরোধের বীজ মাথা তুলতে চেয়েছিল, আলিবর্দির বিজয়-বাহিনী বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় মিলিয়ে এক অখণ্ড সুসংগঠিত রাষ্ট্রদণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেছিল.— বিভেদ-বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুরতার যুগে এই রাষ্ট্রিক সংহতিই (Political integrity) বাংলার ইতিহাসে আলিবর্দির শ্রেষ্ঠ দান। বাংলায় মারাঠা-বগীর উৎপীড়ন আজও কিংবদন্তীর মাধ্যমে জন-চিত্তে বিভীষিকা রচনা করে থাকে। কিন্তু, পূর্বোদ্ধৃত ঐতিহাসিক মন্তব্য থেকেই অনুভব করা সহজ হবে,—এটুকু মারাঠা আক্রমণের একটি অকিঞ্চিৎকর বলি মাত্র। বাংলার মাটিতে মারাঠা শক্তির প্রতাপ আমূল প্রোথিত হতে পারলে কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, এই প্রসঙ্গে তা অনুমেয়।

আলিবর্দির শেষ জীবনে উড়িষ্যা মুর্শিদাবাদ-রাষ্ট্র-শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সত্য। শুধু তাই নয়, তাঁর দেহান্তর-শেষ বঙ্গ-সাম্রাজ্যের শাসন-শক্তি প্রতিদিনেই শিথিল হয়ে আসছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। তবু, আলিবর্দির শাসন-দণ্ড মুর্শিদাবাদ সিংহাসনকে এক সার্বভৌম ক্ষমতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে অসংখ্য ষড়যন্ত্র, জঘন্য কৃতঘ্নতা ও ক্ষমতা-লুব্ধতা সত্ত্বেও, সিরাজদ্দৌলার শাসনকালেও, মুর্শিদাবাদ সিংহাসনের সেই একচ্ছত্র অধিকারের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয় নি। কেবল এই কারণেই,—মুর্শিদাবাদ রাষ্ট্র-শক্তির এই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের ঐতিহ্য

১। History of Bengal Vol II Ch XXI

হেতুই পলাশির মাঠে সিরাজের পরাজয় ও বিনষ্টির সংগে সংগে বাংলার যথার্থ রাষ্ট্রাধিকারে ব্রিটিশ শক্তি তৎক্ষণাৎ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। বস্তুতঃ, পলাশিবিজয়ের এই রাজনৈতিক তাৎপর্য সমকালীন ব্রিটিশ-বাংলার কর্মকর্তাগণের কল্পনাতেও আসেনি। ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে এই বিজয়কে সকলেই বাণিজ্যিক পুনরধিকার প্রতিষ্ঠার দ্যোতক বলে মনে করেছিলেন।১ কিন্তু, ইতিহাস তার কাজ করে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে;—বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শক্তির কুক্ষিগত হয়েছে; তাদের অজ্ঞাতে। পলাশির স্পষ্ট ফলশ্রুতি প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন, বহুদিন পরে ওয়ারেন্ হেস্টিংস, বাংলায় "ব্রিটিশ-এম্পায়ারের" দায়িত্বের কথা তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন। সে যাই হোক্. বঙ্গ-ভূখণ্ডের যে রাজনৈতিক সংহতির ফলে ব্রিটিশ বণিক্-শক্তি একটি মাত্র যুদ্ধ-জয়ে রাজ-দণ্ডের অধিকার অর্জন করতে পেরেছিল,—তা মূলতঃ আলিবর্দি খাঁর দান। বর্তমান প্রসঙ্গে ঐটুকুই আমাদের প্রধান বক্তব্য।

পলাশির ঐতিহাসিক প্রেরণা

পলাশির যুদ্ধ-শেষের সংগে সংগেই বাংলায় আসলে দ্বৈত শাসন সুরু হয়ে গিয়েছিল।—শাসনদণ্ড চালু ছিল নামমাত্র নবাবের নামে, আসলে চলেছিল ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার ছোট-বড় কর্মচারীদের ক্ষমতা-প্রমত্ত যথেচ্ছাচার। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতার আস্বাদনের পেছনে ছিল যথেচ্ছ লাভের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা। পলাশির যুদ্ধ জয় এবং মীরজাফরকে নবাবী মস্‌নদ্ দানের পুরস্কার রূপে কোম্পানীর হিসাব বাদেও কেবল ক্লাইভই একা ব্যক্তিগত খাতে মুনাফা করেছিলেন:

কোম্পানী "মেম্বার স্বরূপে—২৮০০০০
সেনাপতি—২০০০০০
বিশিষ্ট দান—১৬০০০০০
—————
২০৮০০০০ টাকা।২।"

দ্বৈত শাসন এবং বাংলার সর্বাঙ্গীন জীবন-ধারার মহা-বিনাশ

এই সকল অব্যবহিত লাভ ছাড়াও, একই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তিনি বাৎসরিক ৩০,০০০ পাউণ্ডের জায়গীর ১৭৬৫ খৃীঃ ও তৎপরবর্তী কালেও ভোগ করেছিলেন; ক্লাইভের প্রশংসা-মুখর ব্রিটিশ ঐতিহাসিককেও সে কথা স্বীকার করতে হয়েছে।৩ এর পরে অন্যান্যদের উল্লেখ নিছক প্রসঙ্গ বিস্তারের কারণ মাত্র হবে। এই উপলক্ষ্যে দেশী এবং বিদেশী ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই যুগ-প্রসিদ্ধির দোহাই দিয়েছেন;— মোগলযুগের বাংলায় এ ধরণের ব্যক্তিগত লাভের লোভ ও তার জন্যে নৈতিক দুরাচার

১। Observations on Mr. Vansittart's Narrative—by L. Scrafton.
২। বাংলার ইতিহাস—নবাবী আমল—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। Cambridge History of India. Vol V.

স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা ছিল। কেবল এই কারণেই ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ তার যথোচিত অনুসরণ মাত্র করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যার দ্বারা ক্লাইভ্ বা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌এর দোষক্ষালন হয় না বিন্দুমাত্রও। অপর পক্ষে, এই সত্যই প্রকটিত হয় যে, মোগল বাংলার পঙ্কিলতার স্রোতেই এদেশের ব্রিটিশ রাষ্ট্র-শাসকগণও নির্বিচারে গা ভাসিয়েছিলেন। দুর্গত বাংলাকে জীবন্মুক্তির পথ দেখাবার কোন যোগ্যতাই তাঁদের ছিল না।

বাণিজ্যিক এবং রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারেও সেই একক-প্রাধান্য ও ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থ সংরক্ষণের পুরণো নীতি চালু ছিল। কেবল কোম্পানীর স্থানীয় কর্মকর্তাদের অতি-লোভের আগুনে অসম্ভব পরিমাণ অর্থাহুতি দিতে না পারার জন্যই মীরজাফরকে রাজ্য হারাতে হয়। আর ১৭৬০খৃীঃ সেই অসাধ্য-সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীরকাসিম নবাবী মস্‌নদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন। মীরজাফরের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার মূল্য হিসেবে মীরকাসিমের নিকট থেকে কোম্পানী অন্যান্য বহু সুযোগসুবিধার সংগে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের রাজস্ব-ক্ষমতা লাভ করেন। অন্যান্যের মধ্যে সমকালীন বাংলার দুইজন শ্রেষ্ঠ কোম্পানী-কর্ণধার ভান্‌সিটার্ট এবং হল্‌ওয়েল ব্যক্তিগত খাতে নগদ যথাক্রমে পাঁচ ও দু'লক্ষ সত্তর হাজার টাকা উপার্জন করেন।[১] কিন্তু, অত করেও মীরকাসিম আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে কোম্পানী ছাড়াও নিছক কোম্পানীর কর্মচারী হিসেবে স্থানীয় ব্রিটিশ বণিক্‌দের ছোট-বড় সকলেই যে অস্বাভাবিক সুযোগ এবং অসঙ্গত সুবিধা উপভোগ করছিলেন, তার মাত্রাতিরিক্ত অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবার চেষ্টা করে মীরকাসিম যথাসর্বস্ব হারালেন।

* ১৭৬৩ খৃীঃ ব্রিটিশ বণিক কোম্পানী ও তার কর্মীদের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে অধিকতর সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীরজাফর আবার বাংলার মস্‌নদ্ অলংকৃত করতে পারলেন! তাই বল্‌ছিলাম, দ্বৈতশাসনের আনুষঙ্গিক ব্যভিচার ও দুর্ঘটনা আসলে সুরু হয়েছিল পলাশি-উত্তর কাল থেকেই।

১৭৬৫ খৃীঃ কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে সারা বাংলার দেওয়ানী-ভার গ্রহণ করেন। রাজস্ব আদায় এবং উপভোগের, তথা ব্যক্তিগত লাভ ও লোভের মুর্শিদকুলীর ঐতিহ্যই চল্‌তে লাগ্‌ল,—আরো প্রবল ভাবে। জনশক্তি অকথ্যরূপে নির্যাতিত হ'তে লাগ্‌ল। এই দুরাচরণের চরম ফল ব্রিটিশ বাংলার প্রথম মনুষ্য-কৃত দুর্ভিক্ষ,—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খৃীঃ)। 'আনন্দমঠে'র প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদে এই বীভৎসতার বর্ণনা যে বিন্দুমাত্র কল্পনা-রঞ্জিত নয়, ইংরেজ

'৭৬-এর মন্বন্তর

১। বাংলার ইতিহাস—নবাবী আমল।

ঐতিহাসিকের রচনার বাংলা চুম্বকানুবাদ মাত্র, "The Annals of Rural Bangal" তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। এ-বিষয়ে দীর্ঘ বর্ণনা অবান্তর, কেবল প্রত্যক্ষ-দর্শীর স্মৃতিরোমন্থনের অংশমাত্র উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হব:—

"Still fresh in memory's eye the scene I view
The Shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
Still hear the mothers' shricks and infants' moans,
Cries of despair and agonizing moans
In wild confusion dead and dying lie;
Hark to the jackals' yell and Vultures' cry,
The dogs' fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface."[১]

এই বিভীষিকাময় প্রতিবেশও দেওয়ানীর কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় কর্ম-চারীদের অর্থ-লিপ্সাকে বিন্দুমাত্র নিরুদ্ধ করতে পারে নি:—

বাঙালি রেনেসাঁসের উৎস বৃটিশ-সংসর্গ নয়,

"In a year when thirtyfive percent of the whole population and fifty percent of cultivators perished, not five percent of the land-tax was remitted and ten percent was added to it for ensuing year."[২]

নির্বাধ অর্থ-লালসার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে সেকালের বাংলার প্রবাসী ইংরেজ সমাজের নৈতিক জীবনও পঙ্কিলতায় আবিল হয়েছিল; আর তা' কেবল সাধারণ পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এবং তাঁর প্রতিদ্বন্বী সহকর্মী স্যার ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ প্রকাশ্যভাবে দুর্নৈতিক জীবন যাপন করতেন। সমকালীন Hicky's Gazette-এ অনুরূপ অজস্র ঘটনার উল্লেখ আছে।[৩] এদেশে আসার পথে জাহাজের সহযাত্রী জনৈক জার্মাণ চিত্র-শিল্পীর পত্নীর সংগে প্রথমে হেস্-টিংস্এর গোপন প্রণয় এবং পরে বিবাহ-সম্পর্কের ব্যাপারও তৎকালীন বাংলার সহজে-নীতিহীন পরিবেশে নূতন কৌতূহলের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ফলকথা, নৈতিক দুরাচরণে আলোচ্য যুগের ব্রিটিশ ধুরন্ধর-সমাজ মোগল বাংলার তুলনায় অধিকতর কৃতিত্বেরই দাবি করতে পারেন।

অনেকের ধারণা, ব্রিটিশ-চরিত্রে ব্যক্তিগত দুরাচার যতই প্রবল হোক্, রাজনৈতিক সততা ও স্বদেশ-প্রীতি সর্বকালের ব্রিটিশ নাগরিকের সর্বজনীন চরিত্র সম্পদ; ফলে আলোচ্য যুগের ব্রিটিশ চরিত্র থেকেও বাঙালি এই অভূতপূর্ব জীবন-মূল্যবোধকে আয়ত্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু, এধারণাও

১। The Annals of Rural Bengal—by—W. W. Hunter
২। ঐ।
৩। Echoes from old Calcutta bv Busteed দ্রষ্টব্য।

যে কত মিথ্যা, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ইস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-পরিষদে গভর্ণর জেনারেল হেস্‌টিংস ও ফিলিপ্‌ ফ্রান্‌সিসের দলগত বিরোধ, স্বার্থপরতা ও নীচতার নির্লজ্জ প্রকাশ। এমনকি, ওয়ারেন হেস্‌টিংস্‌-এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অসূয়া চরিতার্থ করবার জন্য নন্দকুমারকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতেও ফ্রান্‌সিস ও তাঁর সমর্থকেরা কুণ্ঠিত হন্‌নি;—অথচ চরম মুহূর্তে অসহায় লোকটিকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষিপ্ত দেখেও চুপ করে থাক্‌তে বাঁধে নি তাঁদের। বস্তুতঃ, স্বজাতি-বিদ্বেষ ও অবিসন্ধিপরায়ণতা, নীতি ও সুবিচারের ছদ্মবেশে. ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাসকে জঘন্যতম নরহত্যার কলঙ্কে গ্লানিযুক্ত করেছে। নন্দকুমারের হত্যাঘটনা তারই প্রমাণ।

একটি মাত্র দিক থেকে আলোচ্য ব্রিটিশ কর্মচারিগণ সমকালীন বাঙালি-দের থেকে উৎকৃষ্ট ছিলেন,—সে হচ্ছে তাদের সাক্ষরতা-(literacy)র সম্পদ। যথার্থ ইংরেজি শিক্ষার সমুচিত রুচি-সূক্ষ্মতা বা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এদের অনেকেরই ছিল না—তবু, যে শিক্ষার সান্নিধ্যে এসে উনিশ শতকের বাঙালি নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল তা ইংরেজি; এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুতঃ. আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনার একমাত্র প্রতিপাদ্য ঐটুকুই।—ভারতীয় ব্রিটিশ ব্যক্তিত্বের সাহায্যে মোটেই নয়,—ইংরেজি জ্ঞান-জগৎ ও ভাব-জগতের ঘন-নিবিষ্ট চর্যার প্রভাবেই আধুনিক বাংলার রেনেসাঁসের মুক্তিপথ প্রথম আলোকিত হয়েছিল উনিশ শতকে। আর, সে পথের প্রথম আলোক-স্তম্ভ প্রথমতম ইংরেজি-পণ্ডিত-বাঙালি-মহাত্মা রাম-মোহন রায়;—মধুসূদন সেই আলো-উচ্ছ্বসিত জীবন-পথের শিল্পী-ভগীরথ। কিন্তু সে ইতিহাস রচিত হয়েছে আলোচ্যযুগের পরবর্তী ধাপে। সেকালে কারিৎকর্মা ভারতীয় বৃটিশ কর্মকর্তাগণ ছিলেন সচেতনভাবে বাঙালির সুশিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধীঃ—ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি জীবন-মূল্যবোধের স্পর্শে যেন বাঙালি না আসে,—এসম্বন্ধে তারা সব সময়েই ছিলেন সন্ত্রস্ত। তাদের ভয় ছিল, ইংরেজি শিক্ষা একবার আয়ত্ত করতে পারলে এ-দেশীয়দের সংগে আর কিছুতেই এঁটে ওঠা যাবে না। ভয় যে তাদের নিতান্ত অমূলক ছিল না, ইতিহাস তা প্রমাণ করছে। কিন্তু, এই দীর্ঘ আলোচনার শেষে এ-কথাও নিঃসংকোচে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতীচ্য-চেতনা-প্রবুদ্ধ আধুনিক বাংলার জাগরণে প্রথম যুগের ভারতীয় ব্রিটিশ সমাজের প্রত্যক্ষ দান কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ, ওয়েলেস্‌লির (১৭৯৮-১৮২৩ খৃীঃ) কর্তৃত্বকালের আগে ব্রিটিশ শাসনের কাছে ভারতবর্ষ,—বিশেষ করে বাঙালি কিছুই পায় নি, কেবল হারিয়েছে প্রচুর। ১৭৮৬ খৃীঃ কর্ণওয়ালিশের সমাগমে নানারকম পরি-বর্তনের সূত্রপাত হয় বটে. কিন্তু ১৭৯৩ খৃীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করার পরেই তিনি কর্মত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান। কর্ণওয়ালিশের শাসন-সময়ে সুফলই প্রথম অংকুরিত হতে সুরু করে

বাঙালি রেনেসাঁসের উৎস বৃটিশ-সংসর্গ নয়,

ওয়েলেস্‌লির শাসন কালে। সাহিত্যের ইতিহাসে সেই অংকুর-পরিচয় প্রথম চিহ্নিত হয়েছে ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। কিন্তু, তার আগে, পলাশি-উত্তর অর্ধ শতাব্দীকালে সদ্য-আলোচিত জীবন-ইতিহাসের মতই, সাহিত্য-ইতিহাসও ছিল শুষ্ক উষরতায় ভরপুর।

তবে, শুষ্কতা এবং শূণ্যতা এক কথা নয়। গ্রীষ্মের প্রখরতায় শুক্‌নো মাটির বুকে ফাটল ধরে, কিন্তু সে ত বর্ষার জলধারাকে পৃথিবীর গহ্বরে আমূল টেনে নেবারও প্রস্তুতি! আলোচ্য-কালের ইতিহাসেও সেই দীর্ণতার প্রস্তুতি চলেছিল গোপনে গোপনে, প্রধানতঃ সদ্য-আলোচিত ব্রিটিশ শাসন-শোষণেরই প্রভাবে। সমাজ-জীবনে এই প্রস্তুতির পরিচয় দুটি পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল,—(১) গ্রাম-বাংলা ও নগর বাংলার মধ্যে ক্রম-দৃষ্ট আমূল বিভেদ. ও বাংলার জীবন-কেন্দ্র রূপে নগর বাংলার পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা, এবং (২) ইংরেজ শাসন তথা ভারতীয় ইংরেজ জাতির প্রতি নাগরিক বাঙালির ক্রম-বর্ধিত আস্থা এবং বিশ্বাসের মনোভাব।

প্রতীচ্য জীবনসাধনা ও বাঙালির গোপন জীবনবেদনার রাসায়নিক সংযোগ

এ-পর্যন্ত ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে বোঝা গেছে, গ্রাম-বাংলা এবং নগর-বাংলার মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টি, তথা মধ্যযুগীয় গ্রামীন্ বাংলার জীবন-ধর্মের বিনষ্টি-সাধনের মূলে ছিল মোগল যুগ থেকে প্রবর্তিত নূতন অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির প্রলোভন। বস্তুতঃ ধন-লোভ ও যথেচ্ছ ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ গড়ে উঠেছিল বাংলার নগর-জীবনের বুনিয়াদ্,—ধনের লোভেই বাঙালি সেদিন গ্রামের ঘর ছেড়েছিল। প্রবল প্রতিযোগিতা, বিবেক-হীনতা এবং সর্বাত্মক অনিশ্চয়তার মধ্যে ধনোপার্জনও সহজসাধ্য ছিল না, এ পর্যন্ত আলোচিত ইতিহাসে তার প্রমাণ বিস্তর। কিন্তু প্রাণান্ত আয়াসে উপার্জিত অর্থও নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করবার উপায় মোগল-বাংলায় হিন্দু ধনবানদের একেবারেই ছিল না। কোন স্থানীয় হিন্দু ভূম্যধিকারী উল্লেখযোগ্য সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, এমন খবর জানামাত্রই মোগল শাসন-প্রতিনিধিরা সসৈন্যে লুণ্ঠন কর্মে প্রবৃত্ত হতেন। এই ভয়ে হিন্দু ধনবানেরা ধন উপার্জন করতেন ভয়ে ভয়ে, সঞ্চয় করতেন গোপনে, উপার্জিত সম্পদ ভোগও করতে পারতেন না,—এবং সেই ধন-সম্পদের কথা প্রকাশ করতে হতেন শঙ্কিত। তাই, বাংলার মাটিতে য়ুরোপীয় বণিক-নগরী প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই ওরা আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রসারের কামনায় পাড়ি দিতে আরম্ভ করেছিলেন ঐ সব অঞ্চলে। বাংলায় প্রথম য়ুরোপীয় বণিক-নগরী স্থাপিত হয়েছিল পর্তুগীজদের দ্বারা। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সমৃদ্ধ বাণিজ্যকুঠি গড়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাবধি। ভাগীরথী তীরে প্রথমে সপ্তগ্রাম (১৫৩৭-৩৮ খ্রীঃ)

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগ

এবং পরে হুগলীতে (আনুমানিক ১৫৮০ খৃীঃ) পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি গড়ে ওঠে।১ পরে আসে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের পরে গাঙ্গেয় বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্য কুঠিই একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল,—ওলন্দাজ এবং ফরাসী কুঠিগুলো তখন ক্রমশঃ হয়ে আসছিল নিষ্প্রভ স্বল্পায়তন। সেই সংগে রাষ্ট্রাধিকারেও কি করে বৃটিশ শক্তি ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, তারও পরিচয় পূর্বালোচনায় পেয়েছি। কূটবুদ্ধি ব্রিটিশ বণিকেরা বুঝেছিল, কি বাণিজ্যিক উন্নতি অথবা রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যাপারে দেশীয় ধুরন্ধরদের সহায়তা অপরিহার্য। ব্রিটিশ দেওয়ানীর আমলে,—এমন কি কর্ণওয়ালিশের নব-রাজস্ব-প্রথা প্রবর্তন-কালেও, মুর্শিদকুলির যুগ থেকে বংশপরম্পরায় প্রবর্ধিত রাজস্ব-কর্মীদের অতি-প্রাধান্য সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক ক্ষোভই প্রকাশ করেছেন।২ যাদের ওপর অনেক নির্ভর করতে হয়, তাদের যে কিছুটা ভাগও দিতে হয়, একথা বণিক ইংরেজ অনুভব করেছিল। তাই, স্বয়ং ক্লাইভ্ যখন অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থার্জন করেছেন, তখন তাঁর নিজস্ব দেওয়ান নবকৃষ্ণকেও যথোচিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন নি। বস্তুতঃ, ইংরেজ অধিকারের আওতায় এসেই বাঙালি হিন্দুরা অপ্রত্যাশিত পরিমাণ ধনোপার্জন করেছেন,—এবং নিঃসঙ্কোচে তা সম্ভোগও করতে পেরেছেন। আমাদের কালের দোল-দুর্গোৎসব, বার মাসে তের পার্বনের বর্তমান রূপ আসলে ব্রিটিশ আমলের বাঙালি সামন্ততান্ত্রিকতারই দান। পারিবারিক দুর্গোৎসবের সু-পরিচিত জৌলুসের ঐতিহ্য প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীতে,—ব্রিটিশ আমলে। এবিষয়ে প্রাচীন সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়েছে ঃ—"রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন, এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনাদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে তদৃষ্ট এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।"৩ ধনলোলুপ নাগরিক বাঙালির চিত্ত এই অর্থনৈতিক মুক্তি এবং স্বস্তির ফলে ইংরেজের প্রতি সহজেই শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল। এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ যে আত্মীয়তার আকার লাভ করেছিল, তারও প্রমাণ আছে। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থিকায় (১৮১৭ খৃীঃ হিন্দু কলেজ স্থাপনা-পূর্ব) 'সেকালে'র পরিচয় দিয়ে দুটি তথ্য পরিস্ফুট করেছেন।

(১) বিত্তবানদের বিত্তার্জনের নিঃশঙ্ক সুযোগের সংগে ছিল বংশানুক্রমিক সমুন্নতির প্রতিশ্রুতি। দেওয়ানীর মত লাভজনক পদাধিকারও সেদিন নাগরিক বাঙালির উত্তরাধিকারগত সম্পদ ছিল;—"কলিকাতার

১। History of Bengal Vol II. Ch. XIX.
২। Cambridge History of India Vol V.
৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড।

নিকটবর্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানের মাকড়ি ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গিয়েছিলেন। এতে ইংরেজদের প্রতি নাগরিক বাঙালির কৃতজ্ঞতাবোধ সহজেই বেড়েছিল।

(২) ইংরেজেরা তাদের এদেশীয় সহকারীদের প্রতি সামাজিক সৌজন্যের সম্পর্কও রক্ষা করে চলতেন, "সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে. শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটিতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতেন।" ফলে, আলোচ্য বাঙালি-সাধারণের কৃতার্থতা-বোধের শেষ ছিল না।

ও বাঙালির প্রতীচ্যাদর্শে 'বিশ্বাস'

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই বিশ্বাস এবং কৃতার্থতা-বোধই বাংলার নব--জীবন-সঞ্চারে প্রধান উপাদান রচনা করেছিল। সন্দেহ নেই, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় চিন্তা-জগতের সান্নিধ্যেই বাঙালি জীবনে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস সংঘটিত হতে পেরেছিল; কিন্তু বাঙালির যে মনোধর্ম য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তার মহৎ সম্পদকে ধারণ করেছিল এবং ধারণ করে সৃষ্ট করেছিল ঐ অভিনব রেনেসাঁসের, সেই মনোভূমি প্রস্তুত হয়েছে আলোচ্য যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিতে। মহাত্মা রামমোহন ব্যক্তিগত চর্যা ও কর্ষণের ফলে য়ুরোপীয় ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শনে মহৎ অধিকার অর্জন করেছিলেন। তাই. তিনি এদেশের জাতীয় উন্নতির জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে অগ্রণী হয়েছিলেন। এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কিন্তু, ইংরেজি বিদ্যায় নিরক্ষর-প্রায় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশের সন্তান ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল যখন দৃপ্ত বিশ্বাসের সংগে রামমোহন-সমকালে ঘোষণা করেন,—ইংরেজি শিক্ষা ব্যতীত ভারতবর্ষের অভ্যুদয়ের উপায় নেই,—এবং নিজের যথাসর্বস্ব বহির্বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিলিয়ে দেন. তখন বিস্মিত হতে হয়।১ আমাদের ধারণা, জয়নারায়ণের বিশ্বাস এবং আশা আলোচ্য ইতিহাস-ভূমিরই অপরিহার্য পরিণাম। এ যুগের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতিকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ—(১) মোগল শাসনাধিকার যুগ থেকে গ্রামীন্ বাংলার সংগে নাগরিক বাংলার ক্রমবিচ্ছেদ, (২) গ্রাম এবং নগরে বিচ্ছিন্ন বাংলার বিভেদ-সম্পূর্ণতা, (৩) গ্রাম-বাংলার মৃত্যুর সমসূত্রে আর্থিক অভ্যুদয়শীল নগর-বাংলার নিকট প্রাচীন জীবন-ঐতিহ্যের পূর্ণ বিলুপ্তি, (৪) গ্রাম-নগর-নির্বিশেষে সমকালীন বাংলার ভিন্ন পরিবেশ প্রভাবে নব-অভ্যুদিত নাগরিক সমাজের মনে বাঙালি ঐতিহ্যের প্রতি অনাস্থা,

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

১। জয়নারায়ণ ঘোষালের পত্র ঃ শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের সৌজন্যে দৃষ্ট।

(৫) ঐতিহ্য-বিচ্যুত এবং সুস্থির জীবন-মূল্যহীন নাগর-বাঙালির আত্ম-পরতা ও সর্ববিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাব, সবশেষে (৬) য়ুরোপীয় অর্থাসক্তি ও ভোগ-বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে য়ুরোপীয় জীবনধারার শ্রেয়-স্বরতায় ক্রম-বিশ্বাস।

এই সবকিছু মিলিয়েই ইতিহাসের গহ্বরে গড়ে উঠ্‌ছিল নব-যুগের অনাগত সম্ভাবনার প্রস্তুতি। এ-যুগের সার্থক শিল্প-সৃষ্টির প্রত্যাশা করাই অন্যায়। তবুও সাহিত্য কিছু রচিত হয়েছে, স্বতন্ত্র বিচারে যার মূল্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।—কিন্তু, ইতিহাসের প্রস্তুতির সার্থক সংকেত এরা বহন করে।—এ-ধরণের রচনাবলী দেশী এবং বিদেশী প্রবর্তনায় উদ্ভূত দু'টি ধারাঃ—(১) কবি সংগীত, (২) গদ্য-ভাষা গদ্য-গ্রন্থিকা।

কবিগান প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক নির্মিতির মর্যাদা দাবি করতে পারে না। কিন্তু, সমষ্টিপ্রধান জীবন-মূল্যকে অস্বীকার করে বাংলার রুচি এবং ভাবনা যেখানে প্রথম স্বাতন্ত্র্য-ধর্মী হতে আরম্ভ করেছে, ভাষা-সাহিত্যে তার সার্থক পরিচয় বহন করছে এই কবি সংগীত।

এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ভিত্তি রচনা

গদ্য রচনাও সাহিত্য হয়ে উঠ্‌বার অপেক্ষায় কাল গুন্‌ছিল বিদ্যাসাগর-প্রতিভার সমাগমের। কিন্তু ভাষা-গ্রন্থে গদ্যের ব্যবহার গদ্য-সাহিত্য-রচনার সম্ভাবনাকে এই পর্যায়েই সুনিশ্চিত স্বীকৃতি জানিয়েছিল। তা ছাড়া, বলা হয়ে থাকে, ভাষায় পদ্য রচিত হয় ভাবাবেগের প্রাবল্যে; প্রয়োজনের তাড়না এবং বিচার-সাম্যের ফলেই নাকি সূচিত হয় গদ্য। বর্তমান আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে আধুনিকতার মৌল-লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক বিচার-সম (Rational) দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের তিরোভাবোত্তর কালে ১৮০০ খৃীঃ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর বৈষয়িক জীবন-পরিবেশ বাঙালির মনোভাবে বিচার-সমতা ও ভাবাতিশয্য-নির্মুক্তির সৃষ্টি-সহায়ক হয়েছিল এই অর্থেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসে আধুনিকতার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কবিসংগীত

কবি-সংগীতের জন্ম-লগ্নটিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পরিচালিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ,—"ইংরেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল

সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি. এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়েকজনের ছিল। তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্ সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত,—তাহারা সাহিত্য-রস চাহিত না।"১ এই পরিচিতির মধ্যে কবি-সংগীতের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অর্থবহ ইঙ্গিত রয়েছেঃ—(১) কবি-সংগীত জন্ম-সূত্রে রাজধানীর সম্পদ—নূতন নগরে সদ্য-উদ্ভূত বণিক্-ব্যক্তিত্বের আমোদ-উত্তেজনার উপায় হিসেবেই এই কবিতাবলীর উদ্ভব। (২) প্রাচীন গ্রামীন্ জীবন-ধারার ঐতিহ্য ও সামগ্রিক মূল্যবোধের প্রভাব এদের মধ্যে তিলমাত্র নেই;—ব্যক্তির মুহূর্তের ইচ্ছার অনুবর্তী ছিল এই ধরণের সাহিত্য।

কবিগানের জন্মসূত্র

ইতিহাসের তথ্যাদিও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। শ্রেষ্ঠ কবি-ওয়ালা-দের অনেকেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেকালের নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দেওয়ান-প্রধান বা ধনবান্। বিখ্যাত হরুঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি কবি-ওয়ালা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন স্বয়ং ক্লাইভ্-এর দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণের রাজ-সভায়;—তাঁরই ইচ্ছায় এবং পৃষ্ঠ-পোষণে। অন্যান্য 'কবিয়াল'দের সংগেও অনুরূপ তথ্য যুক্ত রয়েছে। এদিক থেকে আধুনিক সাহিত্যের প্রাথমিক মৌল লক্ষণগুলির অন্ততঃ দুটি, নিকৃষ্ট আকারে হলেও, কবি সংগীতের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছেঃ—(১) সাহিত্যের নগর-মুখিতা এবং (২) সমষ্টি-বোধের ঐতিহ্য-বিযুক্ত ব্যক্তি-সাপেক্ষতা। আধুনিক গীতিকবিতা-লক্ষণের অত্যন্ত দুর্বল ও অস্পষ্ট হলেও প্রথম পদক্ষেপ এখানেই।

সাধারণ লক্ষণ

কবি সংগীতের সুচিহ্নিত পরিচায়ন সময়োচিত অনুসন্ধানের অভাবে আজ দুঃসাধ্য। শ্রীসজনীকান্ত দাস অল্প কথায় এই শ্রেণীর রচনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন,—"কবি-গানের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বাংলা দেশে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জা, পাঁচালী. খেউড়, আখ্ড়াই, হাফ্ আখড়াই, ফুল আখ্ড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ. কীর্তন, টপ্পা. কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীতি, প্রভৃতি নানা বিচিত্র-নামা বস্তুর সংমিশ্রণে 'কবিগান' জন্মলাভ করে। 'কবি' অর্থে এখানে অশিক্ষিতপটু স্বভাব-কবি,—তাঁহাদের রচনা ও সংগীত বিভিন্ন নামে পরিচিত কবিগানের বিভিন্ন শাখা। শেষ পর্যন্ত ইহা বিতণ্ডামূলক

সাধারণ সংজ্ঞা ও
বিভিন্ন বিভাগ

১। লোকসাহিত্য।

সংগীত-সংগ্রামে পর্যবসিত হয়, এবং তর্জা, হাফ আখড়াই, পাঁচালী নামে সমধিক প্রচলিত হয়। নিধুবাবুর টপ্পা, দাশরথির পাঁচালী, গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি কবিগানের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রচলিত রূপ।১"

উদ্ধৃত সংজ্ঞায় কবিগানের উপাদান হিসাবে যে সকল গীত-কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, বিস্তৃত আলোচনায় তাঁদের প্রত্যেকেরই উদ্ভব ও বিকাশগত স্বকীয়তার পরিচয় স্পষ্ট হতে পারবে। ডাঃ সুকুমার সেন এ-বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনাও করেছেন।২ তবু, শ্রীসজনীকান্তের পরিচায়নে এই শ্রেণীর কবিতাবলীর একটি সাধারণ লক্ষণ পরিস্ফুট হতে পেরেছে। কবিগানের উদ্ভব-পরিবেশটি যেমন বাংলার সমাজ-জীবনের অসুস্থতার দ্বারা চিহ্নিত,—তেমনি এদের সৃজন-উৎসও অ-কর্ষিত-চিত্ততার স্থূলতায় আচ্ছন্ন; —'অশিক্ষিত-পটু' কবিগণই প্রধানতঃ এর স্রষ্টা। 'হঠাৎ-রাজা'র মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্ট কবি-সংগীত, হঠাৎ-কবিদেরই সাময়িক কীর্তি। তাই, এদের সুগঠিত কাব্য নামে অভিহিত করা চলে না,—সাধারণভাবে এই শ্রেণীর সকল রচনাই কবিগান নামে পরিচিত। আর, রচয়িতাদের কেউই 'কবি' নন,—সকলেই "কবি-ওয়ালা"।

কবিগানের উৎপত্তি-ইতিহাস আলোচনা করে ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন,

—"The existence of Kabi-songs may be traced to the beginning of the 18th Century or even beyond it to the 17th; but the flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830."৩

এটুকু ইতিহাসের তথ্য। এছাড়া, অনুমানের সাহায্যে কবিগানের উৎস সন্ধান করা হয়েছে সুপ্রাচীন কৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও। কিন্তু, যে-কোনো রকমে কোনো একটি রচনার আদিমতার সম্ভাবনা প্রতিপন্ন করতে পারলেই তার ঐতিহাসিক লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। কৃষ্ণ-কীর্তনে যাত্রার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়,—এটুকু কেবল অনুমান নয়। মহাপ্রভু দানখণ্ডাদির অভিনয় করেছিলেন,—এ-বিষয়ে প্রমাণ আছে। তাছাড়া, বাংলার গীতি-কবিতারও স্পষ্ট আদিরূপ রয়েছে এই আদিম কাব্যে। অতএব, কবিগানের পূর্ব-সম্ভাবনা কৃষ্ণকীর্তনে আভাসিত হয়েছিল,—এমন অনুমানে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আদিম সৃজন-কলার একটি বৈশিষ্ট,—এর রূপ-কন্ধের মধ্যে বিমিশ্রতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। আদিম মহাকাব্যে (Authentic Epic) অন্যান্যের মধ্যে উপাখ্যান ও নাট্যগুণের পূর্ব-সম্ভাবনা বিমিশ্র হয়েছিল। কিন্তু, তাই বলে, এই দুই শ্রেণীর রূপ-রচনাকে সমসূত্র-জ

১। বাংলার কবিগান—সাহিত্য-গ্রন্থিকা প্রবন্ধমালা (১)।
২। দ্রষ্টব্য—বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখণ্ড (২য় সং)।
৩। 19th Century Bengali Literature.

বলে দাবি করলে সাহিত্যের ইতিহাসে কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, সাহিত্যে ভাব এবং রূপ দুই-ই কালের হাতের রচনা। দুই পৃথক জীবন-পরিবেশ নাটক ও উপাখ্যান সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে,—পৃথক্-স্বতন্ত্র দেহ-ও প্রাণের আধারে। সেখানে এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য আস্বাদনে মহাকাব্যের পূর্ব-ভূমিকা কেবল প্রাসাঙ্গিক মাত্র। এদের স্বতন্ত্র দেহ ও প্রাণের রূপ-সন্ধানে বিশেষ দেশ-কালের জীবন-চেতনারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হয়।

কবিগানের প্রসঙ্গেও একই কথা। কৃষ্ণকীর্তন ছাড়া, এই সব সংগীতের পূর্বসূরী হিসেবে ঝুমুর, কৃষ্ণধামালি ইত্যাদির-ও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু, মনে রাখ্‌তে হবে, কবিগান যে-কাল ও যে জীবন-ভূমির ফসল, তাতে এই সব পূর্বগত শিল্পরূপকে কবিগানের বীজ বা অঙ্কুর হিসেবে দাবি করা চলে না। এই শ্রেণীর গানে বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়গত রূপানুসরণের এক বিপর্যস্ত রূপ। কিন্তু, আলোচ্য অধ্যায়েই দেখ্‌ব, বৈষ্ণব-ভাব-চিন্তার সংগে কবিগানের কোনো যোগই নেই। কেবল কীর্তন পালার পুরাপ্রসঙ্গকে পূর্ব সংস্কার মাত্র হিসেবে গ্রহণ করে রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে কবিওয়ালারা নূতন কথা বলেছেন নূতন ভঙ্গিতে। বাচ্য-বিষয়ের সেই স্থূলতা হয়ত আদিমতাধর্মী কৃষ্ণধামালী বা ঝুমুরের সংগেও সাদৃশ্য-যুক্ত। কিন্তু, কবিগান স্বভাবতঃ কৃষ্ণধামালি বা ঝুমুরের স্বজাতি নয়,—যেমন সমজাতীয় নয় বৈষ্ণব পদাবলী বা শক্তি সংগীতের। অথচ, 'সখিসংবাদ'-এর মত 'সপ্তমী গান'-ও কবিগানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ, কবিওয়ালাদের চেতনায় পূর্ব ঐতিহ্যের বিমিশ্রতা ছিল। তাতে, ঝুমুর, ধামালির মত বৈষ্ণবপদ বা শক্তি-সংগীতের-ও ছায়াপাত ঘটেছে।* কিন্তু, সব কিছুকে নিয়েও কবিগান আপন স্বরূপে স্ব-তন্ত্র। আর, এই স্বাতন্ত্র্যের উৎস এই শ্রেণীর রচনা অ-পূর্ব জন্ম ভিত্তি। সন্দেহ নেই, আনুমানিক পূর্বরূপের কথা ছেড়ে দিলেও, কবিগানের ঐতিহাসিক পরিচয় অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালে আভাসিত হয়েছিল। কিন্তু, ঐটুকুও আসলে কবিগানের অঙ্কুর। যে-রূপে ও প্রকৃতিতে আজ কবিগান আমাদের হাতে এসে পোঁচেছে, তা বাংলার জাগ্রৎমান নগর-জীবন-ভূমির ফসল। বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথের ভাষার সেই জীবন-পটভূমির পরিচয় দিয়েছি। এর দ্বারা কবিগানের মূল-ভূমিতে প্রাচীন গ্রাম্য সাহিত্যের পূর্ব-সংস্কারের দাবি অস্বীকৃত হয় না। অজ্ঞাত, অ-সম্ভাবিতকে জন্মদান ইতিহাসের কাজ নয়; জীবনের মূলগত অস্ফুটতাকে অনুকূল পরিবেশে স্ফুটবিকশিত পূর্ণ-প্রাণ-রূপ দেওয়াই তার ধর্ম। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাগরিক বাংলার জীবন-ভূমিতে বসে ইতিহাসে কবিগানের বিশেষ প্রাণরূপকে পূর্ণাঙ্গ করে রচনা করেছে। এই শ্রেণীর গানের দেহে-মনে সেই জীবন-পরিচয়-ই সম্পূর্ণ বিকশিত।

ডাঃ সুকুমার সেন কবি-গানের পৃথক্ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেছেন ঃ—"কবিগানের বিশেষত্ব হইতেছে দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এক দল যে বিষয়ের গান ("চাপান") গাহিবে, সে গান হইলে অপর দল তাহার উত্তর গান ("উতোর") গাহিবে।"১ ডঃ সেন এই প্রসঙ্গে প্রাচীনতম "কবি গানের যে নমুনা"র উল্লেখ করেছেন,—তাতে 'গুরুদেবের গীত' (অর্থাৎ বন্দনা), সখী সংবাদ, বিরহ ও খেউড়—এই চারিটি বিভাগ আছে।২ "কবির আসরে বিষয় বিচিত্রতা প্রথতঃ ভবানী বিষয়, পরে সখীসংবাদ, তারপর বিরহ এবং সর্বশেষে লহর ও খেউড় গাইবার নিয়ম।"৩ বস্তুতঃ, সখী সংবাদ, বিরহ ও খণ্ডিতা বিষয়ক কবি-গানের সংখ্যাই সর্বাধিক;—খেউড় রুচির অপকর্ষে এবং সংখ্যার আধিক্যে স্বয়ং-স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। উদ্ধৃত বিষয়-পঞ্জীর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কবি-ওয়ালারা কাব্য-উপাদানের সঞ্চয়ে ছিলেন পুরাতনের পুচ্ছানুসারী। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচলিত প্রেম-কথার ঐতিহ্য এক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান সহায়ক হয়ে ছিল। বস্তুতঃ, এছাড়া উপায়ও আর কিছু ছিল না। নূতন যুগের প্রাণ-প্রবাহ তখনো সচেতন জাগৃতি লাভ করে নি, তার কণ্ঠে জাগেনি সমুচিত নবীন ভাষা। অবচেতনার জগতে চলেছে শুধু বিশৃঙ্খল আক্ষিপ্ততা,—কণ্ঠস্বরে যেন প্রতিফলিত হয়েছে সেই আচমকা পরিবর্তন। আগে বলেছি, আবার বলি কবিওয়ালার সখীসংবাদ ও বিরহাদি বৈষ্ণব-প্রণয়কথা নয়,—রাধা-কাহিনীর পুরাগত জীবন-মূল্যবোধের সূত্রটুকুকে উপলক্ষ্য মাত্র করে ব্যক্তি-চিত্তবিনোদনের এক অভিনব-প্রচেষ্টা! দৃষ্টান্ত হিসেবে বিখ্যাত কবিওয়ালা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ওরফে হরুঠাকুরের একটি সখী-সংবাদের পদ উদ্ধার করি।

কবিগানের যুগোচিত স্বাতন্ত্র্য-পার্থক্য

মহড়া

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে,
তবে কি হবে স্বজনি।
লম্পট স্বভাব তার জানি।
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়,
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী ॥

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সং)।
২। ঐ।
৩। "গীতাবালী" (নিধুবাবুর গীতসংকলন) এর বিজ্ঞাপন।

চিতেন।

ছিলো যে সঙ্কেত হরি আসিবে নিশ্চয়।
বিলম্ব দেখে তার হতেছে সংশয়।
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার।
গাঁথিলাম সখি গলে দিব কার।
যদ্যপি বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমণি ॥

অন্তরা

কৃষ্ণপ্রাণা আমি, আমার অনন্য গতি।
বলে কি জানাব তোমায়, তুমি কি জান না দূতি ॥

চিতেন

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ।
শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ।
আসারো আশয়ে এতক্ষণ।
রয়েছি করিয়ে পথ নিরীক্ষণ।
মাধব না এসে যদি, এসে দিনমণি ॥

মহড়া

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকন
কাল বরণ।
শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও।
এ অধীনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও ॥

চিতেন

নির্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন।
তাহাতে নাহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ,
ও বংশীরো গুণ কত বিশেষে শুনাও ॥

অন্তরা।

শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥

চিতেন।

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ।
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী.
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥”

বৈষ্ণব কবিতার সংগে এই কবিগানের পার্থক্য কেবল আকৃতিগত নয়, প্রকৃতিগতও। বাচন-ভঙ্গির সুকর্ষির সূক্ষ্মতা ও শালীনতা এবং বৈষ্ণব দার্শনিক ভাবাধিবাসনের অনুপস্থিতি ছাড়াও কবিওয়ালার এই গানে তীব্র-গভীর উপলব্ধিরও অভাব আছে। প্রাচীনতর ভাব-সংস্কারের কেন্দ্র-সূত্রে এ যেন নূতন পল্লব-গ্রাহিতার সংযোজন ঘটেছে।

গীতি-রীতির মধ্যেও সু-কল্পিত নবীন পর্যায়-বিভাগ লক্ষ্য করি। এ-ধরণের রচনার মধ্যে ছান্দসিক কারু-নৈপুন্য প্রত্যাশা করা চলে না। কারণ, (১) কবিওয়ালা-দের শিক্ষা ও কৃষ্টির সম্পন্নতা ছিল না, তাছাড়া (২) আলোচ্য কবি গানের অধিকাংশই প্রস্তুতি-হীন রচনা। সদ্য-নির্বাচিত বিষয়ে 'চাপান' বা সেই 'চাপান'-এর 'উতোর' প্রসঙ্গে কবি-ওয়ালারা মুখে মুখে গান রচনা করে আসরে গাইতেন। তাহলেও, ভাব ও বচন-বিন্যাসের শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে হয়ত গীতিকবিতার স্তবক-বিভাগের মত কবি-গানেরও পর্যায়-বিভাগ করা হ'ত। সবগুলো পর্যায়ের বিভাগ, সব কবি-গানেই থাক্‌ত,—এমন কথা বলা চলে না। তবে, সাধারণ ভাবে পূর্ণাঙ্গ কবিগানের পালায় ১০টি পর্যন্ত পর্যায় বিভাগ লক্ষ্য করা যায়ঃ—চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেল্‌তা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় মহড়া, অন্তরা। এই পর্যায়-বিভাগকে আশ্রয় করে কবিগানে অন্ত্যমিল রচনারও এক ধরণের সংস্কারাগত পদ্ধতি (Conventional System) গড়ে উঠেছিল।[১] এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে,—'কবিগান'কে কবিতার ছন্দ-মিলের কানুন মত নিয়মে বাঁধা চলে না। আগাগোড়াই মনে রাখতে হয়,—এই রচনা-সমষ্টি ছিল মূলতঃ গান;—গানের আকারেই এ-গুলি রচিত হয়েছিল। সংগীত-নিরপেক্ষ কাব্যস্বাদুতার সম্ভাবনা এই শ্রেণীর রচয়িতারা প্রত্যাশা করতে পারতেন না, পাঠকদেরও তা করা উচিত নয়। তাই, উদ্ধৃত বিভাগ-সমষ্টিকে গীত-ভাবের পর্যায়-বিন্যাস রূপেই গ্রহণ করা উচিত।

তাছাড়া, এ-কথাও স্মরণ করব যে, কবিগান, ছিল মূলতঃ বাঙ্‌নির্ভর রচনা,—লিপি-নির্ভর শিল্প-কৃতির সংগে এদের সহজ পার্থক্য আছে। এই বাঙ্-নির্ভরতার জন্যই কবিগানকে প্রধানতঃ ধ্বনি-ঝঙ্কারের প্রতি

১। দ্রষ্টব্য গীতাবলী বিজ্ঞাপন।

অবহিত হতে হয়েছে,—তাছাড়া, ভাবের পল্লব-গ্রাহিতাকে আচ্ছন্ন করবার জন্যেও ধ্বনি-চমৎকারিত্বের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের রচনাতেও দেখি পল্লব-সঞ্চরমান ভাবধারাকে সমুজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে ধ্বনি এবং অর্থ-চাতুর্যপূর্ণ প্রকাশের সমৃদ্ধিতে। কিন্তু ভারত-চন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য আর কবিওয়ালার বাগ্‌ঝঙ্কার এক শ্রেণীর নয়।* এদিক থেকে কবিওয়ালাদের নিছক রায়গুণাকর-কবির অক্ষম অনুকারী মনে করলে তাঁদের প্রতি অবিচার হবে। ভারতচন্দ্রের কবিতার জন্ম-উৎস ছিল লিপি-মুখ। আর, কবি-ওয়ালার বাণীকর ছিল বাগ্‌যন্ত্র,—বাণীকার শিল্পীর প্রত্যুৎপন্নমতি। এই পার্থক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে, তবেই শব্দালংকারের আতিশয্য-বহুল এই রচনা-ভঙ্গির মূলগত শিল্পপদ্ধতি (Art system) কে অনুভব এবং আস্বাদন করা সম্ভব। এই বাঙ্‌নির্ভর প্রকরণের প্রভাবে পূর্বকথিত "চিতেন-পরচিতেনাদি" ভাব-বিন্যাসের সংগে ধ্বনি-পারম্পর্য আপনা থেকে সহজ-সংবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কবিগানের রচনাঙ্গিক ও ভারতচন্দ্র

অতএব, কবি-ওয়ালাদের শিল্প-কৃতিত্বকেও প্রত্যুৎপন্নমতি বাক্-শিল্পীর গীত-কৃত্য হিসেবে বিচার করা উচিত। আর, এই বিচারে 'অশিক্ষিত-পটু' 'কবিয়াল'দের কীর্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ভাবের ঐকান্তিকতা না হলেও, স্থানে স্থানে তাঁদের প্রকাশ-ভঙ্গির নিভৃত স্বকীয়তা আধুনিক চিত্তকেও দোলা দেয়।

কবিগানের শিল্প-কর্মের মৌল-স্বভাব

"জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখ গো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে স্থির নির্ণয় করিতে।
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি,
নির্মল যমুনা জলেতে॥"

রামবসু-লেখা এই কবিতাংশ, অথবা প্রথমে উদ্ধৃত হরুঠাকুরের পদটি কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে, "সহস্র লোকের মধ্যে চারি জোড়া ঢোল ও ৪ খানি কাঁশির গগন-স্পর্শী গোলযোগে প্রতিপক্ষের ভয় রাখিয়া অল্প সময়ের মধ্যে"[১] রচিত হয়েছিল,—একথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। বিশেষ করে, বাগ্-বিন্যাসের স্বকীয় উপাদানটি যে এই রচনাকে শিল্পীর আত্ম-সাপেক্ষ (subjective) রূপ-সুষমা দান করেছে, তার বিভব স্বীকার না করে উপায় নেই।

কবি-সংগীতের সর্ব-নিরপেক্ষ স্বকীয়তার এই ঐতিহ্য এবার স্বীকার করে কবি-ওয়ালাদের ইতিহাসের কাঠামো সন্ধান করা যেতে পারে। এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন 'গুপ্তকবি' ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর পরে

১। গুপ্ত রত্নোদ্ধার; অবতরণিকা

নূতন তথ্য আর কিছুই সংগৃহীত হয়নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বর গুপ্ত যে প্রাচীনতম কবি-ওয়ালার পরিচয় দিয়েছেন,—তিনি গোঁজলা গুঁই। গুপ্তকবি সংবাদপ্রভাকরের ১২৬১ বাং—১লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এ'র সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—"১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল, গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন।" এই তথ্য ঠিক হলে গোঁজলা গুঁই অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রথমেই 'কবির' আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গুপ্তকবি গোঁজলা গুঁই-এর একটি মাত্র পদ আবিষ্কার করেছিলেন।

গোঁজলা গুঁই
'কবিয়াল'-পরিচয়

"এসো এসো চাঁদ বদনি।
এ রসে নীরস করো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ।
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতন মণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥"

এই পদ কেবল অতি প্রাচীন একটি কবিগানই নয়, কবিওয়ালাদের রচনা বৈশিষ্টেরও এক সার্থক নিদর্শন ও পরে ধৃত হরুঠাকুর বা রাম-বসুর রচনাংশের মত কোনো রকমের শিল্প-চমৎকারিতা এই পদে অনুপস্থিত। কিন্তু, সাধারণ কবিওয়ালা-সমুচিত অনুপ্রাস-কণ্টকিত, গদ্যায়ত বাগ্‌ভঙ্গি; প্রাচীন পৌরাণিক জ্ঞানৈতিহ্যের সুলভ, অগভীর চর্যা; ও প্রকাশের অকর্ষিত মুন্সিয়ানা; সব কিছু মিলিয়ে কবিতাটি একটি অকৃত্রিম 'কবিগান'। কবিগান 'অশিক্ষিত-পটু' কবিয়ালদের রচনা। কিন্তু শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও এই সকল রচয়িতাদের সহজ 'পটুতা'কে গতানুগতিক সংস্কারগত পন্থায় পরিশোধিত করার চেষ্টা হত। ফলে, কবিগান রচনা ক্রমশঃ গুরু-গম্য বিদ্যার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কবিওয়ালারা পুচ্ছ-গ্রাহী ছিলেন তাঁদের কাব্য-বিষয়ের চয়নে; আর সেই সংগ্রহকে অজস্র-অপর্যাপ্ত করে তোলার জন্যেই প্রাচীন পুরাণ ও ধর্ম-কথাকে এ'দের যথা-সম্ভব আয়ত্ত করতে হত। বলাবাহুল্য, এই জ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে সংগৃহীত হত না। সামাজিক ঐতিহ্যের সংগে অভিজ্ঞ-তর গুরুর সহায়-তাই ছিল এ-পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। তাছাড়া, গীত-বাঁধার কৌশল-সংকেতাদিও শিক্ষা করা যেত গুরু-সান্নিধ্যে। এদিক থেকে কবিওয়ালারা সম্প্রদায়-বদ্ধ শিল্পীগোষ্ঠীর (School artists) মতই প্রবর্ধিত হয়েছিলেন।

অন্ততঃ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ 'কবিওয়ালার' পরিচয় গুরু পরম্পরানুসারে সজ্জিত করা চলে ঃ—

গোঁজ্‌লা গুঁই
- লালুনন্দ লাল
  - নিতাই বৈরাগী
    - রামানন্দ নন্দী
- রামজি
  - (ভবানী বেনে)
    - রামবসু
- রঘু
  - হরুঠাকুর
    - নীলুরামপ্রসাদ
    - ভোলাময়রা
  - রাসু ও নৃসিংহ
- কেষ্টামুচি

উদ্ধৃত কবিওয়ালা-গোষ্ঠির প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা যায় না; যতটুকু জানা যায়, তা-ও বর্তমান প্রসঙ্গে আগাগোড়া উল্লেখ্য নয়। তা'ছাড়া এই গোষ্ঠি-বন্ধনের বাইরেও প্রতিষ্ঠাবান কবিওয়ালা রয়েছেন। তাহলেও, সাহিত্য-বৃত্তিও যে শিক্ষনীয় বিষয়, এই তথ্যের একটি প্রাচীন স্বীকৃতি হিসেবেই ওপরের তালিকায় ঐতিহাসিক সার্থকতা।

গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্যদের কারো সম্পর্কেই নির্ভরযোগ্য তথ্য সুলভ নয়; প্রতিভাবান্ শিষ্যদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির মধ্যে এঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রধানতঃ বিধৃত হয়ে আছে। লালুনন্দলালের নামে প্রচলিত একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে। কবিগানের আসরে পদটির উৎকর্ষ উপেক্ষণীয় নয়।

শিষ্য-গৌরবে কিন্তু গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্যত্রয়ের মধ্যে রঘুনাথ সর্ব-শ্রেষ্ঠ। রাসু ও নৃসিংহ নামে দুইটি ভাই ও হরুঠাকুর রঘুনাথকে গুরু হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। রাসু ও নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় সম্মিলিত-ভাবে একটি দল পরিচালনা করেছিলেন এবং তাঁদের মিলিত ভণিতায় একাধিক কবিগান পাওয়া গেছে। "কিন্তু উভয় ভ্রাতাই কবি ছিলেন কিনা,

রাসু ও নৃসিংহ

অথবা কোন্‌টি কবি ও কোন্‌টি সুরজ্ঞ ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না।"১ ফরাসী চন্দন-নগরের নিকটে গোঁদলপাড়ায় কায়স্থ পরিবারে এঁদের জন্ম হয়। পিতার নাম অনাদিনাথ রায়। রাসুর জন্ম হয় ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, নৃসিংহের জন্ম সন ১৭৩৮। সামান্য লেখাপড়া শেখার পর দু-ভাই মিশনারীদের বাংলা স্কুলে প্রেরিত হন; কিন্তু বিদ্যানুরাগের অভাবে দু-জনেই স্কুল ছেড়ে বাড়ি আসেন। এই সময়ে এঁদের পিতৃ-বিয়োগ হয়। রঘুনাথ দাসের

১। গুপ্ত রত্নোদ্ধার।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছুকাল এঁরা কবির গান-বাঁধার শিক্ষানবিশী করেন। পরে নিজেরা পৃথক দল গড়ে তোলেন। ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন রাসু-নৃসিংহের পৃষ্ঠপোষক; কবিওয়ালা এই দুই সহোদরের কৃতিত্বে ও দেওয়ানের সহৃদয় সমর্থনে ফরাসী চন্দননগরে একটি স্থায়ী কবিগানের আসর গড়ে উঠেছিল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাসুর দেহান্ত ঘটে, নৃসিংহ হয়ত তার পরেও বছর কয়েক জীবিত ছিলেন।

রাসু-নৃসিংহের সম্বন্ধে 'গুপ্ত-কবি' সংবাদ-প্রভাকরে লিখেছিলেন, "ইঁহাদের বিরচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন।......ইঁহারা সখিসংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট। অতিশয় শ্রুতি-সুখকর ও সর্ব বিষয়েই যশোযোগ্য।" গুপ্ত কবির উক্তির সমর্থনে রাসু-নৃসিংহের 'বিরহ'-এর পদ একটি উদ্ধার করছি।

"মহড়া।

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি প্রয়াগে, মুড়াব মাথা॥

চিতেন।

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো, প্রেম বারতা।
কাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে;
ইহারো লাগিয়ে এসেছি হেথা॥

অন্তরা।

হায়! কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারত ভূমে॥

চিতেন।

কোন্ প্রেমে হরি, বোধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবীলতা॥"

রাসু-নৃসিংহের চেয়েও রঘুনাথ-শিষ্য হরুঠাকুর অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুতঃ, গোটা কবিগানের ইতিহাসে হরুঠাকুর ও রাম বসু ছিলেন দুটি নামময় ঐতিহ্য। আগে বলেছি, হরুঠাকুর ব্রাহ্মণ-বংশ সম্ভূত। তাঁর সম্পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি। কলকাতার সিমলা পল্লীতে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগ ছিল না;—ফলে তাঁর সারস্বত সাধনাও পাঠশালার সীমায় বাঁধা পড়েছিল। এগারো বছর বয়সে পিতৃহীন কবি সখের দল গড়ে তোলেন। রাজা নবকৃষ্ণের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পৃষ্ঠপোষণে সেই সখের দলই হরুঠাকুরের পেশাদারি দলে পরিণত হয়। নবকৃষ্ণের দেহান্তের পরে কবি আবার তাঁর দল ভেঙে দেন। প্রথম গান বাঁধতে আরম্ভ করে হরুঠাকুর রঘুনাথ তন্তুবায়কে দিয়ে নিজের লেখা সংশোধন করিয়ে নিতেন। তাই, স্বরচিত অনেক গীতের শেষে গুরুর ভণিতা যোগ করেছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

হরু ঠাকুর

হরুঠাকুরের রচনায় কবিগানের বিশেষ শিল্প-ভঙ্গি যে মূর্তি-রূপ গ্রহণ করেছিল, ওপরে তার আলোচনা করেছি। কিন্তু, ধ্বনি-ঝঙ্কৃত প্রকাশ-স্বকীয়তা ছাড়াও, কবিগানের অপর একটি নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য,—চটক্‌দারিতাও হরুঠাকুরে কম ছিল না। হরুঠাকুর কবির গানই বাঁধতেন না, লড়াইও করতেন। আর, সেখানে তাঁর রূপ ছিল প্রমত্ত। রুচি এবং ভাষা-প্রয়োগে অশালীনতার যে অভিযোগ কবিগানের বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে আছে, হরুঠাকুর সর্বথা তার থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর চটক্‌-বিভোরতার একটি সামান্য পরিচয় দিচ্ছি :—

"আজ্‌ বাঁধবো তোমায় বনমালি।
করিয়ে সখীমণ্ডলী।
নাগরালি তোমার যত, কোর্‌ব হত,
দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গোরসের অবশেষ দিব মস্তকে ঢালি ॥"

ভালো এবং মন্দ মিশিয়ে হরুঠাকুর ছিলেন বাংলার পূর্ণাবয়ব "কবিয়াল।"

'কেষ্টা মুচি'

হরুঠাকুরের 'লড়াই'-এর একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার, বিখ্যাত কেষ্টামুচি। বয়সে তিনি ছিলেন বর্ষীয়ান্‌; কিন্তু এই বিগত-যৌবন কৃতী কবিওয়ালার কাছে হরুঠাকুর একাধিকবার পরাজয় বরণ করেছিলেন। কেষ্টামুচির একটি মাত্র পদাংশ পাওয়া গেছে; তার প্রথমাংশ :—

"হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে।
হইয়ে ভূপতি, কুব্জা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে ॥"

নিতাই বৈরাগী

নিতাই বৈরাগীর সম্পূর্ণ নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, পিতার নাম কুঞ্জদাস বৈরাগী; জন্মস্থান চুঁচুড়ার দক্ষিণে চন্দননগর, জন্ম সন ১৭৫১ খৃঃ। ইনিও সখিসংবাদ ও বিরহের গান লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কবি দেহত্যাগ করেন।

রাম বসু

ভবানী বেনেকে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর শিষ্য রামবসুর প্রতিভা। বস্তুতঃ এই পর্যায়ের অন্যান্য সকল কবিওয়ালাই রামবসুর উজ্জ্বলতায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পরপারে শালিখা গ্রামে, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে রামমোহন বসুর জন্ম হয় ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম রামলোচন বসু। বাল্যশিক্ষা শেষে বার বছর বয়সে রামবসু জোড়াসাঁকোয় পিসীর বাড়িতে আসেন এবং সেখানে ইংরেজি লেখা-পড়া শিখে কেরাণীর কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু, পাঁচ বছর বয়স থেকে নাকি রামবসু সরস্বতী-কৃপা-পুষ্ট হয়েছিলেন; তাই চাকরীর ভার তাঁর জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চাকুরী ছেড়ে তিনি কবিগান রচনায় বৃত হন। প্রথমে বিভিন্ন কবিওয়ালার ফরমায়েস অনুযায়ী পদ-রচনা করে দিতেন, পরে নিজেই বিখ্যাত কবিদল গঠন করেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামবসুর মৃত্যু হয়; কিন্তু এই স্বল্প-স্থায়ী জীবন-সীমায় কবিওয়ালা হিসেবে রামবসু অক্ষয় কীর্তি অর্জন করে গেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত রামবসু সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে লিখেছিলেন,—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রামবসু।"

রামবসু কবি-স্বভাব ও 'আধুনিকতা'

কেবল রচনা-গুণের উৎকর্ষে নয়, বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যেও রামবসু ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। "রামবসু ভবাণী বিষয়, সখিসংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর, সপ্তমী,১ শ্যামা-বিষয়ের রণবর্ণনা ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদয় গান উত্তম করিতেন।"২ [পূর্বের পর্যায়ে] রামবসুর ভবাণী-বিষয়ক রচনার নিদর্শন উদ্ধার করেছি শাক্ত সংগীতের আলোচনা উপলক্ষ্যে। সখি-সংবাদেরও একটি পদাংশ ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এবার বিরহের একটি

১। সপ্তমী—আগমনী বিষয়ক গান।
২। ঈশ্বর গুপ্ত; সংবাদ প্রভাকর।

পদ তুলে রামবসুর যথার্থ বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ পরিস্ফুট করতে চাইব।—

"মহড়া।
দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেয়ো না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বোলে ধোরে রাখ্‌বো না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেলো।
সদা রাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনি পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুখ দিও না॥
চিতেন।
দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধু বদন।
পীরিত ভেঙেছে ভেঙেছে তার লজ্জা কি।
এমন ত প্রেম ভাঙা ভাঙি, অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না॥"

পদটির স্বরে নয়, সুরেও যে স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয়েছে, তা লক্ষ্য করবার মত। পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করেছি, কবিগানের বাচন-ভঙ্গিমায় স্বয়ং-স্বকীয়তার আভাস থাকলেও, কাব্য-বিষয়ে কবিওয়ালারা ছিলেন অতীতের পুচ্ছানুসারী। বুভুক্ষা-দীর্ণ যুগের ভোগ-বাসনাকে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য ও পুরাণ-কথার আবরণে আচ্ছন্ন ও আবৃত করেছেন এঁরা। আর সে আচ্ছাদন একান্ত দুর্বল ও তরল বলেই এই শ্রেণীর রচনায় অনুভবনীয় গম্ভীরতা আরোপিত হতে পারে নি। রামবসু সাহসভরে এই তরল আবরণটিকে অপসারিত করেছিলেন। ফলে, রূপ-মিলন-বুভুক্ষু অনাবৃত মানুষটিই আত্মপ্রকাশ করেছে কুণ্ঠা-বিমুক্ত আলোকে। ওপরের কবিতায় এম্‌নি একটি প্রেম-রিক্তা নারীর পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে; প্রেম ভাঙা-গড়ার অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিতে যে নিছক মানবী মাত্র। রামবসুর রচনাকে মানবতা-ধর্মী বলতে পারি না। তবু কবিগানের আসরে বিশুদ্ধ মানব-গন্ধিতার অবতারণা যে তিনি করেছিলেন এ কথা মান্‌তেই হবে। উৎকৃষ্ট কবিওয়ালা বলে ত বটেই, তা ছাড়া এই বিশেষ স্বকীয়তার জন্যেও তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্য-স্মরণীয়। বিশুদ্ধ মানবিকতাময় আধুনিক জীবন-বোধের প্রথম আত্ম-বিস্মৃত পদক্ষেপ অনুরূপ সাহিত্য-কৃতির মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে কি না,—একথাও ভেবে দেখবার মত সন্দেহ নেই, অশিক্ষিত-পটু কবিওয়ালাদের পক্ষে নূতন যুগচেতনার অবধারণ অসম্ভব ছিল। আর, রামবসুর সকল সফলতাও কবিগানের স্বভাব-

সীমাকে অতিক্রম করতে পারেনি। কবিগান যুগের স্রষ্টা নয়,—কিন্তু যুগ-প্রভাবের সৃষ্টি। আর এই গ্রন্থের প্রাথমিক আলোচনাকে লক্ষ্য করেছি। বিনষ্ট যুগের আক্ষেপ রামপ্রসাদের কাল যুগ-শিল্পীদের অবচেতনায় ক্রম-ব্যঞ্জিত, ক্রমাভিব্যক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল। রামবসুর উদ্ধৃত কবিতায় যুগের পদক্ষেপ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ভাষায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। কেবল এইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। পরিণাম বোধহীন বিনষ্ট যুগের অন্ধতার এই কৃতিত্ব-ও ইতিহাসের বিশেষ অবধান দাবি করে।

কবিগানের আসরে লড়ায়ের সুর-ও প্রথম জাগিয়েছিলেন রামবসু। তাঁর আগে দুই প্রতিপক্ষ কবিয়াল আগে থেকে গানের বিষয় ঠিক্ করে কবিতা বেঁধে আন্‌তেন। আসরে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে চাপান ও উতোর রচনা করে তৎক্ষণাৎ গাইবার রীতি প্রবর্তন করেন রামবসু।

ডঃ সুশীল দে রামবসুর মধ্যেই কবিগানের অভ্যুদয়, সমাপ্তি ও বিনষ্টির সূচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বস্তুতঃ রামবসুর সংগেই কবিগানের ইতিহাসের সমাপ্তি। কিন্তু, শিষ্যপরম্পরায় আগত কবিওয়ালাদের বাইরেও এমন দু-এক জন শিল্পী ছিলেন, যাঁদের আলোচনা ছাড়া কবিগানের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। এঁদের মধ্যে কেষ্টা মুচির কথা বলেছি। এবারে বল্‌ব এণ্টুনি ফিরিঙ্গি। এণ্টুনি'র পিতৃবংশ ছিলেন পর্তুগীজ। মা ছিলেন এদেশীয়। এই সম্মিলন এণ্টুনির ব্যক্তিত্বে আদর্শ সমন্বয়ের এক প্রশংসনীয় মানস প্রসার সৃষ্টি করেছিল। রামবসুর সংগে লড়াই-এ এণ্টুনি-ব্যক্তিত্বের এই বিশিষ্টতা সার্থক প্রকাশ পেয়েছে।

রামবসু—"বল হে এণ্টুনি আমি একটি কথা জান্‌তে চাই।
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।"
এণ্টুনি—"এই বাংলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাক্‌রে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি-টুপি ছেড়েছি।"

রামবসু সেবারে লড়াই করেছিলেন ঠাকুর সিংহের দলের পক্ষ থেকে। এই কারণেই এণ্টুনির কটুক্তির ভাজন হয়েছেন ঠাকুর সিংহ। রামবসু আর একবার বলেছিলেন ঃ—

"সাহেব্ মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রি সাহেব শুন্‌তে পেলে গালে দেবে চুণকালি।"

এণ্টুনি এই আক্রমণের জবাব দিয়েছিলেন শান্তকণ্ঠে ঃ—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ-ও কথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
এই দ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম হবে সফল যদি রাঙা চরণ পাই ॥"

কালিকা বিষয়ক একটি গানেও এই উদার প্রসন্ন চিত্তের অনুরক্তিই পরিস্ফুট হয়েছে।

আগে বলেছি রাম বসুর সংগে সংগেই কবিগানের উৎকর্ষ ক্রমশঃ রাহুগ্রস্ত হয়েছিল। এই সময়ে লঘুতর চালের দেহলোলুপ নতুন 'কবিয়াল'-কর্ম সূচিত হয়েছিল টপ্পার আসরে। নিধুবাবু এই হাল্কা সুরের গানে প্রাণের আভাস জাগিয়ে তুলেছিলেন।

আর আখড়াই ছিল আসলে টপ্পার পূর্বসূরী। "বাংলা এগার শতাব্দীর কিছু পূর্বে শান্তিপুরে কতিপয় ভদ্রলোক আখ্‌ড়াই সুর উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা টপ্পার কতকগুলি আদি রসাত্মক গান গাহিতেন ও ছড়া কাটাইতেন।"১ পরে রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কুলুইচন্দ্র সেন 'আখ্‌ড়াই' গানকে স্বয়ং-স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আখ্‌ড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর নেই, দু'পক্ষের মধ্যে যে-দলের গান, বাজনা ও সুর ভাল হত, সেই দলই হত জয়ী।

আখ্‌ড়াই

পরে আখ্‌ড়াই ভেঙে হাফ্ আখ্‌ড়াই হয়। 'হাফ্ আখ্‌ড়াইয়ে' কবি-সংগ্রামের মতই উত্তর প্রত্যুত্তর আছে। 'চিতেন পরিচিতেনাদি বিভাগও হাফ্ আখ্‌ড়াইয়ে কবি-গানেরই অনুরূপ।' কেবল 'ফুকা'র পরে হাফ্ আখ্‌ড়াইয়ে একটি 'ডবল্-ফুকা' থাকে, আর সব শেষের 'অন্তরা' হাফ্ আখ্‌ড়াইয়ে অনুপস্থিত। প্রাচীন আখ্‌ড়াইকেই 'ফুল আখ্‌ড়াই বলা হয়ে থাকে।

হাফ্ আখ্‌ড়াই

টপ্পা-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য পরিণত হয় রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবু) হাতে। রামনিধি ছিলেন আখ্‌ড়াই-প্রখ্যাত কুলুইচন্দ্র সেনের নিকট-আত্মীয়। তাছাড়া, নিজে তিনি সুরজ্ঞ ও সুর-রসিকও ছিলেন। ১১৪৮ বাংলা সনে রামনিধি গুপ্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ গুপ্ত। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস শেষ করে রামনিধি কিছুকাল কলকাতায় কোন পাদ্রীর কাছে অর্থকরী বিদ্যার্জন করেন। দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে তিনি চাকুরী নিয়ে ছাপ্‌রা গিয়েছিলেন এবং সেখানে হিন্দী গানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ঐখানেই ছিল রামনিধির টপ্পা-রচনার উৎস। ৯৭ বছর বয়সে ১২৪৫ বঙ্গীয় সনে রামনিধির মৃত্যু হয়।

নিধুবাবু

"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতেই রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ, অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা।... এ দেশীয় অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার যে আদি-রস বিষয়ক গানকেই টপ্পা বলে, কিন্তু সেটি ভ্রম; গানের এক পৃথক

ও টপ্পা

১। গীতাবলী (রামনিধি গুপ্তের গীতি সংকলন)।

রীতির নাম টপ্পা।"[১] টপ্পা সম্বন্ধীয় এই ভ্রমাত্মক মনোভাব রচনার জন্য দায়ী বাংলা দেশের আলোচ্য কালীন টপ্পা-গীতি সমূহ। নিতান্ত দেহ-লোলুপ আদি-রস-সর্বস্বতাই এককালে টপ্পা-গীতির একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। নিধুবাবুও এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নন। কিন্তু, নিধুবাবুর রচনায় সক্ষম হস্তের পরিচয়ও দুর্লভ নয়; ফলে নিছক দেহ-ধর্মের আকুতিও কাব্য-গন্ধিতার আভাস রচনা করে থাকে ঃ—

"শুন শুন শুনরে প্রাণ,
অধীনী জনেরে নিদয় হইও না।
বিরহ যন্ত্রণা, বুঝি তুমি জান না॥
জানিলে জ্বালাতনে জ্বালাইতে না।
কবিতা বণিতা লতা, বুঝে দেখ না;
নিরাশ্রয়ে কদাচিত শোভা থাকে না॥"

নিধুবাবুর কল্পনার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যটুকুও এখানে লক্ষ্য করবার মত। ঢিলে ঢালা চটুল ভঙ্গিমায় যে জীবন-ধারা তখন চলেছিল,—নিধুবাবু তারই স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-মনের গভীরে অনাগত কালের অস্পষ্ট ছায়াসম্পাৎ ঘটেছিল। সেই ভাব-কল্পনাধর্মেরই অপরিণত প্রকাশ "কবিতা-বণিতা-লতার" স্পর্শকাতর কামনীয় অনুভূতিতে। নিধুবাবুর ভাব-কল্পনার এই অস্ফুট স্পর্শ-কাতরতাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত করেছিল,

"নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা
পূরে কি আশা?"

—নিধুবাবুর এই অস্ফুট-চেতন জিজ্ঞাসা ও আকুতি পরের যুগে পূর্ণ মূর্তি পেয়েছে ঈশ্বরগুপ্তের "মাতৃভাষা"র মত কবিতায়। কিন্তু সে মূর্তিও অস্বচ্ছ; শিল্পী-চিত্তের ভাব-স্বরূপ তখনো দুর্বল। তাই, ঈশ্বরগুপ্তের রূপকল্পে অত কথার ছটা। মধুসূদনে যে ভাব-চেতনা পূর্ণাবয়ব, গুপ্ত-কবিতে যার প্রথম রূপমুক্তি,—নিধুবাবুর হাতে তারই প্রথম অঙ্কুর-সংকেত ঃ—কিন্তু সে 'টপ্পার' লঘু সুরে। অনাগত যুগের ছায়ামূর্তি বুদ্বুদের মত বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যে ঝল্‌সে উঠ্‌তে গিয়ে টপ্পাকারের হাতে বুদ্বুদের মতই নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে।

ফলকথা, বাচন-ভঙ্গি, সরসতা ও রচনা-দক্ষতায় টপ্পা-সাহিত্যের ইতিহাসে নিধুবাবু অ-দ্বিতীয়।

পাঁচালী, ঢপকীর্তন ও কৃষ্ণযাত্রাকেও কবিসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। একই বিশেষ সমাজ-পরিবেশে, একই 'আসর জমিয়ে তোলা'র উদ্দেশ্যে, একই রকম অশিক্ষিত-পটু কবিদের রচনা,—এই অর্থেই আলোচ্য বিষয়-সমষ্টি কবিগানের অন্তর্ভূত।

১। ঐ

প্রাচীন পাঁচালী গানে গায়কের পায়ে নূপুর ও হাতে চামর-মন্দিরা থাক্‌ত। পরবর্তীকালে কীর্তনাশ্রয়ী পাঁচালী গান প্রবর্তিত হয়। এই ধরণের পাঁচালীরই এক বিশেষ রূপ ঢপ-কীর্তন। কীর্তনের মতই এদের পালা বিভক্ত এবং কথা ও সুরের সমন্বয়ে গোটা কাহিনী অনেকটাই নাট্যাকারে উপস্থাপিত হত।

ঢপ্‌কীর্তন ও মধুকান

'মধুকান' ছিলেন ঢপ কীর্তনের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তয়িতা। যশোর জেলার উলুশিয়া গ্রামবাসী ছিলেন মধুসূদন কিন্নর ওরফে মধুকান; তাঁর জীবৎকাল ছিল ১২২০ থেকে ১২৭৫ বাংলা সাল। মধুকানের রচনায় অনুপ্রাস-উচ্ছ্বসিত ধ্বনি-চমৎকারিত্বই লক্ষিত হয় সমধিক, সেই সংগে আছে চাতুর্যময় বাগ্‌-বিভূতি। অক্রূর সংবাদ পালায় মথুরা-পথযাত্রী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার উক্তির একটি অংশঃ—

"ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই।
মরিতে হবে তবে আর কেন যাতনা পাই॥
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ, তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ, ত্যাজি অঙ্গ দেখ তাই॥
আজ আমাদের শুভ যাত্রা, দেখলাম তোমার রথযাত্রা,
আমরা করি গঙ্গা যাত্রা, বঁধু ফিরে দেখ তাই॥
কেন রব কৃতাঞ্জলি, করে যাও হে অন্তর্জলি
সূদন বলে কেন জ্বলি, এখনই জ্বালা ঘুচাই॥

পরবর্তীকালের পাঁচালী-রচয়িতা ও যাত্রা-রচয়িতারা মধুকানের রচনা-ভঙ্গির দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ, দাশু রায়ের পাঁচালীর বাচন-বৈদগ্ধ্য ও শব্দ-চাতুর্য মধুকানের চরনা-ভঙ্গিরই পরিণততর রূপ। দাশরথি রায় বর্ধমান জেলার বাঁদমুড়ী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন; পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। দাশরথির জীবৎকাল ১৮০৬-১৮৫৭ খৃঃ। বহিরঙ্গ বিচারে আমাদের বর্তমান আলোচ্য কালের সীমা-শেষে দাশরথির অভ্যুদয়।

দাশু রায়ের পাঁচালী

কিন্তু শিল্পী দাশরথি ছিলেন কবি-ওয়ালাদের মানস-বৈভবের সার্থকতম উত্তরাধিকারী। দাশরথির সমকালীন বাংলাদেশে সমাজ-বিপ্লবের ধারা নাগরিক বাঙালির জীবন-ভূমিতে ক্রমপ্রসৃত হয়ে চলেছে। রামমোহন-যুগের শেষে, সেদিনকার বাংলায় বিদ্যাসাগর-যুগ-মহিমা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের বাংলায় জীবন ধারণের সৌভাগ্য নিয়ে দাশরথি সেই যুগ-প্রদীপ্তকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অশিক্ষিত-পটু কবি-মানসের দুর্বল জীবনবোধ সেই বিপ্লব-শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারে নি,—করতে পারে নি তার যথার্থ মূল্যাবধারণ। তাই, যে নব-বিক্ষুব্ধ জীবনী-শক্তির প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস মধুসূদনের নারী-কল্পনাকে মহিমান্বিত করেছে;—সমগ্র বঙ্কিম-উপন্যাস-কলাকে নিয়ত সঞ্জীবিত করেছে নবীন জীবন-

রসের রসদে,—দাশরথির স্তিমিত চেতনায় তা কেবল শ্রদ্ধা-বিমিশ্র কৌতুকের কৌতূহলই রচনা করে ফিরেছেঃ—

“বিধবা-বিবাহ কথা
কলির প্রধান কলিকাতা
        নগরে উঠেছে অতি রব
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ
ক্রমে দেখ্ছি বলবান্
        হবার কথা হয়ে উঠছে সব।
ক্ষীরপাই নগরে ধাম
ধন্য ধন্য গুণধাম
        ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক
তিনি কর্তা বাঙালির
তাতে আবার কোম্পানীর
        হিন্দু কালেজের অধ্যাপক।
বিবাহ দিতে ত্বরায়
হাকিমের হয়েছে রায়
        আগে কেউ টের পায়নি সেটা
তারা করতে অর্ডর
যেতে কারে অর্ডর
        চটিকে বুদ্ধি আটিকে রাখিবে কেটা।

একদা সর্ব-জন-বন্দিত দাশরথি-প্রতিভার ঐতিহ্য অস্বীকার করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কেবল এই সত্যটিই পরিস্ফুট করতে চাই,—উনিশ শতকের সমাজ-বিপ্লবের উদ্ভব ও বিকাশ-কালে জাত ও জীবিত হলেও দাশরথির মানস-প্রসার অতীতাভিমুখী;—তাই, উনিশ শতকের বাঙালি হয়েও কবি হিসেবে তিনি অষ্টাদশ শতকীয় কবি-ওয়ালা-ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরসূরী। দাশরথির রচনায় আদি রসাত্মক চটকের বদলে, প্রধান স্থান অধিকার করেছিল ভক্তি রসাত্মক বিষয়াদি,—ভোগোল্লাসের পরিবর্তে শ্রদ্ধা-বিনম্র-চিত্ততার অনুশীলনই দাশরথির রচনায় সমধিক। কিন্তু, বিষয় যাই থাক্, রচনার বাক্সর্বস্বতা জনিত ধ্বনি-স্পন্দন,—শব্দ এবং সুর-ঝংকারই ছিল দাশরথির কলা-কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই হিসেবে পাঁচালীকার দাশু রায়ও আসলে বাংলার কবি নন, ‘কবিয়াল’।

‘যাত্রা’-সাহিত্য পাঁচালীরই পরিণততর রূপ কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। পাঁচালীতে একই গায়েন বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা একই গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করত,—যাত্রায় ভূমিকানুযায়ী পাত্র-পাত্রীর বিভিন্নতা স্বীকৃত

হল;—কিন্তু এখানেও অভিনয় বা সংলাপের মাধ্যম ছিল সংগীত। ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও উৎসব।......তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীতি। তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীর নাটগীতি।"[১] যাত্রার একমাত্র বিষয় প্রথমে কৃষ্ণলীলা ছিল বলেই তার নাম ছিল কৃষ্ণযাত্রা। পরে নানাবিষয়ক যাত্রার অবতারণা করা হয়;—ক্রমশঃ বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক যাত্রাই সংখ্যাধিক্য লাভ করে।

যাত্রা এবং গোপাল উড়ে

বিদ্যাসুন্দর যাত্রাকে অবলম্বন করে কলকাতায় প্রথম সখের যাত্রা দলের প্রবর্তন করেন বহুবাজারের রাধামোহন সরকার। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতেই এই যাত্রাদলও তাদের প্রথম অভিনয় করেন। গোপাল উড়ে এখানেই যাত্রা-দলের অভিনয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রথমাবধিই অজস্র খ্যাতি-ভাজন হন। কলকাতায় কলা ফেরি করতে এসে প্রায় রূপকথার মত এই উড়িয়া বালকের ভাগ্য ফিরে যায়। রাধামোহন সরকারের অকাল মৃত্যুর পরে গোপাল উড়ে দলের সমস্ত আসবাব-সম্পদ লাভ করেন এবং নিজে পৃথক দল রচনা করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

গোপাল উড়ে কটক জাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি জাতিতে করণ—তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুন্দ। গোপাল সুদর্শন ও অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য কবি ছিলেন না।—তাঁর যাত্রাদলের গান-লিখিয়ে ছিলেন,—রাম অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী প্রভৃতি বিখ্যাত যাত্রালেখকগণ।[২]

কবি-সংগীতের আলোচনা এখানেই শেষ করব। পূর্বানুসৃতি হিসেবে আবার স্মরণ করি, এই আলোচনায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয় সম্বন্ধে পুংখানু-পুংখ তথ্য নিঃশেষিত হয় নি। বস্তুতঃ, তথ্য আবিষ্কার নয়, আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে সাহিত্য-ইতিহাসের ভাব-মূর্তিটিকে আয়ত্ত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ কবি-সংগীতের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি নির্দেশ করে বলেছেন,—"বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় পরমায়ু অতিশয় অল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়,—এই কবিগানও সেইরূপ একসময়ে স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও

কবিগানের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ডঃ সুকুমার সেন।
২। 'যাত্রা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে একাদশ অধ্যায়ে।

তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।"[১]

উদ্ধৃত মূল্যায়নের তাৎপর্য এই নয় যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগান এক নিষ্ফল জীবন-সাধনার ঐতিহ্যাবহ মাত্র, গোধূলি-লগ্নের যথার্থ সম্পদের মত কবিওয়ালাদের বিষয়-দৃষ্টি অতীতের অন্ধকারে প্রোথিত হলেও, এঁদের অবচেতনা নিজেদের অজ্ঞাতে ছিল আলোক-উৎসাভিমুখী। আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে দৃঢ়-সংস্থিত স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব-মহিমাকে অবধারণ করবার শিক্ষা, বোধ অথবা ক্ষমতা কিছুই এঁদের ছিল না। কিন্তু, অনাগত আলোকের অদৃশ্য রশ্মি-সম্পাৎ এঁদের অন্ধকার হৃদয়কে অলক্ষ্যে স্পর্শ করেছিল। তারই ফলে, নিরন্ধ্র রুচি-হীনতা, এবং নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে প্রকাশ-স্বকীয়তার যে নিভৃত পরিচয় মাঝে মাঝে স্বত-অভিব্যক্ত হয়েছে, —যে-কোন কালের সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় হতে পারে না। নবতর সৃষ্টির প্রভাবে কবিগান আজ তৎকালিক মর্যাদা-বিচ্যুত হয়েছে, কিন্তু হারুঠাকুর, রামবসু, দাশরথির মত কবিওয়ালার সাধন-ঐতিহ্য সর্বকালিক স্বীকৃতির আসনে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। তাই, কবিগান আজ আর বাংলা সাহিত্যের প্রত্ন-জিজ্ঞাসার নির্জীব উপাদান মাত্র নয়, ইতিহাসের সজীব সামগ্রী।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের আদি কথা

বর্তমান আলোচনার সূচনায় বলেছি, বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গদ্য-ভাষার লিখিত রূপ প্রবর্তনের ফলে। পদ্য আবেগ-অভিব্যক্তির ভাষা,—গদ্যের আটপৌরে রূপের মধ্য দিয়ে সহজে প্রকাশ পায় মানুষের আবেগ-মুক্ত জীবনের স্বাভাবিক পরিচয়টি। আধুনিক সাহিত্য মানুষের এই নিরাবরণ সহজ-সাধারণ পরিচয়কেই খুঁজে ফেরে;—এ-মানুষ নিছক আবেগ-সর্বস্ব নয়, চিন্তা-ভাবনা-সমৃদ্ধ (Rational) চৈতন্যময় সত্তা। মানুষের এই Rational চৈতন্যটিকে গদ্য অনায়াসে প্রকাশ করে থাকে;— তাই, আধুনিক মনোভাবই প্রয়োজনের তাড়নায় বাংলা গদ্যের রস-সম্ভাবনাকে অবারিত করেছিল। এ তথ্য ইতিহাস-সমর্থিত।

'আধুনিকতার ভিত্তি'

১। লোকসাহিত্য।

সব ভাষাতেই পদ্য-সাহিত্যের পরে গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে,—এ-কথা সর্ব-জন-বিদিত। তাই বলে, এমন সন্দেহ কেউই প্রকাশ করেন না যে, মানুষের আদিম ব্যবহারিক ভাষা গদ্য ছাড়া আর কিছু ছিল। দৈনন্দিন ব্যবহারের আটপৌরে ভাষা ছিল বলেই হয়ত, ভাব-কল্পনা বিকাশের বাহন হিসেবে পদ্যের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য হয়েছিল;—ব্যবহারের ভাষাকে সজ্জিত করে, তবেই মনের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর, ভাষার ছন্দ-অলংকারগত এই সজ্জাই তাকে পদ্য-রূপ দিয়েছে। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে চর্যার পদ্যে। সেই দশম শতকের বাঙালি নিত্যদিনের প্রয়োজনে যে গদ্যের ব্যবহার করত, আজ আর তার পরিচয় পাবার উপায় নেই। বস্তুতঃ, ষোড়শ শতাব্দীর আগেকার বাংলা গদ্যের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন আমাদের হাতে এ-পর্যন্ত পেঁছায় নি। তা ছাড়া, এ-বিষয়ে বাঙালির নিজস্ব প্রয়াসের পরিচয় যা কিছু পাওয়া গেছে, তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এর থেকে কোনো কালে গদ্য-সাহিত্যের রূপ-মুক্তি ঘটতে পারত, এ কথা আজ কল্পনা করা চলে না। বাংলা-সাহিত্যে আধুনিকতার ইতিহাসে য়ুরোপের প্রথম প্রত্যক্ষ দান,—গদ্য-রচনার প্রবর্তনা। সার্থক গদ্য-সাহিত্য-রচনাকে এঁরা প্রত্যক্ষতঃ প্রভাবিত করতে পারেন নি,—বিদেশীর পক্ষে তা পারা সম্ভবও নয়। কিন্তু যে মৌল প্রয়োজনকে আশ্রয় করে বাঙালির মধ্যে গদ্য-রচনার অবাধ প্রেরণা দেখা দিয়েছিল,—য়ুরোপীয়েরাই সে প্রয়োজন-বোধের স্রষ্টা। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে গদ্য-রচনার উপযোগী পরিবেশই কেবল সৃষ্টি করেন নি তাঁরা;—নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে আদর্শ গদ্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস এই ঐতিহাসিক পটভূমির ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—"সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্‌রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলাদেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহারই ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙালির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।"১

ও বাংলা গদ্য

কিন্তু, ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে,—তার 'পরে নির্ভর করে বাংলা গদ্য সম্বন্ধীয় অনুমানকে অন্ততঃ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত টেনে তোলা চলে। বৈষ্ণবদাসের 'কবি-বন্দনা'য় উল্লিখিত হয়েছে,—

"জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভূবনে অনুপম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত।"

১। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড।

বিদ্যাপতিও যে "রসময় চম্পূ" রচনা করেছিলেন, তার উল্লেখ আছে গোবিন্দ দাসের স্বীকৃতিতে। 'চম্পূ' অর্থও "গদ্য পদ্যময় গীত।"

বাংলা গদ্যের পূর্বসূত্র

বিদ্যাপতি-কৃত চম্পূ কোন্ ভাষায় রচিত হয়েছিল এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার অবকাশ আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা যে অমিশ্র বাংলা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি" নামে 'সহজিয়া' গ্রন্থ কোন্ চণ্ডীদাসের রচনা, সে-বিষয়ে সংশয় আছে। আলোচ্য গ্রন্থের

'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি'

পুঁথিগুলোর কোনোটিই সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগের লেখা নয়। তাছাড়া, এ-রচনা আদিম চণ্ডীদাসের বলে স্বীকার করতে বৈষ্ণবেরা রাজি নন। গ্রন্থের ভাষাও যে অর্বাচীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ঃ—

"চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগলাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি। লাড়ির নাম সুধা !!"

সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য নরোত্তমের নামেও আর একটি সহজিয়া গ্রন্থ চলে আসছে,—গ্রন্থটির

'দেহকড়চা'

নাম 'দেহ-কড়চা'। নরোত্তমের অনুরূপ গ্রন্থ-কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা নিম্নরূপ ঃ—

"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথো আপ্ত জিজ্ঞাসা। তুমি কে! আমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জিব॥ থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপ হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল একযোগে ভাণ্ড হৈল॥"

শূন্য পুরাণের ভাঙা-পয়ার জাতীয় অসংবদ্ধ পদ্যে বাংলা গদ্যের সম্ভাবনা স্থানে স্থানে কেমন সুচিহ্নিত হয়েছে, তার

শূন্য পুরাণ

আলোচনা করেছেন ডঃ সুশীলকুমার দে।১—

"কোন মাসে কোন রাশি। চৈত্র মাসে মীন রাশি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হাথ পাতি লহ সেবকর পুষ্পপাণি। সেবক হব সুখি।"

ডঃ সুশীলকুমার আলোচ্য ভাষার প্রাচীনতা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে লেখা শূন্য পুরাণের কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নি। মূল শূন্য-পুরাণ-কাহিনীর প্রাচীনতা অনস্বীকার্য হলেও, সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা পুঁথির ভাষাকে বিনা বিচারে অত প্রাচীনতার মর্যাদা দেওয়া অনুচিত।

১। 19th Century Bengali Literature.

এই সব সংশয়-কণ্টকিত রচনা ছাড়া শ্রীরূপ গোস্বামীর গদ্যে লেখা 'কারিকা'র সন্ধান দিয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।১ ভাষা নিম্নরূপঃ—

শ্রীরূপের 'কারিকা'

"প্রথম শ্রীকৃষ্ণগুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ ও স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।"

ষোড়শ শতাব্দীর আসামের সমাজ-নায়ক ও অসমীয়া বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তয়িতা শঙ্করদেবের দুটি "নাট"-রচনায় গদ্য লেখার সন্ধান দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন—কিন্তু সে গদ্যের ভাষা হয় সংস্কৃত, নয় ব্রজবুলি।২

এ-সব ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো বহু বৈষ্ণব ও সহজিয়া নিবন্ধ গ্রন্থ রচিত হয়। সেই সংগে স্মৃতি, ন্যায় ও চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক একাধিক বাংলা গদ্য-গ্রন্থও রচিত হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নানাবিষয়ক গদ্যনিবন্ধ

বাঙালির লেখা সন-তারিখ-যুক্ত যে সকল প্রাচীন গদ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, তার প্রায় সব কটিই হয় চিঠি, নয় দলিল-দস্তাবেজ। এ বিষয়ে প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রটি ১৪৭৭ শক (১৫৫৫ খৃীঃ)-এ কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ লিখেছিলেন আহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে। সেকালের বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবে পত্রটি মূল্যবান্‌ঃ—

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বর্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা উদ্যোগত আছি। তোমারো এগোট কর্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লিখিম।"

চিঠিপত্রে প্রাচীনতম বাংলা গদ্য

পত্রটির রচনাকাল সম্বন্ধীয় ধারণা প্রামাণ্য বিবেচিত হলে, ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবহারিক বাংলা যে অনেকটাই সুগঠিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। উত্তর বঙ্গের কথ্য বাচন-ভঙ্গির প্রভাব লেখাটিতে সুস্পষ্ট; এবং তা থাকাই একান্ত সম্ভব। সে যুগে গদ্যের কোন লিখ্য রূপাদর্শ ছিল না,—তার জন্যে কোনো প্রয়োজন-বোধও ছিল না। তখনকার লিখিত ভাষা ছিল মুখের কথারই দূর-বাহক। তবে, আলোচ্য পত্রের শব্দ-ব্যবহারে সংস্কৃতানুসারিতার সুস্পষ্ট প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করবার মত।

সপ্তদশ শতকের বাংলা গদ্যের সর্বাধিক প্রামাণ্য নিদর্শন সরবরাহ করেছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা

১। বাঙলা সাহিত্য।
২। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড— ২য় সং।

কাগজপত্র থেকে ১১০৩ বাংলা সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের একখানি দলিলের ফটোগ্রাফ্ নিয়ে এসে তিনি প্রকাশ করেন। দলিলটি একটি চুক্তিপত্র এবং তার ভাষা নিম্নরূপ ঃ—

সপ্তদশ শতকের গদ্যে লেখা দলিল

"শ্রীকৃষ্ণ। সাথি শ্রীধর্ম
শ্রীযুক্ত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহদাস আগে আমরা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বার সুনারগায় ও গর খ রিকরি সকরাত ২ দ্বই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান।"

ডঃ সুনীতিকুমার অষ্টাদশ শতকে রচিত বাংলা গদ্যের একাধিক নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে অনুলিপি করে এনেছেন; "মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্রে"র ভাষা এবিষয়ে কৌতূহলাবহ ঃ—"মোং ভোজপুর শ্রীযুক্ত ভোজ রাজা তাহার কন্যা নাম স্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা বড় যুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ণ পর্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ণ হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রূপ-লাবণ্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন যুন্দরী সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী।"

বিক্রমাদিত্য চরিত্র

আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্য ভাষার ঐতিহাসিক প্রবণতা পরিস্ফুট করবার জন্য আর দুটি পত্রাংশের উদ্ধার করব,—দুটিই অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে খুব কম সময়ের ব্যবধানে রচিত হয়েছিল। প্রথম পত্রটি ১১৮৭ সালের ২৯শে পৌষ মহারাজ নন্দকুমার লিখেছিলেন পুত্র গুরুদাসকে ঃ—

"প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ ঃ—
তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরন্তু '২৫ তারিখের ২৭ রোজ' রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত কেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পহুঁছেন নাই, পহুঁছিলেই জানা যাইবেক শ্রীযুক্ত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।"

রাজা নন্দকুমারের চিঠি

দ্বিতীয় পত্রটির লেখক জগতধির রায়, লিপিকাল ১১৮৫ বাংলা সালের ১১ই শ্রাবণ ঃ

"৭ শ্রীরাম—
গরিব নেওয়াজ শেলামত—
আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়া শীকিশ্তি

হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পরশ্‌তী চাক্‌লে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুছিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হরদারকে হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ

চিঠিতে দরবারি ভাষা

ফিদবি—

জগতধির রায়।"

ওপরের রচনাংশ কয়টির মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা প্রথম পত্রে বাক্যরীতি (Syntax) অনেকটা সুপরিবদ্ধ; শব্দ-সমষ্টি প্রধানতঃ তৎসম-নির্ভর। মহারাজ নরনারায়ণের এই পত্রাংশে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার অন্ততঃ একেবারে নেই। অথচ, সপ্তদশ শতকে সম্পাদিত চুক্তি-পত্রের শব্দাবলী আরবী-ফারসী শব্দের অতি-প্রয়োগে আজকের পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য-প্রায়। আবার অষ্টাদশ শতকে লেখা 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র'-এ সংস্কৃতানুসারী ভাষা ভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত নন্দকুমারের পত্রে মুসলমানী শব্দের ব্যবহার থাক্‌লেও তাতে কৃত্রিম আড়ম্বর নেই;—'তারিখ', 'রোজ', 'তক্‌' ইত্যাদি শব্দ বাংলার কথ্য ভাষায় সহজ আশ্রয় লাভ করেছে। অপরপক্ষে জগতধির রায়ের পত্র মুসলমানী শব্দ-বাহুল্যের দরুণ প্রায় অবোধ্য।

আলোচ্য রচনাসমষ্টি যদি তাদের সমকালীন-বাংলা গদ্যের মোটামুটি আদর্শ হিসেবেও গণ্য হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, বাংলা গদ্য প্রথমাবধি সংস্কৃত শব্দসম্ভারনির্ভর ছিল। সপ্তদশ, এমনকি, অষ্টাদশ শতকের হিন্দু বাঙালির সাহিত্যিক গদ্য রচনায়ও মুসলমানী শব্দ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। অথচ, সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সরকারি পত্র-পত্রিকা,—দলিল-দস্তাবেজ অথবা আবেদন-পত্রাদিতে আরবী-ফারসী শব্দের অতি-ব্যবহারের ফলে বাংলা গদ্য কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক তথ্যাদির অনুসরণ করলে দেখ্‌ব,—মোগল-পূর্ব বাংলায় বাঙালির ভাষা-সাহিত্য ভারতীয় আর্য-ভাষা-নির্ভর নিজস্বতা পূর্ণ অটুট রেখেছে। পাঠান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বাঙালি হিন্দুর সাহিত্য-কৃতির মধ্যেও মুসলমানী ভাব বা ভাষার ছাপ পড়েনি বল্‌লেই হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মোগল শাসন-যন্ত্রের প্রভাবেই এদেশে আরবী-ফারসীর চর্চা প্রথম বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। মোগল-বাংলার বহিরাগত শাসক-গোষ্ঠী দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করবার অবকাশই পেয়ে উঠ্‌তেন না। তাই, রাষ্ট্রাধিকরণে বক্তব্য পেশ করবার জন্যে প্রথমতঃ আইনজ্ঞদেরই আরবী-ফারসী শিখতে হয়;—ক্রমশঃ মুসলমানী ঐতিহ্যের

বাঙালির প্রাচীনতম গদ্য রচনার ঐতিহাসিক স্বভাব

অনুসরণ আভিজাত্যের কারণ হয়ে ওঠে, এবং হিন্দু রাজা-জমিদারদের দরবারেও এ-ভাষা বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল।১ তবু, আরবী-ফারসী ভাষা বাংলায় 'দরবারি ভাষা'র সীমায়িত মর্যাদা অতিক্রম করে লোক-জীবনের ব্যাপক পটভূমিতে প্রসৃতি লাভ করতে পারেনি। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি প্রাথমিক আলোচনা কালে উদ্ধার করেছি। ভারতচন্দ্র আভিজাত্য-বোধের কৌতুকাবেশে "যাবনী মিশাল" ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও 'যাবনী' শব্দের চটক কম নেই; কিন্তু জীবনের সহজ প্রয়োজনে মুসলমানী বাচন-ভঙ্গি ও শব্দ-ভাণ্ডারের আশ্রয় সাধারণ বাঙালি খুব কমই গ্রহণ করেছে। এই কারণে প্রায় সমসময়ে রচিত নন্দ-কুমার ও জগতধির রায়ের পত্র-রচনার ভাষা-ভঙ্গির পার্থক্য এমন মৌলিক; —এই কারণেই পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যেও মুসলমানী প্রভাব একান্ত প্রাধান্য অর্জন করেছে একমাত্র আদালতেরই ভাষায়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস বাংলা গদ্যের সংস্কৃত-নির্ভর মৌল প্রবণতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করেছেন ইংরেজ প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের সংগঠন ইতিহাসে।২ এই ঘটনাকে ইতিহাসের স্বপথে প্রত্যাবর্তন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আমাদের বক্তব্য এই নয় যে,—আরবী-ফারসী ভাষার শব্দ-সম্ভার এবং বাচন ভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে পারলে বাংলা ভাষা স্বধর্ম-চ্যুত হত। আমরা কেবল এই তথ্যই লক্ষ্য করছি যে,—নানা ঐতিহাসিক কারণের প্রভাবেই আরবী-ফারসী-সংস্কৃতির নবীনতা বাঙালির চেতনাকে একান্ত-ভাবে উদ্বুদ্ধ,—উন্মুক্ত করতে পারছিল না। ফলে, ইস্‌লামিক ভাষা-ভঙ্গিও বাঙালির ব্যবহারে সহজ স্বাভাবিকতা অর্জনে হয়েছিল অক্ষম। অথচ, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের আবশ্যিকতা ও কৃত্রিম আভিজাত্য-বোধের প্রভাবে বাংলা পদ্যের মত গদ্যেও আরবী-ফরাসী শব্দ প্রয়োগের অস্বাভাবিক আতিশয্য লক্ষিত হচ্ছিল। একেই আমরা ভাষার স্বধর্ম-চ্যুতি বলেছি। কল্পনার প্রসার এবং মণ্ডন-সজ্জার সমৃদ্ধি পদ্যের সম্পদ যদি হয়ও,—তবু, সহজ স্বাভাবিকতা, বাস্তব-প্রয়োজনানুসারিতা যে গদ্যের মৌল ধর্ম এ'কথা মান্‌তেই হবে। বাংলা গদ্যের ইংরেজ লেখকেরা গদ্যকে আতিশয্যের কৃত্রিমতা-মুক্ত করে বাস্তব-প্রয়োজনের অনুবর্তী করেছিলেন,—তার স্বাভাবিক মুক্তিপথকে করেছিলেন অবারিত। এইখানেই তাদের সার্থকতা। কিন্তু ইংরেজরাই বাংলা গদ্যের প্রথম বিদেশী সাধক নন,—এপথে প্রথমে এসেছিলেন পর্তুগীজ বণিক ও ধর্মযাজকেরা।

বাংলা গদ্য রচনায় বিদেশিদের প্রয়াস

পর্তুগীজদের বাংলা গদ্যরচনার স্বল্পস্থায়ী প্রচেষ্টাকে শ্রীসজনীকান্ত

১। দ্রষ্টব্য—History of Bengal—Vol. II. Ch. XII.

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড।

দাস ভূমিকম্পের আকস্মিকতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,—"আকস্মিক না ইউক মূল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই।"১ এ পর্যন্ত আলোচিত তথ্যাবলী থেকে সহজে বোঝা যাবে,—পর্তুগীজ প্রচেষ্টার পূর্ব-কালে বাংলা গদ্যের একটি স্বকীয় বাগ্-ভঙ্গি বেশ সুচিহ্নিত হয়ে উঠেছিল, আর সে ভঙ্গি ছিল একান্ত মৌখিক বাচন-বৈশিষ্ট্য-নির্ভর। পর্তুগীজরা কিন্তু বাঙালির বাচন-ভঙ্গির সেই বৈশিষ্ট্যটুকুর অনুসন্ধানও করে নি; তাঁদের রচনার শব্দ ব্যবহার, বানান এবং বাক্যরীতি (Syntax) য়ুরোপীয় পর্তুগীজ ভাষা-ভঙ্গির অনুকৃতি মাত্র। এদিক থেকে ইংরেজ উত্তর-সূরিগণের চেষ্টা আরো মূলগত ছিল;—তাঁরা এদেশীয় বাগ্ধারা, ও রচনা ভঙ্গির 'পরে নিজ নিজ গদ্য-রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কেরির 'কথোপকথন' এই চেষ্টার সার্থক নিদর্শন। এদিক্ থেকে পর্তুগীজ প্রচেষ্টার মূলগত ত্রুটি ও ভাষার আনুপূর্বিকতার বিচারে আকস্মিকতা অনস্বীকার্য। তাহলেও, আধুনিক বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পর্তুগীজদের সাধনা একেবারে মূল্যহীন নয়।

পর্তুগীজ আওতায় বাংলা গদ্য এবং

বাংলা গদ্যের নব-জীবন লাভের প্রসঙ্গে এ-পর্যন্ত বার বারই এক বিশেষ প্রয়োজনবোধের উল্লেখ করছি; সে হচ্ছে লিখ্য ভাষা, তথা সাহিত্য-কৃতির মাধ্যম হিসেবে বিশেষ ও স্বতন্ত্রভাবে গদ্য-চর্যার প্রয়োজন-বোধ। পর্তুগীজ প্রয়াসের মধ্যেই সে প্রয়োজন-বোধের অস্ফুট স্বীকৃতি প্রথম আভাসিত হয়। এখানে এসেই দেখি,—পত্র, দলিল রচনা, বা গল্প বলার প্রয়োজনে নয়,—বিশেষ জ্ঞান বা বিদ্যাকে অক্ষর-মাধ্যমে স্থায়িত্ব দেবার জন্যেও নয়, নিছক গদ্য রচনার বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়েই গদ্য চর্চা সুরু হয়েছে। আগে বলেছি,—সে যুগের পত্রের ভাষাও লিখ্য ভাষার বিশেষ মর্যাদা আয়ত্ত করতে পারেনিঃ—মুখের কথাকে দূরে পাঠাবার মাধ্যম ছিল চিঠির গদ্য। গল্প বলা বা স্মৃতি-শ্রুতি-দর্শন-চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পূর্বোল্লিখিত বাংলা গদ্য রচনাবলী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কিন্তু য়ুরোপীয় জাতি হিসেবে লিখ্য গদ্যের বিশেষ মর্যাদা ও সার্থকতার জ্ঞান পর্তুগীজ বাংলা লেখকদের ছিল সুস্পষ্ট। এই সহজ অবধানতা তাঁদের প্রচেষ্টাকে মৌলিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছিল। সত্য বটে, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই পর্তুগীজ মিশনারীরা প্রধানতঃ বাংলা গদ্যের আশ্রয়-প্রার্থী হয়েছিলেন,—কিন্তু যে গদ্যকে তাঁরা সন্ধান করে ফিরছিলেন, সে একটি বিশেষ গদ্য-রূপ,—আর সেই অনুসন্ধান-চেষ্টারই ফল বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষঃ—Vocabulario em Idioma Bengalla

রচনার সাহিত্যিক প্রয়োজন বুদ্ধি

১। ঐ।

e Portuguez.। লিখ্য ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্যের রূপানুসন্ধানের পথ পর্তুগীজদেরই সৃষ্টি। ইংরেজ উত্তর-সাধকগণ সেই পথেরই সুষ্ঠু স্থায়িত্ব বিধান করেছেন;—এদিক্ থেকে বাংলাগদ্যে ইংরেজ-যুগ পর্তুগীজ পূর্ব-সাধনারই ঐতিহাসিক অনুবৃত্তি। ভারত-ভূমিতে পর্তুগীজ প্রয়াসের সর্বাবয়ব ফলশ্রুতি সম্বন্ধে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করি ঃ—

"They (The Portuguese) may fairly claim that where Portugal led other European Countries followed, where she sowed others reaped, where she laid the foundation, others built a magnificent super-structure."১

য়ুরোপীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্তুগীজেরাই প্রথম ভারতে এসেছিল (১৪৯৭ খ্রীঃ)। এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। বাণিজ্য-ব্যবসায়ী পর্তুগীজদের অনেকেই প্রথমাবধি জলদস্যু ছিল, যারা তা ছিল না, তাদের মধ্যেও সূক্ষ্ম সংস্কৃতি-মত্তার পরিচয় দুর্লভ ছিল। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে পর্তুগীজ বৈষয়িকদের দান সব কিছুই ঋণাত্মক। এরই মধ্যে বাংলাভাষার চর্যা যা কিছু হয়েছে, তার জন্য একান্তভাবে দায়ী পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা। পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রায় সংগে সংগে পর্তুগীজ ধর্ম-যাজকেরাও এদেশে পদার্পণ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী কালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের একাধিক অঞ্চলে তাঁদের রোমান্ ক্যাথলিক গীর্জাও গড়ে উঠেছিল।২ প্রধানতঃ একজন ধর্ম-প্রবক্তার প্রভাবেই দেখ্‌ছি আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর পর্তুগীজ বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে হুগলী ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের জন্য 'ফার্‌মান' দান করেন। সেখানে স্বাধীন-ভাবে ধর্ম প্রচারের আইনগত অধিকারও পর্তুগীজেরা লাভ করেছিল। পর্তুগীজ পাদ্রীরা প্রথমাবধি এদেশে ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং প্রধানতঃ তার উপায় হিসেবেই এদেশীয় ভাষার চর্চায় হয়েছিলেন বৃত।

এই চেষ্টার প্রথম ফল ফলেছিল ষোড়শ শতাব্দী শেষ হবার আগেই। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যে-সুইট্ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মযাজক ফ্রান্‌সিস্‌কো ফের্-নান্‌দেস্ ঢাকা জেলার সোনারগাঁর নিকটবর্তী শ্রীপুর থেকে সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নিকোলাস্ পিমেন্তাকে পত্র লিখে জানান যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের সার ব্যাখ্যা করে "ছোট একখানি বই" এবং এক-খানি প্রশ্নোত্তর মালা রচনা করেছেন; আর তাঁর সহকর্মী দোমিনিক্ দে সুজা দু'খানা বইই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। চিঠিখানি ৭ই জানুয়ারী তারিখে লেখা।

অধুনালুপ্ত পর্তুগীজ রচনা

১। History of Bengal Vol II Ch. XIX.

২। মানোএল-এর ব্যাকরণের প্রস্তাবনা

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে বাংলার রোমন্ ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অধ্যক্ষ ফাদার মার্কোস্ এন্টোনিও সাঁ সুচির একটি পত্র পাওয়া গেছে;—তাতে তিনি লিখ্ছেন এদেশীয় পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা (Fathers) "have learned the language well, have composed Vocabularies, a grammar, a confessionary and Prayers: They have translated the Christain doctrine etc., nothing of which existed until now."১

আরো একাধিক পর্তুগীজ ধর্মযাজক এ ধরণের পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন,—তার প্রচুর প্রমাণ আছে। কিন্তু, এ সকল রচনার অধিকাংশেরই পরিচয় আজ পরোক্ষ তথ্যের 'পরে নির্ভরশীল। মাত্র তিনখানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই তিনখানি গ্রন্থের আত্মরক্ষার ফলে বাংলা গদ্যে পর্তুগীজদের নবতর দানের ইতিহাস আভাষিত হয়েছে। বাংলাভাষায় প্রথম গ্রন্থ মুদ্রিত হবার সুযোগ লাভ করে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্বন্ নগরীতে; তাও একজন পর্তুগীজ ধর্মযাজকের চেষ্টায়। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি বাংলা ভাষার বই লিস্বন নগরীতে ছাপা হয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে ঃ—

বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ

প্রথম গ্রন্থখানি ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ আখ্যায় অধুনা সুপরিচিত হয়েছে,—লেখক ঢাকা-ভূষণার জমিদার-পুত্র দোমএন্তোনিও।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থের লেখক পাদ্রি মানোএল-দা-আস্ সুম্প্ সাম। বই দুখানির একখানি খ্রীষ্ট-ধর্ম সম্বন্ধীয়,—প্রথমে গ্রন্থকার কর্তৃক পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত হবার পর একই লেখকের দ্বারা বাংলায় অনূদিত। মনোএল্-এর লেখানুযায়ী গ্রন্থের নাম Crepar Xaxtrer orth bhed or Cathecismo da Doutrina Christea. রোমান্ হরপের বাংলা প্রতিরূপ অনুযায়ী গ্রন্থের নাম হয় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'।

মানোএল্-এর অপর রচনা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দ-কোষ গ্রন্থটির নাম—Vocabulario em Idioma Bengalla'e Portuguez.

দোম্ এন্তোনিও'র গ্রন্থ মুদ্রণের কৃতিত্ব-ও মানোএল্-এর। গ্রন্থখানি রোমান্ হরপে মুদ্রিত হয়েছিল—ভাষা যদিও বাংলা। দোম্ এন্তোনিওর বাংলা গ্রন্থ পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন মানোএল্ এবং সম্ভবতঃ তিনিই বাংলা হরপে লেখা রচনাটিকে রোমান্ হরপে পরিবর্তিত করে তা মুদ্রণযোগ্য করে তোলেন।২

পর্তুগীজ বাংলার এই কৃতী পুরুষটির উল্লেখযোগ্য পরিচয় প্রায় কিছুই আমাদের জানা নেই। শুধু জানা গেছে, মানোএল্ ছিলেন এভোরার

১। দ্রষ্টব্য—ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন সম্পাদিত ব্রাহ্মণ-রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদের প্রস্তাবনা।

২। Ninteenth Century Bengali Lit.—Dr. S. K. De.

অধিবাসী; অগস্তনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি এদেশে আসেন।[১]

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার ভাওয়াল পরগণায় লিখিত হয়। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে গ্রন্থখানিতে খ্রীষ্ট-ধর্মের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। শ্রীসজনীকান্ত দাসের অনুমান,—"মূল পর্তুগীস্ অংশ মানোএলের লেখা, তিনি সম্ভবতঃ কোন দেশীয় খ্রীষ্টানকে দিয়া বাংলা অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন।"[২] কিন্তু, টাইটেলপেজ-এ গ্রন্থকার হিসেবে মানোএল-এর নামই উল্লিখিত আছে। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এর মুদ্রিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯১,—বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ-মূল উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,—"যে বাঙালা ঐ পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক বাঙালা, দুইশত বৎসর পূর্বে ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে ব্যবহৃত বাঙালা। এই ভাষা কিন্তু একেবারে মৌখিক ভাষা নহে। সাহিত্যিক ভাষার, সাধুভাষার আধারের উপরও এই ভাষা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত।"[৩] পাঠ-সহায়তার জন্য মূল গ্রন্থ-বিষয়ের টুক্‌রো অংশের সংগে ডঃ সুনীতিকুমার কৃত বাংলা-লিপিরূপও উদ্ধার করছি;—

"Pita´ amardiguer, Poromoxorgue´ asss´; tomar xidhi
"পিতা আমারদিগের, পরমস্বর্গে আছ; তোমার সিদ্ধি
namere xeba houq,
নামেরে সেবা হোক;

বাংলা-পর্তুগীজ ব্যাকরণ

মানোএল্-এর ব্যাকরণ কিন্তু পূর্বতর কালের রচনা, ১৭৩৪ খ্রীঃ-এ এই গ্রন্থখানিও ভাওয়াল-এই রচিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা X(১০)+৫৯২। গ্রন্থটির প্রথমাংশ ব্যাকরণ এবং পরাংশ পর্তুগীজ-বাংলা, বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ। ব্যাকরণাংশ পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত। কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রথম অংশের সামান্য মূল এবং অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন কৃত তার বাংলা প্রতিরূপ উদ্ধৃত হল:—

"Number Singular		"একবচন	
Nominativo	Loha´, Ferro	কর্তৃকারক	লোহা=লৌহ
Genitivo	Lohar	সম্বন্ধ	লোহার
Dativo	Lohare	সম্প্রদান	লোহারে বা লোহাকে
Accusativo	Lohare vel Lohaque		

১। ঐ।
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।
৩। মানোএল্-দা-আস্ সুম্‌প্‌সাম্ এর বাঙলা ব্যাকরণ—প্রবেশক দ্রষ্টব্য।

Vocativo	O Loha	সম্বোধন	অ (ও) লোহা
Ablativo	Lohate"	অপাদান	লোহাতে।"

ব্রাহ্মণ রোমান্ ক্যাথলিক সংবাদের লেখক দোম্ এন্তোনিও মগ দস্যুদের দ্বারা ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বালক বয়সে অপহৃত হয়েছিলেন। ফাদার মনোএল্ দের রোজারিও নামক এক পর্তুগীজ ধর্মযাজক তাঁকে উদ্ধার করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। দোম্ এন্তোনিও পরবর্তীকালে তাঁর অনেক স্বদেশবাসীকে খ্রীষ্ট ধর্মান্তরিত করেছিলেন। 'জেন্টু'দিগের প্রতিনিধি জনৈক ব্রাহ্মণ ও রোমানক্যাথলিক জনৈক ধর্মযাজকের কথোপকথনে গ্রন্থখানিতে খ্রীষ্টধর্মের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয়েছে। ভাষার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ—

ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ

Bramane—Tomi care bhoso ?

ব্রাহ্মণ —তুমি কারে ভজো ?

Rom'—Poromexorere Purno Bromere.

রোম — পরমেশ(শ্ব)রেরে পূর্ণো ব্রমে(হ্ম)রে।

B.—Tobe tomara boro utom bhosona bhoso, amora tahare bhusi.

ব্র — তবে তোমরা বরো উতো(ত্ত)ম ভজোনা ভজো, আমরা তাহারে ভজি।

R.—Zodi tomara xei Purno Bromere bhoso tobe queno eto cubit cudharan nana odhormo deqhi ?

রোঃ—যদি তোমরা সেই পূর্ণো ব্রমে(হ্ম)রে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত কুধারণ নানা অধর্মো দেখি ?১

আগেই বলেছি এই গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যবস্থা করে তার স্থায়িত্ব বিধান করার কৃতিত্বও মানোএল্-এর।

পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের ওপরে পর্তুগীজ প্রবর্তিত বাংলা রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু নেই, সেকথা আগে উল্লেখ করেছি। বেশ কিছুসংখ্যক পর্তুগীজ শব্দ বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে;—কিন্তু তারও কৃতিত্ব পর্তুগীজ বাংলা-লেখকদের নয়। তবু, এ কথাও স্মরণ করব, মনোএল্ এবং অপরাপর পর্তুগীজ লেখকদের রচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিষ্ফল হয় নি; বস্তুতঃ "পাদ্রি মানুএল পরবর্তী যুগের কেরি-মার্শমান্ প্রভৃতিগণের পক্ষে এক প্রধান পথিকৃৎ।"২

বাংলা গদ্যে পর্তুগীজ প্রভাব

১। বাংলা হরপের অনুলিপি ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেনের কৃত।
২। মানোএল্-দা-আস্ সুম্প্সাম্ এর বাঙালা ব্যাকরণ—প্রবেশক পরিশিষ্ট।

গদ্যকৃতির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিকতার ভিত্তি' স্থাপনে পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের পরে ইংরেজ শাসন-সহায়ক ও ইংরেজ মিশনারিদের প্রচেষ্টাও উল্লেখ্য। পূর্বে বলেছি, যে-পর্যায়ের ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি সে-পর্যায়ের জীবন অথবা সাহিত্য-কর্মে আধুনিক মনোভাবের পরোক্ষ প্রকাশও ঘটেনি। যে মৌল প্রেরণা থেকে আধুনিক চেতনার উদ্ভব,—এ যুগের মানস-প্রচেষ্টায় তার সমুচিত প্রয়োজন-বোধটুকুমাত্র অস্ফুট আকারে আভাসিত হচ্ছিল। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনের জটিল মনোভাব আদান-প্রদানের লেখ্যমাধ্যম হিসাবে গদ্য-ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এই প্রয়োজন-বোধ সীমাবদ্ধ ছিল। পর্তুগীজ প্রয়াসের মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা উল্লেখ-যোগ্য উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি; কিন্তু ইংরেজদের হাতে এসে হয়েছে বহুবিচিত্র ব্যাপ্তির সম্মুখীন। এই ব্যাপ্তি-সম্ভাবনা সার্থক রূপ পেতে আরম্ভ করেছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকে; সে যুগ বাংলা গদ্যে আধুনিকতার প্রস্তুতি যুগ। তার পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাসে ইংরেজ কর্মব্রতীরাও কেবল আধুনিকতার ভিত্ই গড়ে চলেছেন, তার বেশি কিছু নয়।

বাংলা গদ্যে ইংরেজ

পর্তুগীজদের বেলা যেমন ধর্মপ্রচারকদের মধ্যেই একান্তভাবে এদেশীয় ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, ইংরেজদের বেলা তেমনি বাংলা চর্চা সুরু হয় সিবিলিয়ান্ বা কোম্পানীর শাসন-সহায়ক উচ্চপদস্থ কর্ম-চারীদের দ্বারা। পলাশি যুদ্ধের পর থেকেই এদেশের জীবনধারা ও জন-সমষ্টির ঘন সংযোগে আসতে পারার প্রয়োজন ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে একান্ত হয়ে উঠছিল; ফলে দেশীয় ভাষা-শিক্ষার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে কর্ম-কর্তাদের ধারণা ক্রমশঃ সুদৃঢ় হয়ে উঠ্ছিল। এমন কি, ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কটকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে (Mr. Bristo) দেশী ভাষা না জানার জন্য পদচ্যুত হতে দেখা যায়।[১]

ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ

সর্বপ্রথম ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ সরকারি তরফে বিদেশী শাসকদের দেশিভাষা শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সেই প্রচেষ্টার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ্য করি এন্. বি. হালহেড্ কৃত A Grammar of the Bengal Language গ্রন্থে। হাল্হেড্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মী হিসেবে এদেশে এসেছিলেন; একাধিক ভারতীয় ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। হ্যাল্হেডের ব্যাকরণের প্রকাশ উপলক্ষ্যে বাংলা মুদ্রণ-ব্যবস্থারও গোড়া পত্তন হয়। মুদ্রাযন্ত্র বাংলা-সাহিত্যে আধুনিকতা প্রসারের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যে, এ কথা আজ

১। Selections from Unpublished Records of Govt. Vol I.—দ্রষ্টব্য।

অবশ্য-স্বীকার্য। তাই হ্যাল্‌হেডের ব্যাকরণ আধুনিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার উৎস হিসেবে বিশেষ স্মরণীয়।

হ্যাল্‌হেড তাঁর মূল ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষাতে লিখেছিলেন; বিষয়-সজ্জাও ছিল ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শ অনুযায়ী। কিন্তু গ্রন্থে পরি-কল্পিত মূল নীতিগুলির উদাহরণ হিসেবে বহু বাংলা শব্দের ব্যবহার করা হয়। হ্যাল্‌হেডের ঐ ব্যাকরণের বাংলা শব্দাবলী মুদ্রণের জন্য স্যার চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ ছেনি কেটে বাংলা মুদ্রণযোগ্য অক্ষরের প্রথম পত্তন করেন; সেই অনুযায়ী হুগলীতে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। উইল্‌কিন্‌স্‌ও কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগে তিনি এদেশীয় কর্মকার পঞ্চাননকে অক্ষর প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়ে দিয়ে যান। পরবর্তীকালে স-পুত্র পঞ্চানন বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন।

এবং বাংলা মুদ্রণাক্ষর

হ্যাল্‌হেডের ব্যাকরণ বাংলা গদ্য-প্রসারে কোনো ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ইংরেজ রাজ-কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা-দানের একটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হিসেবেই আলোচ্য পুস্তকের একমাত্র ঐতিহাসিক মর্যাদা। এই সময়ে ইংরেজের নানা প্রকার আইন বিষয়ে দেশীয় ভাষায় একাধিক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। বিদেশিদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্যে শব্দ-কোষ এবং সহজ-প্রবেশ (Tutor) জাতীয় গ্রন্থিকাও একাধিক রচিত হয়; বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এ সকল প্রয়াসের উল্লেখ আবশ্যিক নয়।

ইংরেজ রাষ্ট্রাধিকারে বাংলা গদ্য

ইংরেজ প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থকতার পরিচয় আভাসিত হয় মিশনারীদের প্রভাবে। এই সিদ্ধির জন্য কেরি ও মার্শমান্ একদা বাংলায় প্রাতঃস্মরণীয়তার মহৎ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[১] ইংরেজ শাসকেরা প্রথমে এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রবর্তনের সমর্থক ছিলেন না; ফলে ইংরেজ-ভারতে মিশনারী প্রচেষ্টাও বিলম্বিত হয়েছিল। উইলিয়ম কেরি নামক ইংরেজ তন্তুবায়-পুত্র ভারতীয় বিধর্মীদের নিকট খ্রীষ্টবাণী প্রচারে ব্যাপ্‌টিস্‌ট্ মিশনারী প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম উল্লেখ করেন। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাগর পারে একটি ছোট ধর্ম-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কেরি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলকাতায় পদার্পণ করেন; কিন্তু ইংরেজ শাসন-কর্তৃগণের ভয়ে তাঁকে নীরব থাকতে হয়। পরে জীবিকার্জনের জন্য কেরি মালদহে মদনাবতীর নীলকুঠিতে চলে যান। সেখানেও এদেশীয় ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্বপ্ন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছিল। মদনাবতী

ইংরেজ ধর্মযাজক ও বাংলা গদ্য

১। দ্রষ্টব্য—সেকাল ও একাল; রাজনারায়ণ বসু।

থাক্‌তেই তিনি বাইবেলের অনুবাদ অনেকটা অগ্রসর করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য উত্তর বঙ্গে ইংরেজ অধিকারে থেকে কিছুতেই সফল হচ্ছিল না।

তাই, কেরির সহায়তার জন্যে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর অন্যান্যদের সংগে এলেন জশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম অআর্ড। তাঁরা এক আমেরিকান্ জাহাজে করে শ্রীরামপুরে উপনীত হন। শ্রীরামপুর তখন ওলন্দাজ অধিকারে; ধর্মপ্রচারের সুবিধে হবে মনে করে মার্শমানেরা ওখানে উপস্থিত হন। কেরিও মদনাবতী ছেড়ে আসেন। কেরি এবং মার্শমান দুজনেই সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বাংলা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তাঁরা রামরাম বসু নামক দেশীয় মুন্সীর সহায়তা গ্রহণ করেন। কেরি এবং তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর থেকে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের নিউটেস্‌টামেন্‌ট্ বাংলাভাষায় আনুপূর্বিক মুদ্রিত হয়। এই উপলক্ষ্যেই বিখ্যাত শ্রীরামপুর প্রেসের প্রতিষ্ঠা।

কেরির বাইবেল

আলোচ্য বাইবেলের ভাষা বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নয়। এমন কি, একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষার তুলনায় প্রথম সংস্করণের ভাষা হাস্যকর বলে মনে হয়। কেরির পরবর্তী রচনা-প্রকর্ষের সংগে এই ভাষা-ভঙ্গির তুলনাও কল্পনাতীত। নিচে সামান্য নিদর্শন উদ্ধার করি ঃ—

"প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়-মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকারে বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বর দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি।"

ওপরের উদ্ধৃতির মধ্যে ইংরেজি বাক্য-রীতির প্রভাব খুব স্পষ্ট। কিন্তু, একই সংগে বাক্যগঠনে অবলম্বিত হ্রস্বতা এবং সরলতাও অবশ্য লক্ষণীয়; তৎসম শব্দের প্রতি ঝোঁকও এই রচনাভঙ্গির আর একটি বৈশিষ্ট্য। আর, এ-সকল বৈশিষ্ট্যই শ্রীরামপুর মিশনের মনোভাবের স্বকীয়তার ফল। পর্তুগীজ আমল থেকে শ্রীরামপুর-পর্ব-পূর্ব বাংলা গদ্য রচনার এই প্রয়াসে বিদেশীদের কাজ-চালানো গোছের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্যই একান্ত ছিল।

ইতিহাসের ফলশ্রুতি

কিন্তু, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা খ্রীষ্ট-প্রসঙ্গকে এ-দেশবাসীদের বোধগম্য এবং উপভোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই গদ্য রচনায় বৃত হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অভিমুখী হয়েছিল, হয়েছিল সহজ-সরল স্বাধীনতার অনুসারী। কেরি এবং তাঁর সহকর্মিদের চেষ্টার এই স্বাতন্ত্র্যই বাংলা গদ্যের মুক্তি-সম্ভাবনাকে স্বখাতে প্রবাহিত করেছিল। সে ছিল

বাংলা ও বাঙালির জীবনানুসরণের মৌলিক পথ, আধুনিক বাংলা ভাষা-সাহিত্য সংগঠনের প্রস্তুতি-পথ। এই প্রস্তুতি-পথের ইতিহাসের সম্মুখে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি'-পর্ব এখানে শেষ হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিকতার প্রস্তুতি

উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাসের ইতিহাস বর্ণনা করে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন,—"১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।"[১] বাংলার,—বলা বাহুল্য, কেবল-মাত্র নাগর বাংলার,—ব্যবহারিক জীবনে এই সর্বাভিমুখী নবযুগের প্রসার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে যথার্থই সমিধ-স্বরূপ হয়েছিল। আধুনিকতার ভিত্তি পর্যায়ের আলোচনায় তৎকালিক জীবন ও শিল্প-প্রবাহে নূতনতার প্রতি ইতিহাসের অবচেতন আকূতিকে লক্ষ্য করেছি। আলোচ্য যুগের জীবন-ইতিহাসে দেখ্‌ব, ডিরোজিওর বিপ্লবী-চেতনা, রামমোহনের সংগ্রাম, বিদ্যাসাগরের মহাসাধনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব-ঐতিহ্যের এই আর্তি ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হয়ে উঠ্‌ছিল। গতানুগতিক আচার-প্রতি-পালনের নির্জীবতা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাঙালি-ব্যক্তিত্ব আত্ম-মোক্ষণের পথে ক্রমশঃ-ই এগিয়ে চলেছিল ধাপে ধাপে। কিন্তু, সাহিত্যের জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধি এক-কে নিয়ে নয়;—সর্ব দেশে-কালেই সাহিত্যের সাধন-পীঠ অনেকের জীবন-লোকে প্রসৃত। শিল্পি-সাহিত্যিক স্বয়ম্ভূ যদি হন-ও, তবু তিনি কোনো অবস্থাতেই স্বয়ম্পূর্ণ নন। জীবনের প্রচ্ছদ হিসেবে শিল্পীর দেশ-কাল তাঁর অনুভূতি ও স্বয়ম্ভূতির ধারাকে সদা-সমৃদ্ধ ও অব্যাহত করে রেখেছে। তাই, শিল্প-কৃতির অবধারক যেমন স্রষ্টার প্রতিভা, তেমনি তার শাশ্বত উপাদান সমকালীন জীবন-ধর্ম ও জীবন-লক্ষণ। ডিরোজিও-রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সিদ্ধিকে সাধারণভাবে আয়ত্ত করতে উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালির সময় লেগে-ছিল;—আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল সেই জীবন-সিদ্ধির অবধারণ-ক্ষম প্রতিভার সমাগমে। তাই, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার

প্রস্তুতির যুগ ও পূর্ব সূত্র

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

প্রথম সার্থক এবং স্পষ্ট-চিহ্নিত পদক্ষেপ মধুসূদনের রচনায়। কিন্তু, মধ্যবর্তী পর্যায়ে বাংলার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা নিশ্চল হয়ে ছিল না; সমাজ-জীবনের ক্রম-মুক্ত প্রবাহেরই সমান্তরাল ধারায় তা বয়ে চলেছে—একই ছন্দে, তালে। ব্যবহার এবং ভাবের জগতে যুগপৎ বন্ধন-মুমুক্ষুতার এই প্রবণতাকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বের লক্ষণ রূপে আমরা চিহ্নিত করছি। যদিও এই প্রবণতার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল মহাত্মা রামমোহন রায়, তবু, বীজের ফল-রূপ ধারণের পূর্ব-ইতিহাস নিহিত আছে উনিশ শতকের জন্ম মুহূর্ত হতে;—সে ইতিহাসেরও আবার ইতিহাস আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্যায়ের মোটামুটি হিসেব নিকেশের জন্যও মধুসূদনের আবির্ভাব-পূর্ব বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি জীবনের সেই ইতিহাসের অনুধাবন প্রয়োজন।

এপর্যন্ত বাংলা দেশে ইংরেজ-সংসর্গের যে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, তার সীমায়তি সম্বন্ধে প্রথমেই নিঃসংশয় হতে হবে। বাংলা দেশে ইংরেজ সমাগমের প্রথম পর্যায় নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্কে লিপ্ত। কিন্তু ভারতীয় ইংরেজের ইতিহাস এবং ইংরেজ জাতির সমকালীন ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বস্তুতঃ, বনিয়াদি ইংরেজ চরিত্রের বৈভবই প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালি মনকে ইংরেজি জ্ঞান ও ভাবলোকের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। ইস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ের অতিচার ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্র-শক্তির দৃষ্টি এড়ায়নি। বিদেশে ইংরেজ জাতির সুনাম এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে কোম্পানীর কর্ম-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন প্রথম থেকেই অনুভূত হয়েছিল। সেই প্রয়োজন-বোধের প্রথম ফল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নিয়ন্ত্রণ আইন (Regulating Act)। এই আইনের অধিকার এবং দায়িত্ব স্বীকার করেই ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংস্‌ বাংলায় প্রথম গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন। ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংস্‌-এর প্রচেষ্টায় দূর-প্রসারী সফলতার সম্ভাবনা কিছু কিছু থাক্‌লেও, অব্যবহিত পরিণাম বাংলার পক্ষে শুভকর হয়নি। পূর্ববর্তী আলোচনায় এই তথ্য পরিস্ফুট হয়েছে। ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংস্‌কে এই কারণেই ক্লাইভেরই মত পার্লামেন্টের বিচারের সম্মুখীন হতে হয়;—বলা বাহুল্য, তার ফল হেস্‌টিংস্‌-এর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয়নি।

বঙ্গে ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংস্‌

ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংস্‌-এর সার্থকতা-ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার 'পরে নির্ভর করে দ্বিতীয়বার ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (Pitt's India Act)। এই নূতন আইনের ক্ষমতা ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড কর্ণ্‌ওয়ালিস্‌ (১৭৮৬ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এদেশীয় কর্ম-পরিচালনের কতকগুলো সাধারণ নীতি তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল;

বাঙালি সাধারণকে ইংরেজি শেখাবার উপযুক্ত একাধিক স্কুল কলকাতা শহরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠারও আগে স্থাপিত হয়েছিল।১ সে সব স্কুলে সাধারণ ব্যাকরণ ও ভাষা একেবারেই শেখানো হোত না; যত জোর ছিল বেশি ইংরেজি শব্দ ও তার অর্থ শেখানোর প্রতি। "এরূপ শোনা যায়, শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট্ দিতেন, যে এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরেজি শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোনও বালক ইংরেজি অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া স্কুল ভাঙিবার সময় নামতা ঘোষাইবার মত ইংরেজি শব্দ ঘোষান হইত। যথা:—

ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লোম্যান—চাষা।
পম্‌কিন্—লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার—শষা।২"

শুধু চাক্‌রী-প্রার্থী বাঙালিরাই যে প্রথমে এ ধরণের ইংরেজি শিখেছিলেন, তা নয়,—সে সময়কার কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কয়েকজনও 'ফিরিঙি স্কুলে' এই ধরণের ইংরেজি শিখেছিলেন। প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর, ও মতিলাল শীল-ও ছিলেন এঁদের অন্যতম। রাজ-ভাষা হিসেবে ইংরেজি তখন সমাজে নূতন সম্মানের আসন অধিকার করছে। ইংরেজি-জানা ভদ্র-জন তখন কল্‌কাতার সমাজে বিশেষ সমাদৃত হতেন। কিন্তু, ইংরেজি যে সেদিন কেবল রাজ-ভাষা বলেই আদৃত হয়েছিল তা নয়; ইংরেজের ভাষা বলেও সে তখন সমকালীন বাঙালি সমাজের মর্যাদা আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় সম্পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপী বাংলায় ইংরেজ-সান্নিধ্য গ্লানি-যুক্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু, বিজিত দূরদেশীয়-দের মধ্যে নিছক জাতীয় মর্যাদা ও সুখ্যাতি রক্ষা করবার জন্য স্বদেশ-বাসী যে ইংরেজগণ আইনের পর আইন রচনা করে চলেছিলেন,—যার প্রত্যক্ষ সুফল প্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিল কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে,—ইংরেজ চরিত্রের সেই সহজ মাহাত্ম্যের প্রতি বাঙালির মন প্রথম থেকেই ঝুঁক্‌তে আরম্ভ করেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের অন্যতম একটি কারণ এই সহজ শ্রদ্ধা-বোধও। ভিক্টোরিয়া-যুগের ভারতে বাঙালির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকামনার স্বরূপ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলে-ছিলেন, "কেবল মাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসন কর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি, এমন কথা মনে করাও সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম? মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ

১। দ্রষ্টব্য ঐ।
২। ঐ।

এত বড় হয়ে দেখা দিল কোন্‌ শিক্ষায়?"[১] এ-যে ইংরেজি শিক্ষা সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা-প্রবর্তনেরও আগে ইংরেজের শিক্ষা এদেশীয়গণকে উনিশ শতকের প্রথমাবধি ইংরেজির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, এ কথা আজ অনুভব করা উচিত। মহাত্মা রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যেই নয়,—দর্শন-রাজনীতিতেও সেকালে তুলনাহীন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি যখন [১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে] ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার প্রবল দাবি নিয়ে লর্ড আমহার্স্টসকে চিঠি লিখেছিলেন, তখন তার তাৎপর্য বুঝি। কিন্তু ১৮১৬-১৭খ্রীষ্টাব্দে যে-সকল বাঙালি মহানাগরিকদের চেষ্টা, উৎসাহ ও দানে পুষ্ট হয়ে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের অনেকেরই ইংরেজি আক্ষরিক বিদ্যাও উল্লেখযোগ্য ছিল না। ইংরেজি জ্ঞানের চেয়ে ইংরেজ ও ইংরেজির প্রতি সহজ শ্রদ্ধাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল বলে মনে করি।

বাংলার ইতিহাস-সংস্কৃতি নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও সংগঠন পথে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রধানতঃ হিন্দু-কলেজের জ্ঞান-তীর্থকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্ত এবং বিত্তবান্‌ সহুরে বাঙালির মনোলোকে প্রতীচ্য জ্ঞান-ভারতীর নির্বাধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। বস্তুতঃ, হিন্দু কলেজ-স্থাপনার পূর্ব থেকেই বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলে এসেছিল। কিন্তু প্রতীচ্য-প্রভাবিত জীবন-চেতনার উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রথম সার্থক প্রতিক্রিয়া রচনায় হিন্দু কলেজের কীর্তি একক ও অদ্বিতীয়। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে হিন্দু কলেজের এই দান 'নব্য বঙ্গযুগ' ('Young Bengal Age') নামে ঘোষিত। 'নব্য বঙ্গের' ক্ষতি এবং নিন্দাকর প্রভাব সম্বন্ধে এ কালের বাঙালিরও ধারণা খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু সে তুলনায় আধুনিক বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে 'নব্য বঙ্গের' তুলনাহীন দান সম্বন্ধে অনেকেই যথেষ্ট অবহিত নন। তাই, দীর্ঘ হলেও সেই ইতিহাস আনুপূর্বিক উদ্ধার করব রমেশচন্দ্র দত্তের জবানিতে:—

বাঙালির রেনেসাঁসের পীঠভূমি হিন্দু-কলেজ

"The Hindu College, which was established in 1817, effected a revolution in the ideas of the young Hindus of the day. They imbibed in that College a warm appreciation of western literature and western civilisation, and brooked with impatience the unreasoning restrictions which modern Hindu

১। কালান্তর।

customs had imposed on them. Trained under teachers like Derozio and D. L. Richardson, the first young men who came out from the Hindu College were fired with ambitions to reform all that was unhealthy, and to reject all that was hurtful in Hindu customs and rules. The reaction against the restrictions of ages went perhaps a little too far, but we can scarcely regret this reaction to which is really due all the steady improvement and reform which have been effected in this country. One may laugh at the anglicised young Collegiates of the first half of this (19th) century, but it was those young collegiate whose advanced ideas and training leavened the society in which they lived, and made the sober reforms of later times possible. Men like Kashiprasad Ghosh, Ramgopal Ghosh and Ramprasad Rai, like K. M. Banerjee, Debendranath Tagore and Prasanna Kumar Tagore, were among the early students of the Hindu College and the ideas which they received with their English education permeated the society in which they lived. The writings of Akshay Kumar Dutta reflected the progress infused into Hindu society through the Hindu College. The reforms effected by Iswar Chandra Vidyasagar were possible only after Hindu society had been permeated with advanced ideas through a healthy English education."১

বর্তমান অধ্যায়ের সূচনাতে বলেছি, রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত যুগনায়কদের প্রবর্তিত নবীন জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধকে আয়ত্ত করেই উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি জীবন সেই আধুনিকতার প্রস্তুতি-পথে অগ্রসর হয়েছিল। ওপরের ঐতিহাসিক তথ্য কেবল এই সত্যই প্রমাণিত করে যে,—উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে আধুনিকতার প্রস্তুতি-যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি-স্তম্ভ ছিল হিন্দু কলেজ!—আর, এ কালের পাঠক আত্মশ্লাঘার সংগে স্মরণ করবে, সেই ঐতিহাসিক স্তম্ভের শ্রেষ্ঠ স্থপতি ছিলেন একজন যথার্থ ভারতীয় তরুণ শিক্ষক,—'ডিরোজিও'।

আগে বলেছি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এ দেশে ব্যাপক ভাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সমকালে এবং তার পরে এই চেষ্টা আরো বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ হয়! কিন্তু আলোচ্যকালের ইংরেজি শিক্ষার যথোচিত সামাজিক ফলশ্রুতি লক্ষিত হয়ে-

১। Literature of Bengal.

ছিল কেবল হিন্দু কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়েরই মধ্যে। এর কারণ, আলোচ্য ছাত্রদল গড়ে উঠেছিলেন কেবল সাধারণ ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে নয়, প্রাণ-সচল শিক্ষক-মানসের সান্নিধ্যের মধ্যে। হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষার্থীরা Richardson-এর পাণ্ডিত্য ও হৃদয়-বত্তার সাহচর্যে ফরাসি-বিপ্লবের প্রাণ-ধারা-নিঃস্যন্দী ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শনের সজীব স্পর্শলাভ করে-ছিলেন,—হয়েছিলেন সমৃদ্ধ। কিন্তু, তাঁদের গূহায়িত প্রাণ-চেতনাকে আমূল উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করেছিল তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর মানস স্পর্শ।

হিন্দুকলেজীয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত ডিরোজিও

দুটি ঐতিহাসিক অধ্যাপক-প্রতিভার তুলনা-মূলক বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বস্তুতঃ, অনু-রূপ স্পর্ধিত প্রয়াস কেবল নির্বুদ্ধিতার পরি-চায়ক। তবু বর্তমান প্রসঙ্গে ডিরোজিও সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক সত্যের অনুধাবন অবশ্য প্রয়োজন। রিচার্ডসন-ডিরোজিওর কথা ছেড়ে দিলেও হিন্দু কলেজের ইতিহাস আরো বহু প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপকের সাধনায় পবিত্র হয়েছে। কিন্তু, ডিরোজিও হিন্দু কলেজের একজন নিষ্ঠা ও প্রতিভা-বান অধ্যাপক মাত্র ছিলেন না,—তিনি ছিলেন সেদিনকার উদীয়মান্ বাংলার এক উদ্দীপ্ত অগ্নি-শিক্ষা। সমকালীন বাংলার সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসে ডিরোজিও রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয়;—আধুনিক বাংলা কাব্যের সৃজন-লোকে তিনি মধুসূদনের পূর্বসূরী,—পথ-প্রদর্শক। কবি-ডিরোজিও এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করব; এখানে শুধু স্মরণ করি নব্য বঙ্গের জন্মদাতা সমাজ-বিপ্লবী ডিরোজিও-কে।

রাজনারায়ণ বসুর লেখায় ডিরোজিও-র ব্যক্তি-পরিচয় নিম্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে ঃ—"ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন।... তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গী যেমন বলে, "মোদের বিলাত", তিনি সেইরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন।......

"ডিরোজিও'র স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সর্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিত। তিনিও তাহাদিগের সহবাসে সর্বদা থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণপূর্বক বাঙালি-দিগের সংসর্গে এরূপ বাঙালি হইয়া যান যে, তিনি সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।"[১]

আমাদের ধারণা, 'সাহেবের পুত্র' হলেও, তিনি যে বাংলার সর্বজনীন ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তর-সূরী,—তিনি যে 'বাঙালি' এ কথা ডিরোজিও

১। 'সেকাল আর একাল।'

কখনোই বিস্মৃত হন্‌নি। এই উপলব্ধির যথার্থ স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে তাঁর রচিত কবিতাবলীর মধ্যে। স্বদেশ-জননী বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ করে কবি ডিরোজিও লিখেছিলেন,—

"My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy minstrel hath no wreth to weave for thee,
Save the sad story of thy misery!
Well, let me dive in to the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! one kind wish for thee."১

হিন্দু কলেজের "চতুর্থ শিক্ষক" ডিরোজি'ওর প্রাণ-চেতনার যথার্থ স্বরূপ এখানেই উপলব্ধ হবে। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মত য়ুরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের যথার্থ পরিচয়ে ছাত্র-চিত্তকে সঞ্জীবিত করে তোলা তাঁর একমাত্র আদর্শ ছিল না। যথোচিত জ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞান-প্রসারের মাধ্যমে পতিতা দেশজননীর—'fallen country'র পুনরুদ্ধার বিধানের প্রয়াসই নব-যুবক, নবীন বাঙালি ডিরোজিও'র জীবন-ব্রত ছিল! ডিরোজিও যথার্থই ছিলেন সেদিনকার 'নবীন-বাংলা'—'Young Bengal'.

এই কারণেই, নিছক শিক্ষাক্ষেত্র ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে ডিরোজিও'র শিক্ষণ-প্রয়াস সীমায়িত হয় নি। শিক্ষামন্দিরে ধর্মাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য ডিরোজিও কর্তৃপক্ষের কাছে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। তবু, তিনি সে চেষ্টা পরিহার করেন নি। শিক্ষামন্দিরের বাইরে, এমন কি কখনো কখনো, নিজের বাসকক্ষে, তিনি ছাত্রদের নিয়ে জড়ো করে-ছিলেন, তাঁদের নিয়ে গড়েছিলেন 'Academic Association'। এই 'এসোসিয়েসনে'র উদ্দেশ্য সর্বাংশেই তথাকথিত 'Academic' ছিল না।

বাঙালি তারুণ্যের বৃহত্তর মুক্তিক্ষেত্রের নির্মাতা ডিরোজিও

"এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন অসংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিও'র শিষ্য-দিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহারা

১। Faquir of Jangira.

অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি-নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন।"১ এই প্রচেষ্টার পরিণাম সমকালীন রক্ষণশীল সমাজে দুর্বল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল,— এমন কি, ডিরোজিও-শিষ্যদের অনেকে কিছু কালের জন্য বিপথগামীও হয়েছিলেন। এই কারণে ডিরোজিওকে নিন্দিত, এমন কি পদত্যাগেও বাধ্য করা হয়। কিন্তু, ডিরোজিও'র সাধনার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি এখানে নয়।

ডিরোজিও হিন্দু-কলেজ থেকে পদত্যাগ করেও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নানা অভিযোগ দৃঢ়তার সংগে অস্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন, "তিনি কখনোই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ-বিপক্ষ দুই যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে, ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ, এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই; এবং পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, সেরূপ ব্যবহার কোন বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন।"২

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন মানব-জীবনে যুক্তি-বিচারশীলতার শ্রেষ্ঠতা;—বিচারহীন বিশ্বাস, ডিরোজিও'র শিক্ষানুযায়ী অন্ধতার নামান্তর। এই কারণেই, তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পর্যন্ত ব্যক্তিগত যুক্তিবিচার সাপেক্ষ করে তুলেছিলেন। এই বিচার-বুদ্ধির উৎকর্ষ বিধানের জন্য তাঁর এসোসিয়েশন স্বাধীন চিন্তার সংগে স্বাধীন তর্কের অধিকারও স্বীকার করেছিল। ডিরোজিও'র ছাত্রদের আয়োজিত বিতর্কসভার উচ্চমান ও স্বাধীন চিন্তার উৎকর্ষ সেকালের শ্রেষ্ঠ দেশী-বিদেশী মনীষিগণকে চমৎকৃত করেছিল; অধিকাংশ বিতর্ক-সভাতেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা উৎসাহের সংগে উপস্থিত থাক্তেন।

ডিরোজিওর শিক্ষার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

ডিরোজিও'র এই বিচার-বুদ্ধি-নির্ভর শিক্ষণ-প্রচেষ্টা তাঁর ছাত্রদের মধ্যে চরিত্রোৎকর্ষ, সত্য-সন্ধতা এবং নৈতিক চিন্তাধারার উন্নতি বিধান যে করেছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্লভ নয়।৩ কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদলের দৃষ্টিভংগী প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ ছিল না। সমকালীন হিন্দু সমাজে নৈতিক গ্লানির প্রাবল্য এর প্রধান কারণ। সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষ করে নিখিল বাংলায় হিন্দুসংস্কৃতি সেদিন অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারীদের অন্ধতা, হৃদয়হীন সংকীর্ণতা

ইয়ং বেংগল ও হিন্দু সংস্কারের বিধ্বংস

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
২। ঐ।
৩। হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণী; দ্রষ্টব্য ঐ।

ও অজ্ঞানতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়েছিল। এ সময়কার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি শিবনাথ শাস্ত্রী নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন,—"১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হামিল্‌টন ইহার প্রজা সংখ্যা ৯২৬৭২৩ বলিয়া গণনা করেন। কিন্তু, ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই। দেশের অপরাপর কোন কোনো স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কেবল ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্যবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় সমুন্নত হয়, এমন কোন জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এই সকল পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত ছিল।"১ এদেশের জ্ঞান-চিন্তার জগতে এই ভয়াবহ মড়কের ছবিটি সর্বভারতীয় আকারে প্রকট হয়েছিল গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্‌টো'র রিপোর্ট-এ। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন,—

"It is common remark that science and literature are in the progressive decay among the Natives of India. From every inquiry which I have been enabled to make on this interesting subject, that remark appears to me but too well founded. The number of the learned is not only diminished, but the circle of of this state of things is the disuse and even actual loss of learning even amongst those, who still devote themselves to it, appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and no branch of learning cultivated but what is connected with the peculiar religious doctrines of the people. The immediate consequence of this state of things is the disuse and even actual loss of many books ; and it is to be apprehended that unless Government interpose with a fostering hand the revival of letters may shortly become hopeless, from a want of books or persons capable of explaining them.

লর্ড মিনটো অবশ্য এই দুঃসহ অবস্থা নিরসনের জন্য ব্যাপক সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তন পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এ-দেশের সংস্কৃত শিক্ষার ধারায় যে নিষ্প্রাণ তার্কিকতা ও হৃদয়হীন আচারান্ধতা দৃঢ়-মূল হয়েছিল, তার প্রতিবিধানের জন্য গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষণ-বিষয়ক মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ছিল অপরিহার্য। লর্ড আম্‌হার্‌স্‌ট্‌কে লেখা রাম-মোহন রায়ের ঐতিহাসিক পত্রে এই অপরিহার্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন,—

"If it had bed been intended to keep the British Nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would

১। ঐ।

not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature."

এমন কি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত 'মহাপণ্ডিত'ও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শ পরিবর্তন সাধনে একাধিকবার দেশীয় পণ্ডিতদের অন্ধ নৈষ্ঠিকতার বাধা অনুভব করেছেন।—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Council of Education-কে লিখিত পত্রে তিনি ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের "লজ্জাকর গোঁড়ামির" সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

"They believe that their shastras have all emanated from the omniscient Rishis and, therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversation any new truth advanced by European Science is presented before them, they laugh and ridicule. Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, especially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a scientific truth, they triumph and the superstitions of a regard for their own Shastras is redoubled."

এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্য আহরণের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে। দীর্ঘ দিনের বাক্-সর্বস্ব নৈষ্ঠিক আচারান্ধ হিন্দু সমাজের স্থানুত্ব সমকালীন জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে যে প্রধান বাধা স্বরূপ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অপর দিকে ফরাসী বিপ্লবের মানবতা-সমুচ্ছ্বসিত আদর্শ প্রতীচ্য শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের যুব-চিত্তে নূতন মুক্তির আলোক-পথ উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল। এই কারণেই ডিরোজিও-প্রতিভার তড়িৎ-স্পৃষ্ট হিন্দু-কলেজের বাঙালি তরুণ দল, নূতন শিক্ষালব্ধ জীবনাদর্শের প্রতি যেমন অধীর আবেগে ছুটে গিয়েছিলেন, তেমনি অধীরতর বিতৃষ্ণায় দেশীয় জীবনের প্রতি চিত্ত-দ্বার রেখেছিলেন বিমুখ করে।

ডিরোজিও'র ইংরেজি শিক্ষায় ভারতবর্ষীয়তার প্রেরণা

কিন্তু, নিছক পরানুকরণের মধ্যে আত্মশ্লাঘার কারণ যদি থাকেও, তবু আত্মসঞ্জীবনের শক্তি একেবারেই অনুপস্থিত। ডিরোজিও এ-সত্য না বুঝেছিলেন যে, এমন কথা জোর করে বলা চলে না; তাঁর ছাত্রদের তিনি স্বদেশ ও মানব-প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।—কিন্তু, স্বদেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁদের কোন মহৎ জ্ঞান দিতে পারেন নি! বিদেশী পিতার সন্তান, মাতার কাছ থেকে দেশীয় রক্তের মহিমা-বোধ টুকুকেই পেয়েছিলেন,—দেশের জ্ঞান-সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ সম্ভার তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল। তা ছাড়া, তখনকার দেশীয় পণ্ডিতদের

মধ্যেও যে সেই জ্ঞান-লোক সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, সে কথা আগে বলেছি।

অজ্ঞানতিমির সেই দুর্গমতায় রাজপথ রচনা করে এগিয়ে এলেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন রায় তাঁর পূর্বোদ্ধৃত পত্রের শেষাংশে লর্ড আম্‌হার্‌স্‌টের কাছে দাবি করেছিলেন—এদেশের ছাত্রদের যেন "Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences" শিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, অনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ বাঙালি যুবমন, মুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে দেশীয় জীবন-ধারার অনুবর্তন করবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা সরকারী-বেসরকারী পত্রাবলীতেও এই আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ভাবে আভাসিত হয়েছে।

ইংরেজি শিক্ষিত বাংলায় ভারতীয়তার স্বপ্ন-দ্রষ্টা রামমোহন

শুধু তাই নয়, পরবর্তী কালে নিজ নিজ জীবন-সাধনায় শাস্ত্রালোচনা ও সমাজ-বিপ্লবের নূতন ধারার প্রবর্তন করে আপামর বাঙালির জীবনে এই দুই মহাদিক্‌-পাল তাঁদের আদর্শকে বাস্তবরূপ দান করেছিলেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর বাংলার মুক্ত মনের ক্ষেত্রে নূতন জীবন-ধর্মের এই বীজ বপন করেছিলেন। সেই মুক্ত মনের ক্ষেত্রটি সৃষ্টি করেছিল হিন্দু কলেজ;—আর তার প্রধান স্রষ্টা ছিলেন, ডিরোজিও! উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসে এইখানেই ডিরোজিওর যথার্থ স্থান। শুধু মুক্ত বিচার-বুদ্ধিই নয়, অকৃত্রিম সত্যানুসন্ধিৎসার প্রতিও ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, ডিরোজিওর শিক্ষারই ফলে,—

ডিরোজিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগর

"Indeed the college boy was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which those that remember the time, must acknowledge, that such a boy is incapable of falsehood because he is a college-boy."১

এই বিচারশীল সত্যসন্ধতার ক্ষেত্রেই রামমোহন-বিদ্যাসাগর ভারতীয় চেতনাশ্রিত সমাজ-বিপ্লবের বাণী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের এমন ব্যাপক সার্থকতার এ-ও একটি অতি প্রধান কারণ।

কিন্তু, আলোচ্য যুগের বাঙালি সমাজে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধাশীল ঐতিহ্য-সৃষ্টির পথিকৃৎ একাধিক ইংরেজ মনীষী। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই নাগরিক বাঙালি মাত্রের আকাঙ্ক্ষা যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল ভাবে ঝুঁকেছিল, তখন এদেশের ইংরেজ শাসক এবং তাঁদের সহকারিগণ দেশীয় শিক্ষাদির রক্ষণেই হয়েছিলেন অধিকতর

১। হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণী—মেঃ এড্‌ওয়ার্ডসের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

যত্নশীল। এই প্রচেষ্টার প্রধান কারণ অবশ্য ছিল বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। বণিক্‌জাতি অবাধ বাণিজ্য ও দেশীয় ধন-সম্পদের নির্বাধ ভোগাধিকারই একান্ত ভাবে কামনা করেছিল। এই কারণে দেশীয় ধর্মাদর্শ, সামাজিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদির প্রচলিত ধারাকে ক্ষুণ্ণ করে অকারণ অশান্তি সৃষ্টি করতে তাঁরা মোটেই রাজি ছিলেন না। ভূম্যধিকার-ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আইনের ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শকে একমাত্র মূল্য দেওয়া হয়েছিল। তাই, ওআরেন্ হেস্‌টিংস্-এর সময় থেকেই ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এ-দেশীয় ভাষা-শিক্ষা ও দেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ রচনার প্রতি ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল। কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে এই চেষ্টা সুনিয়মিত ও ব্যাপকতর হয়। এ-সকল তথ্য পূর্ববর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু অনুভব করব, যে-সব ইংরেজ কর্মী এই রাজকীয় প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের সহজ জ্ঞান-তপস্যা এদেশের সংস্কৃতি ও জীবন-জিজ্ঞাসামূলক গ্রন্থাদির অনুসরণে প্রয়োজনের সীমাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে ছিল। বস্তুতঃ ইংরেজ-সংসর্গের একেবারে প্রথম পর্যায়েই অনুরূপ জ্ঞান-যোগীর পরিচয় এদেশে একেবারে দুর্লভ ছিল না। জে মার্শাল নামে কাশিমবাজার কুঠির একজন ইংরেজ কর্মী ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের চর্চা সুরু করে 'শ্রীমদ্‌ভাগবতের' অনুবাদ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় করেছিলেন।[১] সেই একক প্রচেষ্টা হেস্‌টিংস্-কর্ণওয়ালিসের যুগে বহুধাব্যাপ্ত হয়েছিল এবং "সার উইলিয়ম জোন্‌সের সময় হইতে ভারত-প্রবাসী ইংরেজদিগের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা করা একটা বাতিক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম লাভের একটা প্রধান উপায়-স্বরূপ ছিল। এই কারণে অল্প বা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত জানা সে সময়কার ভদ্র ইংরেজদিগের একটা ফ্যাসানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[২] কিন্তু এই 'ফ্যাসান'ই কয়েকজন নিষ্ঠাবান প্রতিভা-ধরের সাধনায় গভীরতর ফল-প্রসূ হয়েছিল। এ সময়কার অনেক ইংরেজ অনুসন্ধিৎসুর প্রচেষ্টার ফলে আর্য দর্শন-কাব্যাদি কেবল ইংরেজিতে আলোচিত হয়নি, সেই সূত্রে বাঙালি শিক্ষিতের কাছে নূতন করে, নূতন মূল্যে হয়েছিল উদ্ভাসিত। ক্রমে দেশে-বিদেশে প্রাচ্য জ্ঞান-সম্পদ ইংরেজ শিক্ষিতজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে এই সব

Indologist ইংরেজ পণ্ডিতগণ

১। B. M. Hall-এর প্রবন্ধ—বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ডে (সজনীকান্ত দাস প্রণীত) উদ্ধৃত।
২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

শ্রদ্ধান্বিত ইংরেজদের প্রচেষ্টাই বারাণসী ও কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলেছিল।

পরবর্তী কালে এই শ্রদ্ধা-সন্নত-চিত্ততাই বাঙালি ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে তাঁদের চেতনাকে জাতীয় সংস্কৃতির অভিমুখী করেছিল। উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের সার্থকতার মূলে আছে প্রতীচ্য

এবং বাঙালি রেনেসাঁস

শিক্ষার প্রভাবে প্রমুক্ত-চিত্ত সামাজিক সাধারণের দ্বারা ভারতীয় জীবনাদর্শের পুনর্মূল্যায়ন। রামমোহন রায়ের মধ্যে এই চেষ্টার সূচনা। আমাদের ধারণা, রামমোহন-চেতনার উদার মানবিকতাবোধ, প্রচণ্ড সংস্কার-বিরোধিতা, এবং সূক্ষ্ম ও শালীন বিচারশীলতা তাঁর ইংরেজি শিক্ষার একমাত্র ফল নয়, ভারতবর্ষীয় শাস্ত্র-চিন্তার প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধাটুকু সমকালীন ইংরেজ-সান্নিধ্যেরই দান।

সত্য বটে, রামমোহন এদেশের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পরিবর্ধিতও হয়েছিলেন। কিন্তু, ব্রাহ্মণ্যের সেই জীর্ণ খোলস তাঁর কাছে দুঃসহ হয়েছিল। রামমোহন বিদ্রোহ করেছিলেন,—

"Rammohan Roy . . although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system; and no sooner acquired a tolerable

রেনেসাঁসের বাঙালি সৈনিক রামমোহন

knowledge of English, then he made his desertion of idolworship known to the Christian world by his English publication — a remuneration that, I am sorry to say, brought servere difficulties upon him, by exciting the displeasure of his parents, and subjecting him to the dislike of his near, as well as distant relations, and to the hatred of nearly all his country men for several years."১

এটুকু রামমোহনের নিজের দেওয়া আত্ম-পরিচয়। প্রথম বয়সে বৈষয়িক উন্নতি কামনা করে তিনি আরবী-ফারসী অধ্যয়ন করেন। কিন্তু, প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর জ্ঞান-তপস্যা আলোচ্য ভাষা দু'টির চিন্তা-জগতের গভীরে প্রবেশ করেছিল। পরিদৃশ্যমান হিন্দু আচার-আচরণীয়তার প্রতি সহজ বিমুখতার সংগে নূতন ভাষা-সাহিত্য-চিন্তার সান্নিধ্য রামমোহনকে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে করি। পরে, ইংরেজি জ্ঞান-লোকের স্পর্শে সে প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়েছিল। তখনো রামমোহন হিন্দু জ্ঞান-মনীষার প্রতি সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব করেননি। বাল্যবয়সে তিনি বারাণসীতে হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন কি না, সে

১। 'An Appeal to the Christian Public'—ভূমিকা। রামমোহন রায় প্রণীত।

বিতর্কমূলক জিজ্ঞাসায় প্রবেশ করা বর্তমান প্রসংগে অপরিহার্য নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান-সাধনার প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির প্রকাশ রামমোহনের কলকাতা বাসের আগে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। এ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"রংপুরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী আসিয়া উপস্থিত হন এবং (অন্ততঃ জানুয়ারী ১৮১২ হইতে) কয়েক বৎসর রামমোহনের নিকটই অবস্থান করেন। রংপুরে ডিগ্‌বীর সাহচর্যে রামমোহন যেমন ভাল করিয়া ইংরেজি শিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার তীর্থস্বামীর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেন।"১ আমাদের ধারণা, যুগপৎ ইংরেজি ও দেশীয় শিক্ষার সম্মিলিত প্রভাবই সংস্কারক রামমোহনের প্রতিভাকে গড়ে তুলেছিল। এই প্রতিভার স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছিল ইংরেজি বিচার-বুদ্ধির সংগে ভারতীয় নিষ্ঠার সংমিশ্রণে। বিদ্যাসাগর ছিলেন এর ঠিক বিপরীত; নিষ্ঠা-প্রত্যয়ের সংগে তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছিল ইংরেজের প্রখর বিচার-বোধ। এ যুগের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিও তাই এই সম্মিলন-সাধনা প্রচেষ্টার ইতিহাস।

বাঙালি সংস্কৃতি-সাধনায় ত্রয়ী

য়ুরোপীয় চেতনার প্রাণস্পর্শে ভারতবর্ষীয়তার নব-সঞ্জীবনই উনিশ শতকীয় সমাজ-বিপ্লবের যথার্থ স্বরূপ। ডিরোজিও'র মধ্যে সেই প্রাণস্পর্শ পেয়েছিল বাংলার প্রথম তরুণ দল,—রামমোহন রায় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন নিখিল বাংলার নবসঞ্জীবন-মন্ত্র। এই প্রতিভার ত্রিবেণী তীর্থে বাংলার সর্বজনীন শিক্ষিত নাগরিক চেতনা যেদিন পুণ্য-স্নান করে উঠল, সেইদিন বাংলা সাহিত্যের ঘটেছিল কৈশোর-বন্ধন মুক্তি। বারে বারে বলেছি, সেই সাধনা সার্থক হয়েছিল মধুসূদনে; এ-যুগে সেই প্রয়াস কেবল সুরু হয়েছে নূতন শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে। সে দায়িত্ব প্রথমে স্বীকার করেছিল হিন্দু-কলেজ; তারপর ক্রমেই এদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। মহানগরীতে, মফঃস্বলে নিত্যনূতন স্কুল-কলেজ গড়ে উঠেছে,—স্ত্রী-শিক্ষা ব্যাপ্ত হয়েছে, শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য গেছে বেড়ে। স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, বেথুন সোসাইটির মত বহু শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান ক্রমেই সমৃদ্ধি লাভ করেছে। জন-শিক্ষার সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে দেশীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার নতুন প্রয়াস। সে এক মহা প্রস্তুতির যুগঃ—জাতীয় জীবনের নব-শিক্ষার যুগও বলতে পারি।—সর্বত্রই নবীনের সংগে প্রাচীনের, বিদেশের সংগে স্বদেশের রাখি-বন্ধনের প্রচেষ্টা।

এযুগে কালজয়ী শিল্প সৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়;—কিন্তু সেই

১। রামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

সৃষ্টির ইমারত গড়ে উঠেছে ঃ—বিদ্যাসাগরের হাতে গদ্য সাহিত্য পেয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো, 'প্রভাকরের' ঈশ্বর-গুপ্ত ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি নূতন মমতা জাগিয়েছেন,—সেই সংগে কাব্য-সাহিত্যের সৃজন-লোকে আহ্বান করেছেন নবীন প্রতিভাকে। জাতীয় সংস্কৃতি-সাধকের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, শিক্ষিত, সম্পন্ন নাগরিকবৃন্দ, জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তির জন্য রচনা করেছেন জাতীয় নাট্যশালা,—সমগ্রজাতির প্রস্তুতির সাড়া পড়েছে নাট্য সাহিত্যের যৌথ শিল্প-কলাকে আশ্রয় করে।

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

এযুগ, সত্যই বাংলার নবজাগরণের ত্রিবেণী তীর্থ,—এর মূলে রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা-ত্রয়ীর সাধন-প্রভাব, এর সাহিত্যিক বিকাশও মূলতঃ ত্রিধারায়;—(১) গদ্য, (২) পদ্য, এবং (৩) নাট্যকলার মাধ্যমে।

বাংলা সাহিত্যের ত্রিধারা

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষাগারের পৃষ্ঠপোষণে বাংলা গদ্য

আধুনিকতার প্রস্তুতি-পথে গদ্য-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশকে নবীন দৃষ্টি-ভংগীর একটি বহিরংগ লক্ষণ বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাহিত্য-শিল্প যতই একালের অভিমুখী হয়েছে, ততই সে হতে আরম্ভ করেছে প্রত্যক্ষ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী; পদ্যের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও বাহুল্যকে ছেড়ে সে ক্রমেই যথোচিত, যথা-পরিমিত এবং যথাযথ গদ্যের ভাষা-অবয়বকে আশ্রয় করেছে। আধুনিক মননের শ্রেষ্ঠ মুক্তি গদ্য সাহিত্যের অজস্রতার মধ্যে নয়, পদ্যের-ও গদ্যায়নে ঃ—গদ্য কবিতার সার্থক সৃজনে। কোনোরকম আলংকারিক বিতর্কে প্রবেশ না করেও কেবল রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাবলীর সাহায্যে এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হতে বাধা নেই। আর, বাংলা ভাষায় এই গদ্য-ব্যবহার-প্রবণতার প্রথম সার্থক পথিকৃৎ উনিশ শতকের নব-প্রবুদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষালয়। বস্তুতঃ, বাংলা গদ্যের প্রথম ঐতিহাসিক পর্যায়কে 'শিক্ষায়তনের যুগ' বল্‌তে বাধা নেই।

বাংলা গদ্যের গঠনে শিক্ষাগার

বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার যে আদিমতম নিদর্শন এ পর্যন্ত দেখেছি, তাতে একটি আদর্শ লিখ্য ভাষার উপযোগী শৃঙ্খলার অভাব একান্ত প্রকট ছিল। প্রয়োজনের অপরিহার্যতাকে উপলক্ষ্য করেই সেদিন নানা জনে নানা

কারণে বাংলা গদ্যের বহিরবয়বকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু কোনো পক্ষের প্রচেষ্টার মধ্যেই ভাষার মূল কাঠামোটিকে পূর্ণায়ত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। কোন রকমে বক্তব্যকে বোধগম্য করে তোলাই ছিল প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। পর্তুগীজদের আওতায় প্রস্তুত ব্যাকরণ-স্বজাতীয় বাংলা রচয়িতাদের কাছে বাংলা ভাষাকে বোধগম্য করার কৌশল-টুকুই তুলে ধরতে চেয়েছিল। পরবর্তী ইংরেজ ব্যাকরণকারদের প্রয়াস ব্যাপকতর হলেও, মূলতঃ পূর্বাদর্শ থেকে পৃথক্ নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রচেষ্টা এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচিত্র ভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রথম পরোক্ষ কারণ হয়েছিল, প্রত্যক্ষ ভাবে সুষ্ঠু বাংলা গদ্য-রীতি রচনারও পথে হয়েছিল অনেকদূর অগ্রসর। এই কারণেই বাংলা গদ্যের আলোচ্য বিকাশ-যুগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস পৃথক্ ও একক বিচারের দাবি রাখে।

গদ্যের লিখ্যরূপ

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে 'গভর্ণর জেনারেল্'-এর প্রচারিত নির্দেশ থেকে জানা যায়,—স্বদেশ ('Home') থেকে আগত 'সিভিলিয়ান্'দের এদেশীয় কর্মক্ষেত্রের ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষিত করে তোলাই ছিল ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। বিদেশীয় শাসকদের পক্ষে শাসিতের ভাষাসাহিত্য শিক্ষার মান বিষয়েও এই নির্দেশে সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল ঃ—

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

"This education must be founded in a general knowledge of the branches of the literature and science which form the basis of the education of persons destined to similar occupation in Europe."১

এই ভিত্তিকে আশ্রয় করে এ দেশীয় ভাষা, ইতিহাস, আচার-আচরণাদির জ্ঞানার্জনও ফোর্টউইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল।

এই মহৎ উদ্দেশ্য কি পরিমাণে বাস্তব সার্থকতা লাভ করেছিল, তার বহু কৌতুকজনক পরিচয় আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সে ইতিহাস আলোচনা অপরিহার্য নয়। কিন্তু, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণ ব্যবস্থাকে উপলক্ষ্য করে বাংলা গদ্য ভাষা সত্যই উল্লেখ্য সম্পন্নতা অর্জন করেছিল;—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর, সেটুকু সম্ভব হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-সংস্কৃত ভাষার অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরির ক্লান্তিহীন মৌলিক চেষ্টার ফলে।

কেরির জীবন বৃত্তান্ত, এবং শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মোদ্যমের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি

১ Governor general's minute, Dt. 18th August, 1800.

প্রথম যোগ দেন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষকরূপে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলোচ্য বিষয়ের অধ্যাপক,—তথা সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কেরির পরবর্তী কর্ম-প্রচেষ্টার যথোচিত মূল্য নির্ণয়ের জন্যও একথা স্মরণীয় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার সংগে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি;—তার কারণ ছিল পঠিতব্য পুস্তকের অভাব। তাই, বাংলা বিভাগের শিক্ষকরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দিয়ে কেরির প্রথম কাজ হয়েছিল পাঠ্যতালিকা নির্ণয়, অথবা পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন করা নয়;—পঠিতব্য পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করা। এদিক থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও কেরিকে সুশৃংখল বাংলা গদ্যের পথিকৃৎরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

উইলিয়ম কেরি

কেরির নিজস্ব বাংলা রচনার গুণগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের কর্ণধার কেরি একটি ব্যক্তিমাত্র নন,—তিনি একটি প্রতিষ্ঠান;—একটি বিশেষ লেখক গোষ্ঠীর নিয়ামক এবং পরিচালক। ফোর্ট উইলিয়ম যুগের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বারে বারেই বলেছি,—এই পর্যায়ে বাংলা গদ্য-রচনায় প্রথম শৃঙ্খলাবোধ সূচিত হয়। মুখের কথা মুহূর্তের প্রয়োজনকে চরিতার্থ করেই নিঃশেষিত;—লেখার ভাষা কালজয়ী স্থায়িত্ব দাবি করে। বাংলাভাষার কাঠামোকে সেই স্থায়িত্বের অভিমুখে,—সর্বজনীনতা ও সর্বকালিকতার পথে সচেতন ভাবে পরিচালিত করেছিলেন কেরি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেবার প্রথম বছরেই সম্পাদিত 'কথোপকথন' বা 'Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় কেরি লিখেছিলেন,—

"The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspecuity, has induced me to compile this small work ; and to undertake the publishing of two or three more, principally Translations from Sangskrito. These will form a regular series of books in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language."

স্পষ্টই দেখছি বাংলাভাষার চর্চার যথোচিত প্রকর্ষ (Proper Cultivaction)-এর জন্য কেরি প্রথম কথ্যভাষার অমিশ্র রূপটিকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব রীতি ও গঠন-স্বভাব (Style

& diction) আছে; গদ্যের বেলায় ভাষার সে স্বকীয়তা গড়ে ওঠে ভাষা-ভাষীদের বাক্-স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে। কেরি কথোপকথনের মাধ্যমে বাংলা-গদ্যের সেই মৌল স্বভাবটিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তারই কাঠামোকে আশ্রয় করে অপরিচিত পাঠকের অগ্রসৃতির জন্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ-ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনি করে, কেরি বিদেশী পাঠককেই নয়, বাংলা গদ্যভাষাকেও "Higher classical works" আয়ত্ত করার পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন।

কেরির প্রচেষ্টার মধ্যে গদ্য-রচনার আদর্শ এবং উদ্দেশ্যগত একটি স্পষ্টতাও ছিল। ভিন্ন ভাষা-ভাষীকে কোনো ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য ভাষা রচনায় যে প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা ও সুপরিকল্পনা প্রয়োজন, তিনি যে সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন,—ওপরের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। কেরি নিজে কতটুকু কি লিখেছিলেন সে বিষয়ে আজ সংশয় আছে। কিন্তু এ দেশীয় বিভিন্ন রচয়িতা মুন্সী পণ্ডিতদের ভাষা-সৃষ্টি যে পরিমাণে কেরির আদর্শ-বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল,—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গদ্য-রচনার ঐতিহাসিক সিদ্ধি ঠিক ততখানিই।

রামরাম বসু

এই বিচারে মুন্সী রামরাম বসু কালানুপাতে প্রথম হলেও,—গদ্য-রচনার কৃতিত্বানুসারে প্রধান উল্লেখ্য ব্যক্তি নন। রামরাম বসুর ভূমিকা লেখক অপেক্ষা বাংলাভাষার শিক্ষক হিসেবেই অধিক স্মরণীয় বলে মনে করি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—"আনুমানিক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ধরিয়া লইবার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে।"[১] চুচুঁড়ায় রামরাম বসুর জন্ম হয় এবং তিনি চব্বিশ পরগণার নিমতা গ্রামে শিক্ষিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক চিঠিতে রামরাম বসু নিজে জানিয়েছেন,—শ্রীরামপুরের কাছে রিস্ড়ায় তখন তাঁর বাস ছিল।[২]

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রামবসুকে প্রথম কর্মতৎপর দেখি ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি জন্ টমাসের বাংলা শিক্ষক হিসেবে। একাজের জন্য সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্স তাঁর নাম সুপারিশ করেছিলেন। রামবসু নিজেও ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মনে করতে বাধা নেই, ফার্সী জ্ঞানের সাধারণ সূত্র অবলম্বন করে রামবসু চেমবার্স-এর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। টমাসের পরে রামবসুর প্রখ্যাত ছাত্র হলেন উইলিয়ম কেরি। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্বদেশ থেকে কল্কাতায় পৌঁছেই কেরি রামবসুকে মুন্সী হিসাবে গ্রহণ করেন।

---

১ রামরাম বসু—সাহিত্যসাধক চরিতমালা।

২। দ্রষ্টব্য—ঐ।

টমাস্‌কে বাংলা শিক্ষাদান ব্যাপারে রামবসু নিজেও উপকৃত হয়েছিলেন। ইংরেজ সান্নিধ্যে তিনি ইংরেজি ভাষায় কথোপকথনে আপন অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। রামবসু ইংরেজি লিখতে জান্‌তেন না, কিন্তু পরবর্তী ইংরেজগণ তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। টমাসের আশ্রয়েই এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল, এমন কথা মনে করবার মত নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কিন্তু, এখানেই যে তাঁর ইংরেজি জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়, তাতে সংশয় নেই;—সেই সংগে রামবসুর মধ্যে দেখা দিয়েছিল প্রবল খ্রীষ্টভক্তি। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি খ্রীষ্ট-স্তোত্র রচনা করেন,—অনুরূপ রচনার ইতিহাসে এটি হচ্ছে

"The first ever seen or heard of in the Bengalese language."

রামবসুর গদ্য-রচনার তুলনায় তাঁর পদ্য-কৃতি নিতান্ত কম নয়। পরবর্তী কালে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "দুইটি ইংরেজি খ্রীষ্ট-সংগীত বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।"[১] পরে রামবসু "খ্রীষ্ট বিবরণামৃতং" নাম দিয়ে একখানি খ্রীষ্ট-চরিত কাব্য গ্রন্থিকা রচনা করেন। টমাসের সংগে প্রথম সান্নিধ্যের কালে রামবসু খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন;—অন্ততঃ টমাস তাই মনে করেছিলেন। পরে তিনি সে ইচ্ছা পরিহার করেছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট-কৃপার প্রতি শেষ পর্যন্ত তাঁর ভরসা প্রবল ছিল।

রামরামের পদ্য রচনা

রামবসুর কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্‌সী বা সহকারী পণ্ডিতরূপে! এই পদে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৪০্। এখানেই বিভাগীয় প্রয়োজনে, পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তাঁর প্রথম গদ্য গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" রচিত হয়। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র গ্রন্থকর্তা হিসাবে রামবসু ঐতিহাসিক কীর্তির অধিকারী হয়েছেন,—কারণ এইটিই "বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙালি-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য-গ্রন্থ।"[২] রামবসুর এই খ্যাতি মূলতঃ যতটা কালের হাতের দান,—ততটা তাঁর স্বোপার্জিত নয়। একই সময়ে কেরির পরিচালনায় একাধিক মুন্‌সী 'কথোপকথনে'র প্রস্তুতির জন্য পরিশ্রম করছিলেন; ঐ একই বৎসরে তা প্রকাশিতও হয়েছিল। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রথম প্রকাশিত গদ্য-গ্রন্থ—এটি একটি গতানুগতিক ঘটনামাত্র। নইলে, বিদেশি ছাত্রের জন্য পাঠ্য পুস্তকের লেখক, বা প্রথম ভাষাগ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে যথেষ্ট দায়িত্ববোধের পরিচয় তিনি দিতে পারেননি বলেই মনে করি।

প্রতাপাদিত্য চরিত্র

বর্তমান আলোচনার আরম্ভে দেখেছি,—কেরি তাঁর দায়িত্ব এবং পদ-

১। ঐ।
২। ঐ।

মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন;—বিদেশীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষণ এবং ভাষার প্রকর্ষ বিধান সম্বন্ধে প্রথমাবধিই তিনি ছিলেন অবহিত। অপর পক্ষে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার একই সময়ে তাঁর বত্রিশ সিংহাসন রচনা করে সম পরিমাণ দায়িত্ববোধ ও ততোধিক ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু তাতে যে প্রসাদগুণ, যে প্রাঞ্জলতা ও স্বচ্ছতা আছে, রামবসু তা কল্পনাও করতে পারতেন না। কোন বিদেশীয়ের কাছে নিজের ভাষা-সাহিত্যকে গ্রহণীয় করে তোলার প্রয়াসে ব্যক্তিগত দায়িত্বের সংগে জাতীয় মর্যাদাবোধও যুক্ত থাকা উচিত। দেশীয় ভাষা-সাহিত্যের পরিচায়ন উপলক্ষ্যে বিদেশী ভাষায় লেখা কোনো কোনো গ্রন্থে একালের পণ্ডিতরাও অনেক সময়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকেন নি;—দুঃখের কথা;—রামরাম বসুও তা ছিলেন না। রামরাম বসুর জীবনে অন্যান্য বহু দুর্বলতার সংগে অর্থলোলুপতাও প্রবল ছিল। "খ্রীষ্টধর্ম-স্বীকারের লোভ দেখাইয়া তিনি বারম্বার পাদ্রিদের নিকট টাকা খাইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনার পৈত্রিক ধর্ম বজায় রাখিয়াই গিয়াছেন।......জন্ টমাসের উন্মাদ হইবার অন্যতম কারণ রামরাম বসুর প্রতারণা।"১ আমাদের ধারণা, এই ব্যাপারেও দ্রুত অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশাই রামবসুকে যে-কোনো প্রকারে অতিদ্রুত গ্রন্থ-সমাপ্তির পথে উৎসাহিত করেছিল। 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র একেবারে প্রারম্ভেই লেখক-মানসের ত্বরিত-গতিজনিত শৃঙ্খলা-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

"যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ, তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বংগ ও বিহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদশাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহৎ গোষ্ঠি তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর বিস্তর ঝকড়া-লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল।"

বাংলা-সংস্কৃত-আরবী-ফারসী বিমিশ্র এই ভাষার শব্দ-চয়ন এবং প্রয়োগে কোনো রকমের শৃঙ্খলাবোধই লেখকের পক্ষে অপরিহার্য মনে হয়নি। বাক্যের সুসংগঠন, এমন কি সাধারণ অন্বয়েও যে ত্রুটি আছে, উদ্ধৃত অংশটি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলা হয়ে থাকে, প্রথম ভাষাকৃৎ-এর পক্ষে এ ধরণের ত্রুটি স্বাভাবিক ছিল। স্বাভাবিকতার মাত্রাবোধ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক্ হতে পারে, কিন্তু 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র ভাষার বিশৃঙ্খলা যে সে-কালেও অনতিক্রম্য ছিল না, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাই নয়, আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা-সৃষ্টিতে রামরাম বসুর দায়িত্ব-বোধের অভাব সম্বন্ধে গভীরতর প্রমাণও আছে,— একটি মাত্র উদ্ধার করছি।

১। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—সজনীকান্ত দাস।

"দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিন্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল। অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন, পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিন্ধিত চিল্ল পক্ষি।"

আলোচ্য গ্রন্থ রচনাকালে সংস্কৃত ভাষায় রামরাম বসুর যথোচিত ব্যুৎপত্তি ছিল না। অথচ, তাঁর পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ পণ্ডিতগণ প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন যে,—"The Bengali is the purest of those languages which are derived from Sanskrit."১ প্রভুদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যই হয়ত রামরাম বসু আরবী-ফারসীর পাশে যথেষ্ট পরিমাণ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন; এবং তার অনেক কয়টিই ভ্রম-মুক্ত নয়। 'চিল্লপক্ষি **তিরেতে বিন্ধিত**' হতে যদি আপত্তি না-ও থাকে; তবু গা-মোছা'র অর্থে '**গাত্রমোচন**' শব্দের কাল্পনিক সৃষ্টি যে-কোন ভাষা স্রষ্টার পক্ষেই শ্লাঘ্য নয়। বিশেষ করে, মনে রাখতে হবে, রামরাম বসু ছিলেন 'শিক্ষক-লেখক'—বিদেশী ছাত্রদের এই ধরণের বাংলা শব্দের প্রয়োগ তিনি শেখাতে চেয়েছিলেন। যে-কোন লেখকের পক্ষে, এমন কি গদ্যভাষার প্রথম মৌলিক মুদ্রিত গ্রন্থের লেখকের পক্ষেও এ ধরণের চেষ্টা জাতীয় মর্যাদা-বোধেরই অভাব সূচিত করে।

রামরাম বসুর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা, ক্ষমতার অভাব তাঁর কখনো ছিল না,—যা ছিল, তা হচ্ছে স্পষ্ট নীতিজ্ঞান ও কর্তব্যবোধের অভাব। ব্যক্তি-জীবনের মত বৌদ্ধিক জীবনেও এই অভাবই তাঁর সকল দীনতার একমাত্র কারণ। নইলে, তিনি যে একজন সাধারণেতর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, ("Person of more than ordinary capacity"—টমাস।) তাতে সন্দেহ নেই। এই অসাধারণ ক্ষমতার প্রথম প্রকাশ দেখেছি, তাঁর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র বিষয় গ্রন্থনে, দ্বিতীয় প্রকাশ তাঁর 'লিপিমালা' গ্রন্থের ভাষা-রচনায়।

'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র ভূমিকায় রামবসু নিজে প্রতাপাদিত্যের উত্তরাধিকার দাবী করেছিলেন। "আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি।" তাই 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' রচনায় গ্রন্থ বিষয়ের প্রতি লেখকের স্বাভাবিক মমতা ছিল। একই ভূমিকায় লেখক গ্রন্থের বিষয়সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, ফারসী ভাষায় প্রচলিত নানা আখ্যায়িকার সংগে বংশানুক্রমে প্রচলিত কিংবদন্তী যোগ করে তিনি প্রতাপাদিত্যের আলোচ্য ইতিহাসখানি রচনা করেছিলেন। এদিক থেকে রামরাম বসু মৌলিক সৃজন কর্মের দাবী করতে পারেন। আর, ভাল বাংলা লিখতে না জানলেও, জীবনকে,—বা ইতিহাসকে দেখবার সার্থক ক্ষমতা যে তাঁর ছিল, এমন একাধিক প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে

১। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাৎসরিক সভায় ছাত্রদের বিতর্ক-বিষয়।

রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ; 'ধূমঘাট পুরীর' বর্ণনা উল্লেখ করতে পারি। ভাষার বাধা উপেক্ষা করে একবার আলোচ্য বর্ণনাংশে প্রবেশ করতে পারলে মনে হয়,—ত্রুটিহীন পুংখানুপুংখতা ও অসীম বিস্ময় নিয়ে ইতিহাসের ঐশ্বর্যময় মণিকোঠা যেন আয়ত্তে এসে পেঁাচেছে।

রামরাম বসুর সৌন্দর্য দর্শন ক্ষমতার দ্বিতীয় নিদর্শন লিপিমালা। গ্রন্থখানি ১৮০২ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে, বিদেশী শাসক গোষ্ঠীকে দেশী ভাষা ও আচরণাদি শিক্ষায় অভিজ্ঞ করে তোলার জন্যই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। 'লিপিমালা' কতকগুলি আদর্শ পত্রের সমষ্টি এবং তা দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে রাজকীয় বিভিন্ন পর্যায়ে পত্রাদি বিনিময়ের আদর্শ 'মান' প্রদর্শিত হয়েছে,—

লিপিমালা

রাজা রাজাকে, অথবা রাজা তাঁর পার্ষদগণকে কি করে পত্র লিখ্তেন, তারই নানা বিষয়ক বিচিত্র নমুনা রয়েছে চিঠি ক'খানিতে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সামাজিক পর্যায়ে "সমান সমানকে, গুরু লঘুকে এবং লঘু গুরুকে, প্রভু কর্মকরকে" ইত্যাদি বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পত্র। এই পত্রাবলী রচনায় রামরাম বসু 'আরবী-ফারসী' শব্দের প্রতি ঐকান্তিক প্রবণতা প্রায় একেবারেই ত্যাগ করেছেন। তৎসম ও তদ্ভব শব্দাবলী প্রয়োগের সৌষ্ঠব পূর্বগ্রন্থের তুলনায় কল্পনাতীত। বাক্যগঠন রীতিতেও বিশেষ দক্ষতা লক্ষ্য করার মত। বাক্যের অন্তর্বর্তী অন্বয় আনুপূর্বিক না হলেও, ভাষার মোটামুটি কাঠামোটি প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়েছে ঃ—

"মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা। মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে। তাহার নাম সতী। দক্ষ মহাব্যক্তি। প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র শিব তাহার জামাতা বটে। কিন্তু তিনি অনাদি। কত কোটি ব্রহ্মা ইহার আজ্ঞাবহ।—"

ওপরের ছেদ চিহ্ন ক'টি আমাদের ব্যবহৃত। তাতেই বোঝা যাবে লিপিমালার বাক্যান্বয় কত সুগঠিত। শব্দ-সম্ভারের বিশুদ্ধি ও সুপ্রয়োগ-ও লক্ষ্য করবার মত। এই অ-পূর্ব দক্ষতার কারণ হিসেবে শ্রীসজনীকান্ত দাস রামরাম বসু কর্তৃক মত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনের' ভাবাদর্শ অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন।১ এই অনুসৃতির উল্লেখে রামরাম বসুর প্রতিভার প্রতি অমর্যাদা করা হয় না; বরং তাঁর প্রতিভার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। রামরাম বসু স্বাধীনভাবে ভাষা রচনায় উল্লেখযোগ্য দক্ষতা যদি প্রকাশ না'ও করে থাকেন, তবু আদর্শ ভাষার প্রথম কাঠামোটিকে প্রত্যক্ষ মাত্র করে নিজের 'দ্বিতীয় স্বভাব'রূপ দীর্ঘদিনের অভ্যাসকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছিলেন।

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

এই আত্মজয় দুর্লভ প্রতিভা ও শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। 'কথোপকথনের' ভাব-ভিত্তিও রামরাম বসুর রচনাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করার পথে সহায়ক হয়েছিল কিনা একথাও ভেবে দেখ্‌বার মত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থটি 'কথোপকথন'—প্রকাশ কাল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থটি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রচলিত ধারণা অনুসারে কেরি'ই এই গ্রন্থের প্রণেতা। কিন্তু ভূমিকায় কেরি নিজে লিখেছেন "....I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature...." পরবর্তী অংশেও তিনি নিজের জন্য কেবল 'compile' করার দায়িত্বটুকুই দাবি করেছেন। তাহলেও আলোচ্য গ্রন্থের উৎকৃষ্ট মান-রচনায় কেরির দক্ষতা যে সমধিক ছিল, সে কথা বলেছি। তাছাড়া বাংলার গার্হস্থ্য-অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচায়নের আকাঙ্ক্ষা-ও তিনি ভূমিকায় প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুতঃ "কথোপকথনগুলি তৎকালে কলিকাতা শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম আচারব্যবহার লইয়া রচিত হইয়াছিল।"১ তা সত্ত্বেও কথোপকথনের ভাষা মূলতঃ কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মৌখিক আদর্শ অনুসরণ করেছে; —এই অর্থে কথোপকথনের ভাষা চলিত বাংলারীতির পথ-নির্দেশের দাবী করতে পারে। গ্রন্থের বিচিত্র বিষয় থেকে এর রীতি-প্রাঞ্জলতার নিদর্শন দিচ্ছি:—

'কথোপকথন'

"তোমরা কয় যা।

"আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে।

"কেমন যায় যায় ভাব আছে, কি কালের মত।

"আহা ঠাকুরাণী, আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড় আমাকে তাহারা অমুক-বুদ্ধিও করে না।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং কেরির নামে প্রচলিত দ্বিতীয় গ্রন্থ "ইতিহাস মালা" প্রকাশিত হয় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটিও কেরির রচনা নয়, সম্পাদনা মাত্র; এই ধারণা অধুনা অনেকাংশে প্রচলিত আছে। দেশী ও বিদেশী ভাষার নানা রকমের প্রায় ১৫টি গল্প গ্রন্থটির বিষয় বস্তু। 'কথোপকথন' যেমন কথ্য ঢং-এ লেখা, তেমনি 'ইতিহাসমালা'র ভাষা স্বচ্ছ-প্রাঞ্জল সাধু গদ্যের নিদর্শন:—"একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সে স্থানে এক ব্যাঘ্র ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।"

ইতিহাস মালা

১। ঐ।

এ ভাষার নিখুঁত অন্বয়-সৌষ্ঠব লক্ষ্য করবার মত ঃ—ওপরের অংশে বাংলা গদ্যের একটি ত্রুটিহীন নিদর্শন দেখ্‌তে পাই। ডঃ সুশীল কুমার দে গ্রন্থটির এই অতুলনীয় সার্থকতার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন,—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা-গদ্যের গঠনভঙ্গি নিয়ে প্রায় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিল, তারই পরিণত সুফল নিয়ে দেখা দিয়েছিল এই গ্রন্থের ভাষা।১ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলাগদ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ; এই যুগ-পরিণতির মুখে সার্থক সিদ্ধির প্রমাণ দাঁড়িয়ে আছে—'ইতিহাস মালা'র গদ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন',—লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যতদূর জানা গেছে, আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভদ্রক'-এ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-বংশে-মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম হয়; ভদ্রক এখন উড়িষ্যার অন্তর্গত, তখন হয়ত মেদিনীপুরে অবস্থিত ছিল। নাটোর রাজপণ্ডিতের কাছে তিনি শিক্ষিত হয়েছিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ২০০ বেতনে কেরির অধীনে তিনি বাংলার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে মৃত্যুঞ্জয় চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন ঃ—(১) বত্রিশ সিংহাসন ১৮০২ খ্রীঃ, (২) হিতোপদেশ—১৮০৮ খ্রীঃ, (৩) রাজাবলি—১৮০৮ খ্রীঃ এবং (৪) প্রবোধ চন্দ্রিকা—১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হলেও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকে শ্রীসজনীকান্ত দাস একজন যথার্থ 'শিল্পী' বলে অভিহিত করেছেন ঃ—সংশয় নেই, অন্ততঃ গদ্য রচনার ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় কেবল ভাষাবিৎই ছিলেন না—ছিলেন সার্থক ভাষা-শিল্পি-ও। বহুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক ভাষা সৃষ্টির পথ নির্দেশ করে লিখেছিলেন,—"দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার-রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমী ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।২

১। 19th Century Bengali Literature.
২। বাঙালা ভাষা—বিবিধ প্রবন্ধ।

ভাষা রচনায় এই প্রয়োজন নির্ণয় ও প্রয়োজনানুসরণের ক্ষমতা শৈল্পিক দক্ষতার অপেক্ষা রাখে। উদ্ধৃত আলোচনায় নির্দেশিত মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রয়োজনানুগ ভাষা রচনায় তৎপর হয়েছিলেন, এবং যুগোপযোগী সার্থকতাও অর্জন করেছিলেন,—তাতে সংশয় নেই।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা নানা বিষয়িণী;—ভাষাও বহু বিচিত্র। 'বত্রিশ সিংহাসন' গল্প গ্রন্থ,—একই নামের সংস্কৃত 'মূলের' সহায়তায় লিখিত। সংস্কৃতানুযায়ী গ্রন্থ হলেও গল্প রচনার উপযোগী প্রাঞ্জল স্বচ্ছ, সরস ভাষা রচনায়, 'শিল্পী' মৃত্যুঞ্জয় এখানে উল্লেখ্য সার্থকতা অর্জন করেছেন:—"দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক সস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞ দত্ত। সেই কৃষক সস্যক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যূতী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানান জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন।"

বত্রিশ সিংহাসন

উদ্ধৃত অংশে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মত,—কিন্তু, গল্পের ভাষার পক্ষে তা দুঃসহ হয়নি। বাক্য কয়টির গঠনে রীতিগত ত্রুটিও আছে,—বাংলা বাক্যের কালানুগ অন্বয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাতে বাক্যের প্রাঞ্জলতা ও গাল্পিক কৌতূহল ক্ষুণ্ণ হয়নি। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য ত্রুটিমুক্ত না হলেও, ভাব-বিষয়ের সার্থক বাহন যে হয়েছে, তাতে সংশয়ের কারণ নেই। আর, ভাষা বিষয়ে কেবল এই পরিমিতি-বোধের জন্যই তিনি ভাষার শিল্পিত্ব দাবি করতে পারেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত 'হিতোপদেশে'র অনুবাদ। লেখক সংস্কৃত শ্লোকাবলীর যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদে প্রয়াসী হয়েছেন; ফলে বাক্যের বাংলা ভাষা-সমুচিত অন্বয় আরও আড়ষ্ট হয়েছে:—

'হিতোপদেশ'

"প্রাজ্ঞলোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক। আর যম কর্তৃক কেশে গৃহীতের মত হইয়া ধর্মাচরণ করিবেক। আর সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেহেতুক বিদ্যার সর্বকালে চৌরাদি দ্বারা অহরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব।"

মূলের সংগে অনূদিত অংশ মিলিয়ে দেখ্‌লেই মৃত্যুঞ্জয়ের আক্ষরিক অনুবাদ-চেষ্টার সার্থকতা প্রতিপন্ন হতে পারবে। আক্ষরিক অনুবাদের

প্রথম আদর্শটি মৃত্যুঞ্জয় সচেতনভাবে অনুসরণ করেছিলেন। মূল সংস্কৃতের শব্দধ্বনিই নয়,—গঠনভঙ্গীও তিনি আনুপূর্বিক অনুসরণের প্রয়াস করেছেন; আর, তাঁর সে চেষ্টা অসার্থক হয়নি। সে রচনা কেবল রীতি-বন্ধ বাংলা-ভাষা হয়ে ওঠে নি। যে-কোনো ভাষা রচনার পক্ষে ঐটিই অবশ্য প্রাথমিক প্রয়োজন। মৃত্যুঞ্জয়ের যুগে যে ভাষা সুগঠিত হয়ে ওঠে নি,—মৃত্যুঞ্জয় সেই অনাগত ভাষা-রীতিকে জন্ম দিতে পারেননি; —তার জন্য পূর্ণাবয়ব বাংলা গদ্য-রীতির জনক বিদ্যাসাগর-প্রতিভার আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয় অ-পূর্ণ গঠিত যে ভাষাকে পেয়েছিলেন, তারই স্থূল কাঠামোকে যথাসম্ভব গুছিয়ে নানা বিষয়িণী রচনার উপযুক্ত মাধ্যম করে তুল্‌তে চেয়েছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের এই প্রচেষ্টা যে পরিমাণে সার্থক, তাঁর ঐতিহাসিক কৃতিত্বও ঠিক ততখানি।

'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র অনেকাংশ মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনার পর্যায়ে পড়ে। প্রথম গ্রন্থের শীর্ষ-পত্র নিম্নরূপ;—"রাজাবলী। অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।" 'কলির প্রারম্ভ' অর্থে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-কথা নিয়ে কাহিনীর সুরু হয়েছে। গ্রন্থবিষয়ের আহরণে লেখক প্রধানতঃ, কিংবদন্তী ও লোক-প্রসিদ্ধির 'পরে নির্ভর করেছেন। রাজাবলির ভাষায় দেখি মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যের কাঠামোটিকে আরো সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করেছেন। গদ্যরীতির রচনাবিষয়ে লেখকের গুণাগুণ 'রাজাবলি'র ভাষা থেকেই বিচার্য বলে মনে করি। কারণ, এখানেই তিনি অন্য-ভাষার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রথম মৌলিক বিষয়ে রচনা করেছেন,—গদ্যরীতিকেও তাঁর আদর্শানুযায়ী বিশুদ্ধ বাংলারূপ দেবার প্রথম সুযোগ পেয়েছেন। বল্‌তে দ্বিধা নেই, —এই বিচারে মৃত্যুঞ্জয় পুরো নম্বর না পেলেও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে' উত্তীর্ণ হতে পারেনঃ—

রাজাবলি

"পূর্বে সূর্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে এক মহারাজ হইয়াছিলেন তিনি নৈমিষারণ্যে যখন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার পূর্ব কিছুদিন কোনই কারণেতে আপন পত্নী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন অতএব যজ্ঞকালে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন না এই প্রযুক্ত বশিষ্ঠ জাবালি প্রভৃতি মহামুনিরা রামচন্দ্রের স্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে এক স্বর্ণ প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছিলেন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের সর্বশেষ গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকার' ভাষার 'পরেই তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতির কারণ সমধিক নির্ভর করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হলেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খৃঃ। বর্তমানযুগে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা দুর্বোধ্য ও দুষ্পাঠ্য তৎসম-প্রাচুর্যের এক চরম নিদর্শন বলে কল্পিত হয়ে থাকে।

কিন্তু, এ ধারণা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র অংশ-বিশেষ সম্বন্ধেই সত্য; 'প্রবোধ-চন্দ্রিকার'-ও অপরাংশে পূর্বোদ্ধৃত সাবলীল 'মৃত্যুঞ্জয়ী' গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন লক্ষ করা চলে।

প্রবোধচন্দ্রিকা

ডঃ সুশীল কুমার দে গ্রন্থ নামের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন—"Moon light of Intelligence"১। মূল তৎসম শব্দটির ব্যুৎপত্তিই কেবল এতে নির্দেশিত হয় নি;—শব্দের অভীপ্সিত নিহিতার্থ-ও স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। নামের এই নিহিতার্থের মধ্যে-ই গ্রন্থ-বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। একালের পরিভাষানুযায়ী সাধারণ-জ্ঞান বিষয়ক (general knowledge) গ্রন্থ নামে 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'কে অভিহিত করলেই হয়ত যথেষ্ট হয় না, নানা-বিষয়ে অনেকটা পরিমাণে 'বিশেষিত জ্ঞান' পরিবেশন করাই বরং গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ছিল। চারটি 'স্তবকে' এবং নানা 'কুসুম'-এ বিভক্ত গ্রন্থটিতে অলংকার, ব্যাকরণ, ধ্বনি ও লিপিতত্ত্ব, আইন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্জ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের বিষয় ও ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই বুঝি,—সংস্কৃত শাস্ত্রের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাংলা গদ্যের কাঠামোর মধ্যে যেন উজাড় করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। কেরি 'কথোপকথনে'র ভূমিকায় "Higher Classical works in the language" বল্‌তে যা বুঝেছিলেন, বিষয় ও ভাষার বিচারে প্রবোধ-চন্দ্রিকা তারই একটি বাস্তব রূপ কিনা, আজ সে তথ্য কে জানাবে? অবশ্য মার্শম্যান-ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভূমিকায় লিখেছিলেন,"

"....any person who can comprehend the present work and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language."

"ভাষা প্রশংসা নাম প্রথম কুসুম"-তে মৃত্যুঞ্জয় ভাষার পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন,—"অনভিব্যক্তবর্ণা, ধ্বনিমাত্ররূপা, পরানাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব কুমারেরদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যন্তীনামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্তষৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালক-বাণী।"

উদ্ধৃত ভাষার সংস্কৃত-মূলকতা আতিশয্য-দুষ্ট, সন্দেহ নেই। কিন্তু, 'প্রবোধ-চন্দ্রিকাতে'ও মৃত্যুঞ্জয় পরিচ্ছন্ন ভাষা রচনায় কালসমুচিত দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন ঃ—"দণ্ডকারণ্যে প্রাচীন নদীতীরে বহু কালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না।"

এ-পর্যন্ত অনুসৃত পরিচিতি অনুসরণ করে মৃত্যুঞ্জয়-প্রতিভার ঐতি-হাসিক ফলশ্রুতি নির্ণয় করা যেতে পারে। বাংলা গদ্যে বিশৃঙ্খল অরাজক-

১। 19th Century Bengali Lit.

তার যুগে ভাষার স্থূল কাঠামোটি তিনি মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলেন,—ভাষাকে করেছিলেন বিচিত্র বিষয়াভিমুখী। বাংলা গদ্য তাতে নানাভারসহ হয়ে উঠ্‌বার সুযোগ পেয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা,—লিখ্য ভাষা রচনায় মৃত্যুঞ্জয় লেখকের পক্ষ থেকে একটি স্ব-প্রতিষ্ঠিত দায়িত্ববোধ অনুসরণ করেছিলেন। ভাষাকে উদ্দেশ্যানুগ এবং বিষয়োচিত করে তোলার অলিখিত সংস্কার বাংলা গদ্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয়ই প্রবর্তন করেন।

মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

কেরি, মৃত্যুঞ্জয় ও রামরাম বসু ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীতে আরও একাধিক গ্রন্থকার ছিলেন। এঁদের রচনায় কেরি-কল্পিত, বা মৃত্যুঞ্জয়-রচিত ভাষার অভিনবতর কোন পরিবর্তন অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লক্ষ্য করা চলে না। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের প্রবর্তিত গদ্য রচনার ধারা এঁদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈচিত্র্য ও প্রসার লাভ করেছিল,—কেবল এই কারণেই আদি যুগের কারুকৃৎ হিসাবে ভাষার ইতিহাসে এঁদের একমাত্র স্মরণীয়তা।

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে স্মরণীয় গোলকনাথ শর্মা;—তাঁর অনুদিত 'হিতোপদেশ' ১৮০২ খৃষ্টাব্দে[১] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত। শ্রীসজনীকান্ত দাস নানারূপ প্রাথমিক তথ্য বিচার করে অনুমান করেছেন, "গোলাকনাথ শর্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপাল দীঘির কাছাকাছি কোন স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মিশনারিদের সহিত যুক্ত ছিলেন;......১৮০৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।"[২] গোলোকনাথের রচনার নিদর্শনঃ—

গোলকনাথ শর্মা

"যে পুত্র অবিদ্যান ও অধার্মিক সে পুত্রের কি কার্য যেমন কানার চক্ষুপীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে।"

স্পষ্টই দেখ্‌ছি, গোলোকনাথ কেবল অনুবাদকই ছিলেন, বাংলার ভাষার গঠন-পদ্ধতি বা মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণার পরিচয় রচনাংশে দৃষ্ট হয় না।

তারিণীচরণ মিত্র হিন্দী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্সি হিসেবে ফোর্ট উইলিয়মে যোগ দিয়েছিলেন, পরে প্রধান মুন্সির পদে উন্নীত হন্। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ অথবা নিকটবর্তী কোন

তারিণীচরণ মিত্র

১। দ্রষ্টব্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)

সময়ে তারিণীচরণের জন্ম হয় এবং তিনি কলকাতারই অধিবাসী ছিলেন।

তারিণীচরণ বহু ভাষাবিৎ ছিলেন,—বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ গিল্‌ক্রাইস্‌টের নিয়ন্ত্রণে রোমান্ হরপে ভারতীয় ছ-টি ভাষায় 'The Oriental Fabulist' নামে অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ঃ—বিষয়বস্তু ছিল 'ইসপের' ও অন্যান্য গল্প। আলোচ্য গ্রন্থের বাংলা, ফার্সী, এবং হিন্দুস্থানী অনুবাদ তারিণী-চরণের করা। বাংলা অনুবাদ অংশ ইংরেজি বাক্য-রীতি-(Syntax)-র হুবহু অনুসরণ করেছে; বাংলা ভাষার গঠন রীতির নিজস্ব পার্থক্য সম্বন্ধে তারিণীচরণের কোন ধারণা ছিল, নিচের লেখা পড়ে তা মনে করা চলে নাঃ ——"এক নেকাড়িয়া ক্ষীণ ক্ষুধাতে আধমরা অসাবধানে এক সামথী পুষ্ট কুকুরের পথে উপস্থিত হইল। নেকাড়িয়া অত্যন্ত দুর্বলত্ব প্রযুক্ত হিংসা অশক্ত হইয়া, এই অতি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম কুকুরের সহিত সৌহার্দ করি;......"

তারিণীচরণ স্কুলবুক-সোসাইটির গ্রন্থ রচনার সংগেও যুক্ত ছিলেন।

চণ্ডীচরণ মুন্‌সির 'তোতা ইতিহাস' কাদির বখ্‌স্‌-এর লেখা ফার্সী 'তুতি নামা'র বাংলা অনুবাদ;—১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। চণ্ডীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে বাংলার পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে;—লণ্ডন থেকেও আলোচ্য গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভাষার নিদর্শনঃ—

চণ্ডীচরণ মুন্‌সি

"বলক নামে এক সহরে চারিজন বন্ধু ধনবান ছিল তাহাদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল।"

এ ভাষার প্রাঞ্জলতা অস্বীকার করা চলে নাঃ—কিন্তু লেখকের বিশুদ্ধ রীতি-বোধের অভাবও লক্ষ্য করবার মত।

চণ্ডীচরণ ভগবদ্‌গীতার একটি পদ্য অনুবাদও প্রস্তুত করেছিলেন।

রাজীব-লোচন মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলে জানা যায়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থও লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোম্পানী রাজত্বের একেবারে প্রথম পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন,—এবং পলাশিযুদ্ধের আগে ও পরে তাঁর কার্য-কলাপ ইংরেজদের পক্ষে বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য হয়েছিল। তাছাড়া, রাজবংশের সংগে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এবং গ্রন্থরচনা ও রাজার

রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুকালের মধ্যে স্বল্পতর পার্থক্য হেতু গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ লোভনীয় হতে পারত। কিন্তু, রাজীবলোচন অ-নির্ভরযোগ্য লোক-প্রসিদ্ধি ও স্ব-কপোল কল্পনার 'পরে অতি নির্ভরশীল হয়ে সেই সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট করেছেন। গঠন-ভঙ্গির দিক্ থেকে রাজীবলোচনের রচনা এ যুগের অন্যান্য রচনার তুলনায় সরল; আর অনেকটা সেই কারণেই যেন বাক্য-সংগঠনও বিশুদ্ধতর হয়েছে,—

"এক দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রাম নারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেঠ ও মীর জাফরালি খাঁ ইহার দিগের নিকট মনুষ্য প্রেরিত করিলেন আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমে ২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্ম নিবেদন করিলেন।"

ওপরের বাক্য কয়টির অধিকাংশই সরল, এবং অনেকটা সে কারণেও বাক্যের বিশুদ্ধ অন্বয়-বিধান সহজ হয়েছে। সেই সংগে ভাষা রচনায় রাজীব লোচনের সহজ পরিচ্ছন্নতা-বোধেরও প্রশংসা করতে হয়।

হরপ্রসাদ রায়

হরপ্রসাদ রায় বিদ্যাপতির লেখা সংস্কৃত 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। ১৮১৫ খৃীষ্টাব্দে এই অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। 'অনুবাদ'-এর ভূমিকায় গ্রন্থ-বিষয় নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে,—

"অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন......।"

হরপ্রসাদের রচিত গদ্য ভাষার পরিচয়ও এর থেকেই পাওয়া যাবে। ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলার অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিলুপ্ত

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আওতায় আরো নানা পুস্তক রচিত এবং প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কোন নিদর্শন রক্ষিত নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে সে সকল নাম-মাত্র-পরিচয় রচনা আলোচ্য নয়। তাছাড়া, ছাত্রদের পাঠ-সহায়তার জন্য এমন সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, গদ্য ভাষার বিকাশে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু নেই; দৃষ্টান্ত হিসেবে মোহন প্রসাদ ঠাকুরের বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজেদের পক্ষে বাংলা এবং বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার জন্য এ ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। মোহন প্রসাদের চেষ্টা অবশ্য সে পথে সার্থক সহায়তা করতে পারেনি,—কিন্তু, আলোচ্য যুগের পক্ষে এ ধরণের নিছক চেষ্টাও কোন দিক থেকেই

মূল্যহীন নয়, বাংলা গদ্যের ইতিহাসের সংগে কোন যোগ নেই বলেই এই সব প্রয়াসের আলোচনা আমাদের গণ্ডি-বহির্ভূত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের মৌলিক প্রত্যাশা সর্বাংশে সার্থক করে তুল্‌তে পারেনি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী কলেজটির পরিসমাপ্তি ঘোষণারকালে,

"It had no revenues and no system of instruction, no teachers, and, as a college, in reality no pupils."১

রাজ-জাতীয়দের নিছক্ জাঁদ্‌রেল শাসক করে তোলার চেষ্টা শাসিত দেশের বাইরে মূল শাসকভূমিতেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে;—এই ধারণারই চরম ঐতিহাসিক পরিণাম পরবর্তী কালের 'ইণ্ডিয়ান সিবিল্ সার্ভিস'। সে যাই হোক্, বিদেশি শাসকদের এদেশে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সার্থকতা যথেষ্ট নয়, এ'কথা মান্‌তেই হবে। তবু ইতিহাসের হাতে অন্যতর মূল্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংবর্ধিত হয়েছে; দেশীয়দের দ্বারা বাংলা গদ্য-ভাষা চর্চার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত ভিত্তির 'পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই আওতায়।

স্কুল বুক সোসাইটি

'স্কুল বুক্ সোসাইটি' আর একটি প্রতিষ্ঠান, বাংলা গদ্যের প্রাথমিক বিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরেই যার দান সমুল্লেখ্য। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ জন য়ুরোপীয় আর ৮ জন দেশী সদস্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন হয়। বিদেশীদের মধ্যে কেরি, আর দেশীয় সভ্যদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন ছিলেন প্রধান।

এবং প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক দেশীয় ছাত্রদের পক্ষে দুর্মূল্য ছিল। তাই, যথাসম্ভব সুলভে পাঠ্য পুস্তকের বহুল প্রণয়ন ও প্রচারই ছিল 'স্কুল বুক সোসাইটির' উদ্দেশ্য। নানা রকমের পঠিতব্য বিষয়েই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উল্লেখ্য রচনাবলীর মধ্যে আছে;—নীতিকথা (১৮১৮), মনোরঞ্জনেতিহাস, হিতোপদেশ (১৮২০) ইত্যাদি। নীতিকথায় ঈশ্বরের গল্পের আকারে নীতি বিষয়ক ছোট ছোট গল্প ছিল অনেক। রাজা রাধাকান্ত, তারিণীচরণ মিত্র এবং রামকমল সেন যুক্তভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। 'মনোরঞ্জনেতিহাস' মনোরঞ্জক গল্পের সমষ্টি,—লেখক ছিলেন তারাচাঁদ দত্ত। রামকমল সেন 'হিতোপদেশ' লিখেছিলেন ইংরেজি ঈশপের গল্পের অনুবাদ হিসেবেই। অন্যান্যের মধ্যে রামমোহন রায়ের লেখা একখানি বাংলা ভূগোলও (১৮১৯—২০) সোসাইটি প্রকাশ করেছিলেন।

১। Allens Indian mail for 1854.

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি 'পশ্বাবলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকেন। প্রতি সংখ্যায় একটি করে পশু-বৃত্তান্ত থাকত। ইংরেজিতে 'পশ্বাবলী'র বিষয় সংকলন করতেন জে, লসন্, আর বাংলায় অনুবাদ করতেন পীয়ার্স।

'স্কুল বুক্ সোসাইটি'র প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যে অনন্য-পূর্ব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। তবে বিদেশী, বিশেষতঃ ইংরেজি আদর্শে পাঠ্যপুস্তকাদি প্রকাশের চেয়ে অনুবাদের প্রতি এখানকার লেখকদের ঝোঁক ছিল বেশি। ভাষার গঠমানতার যুগে অনুবাদ সাহিত্য বিশেষ বলসংযোগের কারণ হয়। উইলিয়ম কেরির সুযোগ্য পুত্র ফেলিক্স্ কেরি গোল্ড্স্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস অনুবাদ করেছিলেন। তা ছাড়া, 'উপদেশ কথা', স্টুয়ার্ট-এর উপকথানুবাদ এ পথে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। 'স্কুল বুক্ সোসাইটির' প্রকাশিত পুস্তিকাবলী ছিল নানাবিষয়িণী,—আর ঠিক্ এই কারণেই ভাষাকে বিচিত্র ভার-বাহিনী করে তোলায় তার প্রভাব ছিল দূরপ্রসারী।

ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনায় শ্রীরামপুর কলেজ

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ-রচনার উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুর কলেজের গদ্য রচনার প্রয়াসও অবশ্য উল্লেখ্য! ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। "ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা ব্যতিরেকে এখানে গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপনাও প্রবর্তিত হইল।"[১] অতএব, এখানে নানা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের রচনাও সূচিত হয়। এখানকার দুজন প্রধান লেখক ছিলেন,—উইলিয়ম কেরির পুত্র ফেলিক্স্ কেরি, আর জোশুয়া মার্শম্যান্-এর পুত্র জন্ক্লার্ক মার্শম্যান্। অধিকাংশই ছিল আদর্শ ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অনুবাদ। এখানেই পাদ্রি ইয়েট্স্ পদার্থ বিদ্যাসার (১৮২৫) এবং জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩) রচনা করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক এই দুটি বই-ই হয়ত অনুবাদ ছিল।

রাধাকান্তদেবেরে প্রযোজনা

এই যুগে ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগত প্রচেষ্টায় রাধাকান্ত দেবের প্রযোজিত শব্দকল্পদ্রুম সংস্কৃত বিশ্বকোষ হিসেবে বিখ্যাত। ফেলিক্স্ কেরির বাংলা বিশ্বকোষ 'বিদ্যাহারাবলী'ও তার অন্তর্ভূত। বিচিত্র বিষয়ক আরো নানা ধরণের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বর্তমান প্রয়োজনে বিশেষ উল্লেখ্যতার দাবি তাদের নেই। কিন্তু, যতটুকু তথ্য বিবৃত হয়েছে, এবং আরো যতটুকু হয়নি, সব কিছু মিলে এ যুগের একটি ঐতিহাসিক পরিচয় সার্থক ভাবে অনাবৃত হয়ে থাকে। সে হচ্ছে জাতি এবং ভাষা,—সাহিত্যিক এবং সাহিত্য, উভয়ের মধ্যেই নবপ্রস্তুতির একান্ত প্রয়াস।

১। বাংলা সাহিত্যে গদ্য—ডঃ সুকুমার সেন।

নবীন জীবনের প্রস্তুতির জন্য সমগ্র মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চলেছিল একদিকে। খণ্ডবিচ্ছিন্ন নানা চেষ্টা ছাড়াও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় স্কুল সোসাইটি,—দেশের নানা জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠাই ছিল তার একমাত্র ব্রত। অন্য দিকে চলেছে দেশের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে অ-পূর্বজ্ঞাত বিচিত্র বিষয়ের বাহক করে তোলার ঐকান্তিক সাধনা।

ফলশ্রুতি

এই বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলকতা, এবং ব্যাপক ও পদ্ধতি-বদ্ধ প্রয়াস ভাষাকে যেমন ভারসহ করে তুলছিল, তেমনি ক্রমেই ভাষার একটি অবয়ব সংগঠনও রচিত হচ্ছিল, সচেতন অথবা অবচেতন ভাবে। এই স্থূল কাঠামোটুকুই ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগরের হাতে পূর্ণায়ত হয়েছে;—বিদ্যাসাগরে যার পরিণাম আলোচ্য যুগে তার ঐতিহাসিক প্রস্তুতি-সূচনা।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা গদ্যে সাময়িক পত্রের যুগ

বিভিন্ন শিক্ষালয় ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানের আওতায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বে লিখ্য গদ্যভাষার কাঠামো ক্রমেই সুগঠিত আর ব্যাপক হয়ে উঠছিল;—পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু, সার্থক সৃষ্টির পক্ষে ভাষা কেবল বহিরঙ্গ উপাদান; চিত্তের নানা-মুখী ভাব ও ভাবনাকে বলিষ্ঠ ভাবে বহন করার জন্যে চাই দৃঢ় পুষ্ট ভাষা। ভাষা যেখানে বলশালী হয়েছে, অথচ, ভাষা-ভাষীর ভাব-লোকে বিচিত্র ভাবনার দোলা লাগেনি, নিষ্ফল মহীরুহের মতই ভাষার সমৃদ্ধি সেখানে ব্যর্থ। শিক্ষায়তনের সাধনা বাঙালি ভাষাকে সমৃদ্ধ করছিল যেমন, তেমনি বাংলার শিক্ষাব্রতীর চিত্তলোকে আহরণ করে আনছিল বিচিত্র জ্ঞান-সম্ভার। কিন্তু, যে-কোন জাতির জীবনই নিছক শিক্ষায়তনের সীমায় বিধৃত নয়;—জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মানস-বিস্তার ও সজীব সুব্যাপ্ত কৌতূহলের 'পরেই জাতীয় উন্নতির বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচ্য পর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের অভ্যুদয় ও প্রসার বাঙালির মানস-লোকের মুক্তি-প্রস্তুতি সার্থক করেছিল। ভাবে-চিন্তায়, ভাষায়-বিষয়ে তাই অনাগত যুগের সার্থক সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপও অনেক

সাময়িক পত্র ও সাহিত্যের ইতিহাস

স্থলেই চিহ্নিত হয়েছিল সাময়িক পত্রেরই পৃষ্ঠায়। শিক্ষায়তনের পাঠ-সীমায় বাংলা গদ্যের যে প্রস্তুতির সূচনা, সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সেই প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা।

আধুনিক জাতির জীবনে সাময়িক পত্রের প্রভাব বহুদূর-প্রসারী। এ-কালের মানব-চেতনা বিশ্বাভিমুখী; সংবাদপত্র যেমন করে সমকালীন বিশ্বের অখণ্ড-রূপটি প্রতি প্রভাতে আমাদের সামনে অনাবৃত করে দেয়, তার তুলনা নেই। তা ছাড়া, জনমত সংগঠন,—এমন কি, বর্তমান যুগে বলিষ্ঠ সমাজ-সংগ্রন্থন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের স্বাধীন মুক্তি এ-সব কিছুই সম্ভাবিত করতে পারে কেবল সংবাদপত্র। অতীত-অনাগতের পট-ভূমিতে বর্তমানকে বলিষ্ঠ রূপ দেওয়াই এক কথায় সংবাদপত্র সহ অন্যান্য রকমের সকল সাময়িক পত্রেরই সাধারণ ধর্ম। এদিক থেকে সাময়িক পত্রের ইতিহাস জাতির বৃহত্তর জীবন-ইতিহাসের সংগে একান্তভাবে যুক্ত। এই কারণে, কেবল সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষিত আলোচনার অপরিহার্য অংগ হিসেবে তা বিবেচিত হতে পারে না। জাতীয় ইতিহাসের সেই স্বতন্ত্র আলোচনার মহৎ দায়িত্ব আরো বহু দুঃসাধ্য-সাধনের মধ্যে সুসমাপ্ত করে গেছেন মহামনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান উপলক্ষ্যে কেবল সেই প্রাসঙ্গিক অংশটুকু আলোচিত হবে, বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব সাধনে যাদের প্রভাব সুনিশ্চিত এবং অপরিহার্য ছিল।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা দিগ্‌দর্শন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারীদের পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করে। তারপর নানা বৈচিত্র্য ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে চলেছে জাতীয় জীবনে বাংলা সাময়িক পত্রের ক্রমাভিসার। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রকাশ-কালের সংগে সংগে ব্রজেন্দ্রনাথ এই ধারার একটি স্পষ্ট পরিণতি লক্ষ্য করেছিলেন। সংবাদ-সাহিত্য এবং অন্যান্য সাময়িক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা জাতীয় জীবনে আজ সংশয়াতীত এবং অন্য-নিরপেক্ষ-ও।

প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশের প্রেরণা ও তৎপরতা

সেই যাই হোক্, দেশীয় ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশের জন্য বাঙালি জাতি ইংরেজদের কাছে ঋণী, যদিও এই পত্র পরিচালনার প্রত্যক্ষ কর্তব্যভার দেশী পণ্ডিতেরাই গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের প্রায় একমাস কালের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতে থাকে। জে. সি. মার্শম্যান্ ছিলেন 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক। অথচ, এই পত্রিকার একটি সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল,—"আমাদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবার

পর্যন্ত স্ব স্ব বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না, অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন নূতন সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জনা করিবেন।"১ তা ছাড়া, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার কিংবা পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণির মত দেশীয় পণ্ডিতজনেরা 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদনা-কর্মেও যে সহায়ক হয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি আছে দর্পণের বিভিন্ন সংখ্যায়। তাই, 'দিগ্‌দর্শন'এ সম্পাদনা ও পরিচালনা ব্যাপারে দেশীয় পণ্ডিতদের প্রভাব অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়। তবু সেই সংগে এ কথাও স্মরণীয় যে, সাময়িক পত্র প্রকাশের প্রেরণা প্রথমে এসেছিল বিদেশীদের কাছ থেকেই।

স্বাধীন দেশের নাগরিক শ্রীরামপুর মিশনের ইংরেজ পাদ্‌রিরা জাতীয় জীবনের সংগ্রন্থনে সাময়িক পত্রের নিঃসংশয়িত ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এদেশেও ইংরেজ শাসন সূচনার প্রারম্ভ থেকে ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র চালু হয়েছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে হিকি সাহেব ইংরেজি ভাষায় 'বেঙ্গল গেজেট্' প্রকাশ করেন; ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র এই 'বেঙ্গল গেজেট'। পরে 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' ইত্যাদি বিভিন্ন ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ সম্প্রদায়ের জীবনকে কেন্দ্র করেই 'হিকি'র 'গেজেট্'-এর উদ্ভব ঘটে, এবং বৃটিশ বাংলা, তথা বৃটিশ ভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমন কি, ব্যক্তিগত অত্যাচার অঘটনও এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুতঃ, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্-এর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি নগ্ন আক্রমণ করেই 'হিকি'র গেজেটের প্রাণান্ত ঘটে। অন্যান্য সমকালীন ইংরেজি পত্রিকাও সাধারণ ভাবে 'বেঙ্গল গেজেটে'র কাঠামোকে অনুসরণ করেছিল।

বাংলাদেশে ইংরেজি সংবাদপত্র

বাংলা দেশে বাংলা ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্বে সাংবাদিকতার প্রথম ঐতিহ্য রচিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষায় ইংরেজের হাতে। বলাবাহুল্য, ইংরেজি পত্রিকাবলীর প্রভাবসীমা থেকে সেদিনকার বাঙালি মন বহু দূরবর্তী ছিল না। তাছাড়া, ইংরেজেরাই দেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশেরও প্রথম আয়োজন করেছিলেন,—এই অর্থেই বাংলার সংবাদ-সাহিত্যের ইতিহাসও অন্যান্য বিষয়ের মত বাঙালির ইংরেজ-সংসর্গের প্রভাব-জাত বলে মনে করা যেতে পারে।

জাতীয় জীবনের গভীরে আরো বহুদূর পর্যন্ত এই প্রভাব অনুসন্ধান করা চলে; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বে সেই আভ্যন্তরীণ

১। ১৮৩০ খ্রীঃ ২৬শে অক্‌টোবরের সংখ্যা।

প্রভাবই সমধিক উল্লেখ্য। নিছক বহিরঙ্গ তথ্য সন্ধান করলেও দেখব,—শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টা ছাড়াও একই সময়ে নিছক বাঙালির চেষ্টায় সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতে পেরেছিল। হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রবর্তনায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেরই কোন সময়ে সাপ্তাহিক 'বাঙাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়েছিল। সমাচার দর্পণ এবং 'বাঙাল গেজেটি'র মধ্যে কোন্‌টি প্রথম, সে সম্বন্ধে আবহমান কাল থেকে মত-পার্থক্য চল্‌ছে।

বাঙালির চেষ্টায় প্রথম বাংলা পত্রিকা

কিন্তু, 'বাঙাল গেজেটি'র পরিকল্পনা যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশীয় চিন্তাসঞ্জাত, তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে এই সত্যটুকুই সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বলে মনে করি। ব্যাপক এবং গভীর মানবিক কৌতূহলের অভাবে সার্থক সংবাদ সাহিত্যের উদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব। মানুষ এবং মানুষের জীবনের দৈনন্দিন আচারআচরণ, ছোট-বড় সকল উপাদান যেখানে মানুষের সহজ কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠ্‌তে পেরেছে,—সংবাদপত্র, অথবা অনুরূপ সাময়িক সাহিত্যের প্রকাশ কেবল সেই যুগেই সম্ভব,—এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য। একালেও মানুষের সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ ও অনুসন্ধান যত তীব্র-তীক্ষ্ণ হতে পেরেছে, সংবাদ-সাহিত্য ততই হচ্ছে পূর্ণাবয়ব এবং নিখুঁত। আর, একেবারে প্রথমেই বলেছি, এই সর্বাত্মক মানবিক কৌতূহলই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা-উৎস। অতএব, বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে আশ্রয় করে উনিশ শতকের বাঙালি-চেতনা যে-পরিমাণে সমকালীন মানবাভিমুখী হয়েছে, সেই পরিমাণেই তা আলোচ্য যুগের সাহিত্য-ইতিহাসের অঙ্গীভূত। আমাদের ধারণা, বাংলা সংবাদপত্র চেতনাগত এই ঐতিহ্যের জন্য ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকার কাছেই ঋণবদ্ধ।

এদিক্‌ থেকে 'দিগদর্শনে'র ঝোঁক ছিল অনেকটা স্কুল-পাঠ্য বিষয়ের দিকেই। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই 'মাসিক পুস্তকের' প্রথম প্রকাশ ঘটে এবং পরে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়ে চলে। সম্পাদক হিসেবে 'দিগ্‌দর্শনেও' মার্শম্যান-এরই নাম মুদ্রিত হয়েছে। আলোচ্য পুস্তিকাটি স্কুল-পাঠ্য বিষয়ে সমৃদ্ধ দেখে 'স্কুল বুক্‌ সোসাইটি একসংগে এই পুস্তিকার বহু খণ্ড প্রতিমাসে কিনে নিতেন। সোসাইটির অনুরোধেই 'দিগদর্শন' মাসিক পুস্তিকার ইংরেজি এবং ইংরেজি-বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী,—

প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র দিগ্‌দর্শন

(১) বাংলা সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১ থেকে ২৬ সংখ্যা।
(২) ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ ছাপা হয় ১ থেকে ১৬ সংখ্যা।
(৩) ইংরেজি সংস্করণও ছাপা হয়েছিল ১ থেকে ১৬ সংখ্যা।[১]

'দিগ্‌দর্শনের' বিষয়-বিন্যাস লক্ষ্য করলেই তার দৃষ্টি-ভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট পরিস্ফুট হতে পারবে। আগেই বলেছি, ছাত্রপাঠ্য জ্ঞান আহরণের দিকেই এই মাসিক পত্রিকার ঝোঁক ছিল বেশি। নিচের উদ্ধৃতিও এই সত্যই প্রতিপন্ন করবেঃ—

"পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিনভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিনশত ছাব্বিশ বৎসর হইল আটশত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্বে আমেরিকা কোন লোক কর্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।"—

অবিমিশ্র বাঙালি প্রচেষ্টায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র বলে 'বাঙাল গেজেটির' ঐতিহাসিক মূল্য সমধিক। কিন্তু পত্রিকাটির কোন সংখ্যা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। "উহা বৎসর খানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।"[২]

বাংলার সংস্কৃতি-সাহিত্যের ইতিহাসে 'সমাচার দর্পণ' আজ এক অ-তুলনীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র বলে কথিত। তবে, মনীষী ব্রজেন্দ্র নাথের ঐতিহাসিক কীর্তিই মূলতঃ এই মর্যাদা রচনা করেছে। তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র বিষয়বস্তু প্রধানতঃ সরবরাহ করেছে এই 'সমাচার দর্পণের' সংগৃহীত খণ্ডগুলি। সমকালীন বাংলা দেশের ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সর্বমুখী বিকাশের দিকে প্রসৃত ছিল সমাচার দর্পণের কৌতূহল। বস্তুতঃ, সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠাতেই আমরা যেমন নারী-শিক্ষা, সতীদাহ নিবারণ-চেষ্টা, নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিচয় পাই, তেমনি এখানেই পাই নিত্য-নূতন গ্রন্থ রচনার খবর,—পাই আদর্শ রসরচনার নিদর্শন;—সবকিছু মিলিয়ে পাই আত্ম-সচেতন বিচার-নিষ্ঠ এক নূতন জাতির অভ্যুদয়ের নিভৃত পরিচয়। আর, এই কারণেই, জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে বাংলা সাহিত্যের অনাগত কালের নানা সার্থক রচনার অংকুর-সংকেত এই 'সমাচার দর্পণের' পৃষ্ঠাতেই লক্ষ্য করে থাকি।

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র ঃ—

১। দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস।
২। ঐ

আগে বলেছি, দিগ্‌দর্শন প্রধানতঃ ছিল পাঠ্য-বিষয় নির্ভর। কিন্তু, 'সমাচার দর্পণ' প্রথম থেকেই একখানি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র রূপে পরিচালিত হয়েছিল। ১৮১৮ খৃীষ্টাব্দের ২৩শে মে শনিবার 'সমাচার দর্পণের' প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরে প্রতি শনিবার পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। আগে বলেছি, সম্পাদক হিসেবে মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত থাক্‌লেও দেশীয় পণ্ডিতেরাই পত্রিকা প্রকাশে প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রথম অবস্থায় সমাচার দর্পণের সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮২৫ খৃীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কর্মে ব্রতী হয়ে জয়গোপাল ক্রমে 'দর্পণের' সংগে সংযোগ ছিন্ন করেন। 'সমাচার দর্পণের' দেশীয় সম্পাদনা-সহায়কদের মধ্যে আর একজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন তারিণীচরণ শিরোমণি। ১৮২৮ খৃীষ্টাব্দে তাঁর লোকান্তর ঘটে তারও পরে সমাচার দর্পণ নানা আকারে দীর্ঘদিন সুপ্রচলিত হয়।

"১৮১৭ সনে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে এদেশের লোকের মধ্যে ইংরেজি শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে 'সমাচার দর্পণকে' দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) করিবার ব্যবস্থা করিলেন।"১

সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস-গঠনে সমাচার দর্পণ

তারও পরে ১৮৪১ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' নানা আকারে চালু ছিল। ১৮৪০ খৃীষ্টাব্দের ১লা জুলাই 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান ঐ সরকারি পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করলে ১৮৪১ খৃীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর-সংখ্যার পর 'সমাচার দর্পণ' লুপ্ত হয়।

প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে "এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয়" এই অভিপ্রায়েই 'দর্পণের' প্রকাশ সূচিত হয়েছিল।

'সমাচার দর্পণ' এই উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম যে হয়েছিল, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ ভাবে স্মরণীয় "বাবুর উপাখ্যান" জাতীয় রচনা। নববাবু-বিলাস, টেকচাঁদ অথবা হুতোমী সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক নক্‌সার সুরু এখানেই। নিছক ব্যঙ্গাত্মক নক্‌সা বলেই নয়,—আলোচ্য ধরণের রচনাবলীর মধ্যে যে সরস কৌতুক-বোধ, যে সূক্ষ্ম সমাজ-সন্দর্শন ক্ষমতা এবং যে আত্ম-বিচারণার চেষ্টা রয়েছে, তারই ঐতিহাসিক পরিণতি পরবর্তী কালে উপন্যাস সৃষ্টির উপযোগী মানসিক এবং সামাজিক প্রতিবেশ রচনার কারণ হয়েছিল বলে মনে করি।

'সমাচার দর্পণে' 'হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তি হীনতা' বিষয়ে লিখিত একটি

১। ঐ।

পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে রামমোহন রায় "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামক মাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিবপ্রসাদ রায় ছদ্ম-নামে রামমোহন এই মাসিক পত্রটির সম্পাদনা করেন। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' বা 'Brahmunical Magazine' অল্পকাল পরে লুপ্ত হয়।

রামমোহনের (১) ব্রাহ্মণ সেবধি এবং

('সমাচার দর্পণে' হিন্দু-বিরোধী প্রচারের প্রতিরোধ কল্পে রামমোহনের সক্রিয়তর প্রচেষ্টার প্রমাণ সম্বাদ কৌমুদী। অন্যান্য বিষয়ে আদর্শ পত্রিকা হলেও 'সমাচার দর্পণ' প্রধানতঃ মিশনারিদের কর্তৃত্বাধীন ছিল।) তাই, দেশীয় ধর্মাদির প্রতি এই পত্রিকায় অকারণে অসূয়া এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশিত হতে থাকে। এর বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে একাধিক ধর্মপ্রাণ স্বদেশীর উৎসাহে "১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদীর' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।"১ রাজা রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী'র একজন অতি উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। পত্রিকাটি প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হত। 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থ এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার বিখ্যাত লেখক-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন "সম্বাদ কৌমুদীর' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কিন্তু, প্রথম ১৩টি সংখ্যা প্রকাশের পরেই ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদীর' সংশ্রব ত্যাগ করেন। বলা হয়ে থাকে, রামমোহনের সংগে মত-পার্থক্যই এই পদত্যাগের কারণ। রামমোহন ঐ পত্রিকায় সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখছিলেন; ভবানীচরণের রক্ষণশীলতা তাতে আহত হয়; তাই তিনি দূরে চলে যান। নানা সময়ে নানা ভাবে হস্তান্তরিত এবং রূপান্তরিত হয়ে হয়ে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ বা তার নিকটবর্তী কাল পর্যন্ত 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়েছিল। রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ একেবারে শেষ পর্যায়ে কিছুদিন 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক ছিলেন।)

(২) সম্বাদ কৌমুদী

'সমাচার দর্পণ'-এর প্রতিবাদ উপলক্ষ্য করে 'সম্বাদ কৌমুদীর' আবির্ভাব ঘটে; আবার, 'সম্বাদ কৌমুদী'র বিপক্ষতার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয় 'সমাচার চন্দ্রিকা'। রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী'তে সতীদাহপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করছিলেন; সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ রচনাই ছিল চন্দ্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধি ছিলেন এঁর সম্পাদক। (পত্রিকা এবং পত্রিকা-সম্পাদক উভয়েই সেকালের হিন্দু-বাংলায় বহুল

সমাচার চন্দ্রিকা

১। ঐ

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সতীদাহ প্রথার সুদক্ষ সমর্থন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে পত্রিকাটিকে একচ্ছত্র জনপ্রীতি দান করেছিল।

'সম্বাদ কৌমুদী' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বাগ্‌যুদ্ধ দীর্ঘদিন সমকালীন বাংলার সমাজ-জীবনে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এবং পরিশেষে "সতী বিষয়ক ব্যাপার ঐ উভয় সমাচার পত্রে লিখিত বাদানুবাদ মাত্রের আশ্রয় হইয়াছে।"১ কিন্তু, বাদানুবাদের উত্তেজনা প্রধান হলেও চন্দ্রিকার একমাত্র উপজীব্য ছিল না। নানা বিষয়ক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনার্তিকে এই পত্রিকা সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পত্রিকাটির সম্পাদনা করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরে হস্তান্তরিত হয়েও নূতন ও পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' নানা দফায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কোনো সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ভবানীচরণের দক্ষতা 'চন্দ্রিকা' সম্পাদনার সার্থকতাকে অতিক্রম করে বিচিত্রতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করার উদ্দেশ্যে যে 'ধর্মসভা' গঠিত হয় (১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারী), ভবানীচরণ ছিলেন তার সম্পাদক। দক্ষ সাংবাদিকতার সংগে এই ঘটনার দ্বারাও ভবানীচরণের সামাজিক সচেতনতা এবং সক্রিয়তার পরিচয় স্পষ্ট হতে পারে। সন্দেহ নেই, ভবানীচরণ রক্ষণাশীলতারই সমর্থন করেছিলেন; আর তাই, সে যুগের ইতিহাসের ধারায় তাঁর কার্যকলাপ 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু, গোঁড়া হলেও তিনি অন্ধ ছিলেন না। বস্তুতঃ, সে-যুগের সমাজ-জীবনে তখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দুদিকে চল্‌ছিল দুই বিপরীত ধর্মী আত্যন্তিকতা। রাজা রামমোহনের স্বচ্ছ-দৃষ্টি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সে-কালে সহজ-গম্য ছিল না। তবু, এই আত্যন্তিকতার মধ্যে ইতিহাস সেদিন স্বরূপ আহরণ করছিল,—পরস্পরের সমালোচনা ও ঘাতপ্রতিঘাতে বাঙালির আত্মদর্শনের পথ দিনে দিনে হয়েছিল সহজ ও স্বচ্ছ। এই ধরণের সমাজ-সন্ধানেরই সাবলীল এবং সরস রূপ দিয়ে গেছেন, ভবানীচরণ তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' এবং 'নববাবু বিলাস' জাতীয় ব্যঙ্গ রচনায়। অনুরূপ রচনার প্রথম সূত্রপাত লক্ষ্য করেছি 'সমাচার দর্পণে'র পাতায়। এই সমাজ-সন্দর্শনের ধারা পরবর্তী পর্যায়ে ক্রম-পরিণত হয়ে উঠেছে হুতোম এবং টেকচাঁদের হাতে। ভবানীচরণ এই ধারার প্রথম দৃঢ় ভিত্তি;—সেই ঐতিহ্য-সূত্রেই যথাস্থানে তাঁর অনুরূপ রচনাবলীর আলোচনা করব;—এখানে কেবল স্মরণ করি, আলোচ্য-যুগের এক সাংবাদিকের হাতেই বাংলা গদ্যের

'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ

১। 'সমাচার দর্পণ' ১৩ই ফেব্রুয়ারী।

সেই নবীন ঐতিহ্য নবজন্ম লাভ করেছিল।

বাংলা ভাষার আর একখানি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হচ্ছে 'বঙ্গদূত'। সার্জন আর, মণ্ট্ গোমারি মার্টিন এক সংগে ইংরেজি, বাংলা, ফারসি ও নাগরি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্ড্' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বাংলা সংস্করণের নাম ছিল 'বঙ্গদূত'—প্রথম প্রকাশ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে। পত্রিকাটি "প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত" এবং "রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত" প্রকাশিত হত। নীলরত্ন হালদার ছিলেন 'বঙ্গদূত'-এর প্রথম সম্পাদক। তাছাড়া, পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। অন্যত্র ব্যস্ততার দরুণ নীলরত্ন হালদার কর্মত্যাগ করলে ভোলানাথ সেন সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহেশ-চন্দ্র রায় সম্পাদক হন। পরে কিছুদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে 'বঙ্গদূত' ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার কিছুদিন প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদূত

তখনকার দিনের সংবাদপত্রসমূহ কি করে রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠ্ছিল তার নিদর্শন হিসেবে 'বঙ্গদূত' থেকে একটি-মাত্র ছত্র উল্লেখ করিঃ—"এই ভারতবর্ষ হইতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারে প্রতি বৎসর ৪০ চল্লিশ লক্ষ পৌণ্ড রাজস্ব রূপে সংগ্রহ হয়। তন্মধ্যে ২০ কুড়ি লক্ষ ঐ কোম্পানীর অংশিতে কৃতাংশ হয়। অবশিষ্ট ইংলণ্ডাধিকারের বেতন বণ্টনে পর্যাপ্ত।"

মূল পত্রটির বিষয়বস্তু সুদীর্ঘ; এবং তা 'সমাচার দর্পণে'ও উদ্ধৃত হয়েছিল। কৌতূহলী জনের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা গ্রন্থ এ বিষয়ে সহায়ক হবে। আমরা কেবল বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্য করব, বাংলার সমাজ, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের আমূল আলোড়নের সংগে রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়েও শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির সচেতনতা ক্রমে প্রখর এবং প্রবল হয়ে উঠ্ছিল। মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনই নয় একান্ত ভাবে আধি-ভৌতিক অভ্যুদয়ও একালের মানুষের কৌতূহলী জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে উঠেছে। আর, আলোচ্য যুগের সংবাদপত্রাবলীই সর্বাভিমুখী এই মানব-জীবন-জিজ্ঞাসার পথকে করেছে অবারিত। আধুনিক যুগ এবং আধুনিক সাহিত্যেরও প্রধান উপজীব্য মানবধর্মের এই সর্বাভি-মুখী প্রসার! আমাদের আলোচ্য পর্যায়ে যে জীবন-জিজ্ঞাসা নিছক 'তথ্য' এবং 'সংবাদ' রূপে ছিল সীমাবদ্ধ, পরবর্তী পর্যায়ে মধুসূদন-বঙ্কিমের সাধনায় তাই হয়েছে শিল্পরূপান্বিত। এই অর্থেই আমাদের আলোচ্য পর্বের সংবাদ-সাহিত্যেরও প্রচেষ্টা অনাগত যুগের সার্থক জাতীয় প্রস্তুতি।

এই প্রস্তুতির সফলতম নিদর্শন 'গুপ্ত কবি'র 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে 'বারত্রয়িক', তার পরে দৈনিক রূপে সংবাদ প্রভাকর বাংলার

উদীয়মান নব-সংস্কৃতি-সাহিত্যের 'পরে প্রভাকর-কিরণ বর্ষণ করছিল অজস্র ধারে। আর, এই সাধনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একাই ছিলেন একশ। (লুপ্ত-প্রায় প্রাচীন বাংলার কাব্য-কবিতার সন্ধান এই সংবাদ প্রভাকরেরই পৃষ্ঠায় সূচিত করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; এখানেই বাংলা-সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক পরিচায়নের অঙ্কুরোদ্গম।১ এখানেই নিত্য নূতন সমাহৃত 'কবিগান'-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে দিনে দিনে;—ভারতচন্দ্রের জীবনীর প্রথম প্রকাশ ও কাব্য-কবিতার বলিষ্ঠ বিচারও প্রথম সম্ভব হয়েছিল,—'প্রভাকরে'রই পাতাতে। 'প্রভাকর'কে কেন্দ্র করেই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিকৃতির বিকাশ,—বলাবাহুল্য, 'সংবাদ-প্রভাকরের' সকল পর্যায়ের মতই কাব্য-বিষয়েরও শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত। এই 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠাতেই বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুর কৈশোর-প্রতিভা প্রথম প্রকাশের আলোক খুঁজে পায়।

ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী শুক্রবার 'সংবাদ প্রভাকর' 'সাপ্তাহিক সমাচারপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পাথুরেঘাটার "বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়।"২ প্রথমে ভাড়াটে মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হলেও ক্রমে যোগেন্দ্রমোহনের বাড়িতেই 'প্রভাকর' যন্ত্রালয় স্থাপিত হয় এবং সেখান থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে পর্যন্ত প্রভাকর "অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত" হয়েছিল। কিন্তু, যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর পরে প্রভাকর বন্ধ হয়।

সাপ্তাহিক 'প্রভাকর'

(চার বছর পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট সংবাদ প্রভাকর পুনঃ প্রকাশিত হয় 'বারত্রয়িক' রূপে, অর্থাৎ তখন প্রতিটি সপ্তাহে পত্রিকার তিনটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন প্রভাকর 'দৈনিক' আকার ধারণ করে। "বাংলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।"৩ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সংবাদ প্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে।

'প্রভাকর'—
'বারত্রয়িক' দৈনিক
এবং মাসিক

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয় এবং তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

'সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায় বাঙালি জীবনে ঈশ্বর গুপ্তের শ্রেষ্ঠ দান স্বাজাত্য-বোধের প্রেরণা। এ পর্যন্ত আলোচিত ইতিহাসে লক্ষ্য করেছি

১। দ্রষ্টব্য :—শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি-জীবনী।"
২। সংবাদ প্রভাকর :—১৮৪৬, ১২ই এপ্রিল।
৩। দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উনিশ শতকের প্রায় সুরু থেকেই নগর-বাংলার বাঙালি মাত্রকেই শিক্ষায় চিন্তায় বলিষ্ঠ করে তোলার সমবেত চেষ্টা চলে আসছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তথ্যাবলীও বাঙালির এই সুপ্ত স্বজাতি-প্রীতি এবং উন্নতি-সাধন আকাঙ্ক্ষার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। বাংলা সংবাদপত্র বাদানুবাদের মধ্যে দিয়েও বাঙালি পাঠক সাধারণের সামনে জাতীয় জীবনের একটি পূর্ণাবয়ব ছবি তুলে ধরেছিল। জাতির সম্বন্ধে এই বর্ধিত জ্ঞান জাতি-প্রীতিরও সংবর্ধনের কারণ হয়েছিল। তাছাড়া, ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেম ছিল, প্রত্যক্ষ, তীব্র এবং সুস্পষ্ট। কবিতায় তিনি লিখেছিলেনঃ—

প্রভাকর ও বঙ্গ-সংস্কৃতি

"কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" [স্বদেশ]

সে-যুগের বাঙালি সমাজের পক্ষে এই অনুভূতি, অভিনব না হলেও দুর্লভ ছিল। সেদিনকার ইংরেজি শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায় বরং বিদেশীয়তার প্রতি যেমন পক্ষপাত-দুষ্ট ছিলেন, স্বদেশের প্রতি ছিলেন তেমনি সহজে বিমুখ। বলা হয়ে থাকে, পরবর্তী কালে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শই বাঙালির স্বাভিমান এবং স্বজাতি-প্রেমের উৎস রচনা করেছিল। কিন্তু, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতীচ্য-জ্ঞান প্রায় কিছুই ছিল না। তবু, রামমোহন-বিদ্যা-সাগরের মতই আত্ম-মর্যাদা এবং জাতীয়তা-প্রীতি তাঁর চরিত্রকেও করেছিল মহিমান্বিত। 'সংবাদ প্রভাকর' 'গুপ্ত কবি'র এই জাতিপ্রেম এবং স্বাভিমান-বোধকে উগ্ররূপে বাংলার সমাজ-জীবনে ছড়িয়ে দিয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে'র যুগ থেকেই বাঙালির সমাজ-চেতনায় অন্য-নিরপেক্ষ জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত হয়েছিল। মধুসূদন-বঙ্কিমযুগের উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চেতনা এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধের ক্রমপরিণাম বলেই মনে করি। এমনি করেই সংবাদ-প্রভাকর এবং 'গুপ্ত কবি' ঈশ্বর গুপ্ত অনাগত জীবন-পথের একটি বৃহৎ সম্ভাবনাকে প্রভান্বিত করেছিলেন। 'প্রভাকরে'র পাতায় দেশীয় ভাষার পরিচয় বিবৃত হয়েছিল নিম্নরূপেঃ—"রাজা রাম-মোহন রায় যৎকালে 'বঙ্গ-ভাষার' শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনুরাগী হয়েন তাহার অল্পদিন পূর্বে সিবিলদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত পণ্ডিতবর মৃত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার বিরচিত প্রবোধ চন্দ্রিকা এবং সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ রায় প্রণীত 'পুরুষ-পরীক্ষা' এই দুইখানি পুস্তক প্রকটিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমোক্ত গ্রন্থে যদিও অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে, কিন্তু তাহার ভাষার অধিকাংশই কঠিন ও কর্কশ, তাহাতে রস ও মধুরত্ব নাই। শেষোক্ত পুস্তকের রচনা অতি সহজ, ভাষা অতি কোমল, দেওয়ানজীর ভাষার সহিত অনেকাংশেই তাহার তুলনা হইতে পারে। যাহা হউক, বাংলা-গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিলে

সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত

ইঁহারা উভয়েই আদি গ্রন্থ-কর্তারূপে গণ্য হইবেন। মহাপ্রভু পাদ্রি কেরি প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা ঐ সময়ে বঙ্গ-ভাষায় খ্রীষ্ট-ধর্ম বিষয়ক কয়েকখানা পুস্তক প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব-সাহেব গন্ধই নির্গত হইত। দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন। তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।

"ইদানীন্তন বঙ্গভাষা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ে যাঁহারা অনুশীলন কল্পে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিবেন, তাহাতে দেশের অশেষ প্রকার উপকার সম্ভবনা। সংপ্রতি মধ্যে মধ্যে দুই একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গদ্যপূরিত ভাষা-পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তৎপাঠে আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, যখন তরু মুকুলিত হইয়াছে তখন ফলবান ও বলবান হইবে তাহাতে সংশয় কি?"

আলোচকের ঐতিহাসিক-চেতনার প্রখরতা বিস্ময়কর,—আর সে আলোক ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত। অতীত-বর্তমানের সত্য ঐতিহ্য-বোধ নিয়ে ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার যথার্থ মূল্যায়নই সার্থক ঐতিহাসিক চিত্তের লক্ষ্য। গুপ্তকবি তাতে ফাঁকি দেন নি;—কিন্তু সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য করবার মত লেখাটির আগাগোড়া ব্যাপ্ত স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমতাবোধ; অপরপক্ষে স্বাভিমানের তীব্রতা হেতু, কেরি প্রভৃতির উল্লেখে অসহিষ্ণুতা। আলোচ্য মনোভাবের ঔচিত্য বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়;—কিন্তু আলোচনার মধ্যে নব-জাগ্রত স্বাতন্ত্র্য-বোধের তীব্রতা ও স্পর্শ-কাতরতাটুকু লক্ষ্য করতে বলি। স্পর্শকাতর অতি-সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিই পরবর্তী পর্যায়ের সাহিত্য-কৃতিকে বিশেষিত করেছে।

জ্ঞানান্বেষণ

'জ্ঞানান্বেষণ' এ-যুগের আর একখানি উল্লেখ্য পত্রিকা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন জ্ঞানান্বেষণ প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যাতেই স্পষ্ট ঘোষিত হয়েছিল ঃ—

"সংপ্রতি এতন্মহানগরে নানাবিধ সমাচার পত্র দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার প্রচার হইতেছে, তাহাতে এই পত্র প্রস্তুত করা কেবল নানা দেশীয় গুহ্যাগুহ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এমত নহে পরন্তু অন্য অন্য প্রয়োজন অনেক আছে।

"এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রভাবিত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম

যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মন্বমিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

"দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন আপন জাতি-বিহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহার কারণ কি ইহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

"তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি বিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং অন্য অন্য বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।"

'জ্ঞানান্বেষণ' ছিল উদারপন্থী তরুণদের পত্রিকা, আর এই কারণেই সেকালের সকল প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন এবং সংস্কারে এই পত্রের উৎসাহ ছিল সর্বাধিক। "গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন।"১ তিনি রাজা রামমোহনের সময় থেকেই প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।। তা ছাড়া, এ যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণ 'জ্ঞানান্বেষণের' সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের নামেই প্রথমে পত্রিকাটির 'লাইসেন্‌স্' নেওয়া হয়েছিল। তাঁর পরে প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এঁদেরই চেষ্টায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগ থেকে 'জ্ঞানান্বেষণের' একটি ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে। রামগোপাল ঘোষও 'জ্ঞানান্বেষণের' একজন প্রধান লেখক ও সমর্থক ছিলেন। সমকালীন বাংলার উদারনৈতিক চেতনা সঞ্চারে 'জ্ঞানান্বেষণে'র মূল্য ছিল প্রচুর।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা একদা যথেষ্ট জনপ্রীতি অর্জন করেছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম সংখ্যার 'বিজ্ঞাপন'-এ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়,—"যাহাতে বিদ্যা-বৃদ্ধি বুদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ আছে যাহাতে মনোহনুপ্রবেশ করিলেই বিশেষোপকার দর্শাইবেক তথা নানা বিষয় ঘটিত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিবরণ যাহা শ্রীলশ্রীযুক্ত দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই প্রজাগণের মহোপকার দর্শাইবেক এবং ধর্ম বিষয় যাহা সর্বসাধারণের আবশ্যক ও এতদ্দেশীয় বা

১। ঐ

ইউরোপীয়াদি দেশের নূতন নূতন সম্বাদ যদ্দর্শনে পাঠকগণেরা পরমোল্লাসিত হইবেন এবং তাহাদিগের ও প্রেরিত যথা রীত্যনুসারে প্রকাশ হইবেক।”

প্রথমাবধি হরচন্দ্র বন্দ্যোাধ্যায় ছিলেন সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়-এর সম্পাদক। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উদয়চন্দ্র আঢ্য সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। বংশানুক্রমে আঢ্য পরিবারের নানা ব্যক্তি তারপরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে এর বিলুপ্তি ঘটে।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু প্রায় এক বছরের মধ্যেই সাপ্তাহিক আকার প্রাপ্ত হয়ে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক পত্রিকায় পর্যবসিত হয়। প্রায় ৭৩ বছর ধরে নানা আকারে পরিচালিত পত্রিকাখানি বাংলার জনমতের 'পরে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলাগদ্যে সাময়িক পত্রের প্রভাব যুগের আলোচনা এখানে শেষ হয়েছে। আবার স্মরণ করি,—বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সম্পূর্ণ তথ্য এই আলোচনায় সংগৃহীত হয়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস অথবা 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থ দুটির বিষয়সূচীর প্রতি লক্ষ্য করলেই বর্তমান অধ্যায়ের তথ্য-দীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথম পর্যায়ে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকার তথ্যের দিক থেকেও আমরা অসম্পূর্ণ। কিন্তু আগেই বলেছি, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ইতিহাস সাহিত্য-ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

বাংলার বৃহত্তর সংস্কৃতি ও গদ্য সাহিত্যের গঠনে পত্র-পত্রিকার দান

আলোচ্যমান সময়ে বাংলা গদ্যভাষা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করে প্রাঞ্জলতা, বহুমুখিতা এবং সভ্যতা-সমুচিত গভীরতা-জটিলতায় ঋদ্ধ হয়ে শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি জাতির মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমৃদ্ধ জাতীয়-মানসই পরবর্তী সাহিত্যে আধুনিকতাধর্মী সৃজন-শৈলীকে করেছিল অবারিত। এই অর্থে আধুনিক মানসের, তথা আধুনিক সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বের নিয়ামকমাত্ররূপে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের বর্তমান আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এই প্রসঙ্গ-কথা স্মরণ করেই, অপেক্ষাকৃত স্বল্প-প্রধান পত্র-পত্রিকার আলোচনা পরিহার করে চলেছি। আর, একই কারণে, এই প্রসঙ্গের শেষে বাংলা সাহিত্য-বিকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেও রেখেছি অনুল্লিখিত। প্রথম যুগের বাংলাগদ্যের পরিণতি যাঁদের হাতে, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনেকেই ছিলেন তত্ত্ববোধিনীর নিয়মিত লেখক। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত রচয়িতাদের রচনা সম্ভারে

তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠা নিয়মিত সমৃদ্ধ ছিল। সেদিক থেকে তত্ত্ববোধিনী সাহিত্য-ইতিহাসের এক পরম সম্পদ। তা সত্ত্বেও বর্তমান প্রসঙ্গে কেন সে পত্রিকার আলোচনা পরিহার করেছি, তারই জবাব-দিহিতে আলোচ্য পর্যায় সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিক মূল্যবোধ স্পষ্ট হতে পারবে।

বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের ঐতিহাসিক সার্থকতা নির্দেশ করে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে বাঙালা গদ্য সাহিত্য (এবং বাঙালা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানতঃ সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হইয়াই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক-পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাংকুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।"[১] আধুনিক বাংলা সাময়িকপত্রের যথার্থতর ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় অসম্ভব বলে মনে করি। কিন্তু, আমাদের এই আলোচ্য যুগের সাময়িক পত্র সমৃদ্ধ-সাহিত্যের আধার হিসেবে বিচার্য নয়,—সার্থক সাহিত্যিকের মানস সংগঠনের প্রবর্তয়িতা রূপেই স্মরণীয়। সার্থক সৃষ্টিমাত্রেরই জন্য শিল্পি-মানসের এক নিম্নতর পরিমাণ শিক্ষা ও বিচারবোধের সমৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়। কেবল মাত্র সৃজনীশক্তির প্রবণতা সার্থক সৃষ্টির আকর হতে যে পারে না, কবিগান বা ফোর্ট উইলিয়ম যুগের গদ্য সাহিত্য তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জাতিকে আধুনিক যুগ-সমুচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুল্-ছিল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা। জাতির মনন ও স্বাধীন চিন্তাকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে তুলেছিল সেদিনকার সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্য। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত যে আলোচনাটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে, তার একস্থানে ঈশ্বর গুপ্ত স্বীকার করেছেন,......"রাজা রামমোহন রায় সমাচার পত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা দ্বারা স্বাভিমত ব্যক্ত করণে প্রবৃত্ত হইলে মহানুভব বিদ্যাতৎপর 'নন্দলাল ঠাকুর মহাশয় তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন, তৎকালে উভয় দলে অনেক সাহায্যকারি পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, উভয় পক্ষের বিবাদে ভাষার বিস্তর উন্নতি হয়। পাদ্রিসাহেবদিগের সহিত প্রথমপক্ষের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং আমরা ঐ সময়কেই বঙ্গভাষা অনুশীলনের আদি সময় এবং মৃত রাজাকে তাহার একজন সূত্র সঞ্চারক বলিয়া উল্লেখ করিব।"

বস্তুতঃ, 'সমাচার পত্রের' এই বাদানুবাদ এবং বহুমুখী আলোচনার মধ্য দিয়ে কেবল বাংলা গদ্যই নয়, বাংলা গদ্য রচনার উপযোগী মনও প্রথম অনুশীলিত হয়েছিল। আলোচ্য যুগে নানাজনে নানাপ্রকার বিষয় নিয়ে

১। বাংলা সাহিত্যে গদ্য—৩য় সং।

সংবাদপত্র মারফৎ আলোচনা-বিচার করেছেন; কিন্তু কোন লেখাতেই, কি ভাষায়, কি ভাবনায় ব্যক্তিত্ব-স্পর্শ (Personal touch) ছিল না। রামমোহন রায় ছাড়া সে-যুগে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ছিল না আর কারো রচনায়,—এমন কি গুপ্ত-কবিরও না। ঈশ্বর গুপ্ত সে কালের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও 'প্রভাকর' সম্পাদক হিসেবে সমাজ-নিয়ামকও ছিলেন। কিন্তু, তাঁর রচনাতেও নিজস্ব কোন 'স্টাইল' আমরা লক্ষ্য করি না;—গদ্যে-পদ্যে সমুন্নত প্রতিভাসত্ত্বেও তাঁর রচনা ছিল গতানুগতিক। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় রঙ্গলাল ও বঙ্কিম-দীনবন্ধুর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু সেও কেবল দীর্ঘ অনুশীলিত জীবনের পূর্বানুসৃতি মাত্র। তাই 'সংবাদ প্রভাকর'কেও এই যৌথ প্রস্তুতি-চেষ্টার অঙ্গ মাত্র বলে স্বীকার করেছি। কিন্তু, তত্ত্ববোধিনীর লেখকগোষ্ঠীর রচনার মধ্যে স্পষ্ট ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের স্পর্শ আছে,—দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় কুমারের রচনার পার্থক্য কেবল বিষয় এবং ভাষাগত নয়,—তাঁদের স্টাইলের স্বকীয়তা-জাত। —তাই, তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার আলোচনা ব্যক্তিত্বধর্মী বাংলাগদ্যের প্রথম যুগ-এর অন্তর্ভূত করে বর্তমান বিচার থেকে তাকে পৃথক্ করেছি,—পৃথক্ ও স্পষ্ট করতে চেয়েছি বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও রূপগত বৈশিষ্ট্য।

নবম অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত বাংলা গদ্য

ইংরেজিতে প্রচলিত কথা আছে,—"Style is the man"; ভাষা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গেই কথাটি সমধিক উল্লিখিত। প্রত্যেক ভাষারই গঠন ও উচ্চারণের একটি করে পৃথক্ ভঙ্গি রয়েছে। ভাষার সেই সাধারণ স্বভাব গড়ে ওঠে, ভাষাভাষীর সাধারণ স্বভাব ও প্রবণতাকে আশ্রয় করে। কিন্তু, একই ভাষা আবার বক্তার স্বভাব ও বক্তব্য অনুসারে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত গদ্য

বক্তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দ্বারা চিহ্নিত বাচন-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যকেই বলি 'স্টাইল'। গদ্য ভাষায় 'স্টাইল' গড়ে উঠতে সময় লাগে। গদ্য সাধারণতঃ, আটপৌরে জীবনের ভাষা; যে-কোন রকমে প্রয়োজনটুকুকে মিটিয়ে দিতে পারার দিকেই অধিকাংশ গদ্য-বক্তার প্রায় একমাত্র ঝোঁক। বিশেষ করে, গদ্য যখন মুখের কথাকে ছেড়ে প্রথম লেখার পাতায় ধরা পড়তে থাকে, তখনো কেবল প্রয়োজন মেটানোর মৌল কথ্য উদ্দেশ্যটিকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে তার সময় লাগে। গভীর ভাব এবং ভাবনার স্পর্শ যতক্ষণ গদ্য ভাষার গায়ে লাগে নি, তখনো পর্যন্ত ভাষার মধ্যে সুস্থসম্পূর্ণ স্টাইল প্রত্যাশা করা চলে না। বস্তুতঃ, এখানেই কাজ

মেটানো কথার বদলে প্রয়োজন হয় ব্যক্তির মন-জড়ানো ভাবনার দোলা। ব্যক্তিত্বের স্পর্শে চিহ্নিত হতে পারলেই আটপৌরে গদ্য সাহিত্যের মর্যাদা দাবি করতে থাকে। স্রষ্টার জীবন-স্পর্শই ত সৃষ্টির পরম উৎস!

এবং গদ্য সাহিত্যের প্রস্তুতি-পরিণাম

এই কারণেই, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ব্যক্তিত্ব-স্পর্শ সূচনার পরিচয়টুকু বিশেষ মূল্যবান। গদ্যভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রস্তুতি-পরিণাম এখানেই। এ-পর্যন্ত বাংলা গদ্যের আলোচনায় আপামর নাগরিক বাঙালির আত্মোন্নতির একটিমাত্র যৌথ আকৃতি ও প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করেছি। বিদ্যায়তন-গুলি নানা সূত্র থেকে নব নব জ্ঞানের উপাদান আহরণ করেছে, সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্য স্বাধীন চিন্তার পথকে করেছে অবারিত। কিন্তু, ব্যক্তির স্বাধীনতা উন্মোচিত হলেই ব্যক্তিত্বের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে না। ব্যক্তিমাত্রেরই মধ্যে সুচিহ্নিত ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি অনায়াস-সাধ্য নয়। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একটি দুর্লভ চারিত্র ধর্ম, স্রষ্টারই তাতে একক এবং শ্রেষ্ঠ অধিকার। ঠিক আগের অধ্যায়ে দেখেছি,—গুপ্ত কবি ছিলেন বাংলার গভীর চিন্তাশীল মহৎ-ব্যক্তি; জাতির জীবনের দিকে দিকে তাঁর দানের সীমা নেই, কিন্তু জাতির সাহিত্যে নেই তাঁর কোন সার্থক সৃষ্টি। এদিক্ থেকে, রামমোহনই আধুনিক বাংলার প্রথম সুচিহ্নিত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব; সাহিত্যে না হলেও, সেদিনকার জাতির জীবনে নূতন সৃষ্টির মহৎ প্রেরণা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব বাংলাগদ্যকেও দিয়েছে প্রথম স্বকীয়তা ধর্মী স্টাইলের সমৃদ্ধি;—গুপ্ত-কবির আবির্ভাব কাল তখনো ছিল কত দূরে; কত অনাগত!

নবীন বাঙালি জীবনের নব-সংস্কৃত রূপের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবেই জীবন-শিল্পী রামমোহন ভাষাকে অভিনব প্রেরণার দোলা দিয়েছিলেন। তা না হলে, তার যুগে বাংলা গদ্য মোটেই সুগঠিত হয়ে ওঠেনি,—এমন কি সুষ্ঠু বাক্যরীতি (syntax)-ও তখনো ছিল আয়ত্তের অনেক বাইরে। তা ছাড়া, রামমোহন নিজেও প্রধানভাবে ভাষা রচনাতেই ব্রতী ছিলেন না, ধর্ম ও সমাজই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্তু, রামমোহনের একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল, আর ছিল সে যুগের পক্ষে দুঃসাধ্য জীবন-সত্য-বোধ। সারাটি জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রামমোহন বজ্র কণ্ঠে সেই সত্য বাণীর বিঘোষণ করেছিলেন, জীবন-পণ করেছিলেন তার বাস্তব প্রতিষ্ঠার জন্য। রাম-

রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও গদ্য

মোহনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সংগে অংগাঙ্গি জড়িয়ে-ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা;—দুয়ে মিলে তাঁর ভাষাকে দুর্লভ বলিষ্ঠ স্বকীয়তা দিয়েছিল, —সে যুগের পক্ষে তা ছিল অনন্য-তুল্য। আশ্চর্য দূর-দৃষ্টির সংগে রমেশচন্দ্র দত্ত রামমোহনের রচিত বাংলা গদ্যের স্বভাব বিচার করেছেন,—

"....Bengali prose had not yet received the purity and grace, which subsequent writers have imparted to it. But Ram Mohan's rugged and well-reasoned style suited the great task he set before himself,—to battle single-handed against a host of unreasoning antagonists, and to expose evil customs and hurtful practices."১

সম্ভবতঃ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে২ হুগলী জেলার রাধানগরে রামমোহনের জন্ম হয়, এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর বাবা রামকান্ত রায় ছিলেন ভূম্যধিকারী। রামমোহনের মা তারিণী দেবী নিষ্ঠাবতী হিন্দু-গৃহিণী ছিলেন। দুই সহোদরের মধ্যে রামমোহন ছিলেন অনুজ; তা ছাড়া তাঁর বিমাতা এবং এক বৈমাত্রেয় ভাইও ছিলেন। রামকান্ত ঘোর বৈষয়িক ছিলেন; রামমোহনকেও বিষয়-বুদ্ধিতে অভিজ্ঞ করে তোলার চেষ্টায় রামকান্ত তাঁকে সেকালের সরকারী ভাষা আরবি-ফারসি শিক্ষা দেন। পিতার ইচ্ছা রামমোহনের মধ্যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল। রামকান্ত পুত্র ও পত্নীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করে দেবার পরেও রামমোহন পিতার নিজস্ব অংশের পরিচালন ভার পেয়েছিলেন, এবং সার্থকভাবে সে দায়িত্বের নির্বাহ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অল্পকাল পরে স্বয়ং রামকান্ত এবং তাঁর আর দুই পুত্র যখন সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট করেন, তখনো রামমোহন নিজের আর্থিক সমৃদ্ধি ধাপে ধাপে বাড়িয়েই যেতে পেরেছিলেন।

কিন্তু, প্রখর বৈষয়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরেও রামমোহনের জ্ঞানপিপাসা দূরগামী হয়েছিল। আরবি-ফারসি-জ্ঞান আহরণকালে তাঁর মনোভাব কি করে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার ইঙ্গিত ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। পারিপার্শ্বিক সমাজের অন্তর্বর্তী গ্লানি রামমোহনকে যে সেকালে হিন্দু ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন করে তুলেছিল,—সে কথাও বলেছি। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরবি-ফারসি ভাষায় লেখা তুহফাৎ-উল্-মুয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেও দুর্লভ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ করে বৈদিক শাস্ত্রে একেশ্বরবাদের মহিমা প্রত্যক্ষ করে রামমোহন রায় সেদিকে আকৃষ্ট হন। মূলতঃ ইস্‌লাম ও খ্রীষ্ট শাস্ত্র চর্চার ফলে তাঁর চিত্তে প্রথম একেশ্বরবাদের প্রতি আসক্তি ও পৌত্তলিকতার প্রতি বিরাগ দেখা দেয়। পরে বৈদিক শাস্ত্রকে আশ্রয় করে তাঁর নব-অনুরাগ দেশীয় জীবন-ভূমিতে নবীন ধর্মবোধ রচনার ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়। দার্শনিক-ভাবুক রামমোহন কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১। Literature of Bengal.

২। এ তারিখ নিয়ে সংশয় আছে।

এতে করে তাঁর জীবনে নিন্দা, তিরস্কার, অপমান, বিপদাশংকা অজস্র-ধারায় বর্ষিত হয়েছে;—তবু, তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল,—সাধনা ছিল অটুট্।

রামমোহনের সংগ্রাম ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে ছিল দ্বিমুখী; একদিকে তিনি স্বজাতি ও স্বজনদের অন্ধ সংস্কারের অচলায়তনে আঘাত করছিলেন, অন্যদিকে বিদেশী ধর্মযাজকদের অকারণ কটাক্ষের বিরুদ্ধে করেছিলেন স্বধর্মের মূল্য প্রতিষ্ঠা। রামমোহনের এই দ্বিমুখী কর্মধারার মূলে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল সত্যাসক্তি, আর প্রবলতর স্বাভিমান। সত্যের প্রতি অটুট্ আস্থা নিয়ে তিনি জাতির জীবনে মিথ্যার জালকে ছিন্ন-ভিন্ন করে-ছিলেন; অপর পক্ষে প্রবল স্বাভিমান ও স্বজাতি-প্রীতির বশে পরদেশিদের অন্যায় নিন্দা-চেষ্টারও করেছিলেন প্রতিরোধ। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আরো একটি বলিষ্ঠ উপাদান তাঁর তীব্র মানব-প্রেম। মানুষ তাঁর কাছে ঈশ্বরের সন্তান এবং সেই কারণেই মানব-প্রেম ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধ্য। আমাদের সমাজে তখনকার দিনে মানুষের চরম অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে-ছিল নারী জীবনের মর্মমূলে। সতীদাহ নিবারণ-চেষ্টার মহৎ ব্রত পূর্ব-কথিত দুটি প্রয়াসের সংগে যুক্ত হয়ে রামমোহনের সংগ্রামকে করেছে ত্রিপথগামী। এই সংগ্রামে তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ছিল, গভীর হৃদয়ধর্ম, দীপ্ত মনীষা এবং ক্ষুরধার লেখনী।

বাংলার ধর্ম এবং সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য বাঙালির ভাষাকেই রামমোহন মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভাষা তখন দুর্বল; ফোর্ট-উইলিয়ম যুগের দু-একজন পণ্ডিতের প্রতিভা-চিহ্নিত হলেও বিশৃঙ্খল। কি করে বাংলা ভাষা পড়তে হয়, কি করে সে ভাষা থেকে অর্থ উদ্ধার করতে হয়, সে সম্বন্ধেও সাধারণ পাঠক ছিল অজ্ঞ। তাই, 'বেদান্ত গ্রন্থের' 'অনুষ্ঠান' অংশে রামমোহনকে লিখতে হ'ল;—

বেদান্ত গ্রন্থ এবং বাংলা গদ্যের রীতি সংগঠনে রামমোহন

"প্রথমত বাংলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমায় অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।"

রামমোহনের নিজের কথাতেই এখানে তাঁর উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটেছে। পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য-সীমাকে তা অনেকদূরে ছাড়িয়া গেছে। আর, এই কারণেই, রামমোহনকে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য বাচ্য ভাষার অন্বয় নির্দেশ করতে হয়েছে। পাঠ্যেতর গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং তার ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রামমোহন এখানে সচেতন। বলা বাহুল্য, সাধারণ পাঠ্য পুস্তকও তিনি একাধিক রচনা করেছেন; কিন্তু সেখানে উদ্দেশ্যের এই স্পষ্টতা এবং ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক সংযোগ সাধন অপরিহার্য ছিল না। ফলে, সে ভাষা অনায়াস-পাঠ্য হলেও রামমোহনের বিশেষ 'স্টাইল'-এর স্পর্শ সেখানে নেই। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর আরম্ভ হয়েছে,—"ব্যাকরণ তাহাকে বলা যায় যাহার জ্ঞান দ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপি শুদ্ধি, অর্থাৎ যথাযোগ্য স্থানে পদ বিন্যাসের ক্ষমতা হয়।

রামমোহনের ব্যাকরণ

"ব্যাকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এক বর্ণ দ্বিতীয় পদ।"

কিন্তু 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'-এর 'ভূমিকায়' একই রামমোহন লিখছেন, —"মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্যের বেদান্ত চন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগত দিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থ-পরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য একবার প্রবর্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত হইবেন না, অতএব দ্বিতীয় বেদান্ত চন্দ্রিকার প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম।"

রামমোহনের ব্যক্তিত্বধর্মী বাংলা গদ্য

অথবা, 'বেদান্ত গ্রন্থে' রামমোহন লিখেছেন,—"এক বেদে কহেন দেহ-ত্যাগ করিয়া জীবের ঊর্ধ্বগতি হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্র-লোকে যান, তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুনর্বার জীব আইসেন এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয়। যদি কহ দেহের সহিত যে অভেদজ্ঞান জীবের হয় তাহার ত্যাগকে উৎক্রমণ কহি সেই উৎক্রমণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পুনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় নাই যেহেতু গমনাগমন দেহসাধ্য ব্যাপার হয় তাহার উত্তর এই।

'স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ!!'

"স্বকীয় লিঙ্গ শরীরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয়।"

'বেদান্ত গ্রন্থের' সূচনায় ভাষার অন্বয় সম্বন্ধে রামমোহন অতি অবহিত হয়েছেন,—কিন্তু, ওপরে উদ্ধৃত শেষ রচনা দুটির কোনোটিতেই অন্বয়ের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নি। অথচ, পাঠ্য ব্যাকরণের ভাষায় সে বিশুদ্ধি উপস্থিত। তা ছাড়া, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' এর তুলনায় অপরাপর রচনার

অপরিহার্য ছিল না; রামমোহন-রচনাবলীর সব কিছু প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য উপাদান বলে গণ্য হতে পারে না। তা হলেও, কালের হাতে রামমোহনই ছিলেন অব্যবহিত পরবর্তী যুগে বিকশিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুক্তিদূত। বাংলা গদ্যে ব্যক্তিত্ব-স্পর্শ ঘটেছিল প্রথম তাঁর হাতে;—তাঁর রচনাতেই প্রথম দেখেছি বিচারমূলক জীবন-জিজ্ঞাসা ও বিপ্লবাত্মক আত্ম-সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। রামমোহনের লেখায় সামাজিক রেনেসাঁসে যে বার্তা ধ্বনিত হয়েছে,—তার অনুবর্তনে রামমোহনোত্তর যুগে দেখা দিয়েছে সাহিত্যে রেনেসাঁস;—এখানেই সাহিত্য-ইতিহাসে রামমোহন-রচনাবলীর দীর্ঘ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ও সার্থকতা।

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

রামমোহনের পরে আলোচ্য পর্যায়ে প্রথম এবং প্রধান স্মরণীয় ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহনের যুগে গদ্য ছিল অ-পূর্ণাঙ্গ; কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ছিল দীপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে গদ্য ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। নধরগঠন সে ভাষা নূতন সাহিত্যের সম্ভাবনাকেই উন্মোচিত কর্‌ল না; শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সংগে তাঁর উপলব্ধি-কল্পনাকেও নিবিড় ভাবে ধারণ করে বিদ্যাসাগরের গদ্য দেখা দিল সারাদেহে নূতন সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্ভার বহন করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন "বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী"[১]—আমাদের ধারণা 'গদ্য' অর্থে কেবল গদ্য ভাষাই নয়, গদ্য সাহিত্যেরও 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু, সে-কথার আগে ইতিহাসের ক্রম-রক্ষার জন্য আরো দুটি নাম স্মরণ করব।

এঁদের প্রথম হচ্ছেন রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে কৃষ্ণমোহনের স্থান খুব উচ্চে নয়। বঙ্কিম-পূর্ব যুগে দুষ্পাঠ্য-কঠিন বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণমোহনের স্কুল-পাঠ্য গদ্যের উল্লেখ করেছেন।[২] সমগ্র রচনাবলী পাঠ করলে অবশ্য সর্বাংশে তাঁকে অনুরূপ নিন্দার ভাজন করা চলে না। তা হলেও, কৃষ্ণমোহন ব্যক্তিত্ব-প্রধান বাংলা গদ্যের অন্যতম লেখক যে ছিলেন না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবু, বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনার একমাত্র যুক্তি,—কৃষ্ণমোহন ছিলেন তাঁর সমকালীন বাংলার একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব, সেই সংগে তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের লেখকও। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন বলিয়াই বোধ করি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—৮৫) সেকালের একজন মনীষী এবং বিশিষ্ট লেখক হইয়াও দেশীয় সাময়িক

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন

১। বিদ্যাসাগর—চারিত্র পূজা।
২। বঙ্কিমচন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য।

পত্রের অথবা লেখক-গোষ্ঠীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।"৩ কারণ যাই হোক্, সেকালের বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে কৃষ্ণমোহন ছিলেন একক, আর আপন পথ ও মতেও ছিলেন অ-দ্বিতীয়।

ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন "সর্বাগ্রগণ্য" ছিলেন,—বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী।৪ কুলীন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান কৃষ্ণমোহন প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে এবং পরে হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ডিরোজিও-র প্রভাবে প্রথমে তিনি ঈশ্বর-বিমুখ হয়ে পড়েন, পাদ্‌রি ডাফ্‌-এর আওতায় এসে পরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মযাজকের মর্যাদা-সূচক পদেও তিনি দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে কৃষ্ণমোহন শিবপুর বিশপ কলেজের অধ্যাপনা গ্রহণ করেন; পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণমোহন যেমন নানা বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তেম্‌নি তাঁর মধ্যে ছিল একটি কবি-মনও। The Persecuted নামে ইংরেজি নাটকে মনীষী এবং শিল্পী কৃষ্ণমোহনের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা পুস্তক 'উপদেশ কথা' (১৮৪০) খ্রীষ্ট ধর্ম-যাজনা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণের সমষ্টি। বাংলা গদ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি কিন্তু পাঠ্য পুস্তক হিসেবেই রচিত। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' আসলে বিশ্বকোষ জাতীয়গ্রন্থ;—তের খণ্ডে বিভক্ত। প্রধানতঃ ইংরেজি এবং কিছু পরিমাণে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে এটি সংকলিত হয়। গ্রন্থটির ইংরেজি-বাংলা এবং কেবল বাংলা দু' রকম সংস্করণই প্রকাশিত হয়েছিল। 'ইজিপ্ত দেশের বর্ণন' করে কৃষ্ণমোহন লিখেছেন,—"একপ্রকার হংসরাজের বিষয়ে কথিত আছে যে সে ম্রিয়মান্ অবস্থায় ব্যতীত জীবদ্দশায় কদাপি গান করে না। কিন্তু আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে মধুর স্বরে গান করে একথারও মূল লৌকিক অবিদ্যামাত্র, তথাপি কবিগণ, সদ্বক্তা এবং দর্শনবেত্তারা তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,......"

মানতেই হবে, সমসাময়িক বাংলা গদ্যের তুলনায় কৃষ্ণমোহনের এ ভাষা প্রাঞ্জল, সরল এবং সাবলীল-ও। তবু, বাংলাগদ্যের ঊষাযুগে কৃষ্ণমোহন যে তাঁর যথোচিত প্রতিষ্ঠা পান নি, তার কারণ হিসেবে তাঁর খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বন জনিত জন-বিরুদ্ধতা অন্যতম বলে মনে হয়। কৃষ্ণমোহনের তৃতীয় গ্রন্থও একটি পাঠ্যপুস্তক,—ষড়দর্শন সংবাদ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল; কথোপকথনের ছলে এতে দর্শন-তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

ইংরেজি সংবাদপত্র Iquirer-এর পরিচালনা করে কৃষ্ণমোহন এককালে প্রচুর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন; ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কিছুকাল

৩। বাংলা সাহিত্যে গদ্য ৩য় সং।
৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ।

'সংবাদ সুধাংশু' নামে একখানি সাপ্তাহিকও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কৃষ্ণমোহনের বাংলা গদ্য-রচনা তাঁর ব্যক্তিত্বের অবয়ব-চিহ্নিত না হলেও, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

নিছক কালগত তথ্য-পঞ্জীর বিচার করলে বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখ করতে হয়। এই দুই মনীষী এক বছরে (১৮২০ খৃীঃ) জন্মেছিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'ভূগোল' ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারও আগে গুপ্ত-কবি'র সংবাদ প্রভাকরের প্রয়োজনে অক্ষয়কুমার যে গদ্য লিখতেন, তার প্রমাণ আছে। অথচ, বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গদ্যের নিদর্শন 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি'র প্রকাশ কাল ১৮৪৭ খৃীঃ। অতএব, প্রকাশকালের বিচারে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখক। এই বহিরঙ্গ তথ্যটুকুর 'পরে অতিমাত্রায় ঝোঁক দিয়ে অনেকে বিদ্যাসাগরের রচনার 'পরে অক্ষয়কুমারের প্রভাব অনুমান করেছেন। অথচ, সাহিত্যের ইতিহাসে এর চেয়ে মিথ্যা অনুভব সুলভ নয়। স্বয়ং রাজনারায়ণ বসু এ-বিষয়ে লিখেছিলেন, "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয়বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন।"১ বস্তুতঃ, যে গদ্যভাষার জন্য অক্ষয়কুমার আজ অবশ্য-স্মরণীয়, সে ভাষার জন্ম বিদ্যাসাগর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাদর্শের অনুবর্তনেই ঘটে-ছিল। কেবল এই কারণেই, সাহিত্য-ইতিহাসের বিচারে অক্ষয়কুমার পূর্ব-কথিত মহাপুরুষ দুজনের অনুবর্তী। আর, যেহেতু কেবল গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থের প্রকাশকালের তথ্য অবধারণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সাহিত্যের ভাব ও রূপধর্মের ক্রম পরিণতি যুগপৎ আমাদের আলোচ্য, তাই অক্ষয়কুমারকে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের উত্তর-ভূমিতেই প্রতিষ্ঠা করব।

অক্ষয় দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিল্পদক্ষতার পরিচয় প্রাঞ্জল করে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বিভিন্ন বাংলা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিধানগত অর্থ ব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে, এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীর মুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।"২ ডঃ সুনীতি-

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী দান

১। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।
২। সাহিত্য পরিষৎ সং বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী (সাহিত্য) ভূমিকা।

কুমার এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার বাচ্যাতীত রস-সৌন্দর্যের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। আর, সাহিত্যে রসের উৎস ভাবের ব্যঞ্জনায়। ঈশ্বরচন্দ্র ভাষাকে সুস্থ সম্পূর্ণ দেহ দিয়েছিলেন; তাকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করেছিলেন; তাতে রূপের সুষমা বাড়ে; কিন্তু রসের মধুরতার সংগে তার কোনো যোগ নেই। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রসের সে রসদ যুগিয়েছে তাঁর স্পর্শ-কাতর মনোলোকের ভাব-সমৃদ্ধি। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু ভাষার কারুকৃৎ ছিলেন না, ছিলেন প্রাণের শিল্পী। নিছক ভাষা-বোধ যতই সূক্ষ্ম ও পূর্ণাঙ্গ হোক্, তাতে রূপের কাঠামো নিখুঁত হতে পারে; কিন্তু ভাষা তাতে প্রাণ-সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে না। বাংলা পদ্যে মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' এই সত্যেরই ঐতিহাসিক প্রমাণ। অন্য দিকে, প্রাণের স্পর্শ যেখানে সজীব, ভাষা সেখানে জিয়ন-কাঠির ছোঁয়া-লাগা 'রূপকথার' রাজকুমারীর মত আপনা থেকে ওঠে জেগে। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা ভাষার জগতে সেই 'জিয়ন-কাঠি' হাতে এসে পেঁৗছেছিলেন। তাই, বাংলা সাহিত্যের ভাষা-ভিত্তিই নয়, আধুনিক বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক বীজও উপ্ত হয়েছিল তাঁর হাতে।

শিল্পী বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বকে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছেন কবি মধুসূদন দত্ত তাঁর একটি পত্রে ঃ—

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব

"The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother."

মহাকবির এই বিখ্যাত উক্তি বিদ্যাসাগর প্রতিভার উদ্দেশ্যে সহস্র শ্রদ্ধাঞ্জলির একটি মাত্র বলে মনে করি না। আমাদের ধারণা, মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব সমধর্মা ছিল। আর তাই, কবির পক্ষে সমাজ-নায়ক মহামানবের নিভৃত ব্যক্তিধর্মকে এমন সত্যরূপে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর-বীরসিংহের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন বিদ্যাসাগর; তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। আবাল্য দারিদ্র্য-পীড়ন এবং দুঃসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধন ছিল তাঁর নিত্য জীবনযাত্রার অংগ। জীবনের অনপনেয় কঠোরতার কাছে নিজেকে কেবল সঁপে দেননি তিনি; দারিদ্র্য-দুঃখকে সহজ সত্য বলে স্বীকার মাত্র করেই হননি ক্ষান্ত;—কঠিন জীবনকে অধিকতর কাঠিন্য দিয়ে জয় করেছেন। দুঃখকে যখন অসহ্য বোধ করি, তখনই দুঃখের হাতে হয় হার। দুঃখকে যখন অনতিক্রম্য মেনে মেনে নিই নীরবে, তখন তার কাছে করি আত্মসমর্পণ। কিন্তু যতই দুঃখ আসুক, তার সীমাকে সহজে অতিক্রম করে—স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ সাধনা যখন আরো বহু দূরে চলে যায়, দুঃখের পীড়ন তখন নিরর্থক হয়, দুঃখ হয় বিজিত। স্বেচ্ছাবৃত

কাঠিন্য-সাধনার মাধ্যমে সেদিনের বিদ্যার্থী প্রাচীন ভারতের তপোবনে এই দুঃখ জয়েরই জীবন-মন্ত্র আয়ত্ত করতেন বলে মনে করি। আমাদের আধুনিক জীবনের উষালগ্নে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপন স্বভাবে সেই দুঃখ জয়ের ব্রতে স্বতো-সিদ্ধ হয়েছিলেন; এখানেই তিনি প্রাচীন আর্য-জীবনের উত্তর সাধক। এবিষয়ে সব চেয়ে বড় কথা, আলোচ্য জীবনা-চরণের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর নিজ ব্যক্তিত্বের গভীরে এক ব্যাপক নিরাসক্তি ও উদার মূল্যবোধ রচনা করেছিলেন। নিজের সম্বন্ধে আসক্তি যত কমে, আতঙ্ক তত হয় লুপ্ত। আর, সকল আতঙ্ক-মুক্ত উদার ব্যক্তিত্বই জীবনের সর্ব-নিরপেক্ষ সত্য মূল্য আবিষ্কারে হয় সক্ষম-তম। এই দুঃখজয়ী, উদার নৈর্ব্যক্তিক জীবন-মূল্যবোধই বিদ্যাসাগরের জীবনে "genious and wisdom of an ancient sage"-এর পরিচয় অনাবৃত করেছে।

বিদ্যাসাগর-ব্যক্তিত্বের এই উদার-মুক্তিপথে শ্রেষ্ঠ সহায়ক হয়েছিল তাঁর দুর্লভ জ্ঞান-সাধনা। প্রথম বয়সের গ্রাম্য শিক্ষার শেষে নয় বছর বয়সে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং প্রায় সাড়ে বারো বছর ধরে ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রে "সমীচীনা বুৎপত্তি" উপার্জন করেন। ইংরেজি বিষয়েও তাঁর অধ্যয়ন সূচিত হয়েছিল এইখানে, —পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য-জ্ঞানে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রায় তুলনা-রহিত হয়েছিল। হিন্দু আইনের পরীক্ষায় হিন্দু-ল-কমিটির হাতেও তিনি উচ্চ প্রশংসার সংগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

ত্রিবিধ উপাদান

পরবর্তী জীবনে বিদ্যাসাগরেরর মধ্যে এই উদার সত্য জীবন-বোধ এবং অতলস্পর্শ জ্ঞান-সমৃদ্ধি তাঁর নিঃসংগ, একক কর্মসাধনাকে সংশয়-মুক্ত ঋজুতা দান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে তাঁর "অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব"-এর উল্লেখ করেছেন। এই পৌরুষ ও মনুষ্যত্বের উৎস ছিল বিদ্যাসাগর-ব্যক্তিত্বের মূলে। তাঁর নিরাসক্ত স্বভাব কোন ভয়েই ভীত ছিল না; তাঁর 'সত্য বোধ' তাঁর জ্ঞান-প্রদীপ্তির দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল,—ছিল সকল সংশয়মুক্ত।—এই নিঃসংশয় নিঃশঙ্কতাই বিদ্যাসাগরকে করেছিল ইংরেজ-জনোচিত উদ্যম ও উদ্দীপনার (Energy of an English man) অধিকারী।

বিদ্যাসাগরের অপার পাণ্ডিত্য, দুঃখজয়ী পৌরুষ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ মনুষ্যত্বের সংগে যুক্ত ছিল একটি নিভৃত স্পর্শাতুর হৃদয়! এখানেই তিনি কেবল বিদ্যা ও দয়ার সাগর নন,—কেবল শিক্ষাবিৎ ও অক্লান্ত-কর্মা সমাজ-বিপ্লবী নন, তিনি স্রষ্টা,—শিল্পী। এক অর্থে সৃষ্টি-মাত্রই বেদনা-সম্ভব; এদেশে শ্লোকের বুৎপত্তি কল্পনা করা হয়েছে 'শোকাৎ জাতং'—অর্থে। জীবন-মন্থন জনিত সেই বেদনানুভূতি বিদ্যাসাগরকে সৃষ্টি-প্রবন্ধ করে-

ছিল: সে উপলব্ধির প্রকাশ তাঁর নিজের লেখনী-মুখেই এক জায়গায় স্পষ্ট হয়েছে।—নয় বছরের দরিদ্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র সেকালের কলকাতার বিরূপ পরিবেশে শিশু-চিত্তের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন বড়বাজারের সিংহদের পরিবারে; তার বর্ণনায় তিনি নিজে লিখেছেন,—"এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু, আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অনুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা, এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ-পর্যন্ত আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য-মূর্তি, আমার হৃদয়-মন্দিরে দেব-মূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"১

রাইমণির নারীস্নেহের অজস্রতার মধ্যে বিদ্যাসাগরের স্পর্শাতুর শিশুমন নারীত্বের প্রতি অপার মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চয় করেছিল চির জীবনের জন্য। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন-সাধনার উৎস এই নারী-ভক্তির কেন্দ্রমূলে। নিজ জননী ও রাইমণির স্নেহ-স্পর্শে সঞ্জীবিত তাঁর ব্যক্তি-মানস সমকালীন বাংলার সমাজ-ব্যবস্থায় নারীত্বের চরম নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হয়েছিল। ব্যথাহত-চিত্তের সেই উত্তাল তরংগক্ষেপ সংস্কারক বিদ্যাসগরের বাহুমূলে অমেয় বলাধান করেছে; শিল্পী বিদ্যাসাগরের মর্মোৎসার ঘটিয়েছে তাঁর নিভৃত লেখনী-মুখে। বাংলার জননী-সুলভ হৃদয়-ধর্মই—(Heart of a Bengali mother) বিদ্যাসাগরের সকল সার্থক রচনার উৎস।—"তোমরা মনে কর, পতি-বিয়োগ হইলেই, স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না,

বিদ্যাসাগরের শিল্পি-স্বভাবের উৎস তাঁর হৃদয়ধর্ম

১। 'বিদ্যাসাগর'—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত দ্রষ্টব্য।

যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে সংসার তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

"হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!"১

এ-ভাষায় যে শক্তি ও তীক্ষ্ণতা আছে, তা কেবল সুষ্ঠু বাচন-বৈদগ্ধ্যের ফল নয়; বিষয়ের সংগে বাচকের মর্মান্তিক আন্তরিকতার স্পর্শে তা প্রদীপ্ত। বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যেই তাঁর নিবিড় মর্ম-সংযোগ ঘটেছে। ফলে, ব্যক্তিত্ব-প্রধান বাংলা গদ্য তাঁরই হাতে প্রথম শিল্প-ধর্মী হয়ে ওঠে। ওপরের রচনা যদি তার সার্থক পরিচয় বলে গৃহীত নাও হয়, তবু এর স্পষ্টতর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু, সে কথার আগে প্রথমে অনুভব করতে হবে, ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগরের সার্থকতার মূলেও আছে তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয়ধর্ম; বাংলা-গদ্যের বহিরবয়বকে তা সুচয়িত শব্দ-সম্ভারে সুঠাম রূপ দিয়েছে, দিয়েছে প্রাঞ্জল অর্থদ্যোতনা;—শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের স্বভাব-সিদ্ধ সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনা বাংলা-গদ্যে সুললিত ছন্দো-সুষমারও প্রবর্তন করেছে।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত রচনা, প্রকাশকাল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর আগে তাঁর সর্বপ্রথম রচনা 'বাসুদেব চরিত' লিখিত হয়েছিল শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অলম্বনে। হয়ত পৌত্তলিকতার

বেতাল পঞ্চবিংশতি

গন্ধ পেয়েছিলেন বলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষরা তা ছাপেন নি। তাহলেও, বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষাতেই কেবল শালীন বাচনভঙ্গি নয়, একটি পদ্ধতি-নিবন্ধ সুশৃংখল লেখক-মনের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে;—"অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসি-লেন, তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন, ভক্ষণ করিয়াছি। রাজা এককালে হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না।"

লক্ষ্য করা উচিত, এই প্রথম রচনাতেই বিদ্যাসাগর 'প্রবেশিয়া',

২। 'বিধবা বিবাহ'—পুস্তক ২য়।

'জিজ্ঞাসিলেন' ইত্যাদি নাম-ধাতুর সার্থক ব্যবহার করেছেন। বাংলা কাব্যে মধুসূদনের আবির্ভাব-কাল তখনও কত দূরে! শুধু তাই নয়, বাংলা গদ্যে ছেদ চিহ্নের সুপরিকল্পিত প্রথম প্রয়োগও এই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-তে। প্রত্যেকটি সু-অন্বিত পূর্ণাঙ্গ বাক্যকে একটি করে ছেদ চিহ্নের দ্বারা পৃথক্ বিচ্ছিন্ন করার রীতি বেতাল পঞ্চবিংশতিতেই প্রথম দেখা গেল। 'কমা' চিহ্নের ব্যবহার আরো একধাপ পরে সুরু হয়;—'শকুন্তলা'র প্রথম সংস্করণ থেকে। সেই অনুযায়ী 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র পরবর্তী সংস্করণ-গুলো সুচিহ্নিত হয়েছে। ওপরের উদ্ধৃতিতে 'কমা' চিহ্নের ব্যবহার আধুনিক যে-কোনো রচনার তুলনায় অতিমাত্রিক বলে মনে হবে। কিন্তু, এখানেও বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও শ্রুতি-শক্তির অনন্য-পূর্ব দক্ষতা লক্ষ্য করবার মত। ছেদ কিংবা 'কমা' প্রভৃতি বিরতি-চিহ্নের কল্পনা করা হয় বিশেষভাবে শ্বাস-বিরতি এবং বাগ্‌যন্ত্রের বিরামের জন্য। উচ্চারণের সময় এ-দুটির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। বিরতি-চিহ্নের দ্বারা এই স্বাভাবিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার সংগে সংগে বাক্যের অর্থপ্রকাশকেও প্রাঞ্জলতর করা চলে। বিরতিহীন একটানা উচ্চারণ অর্থ প্রকাশের পক্ষে হানিকর। ভাষার অধিকার একবার আয়ত্ত হলে, বক্তার অবচেতন আকাঙ্ক্ষাই শ্বাস-বিরতি ও অর্থ-বিরতিকে এক সূত্রে বেঁধে দেয়। কিন্তু, যে যুগে বাক্য ছিল অপূর্ণ-গঠিত, তার অন্বয় ছিল সাধারণ পাঠকমাত্রের অজ্ঞাত, সে যুগে বিদ্যাসাগরের পক্ষে একাধারে ভাষা, ভাষার পাঠক এবং অর্থবোদ্ধা শ্রোতাকে এক সংগে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে। উদ্ধৃত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র অংশটুকু পড়লেই দেখ্‌ব, বিদ্যাসাগর-চিহ্নিত প্রত্যেক স্থলে 'কমা' চিহ্নের ব্যবহার না করলেও, অল্পবিস্তর প্রত্যেক যায়গাতেই আমরা বিরত হই; বিদ্যাসাগরের নির্দেশিত-পরিমাণ বিরতির ব্যবহার করলে কেবল বাক্যের স্পষ্ট অর্থদ্যোতনাই ঘটে না,—ছন্দের স্পন্দনও ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

ও বাংলা গদ্যরীতির পূর্ণাঙ্গতা

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হিন্দী 'বেতাল পাচ্চিশী'র অনুসারে লিখিত।

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় সাহিত্যকর্ম 'শকুন্তলা' ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সন্দেহ নেই, এটিও অনুবাদ গ্রন্থ,—কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের অনুবাদ। কিন্তু, একথা আজ অবশ্য স্মরণীয় যে, বিদ্যাসাগরের কোনো অনুবাদই হুবহু পরানুকরণ নয়। মূল উপাখ্যান অংশের আশ্রয়ে সর্বত্রই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবন-বোধ সৃজনধর্মী অভিনবতার অভিমুখী হয়েছে। বিদ্যাসাগরের শিল্পধর্মের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর পরিবেশ-সচেতনতা। পারিপার্শ্বিক জীবনের সংগে বিদ্যাসাগরের যোগ যেমন ছিল অন্তরঙ্গ, তেমনি তাঁর শিল্প-দৃষ্টিও ছিল সেই জীবন-প্রভাবিত। বিদ্যাসাগরের

শকুন্তলা,

ভাবনা জীবনের মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর রচনা তেমনি প্রসারিত হয়েছে জীবনের প্রয়োজন ও রস-ঔৎসুক্যকে অনুসরণ করে। 'ভ্রাতি-বিলাস' (১৮৬৯ খ্রীঃ) নাম দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের Comedy Of Errors গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করেছিলেন—তার 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছিলেন,—"বাংলা পুস্তকে ইউরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না; বিশেষতঃ যাহারা ইংরেজি জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। সেই দোষের পরিহার বাসনায়, 'ভ্রান্তি বিলাসে' সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে, উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোন অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না। ইতিহাসে বা জীবন চরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে সেরূপ নহে।"

ও ভ্রান্তি বিলাস

বিদ্যাসাগরের অভিমতের সংগে একালের অনুবাদকদের মতের অনৈক্য ঘট্‌তে পারে। কিন্তু 'ভ্রান্তি বিলাসের' পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন, বিদেশী উপাখ্যানে মূল বিষয়ের তারতম্য না ঘটিয়েও বিদ্যাসাগর তাকে বেশ একটি দেশীয় রূপ দিতে পেরেছেন। এই দেশীয় রূপ-সজ্জার মধ্য দিয়ে দেশীয় জীবন-সঞ্জীবনই শিল্পী বিদ্যাসাগরের মৌলিক দান। 'শকুন্তলা' গ্রন্থে এই শিল্প-কর্ম আরো প্রাঞ্জল,—আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

তথা, বিদ্যাসাগরের শিল্পধর্ম

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক মূলতঃ রোমান্‌টিক্‌ প্রেম-কথা। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই কাব্যের ব্যাখ্যা নূতন জীবনমূল্যে ভূষিত হয়েছে। কালিদাসের নাটক সর্বাংশে এই মূল্যবোধের ধারকতা দাবি যে করতে পারে না, মূলগ্রন্থের পাঠকমাত্রই তা স্বীকার করবেন। কালিদাসের সৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার পার্থক্যমূলে রয়েছে উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি জীবনাদর্শ বোধের প্রভাব। উনিশ শতক থেকেই বাংলার সমাজ ও সাহিত্যজীবন যুগপৎ আলোড়িত হয়ে উঠেছে নারীত্ব সম্বন্ধীয় নূতন মর্যাদা-বোধকে কেন্দ্র করে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, এমন কি আরো পরবর্তী কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত বাংলার সমাজ-বিপ্লব নারীকেন্দ্রিক;—বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য নারী-প্রধান। এর ঐতিহাসিক প্রচ্ছদটুকু পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্লেষণ করব;—এখানে শুধু স্মরণ করি, অতি আধুনিক কালের বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার জীবন-ব্যবস্থা ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। আর উনিশ শতকের আলোচ্য সামাজিক বিপর্যয়ের দিনে নারীর স্নেহ-ত্যাগ-তিতিক্ষাকে আশ্রয় করেই সমাজ মহামৃত্যুর শেষ ধাপ থেকে আত্মরক্ষা করেছিল। নারীর

পরিবারাশ্রয়ী কল্যাণ-ধর্মী নারীত্বের ধ্যানী বিদ্যাসাগর

সেই ধাত্রীমূর্তির প্রতি তাকিয়ে মধুসূদন গদ্‌গদ-বাক্‌ রুদ্ধকণ্ঠ; বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত ভাবতন্ময়; রবীন্দ্রনাথ নারীর এই 'কল্যাণী' মূর্তির উদ্দেশ্যে তাঁর 'সর্বশেষের গান'টি নিভৃতে নিবেদন করেন; শরৎচন্দ্র সকল নারীকেই অর্পণ করেন অকুণ্ঠ বিশ্বাসের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

নারীর এই পরিবারাশ্রয়ী কল্যাণী মূর্তির প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে বিদ্যাসাগরের নিভৃত ব্যক্তি-চেতনায়,—স্বয়ং রাইমণি, এবং বিদ্যাসাগরের পিতামহী ও জননীও সেই উপলব্ধির প্রাণময়ী উৎস। তাই, কালিদাসের কালের রোমান্‌টিক প্রেম-কথার বিশ্বস্ত অনুবাদ করতে করতে, ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব-নিহিত গার্হস্থ্য প্রেম-সৌন্দর্যের ছায়াসম্পাৎ ঘটেছে তার 'পরে। অনুবাদকের লেখনী-মুখে এখানেই শিল্পীর দেশ-কালোচিত নিবিড় জীবনানুভূতি মুক্তি খুঁজেছে। পরিচয় দিচ্ছি একটু ঃ—

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের প্রথম অংকে, রাজা দুষ্মন্ত আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনটি সখীর কাছে। প্রিয়ংবদার মুখের ভরসা-বাক্যে নির্ভর করে শকুন্তলার বিবাহ-সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি। প্রিয়ংবদাও যথোচিত উত্তর দিয়েছে। তখন—

'শকুন্তলা' বনাম অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌

"শকুন্তলা—(সরোষমিব)—অনসূএ, গমিস্‌ সং অহং।

অনসূয়া—কিন্নিমিত্তং।

শকুন্তলা—ইমং অসংবন্ধ-প্পলাবিনিং পিঅংবদং, অজ্জাএ গোদমীএ নিবেদইস্‌সং।

* * *

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাং নিরুন্ধ্য)—হলা ন দে যুত্তং গন্তুং।

শকুন্তলা—(সভ্রূভেদম্‌)—কিন্নিমিত্তং।

প্রিয়ংবদা—রুখ্‌ক-সেঅনে দুয়ে ধারোসি মে। এ হি দাব অত্তাণং মোয়াবেহি তদো গমিস্‌সি (ইতি বলাদেনাং নিবর্তয়তি)।"

মূল গ্রন্থাংশের অনুবাদে বিদ্যাসাগর লিখেছেন,—

"শকুন্তলা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অনুসূয়ে! আমি চলিলাম; আর আমি এখানে থাকিব না। অনুসূয়া কহিলেন, সখি! কি নিমিত্তে? শকুন্তলা বলিলেন, দেখ, প্রিয়ংবদা, যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে; আমি আর্যা গোতমীর নিকট গিয়া এই সকল কথা বলিব।...... শকুন্তলা কিছু না বলিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে আট্‌কাইয়া কহিলেন, সখি! তুমি যাইতে পারিবে না; আমার এক কলসী জল ধার, আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব। শকুন্তলা কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত, কলসী লইয়া, জল আনিতে উদ্যত হইলেন।"

উদ্ধৃত দুটি অংশ তুলনা-মূলক ভাবে পড়লে দেখ্‌ব,—মূলের বাচ্য বিষয় অনুবাদে অটুট্‌ রয়েছে। এখানে বিদ্যাসাগর কালিদাসের বিশ্বস্ত অনুবাদক। কিন্তু, মূলের ভাষা অনুবাদে হুবহু অনুসৃত হয় নি,—বরং অনেকটাই পাল্‌টেছে। প্রাকৃত এবং বাংলা ভাষার বাচকদের মত দুটি বাচন-ভঙ্গির মধ্যেও যে অতঃস্বভাবগত পার্থক্য ছিল, স্পর্শকাতর কান ও মন দিয়ে, বিদ্যাসাগর তা অনুধাবন করেছেন। বাগ্‌-ভঙ্গির মধ্য দিয়ে তপোবন-নায়িকাদের চরিত্রে বাঙালি-জীবনের স্বভাব-ধর্ম উজ্জীবিত করে তুলেছেন তিনি;—এখানেই বিদ্যাসাগর জীবন-নিষ্ঠ শিল্পী। কালিদাসের যুগ, জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যে পাঠকের কোনো পরিচয় নেই, উদ্ধৃত অনুবাদের মাধ্যমে তিনিও নিত্য-দেখা বাঙালি জীবনের নিভৃত রোমান্‌টিক্‌ সৌন্দর্যটুকুকে প্রত্যক্ষ করে উল্লসিত হবেন;—একেই আমরা বলেছি, বিদ্যাসাগরের হাতে অনুবাদ-সাহিত্যের নবজীবন-সঞ্জীবন। উপরের উদ্ধৃতির একেবারে শেষ বাক্যটি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সংযোজন। আমাদের উদ্ধৃত মূল অংশের শেষে আছে, ব্রীড়াবনতমুখী কুপিতা শকুন্তলাকে জোর করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়ংবদা,—'বলাদেনাং নিবর্তয়তি';—কিন্তু বিদ্যাসাগর লিখ্‌লেন,—"শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ কুপিতা হইয়া, ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত, কলসী লইয়া জল আনিতে উদ্যত হইলেন।"

সহৃদয় পাঠকমাত্রই প্রথমাংশের নিষ্ক্রিয় পরোক্ষতা (Passivity) এবং অনুবাদ অংশে নায়িকার সক্রিয় সজীব সৌন্দর্যের পার্থক্য লক্ষ্য করবেন। তাছাড়া, জীবন-সচেতন বাঙালিমাত্রই বিদ্যাসাগরের ঐ একটিমাত্র বাক্যে সখীজন-পরিবৃতা অভিমান-কোন্দল-রতা জলের ঘাটের যুবতী বাঙালিনীর রোমান্‌টিক মূর্তি আনুপূর্বিক প্রত্যক্ষ করবেন। বিদ্যাসাগরের হাতে লেখনী এখানে তুলির কাজ করেছে। এমনি করেই 'কালিদাসের কালের' তপোবন-কথাকে, আমাদের কালের বাংলার পরিবারাশ্রিত সমাজ-জীবনের দাওয়ায় টেনে এনেছেন বিদ্যাসাগর।

তৃতীয় অঙ্কে প্রণয়-তাপ-তপ্তা শকুন্তলাকে সখীরা লতামণ্ডপে নিভৃতে মিলিত করেছেন দুষ্মন্তের সংগে। আর্যা গোতমীকে ভয়; কখন না তিনি শকুন্তলার অনুসন্ধান করেন; তাই তাঁকে নিবৃত্ত করা হয়েছে শকুন্তলার গ্রীষ্ম-তাপদাহজনিত অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে। সমাগত সন্ধ্যায় আর্যা গোতমী এসেছেন রুগ্না বালিকার সন্ধানে; বিদ্যাসাগর লিখছেন—

"কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হা পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে

শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্বশরীরে সেচন করিয়া, কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন, এই অসুখ তুমি একলা আছ বাছা কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাহার অনুগামিনী হইলেন।"

বাহুল্য বলে, মূল অংশ উদ্ধৃত করছি না। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান করে দেখবেন, মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করেও বাচন-ভঙ্গি ও বিন্যাসের বিশিষ্টতায় এই তপোবন-উপাখ্যান বর্ণনার মধ্যে বিদ্যাসাগর একটি নিবিড় গার্হস্থ্য সৌন্দর্য প্রতিফলিত করেছেন। আর্যা গৌতমী ও তপোবন-কন্যার কপোপকথন রূপান্তরিত হয়েছে 'পিসি'-'ভাইঝি'র নিভৃত মমতা-বোধে। সংলাপ-অংশে কথ্য ঢং-এর ব্যবহার-ভঙ্গিও লক্ষ্য করবার মত; পরিবেশকে তা আরো ঘন-সন্নিবিষ্ট করেছে। সবার উপরে আর্যা গৌতমীর মহিমাকে ছাপিয়ে রাইমণির মধুরিমাটুকুই কি করে সারাটি বর্ণনায় বিচ্ছুরিত হয়েছে, তাই অনুভব করতে বলি।—এখানে নারী-কেন্দ্রিক এমন এক জীবনকে প্রত্যক্ষ করি,—যে নারী বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদের শান্তিমন্ত্র পাঠ করে কল্যাণ সিঞ্চন করেন না; তপঃকাঠিন্যের তেজস্বিতায় জীবনকে করেন না ঋদ্ধ;—এই সেই নারী যাঁকে উদ্দেশ করে বাংলার গৃহপালিত জীবনের কবি সতৃষ্ণ কণ্ঠে গেয়েছেন,—

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্প কানন-মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ আপন গৃহ কাজে ;
বাইরে তোমার আম্র শাখে স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

* * *

বিদ্যাসাগর সাহিত্যের ঐতিহাসিক ফল-শ্রুতি

নদীর মতো এসেছিলে গিরি শিখর হতে,
নদীর মতো সাগর-পানে চল অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা সেই প্রবাহের গভীর রেখা
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল তীর্থ-সলিল ঝরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥
তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্য কুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে

কত যে ফুল কত আকুল মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে ॥"১

যে ফুল রবীন্দ্রনাথে ফলভার-সন্নত, বিদ্যাসাগরে তা সদ্য মুকুল-সম্ভাবিত। সত্য বটে, বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাই হয় পাঠ্যপুস্তক, নয় অনুবাদ, এবং এজন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও কটাক্ষভাজন হয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের হাতে বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা সকল কটাক্ষের অতীত সমুচ্চ শীর্ষে। সে যুগে আদর্শ পাঠ্য ভাষাগ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল। তাছাড়া, ভাষার সেই গঠমানতার যুগে শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য থেকে সার্থক অনুবাদেরও ছিল বিশেষ প্রয়োজন। উন্নত ভাবনার অনুষঙ্গে জাতীয় চিন্তার সমৃদ্ধি ও পুষ্টির পথ তাতে মুক্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র একাধারে ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে সার্থক অনুবাদ করে জাতির চেতনাকে বহির্জগতের সংগেই কেবল যুক্ত করেননি,—নবজাগ্রত ঐতিহ্যের প্রতিও করেছিলেন মর্ম-সম্পৃক্ত! সে যুগে রস-সফল মৌলিক সৃষ্টির উপযোগী জীবন-ভূমি গড়ে ওঠেনি। উত্তরাধিকারীদের জন্য সমাজ-বিপ্লবী বিদ্যাসাগর একহাতে রচনা করেছেন সেই বাস্তব জীবন-ভিত্তি, আর একহাতে সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর সৃষ্টি করেছেন সেই জীবন-মূল্যবোধের প্রতি সৌন্দর্যাকর্ষণ;—তাঁর শিল্পি-মূর্তির এখানে দ্বৈতরূপ।

সাহিত্যে এই জীবন-মূল্যবোধ আবার ব্যক্ত হয়েছে 'সীতার বনবাস'-এ (১৮৬০ খৃীঃ)। এখানে উপাখ্যান চয়নে বিদ্যাসাগর অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন; প্রথম ৩টি অধ্যায় ভবভূতির 'উত্তর রাম চরিত' থেকে নেওয়া; বাকি উপাখ্যান নানা সূত্র থেকে আহৃত। এই আহরণের মূলেও নিহিত আছে গার্হস্থ্য জীবন-রস-পিয়াসী বাঙালি বিদ্যাসাগরের মন। 'আলেখ্য দর্শন'-এর চিত্রানুসরণে এই মমতাতুর মনের প্রকাশ অনাবৃত।

সীতার বনবাস

উদ্ধৃতি দীর্ঘতর করে লাভ নেই; বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাবলীর মধ্যেও একটি সাহিত্যিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পেরেছিল তাঁর নিভৃত পারিবারিক জীবন-মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে। 'বিধবা-বিবাহ' বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ খৃীঃ) থেকে তার নিদর্শন প্রথমেই উদ্ধার করেছি। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বাংলা-গদ্যে লিখিত প্রথম শোক-কাব্য বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এখানেও সাহিত্যিক মূল্য যদি কিছু থাকে, সে ঐ নিভৃত চিত্তের স্নেহার্তি। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের শিশু পৌত্রী 'প্রভাবতী'র অকালমৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে স্নেহান্দোলিত চিত্ত বিদ্যাসাগর প্রভাবতী সম্ভাষণ রচনা করেছিলেনঃ—"বৎসে প্রভাবতি! তুমি সকলের মমতা পরি-

বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব

১। কল্যাণী—রবীন্দ্রনাথ।

ত্যাগ করিয়া, একেবারে নয়নের অন্তরাল হইয়াছ; কিন্তু আমি অনন্যমনাঃ হইয়া, এরূপ অবিচলিত স্নেহভরে নিরন্তর তোমার অনুধ্যান করি যে, তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার নয়ন পথের অতীত হইতে পার নাই।" এই "অনন্যমনাঃ অবিচলিত স্নেহে" সমাকুল হৃদয়-ধর্মই বিদ্যাসাগরের অনুবাদ ও মৌলিক সাহিত্য-কর্মকে প্রাণ-সঞ্জীবিত করেছে। এখানেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার উৎসমুখে অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা বিদ্যাসাগরের যথার্থ শৈল্পিক মর্যাদা।

প্রভাবতী সম্ভাষণ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর-প্রতিভার পরিচয় নির্ণয় করার পরে নিখুঁত গ্রন্থ-তালিকার নির্দেশ আর অপরিহার্য নয়। তাহলেও স্মরণ করতে হবে, শুধু ভাবসমৃদ্ধিতে নয়, রূপ-বৈচিত্র্যের দিক থেকেও বিদ্যাসাগরের রচনা-বৈচিত্র্য ছিল সে যুগে অতুলনীয়। এই বিচিত্র রচনা সম্ভারের মধ্যে আরো আছে,—মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)-এর অনুবাদ (১৮৬০), জীবন চরিত (১৮৪৯ খ্রীঃ)—'চেম্বার্স বায়োগ্রাফি' পুস্তকের অনুবাদ, বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮ খ্রীঃ) "মার্শমান সাহেব রচিত ইংরেজি গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্বক সংকলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।"

অন্যান্য রচনা

'চরিতাবলী' (১৮৫৬) লিখিত হয় 'ডুব্‌লে', 'রস্কো' প্রভৃতির জীবন কথা অবলম্বন করে। আখ্যানমঞ্জরীর রচনাকাল ১৮৬৩ খ্রীঃ। আলোচ্য রচনাবলীর অধিকাংশই পাঠ্য পুস্তক হিসেবে কল্পিত; কিন্তু প্রত্যেকটি রচনার ভাষা ও বিষয়ে বিদ্যাসাগর-ব্যক্তিত্বের একান্ত স্পর্শ নিবিড় হয়ে আছে।

বিদ্যাসাগরের নানামুখী রচনার নিদর্শন হিসেবে তাঁর স্বরচিত জীবন চরিত (১৮৯১ খ্রীঃ)-এর উল্লেখ করতে হয়। আজ বলা কঠিন, বাংলা গদ্যে প্রথম 'আত্মজীবনী' গ্রন্থের লেখক বিদ্যাসাগরই ছিলেন কিনা। নিজের জীবদ্দশায় তিনি এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেননি; তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে বাংলায় একাধিক আত্মচরিত প্রকাশিত হয়। তাহলেও বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবনচরিত যে বাংলা গদ্যের আদি-যুগে আত্মচরিত রচনার একটি স্বাধীন প্রয়াস তাতে সন্দেহ নেই। 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) জাতীয় বেনামী রচনায় বিদ্যাসাগরের দক্ষতার নিদর্শন মনোমুগ্ধকর।

স্বরচিত জীবন-চরিত

বাংলা গদ্য-রচয়িতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের দক্ষতা সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণ; বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্পর্শাতুর জীবন-ভাবনাময় চেতনার সিদ্ধি অনাগত যুগের সার্থক পথিকৃৎ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরে আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্যে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের অপত্যগণকে কেন্দ্র করে আধুনিক বাংলার শিল্প-সাহিত্যে সমুজ্জ্বল ঐতিহাসিক যুগ গড়ে উঠেছিল,—এই ইতিহাসের রস ও রসদের উৎস ছিল দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-পিয়াসী মন এবং ভাব-সমাহিত উপলব্ধি। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একটি অসীমাভিসারী চিত্ত; প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথের অজস্র চেষ্টাতেও যা বৈষয়িকতার গভীরে বাঁধা পড়েনি। বিষয়ের দায়িত্বকে স্বীকার করেছিলেন মহর্ষি, কিন্তু বিষয়ের বন্ধনকে করেছিলেন অতিক্রম। তাঁর চেতনা ছিল ব্রহ্মাভিমুখী,—মন ঘুরে ফিরেছে হিমালয়ের দুর্গমতায়, বোলপুর-সুরুলের জনমানবহীন মহা-প্রান্তরে। মহর্ষির এই মুক্ত-শুদ্ধ মানস তাঁর চেতনাকে সত্যাভিমুখী করেছিল; আর নিবিড় সেই সত্যানুভূতি তাঁর রচনা মাত্রকে প্রসাদগুণে করেছে সমৃদ্ধ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথের ঐতিহাসিক বৈভব-সমৃদ্ধির মধ্যে মহর্ষির জন্ম হয় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে। তিনি গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ এই দুই সহোদরের অগ্রজ ছিলেন,—প্রিন্‌সের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশব অবধি জ্ঞানমনীষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল গভীর। রামমোহন রায়ের 'এংলো-হিন্দু স্কুল'-এ মহর্ষির শিক্ষা সুরু। এখানেই তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা' নামক ছাত্র প্রতিষ্ঠিত সভার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। সে কালের তুলনায় এই সভার উদ্দেশ্য সত্যই ছিল বৈপ্লবিক। কল্‌কাতা "মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই। অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ"-ই "সর্বতত্ত্ব-দীপিকা" সভার উদ্ভব। পরবর্তী-কালের বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' সংগঠনের হাতেখড়ি হয় এখানেই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজেও পড়েছিলেন কিছুকাল। শিক্ষান্তে তাঁকে পিতার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও সাধনা ব্যয়িত হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও বিকাশ সাধনে। দেবেন্দ্রনাথের যা কিছু লিখন-কর্ম, তাও প্রধানতঃ ব্রাহ্ম-সমাজ ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে আশ্রয় করে। তবু, সাহিত্য-ইতিহাসেও তার দাম কম নয়। রাজনারায়ণ বসু এ-বিষয়ে লিখেছিলেন,—"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষু সমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্র বাবু ধর্ম-প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন

দেবেন্দ্রনাথের গদ্য স্বভাব

নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণের জন্য কতই যে উপকৃত, তাহা বলা যায় না।"১

বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধির ঐকান্তিকতায় 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' স্থানে স্থানে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে;—তাঁর ব্যক্তিত্ব-স্পর্শে ধর্মের আলোচনা হয়েছিল রস-নিষিক্ত ঃ—"ভূলোকে, দ্যুলোকে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, ঊষাকালে, সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ বীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন। ঊষার উন্মীলনের সংগে সংগে সূর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। ঊষার আগমনের সংগে সংগে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়।"

উপরের রচনায় প্রাঞ্জলতা ও ঋজুতার সংগে বক্তার অন্তর্নিহিত চেতনার একটি আত্মসমর্পণ ও তদাত্মতার সুরও অনুস্যূত হয়েছে,—আর, সেই তন্ময় তদাত্মতাই মহর্ষির ভাষাকে সাহিত্যের পর্যায়ে করেছে উন্নীত। এখানে স্মরণ করা উচিত বিদ্যাসাগর-প্রতিভায় সাহিত্যিক প্রতিশ্রুতি যেমন ছিল, তেমনি সৃজনী প্রয়াসও ছিল সক্রিয়। কিন্তু, মহর্ষির লেখায় সাহিত্যিক প্রচেষ্টা স্পষ্টতঃ কোথাও নেই; তাঁর অধিকাংশ রচনাই মূলতঃ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার সংকলন,—পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতা থেকে ব্রাহ্মধর্ম (১৮৫১-৫২), ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬৯-৭২) ইত্যাদি বিভিন্ন পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। তবু, এখান থেকেই বাংলা ভাষা সাধারণ ভাব-প্রকাশে স্পষ্টতা ও সরলতার সংগে সহজ সরসতাও আয়ত্ত করেছে। এটুকু বাংলা গদ্যে মহর্ষির তদাত্মতা পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দান বলে মনে করি;—মহর্ষির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'স্বরচিত জীবনচরিতে'ও (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) এই সত্যই প্রকাশিত ঃ—

"সূর্য অস্তের কিছু পূর্বে সায়ংকালে সুংঘ্রি নামক পর্বত চূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান, কোন পর্বতের আপাদমস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক একগ্রামে দশ-বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্যকিরণে দীপ্ত

বাংলা গদ্যে মহর্ষির ব্যক্তিত্ব চিহ্ন

১। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

পাইতেছে। কোন পর্বত আপাদ-মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্বতের শোভাবর্ধন করিতেছে। প্রতি পর্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শংকা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজভৃত্যের ন্যায় সর্বদা সশংকিত,—একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্বত-শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি।”

—এই তদাত্ম-তন্ময়তাই উত্তরাধিকার সূত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ও রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষির শিল্পি-পুত্র তিন জনেরই স্বভাব-মূলে প্রেরণা-রূপে বর্তমান ছিল।

“১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত” ‘জীবনকাহিনী’ রচনা করে মহর্ষি প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দিয়েছিলেন; নির্দেশ ছিল তাঁর দেহান্তের পরে গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদও মহর্ষি আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর পত্রাবলীও স্থানে স্থানে তাঁর উপলব্ধির গভীরতায় রস-মধুর হয়ে আছে। এসব ছাড়া বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। আলোচ্য অধ্যায়ে এ পর্যন্ত আহৃত তথ্য থেকে বোঝা যাবে বাংলা গদ্যে ব্যক্তিত্ব-প্রধান পৃথক্ বিচ্ছিন্ন রচনার সম্ভাবনা এই সময়েই আভাসিত হয়ে উঠ্‌ছিল,—ভাষা ও সাহিত্যের বিচিত্র বহুল প্রসারের প্রয়াসও হচ্ছিল অঙ্কুরিত। সেই প্রথম অভ্যুদয়ের যুগে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, মনীষা ও ব্যক্তিত্বকে একত্র সংবদ্ধ করেছিল,—সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক পরিণতিকে এক সংগে করেছিল পরিবেশন। এখানেই তার অতুল্য ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

“আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার” উদ্দেশ্যেই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্‌টোবর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হয়।”[১] প্রথম অধিবেশনে সভাটির নাম রাখা হয়—তত্ত্বরঞ্জিনী, দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে ‘তত্ত্ববোধিনী’ নাম প্রবর্তিত হয়। ‘তত্ত্ববোধিনী সভার’ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার কর্মধারা তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল—(১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং (৩) বঙ্গদেশে বেদবিদ্যা প্রসারের জন্য বারাণসী থেকে বিদ্যার্থীদের শিক্ষিত করে আনা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যাপক প্রসার;—বিশেষ করে কল্‌কাতার বাইরের যে সকল ‘ব্রহ্ম-নিষ্ঠ’ প্রত্যক্ষভাবে কলকাতার ‘সমাজের’ সংগে যোগ রাখ্‌তে পারতেন না, তাঁদের

১। স্বরচিত জীবনচরিত-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপকারার্থই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল পরিকল্পনা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম-চেতনার মধ্যে একটি সহজ উদারতা ছিল, ফলে ধর্ম-সভাকেও তিনি সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করে জাতির বৃহত্তর জীবন-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী' সভার একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং "শেষ পর্যন্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন।"১ তেমনি, ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে পরিকল্পিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম থেকেই সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, সমাজ-নীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তত্ত্ববোধিনীর এই বহু বিষয়াভিমুখিতার জন্য অক্ষয় কুমারের প্রয়াসই ছিল প্রধান। তবু পত্রিকাটির ধর্ম-নিরপেক্ষ উদারতার পরিচয় পাই তার প্রকাশরীতি লক্ষ্য করে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' মুদ্রিতব্য বিষয় নির্বাচনের জন্য ছিল একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ তার সভাপতি হলেও, প্রতি বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যের মতকেই গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা হত। অন্যান্যের সংগে প্রথমাবধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ছিলেন এই সমিতির সক্রিয় সদস্য। সমকালীন বাংলার নাগরিক জীবনে জ্ঞান-চিন্তা, ধর্ম-স্বাদেশিকতা, সাহিত্য-বিজ্ঞান,—এক কথায় আনুপূর্বিক জীবন-বোধের শ্রেষ্ঠ পরিবাহক ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বাংলা সাহিত্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' আর একটি মহৎ দান মনীষী অক্ষয় কুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনীর' প্রথম প্রকাশ ঘটে। পরে, দীর্ঘ বারো বছর কাল তিনি এই গুরুদায়িত্ব বহন করেন। সেকালের কৃতবিদ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সংগে প্রতিযোগিতা করেই অক্ষয় কুমার এই পদ লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্বন্ধে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

অক্ষয় কুমার দত্ত

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয় কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।"২ আগেই বলেছি, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যে বহু জ্ঞান-বিষয়িণী হয়েছিল, তারও মূলে ছিলেন অক্ষয়কুমার।

অক্ষয় কুমার যেমন তত্ত্ববোধিনীকে গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি 'তত্ত্ববোধিনী'-কে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ বাংলা গদ্যে তাঁর অভিব্যক্তি সার্থক হয়েছিল। আগে বলেছি, আমরা যে অক্ষয় কুমারকে চিনি তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সংগে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। এ কথার অর্থ অক্ষয় কুমারের ব্যক্তিত্বের অস্বীকৃতি নয়; বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উৎস-সংকেত

১। দ্রষ্টব্য—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাঃ সাধকচরিতমালা—যোগেশ চন্দ্র বাগল।
২। 'ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বর্ষের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

মাত্র। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে অক্ষয় কুমার জ্ঞান-যোগী,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও লেখক। এই বিজ্ঞান-অন্বেষণই তাঁর ব্যক্তিত্বকে গঠিত করেছিল,—তার প্রথম স্ফূর্তি বাল্যের জ্ঞানানুসন্ধিৎসার মধ্যে।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই অক্ষয় কুমারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত এবং মাতা দয়াময়ী। শৈশবে অল্পকাল পাঠশালার শিক্ষার সংগে তিনি স্বগ্রামে ফার্সি এবং সংস্কৃত শিক্ষা করেন। নয় বছর বয়সে পিতৃব্যপুত্র হরমোহনের সংগে কলকাতায় আসেন এবং প্রথমে বাড়িতে ও পরে ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারিতে ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করেন। এখানেই তিনি হার্ডম্যান্ জেফ্রয় নামক একজন ইংরেজের কাছে "কিছু গ্রীক্, লাটিন, হিব্রু ও জর্মণ ভাষা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন।...... ইলিয়ড, বর্জিল, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ অঙ্গের গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইংরাজি সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইঁহার স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ছিল।"১ উনিশ বছর বয়সের সময় অক্ষয় কুমারের পিতৃ-বিয়োগ হয়; ফলে তাঁকে বিদ্যালয় ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে তৎপর হতে হয়। এখানেও প্রবল জ্ঞানানুরাগ তাঁর জীবনের প্রধান নিয়ামক হয়েছিল। হরমোহন অক্ষয় কুমারকে আইন পড়তে বলেছিলেন,—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "যে বিষয় পরিবর্তনীয়; তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি?"২ অক্ষয় কুমারের নিত্যানিত্য বিবেক এর থেকেই পরিস্ফুট।

সাহিত্য জগতে অক্ষয় কুমারের প্রথম আত্মপ্রকাশ কবি হিসেবে;— 'অনঙ্গমোহন' (১৮৩৪) নামে তাঁর একটি পদ্য গ্রন্থ ছিল। গদ্য লেখার সূত্রপাত—সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার প্রয়োজনে আকস্মিক ভাবে। প্রভাকর-

অক্ষয় দত্তের রচনার প্রাথমিক ইতিহাস

সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগে অক্ষয় কুমারের গভীর হৃদ্যতা ছিল। একদিন সহকারীর অনুপস্থিতিতে গুপ্তকবি তাঁকে 'ইংলিশম্যান্' পত্রিকার অংশবিশেষ অনুবাদ করতে বলেন। অনুবাদটি গুপ্তকবির অজস্র প্রশংসা লাভ করে। এর পরে অক্ষয় কুমার 'সংবাদ প্রভাকরের' প্রয়োজনে প্রায়ই নানাবিধ লেখা লিখে দিতেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাদর্শন' নামক একটি মাসিক পত্রের সম্পাদনাও তিনি করেছিলেন। অবশ্য মাত্র ছয় সংখ্যা বার হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

অতএব, দেখ্ছি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের আগে থেকেই অক্ষয় কুমার বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু, সে কালের আরো বহু

১। 'অক্ষয়চরিত'—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।
২। ঐ।

রচয়িতার মত তাঁর সে ভাষা দুর্বলতামুক্ত ছিল না। এই ব্যাপারেই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর;—এইটুকুই রাজনারায়ণ বসুর পূর্বোদ্ধৃত ঐতিহাসিক মন্তব্যের তাৎপর্য বলে মনে করি। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন "অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্পলোকেরই দেখিতাম।"[১] আমাদের ধারণা,—ভাষার এই 'সৌষ্ঠব' আসলে অক্ষয় কুমারের ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়;—দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্রের মার্জনায় সে দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়েছিল। তা ছাড়া, এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব-ও সংহত ও প্রদীপ্ত হয়েছিল বলে মনে করি। 'তত্ত্ববোধিনী' সভা ও পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অক্ষয় কুমার সেদিনকার নাগরিক বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মনীষার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাতে ভাব-সাযুজ্য যেমন ঘটেছে তেমনি ভাব-বিরূপতার-ও সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সংযোগ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিত্ব সুসংজ্ঞক সংসক্তি অর্জন করেছিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার "যখন লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ."[২] অক্ষয় কুমারের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মনীষাময় ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতর স্বীকৃতি আর কি হতে পারে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও অক্ষয় কুমার দত্ত

বস্তুতঃ বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারই অক্ষয় কুমারের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ,—আর এখানেই বাংলা গদ্যে তিনি নূতন সম্ভাবনার পথ উৎসারিত করেন। প্রথম গঠমানতার যুগে বাংলা গদ্য ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের হাতে দ্বিবিধ পুষ্টি অর্জন করেছিল। প্রথমজন বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন মাধুর্য ও সুষমা,—সৃজনশীল রচনার সার্থক বাহন; দ্বিতীয়জনের হাতে একই ভাষা পেয়েছিল বলিষ্ঠতা ও ভারবহন ক্ষমতা,—জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্নাকর ছিল সেই যুক্তি-বিচার সন্নদ্ধ ভাষা। রমেশচন্দ্র দত্ত এই দুটি প্রতিভার তুলনা করে বলেছেন,—

বাংলাগদ্যে বিদ্যাসাগর বনাম অক্ষয় দত্ত

In Vidyasagar's style we admire the placid stillness and soft beauty of a quiet lake, reflecting on its bosom the gorgeous tints of the sky and the surrounding objects. In Akhaykumar's style we admire the vehemence and force of the mountain

---

১। স্বরচিত জীবন চরিত।
২। ঐ।

torrent in its wild and rugged beauty. Vidyasagar is the more accomplished master of style, Akhaykumar is the more forcible preacher. Modern Bengali prose, as we understand it, has been shaped by these twin workers whose memory will be long preserved in Bengal."১

অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে জোর ও তীব্রতা ছিল,—রমেশচন্দ্র তারই প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন;—জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক একটি বিশেষ বাচ্য ছিল অক্ষয়কুমারের; তাঁর বাচন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে সেই বাচ্য বিষয়কে তিনি পাঠক-চিত্তে সংশয়-মুক্ত প্রতিষ্ঠা দান করতে পারতেন,—একেই 'forcible preacher'—এর গুণ বলে মনে করেছেন রমেশচন্দ্র। এই ব্যক্তিত্ব-ধর্মী ভাষার প্রথম পূর্ণ মুক্তি ঘটেছে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-এ। অক্ষয়কুমারের বিচার ও প্রকাশ কত নিশ্চয়াত্মক (Convincing), তারই একটি প্রমাণ ঃ—

অক্ষয়কুমারের রচনাপঞ্জি

"কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, যখন সর্বসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদয় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তিবিশেষের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন তাহারা কেবল ক্লেশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। বিচার-কালে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা অতি সুচারু বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্যকালে তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। যাহা সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদায়ক সন্দেহ নাই।"—অক্ষয়কুমার এখানে "প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখজনক কিনা তাহার বিচার"—করেছেন; যুক্তির প্রাঞ্জলতার সংগে বক্তব্যের সংসক্তি ও ঋজুতা-টুকুও লক্ষ্য করবার মত;—বাংলা গদ্যে ঐটুকু অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত।

আলোচ্য গ্রন্থের আগে তাঁর আরো দু'খানি স্বল্প উল্লেখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমখানি ভূগোল, প্রকাশকাল ১৮৪১ খ্রীঃ, দ্বিতীয়খানি "শ্রীযুক্ত ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা,"—১৮৪৫ খ্রীঃ প্রকাশিত। "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" দুটি ভাগে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৫১ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। চারুপাঠ ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ "নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে সংকলিত" হয়ে বাংলা গদ্যে এক অপূর্ব জ্ঞানভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করেছিল। নীতি ও জ্ঞান-সাধনাকে এই দুটি গ্রন্থিকার মাধ্যমে বাংলাভাষার পাঠকের কাছে সত্যিই চারু-পাঠ্য করে তুলেছিলেন অক্ষয়কুমার। তাছাড়া, বাষ্পীয়

১। Literature of Bengal.

রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ, (১৮৫৫) ধর্মোন্নতি সংসাধক প্রস্তাব (১৮৫৫) এবং ধর্মনীতি (১৮৫৬) নামে কয়েকখানি বইও তিন লিখেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পদার্থ বিদ্যা' "নানা ইংরেজি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত" হয়ে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের আর একটি ঐতিহাসিক সৃষ্টি "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" দুই ভাগে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রধানতঃ "হ হ উইলসন" (H. H. Wilson)-এর "The religious sects of the Hindus"—অবলম্বনে গ্রন্থটির সূত্রপাত। অক্ষয়কুমারের তথ্যসন্ধিৎসা, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা, বিচারভঙ্গি ও দৃঢ়পিনদ্ধ-ভাষার 'সৌষ্ঠব' সব কিছু মিলিয়ে এই গ্রন্থ আজও বাংলা ভাষার জ্ঞানভান্ডারে একটি রত্নরূপে বিরাজ করছে। গ্রন্থটির ভাষা নিম্নরূপ ঃ—

"ল্যাটিন ও গ্রীক্, কেলটিক্ ও টিউটোনিক, লেটিক্ ও স্লেবোনিক, হিন্দু ও পারসিক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূলজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি য়ুরোপীয়দিগের শব্দ-বিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ সংস্কৃত-চর্চার সুধাময় ফল। যতদিন সংস্কৃত অবয়ব-সংস্থান-মাত্রও সুসম্পন্ন হয় নাই ততদিন ঐ শব্দ-বিদ্যার অবয়ব-সংস্থান-মাত্রও সুসম্পন্ন হয় নাই।" [উপক্রমণিকা]

বাংলা ভাষায় অক্ষয়কুমারের সাধনা সার্থক উত্তরাধিকারীর অভাবে আজও পূর্ণ সফল হতে পারে নি। ভাষা-মাত্রেরই দুই ধারা, একটি সৃজনধর্মী, আর একটি জ্ঞানময়। সাহিত্যের ভান্ডারে প্রথমটি সঞ্চয় করে আনন্দের ঐশ্বর্য। অপরটি দেয় চিন্ময় দীপ্তি। ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে দুটিই অপরিহার্য সম্পদ। ঈশ্বরচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকার বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আনন্দাভিমুখী গদ্য-সাহিত্যের সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিয়েছে। কিন্তু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ এবং প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের রচনাকে ছাড়িয়ে অক্ষয়কুমারের সাধনা দূর-ব্যাপ্ত হতে পারেনি। ভাষা-সাহিত্যের এই দুর্বলতামুক্তির জন্য ইতিহাস প্রবল ঔৎসুক্যে অপেক্ষা করবে। কিন্তু, তার আগে এই সত্য-বোধে সংশয় যেন না থাকে যে, বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্নে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার ছিলেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—twin workers ঃ—দুজনের সার্থকতাই যুক্তভাবে, সমপরিমাণে স্মরণীয়।

বাংলা গদ্যে অক্ষয় কুমারের অনন্যতুল্য দান

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা-যুগের আর একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর অধিকাংশ বাংলা রচনা আজও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে দুই সচিত্র মাসিক পত্রিকায় নিবন্ধ রয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সন্ধানী পুরুষও স্বীকার করেছেন, "আজিকার দিনে সেই নামহীন লেখাগুলি নিঃসংশয়ে একত্র করিবার উপায় নাই।"১ তবু উল্লিখিত পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত তাঁর নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা যে সেকালের শিক্ষিত বাঙালির মনে নিরন্তর জ্ঞান-সম্ভার যুগিয়েছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে কথার প্রমাণ।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "তাঁহার জন্ম তারিখ যে ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২২, এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"২ রাজেন্দ্রলালের পিতার নাম ছিল জনমেজয় মিত্র। কল্‌কাতা মেডিকেল কলেজের তখনকার দিনে রাজেন্দ্রলাল একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু মতান্তরের জন্য তিনি চিকিৎসা-বিভাগ ছেড়ে দেন এবং নানা ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। "ফার্সি তিনি ভালই জানিতেন। ক্রমে সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দুতেও পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।"৩ ইংরেজির ত কথাই ছিল না। ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব-জ্ঞানী হিসেবে রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি দেশে এবং বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলার রাজনীতি ও সমাজনীতি; জ্ঞান ও সাহিত্য-সাধনা নানা বিষয়ে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ান্‌ পদে কর্মভার গ্রহণ করেন এবং এখান থেকেই তাঁর জ্ঞান-মনীষার সাধনা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

বাংলায় মুদ্রিত রাজেন্দ্রলালের পুস্তিকাদির মধ্যে—'প্রাকৃত-ভূগোল' (১৮৫৪ খ্রীঃ), শিল্পিক দর্শন (১৮৬০ খ্রীঃ), শিবাজীর চরিত্র (১৮৬০ খ্রীঃ), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১ খ্রীঃ) ও পত্র কৌমুদী (১৮৬৩) উল্লেখযোগ্য। শিল্পিক দর্শন, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারুকলা (crafts) বিষয়ক রচনা, 'পত্র কৌমুদীতে' আদর্শ পত্র রচনার নিদর্শন দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি সীটন-কার (W. S. Seton-Karr)-এর সহযোগিতায় সংকলিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংগে রাজেন্দ্রলালের যোগ ছিল গভীর। যে অধ্যক্ষমণ্ডলী তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রকাশিতব্য বিষয় নির্বাচন করতেন, রাজেন্দ্রলাল প্রথমাবধি তার একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তাহলেও, 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' বিখ্যাত সম্পাদকরূপেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর দান অজস্র হয়ে আছে। বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়,

বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রাজেন্দ্রলাল-প্রতিভা

১। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—সাহিত্য সাধক চরিতমালা।
২। ঐ।
৩। ঐ।

স্কুল বুক্ সোসাইটি, এসিয়াটিক্ সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান যে ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ করতেন না, সেইসব রচনার অনুবাদ প্রকাশ করে দেশীয় ভাষার জ্ঞানভাণ্ডর বিস্তারিত করবার উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরের শেষ ভাগে বিলাতি 'পেনি ম্যাগাজিনের' আদর্শে সচিত্র মাসিক পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হতে থাকে;—প্রথম থেকেই এর সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র সংবাদ পত্র। 'সংবাদ প্রভাকর' এই পত্রিকাটির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে লিখেছিলেন—"পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।"—পত্রিকাটির স্বভাব-পরিচয় এতে আনুপূর্বিক প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করি। বিবিধার্থ সংগ্রহের জ্ঞান ও শিল্পগত সমৃদ্ধির পরিচয় রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির মধ্যে স্বপ্রকাশ, 'জীবন স্মৃতির' পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন। কেবল পত্রিকা নয়, সম্পাদক সম্বন্ধেও কবি বলেছিলেন, "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা—এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের সংগে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নয়।"

সাধারণ অর্থে আমরা যাকে সাহিত্য-কর্ম বলি, তার একছত্রও না লিখে রাজেন্দ্রলাল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পূজ্য মর্যাদা পেয়েছিলেন। বিবিধার্থ সংগ্রহের সংগে 'রহস্য সন্দর্ভ' সচিত্র পত্রিকাও তাঁর সাহিত্য-কীর্তির অঙ্গ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' এবং 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' মিলিত হয়;—'বিবিধার্থ সংগ্রহ' তখন উঠে গেছে। সেই অভাব পূরণের জন্যই মিলিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রহস্য সন্দর্ভের' প্রচলন করা হয়। এই দুই বিখ্যাত মাসিকের পাতায় অন্যান্য বিচিত্র জ্ঞানসম্ভারের সংগে রাজেন্দ্রলাল বাংলা ভাষাকে একটি নূতন সম্পদ দিয়েছিলেন—"একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে সুষ্ঠু সমালোচনার ধারা তিনি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন।"[১]

বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমার-রজেন্দ্রলালের ধারা বহুদূর অগ্রসর হয় নি;—কিন্তু, বিদ্যাসাগরের সুললিত গদ্য এবং মৌলিকতাধর্মী সাবলীল অনুবাদ সেকালে অনেক সার্থক ও অসার্থক অনুকারীর সৃষ্টি করেছিল। এই ধারার সার্থকতম উত্তরসূরী তারাশঙ্কর তর্করত্ন। "ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে" তারাশঙ্করের জন্ম হয়। পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা "ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা" ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। রচনাটি ডেভিড্ হেয়ার স্মারক সভার আহবানে লিখিত ও পুরস্কৃত হয়।

১। ঐ।

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ খ্যাতি তাঁর 'কাদম্বরী' অনুবাদের জন্য। 'কাদম্বরীর' প্রকাশ কাল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' প্রকাশের একই বছরে। অনেকে 'কাদম্বরীকে' 'শকুন্তলার' পূর্ববর্তী রচনা মনে করে বাংলা গদ্যে অনন্য-পূর্ব রূপ-সুষমা রচনার গৌরবে তারাশঙ্করকে অভিনন্দিত করেছেন।[১] 'শকুন্তলার' আগে কিংবা পরেই প্রকাশিত হোক্, 'কাদম্বরীর' ভাষা ও বিষয়-বিন্যাস যে 'শকুন্তলা'-নিরপেক্ষ তা মনে করতে বাধা নেই। কিন্তু, এ-কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যাসাগরের রচিত ভাষার প্রভাব তারাশঙ্করে কম ছিল না;—'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-তেই বাংলা গদ্যের ভাষা-স্বভাব যে সুগঠিত সুন্দর হয়ে উঠেছিল, সে কথা আগে বলেছি। তা হলেও, কাদম্বরী রচনায় তারাশঙ্করের নিজস্ব দক্ষতাও কম ছিল না, এবং সত্যিই তা "ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিয়াছিল।"[২]

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

বাংলা 'কাদম্বরী' সংস্কৃত মূলের "অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে।"[৩] ভাষায় মূলের সদৃশ "শব্দের ঘটা," "সমাসের ছটা," "উপমার আড়ম্বর" স্থানে স্থানে অত্যধিক, আবার অনেক জায়গায় রচনা অনাড়ম্বর ও সাবলীল।

তারাশঙ্করের অপর একটি বিখ্যাত রচনা 'রাসেলাস' (১৮৫৭ খ্রীঃ) জনসনের একই নামের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। রাসেলাস্-এর ভাষা 'কাদম্বরী' অপেক্ষা কম সংস্কৃত-ঘেঁষা এবং সরল।

এ পর্যন্ত আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, বর্তমান পর্যায়ে এসে বাংলা গদ্য বহু ব্যক্তির বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বিদ্যা-সাগর-উত্তর যুগে বাংলা গদ্য রচনার উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছিল। সংগে ছিল সংবাদ প্রভাকর (পরিণত পর্যায়), তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহের মত পত্রিকা এবং নানা জ্ঞান-বিষয়িনী সভা-সমিতি রচিত নিত্য-নূতন আকর্ষণ। বাংলা গদ্যের জগৎ তখন নানা লেখকে ছেয়ে গিয়েছিল; এঁদের সকলের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়,—প্রয়োজনও নেই। কর্ষণ ও অভ্যাসের ব্যাপ্তি ছাড়া এ-সব প্রচেষ্টার মধ্যে বাংলা গদ্য আর কোনো উল্লেখ্য সমৃদ্ধি অর্জন করেছে বলে মনে হয় না। তাই, এই প্রসঙ্গ শেষ করব আর তিনটিমাত্র লেখকের উল্লেখ করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিছক ব্যক্তি হিসেবেই এঁরা স্মরণীয়, ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত গদ্য রচনার জন্য নয়।

আলোচ্য ত্রয়ীর দুজন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ অনুসারী,

১। দ্রষ্টব্য—বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-ভাষা বিষয়ে বক্তৃতা—গঙ্গাচরণ সরকার।
২। ঐ।
৩। কাদম্বরী—বিজ্ঞাপন।

—কর্মক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-জীবনেও। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই বিদ্যাসাগরের প্রধান ভক্ত এবং তাঁর সমাজকর্মের শ্রেষ্ঠ সহায়ক ছিলেন। এঁরই পৌত্রী প্রভাবতীর শোকে বিগলিত-চিত্ত ঈশ্বরচন্দ্র 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' লিখেছিলেন। সব মিলে রাজকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিদ্যাসাগরীয় প্রভাব একান্ত অবিচ্ছেদ্য হয়েছিল।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য লেখার মধ্যে রাজকৃষ্ণ ফরাসি কবি ফেনেলন রচিত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে 'টেলিমেকস্' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। প্রথম তিন সর্গ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে; আর শেষ তিন সর্গ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"১ বলা বহুল্য, এ ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব বহুল ও স্পষ্ট ছিল। বইটি সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'শিশুশিক্ষা' ও 'নীতিবোধ' জাতীয় পাঠ্য পুস্তক দিয়ে প্রথমে রাজকৃষ্ণের বাংলা রচনা সুরু হয়। 'রাজবালা' নামে একটি রোমাণ্টিক আখ্যায়িকাও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

নীলমণি বসাকও ঈশ্বরচন্দ্রের গভীর ভক্ত এবং সাহিত্যিক উত্তর সাধক ছিলেন। "যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না, সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাংলায় কতদূর ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন।"২ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণির জন্ম হয়, পিতার নাম রাজচন্দ্র বসাক। ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'পরস্য ইতিহাস' বাংলা 'পদ্যচ্ছন্দে ভাষান্তরিত' করেই (১৮৩৪ খ্রীঃ) নীলমণির বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থ রচনায় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহযোগী।

নীলমণি বসাক

'আরব্য উপন্যাস' এর ইংরেজি থেকে গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় তিনটি খণ্ডে, প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশকাল ১৮৫১ খ্রীঃ। এটি নীলমণির একক রচনা। বাংলাদেশে নীলমণি একদা সমধিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁর "নবনারী" (১৮৫২ খ্রীঃ) গ্রন্থের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "অনেক শ্রমে ও যত্নে এই পুস্তকে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।"৩ 'নবনারী' এদেশের স্মরণীয় নয়টি নারীর জীবন-মহিমাকে বাংলার পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছিল, এই নারী নয় জন,—সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী,

১। 'টেলিমেকস্'—বিজ্ঞাপন।
২। বাংলার সাহিত্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৩। নবনারী—বিজ্ঞাপন।

দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাঈ এবং রাণী ভবানী। শুধু ভাষার দিক থেকে নয়, ভাবানুবাদের দিক থেকেও নীলমণি ও বিদ্যাসাগরের নৈকট্য ছিল গভীর; বাংলার জাগৃতিমুখর জীবনের কাছে নারী-মহিমার প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল 'নবনারী'। এই জন্য তার জনপ্রীতিও হয়েছিল দূর প্রসারী। হিন্দী থেকে অনূদিত নীলমণি বসাকের বত্রিশ সিংহাসন প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের তৃতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ; গদ্য লেখক হিসেবে না হলেও সোমপ্রকাশের সম্পাদক হিসেবে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্যের জগতে তিনি সংশয়াতীত ভাবে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। উনিশ শতকের নাগরিক ঐতিহ্যে দ্বারকানাথ একটি মহৎ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ১৮২০ খ্রীষ্টব্দে তাঁর জন্ম হয়, পিতার নাম ছিল হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। দ্বারকানাথ ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল। কলকাতা সংস্কৃত কলেজে দ্বারকানাথ দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেছিলেন,—তাঁর কর্মজীবনও নানাসূত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে রোমরাজ্যের ইতিহাস (১৮৫৭) এবং গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৫৭) প্রধান। মূলতঃ এ-গুলো অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বারকানাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ঃ—"তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাংলা ভাষাকে ও বাংলা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাংলা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিকস্ আলোচিত হইতে লাগিল। বাংলা ভাষার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্বে লোকে ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।"১ ফল কথা সোমপ্রকাশ তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহের ঐতিহ্যকে আপন মতে ও পথে সমৃদ্ধ করেছিল,—আর সেই সমৃদ্ধির সাধনায়ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাব-প্রভাব প্রবল পরিমাণে সক্রিয় ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সোমবার পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়; এবং প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়ে চলে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সোমপ্রকাশের' সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তবু দ্বারকানাথের ব্যক্তিত্ব এই পত্রিকাকে স্বকীয়তার ঐতিহ্যে মণ্ডিত করেছিল।—বাংলার ব্যক্তিত্ব-ধর্মী গদ্যের ইতিহাসে 'সোমপ্রকাশ' সাংবাদিক ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রকাশ।

১। স্মৃতিকথা-কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

দশম অধ্যায়

কাব্যে আধুনিকতার প্রস্তুতি

বাংলা-কাব্যে আধুনিকতার প্রথম সার্থক মুক্তি ঘটেছিল মধুসূদনের হাতে। সচেতন বা অবচেতন ভাবে সেই মুক্তির প্রস্তুতি চিহ্নিত হয়েছে মধুসূদন-পূর্ব উনিশ শতকের প্রথমাবধি। এই পর্যায়ে বাংলা কবিতার একটি ধারা পূর্ব প্রচলিত কবি-সংগীতের অনুসরণ করে এসেছে; টপ্পা-পাঁচালির মাধ্যমে, দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭)—এমন কি তাঁরও পরে পর্যন্ত। প্রধানতঃ সে ছিল প্রাচীন ধারারই ভঙ্গি-প্রধান উদ্বর্তন। স্বভাব-কবিদের স্বভাব-সৃষ্টি যে-পরিমাণে প্রখর হতে পেরেছিল, সেই পরিমাণে ঐ অপূর্ণগঠিত কবি-কৃতির মধ্যে আধুনিকতার ভিত্তি রচিত হয়ে চলেছিল কালের হাতে,—অবচেতনার মধ্যে। পূর্বে সে ইতিহাস লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে কবি-কর্ম অজস্র ব্যাপ্ত হতে পারে নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বে গদ্য সাহিত্যের বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। এই পর্বে যে কারণে গদ্য রচনার এত আধিক্য, ঠিক সেই কারণেই কবিতা রচনার ধারা হয়েছে মন্দগতি। গীতিকবিতা বা আখ্যায়িকা কাব্য, যাই হোক, শিল্পীর ভাবতন্ময় ব্যক্তিত্বের নিভৃত প্রেরণা সকল সার্থক কবিতারই উৎস। বিশেষ করে, বাংলা কবিতা-মাত্রেরই স্বভাবে অন্তর্লীন আত্মমগ্নতার প্রেরণা প্রথমাবধি একান্ত হয়েছিল; সাধারণভাবে মর্ম-সঞ্চারিতাই বাংলা কবিতার মৌলিক ধর্ম। কিন্তু, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নাগরিক বাঙালির জীবনে সেই মর্মাভিসারী নিভৃতি ও গভীরতা প্রায় অলভ্য হয়েছিল। নূতন আদর্শের সংঘাতে পুরাতন কেবলই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল, পুরাতনের প্রতিঘাতে নূতন কেবলই সুসংবদ্ধ, সুঅবয়ব-সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল। সে জীবনে আদর্শ ছিল,—ছিল আদর্শের সংঘাত; কর্ম ছিল,—ছিল উদ্যম, সংগ্রাম ও উদ্দীপনা; কিন্তু ছিল না, প্রশান্তি, গভীরতা, আত্ম-সংসক্তি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত ধ্যান-তন্ময় ব্যক্তিত্বও সে-কালের বিশেষিত জীবন-পরিবেশে শ্রেষ্ঠ কর্মযোগীর ব্রত বরণ করেছিলেন। ফল কথা, কবির ব্যক্তিত্ব যদি সে-কালে থেকেও থাকে, তবু কাব্যের উপযোগী জীবন-ভূমি তখন ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত—তাই, কর্মের মুখে গদ্য হয়েছিল মুখর, অথচ বিচিত্র-গতি কাব্য-প্রবাহের উৎসার তখনও ছিল অসম্ভব।

কাব্যে আধুনিকতার প্রস্তুতি

তাহলেও, আলোচ্য যুগের পটভূমিতেই পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যোচিত পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। সেই প্রস্তুতি,—সেই কর্মচর্যাই বর্তমান পর্যায়ের স্বল্প পরিমাণ কাব্যিক প্রয়াসে সুচিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সার্থক কাব্য নেই,

কিন্তু, সংঘাতপুষ্ট নবীনাভিমুখী জীবনোৎকণ্ঠা কবিতার পৃষ্ঠে সুচিহ্নিত হয়েছে;—উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কবিতায় এখানেই রয়েছে আধুনিকতার প্রস্তুতি-চিহ্ন।

সে প্রস্তুতির ইতিহাস আবার একক ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত। রমেশচন্দ্র দত্ত সে ইতিহাসের পরিচয় বিবৃত করেছেন—"No renowned poet appeared in Bengal in the first half of the present Century, and Iswar Chandra (Gupta) was the reigning King of the literary world in his day."১ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, সংবাদ প্রভাকরের 'প্রভাকর' ঈশ্বর গুপ্ত সে যুগের বাংলা কাব্যের প্রায় একমাত্র কবি ছিলেন; এই তথ্যের তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মত।

প্রস্তুতিযুগের একমাত্র কবি ঈশ্বর গুপ্ত

এ-কথাও স্মরণীয় যে, সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা সেকালে সর্বজন বন্দিত ছিল, কিন্তু কবি ঈশ্বরগুপ্তের উৎকর্ষ নিঃসংশয় স্বীকৃতির আসনে কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন-সমৃদ্ধ 'গুপ্তের কবিত্ব' বিচারের পরেও রমেশচন্দ্র অনায়াসে বল্‌তে পেরেছেন, "The poetry is not of a very high order;"২—এ সিদ্ধান্ত সর্বাংশে ইতিহাস সমর্থিত। বর্তমান পর্যায়ের বাংলা কবিতা এমন একজন কবির একমাত্র সাধনার দ্বারা পুষ্ট, যিনি প্রধানত এবং প্রথমত সাংবাদিক। এই তথ্য থেকে আলোচ্য কবিতা-ধারার মৌল প্রকৃতি নির্ণীত হতে পারে বলে মনে করি।

অমিশ্র তথ্যসন্ধিৎসা, সমকালীন জীবন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তু-নিষ্ঠ কৌতূহল, ও অব্যবহিত কালের জীবন-মূল্য সম্বন্ধে সদা-সচেতন উৎকণ্ঠা সার্থক সাংবাদিকের প্রতিভার মৌল উপাদান। সুস্থির স্থায়িত্বের চেয়ে বলবান গতি-শীলতা, অতলস্পর্শ গভীরতার চেয়ে শীর্ষচারি ব্যাপ্তিই সাংবাদিকতার ধর্ম। ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যেও ঠিক তাই ছিল। তাঁর স্বল্প-শিক্ষার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বারে বারে আক্ষেপ করেছেন।৩ ফল কথা, যতটুকু শিক্ষার গভীরতা থাকলে প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব নিজের মধ্যে নিজের নিঃশেষ অধিকার খুঁজে পায়, ঈশ্বরগুপ্তের তা ছিল না। ঈশ্বরগুপ্তের প্রতিভা ছিল; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ-গঠিত, সুপুষ্ট ছিল না। অথচ, পূর্ণ অবয়বে বিশেষিত ব্যক্তিত্বই সার্থক কবিধর্ম বিকাশের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন।

ঈশ্বরগুপ্তের সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব

শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়;—জীবনের পাঠশালাতেও ঈশ্বর গুপ্তের

১। Literature of Bengal.

২। ঐ।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব।

শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হতে পারে নি। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর জন্ম হয়, পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ গুপ্ত, মাতা শ্রীমতীদেবী। হরিনারায়ণদের ছিল বিরাট সংসার,—সহোদর, বৈমাত্রেয় ভাই, তাঁদের 'দারাপত্য' নিয়ে ছিল বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। পৈত্রিক জমিজমা, খামার-পুকুর মিলে মোটামুটি মধ্যবিত্তের চালে চলে যেত সংসার। হরিনারায়ণ প্রথম জীবনে কবিরাজ ছিলেন,—পরে মাসিক আট টাকা বেতনে 'শেয়াল ডাঙার' কুঠিতে কাজ করতেন। দশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগ হয়; ঈশ্বরগুপ্তেরা তখন চার সহোদর ছিলেন, সহোদরা বোনও ছিলেন একটি। পত্নী-বিয়োগের পরে হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিমাতার প্রতি বালক ঈশ্বর-চন্দ্রের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র,—"খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবি প্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলাগাছে বিঁধিয়া গেল।

ও ব্যক্তি জীবন-পরিচয়

"অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কীরাত-পরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাক হস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠামহাশয় দ্বার ভাঙিগয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

"কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপাত অস্ত্র সংগ্রহ হইল, সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই। মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালা-বিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল।"[১]

ঈশ্বরচন্দ্র বিমাতার সংসারে বেশি দিন বাস করেন নি;—মাতৃবিয়োগের অল্প পরেই তিনি জোড়াসাঁকোয় মাতুলবাড়ীতে আসেন; এঁদের বৈষয়িক অবস্থা ভাল ছিল না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রকে এখানে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। ফলে এখানেও তাঁর চিত্ত নিজ পরিবেশের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরগুপ্তের ব্যক্তি-জীবনে চরমতম অভিঘাত এসেছিল তাঁর বিবাহের মধ্য দিয়ে। কবির পিতা আর্থিক সাশ্রয় এবং কৌলীন্যের মোহে একটি কৃষ্ণাঙ্গী রমণীর সংগে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্রের তাতে ঘোর আপত্তি

১। ঐ।

ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,—বিবাহিতা পাত্রীই শুধু ঈশ্বরগুপ্তের অপছন্দ ছিল না, অন্যত্র "একটু Romance"-ও ছিল।১ ক্ষুব্ধ ঈশ্বরচন্দ্র সারাজীবন পত্নীর সংগে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ রেখেছিলেন, অবশ্য তাঁর আর্থিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি কখনো।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের মৌল অভাব ও ত্রুটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চারটি ভাগ করেছেন,—"(১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সংগে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ।"২—আমাদের ধারণা, শুধু "সমাজের উপরে" নয় গোটা জীবনের প্রতি এই 'জাতক্রোধ'-ই ঈশ্বর গুপ্তের মনোভঙ্গিকে (Attitude) প্রভাবিত করেছিল; ফলে তাঁর চেতনার মর্মমূলে জীবন সম্বন্ধে একটা সুস্থ, সম্পূর্ণ মূল্যবোধ স্থায়িরূপ পেতে পারেনি,—এখানেই শিল্পী ঈশ্বরগুপ্তের যথার্থ দীনতা।

গুপ্ত কবির ব্যক্তিত্বে ত্রুটি

সন্দেহ নেই, গুপ্ত কবির মধ্যে একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল; সমসাময়িক জীবন ধারার অজস্র কালিমা এবং অসংলগ্নতার,—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সব রকমের 'মেকি'র বিরুদ্ধে সেই ব্যক্তিত্ব প্রবল প্রতিরোধ রচনা করতে চেয়েছে আশৈশব।—সন্তান সত্ত্বেও বিপত্নীকের পুনর্বিবাহের মধ্যে দেহ-লোলুপতার নিকট পিতৃত্বের যে রূঢ় পরাভব ও লজ্জাকরতা প্রচ্ছন্ন ছিল, ঈশ্বর গুপ্তের শিশুমন তাকে আক্রমণ করেছিল কেবল রুল দিয়ে নয়—নিজের অভিজ্ঞতার সকল শক্তি দিয়ে। পিতামহের স্তোক বাক্যের উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখ্‌ছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্‌বেন।" মাতুলালয়ে নিজের দারিদ্র্যের সংগে সংগে নানা অযোগ্য জনের সম্পদের সম্ভার তিনি ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করেছিলেন। ফল কথা, জীবনে তাঁকে দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল নানাভাবে, কিন্তু দুঃখ জয়ের উদার সিদ্ধিতে তাঁর চিত্ত মুক্তি পায়নি কোনোদিন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লক্ষ্য করেছি, দুঃখকে অস্বীকার ও অতিক্রম করেই তাঁর দুঃখজয়ী ব্যক্তিত্ব মহিমাময় হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যত দুঃখ ভোগ করেছেন,—জীবনের প্রতি আক্রোশ গেছে তত বেড়ে। সমকালীনতার বিরুদ্ধে এই অন্ধ আক্রোশ তাঁর চেতনাকে সুস্থ স্থায়ী জীবন-মূল্য উদ্ধাবনের সুযোগ দেয়নি;—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যা পেরেছিলেন। বিবাহিত পত্নীর সংগে বাক্-সম্পর্কও ছিন্ন করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, কিন্তু কোন 'Romance'-এর গভীর মর্মপীড়া ছিল না তার পেছনে;—স্বেচ্ছাবিরুদ্ধ কর্মে বাধ্য হওয়ার

১। ঐ।
২। ঐ।

ক্ষোভই এ-ক্ষেত্রে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে চিরকাল তিনি বিরক্তি পোষণ করে চলেছেন,—দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহও করেননি; কিন্তু কোনো প্রকার বেদনা, বিরাগ অথবা আদর্শের তাড়না ছিল না তার পেছনে। কেবল "দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল,"—এই ছিল তাঁর ধারণা।

ফল কথা, ঈশ্বর গুপ্তের গোটা ব্যক্তিত্বের মূলে ছিল এক প্রবল নেতি-বোধ (Sense of negation); অথচ সার্থক কবি-সিদ্ধির জন্য ইতিমূলক স্পষ্ট মূল্য-বোধ (Positive sense of values) নিতান্ত অপরিহার্য। ঈশ্বর গুপ্তকে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের মতই হতে হবে, পূর্ব অনুচ্ছেদে আমরা একথা বল্‌তে চাইনি। প্রবল বিরূপতার প্রতিক্রিয়াকে আত্মসাৎ করে বিদ্যাসাগর কেমন একটি পূর্ণায়ত বলিষ্ঠ জীবন-বোধ আয়ত্ত করেছিলেন, সে কথা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি। আরো দেখেছি, সেই জীবন-চেতনার প্রভাবে বিদ্যসাগরের গদ্য-রচনাও কেমন কাব্য-সুষমাময় হয়ে উঠেছে। আমাদের বক্তব্য, উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত জীবনের অতলে অবগাহন করে বিদ্যাসাগর চিরন্তন কালের জন্য রত্ন সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু, উপরি-ভাগের প্রবাহে ক্লেদ পঙ্কিলতা লক্ষ্য করে ঈশ্বর গুপ্ত সমকালীন জীবন-ধারার প্রতি বিমুখ হয়েছেন,—পঙ্ক থেকে পঙ্কজের উদ্ধার তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। সামাজিক অসংগতি ও অসংলগ্নতার সংস্কার চেষ্টা তিনি করেছেন। কিন্তু, সে সাংবাদিকের মত, শিল্পীর মত নয়। সমুচিত দূরত্ব রক্ষা করে বিচার, বিশ্লেষণ, সমালোচনার বীজাণু-নাশক ছড়িয়ে দিয়েছেন ওপর থেকে;—শিল্পীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে অতলস্পর্শ পরিচ্ছন্নতাকে আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাই, ঈশ্বর গুপ্ত বলিষ্ঠ সাংবাদিক হয়েও দুর্বল কবি।

ঈশ্বর গুপ্তের কবি-স্বভাব নেতিবাদী

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তি-চেতনার মূলে ছিল এক দ্বৈতরূপ, তাঁর সাহিত্য-কর্মে গদ্যে ও পদ্যে সে দুটি রূপ পৃথক্ মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। গদ্য-লেখক ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সেকালের আধুনিকদের অগ্রণী,—পরবর্তীকালের পুষ্টতর আধুনিকতার পথিকৃৎ। কিন্তু পদ্য-লেখক গুপ্ত কবি ছিলেন একান্ত অনাধুনিক; প্রাচীনের স্বকীয়তাহীন অনুবর্তী মাত্র। তাঁর কবিতায় আধুনিকতার যা কিছু স্পর্শ সে কেবল বিষয় নির্বাচনে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়।"[১] বিষয়-নির্বাচনে যে বস্তু-নিষ্ঠার ইঙ্গিত

এবং গুপ্ত কবির ব্যক্তিত্বের দ্বৈধ

১। দ্রষ্টব্য ঐ।

এখানে আছে, ঈশ্বর গুপ্তের তা মৌলিক উদ্ভাবন নয়। মধ্যযুগীয় প্রায় সকল সাহিত্যেই বস্তু-সচেতন দৃষ্টির সজীবতা সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করি। ঈশ্বর গুপ্ত এখানে মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের উত্তর-সূরী। তাহলেও, গুপ্ত-কবির বিষয় দৃষ্টিতে অতুল্য এক দূর-প্রসার ও সর্বাভিমুখিতা ছিল। মধ্য যুগের সাহিত্য কেবল জীবনের বৃহৎ এবং মহৎ অংশকেই চিত্রিত করেছে। মুকুন্দরামের সাহিত্যে মুরারিশীল এবং ভাঁড়ুর চরিত্র-চিত্র সজীব ভাবে অঙ্কিত হয়েছে সন্দেহ নেই, এমন কি বাজারেও ভাঁড়ুর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু, সে ছবি খুব মোটা, পরিপ্রেক্ষিৎটি খুব বৃহৎ। মুকুন্দ-রামের হাতে সেখানে বাজার ও বাজার-ওয়ালার একটি শ্রেণীগত উপাদান-ই পূর্ণ অবয়ব পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'মালিনী'ও শ্রেণীধর্মেরই শিল্প-প্রতিভূ। কিন্তু জীবনের প্রতিটি বিষয় ও উপাদানকে বিচ্ছিন্ন, একক, স্বতন্ত্র মূল্যে খুঁটিয়ে দেখেছেন ঈশ্বরগুপ্ত। এই অন্য-নিরপেক্ষ, স্বাতন্ত্র্যময় পুঙ্খানুপুঙ্খতা তাঁর আধুনিক দৃষ্টির পরিচয়। জীবনের সকল দিকেই ঈশ্বরগুপ্তের তির্যক্, সন্ধানী দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছিল। ফলে, বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছে, 'নৈতিক ও পারমার্থিক' বিষয়ের পাশে (১) সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক, (২) 'ঋতুবর্ণন'-বিষয়ক, (৩) 'যুদ্ধ বিষয়ক' ও আরো (৪) 'বিবিধ বিষয়ক' নানা কবিতাবলীর সম্ভার।[১] নৈতিক এবং পারমার্থিক বিষয়ই যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রধান এবং প্রায় একমাত্র উপাদান ছিল, এ সত্য যথাস্থানে লক্ষ্য করেছি। আর, বর্তমান গ্রন্থের একেবারে আরম্ভ থেকেই দেখে এসেছি,—সর্বাবয়ব সম্পূর্ণ মানবিক কৌতূহলের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যই আধুনিকতার মৌল ভিত্তি। কবি-ওয়ালাদের রচনায় প্রাচীন দেবায়িত-মনুষ্যত্ববোধের অন্তরালে বিশুদ্ধ মানব-বিষয়ক কৌতূহল উঁকি দিতে সুরু করে,—সেখানেই লক্ষ্য করেছি আধুনিকতার ভিত্তি-পত্তন। ঈশ্বরগুপ্তের যুগের হাতে এসে সেই দুর্বল পরোক্ষ কৌতূহল কেবল স্ফুটবাক্ই হয়ে ওঠে নি, হয়েছে বিচিত্র পথচারী। এই কারণে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় আধুনিক কৌতূহলের সূচনা, তথা, আধুনিক কাব্যের প্রস্তুতি-পর্বের সন্ধান করছি। নইলে স্বভাবতঃ গুপ্ত-কবি যে-পরিমাণে কবি-ওয়ালাদের উত্তর-সূরী, সেই পরিমাণে তিনি মধুসূদনাদির যুগের পূর্বসূরিত্ব দাবি করতে পারেন না।

বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা

বস্তুতঃ, কবি-ওয়ালাদের অনুবর্তন করেই বাংলা কাব্য-জগতে ঈশ্বর-গুপ্তের প্রথম আবির্ভাব। তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকে, এমন কি, তাঁর পিতাও পাঁচালী, কবিগান ইত্যাদির জন্য গান বেঁধে দিতেন। ঈশ্বরগুপ্ত শৈশবাবধি এই স্বভাব-কবিত্ব অর্জন করেছিলেন। "১১। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম

১। দ্রষ্টব্য—'সূচীপত্র' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত।

হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন, যে সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চন পল্লীতে বারোইয়ারি প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদি দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদ লোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বরবাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য গান পরিপাটি প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।"১ ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত সে সকল "উত্তর" যে বহুল প্রশংসিত হয়েছিল, তারও প্রমাণ আছে। গুপ্ত-কবির আখ্ড়াই, হাফ আখ্ড়াই জাতীয় কবিতার ছয়টি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সংকলনে উদ্ধার করেছেন, ঐ কবিতাবলীর মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কবি-স্বভাব স্পষ্ট স্ফুট হয়েছে বলে মনে করি ঃ—

"অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে।
যার চিন্তামণি-চিন্তা অন্তরে, তার কি চিন্তা মরণে?
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার, অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার,
শুন শ্যাম, গুণধাম, তব নাম করি সার।
ভক্তি ভবজলধি জলে হয় পার॥
তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন,
তব তত্ত্ব জেনে সার, করেছিলাম পদ সার;
তবে কেন ঘটিল এমন?"

ভাবের অভাবের সংগে শব্দ ও অর্থালংকারের চটক-রচনার প্রয়াস এখানে লক্ষ্য করবার মত। ঈশ্বরগুপ্তের সমস্ত কবি-কর্মের মধ্যেই লঘু সুরের চপলতার সংগে ভঙ্গি-নির্ভর কথার এই চটক একান্ত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র একে বলেছেন 'ইয়ারকি'। জগদীশ্বরের সংগেও একটু 'ইয়ারকি'র পরিচয় উদ্ধার করেছেন তিনি ঃ—

"কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম?
তুমি হে আমার বাবা—হাবা আত্মারাম।"

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার অন্তরঙ্গে বিষয়-নিরপেক্ষ লঘুতা বা ইয়ারকি এবং বহিরঙ্গে ভঙ্গি-সর্বস্ব বাক্-প্রাচুর্যই তাঁর কবি-লক্ষণকে প্রধানতঃ চিহ্নিত করেছে।

'পৌষ পার্বণ' কবিতায় মজা-মত্ত ঈশ্বরগুপ্তের 'সুখেপূর্ণ' চিত্তের ভোগানন্দ বিখ্যাত হয়ে আছে,—"সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা॥
ধনুরতনুর শেষে, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহাসুখ ভোগ॥"—ইত্যাদি

১। ঈশ্বর গুপ্তের 'বাল্যসখা' লিখিত,—দ্রষ্টব্য ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব।

কিন্তু দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অকালের ফলে যে বছরে সেই সুখ-সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে গেল,—ধরা হল দুঃখ-পূর্ণ;—সেবারও গুপ্ত-কবি 'পৌষ পার্বণ' কবিতা লিখেছেন,—

"এবার বছরকার দিন, কপালে ভাই,
জুট্‌লো নাকো, পুলি পিটে।
যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার হাজার,
মোর্তেছে লোক, কপাল পিটে॥
ভাত না পেয়ে উদর ভোরে, কত দুঃখী গেল মোরে,
চেলের বাজার সস্তা কোরে
দেয় না রাজা ঢেঁড়া পিটে॥
ঘরে হাঁড়ি ঠন্‌ঠনান্তি, মশা মাছি ভন্‌ভনান্তি,
শীতে শরীর কন্‌ কনান্তি,
একটু কাপড় নাইকো পিঠে॥
দারা, পুত্র হন্‌ হনান্তি, অস্তি, নাস্তি, ন জানন্তি,
দিনে রাত্রি খেতে চান্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে॥"

সেই একই 'ইয়ার-কি'! কবির সামাজিক সচেতনতা এখানে স্পষ্ট ও সুচিহ্নিত; দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গৃহস্থের দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিখুঁত; সেই সংগে উৎসব দিনের রিক্ততার পরিচয়টুকুও প্রস্ফুট। কিন্তু, শিল্পীর সহানুভূতি যত গভীর ও একান্ত হতে পারলে, জীবনের এই নিরন্ধ্র বেদনাকে বিদীর্ণ করে সার্থক শিল্প-রূপায়ন সম্ভব হতে পারত, এখানে তার সম্পূর্ণ অভাব। ফল কথা, ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক সচেতনতা ব্যাপক ছিল। কিন্তু, তাঁর সামাজিক সহানুভূতি ছিল অগভীর পল্লব-চারি। জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যাকে তিনি যথাস্থিত-রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, যথার্থ সাংবাদিকের মত তার স্বরূপ বিচারও করেছেন। কিন্তু, শিল্পীর মত জীবন-গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি। কবি ঈশ্বরগুপ্ত সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্তের সীমা অতিক্রম করতে পারেন নি বলেই তাঁর কবি-কর্ম অগভীর ও অসম্পূর্ণ।

চূড়ান্ত সমস্যা-প্রবল বিষয়েও ঈশ্বরগুপ্ত কবিতা লিখেছেন,—সেখানে "ইয়ার্কি" নেই,—তাঁর কণ্ঠ গুরু গম্ভীর। কিন্তু, সর্বত্রই গুপ্তকবির কবি-স্বভাব অবিচল। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বিধবা বিবাহ আইন' কবিতাটির উদ্ধার করি। কবিতাটি সুদীর্ঘ; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবি-মানসের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ পরিচায়নের জন্য তার অনেকাংশই পরিহার করা অনুচিত হবে।

ঈশ্বর গুপ্তের গুরু-গম্ভীর কবিতা

"হিন্দু বিধবার বিয়া, আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার, নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে, নিয়ম নির্দেশ॥
শত শত প্রজা তায়, ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দাশ নাহি, শুনিলেন কানে!
গ্রাণ্ট (১) করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল, কাল বিল (২) করিলেন পাশ॥
না হইতে শাস্ত্র মতে, বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন, আইন আদেশ॥
যাহাদের ধর্ম এই, আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা, ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম, আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্মে, কেন দেন কর?
* * *
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ি।
তাহারা সধবা হবে, পরে শাঁকা শাড়ি॥
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে?
দেশাচার ব্যবহারে বাধো বাধো করে॥
যুক্তি বোলে বিচার করুক শত শত।
কোন মতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতীবলে সম্বোধন, কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত, যে হবে সন্তান।
"বৈধ" বোলে কিসে তার, করিবে প্রমাণ
* * *
বিধবার বিয়ে দিতে, যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড়, লোক আছে যত॥

"১। ব্যবস্থাপক মেং গ্রাণ্ট সাহেব বিধবা বিবাহ বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, ব্যবস্থাপক মেং কাল বিল সাহেব তাহা গ্রাণ্ট অর্থাৎ গ্রাহ্য করিয়া কাল বিল। তাহা অর্থাৎ কালরূপ আইন প্রকাশে মত প্রকাশ করেন।"—পাদ টীকা স্বয়ং কবি-কৃত।

যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত, পরিচয় নিয়া ॥
গোপনেতে এই কথা, বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে, পারে কি না পারে?
যদি পারে, তবে তারে, বলি বাহাদুর।
এখনি করিলে সব, দুঃখ হয় দূর ॥
সহজে যদ্যপি হয়, এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে, আইন প্রচার ॥
যদি কেহ নাহি পারে, সাহস ধরিয়া।
কিফল বিফল তবে, আইন করিয়া?

* * *

সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হোতে পারে, মুখের কথায় ॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মিছে বলা, বলা নয়, কাযে করা করা ॥
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥
সাগর[১] যদ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার ॥

* * *

রাজার কর্তব্য কথা, করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিয়া আর নাহি প্রয়োজন ॥
এইমাত্র শেষ কথা, কহিব নিশ্চয়।
এ বিষয়ে বিধি দেয়া, রাজধর্ম নয় ॥
মরুক্ মরুক্ বাদ, প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তায়?"

গুপ্ত কবির মতের সংগে অনেকেরই বিভেদ ঘটবে,—কিন্তু গোটা কবিতাটির পাঠক অনুভব করবেন, নিজের পক্ষে প্রবলতম যুক্তির প্রয়োগে ঈশ্বর গুপ্তের দক্ষতা এ-কালেও প্রায় তুলনা-রহিত। যুক্তির ক্রমবিন্যাস,

১। "সাগর শব্দের টীকা গ্রাহকেরা করিবেন";—কবিকৃত পদটীকা।

ও পরম্পরানুগত শক্তির এই আঘাত-কৌশল নৈয়ায়িক-জন-দুর্লভ। কিন্তু, এই 'পাদটীকা'-কণ্টকিত কবিতাটির বিষয়বস্তু এক কালে যতই মূল্যবান্ হয়ে থাক্, কিংবা লেখকের চিন্তা-শক্তির প্রখরতা এতে যতই তীব্র হোক্, একে সার্থক কাব্য-পদবাচ্য করা চলে না কিছুতেই। বরং 'দৈনিক সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি উপযুক্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন হতে পারত এই রচনা। মূল কথা, সমাজ বিপ্লবের মুহূর্তে ঈশ্বর গুপ্তের নাগরিক চেতনা আপন মতে ও পথে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু, তাঁর কবি-কল্পনা সে উদ্দীপনাকে বিশেষ দেশকালের অতীত সর্বজনীনতা দিতে পারে নি। এখানেই তিনি সাংবাদিক,—শিল্পী নন; আর তা কেবল ভাবে নয়, ভাষায়ও;—এখানে তিনি কবিওয়ালাদেরই উত্তর-সূরী সর্বাংশে।

সাংবাদিকতা ধর্মী
অগভীর কবি-কর্ম

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত অতি-মূল্যায়নের চেষ্টা আজও চোখে পড়ে। তাতে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন উদ্ধার করা হয়। গুপ্ত-কবির কাব্য-বিষয় বিচিত্র ছিল, কিন্তু তার কোনটির সংগেই তাঁর কবি-চেতনার নিভৃত গভীর সংযোগ ছিল না। ফলে, রসোত্তীর্ণ কাব্য-ভাব বা কাব্য-রূপ, কিছুই তিনি গড়ে তুল্‌তে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রে বরং নূতন বিষয়কে পুরাতন কবিগানের সুরের আধারে ঢেলেছেন। তাঁর এই কাব্যিক অক্ষমতাকে 'খাঁটি বাঙালিত্বে'র ধর্ম বলে শ্লাঘণীয় করে তোলার চেষ্টা প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রই করেছিলেন; তাঁর পক্ষে ইতিহাসের সমর্থন ছিল। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি নাগরিকতার প্রথম সিদ্ধকাম শিল্পী। এদিক থেকে নিজেদের যুগের স্থিতি-স্থাপকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সংশয় না হোক্, উদ্বেগটুকু স্বাভাবিক। অন্য দিকে, দীর্ঘস্থায়ী মধ্যযুগীয় কাব্যধারার প্রতি ঐতিহ্য-সচেতন বাঙালি মাত্রেরই সহৃদয় মমতাবোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। সে ঐতিহ্যের ক্ষীয়মানতার যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের অতি-মমত্ব আরো স্বাভাবিক, আরো মহনীয়। কিন্তু, আজ বঙ্কিমোত্তর কালে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বঙ্কিম-কথিত দুটি যুগের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন অবশ্য প্রয়োজন!

ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে
ভ্রান্ত মূল্যায়ন

এই বিচারে 'খাঁটি বাঙালিত্ব' একটি শাশ্বত সত্য বটে, কিন্তু কোনো পর্যায়েই তা স্থানুত্বের নামান্তর নয়। বস্তুতঃ, বাঙালির ও বাংলা ভাষার সাহিত্যে যতটুকু 'খাঁটী বাঙালি'র সম্পদ, ততটুকুই বর্তমান ইতিহাসের আলোচ্য। সে 'বাঙালিত্ব' একটি মৌল স্বভাবকে নির্ভর করে দেশকালে নিত্যই বিবর্তিত, পরিণত, নব-গঠিত হয়ে উঠ্‌ছে। তপ্‌সে মাছ, অথবা 'পৌষপার্বণ' নিয়ে লেখা কবিতামাত্রই 'বাঙালিত্বে'র বনেদি কৌলীন্যে ভাস্বর; আর প্রমীলার চিতারোহণ (মেঘনাদ বধ), রুক্মিনীর পত্রাভিসার (বীরাঙ্গনা)

অথবা 'বঙ্গভূমির' প্রতি আত্মনিবেদন 'খাঁটি বাঙালি ধর্ম' নয় কেন? বঙ্কিমচন্দ্র এই বিবর্তমনতার সত্য-বোধ হারান নি;—তিনি নিজেই বলেছেন ইচ্ছে করলেও গুপ্ত-কবির কাব্য-জগতে ফিরে যাবার উপায় আর নেই,—যাওয়া উচিত নয়। ফলকথা, এক যুগ-সন্ধিক্ষণে বঙ্কিম ক্ষীয়মান অতীতের প্রতি দরদী রসিকের বেদনার্তি নিয়ে সেকালের গ্রামীন্ জীবন ও কাব্য-ধারার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর সে দরদ, সেই আর্ত মমতাবোধ ঈশ্বর গুপ্তের প্রাচীন ঢং-এ লেখা কবিতাকে নবীন কাব্যকলার জগতে প্রকাশ করতে তাঁকে অধিকতর সাহসী করেছিল;—এইটুকুই ঐতিহাসিক সত্য। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য-সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি মূল্য দাবি করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

গুপ্ত-কবিত্বের ঐতিহাসিক স্বভাব

নিছক বিষয়-বিন্যাসের দিক থেকেও গুপ্ত কবি বিশুদ্ধ প্রাচীনতা-ধর্মী নন,—এই বিচারে বরং তথাকথিত 'খাঁটি বাঙালিত্ব' তিনি কমই দাবি করতে পারেন। 'পৌষপার্বণ' বা 'এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছে'র পাশে, 'বিধবা-বিবাহ' 'বিধবা বিবাহ আইন', 'কৌলীন্য প্রথা' 'মাতৃভাষা', 'স্বদেশ'এর মত কবিতাও আছে। আর, কেবল বিষয়বিন্যাসে নয় রচনার প্রাঞ্জলতা এবং আনুপূর্বিক সংসক্তির বিচারেও প্রথম প্রকারের কবিতাগুচ্ছের চেয়ে দ্বিতীয়োক্ত কবিতাবলীই বরং উৎকৃষ্টতর।

এত সব সত্ত্বেও গুপ্তকবির কবিতালোচনা অসার্থক নয়। মনে রাখব, তিনি ছিলেন উদীয়মান নব্যবঙ্গের একদা-বলিষ্ঠতম সাংবাদিক; কেবল সংবাদপত্রের স্তম্ভে নয়, সরস্বতীর কাব্যকুঞ্জেও সেই নবযুগ-সংক্রমণের সংবাদ পৌঁছে দিয়ে গেছেন তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষায়;—আধুনিক বাংলা-কাব্যের প্রস্তুতিপর্বে তিনি সার্থক কবি-সাংবাদিক।

গুপ্ত কবির বিরুদ্ধে 'কবিয়াল'-সমুচিত খেউড় রচনা করে বাংলা-কবিতায় সমসাময়িক ঔৎসুক্য রচনা করেছিলেন গৌরীশংকর তর্কবাগীশ। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের ইটা পরগণায় এঁর জন্ম হয়;—পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য। গৌরীশংকর সাংবাদিক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

শ্রীহট্টের কবি গৌরীশংকর তর্কবাগীশ

'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'সম্বাদভাস্কর'—এই দুটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনা ভার প্রধানতঃ তাঁর 'পরে ন্যস্ত ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত নিজে স্বীকার করেছেন, সংবাদ প্রভাকরের সংগেও তর্কবাগীশের সহৃদয় সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ি হয়েছিল। হঠাৎ গুপ্তকবি ও গৌরীশংকরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, এবং প্রথমজন 'পাষণ্ড পীড়ন' ও দ্বিতীয়জন 'সম্বাদ রসরাজ' আশ্রয় করে পরস্পর পঙ্ক নিক্ষেপে রুচি ও শীলতার মাত্রা বহুদূর অতিক্রম করে যান।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিতৃষ্ণ উল্লেখের পর এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক কৌতূহলও অসঙ্গত মনে হয়।

আলোচ্য পর্যায়ে উল্লেখ্য কবিকর্ম আর কিছু নেই। ঈশ্বরগুপ্তের ধারা অনুসরণ করে কিছু সংখ্যক দুর্বল ব্যক্তি সমকালীন জীবন-বিষয়ে কবিতা লিখেন। এঁদের মধ্যে মহিলাকৃত প্রচেষ্টা বলে কৃষ্ণকামিনী দাসীর

কৃষ্ণকামিনী দাসী

চিত্তবিলাসিনীর (১৮৫৭ খৃীঃ) উল্লেখ করা যেতে পারে। গদ্যপদ্য মিশ্রিত বইটিতে কৌলীন্য প্রথার দোষ আলোচিত হয়েছে। "কৃষ্ণকামিনী দাসী' কোন লেখকের ছদ্মনাম হইতেও পারে।"১

কিছু সংখ্যক কবিতাগ্রন্থে, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত অথবা ইংরেজি থেকে অনুবাদের চেষ্টা আছে। এসব রচনারও উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। মোট কথা, কাব্যের প্রবাহ আধুনিক জীবনের প্রতি বিচিত্র উৎকণ্ঠাকে সম্বল

অন্যান্য রচনা

করে অনাগত মুক্তির জন্য অপেক্ষমান হয়ে ছিল সেদিন। এ-যুগের কাব্য ধারায় সে মুক্তি বাধা-গ্রস্ত হয়েছিল অগভীর জীবনবোধ ও চাতুর্যপূর্ণ বাচন ভঙ্গির বহিরঙ্গ কৃত্রিমতায়। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন এই ধারার প্রভাকর-তুল্য প্রখর বাণীধর।

একাদশ অধ্যায়

বাঙালির নাট্যস্বভাব ও বিবর্তন

জাতীয় প্রস্তুতির সর্বাত্মক প্রচেষ্টার উৎস থেকেই নাট্য সাহিত্যের উদ্ভব। সার্থক নাট্যকলার স্রষ্টা একক নাট্যকার নন,—একটি অখন্ড জাতি। প্রবহমান জীবনধারা, তার দ্রষ্টা নাট্যকার, অনুকারক অভিনয়কারিগণ এবং আস্বাদক দর্শকমন্ডলীকে নিয়ে গড়ে ওঠে নাটকের চতুরঙ্গ কাঠামো।

নাটক ও জাতীয় জীবন

এঁদের সমবেত দান ও সংবেদনাকে নিয়ে সার্থক নাটকীয় পরিমন্ডলের সৃষ্টি;—আর, শিল্প-কৃতির এই যৌথ ধর্মের জন্যই নাটকের ইতিহাস জাতির অখন্ড জীবন-ইতিহাসের সংগে সম্পৃক্ত।

সাধারণ ভাবে, শিল্প-সাহিত্যমাত্রই জীবন-সম্ভব। কিন্তু, জীবন-সত্য ও জীবন-ধর্মকে আয়ত্ত করার আকার ও প্রকার অনুসারে শিল্প-কৃতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেয়। জীবন-বোধের বিবর্তন অনুসারে একই কৃষ্ণ-

১। বাঙালা সাহিত্যে গদ্য—ডঃ সুকুমার সেন।

কথা চৈতন্য-পূর্ব যুগ থেকে কবিওয়ালাদের কাল পর্যন্ত বিবর্তিত হয়ে ভাব-রূপে বিচিত্র সাহিত্য-কর্মের সৃষ্টি করেছিল। বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনী ভবভূতির উত্তর রামচরিতে যে নব-রূপ গ্রহণ করেছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।১ সেখানেও বাল্মীকির সংগে ভবভূতির শিল্প-পার্থক্যের মূলে রয়েছে শিল্পি-দুজনের জীবন-বোধের বিভিন্নতা। বিশেষ বিশেষ দেশ-কালে জীবন-বোধের পার্থক্য অনুসারে সাহিত্যের ভাব-ধর্ম যেমন পরিবর্তিত হয়,—তেমনি ভাবের অনুযায়ী নূতন বাগ্‌ভঙ্গিও হয়ে থাকে স্বতপ্রকাশিত। সাহিত্য-শিল্পে 'ভাব' ও 'রূপ'-এর সম্পর্ক 'হরিহরের' মত সহজ সম্পৃক্ত। যথার্থ নূতন ভাব-সম্পদ আপনা থেকেই নূতন প্রকাশ-শৈলীকে আশ্রয় করে থাকে। তাই দেখি, প্রাচীনকালের বিভিন্ন সাহিত্যিক 'রূপ-কল্পের' জন্ম-মূলে সমকালীন জীবন-যাত্রা এবং জীবনাস্বাদনের বিশেষ ভঙ্গির (Pattern) প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, মহাকাব্য বা Epic যুগের সাহিত্যে একটা অখণ্ড যুগ-জীবন যথাস্থিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি সমালোচক এর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,—এপিক হচ্ছে শূর যুগ (Heroic Age)-এর প্রতিনিধি শূরকাব্য (Heroic Poetry)।২

এদেশেও যে দুটি মহৎ কাব্য মহাকাব্যের স্থায়ী মর্যাদা পেয়েছে,—সেই রামায়ণ ও মহাভারত জাতীয় জীবনের অখণ্ড-সম্পূর্ণ ঐতিহ্যেরই মূর্ত প্রকাশ। প্রাচীনতম সভ্য মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বোধের অভিব্যক্তি হিসেবে হোমার বাল্মীকি এবং ব্যাসের কাব্য অন্যকাল-নিরপেক্ষ বিশেষ রূপাঙ্গিককে অবলম্বন করে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। কিন্তু, বাল্মীকি-ব্যাসের কালের পরে সেই আঙ্গিক-কাঠামো অনুসরণ করতে গিয়ে কালি-দাসের মত কবিও যা সৃষ্টি করলেন, তা আর মহাকাব্য হয়ে উঠ্‌ল না,—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অলংকার শাস্ত্রের জোরেই" তা মহাকাব্য।৩ ঠিক্ তেম্‌নি, প্রতীচ্যদেশে বিভিন্ন ভাষায় হোমারের উত্তর-সূরিগণ যা রচনা কর্‌লেন, মৌলধর্মের বিচারে তাদের 'Epic' বলে স্বীকার করা চলে না। তাই, 'Authentic Epic' এর বদলে সেগুলো হল Literary Epic;—অর্থাৎ সেই একই আলংকারিক মহাকাব্য।৪ একই মহাকাব্য রচনায় এই আঙ্গিকগত পার্থক্যের মূলে রয়েছে জীবন-ভঙ্গি ও জীবন-বোধের আমূল বিভিন্নতা। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সংগে হোমার-বাল্মীকি-ব্যাসের যুগের সমাজ-জীবন ছিল ঘন-সন্নিবিষ্ট।—সে যুগের কাব্য সৃষ্ট হত প্রধানতঃ পড়বার

১। দ্রষ্টব্য বিবিধ প্রবন্ধ।
২। দ্রষ্টব্য—The Epic. Aber Crombie.
৩। 'রামায়ণ' ঃ—প্রাচীন সাহিত্য।
৪। The Epic.

জন্যে নয়!—একটা গোটা সমাজ সেখানে মুখোমুখি হয়ে বস্‌ত; আর ভাব-তদ্‌গত উদাত্ততার সংগে একজন তা আবৃত্তি করে চল্‌তো;—একের কণ্ঠ থেকে কাব্য-রস একই সংগে ছড়িয়ে পড়ত একটি গোটা-সমাজের মধ্যে। লেখক, পাঠক এবং শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে এক অসাধারণ পরিমাণ ভাব-সাযুজ্য না থাক্‌লে এই কাব্য-পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। তাই, যে যুগে সমানুভূতি পরায়ণ একটি গোটা সমাজের সামাজিকগণ এক অভিন্ন জীবন-বোধ নিয়ে একটি বিশেষ রসাস্বাদনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, যেখানে শিল্পী নিজের ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ ভাবে সেই সার্বিক আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পরূপায়িত করেছেন,—যেখানে শিল্পী এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সমমর্মী হয়ে আবৃত্তি-কারক সেই সর্বজন-কাম্য রসানুভূতিকে কণ্ঠে কর্‌ছেন উৎসারিত,—সেই দলগত অখণ্ডতার মধ্যে,—পূর্ণাঙ্গ Team-work-এর মধ্যেই Epic শিল্প পূর্ণ অবয়ব লাভ করে। স্রষ্টা, পাঠক ও উদ্গাতার মধ্যে ব্যক্তি-সচেতনতা যত প্রবল হয়েছে,—দল সংগঠন হয়েছে তত শিথিল; শিল্পরূপায়নে ব্যক্তিত্ব-প্রধান মন্ময়তার (Subjectivity) দরুণ, অখণ্ড জীবন-তন্ময়তার (Objectivity) ঘটেছে অভাব। ফলে, Epicএর মৌল ধর্ম পড়েছে ভেঙে।

Epic বনাম নাটক

বর্তমান উপলক্ষ্যে Epic প্রসঙ্গের এই দীর্ঘ অবতারণা অকারণ নয়। আমাদের ধারণা, নাট্য-কলার উদ্ভবের-মূলে Epic সাহিত্যের Team workটি আরো ঘনবদ্ধ,—আরো সক্রিয় হয়ে আছে। ফলে, সফল নাট্য রচনার পটভূমি হিসেবে জাতীয় জীবনের অখণ্ড সংগঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ঘটেছে বারে বারে।

প্রতীচ্য দেশের ইতিহাসে গ্রীক্ 'এপিক্'-এর যুগের পরেই নাটকের উদ্ভব। 'এপিক্'-এর মধ্যে বর্ণনা (Narration) এবং ঘটনার (action) ধর্ম একত্র-বদ্ধ আছে;—তার থেকে ঘটমানতার (activity) উপাদানকে একত্র-সন্নিবদ্ধ, দৃঢ়পিনদ্ধ করেই নাট্যকলার উদ্ভব। বর্ণনার জগতে পাঠক বা শ্রোতা একটি বহিরাগত সত্তা; সাহিত্যের মূল বাচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সে নয়। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীর বিড়ম্বনাকে উৎকণ্ঠার সংগে অনুসরণ করে পাঠক ছুটে চলে ব্রহ্মদেশের দুর্গমতায়; আবার তারই সংগে ফিরে আসে কল্‌কাতায় উপেন্দ্রের অন্তিম শয্যার কারুণ্য-লোকে। কিন্তু, কিরণময়ীর ট্রাজেডির সংগে যতই সহৃদয় হয়ে উঠুক না কেন, শরৎ-সাহিত্যের পাঠক কিছুতেই নিজেকে উপেন্দ্র-দিবাকর-সতীশের মত 'চরিত্রহীন'-কাহিনীর একটি অপরিহার্য চরিত্ররূপে অনুভব করতে পারে না। গোটা গল্প বর্ণনার সে শুধু একজন শ্রোতা,—বাইরের জগতের সাক্ষী। কিন্তু 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়কালে প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি

প্রতীচ্য নাট্যাঙ্গিকের ঘটনা-সংবদ্ধতা

দর্শক মূল ঘটনার সংগী,—নিজ নিজ মনের গভীরে প্রত্যেকে নাটকীয় ঘটনার অপরিহার্য চরিত্র এক একটি। এই কারণেই, 'ক্ষেত্রমণির' ধর্ষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত দর্শক নিষ্ক্রিয় হয়ে থাক্‌তে পারেন নি,—সর্বজন-বন্দিত তালতলার চটি একপাটি ছুঁড়ে নিজের দিক্ থেকে ঘটমানতার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের মত উচ্চকিত সমমর্মিতা দুর্লভ। তাহলেও, মোটামোটি প্রত্যেক দর্শকই যে প্রেক্ষাগৃহে সজীব মঞ্চাভিনয়ের কমবেশি দৈহিক অনুবর্তন করে থাকেন, এটি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা। বর্ণনা-ধর্মী শিল্প রচনায় লেখক বিশেষ-ভাবে নিজের কল্পনা-লোকেরই অনুসরণ করেন। কিন্তু, নাট্যশিল্পীকে তাঁর সৃজনজগৎ নিয়ে এসে বস্‌তে হয়, অভিনয়-শিল্পী এবং দর্শক মণ্ডলীর মাঝখানে। কল্পনাধর্মী স্রষ্টার প্রতিষ্ঠা তাঁর ভাবজগতে, নাট্যকারের সৃষ্টির আসন আপামর জাতির জীবন-বেদীতে।

এদিক্ থেকে সার্থক নাট্য-রসাস্বাদনের শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি নাট্যমঞ্চ। রচয়িতার বাচ্য-বিষয় সহৃদয় অভিনেতৃগণের অভিনয়ের মধ্যে ঘটনা-রূপ লাভ করে যখন দর্শকের মনে আবার নূতন ঘটমানতার (activity) দোলা সৃষ্টি করে, তখনই হয় সার্থক নাট্য-কলার রসাভিব্যক্তি। সন্দেহ নেই, আধুনিক কালে নাট্যকাব্য, এমনকি, প্রধানতঃ পাঠযোগ্য নাটক রচনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু, সে সকল রচনা 'অলংকার শাস্ত্রের জোরেই' নাটক, নাট্যকলার মৌলিক আস্বাদন-ধারা সেখানে প্রায় অলভ্য। বর্তমান পর্যায়ে এ ধরণের সৃষ্টির বিচার প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু, এই উপলক্ষ্যে মনে রাখ্‌তে হবে, যথার্থ নাট্যশিল্পীকে তাঁর বাচ্য বিষয়ের স্ফূর্তির জন্য কেবল নিজের ওপর নির্ভর করলে চলে না;—লেখনী চালনার সময় তাঁকে একটি চোখ নিবদ্ধ রাখ্‌তে হয় নির্দিষ্ট অভিনেতৃ-সমাজের প্রতি, আর একটি চোখ দর্শক-সাধারণের ওপর। যে বিষয়টি অভিনেতৃগণ সহৃদয় সার্থকতার সংগে হুবহু প্রকাশ করতে সক্ষম, এবং সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে যে বিষয়টি সহজে সকল দর্শকের মর্মগত হতে পারে, ঠিক্ সেই বিষয়ের যথোচিত সৃষ্টিই নাট্যকারের সাধনা হওয়া উচিত। স্পষ্টই দেখ্‌ছি, স্রষ্টা, অভিনেতা ও দর্শকের অভিন্ন-মর্মিতাই সার্থক নাটক রচনার অপরিহার্য পটভূমি। যে-দেশে, যে-কালে এই সার্বিক অভিন্নমর্মিতা ঘনতম সন্নিবিষ্ট হয়েছে;—তখনই সেদেশে সার্থক নাটক রচনা হয়েছে সম্ভব। প্রতীচ্যে পেরিক্লিসের যুগের গ্রীক্-নাটক, চতুর্দশ লুই-এর যুগের ফরাসী নাটক এবং এলিজাবেথের যুগের ইংরেজি নাটক এই সত্যকেই প্রতীয়মান করে।

সংস্কৃত নাট্যকলাতেও জাতীয় ঘন-সন্নিবদ্ধতার একান্ত প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। প্রতীচ্য আদর্শমত ঘটনার (action) প্রাবল্য সংস্কৃত নাটকে প্রায় অলভ্য। তবু, দর্শক, অভিনেতা ও স্রষ্টার মধ্যে সেখানে একটি অভিন্ন-

হৃদয় আদর্শ-সমতা গড়ে উঠেছে। সমকালীন ধর্মাশ্রিত জীবন-মূল্যবোধের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল তার উৎস। সংস্কৃত নাট্যালংকারিক সেই মূল্যবোধ-কেই সাধারণীকৃত করেছেন। কোন্ বিষয়টি বর্ণিতব্য, কোন্‌টি নয়, কোন্‌টি আস্বাদ্য, কোন্‌টি বা আস্বাদনের অনুপযোগী, এসব বিচার-নির্দেশের মধ্য দিয়ে নাট্যসৃষ্টির সংগে অপরাপর তিনটি নাটকীয় উপাদানের যোগে সংস্কৃত নাট্যকলার চতুরঙ্গ সম্মিলন সার্থক হয়েছে। তা ছাড়া, সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রথম থেকেই দর্শককে নাটকীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের 'প্রস্তাবনায়' সূত্রাধর নটীর নিকট প্রথমেই বক্তব্য আরম্ভ করেছে,—"আর্যে! অভিরূপ ভূয়িষ্টা পরিষদিয়ম্। অদ্য খলু কালিদাস গ্রথিত-বস্তুনা নবেনাভিজ্ঞান শকুন্তলাখ্যেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎপ্রতি পাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ।"—এখানে প্রথম থেকেই সকল যত্ন 'অভিরূপ ভূয়িষ্ট 'পরিষৎ'-এর প্রতি নিয়োজিত হয়েছে। অন্যত্র 'সূত্রধার' আবার বলেছে,—"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমনে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্। বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"—এই রূপে বিদ্বৎ-জন-রূপ দর্শকের পরিতোষ-সাধনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাকে নাট্যাভিনয়ের অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সংস্কৃত নাটকেই সূত্রধার একই রকমে নাট্য-বিষয়, অভিনেতৃবর্গ ও দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে অভিন্নসূত্র সংগ্রন্থন সৃষ্টি করে থাকে।

সংস্কৃত নাটকে জাতীয় ঘন-সন্নিবন্ধতা

অতএব দেখছি, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য নাট্যাঙ্গিকে পার্থক্য যতই থাক্,—সব নাটকেরই সাধারণ ধর্ম জাতীয় জীবনাশ্রয়ের যৌথতায়। আবার, একথাও সত্য যে, প্রত্যেক জাতির মৌল স্বভাবের মধ্যে-অনন্যতুল্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই স্বতন্ত্র স্বভাব নাট্যকর্মের মধ্যে সংসক্ত রূপ ধারণ করে বলে, এক জাতির ভাষায় লেখা নাট্যধর্মের সংগে অপরাপর জাতির নাট্য-ধর্মের আমূল পার্থক্য ঘটে থাকে। অতএব, নাট্যকলা বিচারের কোন আন্তর্বিশ্ব অন্য-নিরপেক্ষ (absolute) মান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দৃশ্য-কাব্য, অর্থাৎ মঞ্চাশ্রয়ী ঘটনাপ্রধান শিল্প সম্বন্ধে একটা সাধারণ প্রত্যাশা যদি গড়ে তোলা চলেও, তবু, সে সাধারণ গুণাবলী কোন্ জাতির রচনায় কতটুকু পাওয়া যেতে পারে, সে বিচার দেশ-কাল সাপেক্ষ। এই কারণেই ইংরেজি নাট্যকলার তুলনায় সংস্কৃত নাটক কাব্যমাত্র, আর ইংরেজি বা সংস্কৃত উভয় নাটকেরই আদর্শানুসারে বাংলার কোনো নাটক পূর্ণাঙ্গ সফল নয়।

নাটকে জাতীয় নাট্যস্বভাব

বাংলা নাটকের ইতিহাস বিচারের প্রারম্ভে এই সত্যটুকু বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কারণ, বাংলার নাট্যমঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি

স্ব-বিরোধ এ-পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। বাঙালি শিল্পীর প্রতিভা নাটকের অপেক্ষা কাব্য ও গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকতর সার্থক হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। নাট্যরচনায় এই শক্তি-মান্দ্য বাঙালির জাতীয় স্বভাবের পরিণাম বলেই মনে করি। তা হলেও, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালকে কেন্দ্র করে, বাংলার নবজাত নাট্যমঞ্চ একদা শিল্প-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।—বিশেষ করে উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালির জীবনে সেদিনের নাট্য উদ্দীপনা অপূর্ব অভিজ্ঞতার আকর হয়ে আছে আজও। অথচ, মঞ্চ-সফলতা ও যৌথ জীবনাস্বাদনের এই ঐতিহ্য সত্ত্বেও একালের বিচারকের দৃষ্টিতে প্রায় সকল বাংলা নাটকেই সার্থকতার চেয়ে ত্রুটিই লক্ষিত হয় বেশি পরিমাণে। রঙ্গমঞ্চে জাতির যৌথ জীবনের রূপায়নই যদি নাট্য সাহিত্যের সার্থকতার মানদন্ড হয়, তবে উনিশ শতকের বাস্তব ইতিহাস এবং আমাদের তত্ত্ব-নির্ভর (academic) নাটক বিচারের কোথাও কোনো বিরোধ আছে,—এ কথা মান্‌তে হবে। পরবর্তী আলোচনায় দেখব, —বাংলার জীবনধর্মের দ্বারা বিশেষিত নাট্যকলাকে প্রধানতঃ এলিজাবেথ-এর যুগের ইংরেজি নাট্যাদর্শের মান অনুযায়ী বিচার করতে গিয়েই এই বিভ্রাটের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু, সে বিচারের আগে বাংলা নাটকে বাঙালির জাতীয় স্বভাবের সঙ্গে প্রকাশের পরিচয় অনুধাবন যোগ্য।

এ-কালের বাংলা নাটক বিচারে স্ব-বিরোধ

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ে মূলাবধি বাঙালির জাতীয় স্বভাবকে অনুসন্ধান করে দেখেছি, প্রবল ভাবাবেগ এবং আত্মগত উচ্ছ্বাসই সেই স্বভাবের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই বাঙালির রচনায় গদ্য অপেক্ষা পদ্যের দিকে প্রবণতা বেশি;—এই কারণে বাঙালির গদ্য কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত, এবং বাঙালির কবিতা মাত্রই সংগীত-ধর্মী। সর্ব-নিরপেক্ষ এই ভাব-প্রাধান্যের ফলেই বাংলার সাহিত্য-প্রতিভা মাত্রই আত্মলীন কবিতা অথবা বিবরণাত্মক (Narrative) গদ্য রচনার প্রতি ঝুঁকেছে বেশি। ঘটনা (action)-প্রধান নাট্য রচনার পক্ষে বাঙালির জাতীয় স্বভাব অনুকূল নয়।

তথা নাট্যস্বভাব

তা সত্ত্বেও, বাঙালির জীবনের নাটক রচনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল স্বাভাবিক কারণে, এবং প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি স্বাধীনভাবে নাটক রচনাও করেছে। আগে বলেছি, নাটক রচনার স্বাভাবিক প্রেরণাটি সূচিত হয় জাতীয় জীবনের নিবিড় ঘন-সংবদ্ধতার মধ্যে;—গোটা জাতি যেন সেখানে আত্মোৎসার ও আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরের মুখোমুখি এসে বসেছে। সেই দীপ্ত-উদ্দাম সন্নিবদ্ধতাকে নিছক বর্ণনা বা অনুভূতির অনুষঙ্গ তৃপ্ত করতে পারে না,— কর্মকন্ডূয়ন তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসেও যে-পর্যায়ে জীবন-সংবন্ধন জনিত

কর্মকণ্ডূয়ন দুর্বার হয়েছে, তখনই তার স্বভাবগত আবেগ হয়েছে কর্মে অনূদিত; সেখানেই বাঙালিধর্মী নাটকের জন্ম,—ভাবানুভূতির কর্মানুবাদ (Translation of emotion into action)-এর মধ্যে।

বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যাঙ্কুরের সন্ধান মিলেছে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে। তারও আগে, বাঙালির নাট্য-স্বভাব অঙ্কুরিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষার গীতগোবিন্দে। কৃষ্ণকীর্তন কাব্য আসলে পদের সমষ্টি; পদগুলির ওপরে গেয় সুরের উল্লেখও রয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রায় আদ্যন্ত গ্রন্থখানিই কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াইর কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত। গোটা রচনার বিভিন্ন খণ্ডে একটি বিরোধমূলক কাহিনীর ঘটনানুক্রমিক প্রসার ও পরিণতিও লক্ষ্য করবার মত। সব কিছু মিলিয়ে, মনে হয়, একটি নাটকীয় কাহিনীকে যেন সাংগীতিক সংলাপের মধ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই, গ্রন্থ-সম্পাদক 'কৃষ্ণকীর্তন'কে "গীতিনাট্য-শ্রেণীর গীতিকাব্য" নামে পরিচিত করেছেন। আমাদের ধারণা 'গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য' সৃষ্টিই বাংলা নাটকের মৌল স্বভাব। তুর্কী-আক্রমণোত্তর বাংলার জাতীয় জীবনের একত্র ঘন-সন্নিবেশের আকাঙ্ক্ষা অপরিহার্য হয়েছিল। অজস্র বিরোধ-বিক্ষোভে তাড়িত সেদিনের জীবনে প্রেমের যে মর্মপীড়া অন্তর-গহনে বেদনার আবর্ত রচনা করেছিল, রাধার আর্তিতে সেই সামাজিক বেদনারই অভিপ্রকাশ। ফল কথা, বাঙালির মর্মোৎসারিত প্রেমাকূতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম কর্মানূদিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে, বাঙালির নাট্যকলার উদ্ভব এখানেই হয়েছে অঙ্কুরিত। এদেশে প্রতীচ্য সংসর্গের জন্য তখনো বহু শতাব্দীকালের অপেক্ষা ছিল। আর, অবহিত-চেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন, কৃষ্ণকীর্তনের কাব্যদেহে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বহুল প্রভাব থাকলেও, তার নাট্যাঙ্গিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কোনো উল্লেখ্য প্রভাব নেই। বাংলা ভাষার এই প্রথম নাটকীয় প্রয়াসটুকু বাঙালির জাতীয় স্বভাবের মূল-জাত,—সংস্কৃত অথবা ইংরেজি নাট্যকলার সংগে তার কোনো যোগ নেই,—ইতিহাসের এই তাৎপর্যটুকু লক্ষ্য করবার মত। পরবর্তী কালের বিবর্তন ধারায় এই স্বভাব-ধর্ম সকল সার্থক বাংলা নাট্যকলার মূলে সম্পূর্ণ অটুট থেকেছে। সংস্কৃত বা ইংরেজি নাট্যকলার বহিঃসম্বন্ধ বাংলা নাটকের মৌলিক চরিত্রগুণকে কেবল উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধই করেছে, তাকে বিলুপ্ত করেনি। অতএব, ইংরেজি বা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী বাংলা নাটকের বিচার নির্দিষ্ট না করে, বাঙালির স্বভাব-ধর্মানুযায়ী নূতন বিচার-মান আবিষ্কারই অধিকতর পরিমাণে ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্মত হবে বলে মনে করি।

প্রথম বাংলা নাট্যাঙ্কুর

চৈতন্য-পূর্বকালে 'কৃষ্ণকীর্তন' অভিনীত হয়েছিল কি না, জানা যায় না। কিন্তু, চৈতন্যদেব নিজে যে একাধিকবার কৃষ্ণলীলাত্মক কাহিনীর

অভিনয় করেছিলেন, তার পরিচয় আছে। চৈতন্যদেবের অভিনীত 'দানলীলা' ও কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড অভিন্ন কিনা, সে প্রশ্ন বর্তমান উপলক্ষ্যে অবান্তর। এমন কি, অভিনীত পালাটি যদি সংস্কৃত ভাষার কোনো কাব্য থেকেও সংকলিত হয়ে থাকে, তবু, অভিনয়ের বিষয়-উৎস যে সমকালীন বাংলার সমষ্টি জীবনের মূল-জাত, তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। চৈতন্যদেবের পরে মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে আর কোনো নাট্যানুষ্ঠানের সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে, চৈতন্য-ধর্মকে আশ্রয় করে এদেশে গোষ্ঠিগত জীবনচর্চার যে মহোৎসব সুরু হয়েছিল, তার ফল-পরিণাম লক্ষ্য করি সংস্কৃত ভাষায় লেখা তিনটি নাটকে। প্রথম দুটির লেখক গোস্বামী শ্রীরূপ;—ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব সংস্কৃত ভাষায় লেখা। আঙ্গিক অংশেও এই দুই নাটক সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের অনুসারী। তাহলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বকে শিল্প-রূপায়িত করাই গ্রন্থ দুটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। শুধু তাই নয়, চৈতন্য জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, এবং চৈতন্য ধর্মাদর্শের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা রূপগোস্বামী ঐ দুটি কৃষ্ণ-কথাশ্রিত নাটকেও প্রেমময় জীবন-ঐতিহ্যের অপরূপ ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। মধ্যযুগীয় অখণ্ড বাঙালি জাতি তথা সমগ্র প্রেম-ধর্মান্বিত ভারতবর্ষীয় সমাজের ভাব-বাসনাকে প্রকটিত করেই যেন নাটক দুটি রূপ ধরেছিল। কবি কর্ণপুরের লেখা চৈতন্য চন্দ্রোদয় সংস্কৃত নাটক এই ভাব-পরিমণ্ডলকে আরো ঘন-নিবন্ধ করেছে; কারণ, তাঁর নাট্য-বিষয় ছিল চৈতন্য-জীবন-কেন্দ্রিক। বাংলা ভাষা, তথা বাংলা দেশের সংগে এই সব রচনার সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু চৈতন্য-চেতনার প্রভাবে বাংলার জীবন-লোকে জাগ্রত সমষ্টিগত জীবন-ঔৎসুক্যের সফল রূপায়ন প্রত্যক্ষ করি এই সব নাট্য-নাটিকায়। তাই, সমকালীন বাঙালি জীবনের সংগে এই রচনা-তিনটি সম-ধর্মান্বিত। বলা বাহুল্য, আলোচ্য শিল্পী দুজনও ছিলেন সেকালের বাঙালি।

কৃষ্ণকীর্তনের পালা অভিনয়

সংস্কৃত ভাষায় বাঙালির নাটক

চৈতন্য যুগে জাতির বৃহত্তর জীবন-সমুদ্রে যে সমষ্টি-নিবন্ধ উচ্ছ্বাস অতি প্রবল হয়েছিল, এ-যুগের দুর্বল নাট্যাঙ্কুরের মধ্যে তারই একটি অবচেতন স্বভাব-প্রকাশ লক্ষ্য করি। চৈতন্য-উত্তর কালে বাংলা নাটক আর কিছু লিখিত, বা অভিনীত হয়েছিল কিনা, জানা যায়নি। সে খবর জানা গেলে, প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহলের নিবৃত্তি হতে পারত। তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আলোচ্য পর্যায়ে নাটক রচনার চেষ্টা যদি কিছু হয়েও থাকে, তবু ভাব-সমুদ্বেল বৈষ্ণব গীতিকবিতা এবং বাস্তব জীবন-রস-ঋদ্ধ

বাঙালির নাটক ও চৈতন্যযুগ

'মঙ্গল-গীতি'র সমৃদ্ধির অতলে সে ইতিহাস লুপ্ত হয়েছে। নাট্য-বাসনার একটি অস্ফুট অঙ্কুরিত আবেগ ও তার ক্রম-বিলুপ্তির এই অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে, পূর্বালোচনার সূত্র ধরে বলতে পারি, বাঙালি সমাজ-জীবনের একত্র-সন্নিবেশ সেদিন নাটকের এই অস্পষ্ট আকৃতিকে উদ্বোধিত করেছিল। কিন্তু, চৈতন্য-প্রবর্তিত জীবনাবেদনে সংসক্তি অপেক্ষা আবেগ-স্ফীতি ছিল বেশি; তাই, এ-যুগে নাটকের বদলে 'গীত'ই প্রধান হয়ে রইল।

কিন্তু, এই গীতি-রচনার মধ্যেও চোখে পড়ে সুপরিবদ্ধ কাহিনীর (Plot) গ্রন্থন, ও সে কাহিনীকে যথাসম্ভব সংলাপাশ্রিত করে তোলার পরোক্ষ নাটকীয় প্রয়াস। কীর্তনের কল্যাণে বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব কবিতাবলী বিভিন্ন রসপর্যায়ের অনুসারে পালা-বিভক্ত হতে আরম্ভ করেছিল। তাতে সখী, রাধা অথবা কৃষ্ণের উক্তিরূপে বিভিন্ন পদের পরিকল্পনা লক্ষ্য করবার মত। একালের অনেক সিদ্ধকাম কীর্তনকারদের দেখেছি,—ঐ সব 'পালা গান' গাইবার সময়ে তাঁরা বিভিন্ন চরিত্রের সংগে একান্ত একাত্ম হয়ে পড়েন! গানের সংগে সংগে বিশিষ্ট চরিত্রের ভাবাকৃতি তাঁদের দেহ-ভঙ্গিতেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর, 'আখর' গুলো হয় সেই ভাব-পরিপোষণের সার্থকতম সহায়। সব কিছু মিলে পদকীর্তনের আসরে একটি একক 'গীতাভিনয়'-ই সহজ মূর্তি ধারণ করে। অভিনয় কলার এই সুগঠিত প্রয়াস কীর্তনে যদি প্রথমাবধি না-ও থেকে থাকে, তবু এর একটি মোটামুটি কাঠামো যে মূল পালা সজ্জাতেই ছিল, তাতে সংশয় নেই। চন্ডী বা মনসা মঙ্গল, কিংবা রামায়ণ গানের মধ্যেও একজন মাত্র গায়েন 'অষ্ট-মঙ্গলা'-র পালা 'আসরে' গান করে ফিরেন; সেখানেও গীতাংশের সংগে জড়িয়ে রয়েছে অভিনয়-প্রয়াস। সপ্তদশ অষ্টদশ শতাব্দীর সামাজিক বিপর্যয়ের লগ্নে এই অভিনয়-সম্ভাবনাযুক্ত গীত-সাহিত্যই বিচিত্র রূপায়িত হয়েছে তর্জা, আখড়াই, কবিগানের আসরে। কবি-সাহিত্যের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে নাট্যানুকূল পরিবেশ মোটেও রচিত হতে পারত কিনা, তা বলা কঠিন। 'পাঁচালি' গানে একটিমাত্র গায়ক বিভিন্ন ভূমিকার গীতাভিনয় করে আসর জমিয়ে তুলতেন;—এ বিষয়ে দাশু রায়ের ঐতিহ্য সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। চৈতন্যোত্তর কালের এই সকল গীতি-প্রচেষ্টার মধ্যে বাঙালি-ধর্মী নাট্য-সম্ভাবনা কতদূর অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে তথ্য বিতর্কিত গবেষণার বিষয়। কিন্তু, আমাদের আলোচ্য যুগের অব্যবহিত পূর্বে ও সমকালে 'যাত্রা'-সাহিত্য যে এ-দেশের জাতীয় নাট্য ঔৎসুক্যকে অসম্পূর্ণ পরিমাণে হলেও সার্থক মুক্তি দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বহিরঙ্গ

বৈষ্ণব পালাকীর্তনে বাঙালির নাট্য স্বভাব

নাট্য-স্বভাবিত অন্যান্য রূপ

ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে 'যাত্রার' সংগে আধুনিক বাংলা নাটকের কোনো সংযোগ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু, বাংলা নাট্যকলায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাঙালি স্বভাব যতটুকু স্ফুরিত হয়েছে, বাংলা নাটকের অন্তর-পরিচয় ততটুকু পরিমাণে যাত্রা-ধর্মী বলে মনে করি। তাই, বর্তমান প্রসঙ্গে যাত্রা ও বাঙালির নাট্য-স্বভাবের সংযোগ সন্ধান অপরিহার্য।

যাত্রা

'যাত্রা' শব্দটি কত প্রাচীন,—মূলতঃ এটি আর্য, অথবা অনার্য-ভারতীয় কোন্ ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা বিচার-অনুমান করেছেন। নাট্য জগতে 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহার-ঐতিহ্য সম্বন্ধে ডঃ সুশীল কুমার দে লিখেছেন,—

"The traditional existence of Yatras is known to us from time immemorial and in Bharat's Natya Sastra, we hear of popular semidramatic performences, which have been generally regarded as the probable pre-curser of the popular Yatras, on the one hand, and of the later Sanskrit dramatic literature on the other."১

কিন্তু ডঃ দেও স্বীকার করেন,

"that the principal elements in the old Yatra seem to be of indegenous growth, peculiar to itself."২

বিভিন্ন ধর্মোৎসবে 'নাট্যগীতানুষ্ঠানের' দেশজ প্রচেষ্টার পরিণতি হিসেবেই যে যাত্রা-সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল, সে বিষয়ে বর্তমান-কালে কারো সংশয় নেই। ডঃ সুশীল দে অবশ্য 'কৃষ্ণকীর্তন' এবং শ্রীচৈতন্যের অভিনয়কে 'যাত্রার' ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। ঐ সব আদিম প্রয়াস যাত্রা নামে পরিচিত হবার যোগ্য কি না তাতে সংশয় আছে। কিন্তু, যে যাত্রা-সাহিত্য প্রাচীন বাংলার আবেগপ্রধান, আবৃত্তি-মূলক গীতি-কাব্যের স্বভাবধর্মকে বহু পরিমাণে ধারণ করে আছে, তাতে সংশয় নেই। এদিক্ থেকে মধ্যযুগের 'পালা' কাব্যসমূহের নাট্যিক বিকাশ রূপে 'যাত্রা' সাহিত্যের উদ্ভব কল্পনা করা খুব অসংগত নয়। ডঃ দে-ও যাত্রা-সাহিত্যের প্রায় অনুরূপ পূর্ব-ঐতিহ্যের কথা ইঙ্গিত করেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন 'পাঁচালি' থেকে যাত্রার উদ্ভব অনুমান করেছেন।৩ কিন্তু, এতে আপত্তির কারণ যে আছে, তা দেখিয়েছেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।৪ 'পাঁচালি' বাংলার প্রাচীনতম কাব্যধারার একটি;—ত্রয়োদশ শতকে 'মঙ্গল-কাব্য' বিকাশের উৎসমূলেও 'পাঁচালির' অস্তিত্ব অনুমান

১। Ninteenth Century Bengali Literature.
২। ঐ।
৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২য় সং।
৪। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস।

করা হয়েছে। কিন্তু, দাশুরায় বা তাঁর পূর্বসূরীদের হাতে, পাঁচালি যে রূপাঙ্গিক লাভ করেছিল, তার ঐতিহ্য কত প্রাচীন সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া চলে না। অথচ, যাত্রা-সাহিত্য যে সুপ্রাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক্, 'যাত্রার' প্রাচীন ঐতিহ্যের মোটামুটি একটি পরিচয় পাই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি উক্তিতে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহে তিনি লিখেছিলেন,—"গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে 'কবির' হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে 'যাত্রা' বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে, সংকীর্তন ও পরে 'কবির' প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্যন্ত দেশের বিনোদন ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না।"২

যাত্রার প্রাচীন ঐতিহ্য

রাজেন্দ্রলালের হিসেব যদি ঠিক্ হয়, তবে মনে করা যেতে পারে উনিশ শতকের একেবারে সুরুতেই 'যাত্রার' 'পুনর্বিকাশ' ঘটে। কিন্তু, এই ধারার অভিনয়-কৃতির মূল বিকাশ যে আরো প্রাচীন, এমন কি, 'কবি' ও 'কীর্তন' ধারার সুস্থায়ী প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী, আলোচ্য লেখক সে ইঙ্গিতও করেছেন। 'নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ' বল্‌তে ঠিক্ কি বোঝানো হয়েছে, তা নির্ধারণ করা শক্ত। তবে, মনে রাখ্‌তে হবে, রাজেন্দ্রলাল বাংলার প্রাচীনতম শেক্‌স্‌পীয়র নাট্য-পিয়াসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ছিলেন। অতএব, স্থূলতা, দেশীয়তা, গীতি-সর্বস্বতা, ঘটনা-দৌর্বল্য সব কিছু মিলিয়ে যাত্রার নাট্যকলাগত ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত যে আছে, এ-সম্বন্ধে সংশয় করবার কারণ নেই।

যাত্রার পুনর্বিকাশ

বাংলার এই গীতি-বহুল যাত্রা-সাহিত্য, যতদূর জানা গেছে, মূলতঃ 'কৃষ্ণ-কথাকে' আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। চৈতন্যোত্তর যুগ থেকেই বাংলা দেশে "কানু বিনে গীত নেই।" সেই 'কানুগীতির' ধারা কাব্য ও গীতের বাহনকে অতিক্রম করে কোন্ ঐতিহাসিক মুহূর্তে অভিনেয় মাধ্যম আশ্রয় করেছিল, সে তথ্য আজ জান্‌বার উপায় নেই। তবু, কৃষ্ণানুরক্তির বাঙালি-ধর্মী জাতীয় আবেগ যে 'কর্মানুদিত' হয়ে 'যাত্রারূপ' ধারণ করেছে, তাতে

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, যাত্রার প্রাচীনতম রূপের মধ্যে নাট্যাঙ্গিকের স্থূল কাঠামো আশ্রয় করে আসলে গীতাবেগকেই আস্বাদন করা হত।

যাত্রার রূপাঙ্গিক

ফলে, অনেকক্ষেত্রে সংলাপ অংশও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত গীত-মাধ্যমেই রচিত হয়েছে। এমন কি, যে যুগে যাত্রার নাট্যসম্পদ সমৃদ্ধি পেয়েছে, তখনো দর্শকজনের মনোরঞ্জন করতে বিচিত্র ধরণের গীতি-ঐতিহ্যের পরে বিশেষ নির্ভর করা হত। ডঃ সুশীল দে লিখেছেন,

"The peculiar mode of singing Chaupadis or the Mahajan padas by pattan or devising the peculiar variation of a Tukko in the music of the Kirtan was utilised by every yatrakar for entrancing his audience."১

অতএব, মনে রাখ্তে হবে, 'যাত্রার' 'গীতিবাহুল্য' ও তথাকথিত নাট্য-ধর্মের অভাব যাত্রা-লেখকের অক্ষমতা-প্রসূত নয়, বাঙালি দর্শকসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও নাট্যাস্বাদন-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা সত্ত্বেও, যাত্রা যে বাঙালি স্বভাবের উপযোগী নাট্যগুণে ক্রমেই পরিণত হয়ে উঠ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ সুশীল দে লিখেছেন,—

যাত্রার সার্থক
নাট্য সম্ভাবনা

"The mimetic qualities of the yatra, its realistic tendencies, its wearing out of a consistent plot, its taste for a personal and lively dramatic story, its mingling of the comic and serious — all these traits more or less indicated that the amorphous yatra might have passed into an indigenous form of the regular drama."২

এবারে বাংলার নাট্য সাহিত্যের মৌল ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের সার সংকলন করা যেতে পারে।—(১) নাট্য-কলা যৌথ জাতীয় শিল্প;— তাই, নাট্যাঙ্গিকের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জাতির সাধারণ মৌল স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই কারণে ইংরেজি নাট্য-স্বভাবের সংগে ফরাসি, জার্মাণ অথবা সংস্কৃত নাটকের স্বভাব ও গঠনরীতির স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একই কারণে বাংলার নাট্যস্বভাব সংস্কৃত বা ইংরেজি নাটক থেকে স্বয়ং-স্বতন্ত্র।

বাঙালির
নাট্যস্বভাবের
ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

(২) বাঙালির নিজস্ব নাট্যস্বভাবের সংগে স্বয়ং-স্বতন্ত্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যও গড়ে উঠ্তে সুরু করেছিল প্রাচীন কাল থেকেই। জাতীয় রুচি, প্রয়োজন এবং ঐতিহ্যের সংগে সেই নাট্যকলার যোগ আমূল। যাত্রাকে

১। 19th Century Bengali lit.
২। ঐ।

আশ্রয় করে বাংলার সেই নাটকীয় সমৃদ্ধি অবাধগতিতে অগ্রসর হয়েছিল, এবং একটা পর্যায়ে হয়েছিল সম্পূর্ণতার মুখোমুখি।

(৩) কিন্তু, 'যাত্রার' মধ্যে বাঙালির নাট্য-স্বভাব পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ অর্জন করতে পারে নি। তাহলেও, বাংলার জাতীয় চেতনায় সেই নাটক-ঔৎসুক্য অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। ফলে, নাটকের বহিরাঙ্গিকে প্রাচ্য-প্রতীচ্য শিল্প-কলার বিমিশ্রতা যতই ঘটুক, অন্তরঙ্গে বাংলা নাটক যাত্রাধর্মী আবেগ-প্রাধান্য ও গীতিধর্মিতা, তথা বাঙালি নাট্যস্বভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ফলে, বাংলা ভাষার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকই একালের পরিভাষায় হয় অতি-নাটকীয়, নয় গীতি-নাট্টিক।

এবারে বাংলা নাটকের বহিরাঙ্গিকের স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে; কিন্তু এখানেও 'যাত্রা-সাহিত্য'-ইতিহাসের অনুবর্তন করতে হবে। পরমানন্দ সেনকে নিয়েই যাত্রা সাহিত্যের সুসমৃদ্ধ শেষ পর্যায়ের প্রথম সার্থক বিকাশ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্ধৃত তারিখ ঠিক হলে, পরমানন্দের আবির্ভাব কাল উনিশ শতকের প্রথম দশকের পরে। পরমানন্দ বীরভূমের লোক ছিলেন; —তাঁর রচিত 'কালীয় দমন' পালা বিখ্যাত ছিল। কৃষ্ণ-জীবনের নানা দিক নিয়ে আরো যাঁরা যাত্রা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন, সুদাম ও লোচন অধিকারী, কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ অধিকারী, কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী, পূর্ববঙ্গে ঢাকা-বিক্রমপুরের কালাচাঁদ পাল ইত্যাদি।

কালে কালে যাত্রা সাহিত্য আর নিছক ধর্মকাহিনীর মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকে নি। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, কলি রাজার যাত্রা ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রার plot উনিশ শতকের একেবারে প্রথম থেকেই মানব জীবনের নিবিড় সংস্পর্শে এসে পড়েছিল। এই বিবর্তনের পটভূমিটুকু লক্ষ্য করবার মত। কবিগানের বহুল প্রসারের পূর্বে থেকে নিকৃষ্ট ধরণের যাত্রার অস্তিত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বীকার করেছেন। আর, কবিগানের প্রতিষ্ঠাকালের সূচনা আমরা কল্পনা করেছি, মোটামুটি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। অতএব, অষ্টাদশ শতকের কোনো সময় থেকে যাত্রার স্পষ্ট প্রসার সুরু হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। আর, বাংলা দেশের বৃহত্তর জীবন-ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি,—অষ্টাদশ শতক বাংলার সমাজ জীবনে দ্বিধা বিভক্তির যুগ। একদিকে মধ্যযুগীয় গ্রামীন্ জীবন-মূল্য-বোধ ক্রমেই লুপ্ত হচ্ছে,—সংগে সংগে ভাঙ্ছে গ্রামীন্ সমাজ,—আর এক দিকে অর্থনৈতিক ঔৎসুক্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে ধনতান্ত্রিক নূতন নাগরিক গোষ্ঠী। এই বিচ্ছিন্নতাও বিলুপ্তির পদ্ধতি যখন চল্ছে, তখনো মুমূর্ষু গ্রাম-বাংলা শেষ কয়টি মহৎ সম্পদ দান করেছে বাংলার সাহিত্যকে;—বাউল, জারি, শারি গান প্রভৃতির সংগে স্পষ্ট-বিকশিত 'যাত্রা

গান'১ ও সেই নব-উদ্ভূত লোক-সাহিত্যের আর একটি ধারা। বাংলার লোক-রুচির অপকর্ষের সংগে এই যাত্রা-শিল্পেরও অপকর্ষ ঘটেছে।

প্রথমে কৃষ্ণ-কথাকে আশ্রয় করেই যাত্রা সাহিত্যের প্রথম প্রসার ঘটে 'কৃষ্ণ-যাত্রা' রূপে। অনুমান করতে পারি,—বাংলার ঊষর জীবন-ভূমিতে বৈষ্ণব সংগীতের প্রস্রবণ তখন শুকিয়ে আসছিল, বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্য জীবন্ত জীবনাশ্রয় হারিয়ে বাচন-সৌন্দর্য ও রূপ-বৈদগ্ধ্যকে করে চলেছিল আশ্রয়। এমন পরিবেশে ক্ষীণ প্রাণ পুরাতন ভক্তি-কথার সজীব নূতন রূপায়নের অবচেতন চেষ্টা থেকে যাত্রা গানের অঙ্কুরোদ্গম। ভাবের যে ধারা হৃদয়ের অন্তর্মূলে শুকিয়ে আসছিল, অভিনয়-সক্রিয়তার মধ্যে তা আবার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে হয়ে উঠ্‌ল প্রত্যক্ষ। তার পরে, অল্প দিনেই নূতন প্রয়োজন, তথা নূতন যুগাকাঙ্ক্ষার দোলা লাগ্‌ল যাত্রা-সাহিত্যের মূলে। এই গঠমানতার যুগে বাংলার নাগরিক জীবন বিশেষভাবে আর্থিক অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই বর্ধিত হয়েছিল। অথচ নবজাগরণশীল সেই সমাজের "চিত্তবিনোদনের" কোন পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল না। প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে 'আধুনিক' বাংলার আদিম নাগরিকজন তাদের রস-বাসনাকে চরিতার্থ করেছিল। একদিকে গ্রামীন্ সমাজ যেমন ভাঙ্‌ছে, তেমনি ক্রমশঃ সংহত হয়ে উঠ্‌ছিল নবীন নাগরিক সমাজ। এই উদীয়মান সমষ্টি-জীবনের সমবেত 'চিত্ত বিনোদনের' প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই একদিন যাত্রার ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এই প্রচেষ্টার সার্থকতাতেই যাত্রা-গানের চরম নাট্যোৎকর্ষের সংবাদ খুঁজে পাই।

যাত্রার বিবর্তন

রাজা নবকৃষ্ণের গৃহে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ করেছি আগে। একই প্রয়োজনের ধারাকে চরিতার্থ করতে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'কলিরাজার যাত্রা' "রচিত ও প্রকাশিত" হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা' ও 'নল দময়ন্তীর যাত্রা' অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত-বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন সমকালীন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা। একই পত্রিকায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভবানীপুরে 'নন্দবিদায়' যাত্রার সার্থক অভিনয়ের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, বাংলার নাগরিক সমাজ একদিন যেমন সার্থক যাত্রাভিনয়ের সহায়ক হয়েছিলেন, তেমনি আর একদিন বাংলা নাটকে যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিলোপের কারণও হয়েছিলেন তারাই।

এ-পর্যন্ত আলোচিত ইতিহাসের তথ্য থেকে দেখেছি, অষ্টাদশ শতকে ধনতান্ত্রিক স্থিতি-স্থাপকতাকে উপলক্ষ্য করে বাংলায় এক নূতন নাগরিক

১। শৈশবে পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য সমাজে 'যাত্রা গান' নামটিই লোকমুখে শুনেছি;—লোকে সেখানে 'যাত্রা' দেখ্‌তে যায় না, 'যাত্রা গান শুনতে যায়।' যাত্রা রসাস্বাদন সম্বন্ধে বাংলার নাট্য-চেতনার স্বরূপটি এখানে আভাসিত হয়েছে বলে মনে করি।

সমাজ গড়ে উঠ্‌ছিল। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই সে সমাজ নূতনতর জীবন-বোধের আকাঙ্ক্ষায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বাঙালির জীবনে সেই নব-প্রবোধন-কামনায় ভার-সাম্য স্থাপন করেছিল প্রতীচ্য শিক্ষার ধারা। আধুনিক নাটকের জন্ম-লগ্নেও সেই একই ঐতিহ্য সক্রিয় হয়ে আছে। ইংরেজদের প্রয়োজনে ইংরেজি নাটকাভিনয় ও নাট্যশালার পত্তন কলকাতায় পলাশি-পূর্ব যুগেই সুরু হয়েছিল। ক্রমে তার প্রসার ও পরিণতি হতে থাকে। ইংরেজদের সংগে সেকালের নাগরিক বাঙালির যে সম্পর্ক ছিল, তাতে ইংরেজি ধরণের নাট্যাভিনয়-প্রথা এ-দেশীয়দের কৌতূহলী করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলাদেশে প্রথম মঞ্চাশ্রিত নাটকাভিনয় কিন্তু এই কৌতূহলেরও ফল নয়। গেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশ-নাগরিক ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যাভিনয়' 'মঞ্চ'-স্থ করেন। গোলোকনাথ দাস নামক একজন বাঙালিকে দিয়ে 'Disguise' নামে একখানি ইংরেজি নাটকের বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বাঙালি কুশীলবদের দিয়ে তিনি অভিনয় করান। এই অভিনয় জনপ্রিয়ও হয়েছিল আশাতিরিক্ত পরিমাণে,—প্রেক্ষাগৃহ হয়েছিল দর্শকে পরিপূর্ণ।

বাংলা নাটকের নব-রূপের ঐতিহাসিক উৎস

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার লেবেডেফ নাটকাভিনয় করিয়েছিলেন।

তবু, বাংলা দেশে বাঙালি প্রবর্তিত নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় আরো বিলম্ব ঘটেছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষণে স্থাপিত হিন্দু থিয়েটার বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। তাও, ইংরেজি নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্যে এই থিয়েটার-এর জন্ম।

অতএব দেখছি, বিদেশী লেবেডেফের প্রয়োজিত নাট্যাভিনয় বাঙালির 'চিত্ত বিনোদনে' সফল হলেও তার চিত্ত উদ্বোধনে সক্ষম হয়নি। তার জন্য প্রয়োজন ছিল ইংরেজি শিক্ষার সঞ্জীবন-স্পর্শের। আর, সে কর্তব্য অন্যান্য আরো বহু ঐতিহাসিক দায়িত্বের সংগে উদ্‌যাপন করেছিল সেদিনকার হিন্দু কলেজ। আধুনিক মঞ্চাশ্রিত নাট্যশিল্পের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির প্রথম ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল হিন্দু কলেজের সেক্‌স্‌পীয়র-পাঠন। ডি, এল, রিচার্ডসন ছিলেন সেক্‌স্‌পীয়র-সাহিত্যের নিবিষ্ট পণ্ডিত,—তাঁর কণ্ঠও ছিল উদাত্ত। হিন্দু কলেজের নবীন পড়ুয়াদের অন্তরে রিচার্ডসনের পঠন-পাঠনে সেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্য-রস আমূল প্রোথিত হয়েছিল। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের কাব্যোৎকর্ষ দেশকালাতীত, কিন্তু তাঁর নাট্য-কলার একান্ত আশ্রয় ছিল সমসাময়িক ইংলণ্ডের

প্রতীচ্য নাট্য-রসানুভূতি

১। দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

রঙ্গমঞ্চের গঠন বৈশিষ্ট্য। সেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যকলা-লোকেও রিচার্ডসনের হাতে বাঙালি তরুণদের প্রথম প্রবেশ ঘটেছিল। তড়িৎগতিতে সেই রসবোধ বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল; ইংরেজি আঙ্গিক সমৃদ্ধ নাট্যকলার প্রতি শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই তখন শ্রদ্ধা ও আগ্রহ উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের নানারকম রঙ্গ-শালায় কলকাতা সহরে তখন নিয়মিত অভিনয় চলেছে বিচিত্র ধরণের ইংরেজি নাটকের। বাঙালির উৎসাহ তাতে আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

সেই বিশ্ব-চমৎকারী নাট্যকলার পাশে লৌকিক স্বভাব-শিল্পীর রচনা যাত্রা-র স্থূল কলা-কর্মের স্থান কোথায়! অতএব, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির রসবোধ যতই পরিণত হয়েছে, নাগরিক বাংলার সমাজ-জীবনে যাত্রার আবেদন ততই হয়েছে বিলুপ্ত। গ্রামীন বাংলা তখন মুমূর্ষু—অথবা মৃত। সেই মৃত্যু-সমাকীর্ণ জীবন-পরিবেশে যাত্রা-শিল্প ভাঁড়ামি, রুচিদৌর্বল্য ও কৃত্রিম গীতি-সর্বস্বতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। নগর বাংলার জীবনে যাত্রার মৃত্যু-তোরণ দিয়ে নূতন মঞ্চাশ্রয়ী নাট্যকলার প্রথম আবির্ভাব।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার চন্দ্রিকার' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হয়েছিল,—"এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্ত বিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাঁহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত কাব্য, সংগীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত শেয়ার গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতন-ভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।"১

'যাত্রা'র প্রশংসা সত্ত্বেও 'ইংরেজদের মত' নাট্যমঞ্চ গঠনের আগ্রহটুকু এখানে লক্ষ্য করবার মত। যাত্রার পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের অভাবজনিত আক্ষেপটুকুও তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজি কলা-সম্মত নাটকের প্রতি ঝোঁক যতই বেড়েছে, যাত্রার অপূর্ণতার প্রতি বিরাগ হয়েছে ততই প্রবল। ফলে যাত্রাকে সম্পূর্ণ পরিহার এবং ইংরেজি নাট্যকলাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করার আগ্রহ

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।

ক্রমশ হয়েছে ব্যাপক। এই আকাঙ্ক্ষার আতিশয্যতার ফলে বাঙালি সেদিন ইংরেজি নাটক অথবা সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ অভিনয় করেছে, তবু যাত্রাকে স্বীকার করেনি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবিধার্থ সংগ্রহের পাতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাত্রা প্রশস্তি লিখেছিলেন, দেখেছি। কিন্তু সেই একই ব্যক্তি প্রায় একই সময় বা কিছু আগে (১৭৮০ শক) বিবিধার্থ সংগ্রহে নূতন নাট্যমঞ্চে "প্রকৃত নাটকের অভিনয়" প্রসঙ্গে যাত্রার প্রচুর নিন্দা করেছেন।১ ফলকথা, একদিকে দেশীয় নাট্যকলা 'যাত্রা'র অপূর্ণতা ও আপেক্ষিক অপকর্ষ, অন্যদিকে সেক্‌স্‌পীরীয় সাহিত্যের বিশ্ব-বিজয়ী দীপ্তি ও ইংরেজি নাট্যকলার সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণতা সেদিনকার নাগরিক চিত্তকে যাত্রাবিমুখ ও ইংরেজি ধরণের মঞ্চাশ্রয়ী নাটকের আকাঙ্ক্ষায় অধীর করেছিল। এই সূত্রেই রামনারায়ণ তর্করত্নের হাতে নূতন ধরণের নাট্য-সম্ভাবনার সূচনা। রামনারায়ণ উদীয়মান বাঙালি সমাজের প্রতীচ্যাভিমুখী নাট্যাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে পারেন নি, কিন্তু, যাত্রা-উত্তর নূতন নাট্যকলার সন্ধান দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ 'রত্নাবলী যাত্রা নয়', ভূমিকার এই প্রতিশ্রুতিতেই রামনারায়ণের নাট্যকলার প্রথম প্রতিষ্ঠা। অতীতের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে নূতন সম্ভাবনার সম্মুখে এখানেই সূচিত হয়েছে আধুনিক বাংলা নাটকের প্রস্তুতি-পর্ব। পরবর্তী ইতিহাসের ধাপে ধাপে লক্ষ্য করব, যাত্রা-স্বভাবের প্রবল অস্বীকৃতির মধ্যে যার সূচনা, অন্তরে অন্তরে আবার সেই জাতীয় ধর্মের আভ্যন্তরীণ স্বীকৃতিতেই বাংলা নাটকের যথার্থ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে আরো একধাপ পরের কথা।

ইংরেজি কলা-সম্মত বাঙালি জীবনধর্মী নাট্যকলা

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।

প্রস্তুতি পর্বের বাংলা নাটক

পূর্বের অধ্যায়ে বাঙালির প্রাথমিক নাট্য প্রয়াসের যে পরিচয় পেয়েছি, কোন কালেই তা পূর্ণতা লাভ করেনি। তাছাড়া, ইতিহাসের অনুসরণ করে দেখেছি, 'যাত্রা' পর্যন্ত যুগের নাট্যরচনায় বাঙালির সমষ্টি-জীবনের একটি অবচেতন আকৃতি, বা অর্ধ সচেতন প্রচেষ্টাই একান্ত হয়েছিল। মধ্য যুগের চৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালি জীবন ছিল ভাবাদর্শ-পুষ্ট, নির্বিশেষ আবেগ-উচ্ছ্বসিত। কিন্তু, জাতীয় মানসের সচেতনতা এবং উদ্দীপনাময় কর্মতৎপরতা ছাড়া সার্থক নাটক সৃষ্টি সম্ভব নয়;—আগেই বলেছি ঘনতম-নিবন্ধ জাতীয় প্রেরণার কর্ম-প্রকাশই সার্থক নাট্যকলার উৎস। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'যাত্রা'-উত্তর নাট্য-সাহিত্যে বাঙালির জাতীয়তা প্রথম সর্বাবয়ব সুচিহ্নিত হয়েছে, হয়েছে একক অভীষ্ট-মুখী, উৎ-কেন্দ্রিক। বাংলা সাহিত্যে মঞ্চাভিনয় উপলক্ষ্যে রচিত প্রাথমিক নাটক-গুলি এই 'জাতীয়তা'র স্বভাবকে যে-পরিমাণে আয়ত্ত করেছে, সেই পরি-মাণেই তাঁরা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ;—আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রস্তুতিকার।

নাটকে আধুনিকতার প্রস্তুতি

কেবল এই কারণেই আলোচ্য পর্বের নাট্য সাহিত্যকে নিছক ইংরেজি নাট্যকলার অনুকৃতি মাত্র বলে মনে করা অন্যায় হবে। সেদিনকার বাংলা-নাটকের জন্ম-মূল বস্তুতঃ অখণ্ড বাঙালি নাগরিক জীবনের গঠমানতার সংগে একান্ত সম্পৃক্ত। বাংলা নাটকের দেহাবয়বে ইংরেজি প্রভাব যেটুকু আছে, তা সেদিনকার অখণ্ড বাঙালি জীবন থেকেই সংগৃহীত। আর, উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে ইংরেজি প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তার জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্য অভিমানের মধ্যে।

ইংরেজি প্রভাবিত বাংলা নাটকের

সন্দেহ নেই, মধ্যযুগের গ্রামীন বাংলার সমাজ সংগঠনের মধ্য দিয়ে আপামর বাঙালি সাধারণ আদর্শ জীবন-ধর্মের সম্পদকে আহরণ করেছিল; সেকালের সাহিত্যেও সে পুষ্টির প্রকাশ ছিল ভাস্বর। কিন্তু, সমষ্টিগত আদর্শবোধ যতই প্রবল হোক্, সমবেত কর্মপ্রয়াস যতই হোক্ সুশৃংখল, তবু মধ্যযুগের বাঙালিকে আধুনিক অর্থে একটি পূর্ণাংগ 'জাতি' বলে চিহ্নিত করা চলে না। সেদিন ছিল কেবল একটি সুগঠিত বাঙালি সমাজ। 'জাতি' বোধ-এর পেছনে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নতার কথা পরিকল্পিত হয়ে থাকে, 'জাতি'-ধর্মের এটি

বহিরঙ্গ লক্ষণ। অধিকার এবং দায়িত্ববোধের অন্তরঙ্গ সচেতনতা ও সুস্পষ্টতা না থাকলে এই 'জাতি'ত্বের সংহতি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে গোষ্ঠি-বন্ধন ছিল, ছিল তার উপযোগী আদর্শ ও অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো। কিন্তু, সমষ্টিগত জীবনের বৃহৎ-প্রচ্ছদরূপে সেই অর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপরে সেকালের সামাজিকের কোন অবহিত অধিকার অথবা সক্রিয়তার চিহ্ন ছিল না। অথচ, য়ুরোপের রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক জীবন-ধর্মের পক্ষে 'জাতি'ত্বের চেতনা ছিল সহজাত। Aristotle-এর 'Poetics'-এর মত 'Politics'-এর সুগঠিত পরিণতিও য়ুরোপের 'জাতি'ত্বময় স্বভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ-ধারা Plato কিংবা তাঁরও পূর্বকাল থেকে য়ুরোপের মজ্জাগত। আমাদের ধারণা, য়ুরোপীয় নাটকের বিশেষ আঙ্গিক গঠনের মূলেও এই রাষ্ট্রপ্রধান জীবন ধারা, তথা 'জাতি'-ত্বময় চৈতন্যের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। আগে বলেছি, জাতীয় স্বভাবের পরিস্ফীতির মধ্যেই প্রতীচ্য নাটক সার্থকতম অভিব্যক্তি পেয়েছে।

স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য

আমাদের দেশে এই স্বজাতি-প্রীতি এবং স্বাজাত্যাভিমান প্রথম স্ফুট-বাক্ হয়েছে রামমোহনের মধ্যে। রামমোহন আধুনিক বাংলা, তথা আধুনিক ভারতের স্বাধিকার সচেতন দায়িত্বশীল প্রথম নাগরিক। জাতীয় জীবনের-সীমায় রামমোহনের স্বাভিমানী নাগরিক মানসের প্রথম বৈপ্লবিক প্রকাশ ফ্রেডারিক্ হ্যামিল্টনের দুরাচরণ-এর বিরুদ্ধে লর্ড মিনটোর কাছে প্রেরিত আবেদনে (১২ই এপ্রিল ১৮০৯ খৃীঃ)। তাঁর আন্ত-র্জাতিক নাগরিকতা-বোধও কত সুপরিণত ছিল, সে প্রমাণ আছে,—১৮৩২ খৃীষ্টাব্দে ফ্রান্স যাওয়ার ছাড়পত্র চেয়ে সে দেশের বৈদেশিক মন্ত্রীকে লেখা আবেদনে। তাছাড়া, রামমোহনের সুপরিবদ্ধ স্বাধীন নাগরিক চেতনার তীব্রপ্রকাশ জে, এস্ বাকিংহামকে লেখা (১১ই আগষ্ট ১৮২১ খৃীষ্টাব্দ) পত্রে ঃ—

নবজাগ্রত বাঙালির স্বভাব-সচেনতা

"Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful."১

এদিক থেকে, রামমোহন একটি আধুনিক নাগরিক মাত্র নন; স্বাধীনতা কামনা, স্বাভিমান, মানবপ্রেমের অপার প্রসার নিয়ে তিনি বাংলার প্রথম আত্ম-সচেতন জাতি। রামমোহনের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও মনীষার মধ্যে বাঙালির অনাগত যুগজীবনটি যেন নিজেকে আগে থেকেই একবার অনাবৃত করে দেখেছিল। রামমোহনোত্তর কাল থেকে,—বিশেষ করে হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষিত ছাত্রদলের সামাজিক প্রতিষ্ঠার যুগ

১। এ-সব প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হবে।

থেকে এই নাগরিক সচেতনতা,—এই সুচিহ্নিত 'জাতি'-বোধ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির অন্তর্লোকে প্রসারিত হতে আরম্ভ করেছে! হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষা রিচার্ডসন-ডিরোজিও'র মধ্য দিয়ে এই জাতিত্ব-চৈতন্য রচনায় উদ্বোধকের কাজ করেছিল। মনে রাখতে হবে, সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির প্রিয় পাঠ্য মাত্রই ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জীবন-বাণীতে ছিল প্রাণ-সঞ্জীবিত। সেদিনকার ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই তাঁদের স্বাজাত্য-বোধের প্রেরণাদর্শ আহরণ করে-ছিলেন এখান থেকেই। এই আদর্শ-বুদ্ধি, তথা, স্বজাতি সম্বন্ধে অভিমান ও দায়িত্ববোধ যত ঘনসন্নিবদ্ধ হয়েছে, ততই জাতীয় উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি জাতির ভাব-চিন্তা-কর্ম হয়েছে দৃঢ়-কেন্দ্রিক। শিক্ষামূলক সংস্কার প্রচেষ্টা, সংবাদপত্র পরিচালন, সামাজিক বিপ্লব-সাধন সব কিছুর মধ্য দিয়েই বাঙালি জীবন নিজের নির্দিষ্ট সীমায় ক্রমেই পরিস্ফীত হয়ে উঠ্ছিল। বাঙালির নবজাগ্রত নাট্য-পিপাসা সেই দৃঢ়-সংবদ্ধ পরিস্ফীতির ফল।

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সমাচার চন্দ্রিকার সম্পদকীয় উক্তিটি আবার স্মরণ করি। সন্দেহ নেই প্রবন্ধকার "ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান"-এর জন্যই অভাববোধ করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর আকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল "নগরবাসীদিগের" "চিত্ত বিনোদনের" জাতিত্ব-সচেতন ইচ্ছা। সেদিন-কার নাগরিক বাঙালির জাতীয় প্রয়াস "উপকার ও উৎকর্ষ" মূলক "নানা-বিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা" সম্ভব করেছিল;—সেই জাতি-হিতৈষণা-বৃত্তির ব্যাপ্তিতেই আলোচ্য জাতীয় বিনোদন-প্রচেষ্টার আকাঙ্ক্ষা। য়ুরোপীয়দের যা কিছু ভাল আছে,—আমাদেরও তাই চাই, —এমন কি রঙ্গালয় পর্যন্ত,—এই অনুভব জাতীয় মমত্ব-বোধেরই পরি-চায়ক। একই কারণে, ইংরেজি নাট্যকলা উৎকৃষ্ট বলে স্বজাতির জন্য চাই অনুরূপ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। এখানে লক্ষ্য করা উচিত,—বাঙালি পরিচালিত প্রথম যে নাট্যালয়ে সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক ও 'উত্তর-রামচরিতে'র ইংরেজ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ অভিনীত হয়েছিল,—সে ছিল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১ খ্রীঃ)। বাঙালির চেষ্টায় গড়া প্রথম নাট্যশালার অনুরূপ নামকরণের পেছনে কোনো সচেতন উদ্দেশ্য ছিল, এমন দাবি করা চলে না। কিন্তু, সমগ্র জাতির অবচেতনায় 'হিন্দু-জাতিত্ব-বোধ',—তথা এক বিশেষ জাতি-চেতনা, তখন থেকেই অব্যক্ত সঞ্চারিত হয়েছিল। এরই সচেতন পরিণাম মধুসূদনের সাহিত্যে। বাংলা নাটক রচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন একাধিক পত্রে "Our National Theatre" গড়ে তোলার

এবং নাট্য-সৃষ্টির প্রাণ-প্রেরণা

আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। সেই অদম্য স্পষ্ট প্রেরণার প্রথম প্রচ্ছন্ন সঞ্চরণ বাংলা জাতীয় নাট্যশালা গঠনের উৎস। প্রধানতঃ এই কারণেই 'হিন্দু থিয়েটার'এ কলা-রীতিশুদ্ধ নাট্যবিষয়ের ইংরেজি অবতারণা যথেষ্ট জন-প্রীতি-অর্জন করতে পারেনি। অথচ, 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের নাটকীয় উপস্থাপন জনচিত্তকে আকুল করে তুলেছিল শ্যামবাজার নবীন বসুর বাড়িতে (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

ফল কথা, সেকালের নগর-বাংলায় যৌথ জীবনের প্রতি ধীরে ধীরে প্রবল মমতাবোধের সঞ্চার হয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়ে সম্মিলিতভাবে যৌথ চিত্ত-বিনোদনের অবকাশ কামনায় শিক্ষিতজনের মন, তাই, উৎসাহিত হয়েছিল। বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা এই আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার ফল। একই ধরণের রস-বাসনার প্রভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দেখা দিয়েছিল পৃথক্ নাট্যসমিতির উদ্ভব। কিন্তু, এ-সব কিছুর মধ্য দিয়ে জাতির জাগ্রত নাট্য-রস-পিপাসা শান্ত হয় নি;—কারণ, সকল প্রতিষ্ঠানেই বিশেষভাবে ইংরেজি ভাষায় লেখা বা অনুবাদ করে নেওয়া নাটকের অভিনয় হত। এই কারণেই, নবীন বসুর বাড়িতে প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয় 'বিদ্যাসুন্দর' মঞ্চস্থ করার ফলে বাংলা দেশে উৎসাহ ও উত্তেজনার সীমা ছিল না। কিন্তু, সে আলোড়নও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। কারণ, বাঙালির সদ্য-উদ্ভূত নাট্য-উদ্দীপনার ইতিহাসে এ-ও ছিল এক কৃত্রিম পর্যায়।

ইতিহাসের সিদ্ধান্ত

চেনামূলে অঙ্কুরিত হয়েছে, সার্থক নাট্য রচনার উপাদানও সঞ্চিত মনের অতলে, কিন্তু জাতির যৌথ-চেতনা সেই যথার্থ উপাদানটিকে খুঁজে ফিরছে তখনো নানা পথে। একদিকে রয়েছে মূল বিখ্যাত ইংরেজি নাটকের অভিনয়, আর একদিকে সংস্কৃত নাট্যকলার পূর্ব-ঐতিহ্য অনুসরণ করে সংস্কৃত ভাষার নাট্যানুবাদ;—আর একদিকে আছে দেশি-বিদেশী কাহিনী (plot) আশ্রয় করে ইংরেজি আঙ্গিক-যুক্ত মৌলিক নাটক রচনার চেষ্টা। মোট-কথা বাংলা নাটকে এটি পথ খোঁজার পর্যায়।

"ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যনুবাদ লইয়াই বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে কাদিহাটী নিবাসী বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকই এই শ্রেণীর প্রথম রচনা (রচনাকাল ১২৪৬, প্রকাশ ১৮৭১)।"১ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'কে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নাটক বলে মনে করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।২ কিন্তু, 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'

প্রথম বাংলা নাটক

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২য় সং—ডাঃ সুকুমার সেন।
২। দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

আসলে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হলেও নাট্যাকারে লিখিত নয়।[১] 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'-এর নাট্যরূপেও উল্লেখ্য বিশিষ্টতা কিছু নেই, এটিও মূলের দুর্বল অনুবাদ মাত্র। আলোচ্য পর্যায়ের যে সংস্কৃত নাট্যানুবাদের কলা-কর্ম উল্লেখ্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাঁর লেখক ছিলেন নন্দকুমার রায়; —১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এর অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'আশুতোষ দেব ওরফে সাতুবাবুর বাড়িতে তাঁর দৌহিত্ররা নাটকটির অভিনয় করান। সে অভিনয় তৎকালের নগর-বাংলায় প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। নাটকটি অভিনীত-ও হয়েছিল একাধিক বার।

তা হলেও, আলোচ্য সময়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা অভিনয় প্রসার লাভ করতে পারে নি। আগে দেখেছি, নব প্রকরণে বাংলা নাটক লেখার উৎসাহ এসেছিল প্রধানতঃ ইংরেজি নাট্যকলা, তথা সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক আস্বাদনের ফলে। তাই, বাংলা নাটকের এই অনুকৃতি-প্রধান পর্যায়ে সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি রীতির বাংলা নাটক সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে প্রাধান্য পেয়েছিল।

এই ধারার নাটক লেখকদের মধ্যে আছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার আর হরচন্দ্র ঘোষ। প্রথম দুজনের প্রত্যেকে একখানা করে নাটক লিখেছেন যার কাহিনী দেশীয় ঐতিহ্য থেকে সংকলিত, অথচ দুটি রচনারই নাট্য শরীরে ছড়িয়ে আছে ইংরেজি কলাশৈলীর প্রভাব। হরচন্দ্র ঘোষ চারখানি নাটক লিখেছিলেন,—প্রথমখানি সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অবলম্বনে।

যোগেন্দ্র গুপ্ত আর তারাচরণ শিক্‌দারের নাটক প্রকাশিত হয় একই বছরে,—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। যোগেন্দ্র গুপ্তের রচনা 'কীর্তিবিলাস'-এর প্রকাশকাল বোধ হয় কিছু আগে। কিন্তু, সবচেয়ে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়, —'কীর্তিবিলাস' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম 'ট্রাজেডি'। এ দেশে সংস্কৃত নাট্যকারেরা পূর্বাবধি অশুভ-শেষ নাট্য-রচনার বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রসঙ্গ-বিচার নিরর্থক। অনুসন্ধিৎসু পাঠক কেবল লক্ষ্য করবেন, প্রাচ্য নাট্যকলার এই আলংকারিক ঐতিহ্য এ দেশের জীবন-মূল্যবোধের একান্ত প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। যোগেন্দ্র গুপ্ত তাঁর বই-এর যে ভূমিকা লিখেছেন, তার থেকে মনে হয়, ট্রাজেডি রচনার মূলগত প্রতীচ্য জীবনবোধের যুক্তি-সূত্র (logic) তিনি আয়ত্ত করেছিলেন ঃ—

যোগেন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস

"......অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে, অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে

১। দ্রষ্টব্য—বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২য় সং।

কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যন্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্‌স্‌পীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

আমার অন্তকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক-প্রয়াসী।

* * *

"আরিষ্টল নামা গ্রীস দেশীয় সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যদি কখন উক্ত দেশস্থ নাট্যশালে অভিনয়কালে দুই বা অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত, যে কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট তখন করুণাভিনয় কারকেরাই জয়-পতাকা পাইত। আশঙ্কা এবং অনুকম্পা সাধারণ জনগণের মনোমধ্যে অশেষ মায়া উপস্থিত করিয়া অন্যান্য অভিনয়ের ক্ষণিক হর্ষ এবং উল্লাস নির্বাণ করিত। পতি লইয়া পতিব্রতা কামিনী পতিসহ আমোদ-প্রমোদে কাল যাপন করিতে লাগিল, শুনিলে হর্ষ জন্মে, কিন্তু পতি বিয়োগে পতিব্রতা কামিনী পতিসহ প্রাণত্যাগ করিল, শ্রবণে করুণা উপস্থিত হয়। হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকালস্থায়িনী।

"ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদ-গ্রস্ত হইতে হইবে না, এ মত নহে।

"অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, সুতরাং যে করুণাভিনয়ে অধর্ম বিরুদ্ধে পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সেই করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে।"

একেবারে শেষে, ট্রাজেডি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধ মনোভাবের একটি কারণ নাট্যকার খুঁজে বের করতে চেয়েছেন,—একালের কল্পনায় তা কৌতুককর ঃ—"দেশ বিদেশের মানবগণের মতের ভাব ভিন্ন হয়। শীতল দেশনিবাসিগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উষ্ণদেশীয় লোকেরা হাস্যরসে প্রবৃত্ত। বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্যরসাভিনয় অবলোকন করিতে সর্বদাই অভিলাষী।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, করুণেতর রসবিশিষ্ট নাট্যকলাকে লেখক অগভীর মনে করেন এবং সে-পক্ষে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমকালীন যাত্রা সাহিত্যের দুর্বল শিল্প-কর্ম। ফল কথা, বিদেশী নাট্যকলার মূলগত যুক্তিধারার একটি গ্রন্থলভ্য (Academic) জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু, দেশীয় শিল্পবোধের ঐতিহ্য, অথবা সংস্কৃত দেশীয় নাট্য সাহিত্যের বিচিত্র

সার্থকতার সংগে লেখকের কোন মর্ম-সংযোগ ছিল না। ফলে, দেশীয় জীবনধারা সম্বন্ধে ধারণা ও প্রতীচ্য নাট্যকলার পুথিগত বিদ্যা নিয়ে যোগেন্দ্র গুপ্ত যে নাটক লিখ্‌লেন, নিছক প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া সে আর কোনো দাম দাবি করতে পারে না।

'কীর্তিবিলাস' নাটকের কাহিনীতে দেশী আধারে বিদেশী রচনার ছাপ ফেল্‌বার চেষ্টা রয়েছে। 'রূপকথার' শীত-বসন্ত জাতীয় কাহিনী থেকে গল্পটি নেওয়া; রাজা চন্দ্রকান্তের প্রথম বিবাহের দুটি পুত্র,—কীর্তিবিলাস ও মুরারি। বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক রাজা আরো একটি বিয়ে করেন। বৃদ্ধের সেই তরুণী-ভার্যা, সুন্দরী তন্বী নলিনী কীর্তিবিলাসের নিকট প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ঘৃণার সংগে প্রত্যাখ্যাত হন। প্রতিশোধ নেবার জন্য বৃদ্ধ রাজার কাছে জঘন্য নালিশ করে তিনি কীর্তিবিলাসের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ আদায় করে নেন। কিন্তু, সেই দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালিত হবার আগেই শোকার্ত রাজা প্রাণত্যাগ করেন,—মরবার আগে তিনি কীর্তি-বিলাসের দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে যান। এদিকে কীর্তিবিলাসের প্রাণান্ত হয়েছে ভেবে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। কীর্তিবিলাস ফিরে এসে সেই শোকে নিজের জীবন নাশ করেন।

রূপকথার মূল গল্পটি 'শুভ-শেষ';—রাণীর কারসাজি এড়িয়ে রাজ-পুত্র-দুটি সে গল্পে তাদের রাজ্যাধিকার আবার ফিরে পেয়েছিল। যোগেন্দ্র গুপ্ত সেই কাহিনীকে করেছেন করুণান্ত। তা ছাড়া, যুবরাজ কীর্তি-বিলাসের মধ্যে হ্যাম্‌লেট্‌ চরিত্রের ছায়া আরোপ করার চেষ্টাও চোখে পড়ে। তাহলেও, নাট্যশেষের 'ট্রাজিক' পরিণতি ছাড়া রচনার বাকি অংশে সংস্কৃত নাট্যকলার ছাপই বেশি;—নাটকের সুরুও হয়েছে 'নান্দী' ও সূত্রধার-কথার মধ্য দিয়ে। ইংরেজি 'scene' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে যোগেন্দ্রচন্দ্র 'অভিনয়' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

সব কিছু মিলিয়ে কীর্তিবিলাস নাটকে লেখকের স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব বা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দুর্লক্ষ্য। প্রতীচ্য ট্রাজেডির রস তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বাঙালির নাট্য সাধনায় সেই রসসিদ্ধির পথ অবারিত করবার চেষ্টাই কেবল করেছেন তিনি,—এ-ছাড়া, গোটা নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতির সৌষ্ঠব রক্ষার প্রতি তাঁর সচেতনার কোনো ছাপ নেই। প্লট্‌-এর বিন্যাসে সংস্কৃত আঙ্গিকের অনুসরণ করা হয়েছে শৃঙ্খলাহীনভাবে। চরিত্র সংগঠন ইত্যাদিতেও সু-পরিকল্পনার কোনো চিহ্ন নেই। গদ্য পদ্যে বিমিশ্র ভাষা এবং সংলাপ কোথাও নাটকীয় সিদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। গদ্য সংলাপে কথ্য ভাষা দূরে থাক্‌, সাধুলিখ্য ভাষার কোথাও কথ্য ঢং-টুকুও ফোটে নি।

এ ধরণের ভাষা বিদ্যাসাগরের রচনার পরে বাংলা গদ্যে অচল হওয়া

উচিত ছিল,—নাট্য-সংলাপে ত বটেই। যোগেন্দ্র গুপ্তের পদ্য সংলাপ ঈশ্বর গুপ্তের ছাঁচে ঢালা।

ফলকথা, নাট্যশিল্প হিসেবে 'কীর্তিবিলাস' সম্পূর্ণ অসার্থক। তাহলেও যোগেন্দ্র গুপ্তের প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হয় না। ভারতবর্ষের নাটকীয় পূর্ব-সংস্কার অস্বীকার করে প্রথম 'ট্রাজেডি' লেখবার চেষ্টা করেছিলেন; কেবল এই কারণে যোগেন্দ্র গুপ্তকে এক বৈপ্লবিক রস-রূপের পথিকৃৎ বলে মনে করা যুক্তিসিদ্ধ হবে না। যে যুগে, যে সমাজে তিনি 'ট্রাজেডির' রস পরিবেশন করেছিলেন, ট্রাজিক শিল্পকলার সৌন্দর্য-মাধুর্যে সে যুগ ও সমাজ যোগেন্দ্র গুপ্তেরই মত ছিল বিমুগ্ধ-হৃদয়। রক্ষণশীলদের তরফে বিরোধিতার সম্ভাবনা কিছু হয়ত ছিল, তা সত্ত্বেও সেদিনকার পরিবেশে ট্রাজেডি রচনার প্রয়াস খুব দুঃসাহসিক ছিল, এমন কথা বলা চলে না। তবু এ-বিষয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্রের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। লক্ষ্য করে দেখ্‌ব,—অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সত্ত্বেও মধুসূদনের পূর্বে যোগেন্দ্র গুপ্ত ছাড়া আর কেউ ট্রাজেডি লিখ্‌বার চেষ্টা করেন নি। সার্থক প্রতিভা, তথা অতুলনীয় রসানুভূতির অভাব থাক্‌লেও বাংলা ভাষার নাটকে বিদেশী সাহিত্যের রস-সঞ্চয়ের প্রথম চেষ্টা করেছিলেন যোগেন্দ্র গুপ্ত—তাঁর এই অ-পূর্ব উদ্যম ইতিহাসের অবশ্য স্মরণীয়।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ইংরেজি আদর্শে রচিত সর্বপ্রথম 'শুভান্ত নাটক,—'Comedy'। অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের মহাভারতীয় কাহিনী নিয়ে ভদ্রার্জুনের প্লট রচিত হয়েছে। গল্পাংশ কাশীরাম দাস-এর কাব্য থেকে নেওয়া। সুভদ্রার 'পূর্বরাগ' অংশে সেকালের নাগরিক

ভদ্রার্জুন

রোমাণ্টিকতার স্পর্শ দুর্বল ভাবে অনুরঞ্জিত হয়েছে। তাতে নাট্য বিষয়ের খুব যে উৎকর্ষ ঘটেছে, এমন কথা বলা চলে না।

কিন্তু, প্রতীচ্য নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যোগেন্দ্র গুপ্তের চেয়ে তারাচরণ বেশি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ—

"......এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।"—তারাচরণের এই ইঙ্গিত স্পষ্টতঃ সেকালের অবিন্যস্ত যাত্রা শিল্পের বিরুদ্ধে। তাই লেখক বলেছেন,—"এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে,—। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা স্থানের নির্ণয় বিষয়ে য়ুরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য

রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্য-কারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় য়ুরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরেজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্তে 'সংযোগস্থল' ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে।—নাটক-নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় য়ুরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। য়ুরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে বেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবন্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"—কেবল সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক গত পার্থক্যই নয়, ইংরেজি নাটকে সে দেশের মঞ্চ-প্রভাবিত অবয়ব-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তারাচরণের অবধানতা এখানে লক্ষ্য করবারমত।

যোগেন্দ্র গুপ্তের তুলনায় তারাচরণের নাট্য-সার্থকতাও ছিল বেশি,—যদিও তা যথেষ্ট উল্লেখ্য নয়। বলরাম, ভীম, দুঃশাসন প্রভৃতি মোটা চরিত্রগুলো সরস রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে ভদ্রার্জুনের পাতায়;—কিন্তু অর্জুন-সুভদ্রা মোটেই সুগঠিত নয়। চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকারের দক্ষতা ছিল, এমন কথা বলা চলে না। তবে, সরসতার প্রতি সহজ সকৌতুক আকর্ষণের পরিচয় তিনি মোটামুটি ফুটিয়ে তুলেছেন। সংলাপ গদ্য-পদ্যে রচিত হলেও পদ্যাংশ বেশি, আর সে পদ্যে নাট্যধর্ম মোটেই ফুটে ওঠেনি।—অর্জুন-দর্শনমাত্রে প্রণয়াতুর-চিত্তা সুভদ্রার উক্তিঃ—

"বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়।
অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়॥
তোমারে কহিতে আমি লজ্জা নাহি করি।
কি হইল সখি আজি দেখ প্রাণে মরি॥
এখন তোমার কথা হইল স্মরণ।
মিথ্যা নহে কহেছিলে যতেক বচন॥
অর্জুনের বাণ হেরি ত্রিলোকের ভয়।
এবে জানিলাম, সত্য, মিথ্যাকথা নয়॥"

তারাচরণের গদ্য সাধু ভঙ্গিতে লেখা;—নাটকীয় সংলাপ হিসেবে স্থানে স্থানে জটিলও;—"যদ্যপি আপনারদিগের নিতান্তই অর্জুনকে

সুভদ্রা সমর্পণ করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে যখন দুর্যোধনের সহিত ভদ্রার বিবাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম তখন কহিলেন না কেন?" (বসুদেবের প্রতি বলরাম)

হরচন্দ্র ঘোষের প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি সেক্‌স্‌পীয়রের 'Merchant Of Venice' অবলম্বনে লেখা। হুবহু অনুবাদ সম্ভব নয় বলে, গ্রন্থটিতে সে চেষ্টা ত্যাগ করা হয়েছে একথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন ভূমিকায়। কিন্তু "যদ্যপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরেজি কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম গ্রহণ" করা হয়েছে,—একথাও বলা হয়েছে। অভিনয়-যোগ্য নাটক রচনার উদ্দেশ্য হরচন্দ্রের ছিল না;—"এতদ্দেশীয় বালক বৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলন্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শ ক্রমে" নাটকটি রচিত হয়েছিল, এবং তা-ও কেবল "এতদ্দেশীয় বালক বৃন্দের জ্ঞান-বৃদ্ধ্যর্থ"-ই। পাঠ্য পুস্তক হিসেবে গ্রন্থটির অনুমোদনের জন্য লেখক আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু তা সার্থক হয়নি; এছাড়া সাধারণ ভাবেও নাটকটি জন-সমাদর পায়নি।

হরচন্দ্র ঘোষের বিবিধ নাটক

দেশী বিষয়ে নাটক লিখ্‌লে তা জনপ্রিয় হতে পারে। এই ভেবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র 'কৌরব-বিয়োগ নাটক' লিখ্‌লেন এবং নিজের সমর্থনে গ্রন্থারম্ভে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় পৃথক্ ভূমিকা যুক্ত করলেন। এত সব সত্ত্বেও, নাটকটি উৎকৃষ্টতর পরিণতি লাভ করতে পারে নি। আসলে, নাট্যাঙ্গিক সম্বন্ধে হরচন্দ্রের স্পষ্ট ধারণারই ছিল অভাব; তাঁর গোটা রচনাটিই ছিল বিবরণ (Narration) মূলক। অনেকটাই যেন কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্প রচনার ভঙ্গী।

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখচিত্তহারা' (১৮৬৪ খ্রীঃ) সেক্‌স্‌পীয়রের রোমিও-জুলিয়েট্ অবলম্বনে লেখা। নাট্যারম্ভে সংস্কৃত নাটকের মত নান্দী ও প্রস্তাবনা রয়েছে। এই লেখকের সর্বশেষ নাটক লেখা হয়েছিল আরো দশ বছর পরে (১৮৭৪ খ্রীঃ),—নাটকটির নাম 'রজত গিরি নন্দিনী'। ততদিনে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়েছে (১৮৭২)। প্রতিষ্ঠাই লেখককে এই চতুর্থ নাটক রচনায় উৎসাহিত করেছিল। নাটকের ভূমিকায় এ কথার স্বীকৃতি আছে। "ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ" করা হয়েছে। "এতে হরচন্দ্রের উদ্যমের ব্যর্থতা এবারেও ছিল পূর্ববৎ।

এ পর্যন্ত নাট্য রচনার প্রয়াসের মধ্যে একটি অস্থিত-চিত্ততা এবং নানা-মুখীনতাই লক্ষ্য করেছি। জাতির অন্তগূঢ় প্রেরণা স্ফুট-বাক্ হয়ে

ওঠার আগেকার বেদনাবোধই তাতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে হরচন্দ্র ঘোষের পৌনঃ-পৌনিক চেষ্টা ও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা এই সৃজন-পূর্ব কালের আর্তিকে ঐতিহাসিক স্পষ্টতা দান করেছে। বাংলার সেই আর্তিমুক্তি ঘট্‌ল রামনারায়ণ তর্করত্নের হাতে,—'কুলীন কুল সর্বস্ব' (১৮৫৪ খৃীঃ) নাটকে। রামনারায়ণের নাট্য-সার্থকতার উৎস তাঁর কলানৈপুণ্যে নয়! নাট্য-বিষয়ের প্রতি সমগ্র জাতির উৎকণ্ঠিত যৌথ কৌতূহল। নাট্যকারের জনপ্রিয়তাকে উচ্ছ্বসিত করেছিল। আর এই বিষয় কল্পনাও রামনারায়ণের মৌলিক চিন্তার ফল নয়। বস্তুতঃ, জাতীয় জীবনের মূল-ভূমি থেকেই হয়েছিল এর উদ্ভব। ১৮৫৩ খৃীষ্টাব্দের শেষভাগে রংপুর-কুণ্ডী পরগণার জমিদার নানা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ৫০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। জানিয়েছিলেন,—'কুলীন কুল সর্বস্ব' নামক নাটক রচনা করে যিনি "রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পাইবেন" পুরস্কারটি তাঁরই প্রাপ্য। এর আগে 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩ খৃীঃ) বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখে রামনারায়ণ একই জমিদারের ঘোষিত ৫০৲ পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবারেও তিনি বিঘোষিত বিষয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হলেন।

নাট্যকে রামনারায়ণ

এদিক্‌ থেকে নাটক রচনায় রামনারায়ণের আত্ম-নিয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না; এমন কি তাঁর প্রথম নাটকের বিষয় ও নাম পর্যন্ত পর-নির্দেশিত। অবশ্য এতে নাট্যকারের শিল্পায়নের কোনো দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। বরং, পর-নির্দেশিত বিষয়ের সংগে একাত্ম হয়ে তিনি সর্বজনের উপভোগ্য, সার্থক অভিনেয় নাটক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এখানেই তাঁর দক্ষতা।—নাট্যশিল্পী রামনারায়ণ বাঙালির নবোদিত যৌথ জীবনের অংশীদার রূপেই সিদ্ধকাম হয়েছেন। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি চেতনার আমূলে জড়িয়েছিল মধ্যযুগীয় সামাজিক গ্লানি বারণের যৌথ চেষ্টা। সতীদাহ ততদিনে নিবারিত হয়েছে; বিধবাবিবাহের আন্দোলনে সারা বাংলার নবীন-প্রবীণ সমাজ উন্মথিত হয়ে চলেছিল? নারীত্বের প্রতি বর্বরোচিত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত বাঙালি মনুষ্যত্ব জীবনের দিকে দিকে রচনা করছিল বিদ্রোহ-অভিযান। কৌলীন্যপ্রথার অমানুষিকতা ও অসংগতি ছিল সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতারই একটি। বস্তুতঃ, সেকালের বাংলার সমাজ-বিপ্লবের মুখে অন্যতম 'অচলায়তন' ছিল এই কৌলীন্য-গ্লানি। আরো লক্ষ্য করবার কথা, এই পাপস্তম্ভের বিরুদ্ধে প্রথম নাট্যকারের লেখনীর আঘাত উৎক্ষিপ্ত হয়েছে যাঁর চেষ্টায়, তিনি নাগরিক বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু শিক্ষিত এবং "বিদ্যোৎসাহী" বাঙালি

কুলীন-কুল-সর্বস্বের পূর্ব-ইতিহাস

ছিলেন। কৌলীন্য প্রথার প্রতিবাদীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু, বাংলার নগরসীমা ছাড়িয়ে সেই বৈপ্লবিক বিক্ষোভ মফঃস্বল বাংলার শিক্ষিত সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আপামর বাঙালির সেই যৌথ জীবন-বেদনা রামনারায়ণের লেখনীকে উদ্যত করেছিল; রামনারায়ণের নাট্য-সার্থকতা এই যৌথ জীবনের বাণীকার হিসেবেই।

বস্তুতঃ, 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের 'বিজ্ঞাপন'-এও লেখক একই কথা বলেছেন ঃ—"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্যাদা মধ্যে স্বকপোল কল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্থ হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম, তন্নিমিত্ত "পতি ব্রতোপাখ্যানে" প্রসঙ্গ-ক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে;......"—'কুলীনকুল সর্বস্বের' ফরমায়েসী বিষয়ে জনমনোমুগ্ধকর নাট্যরচনা যে রামনারায়ণ করতে পেরেছিলেন, তার কারণ নাট্য-বিষয়ের সংগে তাঁর শিল্পি-মনের এই একাত্মতা।

কুলীনকুল-সর্বস্বের জীবন-সংযোগ

মূল বিষয়ের উপস্থাপনায় নাটকটি সংস্কৃত আঙ্গিকের অনুসরণ করেছে; তাহলেও লেখকের দৃষ্টি প্রথমাবধি ছিল বিষয়-নিষ্ঠ। নান্দী অংশে শক্তি-বন্দনা-য় রামনারায়ণ বলেছেন,—

"কুলময়ী কুলারাধ্যা কুল ভক্তজন বাধ্যা
জগদাদ্যা কুল কুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল সমূলে করি নির্মূল
সত্য কুল-বৃদ্ধি বিধায়িনী ॥"

গোটা নাটকটিতে অনুসৃত ভাষা-ভঙ্গির শৈথিল্য ও দুর্বলতা এখানে স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি। তাছাড়া, ইংরেজি নাট্য-মান অনুসারে বিচার করলে বিভিন্ন অঙ্ক-বিন্যাসেও 'প্লট্'-এর শিথিল-বন্ধতা ও ঘটনা (Action) অপেক্ষা বর্ণনার (Narration) প্রাধান্য চোখে পড়বে। এদিক থেকেও নাটকটি সংস্কৃত কলা-রীতির অনুযায়ী। মূল প্লটের সূত্রে গাঁথা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে বিভিন্ন অঙ্কে বিন্যস্ত করা হয়েছে; এবং সব কয়টি গল্পের সমবেত আবেদন দিয়ে নাটকের রসপরিণতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন এই সব কাহিনীর ভাব-পরিচয় লেখক নিজে বিবৃত করেছেন,—"এই নাটক ছয়ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্র-বিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি-পঞ্চাননের বিয়োগ

নাট্য-বৈশিষ্ট্য

পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ।"১ বিবরণমূলক রচনা-ভঙ্গির জন্য বিচ্ছিন্ন কাহিনী কটির মধ্যে যথা-পরিমাণ নাটকীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারেনি।

সংলাপের মধ্যেও দুর্বলতা আছে যথেষ্ট। কুলীন কুলসর্বস্বের সংলাপের ভাষা বৈচিত্র্যময়; কোথাও পদ্য, কোথাও বা গদ্য। কুলপালক-পত্নী মেয়েদের বিবাহ সংবাদ শুনে বলছেন,—

"আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে।
শরীর যুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে॥
চিরকাল যত সাধ ছিল মোর মনে।
সে সাধ পুরাব আজ জামাতার সনে॥"

গদ্য সংলাপের ভাষার দুর্বলতা আরো বেশি। কথ্য ভঙ্গির সংগে রাম-নারায়ণের যথেষ্ট পরিচয় ছিল না। তাই, সংলাপের অনেক জায়গায় সাধু ও কথ্য রীতির গদ্য জড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া, সাধারণভাবে সংস্কৃত নাটকের ভাষা-বিন্যাসের আদর্শও যেন রামনারায়ণকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। পুরুষ এবং উচ্চশ্রেণীর লোকদের মুখে তিনি সাধুভাষা প্রয়োগ করেছেন; নারী এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষের মুখে বরাদ্দ করেছেন কথ্য ভাষা। এ-যেন অনেকটা সংস্কৃত নাটকের সংলাপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য। সাধুভাষার মার্জিত রূপের অতি-মার্জনের ফলে অদ্ভুত অনাটকীয় এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

"কুলপালক। (ঊর্ধ্ববিলোকন করিয়া)—একি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, সহস্র-কিরণ সূর্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণ অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ-শান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লব-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা ভজনা করিতেছে।"

কিন্তু কথ্য ঢং-এর সংলাপ রচনায় অনেকক্ষেত্রেই রামনারায়ণের ঐকান্তিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশেষ করে, কুলপালকের ভৃত্য ভোলার গেঁয়ো ঢং ও উচ্চারণযুক্ত কথা, এবং সবার উপরে কুলপালক-কন্যা তিনটির সংলাপ রচনায় লেখকের দক্ষতার অবধি নেই। এখানে তিনি যথার্থ জীবন দ্রষ্টা; বেদনার্ত জীবনধর্মের সহৃদয় নাট্যকার! আগে দেখেছি কুলীন-কন্যাদের চরম বিড়ম্বনা, তথা কৌলীন্যের ঘৃণ্য গ্লানির বিরুদ্ধে রাম-নারায়ণের সহৃদয়তা ছিল স্বয়ংস্ফূর্ত। নারীত্বের বেদনার্তিকে তিনি আমূল তলিয়ে দেখেছিলেন। ফলে, একই বিড়ম্বনার প্রতি বিভিন্ন বয়স ও স্বভাবের নারীর যে পৃথক্ পৃথক্ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হল, আশ্চর্য

১। বিজ্ঞাপন।

সত্য-সন্ধতার সংগে রামনারায়ণ তাকে অনুভব করেছেন। আর, কেবল বাচ্য-বিষয়ের মধ্যে নয়, বাচনভঙ্গী ও বাচ্য-ভাষার মধ্যেও তাকে স্ফুরিত করেছেন সার্থক ভাবে। কুলপালকের দ্বিতীয় কন্যা কৌলীন্য প্রথার বিষ-জর্জরিত যৌবন-ক্ষুধা শাম্ভবী নিজের বিবাহ সম্ভাবনার কথা শুনে মাকে "সভ্রূভঙ্গে" অর্থপূর্ণ ভাবে বলেছে,—বিয়ের খবর 'বল্লাল' যেন টের না পায়,—কারণ,—

"টের পেলে সে টের পাওয়াবে; সে এমন নয়; যেমন মোল্লা বলে, 'হেঁদুর পরব নেই'—তেমনি বল্লাল বলে কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বিয়ে নাই।' 'তা দেখিস্, সাবধান, সাবধান।"

৩৬ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের চারটি মেয়েকে একত্র এক অতি-বৃদ্ধ কুলীন পুঙ্গবের সংগে এক রজ্জুতে বেঁধে কুলপালক বিবাহ-বৈতরণী পার করবেন। নানাজনের তাই নানা প্রতিক্রিয়া! আটবছরের কন্যা কিশোরী অনেক শুনেও বিবাহ-বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারে নি। কোন রকম উৎসবের আঁচ করে সুখাদ্য লাভের আশায় সে উৎফুল্ল হয়েছে;—"ওমা তা কি আমি খাব"—এ প্রস্তাবে বাধা পেয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কার কার বিয়ে হবে। চার বোনের বিয়ের খবর শুনে সে মাকে প্রশ্ন করে,—"ওমা! তবে তোর হবে না।"

একটি অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকার বিমূঢ়তার সংবাদটুকুই কেবল এখানে পরিবেশিত হয়নি; তার মূঢ় মূর্তিটি যেন আমূল রূপায়িত হয়েছে তার বাগ-ভঙ্গির মধ্যে।—এখানেই রামনারায়ণ বিবৃতিকারক নন,—নাট্যকার।

কিন্তু নাটকের সর্বাংশে জীবন-রূপায়নের এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রত্যক্ষতা রচনা সম্ভব হয়নি; সে কথা আগে বলেছি। ফলে, সেকালের সমাজ-জীবন-বেদনার মূলে প্রবল আলোড়ন সঞ্চার করলেও, কুলীন-কুল-সর্বস্ব পূর্ণাঙ্গ নাটকীয় সংঘাত রচনার দাবি করতে পারে না। স্বয়ং রামনারায়ণ গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'এ এ-কথা স্বীকার করেছেন,—"ইহা ('কুলীনকুলসর্বস্ব') কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু অদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।" ফল কথা, সমকালীন জীবনের তমসান্ধ একটি দিক্ রামনারায়ণের চেতনাকে ব্যথিত করেছিল,—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-লঘুহাস্যের লগুড়-আঘাতে তাকে দূর করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। বস্তুতঃ, জাতির জীবনে তাঁর প্রচেষ্টার রূপ ছিল নেতিমূলক,—নিজ কালের অন্ধকার জীবনকে তিনি কোন ইতিমূলক (Positive) বলিষ্ঠ আদর্শবোধের আলোক-লোকে পরিচালিত করতে পারেন নি;—সেই নব-জীবন-বাণীর জন্যই ছিল মধুসূদনের প্রতীক্ষা। মধুসূদনের নাট্য-সাহিত্যে নূতন মূল্যবোধের যে আলোকোৎসার, তার বহিরাবরণের লাভা-

উৎক্ষেপ ঘটেচে রামনারায়ণের লঘুরসায়িত সামাজিক ব্যঙ্গ-নাটকের মধ্যে। —রামনারায়ণ তাই সম্পূর্ণ সফল নাট্যকার নন,—তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ।'

রামনারায়ণের অনুবাদ-নাট্য

প্রথম মৌলিক নাটকের পরে রামনারায়ণ একে একে চারখানি সংস্কৃত নাট্যানুবাদ রচনা করেনঃ—(১) 'বেণীসংহার' (১৮৫৬); (২) 'রত্নাবলী' (১৮৫৮); (৩) 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) এবং (৪) 'মালতী মাধব' (১৮৬৭)। বাংলা নাটকের ইতিহাসে আলোচ্য রচনা চারটির বিশেষ উল্লেখ্য কোনো দান নেই। কেবল রত্নাবলী নাটক 'বেলগাছিয়ার নাট্য-শালায়' অনেক তোড়জোড় করে অভিনীত হয়েছিল (১৮৫৮), আর, সেই অভিনয় উপলক্ষ্যেই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব। এদিক থেকে 'রত্নাবলী'র পরোক্ষ মূল্য অবশ্যই আছে। এই নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' লেখক তাঁর অনুবাদ-রীতির কথা উল্লেখ কবেছেন—"......'রত্নাবলী' নাটকের অবিকল অনুবাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম,—"। সব কয়টি সংস্কৃত নাট্যানুবাদেই এই রীতি সাধারণভাবে অনুসৃত হয়েছে।

তাছাড়া, কেবল 'কথোপকথনে'ই রামনারায়ণ "এতদ্দেশীয়" ভাষার ব্যবহার করেন নি, নাটকের গঠন-ভঙ্গিতে ও চরিত্র-চিত্রণে বাঙালি-ধর্মী সহৃদয়তার ছাপ আছে। বিশেষ করে, সংগীতের আকর্ষণ বাঙালি দর্শকের কাছে রামনারায়ণের সংস্কৃত নাট্যানুবাদকেও মঞ্চোপভোগ্য করে তুলেছিল। এখানে লেখক সচেতন ভাবে যাত্রার অনুসারী। 'রত্নাবলী'র 'বিজ্ঞাপনে' রামনারায়ণ লিখেছিলেন,—"যদি চ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত নিতান্ত পরিবর্জিত হইলে তাহাতে রস ও সৌন্দর্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা।" বাঙালির জাতীয় নাট্য-স্বভাবের উপলব্ধি ও অনুবর্তনও রামনারায়ণের নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ হয়েছিল।

পুরাণাশ্রিত নাটক

'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫) এবং 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) পুরাণাশ্রিত বিষয় নিয়ে লেখা রামনারায়ণের তিনটি মৌলিক নাটক। এসব নাটকের আঙ্গিক সংস্কৃতানুযায়ী, কিন্তু সংলাপ ও বিষয়-বিন্যাস 'কুলীনকুলসর্বস্ব'র তুলনায় আরো ঘন-নিবদ্ধঃ—রচনায় মুন্সিয়ানার ছাপ সুস্পষ্ট।

তাহলেও, রামনারায়ণের জনপ্রিয়তা তাঁর-কলা-কৃতির মৌলিক উৎকর্ষের জন্য নয়; উনিশ শতকের জাগ্রৃয়মান বাঙালি সমাজের জাতীয় আকৃতিকে আত্মসাৎ করেই তিনি নাট্যকারের সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এই

কারণেই, তাঁর উল্লেখ্য নাটক মাত্রই সমকালীন সামাজিক দুর্নীতির প্রতি শ্লেষ-আঘাত রচনায় উদ্দীপ্ত। এ ধরণের নাটক কয়টির মধ্যে 'নবনাটক'ই (১৮৬৬) শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ, 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে একটি ব্যঙ্গাত্মক নক্সার চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া চলে না; কিন্তু, 'নবনাটক' পূর্ণাঙ্গ নাট্য-মর্যাদা দাবি করতে পারে। এটিও আসলে 'পুরস্কার' প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নির্দেশিত বিষয়ে লেখা। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। নাটকের সম্পূর্ণ নামকরণেই নাট্য বিষয় স্পষ্ট হয়েছে,—"বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক।" 'নবনাটক' রচনার পূর্বে মধুসূদনের নাটক সব কয়টি, এবং দীনবন্ধুর সমাজ বিপ্লবাত্মক 'নীলদর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, নিছক প্রকাশ-কালের বিচারে 'নবনাটক' আলোচ্য পর্বের পরবর্তী রচিত। কিন্তু, রচনার যান্ত্রিক প্রকাশ-কালের অনুমতে নয়,—রচয়িতার বিশেষ মনোভঙ্গির ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই বর্তমান ইতিহাসের ধারাকে আমরা সন্ধান করেছি। এদিক থেকে মধুসূদন-দীনবন্ধুর পরে লেখা 'নবনাটকেও' রামনারায়ণের পূর্বসূরিত্বের ছাপ স্পষ্ট। আলোচ্য নাটকের ভাষাবিন্যাস, এবং ঘটনার পরিণতিতে 'নীলদর্পণের' প্রভাব স্পষ্ট;—'নীলদর্পণের' মতই রামনারায়ণ এখানে বহু-মৃত্যুজনিত 'ট্রাজেডি' সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। সংস্কৃত নাট্যকলা-সিদ্ধ মানসে রামনারায়ণ যে 'ট্রাজেডি' রচনায় বৃত হয়েছিলেন, তাতেও তাঁর সংস্কার-মুক্ত জীবনাভিমুখী শিল্প-চেতনার পরিচয় পাই। 'নবনাটক' জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল।

রামনারায়ণের সার্থকতার উৎস

নবনাটক

বাল্য বিবাহ-প্রথাকে আঘাত করে রামনারায়ণ আর একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন বলে মনে হয়।—নাম 'সম্বন্ধ-সমাধি নাটক',—রচনার কাল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ।[১] এই নাটকেও গুণেন্দ্র নাথের পৃষ্ঠ-পোষণ যে ছিল,—গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র থেকে তা অনুমিত হয়।

সম্বন্ধ-সমাধি

সমকালীন আরো নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে রামনারায়ণ নানা উপলক্ষ্যে প্রহসনও লিখেছিলেন কয়েকটি; তার মধ্যে আছেঃ—'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সংকট' এবং 'চক্ষুদান'।

রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্ব[illegible] সমকালীন বাংলার নাট্য জগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের সংস্কার ও বিপ্লবের

১। নাটকটিতে গ্রন্থকারের নাম [illegible] ডাঃ সুকুমার সেন আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে অনুমান করেছেন, এটি রামনারায়ণ অথবা তাঁর অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কর্তৃক লিখিত। —দ্রষ্টব্য বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড।

আকাঙ্ক্ষাকে সর্বপ্রথম নাটকের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে রামনারায়ণই বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে জাতির যৌথ জীবনভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।—সেই মৌল জীবনানুভবের উদ্বর্তনে অসংখ্য ভালো-মন্দ সামাজিক নাট্য-নক্সা রচিত হয়ে চলেছিল দিনে দিনে। এই সব রচনার ইতিহাস থেকে উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন আবিষ্কার করা কঠিন। কিন্তু, একটি যৌথ জীবনাবেদন যে সমগ্র জাতির মর্ম-মূলকে পীড়িত এবং ক্রমেই একত্র-সংহত করে তুলছিল, প্রায় সমভাবাপন্ন এই সব রচনা তার নিঃসংশয় প্রমাণ। তাছাড়া, রামনারায়ণের নাটককে আশ্রয় করে অভিনেয় শিল্পরূপে বাংলা নাট্য-কলার সংগঠনও ক্রমে দৃঢ়-পুষ্ট হয়ে উঠছিল। "নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'[১] নাটকের অভিনয় (১৮৫৭) বাংলা অভিনয়-শিল্প ও নাট্য রচনায় তড়িৎসম উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। রাম-নারায়ণের অন্যান্য নাটকের অভিনয়ও এই উদ্দীপনাকে প্রদীপ্ততর করেছিল। বস্তুতঃ, তাঁর অনেক নাটকই একাধিকবার, এমনকি, বারবার অভিনীত হয়েছে।[২] একদিকে রামনারায়ণের নাটকের অভিনয়-সাফল্য অজস্র নাট্যকারকে নিত্য নূতন নাটক রচনায় অনুপ্রেরিত করেছে। অন্যদিকে মঞ্চ-অধিকারীদের পক্ষ থেকে অভিনয়-যোগ্য নূতন নাটক লাভের আগ্রহ, দুদিক থেকেই নাট্য রচনার উৎসাহ ও উদ্দীপনা হয়েছিল মুক্ত,—অবারিত। অভিনয়-মঞ্চ ও নাট্য সৃষ্টির পরস্পর পরিপূরক এই অপূর্ব যৌথ-জীবনায়নের ছাপটুকুও আলোচিতব্য অসংখ্য সাহিত্যের মধ্যে অনুধাবন-যোগ্য। যথার্থ নাট্য-শিল্পোচিত পরিবেশের প্রস্তুতি এই ধারার ব্যাপ্তি ও সুপ্রতিষ্ঠার মধ্যে।

কুলীন কুলসর্বস্ব ও জাতীয় আলোড়ন

এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক (১৮৫৮) প্রথম উল্লেখ্য,—'কুলীন কুল সর্বস্বের' প্রত্যক্ষ প্রভাবে লেখা নাট্য-কৃতির মধ্যে এটি প্রথমতম। বিষয়বস্তুও 'কুলীনকুলসর্বস্ব'রই অনুরূপ,—বহু বিবাহ-জনিত সমাজ বিভ্রাট!

এছাড়া, বাল্য-বিবাহ নিয়ে লেখা প্রথম দুটি নাটক হচ্ছে, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্য-বিবাহ নাটক' (১৮৫৯?) এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' (১৮৬০)। এ-দুটি নাটকই এ-বিষয়ে রাম-নারায়ণের 'নব নাটকের' পূর্ববর্তী; এবং এই কারণেই স্মরণীয়।

সমধর্মী অন্যান্য নাটক ও নাট্যকার

শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যাপণ গ্রহণের নিন্দা করে 'কন্যা বিক্রয়-নাটক' (১৮৬৩) লিখেছিলেন নফরচন্দ্র পাল।

বিষয়গত বৈশিষ্ট্য ছাড়া এ-সব রচনার আর কোনো ঐতিহাসিক মূল্য

১। দ্রষ্টব্য-বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস।
২। ঐ।

নেই। বিষয়-বিচারেও গতানুগতিকতা ছাড়া স্পষ্ট-গ্রাহ্য-নবীনতা কিছু ছিল না। উনিশ শতকের সমাজ-বিপ্লবের পূর্ব কালে বাংলার নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে নানা রকমের দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল,—প্রধানতঃ বাঙালি হিন্দুর কদর্য বিবাহ-পদ্ধতিই ছিল ঐ সব ত্রুটির প্রধান উৎস। এই ধরণের বিবাহ-রীতির নিন্দনীয় নানাদিক নিয়ে রামনারায়ণের পরে নানা জনে নাটক লিখেছিলেন। বহু-বিবাহ, কন্যাপণ ইত্যাদি একই সামাজিক কু-প্রথার এ-পিঠ, ও-পিঠ। এই গতানুগতিকতার মধ্যে নূতন সজীবতার পথ আর একবার খুলে দিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র, তাঁর 'বিধবা বিবাহ নাটকে' (১৮৫৬)।

উমেশচন্দ্রের বিধবা বিবাহ নাটক

বিধবা-বিবাহের চেষ্টাও আসলে পুরাতন সমাজের নারী-পীড়ন পদ্ধতির প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দীপ্ত সংগ্রাম সে-কালের সমাজ-জীবনে 'বিধবা-বিবাহ' আন্দোলনকে নিছক নৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পটভূমিতে টেনে তুলেছিল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর এবং তাঁর অনুগামী-প্রতিগামীরা মিলে বাংলা ভাষার গদ্য প্রবন্ধে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে। উমেশচন্দ্র সেই বৈপ্লবিক উত্তাপকে তর্ক-প্রবন্ধের পর্যায় থেকে নাট্য-শিল্পের ক্ষেত্রে টেনে এনেছেন; এতে নৈতিক দুঃসাহসের সংগে প্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। আর সেই সহৃদয় জীবনোত্তাপ উমেশচন্দ্রের মধ্যেও এক অপূর্ব নাট্য সংহতির সৃষ্টি করেছিল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ হয়;— বিরুদ্ধ পক্ষের আক্রমণ ও আক্রোশ তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। উমেশচন্দ্র সেই ক্ষিপ্ত উন্মাদনার যুগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই 'বিধবা বিবাহ নাটক' লিখলেন বিদ্যাসাগর-প্রচেষ্টার সমর্থন করে। দুটি বাল-বিধবার জীবন-পরিণতি এতে চিত্রিত হয়েছে,— প্রথমটি কীর্তিরাম ঘোষের বিধবা মেয়ে সুলোচনা, পরপ্রলুব্ধ হয়ে অবৈধ সন্তান-সম্ভাবিতা হয়; এবং নানা দুর্ভোগের শেষে আত্মহত্যা করে কলঙ্ক থেকে রেহাই পায়। অন্যদিকে রয়েছে অদ্বৈত দত্তের বাল-বিধবা মেয়ে প্রসন্ন,—পুনর্বিবাহিতা হয়ে সচ্ছন্দ আনন্দে যার জীবন হয়েছে অতিবাহিত। সুলোচনার 'ট্রাজেডি'ই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য; অন্ধকারকে গাঢ় করবার উজ্জ্বল পটভূমিরূপে কল্পিত হয়েছে প্রসন্ন-কাহিনী। এই দুই গল্পের বিন্যাস-সংহতিতে একটি সংসক্ত নাটকীয় 'প্লট' গড়ে তুলতে পেরেছেন উমেশচন্দ্র, সুলোচনার ট্রাজিক পরিণাম নাটকটিকে ঘন-বিপন্ন কারুণ্যে করেছে আচ্ছন্ন। উমেশচন্দ্রের নাটকীয় সার্থকতার মূলে আছে তাঁর জীবনানুভূতির দীপ্ত সজীবতা। 'বিধবা বিবাহের' বৈপ্লবিক চেষ্টার প্রতি কেবল

উৎসব ও অভিনব সার্থকতা

নিষ্ক্রিয় নৈতিক সমর্থন নয়,—সক্রিয় উদ্যমে আকুল হয়েছিল তাঁর আমূল চেতনা। লেখক নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন,— "......he decided on sacrificing dramatic purity to what he conceived would produce effect."১ কেবল এই কারণেই, অর্থাৎ, এই প্রাণময় জীবন-স্পর্শের প্রভাবেই 'কুলীন-কুল সর্বস্বাদির' তুলনায় 'বিধবা বিবাহ নাটক' অনেক সজীব, —অনেক বেশি শিল্প-সার্থক।

বিদ্যাসাগর মশায়ের 'সীতার বনবাস' অনুসরণে উমেশচন্দ্র 'সীতার বনবাস নাটক' রচনা করেন।

উমেশচন্দ্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকের প্রেরণাকে অনুকরণ করে পক্ষে ও বিপক্ষে নাট্যরচনার ঝড় বয়েছিল এর পরে। শিল্পকর্ম অথবা ইতিহাস, কোনোটির বিচারেই এ সকল প্রয়াস একান্ত উল্লেখযোগ্য নয়। উমেশচন্দ্রকে নিয়েই বাংলা নাট্য-সাহিত্য উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজ-জীবনের সক্রিয় বিপ্লব-লোকে প্রবেশ করেছে, প্রত্যক্ষভাবে হয়েছে আধুনিক জীবন-ভূমির অভিমুখী। কিন্তু, জীবনের বস্তুময় ভিত্তি এবং সার্থক শিল্পকর্মের পটভূমি অভিন্ন নয়। উমেশচন্দ্র বাঙালির নাট্যশিল্পকে সমাজ-বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ বিষয়লোকে অবতীর্ণ করেছিলেন,—সেই বিপ্লবী জীবনধর্মকে শিল্প-সৌন্দর্য-লোকে উত্তীর্ণ করেছেন মধুসূদন। অতএব, উমেশচন্দ্রের নাট্যসিদ্ধিকে নিয়েই বাংলা নাটকের প্রস্তুতি পর্বের সার্থক অবসান।

বিধবা বিবাহের সাহিত্য-ঐতিহাসিক সার্থকতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আধুনিকতার মুক্তি

বাংলা সাহিত্যে প্রস্তুতি-পথের পরিণাম বেয়েই এসেছিল আধুনিকতার মুক্তি। 'আধুনিকতার প্রস্তুতি' পর্বের আলোচনায় বলেছি;—ডিরোজিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগর,—এই প্রতিভা-ত্রয়ীর বিপ্লব-চর্যার সমবেত পরিণামকে আশ্রয় করে উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালি সমাজ, তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্য নবীন শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়েছিল। তাই, বর্তমান আলোচনার সুরুতেই আলোচ্য বিপ্লব প্রয়াসের সামাজিক ফলশ্রুতি নির্ণয় প্রয়োজন।

নব্যবঙ্গ-সমাজ ডিরোজিওর কাছে পেয়েছিল একটি শুদ্ধ-সত্য নৈতিক

১। ভূমিকা।

মূল্যমানের প্রেরণা ;—যথাস্থানে তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি। সেই দুর্লভ সামাজিক অবদানের সংক্ষিপ্ত ফলশ্রুতি ধ্বনিত হয়েছে ডিরোজিও-শিষ্য রাধানাথ শিকদারের আত্মজীবনীতেঃ—"নিশ্চিত বল্‌তে পারি; সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা,—যা সমাজের শিক্ষিতজনের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যা ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর না হয়েই যায় না—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।"[১]

আধুনিকতার মুক্তি সাধনায় ত্রয়ী

রাধানাথ শিক্‌দার অনুশোচনা করেছেন,—ভারতবর্ষের নানামুখী প্রগতির স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তেই অকালে প্রাণত্যাগ করতে হল ডিরোজিওকে,—নিজের কোনো ভাব-কল্পনাকেই তিনি সার্থক রূপ দিয়ে যেতে পারেননি। আসলে নবজাগ্রত বাংলার প্রথম দুর্বার যৌবন,—প্রথম মূর্তিমান্ তারুণ্য-বিগ্রহ ছিলেন ডিরোজিও। যৌবনের শক্তিমূলে রয়েছে নির্বার আবেগ-প্রবাহ, দুর্ধর্ষ উচ্চাশা এবং সত্যের প্রতি অনির্বাণ অকুণ্ঠ আগ্রহ-দীপ্তির। আগে বলেছি, যে সমাজ ও পরিবেশে তিনি জন্মেছিলেন; তাতে ভারতীয় ঐতিহ্যের তমসালীন রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন, করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু, সত্যের একটি নির্বিশেষ রূপ আছে,—মানবিকতার আছে সর্বজনীন শাশ্বত মহৎ স্বরূপ! দেশ-কালে তা পৃথক হয় না, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে তার স্বরূপ হয় না বিচ্ছিন্ন ;—বিশুদ্ধ যৌবন-ধর্ম সেই দেশ-কালাতীত সর্বজনীন সত্য-পথের অভিসারী।—ডিরোজিওর কাছে তাঁর শিষ্যদল,—নবীন বাঙালি সমাজ এই "সত্যানুসন্ধিৎসা" এবং "পাপের প্রতি ঘৃণা"র আবেগ-উদ্বেলিত শক্তির স্পর্শ লাভ করেছিল। সে দিনের শিক্ষিত তরুণের চেতনায় তা স্পর্শমণির স্থায়ী ফল রচনা করেছিল। ফল কথা, বিশ্বাসের অতি-তীব্রতা, উদ্দেশ্যের একাভিমুখিতা, সংগ্রামের দৃঢ়তা ও সর্বোপরি সিদ্ধির অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেকালের তরুণ মন উচ্ছ্বসিত আবেগের তরঙ্গ-কম্পনে ছুটে চলেছিল। নব-উদ্গত যৌবনের এই ভাব-উদ্বেলতা বাঙালি চেতনায় ডিরোজিওর একক দান। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম তারুণ্যের এই কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস মধুসূদনের শিল্প-স্বভাবকে সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। ফল কথা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোলকলায় পূর্ণ উদ্দাম নব-যৌবনের কবি মধুসূদন শিক্ষক ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্য নন,—কিন্তু, কবি-ডিরোজিওর সার্থক উত্তরসূরী।

১। ডিরোজিও

উনিশ-শতকের প্রথমার্ধের বিপ্লব-আকাশে ডিরোজিও যে অগ্নি-সংযোগ করে গেলেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সাধনার মাধ্যমে সে আগুন

১। মূল ইংরেজির অনুবাদ যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' থেকে নেওয়া।

যুগ-সঞ্চিত সকল মিথ্যাকে দগ্ধ করে আধুনিক বাঙালি জীবনধর্মকে সর্বাবয়বে পুষ্ট,—উজ্জ্বল রূপ দিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগর ডিরোজিও-বৃক্ষের ফল নন, কিন্তু তাঁদের সাধনা জাতীয় তারুণ্যের যে চেতনা-ভূমিকে আশ্রয় করে সফল হয়েছিল,—তা ডিরোজিওর প্রস্তুত। এই তথ্য পূর্ববর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করে এসেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় নাগরিক বাঙালির মানস-গঠনে সেই বিশেষিত অবয়বের স্বরূপটি।

রেনেসাঁসের ভিত্তি-রচয়িতা

ডিরোজিও থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত যে বিপ্লবের ধারা বাংলার নাগরিক জীবনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তার প্রথম ফল-শ্রুতি সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিহ্নিত হতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের সুরু থেকে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মধুসূদনের প্রথম সৃষ্টি শর্মিষ্ঠা নাটকে তার সুচিহ্নিত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। সেকালের নাগরিক বাংলার নানামুখী উৎক্ষেপের পরিচয় দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন,—"বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ [খ্রীষ্টাব্দ] পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য......।"[১]

"গভীর অভিনিবেশ সহকারে" লক্ষ্য করলে দেখব, শিবনাথ শাস্ত্রীর এই সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী সেকালের বাংলার সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মনৈতিক আলোড়নের সব কয়টি দিকের প্রতিই অঙ্গুলি-সংকেত করেছে। যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে এই সর্বাত্মক আন্দোলনের বহিরাঘাত সূচিত হয়েছিল, তা ছিল তখন ফরাসি-বিপ্লবের আবেগপুষ্ট;—রাষ্ট্রনীতি-সচেতন। ডিরোজিও'র যৌবন-চেতনা এই রাজনৈতিক আদর্শ-প্রধান সাহিত্য-দর্শনের ভাব-প্রভাবে পরিবর্ধিত হয়েছিল। কিন্তু তার বহিরাঘাতের তাড়নায় বাঙালির মর্ম-লোক যে পথে আন্দোলিত হয়ে উঠল,—সে মধ্যযুগীয় সমাজ-কেন্দ্রিক জীবন-ধর্মের বিপ্লব-পরিণামী পথ। বলা হয়ে থাকে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় মানস বিশেষ ভাবে সমাজ-ধর্মের অভিমুখী; রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এবং

রেনেসাঁসের জীবন-পটভূমি

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

অন্যত্র এই ধারণাকে পুষ্ট করেছেন। শাশ্বতকালের পটভূমিতে এই মতবাদের সত্যতা কতদূর, সে গবেষণা অবান্তর। কিন্তু, আমাদের আলোচ্য যুগের শিক্ষিত বাঙালি মানস যে সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টি-ভঙ্গির দ্বারাই আমূল আন্দোলিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের এখানে-ওখানে রাজনীতি-অর্থনীতিগত সচেতনতার আভাস এক-আধটু আছে। তাহলেও আসলে সে ছিল এক বিশুদ্ধ, পূর্ণ-গঠিত সমাজ-বিপ্লবের ধারা। আর, সেই সামাজিক মূল্যবোধের সুস্থ-বলিষ্ঠ নবীন প্রতিষ্ঠার পথ বেয়েই বাংলার সাহিত্য-শিল্প-লোকেও আধুনিকতার অকম্পিত পদধ্বনি প্রথম শোনা গেল।

সমাজ-বিপ্লব-মূলক

আগে বলেছি, রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের সচেতনতা প্রবল ছিল। এ অনুভূতির তীব্রতা J. S. Buckingham-কে লেখা পত্রাংশে স্পষ্ট প্রকাশিত।[১] তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উদারতা, মানবিকতা-বোধ ও আন্তঃরাষ্ট্র বিশ্ব-মৈত্রী-কল্পনা এ-যুগেও দুর্লভ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহন ফ্রান্স গিয়েছিলেন।—সে দেশে যাবার ছাড়পত্র চেয়ে ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে জোরের সংগে ঘোষণা করা হয়েছিল,

২। রামমোহন ঃ রেনেসাঁসের রূপকার

"——that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

এই আন্তঃরাষ্ট্র মানবিক সহৃদয়তা প্রতিষ্ঠার পথে রাজনীতি-অর্থনীতিগত যে সকল বিরোধ-বাধা দেখা দিতে পারে,—তার নিরসনের জন্য রামমোহন প্রস্তাব করেছিলেন,

".....the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the Parliament of each ; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the chairman to be chosen by each nation alternately, for one

১। পূর্বে উধৃত হয়েছে।

year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other ; such as at Dover and Calais for England and France.

"By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civilised countries with constitutional Governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation."১

একালে ভারত-প্রজাতন্ত্রের ঘোষিত বিশ্বমৈত্রী ও সহাবস্থান নীতির ঐতিহ্য আবিষ্কারের জন্য খ্রীষ্ট-পূর্ব বৌদ্ধযুগের শরণ নেওয়া হয়। আধুনিক ভারতের প্রথম প্রাণ-প্রতীক রামমোহন আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষার মাধ্যমে এই আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অথচ বিশ্ব-বিষয়ে এই প্রখর রাজনৈতিক দূর-দৃষ্টি সত্ত্বেও, বাংলার জীবন-ভূমিতে রামমোহনের কর্মসাধনা সামাজিক সংস্কার-বিপ্লবের ক্ষেত্রেই একান্ত নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, সতীদাহ নিবারণের সংগ্রামী সেনাপতি, প্রতীচ্য শিক্ষা-প্রবর্তনের পথিকৃৎ, নারী-জাতির উত্তরাধিকার বিধির উদ্গাতা রূপেই বাঙালির ইতিহাসে রামমোহনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসকেও তাঁর এই বাঙালি-স্বভাব নিজের অনুবর্তী করে নিয়েছিল।

রামমোহনের রাজনৈতিক সচেতনতা

রামমোহনের সমাজ-বিপ্লবী সত্তার মূলে তাঁর ইংরেজি শিক্ষা ও রাজনৈতিক উপলব্ধির একটিমাত্র বিশেষ ছাপ পড়েছিল। প্রধানতঃ সেই বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই মধ্যযুগের সমাজ-ধর্মিতার তুলনায় উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-বিপ্লব আমূল পৃথক্ হয়েছে। ইংরেজি ঐতিহ্যের সে দান রামমোহনের অতন্দ্র ব্যক্তি-সচেতনা (Individuality)। মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার জীবন ধারা সমাজ-প্রধান,—সমষ্টি-কেন্দ্রিক। আর, সে সমাজ ছিল পরিবারানুক। ব্যক্তির জীবন সেখানে একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হত সমষ্টিগত কল্যাণ-বোধের আদর্শে। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রশ্ন সেখানে ওঠেনি,—একটি গোটা সমাজ সচল সক্রিয় মূর্তি ধরেছিল প্রত্যেক সামাজিকের অন্তর-চেতনায়। সংকীর্ণতর পরিবেশে সেকালের বাঙালি এই সামাজিক মূল্যবোধেরই প্রথম সংহত চর্চা করেছে যৌথ পরিবার-প্রথার পটভূমিতে। নানা গভীর-অগভীর আত্মীয়-সম্পর্কে বাঁধা এক-একটি জনসমষ্টিকে নিয়ে ছিল সেকালের বৃহদায়তন এক একটি যৌথ

ও উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধ

১। রামমোহন রায়; সাহিত্য-সাধক চরিতমালা থেকে উধৃত।

পরিবার। সকলেই এক বৃহৎ পারিবারিক প্রাচীন ঐতিহ্যের ভারবাহী মাত্র হয়েছিল, সেই ঐতিহ্য রক্ষার নামে সয়ে-যাওয়া এবং মানিয়ে চলাই ছিল প্রতিটি পারিবারিকের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রশ্ন করা, জবাব-দিহির দাবি করা, সেকালের জীবন-মূল্যবোধের কাছে ছিল অপরাধজনক অনধিকার-চর্চা। ব্যক্তিত্ব-সচেতনতাহীন এই সমষ্টি-কল্যাণবোধের আদর্শই অন্ধতা প্রাপ্ত হয়ে বাঙালির অস্থিমজ্জায় একদিন কুসংস্কারের মহীরুহ জাগিয়ে তুলেছিল। রামমোহন সেই সামাজিক কুসংস্কারের অচলায়তনে প্রথম কুঠারাঘাত করেন। এখানেই নবীন বাংলার সমাজ-বিপ্লবের সূরু।

কিন্তু, রামমোহনও সমষ্টি-কেন্দ্রিক কল্যাণবোধের আর এক বিশেষ আদর্শের দ্বারা সে পথে পরিচালিত হয়েছিলেন। সে পথ বাংলার ব্যক্তি-অনুক জাতিত্ব-বোধের পথ। রামমোহন দেখেছিলেন, মধ্যযুগের আদর্শা-নুযায়ী ব্যষ্টি ছিল সমষ্টির অনুমত,—ব্যক্তির জীবন সমাজের কল্যাণের জন্যই নিঃশেষিত হয়েছে সেখানে। ইংরেজি জ্ঞান, বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবাদর্শের শিক্ষার প্রবল প্রেরণায় রামমোহন 'Liberty' শব্দের নতুন তাৎপর্য অনুভব করলেন,—আর, সেই তাৎপর্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হল তাঁর 'Equality' এবং 'Fraternity'র আদর্শ। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমষ্টি-বন্ধনের যথার্থ মূল্য; ব্যক্তির স্বাধীনতার (Liberty) জন্যই সাম্য (Equality) এবং সৌভ্রাত্রর (Fraternity) প্রয়োজন। ব্যক্তির স্বাধীনতা, —ব্যক্তিত্বের মুক্তিই যদি না থাকে, তবে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দাঁড়াবে কোথায়, —কাকে আশ্রয় করে? রামমোহন আত্মসচেতন ব্যষ্টিধর্মী মানুষের সমন্বয়ে এক নূতন সমষ্টি-জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন;—তাই, তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম 'আত্মীয় সভা'।

নব জাগ্রত সমষ্টিবন্ধ জীবনের অখণ্ড অনু (unit) হিসেবে যে ব্যক্তি-ধর্মের পরিকল্পনা রামমোহন করেছিলেন, তারও পশ্চাতে ছিল য়ুরোপের জাতীয়তাধর্মী স্বাভিমান এবং স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি। এই মর্যাদা ও অভিমানের সচেতনতা নিয়ে তিনি ইংরেজ রাজকর্মচারি-কৃত অসদাচরণের বিরুদ্ধে বড়লাটের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন,—যার ছত্রে ছত্রে এদেশীয় শাসিত নাগরিকের সদাচরণ প্রাপ্তির অদম্য দাবি জোরের সংগে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুতঃ, উনিশ শতকের নগর-বাংলার প্রথম মুক্তি-দূত রামমোহন সমষ্টিবন্ধ এমন এক জাতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন,—যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি স্বয়ং-স্বতন্ত্র নাগরিক হিসেবে স্বাধীন, সুস্থ ও স্বয়ম্পূর্ণ। রামমোহন যে সমাজে জাত এবং বর্ধিত হয়েছিলেন, সেখানে সামাজিক পটভূমিতে অসাম্য এবং উৎপীড়ন ছিল অতি প্রবল। তাই, রামমোহনের স্বয়ংস্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রথমতম সংগ্রাম-অভিযান সেই সামাজিক

অনৈক্যের বিরুদ্ধে;—আর সংগ্রামী হিসেবে তিনি ছিলেন,—আপোষহীন, দুর্ধর্ষ দুরন্ত।

রামমোহনের ব্যক্তি-জীবনে একটি দুরপনেয় স্ব-বিরোধ আজও প্রবল হয়ে আছে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও অল্প বয়স থেকেই তিনি পৌরাণিক হিন্দুর আচার-আচরণ ও মূর্তি পূজার বিরোধিতা করে একেশ্বরবাদের অভিমুখী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিজের স্বাধীন অভিমত প্রথম গ্রন্থিত করে তিনি তাঁর পরিবার পরিজন ও মাতাপিতার কাছেও ভর্ৎসিত লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। এই কারণেই কি-না কে জানে,—পরবর্তী জীবনে মাতা-পিতা-ভ্রাতার প্রতি তিনি সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহার পরিহার করেছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন কোম্পানী সরকার এবং বর্ধমান রাজের বাকি খাজনার দায়ে রামমোহনের পিতা দু-দফায় কারাবাস করেছিলেন, তখন রামমোহন নিজে প্রচুর আর্থিক সংগতির অধিকারী। কিন্তু, পিতার সাহায্যে একবারও তিনি এগিয়ে আসেন নি। বরং, তাঁর অগ্রজ জগমোহন সর্বস্বান্ত হয়েও পিতার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। পরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জগমোহনও যখন প্রধানতঃ পিতৃঋণের দায়েই জেলে ছিলেন, তখনও আনুকূল্যের জন্য অগ্রজের সকল আবেদন রামমোহন অস্বীকার করেন। অবশেষে সুদ শুদ্ধ টাকা আদায়ের দলিল লিখিয়ে তবেই তিনি সামান্য অর্থ তাঁকে দিয়েছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র, এমন কি নিজের মায়ের সংগেও বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর বিরোধ আদালত অবধি যে পৌঁচেছিল, তাতে সংশয় নেই। রামমোহন-জননী দুঃসহ মনঃকষ্ট এবং অর্থ-কষ্ট ভোগ করে পুরীতে প্রাণত্যাগ করেন; স্বয়ং রামমোহন তখন কলকাতায় প্রচুর বিত্ত এবং প্রচুরতর খ্যাতির অধিকারী। আত্মীয় সভার কর্ম-প্রচেষ্টাও তখন চলেছে পুরোদমে।১

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রামমোহন ব্যক্তিত্বের স্ব-বিরোধ

কারণ যাই হোক, পিতামাতা এবং পরিবারের প্রতি রামমোহনের এই বিমুখতার পেছনে মতান্তর ও মনান্তর যে ছিল, তাতে সংশয় নেই। কিন্তু, যে-কোনো পক্ষ থেকে যত ত্রুটি-ই ঘটে থাক্, রামমোহনের মত পুত্রের এরূপ আচরণ এ দেশের জীবন-মূল্যবোধের বিচারে বিস্ময়কর। নৈতিক ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের বক্তব্য,—অতিশয় পরিমাণে হয়ে থাকলেও,—রামমোহনের ব্যক্তি-সচেতন আত্মমর্যাদা-বোধ এখানে আপোষহীন সংগ্রামী স্বভাবের পরিচয় দিয়েছে।

ডিরোজিও প্রসঙ্গে বলেছি,—ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পর্যন্ত তিনি বিচার-সিদ্ধ, প্রমাণ-সাপেক্ষ বিষয়রূপে নিজ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।

ডিরোজিওর-ও আগে, রামমোহনই বাংলা দেশে শাস্ত্র-জ্ঞান, তথা ঈশ্বর-স্বরূপকে প্রথম বিচার-প্রামাণ্য করে তুলেছিলেন। ফল কথা, সর্বপ্রকার পূর্ব-সংস্কারের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি; ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির ওপর একান্ত নির্ভর;—প্রতিটি বিষয়কে ব্যক্তির যুক্তি-সিদ্ধ করে নেবার একমাত্র মূল্যমান নব্যবঙ্গ-যুগের বিপ্লবী চেতনাকে সেদিন নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ব্যক্তিত্বের এই সর্বনিরপেক্ষ একক প্রাধান্যের আদর্শই মানবতা,—Humanism নামে অভিহিত হয়েছিল। বিপ্লবী রামমোহন এই আপোষহীন ব্যক্তিত্ব-সর্বস্বতার প্রথম এবং প্রবলতম প্রতীক। নিজের ব্যবহারিক জীবনে মানব-আত্মার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় একদিকে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেছেন,—অন্যদিকে জনক-জননীর মত পরমাত্মীয়দের প্রতিও প্রকাশ করেছেন অবিমিশ্র আন্তরিক বিরূপতা। আমাদের ধারণা, যে রামমোহন ঈশ্বর-স্বরূপকে ব্যক্তিগত বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে তবেই স্বীকার করেছিলেন,—পিতৃমাতৃ-ভক্তি চিরন্তন ঐতিহ্য-মূল্যকেও তিনি দৃপ্তভাবে অস্বীকার করেছেন,—কেবল নিজের ব্যক্তি-চেতনার অননুযায়ী হয়েছিল বলে। নিজের জীবনে পিতৃমাতৃভক্তি,—রামমোহনের যুগ-জীবনের পরিভাষায়,—আপন মানব-মর্যাদার পরিপন্থী ছিল বলেই ছিল সর্বাংশে পরিত্যাজ্য।

ডিরোজিও ও রামমোহন ব্যক্তিত্বের সমবেত ফলশ্রুতি

আবার বলব,—নৈতিক ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিতর্ক আমাদের নয়। পূর্ব-সংস্কারের মহত্তম অংশ বলে গণ্য স্পর্শ-কাতরতাগুলিও সেকালের ব্যক্তি-চেতনার একমুখী আঘাতে কেমন বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল,—সেই তথ্য-টুকুই এখানে লক্ষ্য করবার মত। বিপ্লবের এইটিই প্রথমতম চিহ্ন। ভাঙতে সুরু করলে, আমূল সে বিচুর্ণ করে;—তার পরে গড়ে তোলে সম্পূর্ণ নূতন মূল্য-বোধের ভিত্তি। অবশ্য সেই নূতনতর পথ পূর্বাপর সুস্থ জীবন-মূল্য-বোধের সংগে একান্ত সম্পৃক্ত। বাঙালির নাগরিক জীবনে আবার সুস্থ পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল; মাতৃ-পিতৃভক্তির ঐতিহ্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে পরবর্তী কালের জীবন ও সাহিত্যে। কিন্তু, রামমোহনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা পূর্ববর্তী যুগের অনুরূপ মূল্য-বোধকেও অস্বীকার, এমন কি, হয়ত উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলেছিল। আলোচ্যযুগের ভাঙনের ইতিহাস বিচারে এ-কথা যেন না ভুলি।

এবং বিপ্লবের বিধ্বংস

রামমোহন যে পরিবেশে জন্মেছিলেন,—সে ছিল সমাজ-কেন্দ্রিক। সামাজিক ঐতিহ্য-বোধের প্রতি অন্ধ মমতা রামমোহনের ব্যক্তি-জীবনের 'পরেও দুঃখের বোঝা সঞ্চিত করেছিল। সব কিছু মিলে বাংলার সামাজিক অসংগতির ক্ষেত্রেই রামমোহন প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। আর, বাঙালি

রামমোহনের সামাজিক অভিজ্ঞতা

হিন্দুর জীবনে সামাজিক কল্যাণের নামে সেদিন নিষ্ঠুরতম পীড়ন চল্‌ছিল নারীজাতির ব্যক্তিত্বের 'পরে। অবহিত-ভাবে লক্ষ্য কর্‌লে দেখ্‌ব, মধ্যযুগে বাংলার পরিবার-ধর্ম,—তথা, পরিবারানুক সমাজধর্মে নারী এক অত্যাবশ্যক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরুষ-প্রধান জীবন-ব্যবস্থায় পরিবারের শ্রেষ্ঠ-পুরুষ অন্য সকল পারিবারিকের 'পরে একাধি-পত্য দাবি করেছে প্রবল প্রতাপে। যেখানেই বিরোধ-সংঘাত অঙ্কুরিত হতে চেয়েছে, সেখানেই নারীর ত্যাগ, সহৃদয় সেবা-পরায়ণতা,—রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় তার কল্যাণীত্ব সমস্ত বিরূপতাকে শান্ত করেছে,—ঘনীভূত বিক্ষোভকে করেছে শীতল-সুন্দর। দৃষ্টান্ত হিসেবে মনসামঙ্গলের কাহিনীর আলোচনা করা যেতে পারে। চন্দ্রধর অনেকটা অপার্থিব জেদের বশেই মনসার সংগে বিবাদ করেছিলেন। ইচ্ছা সত্ত্বেও সনকা কিংবা তাঁর পুত্র-বধূদের পক্ষে মনসা-তোষণের উপায় ছিল না। পরিবারের কর্তা হিসেবে চাঁদের প্রতাপ সেখানে অনতিক্রম্য। অথচ বিপদের অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এসেছে, একটির পরে একটি পুত্র সর্পদংশনে মারা পড়েছে, বিধবা বধূদের শোকার্তির মধ্যে চাঁদ শবদেহগুলিকে টেনে নদীর জলে দিয়েছে ভাসিয়ে। 'কানির উচ্ছিষ্ট' পুত্রের প্রতি বধূদের আকুল মমতাবোধকেও সে কোন মর্যাদা দেয় নি। আবার তাদের অধীর ক্রন্দনের টুঁটিও চেপে ধরতে চেয়েছে,—কারণ, চাঁদের পুরীতে ক্রন্দন-শব্দ 'কানির' হাসির কারণ হতে পারে। সেই দুঃসময়ে চন্দ্রধরের পরিবারের ঝড় ঘনিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ত অবোধ শোকের আর্ত কণ্ঠধ্বনিতে! কিন্তু, জননী সনকা একদিকে নিজের অদম্য পুত্রশোকার্তিকে বুকে চেপে বধূদেরও বুঝিয়েছেন,—শান্ত করেছেন। চাঁদের জেদ ও অন্ধ আক্রোশ প্রশ্রয় পেয়েছে;—পারিবারিক জীবন-ক্ষেত্রে হয়েছে বিজয়ী। তাই, মধ্যযুগীয় পুরুষ-প্রধান সমাজ-চেতনার দৃষ্টিতে তিনি 'মাতা সনকা' নন,—'সনকা সতী'। পতিপরায়ণতার আদর্শরূপে নারীর যে পরিচয় এদেশে ঘোষিত হয়েছে, তার অনেকখানিই পুরুষ-প্রধান সমাজ-ধর্মের ধাত্রীরূপে। এই কারণে, মধ্যযুগের 'মঙ্গল' ও অনুবাদ কাব্যেই নয়,—লোক-কাব্যেও সতীত্বের এমন উচ্ছ্বসিত জয়গীতি। আর, অনেকটা এই কারণেই নারীর সতীত্ব ধর্ম সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনা অতি-মাত্রায় ছিল স্পর্শকাতর।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের বিনষ্টির ফলে এই স্পর্শ-কাতরতা একদিকে নৈতিক অসংযম এবং অন্যদিকে নীতিহীনজনের শঙ্কাতুরতার মধ্যে গ্লানিকর এক সংকীর্ণ রূপ ধারণ করে। ইতিপূর্বের ইতিহাস আলোচনায় দেখেছি, মোগল শাসন-সংস্কার বাংলাদেশে ব্যসনাসক্তি এবং আনুষঙ্গিক নীতি-শৈথিল্যকে উন্মুক্ত করেছিল। একেবারে প্রথম পর্বের ইংরেজ

সংসর্গের কালে নগর-বাংলায় এই দুর্নৈতিকতা প্রবলতম হয়েছিল। যথা-স্থানে সে কথা বলেছি। সে কালে সপরিবারে বাস্তুত্যাগ নিন্দনীয় ছিল। ফলে, প্রতি নগরেই প্রকাশ্যে দুর্নৈতিকতা ও ব্যভিচারের যে বীভৎসরূপ চালু ছিল, 'রামতনু-লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী তার সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে আদালতের আমলা মুক্তিয়ার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে বলিতেন,—'ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ি করিয়া দিয়াছেন।' রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ি করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই? দেশের সর্বত্রই এ সম্বন্ধে নীতির অবস্থা শোচনীয় ছিল।" —নৈতিক গ্লানির কথা আলোচনা করে চিত্তভারই ঘনতর হবে। শুধু এ-টুকু বলে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রামে কিংবা সহরে স্বামিদেবতাদের দ্বারা নিগৃহীতা পুরাবাসিনীদের মধ্যেও নৈতিক বিশুদ্ধি খুব সুলভ ছিল না। তাই, দেশের নৈতিক জীবন যত শিথিল হয়েছে, পুরুষপ্রধান সমাজের ক্ষমতাধিকার রক্ষার প্রয়োজনে নারীর নৈতিক বিশুদ্ধির প্রতি শঙ্কাতুর আগ্রহ মানবিক সহৃদয়তার মাত্রাকে ততই করেছে অতিক্রম। বিধবার পুনর্বিবাহ-নিরোধ এবং বিশেষভাবে সতীদাহ প্রথা সেই হৃদয়হীন পুরুষ-প্রাধান্যের চরম পরিচয়।

এবং মানবিক সহৃদয়তা

বিদ্রোহী রামমোহনের প্রথম বিপ্লবী কুঠারাঘাত এই বর্বরতার বিরুদ্ধে। সতীদাহ,—অর্থাৎ মৃতপতির সংগে বিধবা পত্নীকে অগ্নিদগ্ধ করে মারার প্রথা এদেশে সুপ্রাচীন। সম্রাট্ আকবর একবার এই প্রথা নিরোধের চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। তবু, "১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠির সমক্ষেই রামচাঁদ পণ্ডিত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা" ইংরেজ পদকর্তাদের সামনেই সহমৃতা হয়েছিলেন; ইংরেজ কর্মাধ্যক্ষের পত্নী চেষ্টা করেও তা নিবারণ করতে পারেন নি,—এমন প্রমাণ আছে।[১]

সমাজ বিপ্লবী রামমোহনের বিপ্লবাঘাত

ঐ সময় থেকেই প্রধানতঃ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় সতীদাহের বিরুদ্ধে এক-আধটু আলোড়ন সূচিত হয়। ভারতবর্ষব্যাপী এই দুরাচরণের প্রতিবাদে ক্রমশঃই শিক্ষিত, সহৃদয় দেশি-বিদেশিজনের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে সদর নিজামত আদালতের নির্দেশ মত ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রথার সীমা নিয়ন্ত্রিত করে সরকারি আইন জারি করা হয়। ফলে, বিধবানারীর স্বেচ্ছাকৃত আবেদন ও তার উত্তরে

১। ঐ।

ম্যাজিস্‌ট্রেট্‌-এর লিখিত অনুমতি ছাড়া সতীদাহ আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। রক্ষণশীল হিন্দুদল এই নিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকেন; এমন সময়ে রামমোহন রায় অবতীর্ণ হলেন সতীদাহের প্রবল বিরোধিতায়। তাঁর অনুগামীদের নিয়ে তিনি সরকারকে এই মহৎকর্মের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বাংলাদেশে সামাজিক বিপ্লবের প্রথম আগুন জ্বল্‌ল সতীদাহ নিয়ে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আন্দোলন নবতর শক্তিতে দীপ্ত হয়ে ওঠে আর একটি নির্মম নারীহত্যাকে উপলক্ষ্য করে। সেকালের গবর্ণর জেনারেল লর্ড আম্‌হার্‌স্‌ট্‌-এর পত্নী এ বিষয়ে তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছেন,—

সতীদাহ নিবারণ

"A young man having died of cholera, his widow resolved to mount the funeral pile. The usual preperations were made, and the licences procured from the magistrate. The fire was lighted by nearest relations; when the flame reached her, however she lost courage, and amid volume of smoke and the deafening screams of the mob, tomtom, drums etc, she contrived to slip down unperceived, and gained a neighbouring jungle. At first she was not missed; but when the smoke subsided, it was discovered she was not on the pile. The mob became furious and raided into the jungle to look for the unfortunate young creature, dragged her down to the river, put her into a dingy, and shoved off to the middle of the stream, when they forced her over board and she sank to rise no more."

এই ঘটনার ফলে কেবল এ দেশের প্রগতিবাদীরাই নন, ইংরেজ রাজপুরুষেরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। রামমোহনের দল এবার প্রাণপণে আন্দোলন সুরু করলেন। লর্ড আম্‌হার্‌স্‌ট্‌ সতীদাহ প্রথা আরো নিয়ন্ত্রিত করে দিলেন। অবশেষে, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেন্‌টিঙ্‌ক্‌ এই প্রথা একেবারে রহিত করে দেন।

সতীদাহ নিবারণের ইতিহাস বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। বাংলার বৈপ্লবিক সমাজ-চেতনায় এই প্রথা নিবারণের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতিটুকুই আমরা লক্ষ্য করব। 'সতীদাহের' সমর্থকরা সব সময়েই হিন্দুনারীর নৈতিক বিশুদ্ধির বিষয়ে জোর দিয়েছেন। সে উপলক্ষ্যে পতিহীনা নারীর অস্তিত্বের অসার্থকতা পর্যন্ত তাঁরা ঘোষণা করেছেন অকুণ্ঠিতভাবে। স্মার্তপৌরাণিক হিন্দু-সমাজে নারীর পুরুষ-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন অস্তিত্ব কখনো স্বীকৃত হয় নি।—বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং প্রৌঢ়তে পুত্রের অধীনারূপে নারীর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। এদেশে

গৌরীদান ও বাল্য বিবাহের স্মার্তনীতি, এবং বিধবার অনুষ্ঠেয় জীবনাচরণের নির্দেশ,—সর্বত্রই নারীকে একান্ত পুরুষ-লগ্না করে দেখেছে,—সর্বত্রই সে "ছায়েবানুগতা পতিম্।" অতএব, কায়ারূপী পতির জীবনান্তের সংগে 'ছায়া'রূপিনীও নিঃশেষে দগ্ধ হবে,—এই নৈতিক যুক্তি 'সতীদাহের' পক্ষে উক্ত বা অনুক্তরূপে প্রবল হয়েছিল। এমন অবস্থায় 'সতীদাহ নিবারণে'র ফলে বাংলার পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর পৃথক্ অস্তিত্বের মর্যাদা প্রথম স্বীকৃত হল। বস্তুতঃ এই স্বীকৃতির সচেতন বিকাশের পথ বেয়েই আধুনিক বাঙালি সমাজে ধীরে ধীরে ঘটেছে নারী-ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধান্বিত প্রতিষ্ঠা।

নারীকে উত্তরাধিকার দানের প্রয়াস

'সতীদাহ' নিবারণের সংগে সংগেই রামমোহন রায়ের বৈপ্লবিক প্রয়াস নিরস্ত হল না;—নারীর বৈষয়িক উত্তরাধিকারের দাবিও তিনি জোরের সংগে উপস্থিত করেছিলেন। সে কালে এ ধরণের আইন পাশ করানো সম্ভব হয় নি; কিন্তু, ইংরেজি শিক্ষিত 'নব্যবঙ্গ' সমাজে এই দাবির নৈতিক মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। 'সতীদাহ' নিবারণ দ্বারা নারীর পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। আর, এই নূতন দাবির জোরে নারীর পক্ষে অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জীবনযাপনের অধিকারও শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। ব্যক্তি-নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা এখানেই প্রথম হল সূচিহ্নিত।

৩। বিদ্যাসাগর ঃ রেনেসাঁসের প্রাণ-শিল্পী

এর পরে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,—বিধবার পুনর্বিবাহের দাবি নিয়ে। অনেক সংগ্রামের পরে তিনি জয়ী হলেন,—বিধবা বিবাহ কেবল আইনেই নয়,—ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সুসিদ্ধ হল। সে ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'সতীদাহ' নিবারণের মধ্যে নারীর পৃথক্ অস্তিত্বের যে স্বীকৃতি সূচিত এবং নারীজাতির বৈষয়িক স্বাধীনতা কামনার মধ্যে তার স্বাতন্ত্র্যের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল—'বিধবা বিবাহ' প্রথার সিদ্ধিতে তারই পরিণত সামাজিক ফলশ্রুতি দেখা দিল।—এবারে নৈতিক স্বীকৃতি পেল নারীর স্বয়ং-স্বতন্ত্র জীবন উপভোগের অধিকার। পুরুষপ্রধান সমাজে নারী-সত্তাকে একান্তরূপে পুরুষ-সাপেক্ষ করে তোলার প্রথম উৎকট চেষ্টা দেখা যায় সতীদাহ প্রবর্তনে। এই প্রয়াসের দ্বিতীয় অভিব্যক্তি বিধবামাত্রেরই জীবন-উপভোগের অধিকার-নিরোধে। বিপত্নীকের জীবন-সম্ভোগে আমাদের সমাজে কোনো বাধা নেই; কিন্তু, বিধবামাত্রেরই পক্ষে ব্রহ্মচর্যের নামে প্রবৃত্তি নিরোধ বাধ্যতামূলক। এই বাধ্যতামূলক

বিধবা বিবাহ

পুরুষ-সাপেক্ষতা থেকে নারীর জীবন-সম্ভোগের স্বতন্ত্র অধিকার নৈতিক মর্যাদা পেল বিধবা-বিবাহের মধ্য দিয়ে।

আলোচ্য যুগের বাংলার সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসে নারী-ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ ঘটেছে স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ইংরেজ মিশনারিদের চেষ্টায় একটি-দুটি বালিকা-বিদ্যালয় এখানে-ওখানে গড়ে উঠছিল। রাজা রাধাকান্ত দেবও এ-বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। বিশেষ করে ১৮৪৯ খৃীষ্টাব্দে 'বেথুনস্কুল' স্থাপনের সংগে সংগে এই প্রয়াস সারা বাংলায় ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত সাধনার ফলেই বাংলার গভীর মফঃস্বলেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার জনপ্রিয়তা লাভ করে। সরকারি সহযোগিতায়, অথবা নিছক জনসাধারণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই প্রয়াস গোটা উনিশ শতকব্যাপি প্রসারিত হয়েছে।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন

পুরুষের পক্ষ থেকে নারীকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছে সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন চেষ্টার মধ্যে। কিন্তু, পরের হাত থেকে অধিকার পেলেই 'অধিকারী' হয়ে ওঠা চলে না, অধিকার রক্ষার ক্ষমতাও অর্জন করতে হয়। নারীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবার জন্য পরের স্বীকৃতি যথেষ্ট ছিল না, তার ব্যক্তিগত মানস-প্রস্তুতিও ছিল একান্ত অপরিহার্য। তার জন্যই নারী-শিক্ষার আয়োজন।

নারী-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য-কামনা

অতএব দেখ্‌ছি,—উনিশ শতকের ডিরোজিও-রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে,—প্রধানতঃ তা সমাজ-কেন্দ্রিক। প্রথমযুগের ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রেরণা যেটুকু ছিল, তার থেকে বাঙালি শিক্ষিতজন আহরণ করেছে আত্ম-মর্যাদা, স্বাভিমান,—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উগ্র মূল্যবোধ। মানুষের সর্ব-স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিই এ-যুগে মানব ধর্মের (humanism) সাধনা বলে একান্তভাবে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের এখানে কেবল সুরু, ব্যক্তি-মানুষের স্বতন্ত্র মূল্যায়নের শেষে এ-যুগের বাঙালিমানস নূতন গোষ্ঠি-জীবন গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সক্রিয় হয়েছে। আত্ম-সচেতন, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে প্রখর এই জনগোষ্ঠী নিজেদের একত্রবদ্ধ করেছে নূতন জাতিবোধের মধ্যে। বঙ্কিম-পূর্ব উনিশ শতকের বাঙালি জাতীয়তার ইতিহাসে রাজনৈতিক মনোভাবের প্রভাব এই পর্যন্তই। এ ছাড়া, মধ্য-

উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁস সমাজকেন্দ্রিক

যুগীয় বাঙালি সমাজের ভাঙা বনিয়াদ ধূলিসাৎ করেই আসলে জন্ম নিয়েছে নূতন বাঙালিজাতি।

আত্ম-সচেতন, ব্যক্তিমানবের প্রতি প্রখর শ্রদ্ধান্বিত ইংরেজি শিক্ষিত এই বাঙালি নাগরিক দল, ব্যক্তি-মর্যাদার অভাব যেখানেই দেখেছে,—সেখানেই হয়েছে সংগ্রাম-দীপ্ত। বাংলার সমকালীন জীবন-ব্যবস্থায় নারীত্বের ব্যক্তি-মূল্য সর্বাধিক নির্যাতিত ছিল। হয়ত এই কারণেই সেদিনকার জাগ্রত বাঙালি-চেতনা তার বিমুক্তি সাধনায় একান্ত ব্রতী হয়েছিল। অনেকটা এই কারণে বৈপ্লবিক চেষ্টা রাজনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে এড়িয়ে প্রধানতঃ সামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছে। ফলে, আবার বিপ্লবোত্তর নূতন নারীকেন্দ্রিক পরিবার গড়ে উঠেছে,—ত্যাগে, তিতিক্ষায়, আত্মদানে যে নারী আধুনিক সমাজের কল্যাণ-শ্রী-বর্ধিনী,—কল্যাণী। কিন্তু, মনসামঙ্গলের সনকার সংগে কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমরের পার্থক্য যেখানে,—আলোচ্য যুগের ব্যক্তিত্ব-সচেতন (Individualistic) নারীসত্তার সংগে মধ্যযুগীয় 'ছায়া'রূপিণী নারীর সেই পার্থক্য। নূতন বিপ্লবী জীবনের মহাস্রোতস্বিনীতে পুণ্যস্নাত বাংলার নারীধর্ম বাঙালির পরিবার-জীবনের কর্ণ ধারণ করেছে পুনরায়। সকল বিশৃঙ্খলতাকে সুশৃঙ্খল করেছে,—বিক্ষোভের মধ্যে বিতরণ করেছে অনন্ত প্রশান্তি। সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি জাতি এই সৌন্দর্যের প্রতি তদ্গত শ্রদ্ধায় তাকিয়ে ছিল অপলক দৃষ্টিতে। নবজাগ্রত বাঙালি জাতি-ধর্মের এই নবীন বিস্ময়-আকুলতাকে বক্ষে ধারণ করেই নূতন যুগের বাংলা-সাহিত্যের প্রথম আত্মমুক্তি। কেবল এই কারণেই মধুসূদন থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য নারী-স্তোত্র রচনায় মুখর;—পুরুষের অপেক্ষা নারীব্যক্তিত্বের প্রাধান্য এই বিরাট শিল্প-প্রবাহে অতুলনীয়।

লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব,—আলোচ্য সময়ের নাগরিক বাংলায় রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সক্রিয়তা ঘনবদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছিল। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ কালের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঘটনা-পঞ্জীর যে পরিচয় শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে,—তাতেও একাধিক রাজনৈতিক আন্দোলনের উল্লেখ আছে। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-বিপ্লব হিসেবে সিপাহি বিদ্রোহ এবং নীল-বিপ্লবের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু, আমাদের আলোচ্য যুগের শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি জাতির সংগে সিপাহি বিদ্রোহের দেশব্যাপী অগ্নিদাহের কোনো যোগ ছিল না। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিধাহীন ভাষায় এ-সত্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ 'হিন্দু পেট্রিঅট' পত্রিকার পাতায় বারে বারে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 'নীল-বিপ্লবের' মূলে 'রাজা'র জাতির সংগে

সমকালীন বাংলায় রাজনৈতিক উৎক্ষেপের আবেদন-পরোক্ষতা

'প্রজার জাতি'র লড়াই-এর প্রেরণা যতটুকু ছিল, ততটুকু পরিমাণেই তার স্বভাব রাজনৈতিক। তাছাড়া রাজ-শক্তির কড়িকাঠে নিষ্পিষ্ট বাঙালির সামাজিক মনের বিক্ষোভই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'নীলদর্পণ' নাটকেও দেখব, রাজনৈতিক অধিকার-স্বাতন্ত্র্যের সচেতনতার চেয়ে ক্ষেত্রমণির নারীত্বের নির্যাতন এবং গোলোক বসুর সুস্থ-সুন্দর পরিবার-জীবনের ট্রাজেডির মধ্যেই সমগ্র রচনাটির আমূল বিক্ষোভ প্রোথিত হয়ে রয়েছে।

একালের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য সন্ধান করলে দেখব,—রামমোহন রায়ের প্রখর রাষ্ট্র-চেতনা হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুবজনের মধ্যে সার্থক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে নূতন সনদ পেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'টাউন হলে' ইংরেজ ও দেশীয় জনের এক বিরাট সভা হয়। সে সভায় রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের দীর্ঘ বক্তৃতা ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির রাজনৈতিক বুদ্ধিপ্রখরতার প্রথম ঐতিহাসিক প্রমাণ।[১] দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের রাজনৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার-সচেতন আর একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি নাগরিক। এর পরে বাংলাদেশে ইংরেজ এবং বাঙালি ভূম্যধিকারীদের ভূমি-স্বার্থ রক্ষার জন্য ভূম্যধিকারী সভা (১৮৩৭ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩ খ্রীঃ), ন্যাশান্যাল এসোসিয়েশন (১৮৫১), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন (১৮৫১) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালি শিক্ষিত জনের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি ও সচেতনতা ক্রমে সুপরিবদ্ধ, সুচিহ্নিত হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া, সংবাদপত্রের মাধ্যমেও বাঙালির রাজনৈতিক স্বাভিমান-বোধ যে প্রবল হয়ে উঠ্ছিল, সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। কিন্তু, আলোচ্য যুগে এই রাজনৈতিক আত্মভিমান যতই প্রবল হোক্, সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি সাধারণের জীবন-মূলকে তা আলোড়িত করতে পারেনি; এই সত্যটুকু বর্তমান প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। সন্দেহ নেই, গুপ্তকবি তাঁর 'স্বদেশ' কবিতায় স্বদেশের কুকুরের প্রতিও প্রবল মমতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর সুযোগ্য কবি-শিষ্য রঙ্গলাল সিপাহি-বিদ্রোহের সমকালে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮ খ্রীঃ) প্রকাশ করে লিখেছিলেন,—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?"

কিন্তু, এ-সকল কবিতার মধ্যে যা সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে, তা স্বজাতি-প্রীতি ও স্বজাত্যভিমানের উচ্ছ্বাস ও আবেগ ছাড়া কিছু নয়।

১। দ্রষ্টব্য। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত।

—বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালি-স্বভাব এই জাতিত্ব-বোধকে কেন্দ্র করেই আমূল আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাধারণ জাতীয় স্বভাব ছাড়া বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব-বোধের প্রত্যক্ষ প্রেরণা এ সকল কাব্য-কবিতায় দুর্লভ। বস্তুতঃ, 'আনন্দ-মঠ'-এর আগে বাঙালির রাজনৈতিক আকুতি বাংলা সাহিত্যের স্বভাব-গত হয়ে ওঠেনি; কেবল হেমচন্দ্রের দু-একটি কবিতায় তার জন্য আক্ষেপ আছে মাত্র। এই কারণেই 'আনন্দ মঠ' বাংলার প্রথম রাজনীতি-সমাশ্রিত সার্থক সাহিত্য-কর্ম। কিন্তু, 'আনন্দ মঠে'র শিল্পীর ধ্যানও কল্পনা-সন্নিবিষ্ট। —হিমালয়ের অগম্য গহন-লোক তাঁর প্রেরণার উৎস। বাঙালির জীবন-ভূমিতে রাজনৈতিক বিপ্লব-তাড়না স্বভাব-নিবন্ধ হতে আরো সময় লেগেছে,—বিশ শতকের সমাধুনিক যুগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে রাজ-নৈতিক স্বভাব সুপ্রকট হতে পারে নি,—এই তথ্যটুকু বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।

বাঙালি স্বাজাত্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বুদ্ধি-তাড়িত নয়

আলোচ্য পর্যায়ে বাঙালির রাজনৈতিক স্বভাবের এই দীর্ঘ আলো-চনার কারণ আছে। আমাদের ধারণা, বাংলা-সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্ভব ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্য-দর্শন সাধনার প্রত্যক্ষ পথ বেয়ে;—আর, এই কারণেই আলোচ্য কালের বাংলা সাহিত্য প্রতীচ্য ভাবপুষ্ট হয়ে আছে। আরো মনে করা হয়ে থাকে, এই 'সাহেবিয়ানা'র প্রবর্তন করেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পথিকৃৎ হয়েছিলেন 'খাঁটি সাহেব' মধুসূদন। উনিশ শতকের বাংলার জীবন-বিপ্লব সম্বন্ধে এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান প্রণোদনা তার রাজনৈতিক অন্তঃ-স্বভাবে। উনিশ শতকে যে ভাষা-সাহিত্য পাঠের ফলে বাঙালি রেনেসাঁসের জাগরণ ঘটেছিল,—ফরাসি বিপ্লবের স্বভাব-পুষ্ট সে সাহিত্য অন্তরে-বাহিরে ছিল রাজনৈতিক মুক্তির অভিমুখী। কিন্তু, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে এ-যুগের বাঙালি যে মুক্তি পেল, সে তার আপন মতে ও পথে। য়ুরোপীয় সান্নিধ্য বাঙালিকে দিয়েছিল স্বাভি-মান ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ। আর দিয়েছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় জাতিত্ব গঠনের প্রেরণা। আসলে, এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও মানবতাবোধ আধুনিক জীবন-ধর্মের মৌল ভিত্তি। এইটুকুকে আয়ত্ত করে বাঙালির গোষ্ঠি-জীবনার্তি মুক্তি পেয়েছে আপন ঐতিহ্যের অনুসরণে। সে পথে পরিবারানুক বাঙালি সমাজের ধ্বংস-স্তূপের 'পরে সমুত্থিত হয়েছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-সচেতন পরিবার-কেন্দ্রিক নব-বাঙালি জাতিত্ববোধ। প্রথম যুগের আত্মলীন নারীত্ব আত্মসচেতনার সমৃদ্ধি নিয়ে নূতন জীবন্মুক্তির

সামাজিক গোষ্ঠি-চেতনার রাজনৈতিক অভিধা

পথকে করেছে অবারিত। আর, জাতিত্ব-সচেতন সামাজিক বাঙালি জীবনের সেই মুক্তিপথ বেয়েই এসেছে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতারও মুক্তি।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি

একেবারে সুরুতে বলেছি, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার মুক্তিকে আশ্রয় করেই বাঙালি মনোধর্মে যৌবন-লক্ষণ অভিব্যক্ত হতে আরম্ভ করেছে। খুব মোটা হিসেবে সেই লক্ষণ-কয়টির মৌল উপাদান হচ্ছেঃ—(১) মানুষ ও মনুষ্যত্বের শক্তির প্রতি অবিচল বিশ্বাস, (২) নিজের এবং অন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তির অন্তর-নিবদ্ধ মনুষ্য-শক্তির প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা, তথা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সচেতন মর্যাদা-বোধ, (৩) সকল রকমের সংস্কারগত পূর্ব-ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, এবং (৪) জীবন-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি-প্রধান বিচার-তীক্ষ্ন মানব-হিতকর মান আরোপের চেষ্টা। এক কথায়, আত্মসংবিৎ, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তিই সুস্থ-বলিষ্ঠ যৌবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ব্যক্তি, সমাজ অথবা জাতির ক্ষেত্রে এই লক্ষণ কয়টি সমপরিমাণেই ক্রিয়াশীল। মনে রাখতে হবে, এই ক্রিয়াশীলতার বিভিন্ন পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েই যৌবনের শক্তি সুবিন্যস্ত বিকাশ লাভ করে।

সাহিত্যে যৌবন-লক্ষণ

এ দিক্ থেকে, প্রথম-যৌবন স্বভাবতঃই উচ্ছ্বাস-উদ্বেল, আবেগ-আতিশয্যে কম্পিত। তার কারণও আছে। শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের নানা ধাপকে অতিক্রম করে তবেই যৌবনের প্রথম প্রকাশ। মানুষের কথাই যদি বলি, যৌবন-পূর্ব বিভিন্ন পর্যায়ে সে নিজের সম্বন্ধে অনবহিত,—সংশয়াচ্ছন্ন। নিজের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত শক্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চয় অবধানতা নেই বলেই শিশু, বালক এবং কিশোর পরমুখাপেক্ষী; বারে বারেই অপরকে জিজ্ঞাসা করে তার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হয়, অন্যের নির্দেশ নিয়ে তবেই করতে হয় কর্তব্য স্থির। কিন্তু, শৈশব-বাল্য-কৈশোরের বিচিত্র-পরিণত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-চিন্তার পথ বেয়ে সমুদ্ভিন্ন যৌবনে মানুষ হঠাৎ নিজের মধ্যে নিজের নিঃশেষ অধিকারের উৎস খুঁজে পায়; নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয় যেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতই সেই

উচ্ছ্বাস উদ্বেল প্রথম যৌবন

হঠাৎ আত্ম-আবিষ্কারের আবেগ দুর্মদ এবং দুর্দম; অকারণ-অবারণ আবেগে উদ্ধত সে যৌবন বেহিসাবের মুক্তিপথেই নিজেকে উজাড় করে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের বাংলা সাহিত্যে যৌবন-ধর্মের প্রকাশ বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই 'বিজয়-বসন্ত' সেই 'গোলে বকাওলি', সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! 'বঙ্গ-দর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদ্-উন্নত ধ্বনির্।" এবং মুসলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্য-কাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"১

কিন্তু, এ-টুকু ত বিকশিত যৌবনের সংবাদ। এখানে শক্তির অবারিত উৎসারের আবেগ যেমন রয়েছে,—তেমনি আছে সুশৃঙ্খল, পরিকল্পনা-বিচিত্রতা ও প্রাচুর্যের সমাবেশ। মনন এবং শৃঙ্খলার এই সু-সমতাই যৌবনের শক্তিকে সৌন্দর্য-পরিণতি দান করে। কিন্তু, জন্ম-মুহূর্তে যৌবন-শক্তি আবেগমাত্র-সর্বস্ব উচ্ছ্বাসে হয় পরিস্ফীত। যৌবনের অবারিত শক্তির উৎস নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ, তার আকার-প্রকার স্বভাব সম্বন্ধে কোনো কিছুই স্পষ্ট করে জানা যায় নি। এমন অবস্থায়, 'নাম-না-জানা', 'একটা-কিছু' হঠাৎ-পাওয়ার মূক-বিস্ময় ক্রমে ভাষা-হীন আবেগ ও ধীরতাহীন আনন্দে যৌবনের জন্ম-লগ্নকে আপ্লুত করে। প্রথম যৌবন যেমন উদ্দাম, তেমনি উচ্ছল চঞ্চল!

চাঞ্চল্য অবশ্য কৈশোরেরই মৌল স্বভাব। অস্ফুট-অপূর্ণ জানার রহস্যময়তাই কিশোর-চেতনাকে কৌতূহলে চঞ্চল করে তোলে। নিজের ভিতরের শক্তি-রহস্যকে জেনেও জানা যাচ্ছে না, পেতে গিয়েও পাওয়ায় বাধা ঘট্‌ছে; তারই ফলে কৌতূহলী অগ্রসরণ চলে এক পদে,—আর এক পদে সশংক পশ্চাৎ অপসরণ। কৈশোর চাঞ্চল্যের উৎস এই মনোভাবের মধ্যে। আর, যৌবনের প্রথম সমাগম কৈশোর-কৌতূহলের ভিত্তির 'পরে!—কিশোরের কৌতূহলী জিজ্ঞাসার মুখেই অকস্মাৎ খসে পড়ে যৌবনের প্রেক্ষাবরণ! হঠাৎ উন্মোচিত শক্তিধারার কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস কৈশোরের চাঞ্চল্যকে আরো ছুটিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলে; যতক্ষণ না সুস্থ মনন এবং সুশৃঙ্খল যুক্তি-

বয়ঃসন্ধি লক্ষণ

১। আধুনিক সাহিত্য।

চিন্তার আধারে অবয়ব গ্রহণ করে দুরন্ত যৌবন। একেবারে ঊষালগ্নে কৈশোর-যৌবনের এই 'হর-গৌরীত্বে'র স্বভাবকেই বলি বয়ঃসন্ধি। কিশোরের অপরিণত বে-হিসাব রয়েছে, অথচ আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-প্রত্যয় হয়েছে দৃঢ় সুনিশ্চিত;—অদম্য যৌবনের মুক্তিলগ্ন এই সন্ধিধর্ম দ্বারা চিহ্নিত। আধুনিক বাংলা কাব্যে মধুসূদন সেই বয়ঃসন্ধির কবি; বাঙালি-যৌবনের মুক্তি-বিধাতা জীবন-শিল্পী।

বয়ঃসন্ধির আরো একটা দিক্ আছে, মুক্তি-পূর্ব পর্যায়ের প্রস্তুতি সাধনায় তা ব্যস্ত। সন্তান-সম্ভবা জননীর জঠর-যাতনার মতই বয়ঃসন্ধি-চেতনা অন্তঃপীড়ায় ব্যথিত। পূর্ববর্তী পর্যায়ে বিদ্যাসাগরের গদ্য-রচনায় এই বেদনার্তির স্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করে এসেছি। সমাজ-বিপ্লবী বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞা এবং বলিষ্ঠতা পরিণত যৌবনের লক্ষণান্বিত; শিল্পী বিদ্যাসাগরের আবেগার্ত ব্যক্তিত্ব ত্যাগ, সংগ্রাম, অনুকূলতা ও প্রতিকূলতায় বয়ঃসন্ধির উচ্ছ্বাসে স্ফীত। বিদ্যাসাগর-জীবনের অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে

বয়ঃসন্ধি অন্তঃপীড়

এখানে বৃদ্ধ শিক্ষক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বাল-বধূকে দেখে প্রকাশিত আবেগ-অনুভূতির কথাই কেবল উল্লেখ করব। বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে জীবনাবেগ তাঁর ব্যক্তিত্বকে সমুদ্বেল করেছিল, মধুসূদনের ক্ষেত্রে নব-জীবন-জন্মদানের সেই ব্যাকুল আর্তিই ব্যক্তি-জীবন-সীমাকে পরিপ্লুত করে কাব্য-ভূমিতে হয়েছিল আমূল প্রোথিত। ঠিক এই কারণে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বলেছিলাম, বিদ্যা-সাগর ও মধুসূদনের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব সমধর্মান্বিত।

বয়ঃসন্ধি যুগের বাংলার কাব্যের যৌবনোৎসার ঘটেছে মধুসূদনে। কিন্তু, তার কৈশোর-মোক্ষণের প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করি রঙ্গলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাব্যে-প্রবাহে। বস্তুতঃ, কৈশোর-কৌতূহলের অবসানে যৌবন-

বাংলা কাব্যের কৈশোর-মোক্ষণ

ধর্মী আত্ম-প্রত্যয়ের প্রথম নিঃশংকতা রঙ্গলালের মধ্যেই লক্ষ্য করি। আধুনিক বাংলা-কাব্যের যৌবন-ঊষায় তাঁর কবিকৃতি কোকিল-কণ্ঠের মত বসন্ত সমাগমের বার্তাকে আভাসিত করে তুলেছে। এই অর্থে রঙ্গলাল মধুসূদনের পূর্বসূরী এবং সেই মহৎ অধিকার তিনি সচেতনভাবেই দাবি করেছেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী'র—ভূমিকায়ঃ—"...যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্য-কুসুম (পদ্মিনী-উপখ্যান) বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহস পূর্বক বলিতে পারি, পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয় মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দ-দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে, কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য

প্রণয়ন করিয়াছেন; অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে।" নানা দিক্ থেকেই কবির এই দাবি নিরর্থক নয়।

এবং কবি রঙ্গলাল

সন্দেহ নেই, রঙ্গলালের কবি-কর্মে উল্লেখ্য শিল্প-সুষমা প্রচুর নেই। কিন্তু, তাঁর দ্বিধামুক্ত আত্ম-প্রত্যয় ও সহ-জ জীবনবোধ কাব্য-ইতিহাসের অনাগত ভবিষ্যৎকে সুচিহ্নিত করে তুলেছিল। বাঙালি জীবনের নব-সম্ভাবনাকে কবি রঙ্গলাল যথাযথ অনুভব করেছিলেন, আর সেই অনুভূতির আনন্দেই হয়েছিলেন কলকণ্ঠ। সদ্য-অঙ্কুরিত জীবন-ধর্মের দুর্নিবার গতিবেগ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় অবিচল ছিল, কিন্তু সেই জন্মলগ্নের সংগে শিল্পি-মানসের যোগ অব্যবহিত অথবা অচ্ছেদ্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যে যৌবন-শিশুর স্বভাব-আকূতি ভরা আর্ত ভাষাটি রঙ্গলাল আয়ত্ত করে উঠতে পারেন নি, নিজের কলকণ্ঠের আনন্দ দিয়ে কেবল সংবর্ধিত করে গেছেন নূতনের সমাগম-বার্তা। আধুনিক বাংলা কাব্যের জন্ম-মুহূর্তে রঙ্গলাল ছিলেন জ্ঞান-যোগী। রেনেসাঁস-উত্তর বাঙালি জীবন-ধর্মের সত্য রূপ যুক্তি-বিচারের মাধ্যমেই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন,—তাঁর সমগ্র চেতনাকে নিয়ে আমূল ডুবে যেতে পারেন নি তার গহনে। এখানেই মধুসূদনের থেকে কবি রঙ্গলালের স্বভাব-পার্থক্য।

রঙ্গলালের সৃজন-পঞ্জীর ইতিহাস আলোচনা করলে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। "কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে" কবির "প্রগাঢ় আসক্তি" ছিল এবং "ইংলণ্ডীয় কবিতার" "বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনা" করে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে "বাংলা সমাচার পত্রপুঞ্জে" তিনি তা "প্রকটন করেন"।

রঙ্গলালের কবি-কর্মের পূর্ব-সূত্র

'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র 'ভূমিকায়' এই খবর কবি নিজেই দিয়েছেন। তাছাড়া 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র আগে 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' নামে একখানি 'উপকাব্য'ও তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন (১৮৫৮ খৃঃ)। কবি নিজে স্বীকার করেছেন,—"তত্তাবৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা পরিচায়ক নহে।"[১] রঙ্গলালের "ক্ষমতা পরিচায়ক" প্রথম ও বিখ্যাততম কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান'। এই কাব্য-রচনার প্রেরণা এসেছিল শিল্পি-মনের সহজ আকূতি থেকে নয়, জাতিত্ব-সচেতন রঙ্গলালের জ্ঞান-মনীষার উৎস থেকে। কাব্য রচনার একটি কারণ কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন।—বস্তুতঃ, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাঙালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে' কবির যে বক্তব্য ছিল, 'পদ্মিনী উপাখ্যান' যেন তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ (Practical demonstration) রূপে কল্পিত।

১। পদ্মিনী উপাখ্যান—ভূমিকা।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটনের মহত্ত্বের স্মারক 'বীটন-সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সোসাইটি'র এক সভায় হরচন্দ্র দত্ত 'Bengali Poetry' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন;—কৈলাস-চন্দ্র বসু প্রবন্ধ-বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উভয়েরই প্রামাণ্য বিষয় ছিল ইংরেজি কাব্যের তুলনায় বাংলা কাব্য-কবিতার অপকর্ষ নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে স্বাধীন জাতির কাব্যের সংগে পরাধীন জাতির কাব্য-কৃতির তুলনা এসে পড়ে। ইংরেজ জাতি বহু শতাব্দী ধরে স্বাধীন, এই কারণে তাঁদের মানস স্বস্তি প্রচুর। ফলে, কাব্যেও সার্থকতম মানস-বিকাশ সম্ভব হয়েছে। অন্য দিকে বাঙালিরা দীর্ঘ পরাধীনতার মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যে আচ্ছন্ন বলেই উৎকৃষ্ট কবিতা রচনায় অক্ষম হয়েছিল। প্রবন্ধ-রচয়িতা এবং আলোচক দুজনেই এ ধরণের যুক্তির অবতারণা করেন। রঙ্গলাল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনার ধারা লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। অল্পাধিক একমাসের মধ্যে 'বীটন সোসাইটি'র সভায় তিনি এ-বিষয়ের একটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাংলা ভাষার অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রঙ্গলালের প্রত্যয় ছিল গভীর বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সমর্থিত। ইংরেজি কাব্য ও কাব্য-ইতিহাসের বিস্তৃত উদাহরণের ওপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর শ্রদ্ধান্বিত বক্তব্য উপস্থিত করেন 'বাঙালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে'। সেই তথ্যভার-সমৃদ্ধ আলোচনা বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার প্রতি মমতাশীল জনের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। ফলে, প্রবন্ধের সমর্থন-যোগ্য কাব্য-রচনার জন্য রঙ্গলাল নানাদিক থেকে অনুরুদ্ধ হতে থাকেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তারই পরিণতি।

রঙ্গলাল প্রসঙ্গে এই পূর্ব-ইতিহাস আলোচনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত, ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির সাহিত্য-চেতনায়, তখনো দুর্বল আবেগের আচ্ছন্নতা ছিল,—ছিল পরমুখা-পেক্ষিতা ও আত্মমর্যাদা বোধের অভাব। রঙ্গলাল বলিষ্ঠ জ্ঞান-সমৃদ্ধির দ্বারা সেই দুর্বলতা অনায়াসে অতিক্রম করেছিলেন। 'বীটন-সোসাইটি'র প্রথম বক্তৃতায় ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের প্রতি যে বিস্মিত শ্রদ্ধা-বোধ প্রকাশিত হয়েছিল, আপাত-দৃষ্টিতে তাতে কোন অসংগতি নেই। কিন্তু, গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব, প্রথম শ্রেণীর শিল্প-কর্মকে হঠাৎ আবিষ্কারের বিস্ময় আলোচ্য রসিক দুজনকে বিমুগ্ধ-চেতন করেছিল। অপরের ভাল লক্ষ্য করে নিজেও ভাল হয়ে ওঠার চেষ্টা করব,—এখানেই সুস্থ-বলিষ্ঠ মননের লক্ষণ। কিন্তু, রঙ্গলালের 'পূর্বপক্ষ' গণ নিজেদের যথার্থ পরিচয় না জেনেও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনে পরাঙ্‌মুখ হয়ে-ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন উঠেছিল; কিন্তু সেদিনের বক্তাগণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে 'মরমে মরেছিলেন', এমন কথা

কল্পনা করাও বাতুলতা। আগে বলেছি, সমকালীন নাগরিক বাংলায় প্রচলিত ইংরেজি সাহিত্যে ফরাসি বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাণী-সমুজ্জল হয়েছিল। আর তার থেকেই শিক্ষিত বাঙালিরা জাতিত্ব-বোধের একটি আবেগকে মাত্র তখন পর্যন্ত আয়ত্ত করে উঠ্‌তে পেরেছিলেন। আলোচ্য বক্তাদের ক্ষেত্রে তাও ছিল নিতান্ত দুর্বল ও ভরসাহীন। দুর্বল ভাবাবেগ, মূক বিস্ময় এবং অপরিণত জাতি-চেতনার মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি কাব্য-পাঠকের মন যখন দোদুল্যমান, তখনই জ্ঞান-সিদ্ধ কবি রঙ্গলালের আবির্ভাব।

এ পর্যন্ত বারে বারে কবি-রঙ্গলালের জ্ঞান-সিদ্ধির কথা উল্লেখ করেছি —এই প্রসঙ্গে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যায়তনের নিয়মিত শিক্ষা তাঁর যথেষ্ট ছিল না। তাহলেও, কেবল ব্যক্তিগত সাধনায় সে যুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস-জ্ঞান ছিল গভীর এবং প্রখর;—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত ওড়িয়া প্রত্ন-গ্রন্থের পাঠোদ্ধার অনেকাংশে তাঁরই করা। উড়িষ্যায় পাওয়া একাধিক দুষ্পাঠ্য প্রত্নলিপির-ও সার উদ্ধার করেছিলেন তিনিই; উড়িষ্যার ভাষা-সাহিত্যেও তাঁর অধিকার ছিল নিঃসংশয়। ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষা ও রসজ্ঞতায় যে রঙ্গলাল তাঁর যুগের কারো অপেক্ষা পেছনে ছিলেন না, সে কথা একাধিক কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। তা ছাড়া, প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের একজন গুণমুগ্ধ অনুচর ছিলেন,—সংবাদ প্রভাকরের ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখক। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-কবিতার আলোচনায় কবির প্রখর বিচার-বিশ্লেষণ-মুখিতা ও গভীর আত্ম-মর্যাদাবোধের পরিচয় লক্ষ্য করে এসেছি। পণ্ডিত রঙ্গ-লাল গুপ্ত-কবির সেই দুর্লভ প্রতিভার উত্তরাধিকার অনেকটা পরিমাণে অর্জন করেছিলেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জ্ঞান-সম্পদের সংগে আত্মসচেতন বিচার-ধর্ম যুক্ত হয়ে রঙ্গলালের ব্যক্তিত্বকে নিঃসংশয় প্রত্যয় ও যথাযথ ভবিষ্যৎ দর্শনের অধিকারী করেছিল। ফলে, তাঁর জাতিত্ব-বুদ্ধি (Sense of Nation-hood) গুপ্ত-কবির চেয়ে ছিল আরো সুগঠিত ও সুপরিণত। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর উৎস মূলে রঙ্গলাল-ব্যক্তিত্বের উপরি-উক্ত প্রত্যেকটি উপাদান সার্থক সহায়তা করেছে।

জ্ঞান-সিদ্ধ কবি রঙ্গলাল

'পদ্মিনী উপাখ্যানের' সাথর্কতার প্রসঙ্গে প্রথমেই তার বিষয়গত অভিনবতার উল্লেখ করা হয়। ভারতচন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে গতানুগতিক আদি ও লঘু রস চর্চার ক্ষেত্রে রঙ্গলালই প্রথম গভীর ভাবাত্মক ঐতিহাসিক উপাখ্যানের অবতারণা করেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' বিষয়বস্তু টড্‌এর 'রাজস্থান থেকে গৃহীত। কাব্যের ভূমিকায় কবি এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

—"পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়। বিশেষতঃ, ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জন-সমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্য প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কাল মধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালংকারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব, স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।"

ও পদ্মিনী উপাখ্যানের বিষয় চয়ন

স্পষ্টই দেখছি, রঙ্গলালের কাব্য-বিষয়-চয়ন তাঁর বহু-চিন্তার আদর্শ-বুদ্ধির ফল,—এখানে তিনি জ্ঞানযোগী। এই বিষয়-নির্বাচনে কবির উদ্দেশ্যের দুটি দিক্ খুব স্পষ্ট,—(১) ঐতিহ্য-সচেতনতা ও প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা, এবং (২) 'স্বদেশীয় লোকের' মধ্যে সেই গরিমা-বোধের প্রবর্তন কামনা। এখানেই রঙ্গলালের কবি-কর্মের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর অংশ বিশেষ,—প্রধান ভাবে ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য পরবর্তী কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। অনেকটা এই কারণেই তীব্র স্বদেশ-প্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতির কবি হিসেবে রঙ্গলাল বিখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু, পূর্বে একাধিকবার বলে এসেছি, এ যুগের ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির চেতনায় জাতিত্বের প্রতি মমতা-বোধ থাকলেও, যথার্থ রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির স্বয়ং-প্রকাশ ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষে শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধের পীড়াবোধ থেকেই রাজনৈতিক চেতনার ক্রম-অভ্যুত্থান ঘটেছিল। রঙ্গলালের যুগের বাংলা দেশে, কিংবা তাঁর কাব্যেও, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার গ্লানিবোধ প্রত্যক্ষ নয়,—রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব প্রয়োজন দ্বারা নয় স্বত-চিহ্নিত। ইংরেজি সাহিত্যাদি গ্রন্থে পড়া রাজনৈতিক ভাবোদ্বেলতা এ-দেশের বাঙালি-চিত্তে

পদ্মিনী উপাখ্যানে স্বদেশপ্রীতি বনাম রাজনৈতিক চেতনা

স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানের একটি আবেগ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এর পরিণামকে আমরা জাতিত্ব-সচেতনতা নামে চিহ্নিত করেছি। এই নিষ্ক্রিয় আবেগ-অভিমান সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি সাধারণকে উচ্ছ্বাস-প্রবণ করেছিল,—জাতিত্ব-প্রীতির সেই উচ্ছ্বাসটুকুই রঙ্গলালের কাব্যে স্বদেশ-প্রীতিরও উৎস। তাতে শিল্পীর ব্যক্তিত্বময় উপলব্ধি উল্লেখ্য তীব্রতা অর্জন করেনি। পূর্ব-কথিত কাব্যাংশেঃ—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" ইত্যাদি ইংরেজ কবি মুর-এর কবিতার বিশ্বস্ত হলেও দুর্বল ভাবানুবাদ। মুর-এর আবেগ-গম্ভীরতা রঙ্গলালের কবি-ব্যক্তিত্বে কোনো পৃথক্-তীব্র শক্তি সঞ্চার করতে পারে নি,—এখানে তিনি ইংরেজ কবির সশ্রদ্ধ অনুকারী মাত্র।

অন্যদিক থেকে পরাধীনতার জ্ঞানও রঙ্গলাল এবং তাঁর সমকালীনদের কাছে ছিল বহু দূরবর্তী। ইংরেজি শিক্ষার সুরু থেকে এদেশের ইতিহাসও ক্রমে শিক্ষিত জনের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূত হয়েছে। আর, তখন থেকেই ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে। এই মনোভাবের সংগঠনে ইংরেজ রাষ্ট্র-কর্তা এবং মিশনারি-দের দানও কম নয়। একেবারে পলাশির যুগ থেকেই দেশীয় ইংরেজ সমাজ মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক-ব্যবধান জাগিয়ে তোলার সচেতন চেষ্টা করে এসেছেন। ফলে, আমাদের আলোচ্য পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিকের জাতি-চেতনা হিন্দু-জাতিত্ব বোধের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রঙ্গলালের যুগ ভারতবর্ষের পরাধীনতার গণনা সুরু করেছে ভারতে মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে; আর, সেই পরাধীনতার গ্লানি মুক্তির আশা রঙ্গলাল ও তাঁর যুগ দেখতে পেয়েছে নূতন ইংরেজ অধিকার প্রবর্তনের মধ্যে। পদ্মিনী উপাখ্যানের শেষে কবি লিখেছেনঃ—

"ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ বিভাবরী ভোর,
ঘুম ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপা বলে মানস উদয়াচলে,
জ্ঞান ভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী মাঝে, সুখ সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময় ! বিদ্রোহ বারিদ চয়,
আর যেন বিষ না বরিষে ॥"

শাসক জাতির প্রতি এ-টুকু কবি রঙ্গলালের নিছক স্তোক বাক্য নয়; —ঐটুকুই তাঁর কবি-চেতনার নিভৃত প্রবল আকাঙ্ক্ষা। মনে রাখতে হবে,

'পদ্মিনী উপাখ্যানের' প্রকাশ কাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। দীর্ঘ এক বছর ধরে সিপাহি "বিদ্রোহ বারিদ চয়" তখনো সারা ভারতবর্ষ আলোড়িত করে চলেছি। রঙ্গলালের পক্ষে, কেবল রঙ্গলালেরই নয়;—তাঁর সমকালীন শিক্ষিত বাংলার চোখে এই ইংরেজ-বিরোধিতা 'জ্ঞানাভানু প্রভার' অভাব, তথা, নিছক অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতারই ফল। মনে রাখতে হবে, রঙ্গলাল নয়, দুর্ধর্ষ হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট্'-এ এই বিশ্বাসকেই প্রবলভাবে লালন করেছেন, তীব্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন দিনের পর দিন।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কিংবা রঙ্গলালের অন্যান্য কাব্য-কবিতায় রাষ্ট্রীয় সচেতনতার প্রত্যক্ষ পরিচয় সুপরিণত নয়; কিন্তু তার জাতিত্ব-বোধ স্পষ্ট এবং সুচিহ্নিত। বস্তুত এখানেই রঙ্গলাল বাংলা সাহিত্যের আবেগধর্মী Neoclassicism-এর উদ্গাতা। রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত কাব্য-যুগকে বাংলা সাহিত্যে 'মহাকাব্যের যুগ' নামে অভিহিত করা হয়। আর, সব রকম সার্থক মহাকাব্যেরই উৎস সুস্পষ্ট গোষ্ঠি-জীবন-ধর্মের তীব্র

রঙ্গলাল ও বাঙালির মহাকাব্য

সংসক্তিতে। রামমোহন রায়ের কাল থেকে সুরু করে হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী' পর্যন্ত নাগরিক বাংলার ইতিহাসে আত্ম-চেতনা ও ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতাময় একটি গোষ্ঠি-জীবনের আকৃতি ক্রমেই সুপরিবদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছিল। স্বাভিমান এবং স্বজন-প্রীতি-প্রবল এই জীবনাকৃতিকে আমরা জাতিত্ব-বোধ নামে অভিহিত করেছি। আবার, এই জাতিত্ব-বোধের পিনদ্ধতম শক্তিই বাংলা মহাকাব্য-রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। মধুসূদন 'তিলোত্তমা সম্ভব' রচনা করে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,—

"I began the poem in a joke, and I have actually done something that ought to give our national poetry a good lift, ..."

নাটক রচনা প্রসঙ্গেও তিনি বারে বারে আমাদের 'National Theatre'-এর কথা উল্লেখ করেছেন, এই তীব্র Nation-সচেতনতাকেই আমরা জাতিত্ববোধ নামে অভিহিত করছি,—বাংলা মহাকাব্যের জন্ম এই ভাবাকৃতির উৎস মূলে।

নাগরিক বাঙালির চেতনায় দীর্ঘদিন ধরে এই স্বাভিমান ও স্বদেশ-প্রীতিময় জাতিত্ব-বোধ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়ে আস্‌ছিল। রঙ্গলাল তাঁর কাব্য-বিষয়-চয়নে সেই মমতাবোধকেই ক্রম-সক্রিয় সাহিত্যিক প্রকাশ দান করলেন। পুরাণের গালগল্প নয়, মধ্যযুগীয় আদিরসাত্মক দেবকাহিনী নয়,—জাতীয় মর্যাদা এবং স্বাজাত্যাভিমানের ধারক ও পোষক একটি বলিষ্ঠ ঐতিহ্যকে রঙ্গলাল উপহার দিলেন তাঁর স্ব-'জাতি' পাঠকের কাছে।

ভরসা করলেন,—"স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন" হবে।

এই নূতন কাহিনীর উপস্থাপনা বিষয়েও রঙ্গলাল সমকালীন নাগরিক বাঙালির নিভৃত জীবন-মূল্যবোধেরই অনুবর্তন করছেন,—সচেতনভাবে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর মহাকাব্যিক সার্থকতা বিচারে এই রচনার শূরধর্মের (Heroic Spirit) অভাব বিষয়ে অনুযোগ করা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এ অভিযোগ আলোচ্য যুগের সব কয়টি বাংলা 'মহাকাব্যে'র প্রতিই প্রযুক্ত হয়ে আস্‌ছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ'-এ বীররসের হুঙ্কার করুণ রসে প্লাবিত হয়েছে, হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'—বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড়ের শৌর্যকে শিথিল করেছে শচী-ইন্দুবালার নারীধর্মী দুর্বলতা। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যে অসংযত আবেগ-উচ্ছ্বাস মহাকাব্যের উদাত্ততাকে ডুবিয়ে দিয়েছে দুর্বল গীতিধর্মের অতলে,—এ-সব নালিশ আজ আমাদের মজ্জাগত। কিন্তু, এই ধরণের কাব্য-বিচারে আলংকারিক অতি-সচেতনতা ঐতিহাসিক রস-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে বলে মনে হয়। আগে বলেছি, মহাকাব্যের মৌল-প্রেরণা উৎসারিত হয়ে থাকে, পিনদ্ধতম গোষ্ঠি-জীবন-বোধের উৎস থেকে। বস্তুতঃ, সেই বিশেষ জীবন-ধর্মের নিরুপম মহিমা-বোধের ফলেই একটি মানব-সমষ্টিকে অনুরূপ গোষ্ঠি-বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব হয়। অতএব, গোষ্ঠি-জীবনের উদাত্ত-বলিষ্ঠ মহিমা-কীর্তনই মহাকাব্য-কলার অন্তস্বভাবকে পরিচালিত করে থাকে। মহাকাব্যে জীবন-প্রেরণার এই বৈশিষ্ট্যই প্রাচ্য আলংকারিকের দৃষ্টিতে "ধীরোদাত্ত গুণান্বিত" হয়ে দেখা দিয়েছে, প্রতীচ্য আলংকারিকের ভাষায় এই জীবন-প্রেরণারই নাম "শূরধর্ম" (Heroic Spirit)।

পদ্মিনী উপাখ্যানে বাঙালির গোষ্ঠি-চেতনা

কিন্তু, জীবনের মূলীভূত সেই মহিমাবোধের স্বভাব দেশ-কালে পৃথক্ হয়ে থাকে। ফলে, 'ধীরোদাত্ত-শূরত্বের' স্বভাবও হয় পৃথক্। হোমারের মহাকাব্যে যুদ্ধ বর্ণনার ছড়াছড়ির মধ্যে শূর-ধর্মের প্রকাশ ঘটেছিল। অথচ, মিল্‌টন একটির বেশি যুদ্ধ বর্ণনা করবেন না বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন,—মধুসূদনও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। মহাকাব্যের অন্তঃস্বভাব বিচারে 'এহ-বাহ্য।' আসলে গ্রীকযুগের জীবন-মহিমা-বোধের থেকে মিল্‌টনের জীবন-মূল্যবোধ ছিল বহুল পৃথক। আর মিল্‌টন ও মধুসূদনের জীবন-বোধের পার্থক্যও প্রায় আমূল। সংস্কৃত মহাকাব্য-স্বভাবের সংগে উনিশ শতকের বাংলা মহাকাব্য-প্রেরণার তুলনাও একই কারণে অ-সিদ্ধ। অথচ, হোমার-বাল্মীকি, কিম্বা মিল্‌টন-কালিদাসের কাব্যকলার মানদণ্ডে রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত মহাকবির মূল্যায়নে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। শিল্প সৃষ্টির জগতে

আলংকারিক কোনো বিচার-মানই দেশকালের অতীত একান্ত (Absolute) সত্য হয়ে উঠতে পারে না। শিল্পধর্মের মত অলংকার-শাস্ত্রের স্বভাবও বিবর্তনশীল,—একথা আমরা ভুলেছি। এখানেই নিহিত আছে ইতিহাসের এক আশ্চর্য কৌতুক,—এর নিরসরণের জন্য চাই আলোচ্য যুগ-জীবনাশ্রিত মূল্যবোধের উপযোগী নূতন কাব্য-বিচারমান।

এ পর্যন্ত অনুসৃত জীবন-ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি,—উনিশ শতকের প্রথমাবধি ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাংলায় এক নূতন মূল্যবোধ ক্রমেই দানা বেঁধে উঠ্ছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই সমষ্টিগত মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছি 'স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-সচেতন পরিবার-কেন্দ্রিক নব বাঙালি জাতিত্ব' বলে। এ-পর্যন্ত 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র আলোচনায় রঙ্গলালের 'জাতিত্ব-সচেতনতা'র পরিচয় বিবৃত করেছি। কিন্তু, গভীর-ভাবে লক্ষ্য করে দেখব, কবি হিসাবে রঙ্গলালও ছিলেন তাঁর সমকালীন নাগরিক বাংলার মতই পারিবারিক জীবনাদর্শের মহিমাবোধে আপ্লুত চেতন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র গোটা কাব্য-কাহিনীতে পদ্মিনীর রোমান্টিক প্রণয়, তাঁর সতীত্বের মহৎ আদর্শ,—নারী-ব্যক্তিত্বের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ও কল্পনাতীত দুঃসাহস; সর্বোপরি পারিবারিক জীবনাদর্শের বেদীমূলে তাঁর মহত্তম আত্মদান উজ্জ্বল আবেগময় বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়েছে। সে তুলনায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে বীর্যদীপ্ত সংগ্রাম-চিত্রণের যে বৃহৎ সম্ভাবনা ছিল, রঙ্গলাল যেন ইচ্ছা করেই তা নষ্ট করেছেন। অতএব, রঙ্গলালের কাব্যে যুদ্ধকথা,—শৌর্যগাথা দুর্বল হয়েছে বলে অনুশোচনা করা বৃথা;—এ-যেন আম গাছে কাঁঠাল না ফলাতে পারার দুঃখ। মনে রাখতে হবে, রঙ্গলালের যুগজীবনের পরিভাষার আদর্শে 'শূরত্ব' এবং সার্থক 'মনুষ্যত্ব' ছিল সমার্থক। আর, আদর্শ-মনুষ্যত্বের উপাদান বল্‌তে সে যুগের বাংলা দেশ (১) স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, (২) পরিবার-কেন্দ্রিক মমতাময় জীবনবোধ এবং (৩) স্বদেশ ও স্বাভিমান-পুষ্ট সমষ্টি ধর্মী জাতি-চেতনার স্বভাবকেই বুঝেছিল। এই কারণেই পদ্মিনী উপাখ্যানে নিষ্ঠুর সংগ্রাম অপেক্ষা মমতাময় প্রণয়-চিত্র দীপ্ততর; এই কারণেই আলাউদ্দিনের চিতোর-ধ্বংস অপেক্ষা ভীমসিংহ-উদ্ধার কাহিনী প্রাণ-সমুজ্জ্বল; এই জন্যই ভীমসিংহের পুত্রদের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ অপেক্ষা পদ্মিনীর চিতাপ্রবেশ-বর্ণন একাধারে হৃদয়বিদারী ও মহিমাময়। ভীমসিংহের বীর্য নয়, পদ্মিনীর শূরমহিমাই পদ্মিনী উপাখ্যানকে উদাত্ততা দান করেছে। আর, এই উদাত্ত মহিমাবোধের পীঠভূমি চিতোরের রণস্থল নয়,—উনিশ শতকের বয়ঃসন্ধি-সমাকুল আবেগপুষ্ট বাঙালি-মানস। তাই বলছিলাম, আধুনিক বাংলা কাব্যে বয়ঃসন্ধির বার্তাবহ প্রথম কবি রঙ্গলাল।

আবার স্মরণ করি, বাংলা কাব্যে বয়ঃসন্ধির বার্তাবহ-মাত্রই রঙ্গলাল। যে নবীন গোষ্ঠি-জীবনবোধ সমকালীন নাগরিক বাংলার যৌথ চেতনাকে

রঙ্গলাল প্রতিভার ফলশ্রুতি

উন্মথিত করেছিল, জ্ঞান-যোগে তার সম্পূর্ণ খবর তিনি রেখেছিলেন। কিন্তু, সেই জীবন-স্বভাবে আমূল অবগাহন করতে পারেন নি। ফলে, তাঁর কাব্যে নূতন জীবন-বাণীর উপযোগী শিল্পরূপ গড়ে ওঠেনি, —রঙ্গলালের কবি-প্রাণ তাঁর কাব্য-বিষয়কে (Content of Poetry) সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে, সার্থক নূতন কাব্য-রূপকেও (Poetical form) তিনি পারেন নি জন্ম দিতে। স্বাধীনতা-কামী জীবন-বাণী তাঁর কাব্যে পয়ার-ত্রিপদীর বন্ধন-সীমায় যেন মাথা কুটে মরেছে। তাই, অনাগত জীবনের সম্ভাব্য উদাত্ততার বিবৃতিকার (Narrator) রূপেই তাঁর সার্থকতা, সে জীবনের সার্থক বাণীধর তিনি নন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলব, পদ্মিনীর স্বামী উদ্ধারের কাহিনীতে দুর্ধর্ষতার স্বভাবধর্ম যতটুকু ছিল, তার যথাযথ বর্ণনা করেই উপাখ্যান রসোত্তীর্ণতা দাবি করেছে। আর, চরম মুহূর্তে 'পদ্মিনী স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ' বর্ণনার অগ্নি পরীক্ষায় রঙ্গলালের কবি-সিদ্ধি হাস্যকররূপে ব্যর্থ। তথাপি তিনি বুঝেছিলেন,—"—সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎ কবিতা জননার্থে যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য। পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রন্থিত করা বিধেয়,—"[১] সমকালীন নাগরিক বাংলার জীবনমূলে "কাব্যোপযুক্ত বিষয়" সঞ্চিত হয়ে উঠেছে, এ-কথা নিঃসংশয়ে জেনে রঙ্গলাল গদ্য-প্রধান যুগে দুঃসাহসের সংগে কেবল আত্ম-শক্তির 'পরে নির্ভর করেই অনাগত কালের কাব্য-ইতিহাসকে "সৎ কবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান" করে গেছেন। রঙ্গলালের আত্ম-বিশ্বাস এবং নিঃসংশয় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আধুনিক বাংলা কবিতার কৈশোর-দুর্বলতা মোচিত হয়েছে বলে মনে করি। বয়ঃসন্ধির বাংলা কাব্যে তাই তাঁকে কৈশোর-মোক্ষণের কবি বলা যায়।

রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী' প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ'-ও তখন প্রকাশিত হয়েছে। শব্দ-বিন্যাস এবং অলংকার প্রয়োগে কোথাও কোথাও মধুসূদনের প্রতিধ্বনি

রঙ্গলালের কর্মদেবী

কর্মদেবীতে শোনা যায়। কিন্তু, রঙ্গলাল তাঁর কবি-স্বভাবকে সর্বদাই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।—সে বিচারে 'কর্মদেবী' এবং রঙ্গলালের অন্যান্য সকল কবি-কর্মই মধুসূদন-পূর্ব কাব্যকলার লক্ষণান্বিত। 'কর্মদেবীর বিষয়-বস্তুও রাজপুত-

---

১। কর্মদেবী—ভূমিকা।

কাহিনী থেকে নেওয়া; গল্পটিতে নারী-প্রেমের রোমাণ্টিক মাধুর্য এবং নায়িকা নারীর আত্মত্যাগ ও সতীত্ব-মহিমা অধিকতর স্পর্শকাতরতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। যশল্মীরের ভাট্টি জাতীয় প্রদেশ-কর্তার ছেলে সাধু এই কাব্যের নায়ক;—বীরত্ব এবং স্বদেশ-প্রীতি তার ভূষণ। বিদেশী মুসলমান বণিকদের সে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়;—বহির্বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সে ক্ষিপ্ত, কারণ;—

"এরূপ বাণিজ্য ছলে কত জাতি এসে।
করিলেক প্রভুত্বস্থাপন নানা দেশে॥"

তার বক্তব্য,—"স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক্, এই চাই।"

যাই হোক্, সেখান থেকে সাধু ঔরিনট্ নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানকার গোহিল অধিপতি মাণিক দেবের সুন্দরী কন্যা 'কর্মদেবী' তাঁর বীরত্বে বিমুগ্ধ হয়,—সাধুও হয় গোপনে কর্মদেবীর প্রতি আকৃষ্ট। রঙ্গ-ভূমিতে বিজয়ী সাধুকে মালা পাঠিয়ে দেন কর্মদেবী। অবশেষে মানিক দেব কর্মদেবী ও সাধুর বিবাহে সম্মতি দেন। কিন্তু, কর্মদেবী ছিলেন মন্দোরের রাঠোর-রাজ অরণ্যদেবের বাগ্দত্তা। কর্মদেবীর বিবাহের সংবাদ শুনে তিনি সাধুকে সসৈন্যে যুদ্ধে আহবান করেন। সেই যুদ্ধে সাধুর মৃত্যু হয়। শোকার্তা কর্মদেবী নিজের বামবাহু কেটে ভ্রাতার কাছে দিয়ে অনুরোধ করলেন;—'কুলকবিবর' এই 'রত্নমণ্ডিত হস্ত' গ্রহণ করে ঃ—

"সতীত্বের সংগীত আখ্যানে ভাই
গান যেন দাসীর চরিত।"

তারপর ডান হাত কেটে নিয়ে তার শ্বশুরের কাছে পাঠাবার কথা বলে আশা করলেন,—

"জানিবেন এই কথা তিনি ভাই,
বধূ তাঁর সুত-যোগ্য বটে।"

তারপর সাধুর সংগে নির্বাহু কর্মদেবী অনুমৃতা হলেন,—পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন, যেন শ্মশানের

"এই স্থানে সরসী খনন করি,
নাম দেন কর্ম সরোবর।"

স্পষ্টই দেখছি, বীরগাথা অপেক্ষা, নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষা-দীপ্ত রোমাণ্টিক প্রণয়-কথা রচনায় রঙ্গলাল এখানে আরো সাবলীল হয়ে উঠেছেন। সাধুর বীরত্ব-বর্ণনায় স্বদেশ-প্রীতি এবং শৌর্যবোধের পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু, কর্মদেবীর প্রণয়োৎকণ্ঠার সংগে রঙ্গভূমিতে তাঁর ব্রীড়াহীন আত্ম-প্রাশ,—সর্বোপরি প্রশান্ত ধৈর্যময় শুরত্বের মধ্যে জীবন উৎসজন তার নারী-ব্যক্তিত্বকে মহিমা-সমুজ্জ্বল সুষমা দান করেছে। বস্তুতঃ, এই

শৌর্য-ধর্মী নারী-ব্যক্তিত্বের অন্তরালে মহৎ মনুষত্বের পূর্ণাঙ্গতার স্বপ্ন দেখছিল সেদিনকার গোটা নাগরিক বাঙালি জাতি। আর, তারই সহজ সর্বজনীন সুরটি ধারণ করে 'কর্মদেবী' সার্থক সমষ্টি-জীবন-কাব্য হয়ে উঠতে চেয়েছে। এখানে রঙ্গলাল উনিশ শতকের সমাজ-ধর্ম-সচেতন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যই নন,—তাঁর সার্থক উত্তরসূরী। অর্থাৎ, রঙ্গলালের সমাজ-সচেতন জীবন-বোধ গুপ্ত কবির চেয়ে একধাপ প্রাগ্রসর। এই সামাজিক সহানুভূতি একদিকে বাংলার স্বদেশপ্রীতি ও জাতিত্ববোধের স্পর্শকাতরতার সংগে নারীশৌর্যের মহিমাবোধকে সমসূত্রে গেঁথেছে। আর একদিকে সমকালীন দুর্বল বাঙালির সমালোচনায় কবি-দৃষ্টিকে করেছে প্রখর। বাঙালির জাতীয় দৌর্বল্যের বর্ণনায় রঙ্গলালের রোমান্‌টিক্‌ কবিদৃষ্টি প্রায়ই বিদ্রূপাত্মক—(satiristic) হয়ে উঠেছে। জাতি-প্রীতি, আত্মসচেতনতা এবং আত্মসমালোচনা, নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতি মহিমাময় মূল্যবোধ, সব কিছু মিলিয়ে উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালি জীবন-ধর্মের অচ্ছেদ্য অংশীদার হয়ে উঠেছেন রঙ্গলাল। আর, সেখানেই তিনি জাতিত্বধর্মী বাংলা কাব্যের (National Poetry) সচেতন পথিকৃৎ।

শূরসুন্দরী

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য 'শূর সুন্দরী'ও রাজপুত নারীত্বের শৌর্য-গাথা,—গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে আকবরের হিন্দুনারী-লোলুপতাকে কেন্দ্র করে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শূরসুন্দরীর প্রকাশ হয়।

কাঞ্চী কাবেরী

'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯ খ্রীঃ) পূর্বাপর ঐতিহাসিক কাব্যধারার মধ্যে ঈশ্বরানুভূতির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। উড়িষ্যার প্রত্ন-কাহিনীর সংগে কিংবদন্তী-কল্পনার সূত্র যোগ করে এই দেবাশ্রিত মানব-মহিমা-কথার জন্ম। উড়িষ্যারাজ জগন্নাথ-ভক্ত পুরুষোত্তম বিরূপ কাঞ্চীরাজকে জয় করে সে দেশের রাজ-কন্যাকে হস্তগত করেছিলেন। পরে নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে তাঁর সংগে হয়েছিলেন পরিণয়াবদ্ধ,—বিবাহিত এই গল্প নিয়েই 'কাঞ্চী কাবেরী'র জন্ম। এই বিরোধ-মিলন কাহিনীর অধিকাংশ জুড়ে আছে দেব-শক্তি এবং দেব-কৌশলের মহিমা। উড়িষ্যার পক্ষে ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী জগন্নাথ-বলরাম, এবং কাঞ্চীরাজের সহায়ক হয়েছিলেন কৌশলী দেবতা গণপতি।

অন্যান্য রচনা

এ-সকল কাব্য ছাড়া, কালিদাসের 'কুমার সম্ভব'-এর (১৮৭২ খ্রীঃ) কাব্যানুবাদও করেছিলেন রঙ্গলাল।* 'নীতি কুসুমাঞ্জলি'—"এই শিরোনাম যুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল রচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত" হয়েছে। এই ধরণের রচনায় কাব্য-সৌন্দর্য কিছুই নেই, ছন্দের আধারে গদ্য-ধর্মী জ্ঞান-ভাণ্ডারকে

সঞ্চয় করে গেছেন কবি। রঙ্গলালের গদ্যরচনাবলী কিন্তু গভীরতর জ্ঞানসমৃদ্ধ। 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' ছাড়াও, 'শরীর সাধনা বিদ্যার গুণোৎকীর্তন' এই তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান-চর্চার উল্লেখ্য নিদর্শন। তাছাড়া, গুপ্তকবির মত রঙ্গলালের সাংবাদিক দক্ষতাও ছিল যথেষ্ট। 'রসরাজ' নামে একখানি স্বয়ং-পরিচালিত সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন তিনি। 'এডুকেশন গেজেট্' প্রথম প্রকাশিত হলে রেভারেণ্ড ওব্রাএন্ স্মিথ তার সম্পাদক হন,—আর রঙ্গলাল নির্বাচিত হয়েছিলেন সহকারী সম্পাদক।

তাই বলছিলাম, রঙ্গলালের কবিত্বের পেছনে ছিল তাঁর সুস্থির পাণ্ডিত্য। এই কারণেই তাঁর কাব্য রচনায় গভীর ভাবানুভূতির আলোড়ন নেই,—তার বদলে আছে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সুচিন্তিত পদক্ষেপ। রঙ্গলাল উনিশ শতকের নব-উদীয়মান বাঙালি জীবন-ধর্মকে পাণ্ডিত্যের দ্বারা আয়ত্ত করেছিলেন। সেই জ্ঞানমার্গী পরিচয়কে তিনি ছন্দোবদ্ধ করে গেছেন তাঁর নানা কাব্য-কবিতায়। তাই, তিনি আলোচ্য যুগের প্রাণ-চঞ্চল সার্থক কবি নন; স্থিতপ্রাজ্ঞ জীবন-দ্রষ্টা। মধুসূদন রঙ্গলালের দেখা জীবনরূপকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন তাঁর সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে। রঙ্গলালের দেখানো পথ বেয়েই আধুনিক কাব্য-সরস্বতী মধুসূদনের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। মধুসূদন যে জীবন-ধর্মের নির্মাতা, রঙ্গলাল তারই সচেতন পথিকৃৎ, ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

রঙ্গলালের কবি-কর্ম ও সাহিত্য-ইতিহাস

ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "আত্মসচেতনতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভার গুণ ও দোষ দুই-ই।"[১] মধুসূদনের ব্যক্তি-স্বভাবের ঐতিহাসিক লক্ষণ সত্যতর ভাবে ব্যক্ত করা হয়ত অসম্ভব। বর্তমান অধ্যায়ের সূচনায় বলেছি,—প্রথম যৌবনের স্বভাব-লক্ষণ হচ্ছে,—সুনিশ্চয় আত্ম-প্রত্যয়; আত্ম-শক্তির 'পরে অনন্য-সাপেক্ষ অবিচল বিশ্বাস। আর, অনন্য-সাপেক্ষ,—তথা, একান্তভাবে আত্মাপেক্ষী বলেই প্রথম যৌবন অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন। আবার, অতিশয়তা-দুষ্ট বলেই বিশৃঙ্খল বে-হিসেবী প্রথম যৌবন অনেক সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত-ও হয়ে পড়ে। মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের বহিরঙ্গে ছড়িয়ে আছে উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের দিগন্তপ্রসারী ধূমকেতু-লীলা। অন্য দিকে, তাঁর কবি-আত্মার মর্মলোক অবিচল উদ্দেশ্য উদ্‌যাপনের দৃঢ় প্রত্যয়লোকে নিয়ত উদ্ভাসিত হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় দেখব, মধুসূদনের কাব্য-সাধনার আজন্ম প্রেরণা এসেছে এই যৌবনোচ্ছ্বসিত আত্মচেতনা

মধুসূদনের ব্যক্তি-স্বভাব

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।

থেকে, কিন্তু তাঁর কবি-সিদ্ধির অনন্ত উৎস উৎসারিত হয়েছিল কবিমানসের অবচেতনার মর্মমূলে।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়েছিল; পিতা ছিলেন সেকালের কল্‌কাতার সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন আইনজীবি রাজনারায়ণ দত্ত। মধুসূদনের মাতা জাহ্নবী ছিলেন চতুষ্পত্নীক রাজনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী। জন্ম থেকে "ত্রয়োদশ বর্ষ" বয়স পর্যন্ত মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল কপোতাক্ষী-ধৌত পল্লী-জননী সাগরদাঁড়ির স্নেহ-চ্ছায়ায়। রাজনারায়ণ মধুসূদনের সাত বছর বয়সের সময় থেকেই স্থায়িভাবে কল্‌কাতা-প্রবাসী ছিলেন। তখন থেকে কলকাতাবাসী হবার আগে পর্যন্ত মধুসূদনের বাল্য এবং কৈশোর জননী জাহ্নবীর তত্ত্বাবধানে কেটেছিল।

বাল্য-কথা

এই সময়ে পল্লীবাংলার গুরুমশায় ও মৌলবীসাহেব এক সংগে কবি-বালকের শিক্ষা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মাতৃ-স্নেহাকুল মধুসূদনের এই বাল্যজীবন রূপকথার মতই অবিশ্বাস্য যত্ন-বিলাসিতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। "তিনি স্নানার্থে গমন করিলে, একবার ৫। ৭টি চুল্লীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত। প্রত্যাগমন করিয়া যে চুল্লীর অন্ন সর্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ হইত, তিনি তাহাই আহার করিতেন।[১] ভোগের এই অতিমাত্রিকতা পরিণামে মধুসূদনের বহিঃস্বভাবকে বিলাসী এবং উচ্ছৃংখল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল হয়ত। কিন্তু, তাঁর আত্মসচেতন ব্যক্তি-মানস একান্ত নিষ্ঠার সংগে আবাল্য সারস্বত-ব্রত উদ্‌যাপনে ছিল তন্ময়। ব্যবহারিক জীবনের বিলাস-উচ্ছ্বাস তাঁর অন্তরশায়ী কবি-ধর্মকে স্পর্শ করতে পারেনি;—সেখানে মধুসূদনের সারস্বত-চেতনা ধ্যানী-যোগীর মতই ছিল সুস্থির অ-তন্দ্র। কবির জননী এবং পারিবারিকেরা যখন তাঁর সুখ-বিধানের জন্য অতি-তৎপর হয়েছিলেন, তখনও বালক কবি জ্ঞান-তপস্যায় ছিলেন কেন্দ্রিত-চিত্ত।—"তাঁহার সমবয়স্ক, বাটীর অপরাপর বালকেরা, আহার করিতে বসিয়া, আহার্যবস্তুর জন্য যখন চীৎকার ও কোলাহল করিত, মধুসূদন সেই সময়ে শীঘ্র-শীঘ্র কোন-রূপে আহার সম্পন্ন করিয়া, এক-এক দিন হয়ত, অসিদ্ধ ব্যঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া সকলের অগ্রে গিয়া পাঠশালায় বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি হিন্দু-কলেজে, সহাধ্যায়িগণের

১। মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত—যোগীন্দ্রনাথবসু।

মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।"১

সারস্বত সাধনার জন্য এই একাগ্র নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তপস্যার ধর্ম মধুসূদনকে আজীবন উদ্বুদ্ধ করেছিল। হিন্দু কলেজে এই একাগ্রতা ও তপস্যার বলে এক বছরে তিনি একাধিক শ্রেণীর সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে তাঁর মর্যাদা-বুদ্ধি যেমন অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রখর ছিল,—তেমনি তাঁর অতিমাত্রিক আত্ম-প্রত্যয় প্রায় দাম্ভিকতার সীমায় গিয়ে পৌঁচেছিল। হিন্দু কলেজে প্রবেশ করার পরেই যশস্বী কবি হবার আকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। আর, তাঁর মত আত্ম-সচেতন ব্যক্তিত্বের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা মাত্রই ছিল নিশ্চিত প্রত্যয়। অন্ততঃ সতেরো বছর বয়সের সময় থেকে তিনি আচার-আচরণে, ধ্যান-বিশ্বাসে একজন সিদ্ধকাম ভাবী কবির মতই সর্বদা ব্যবহার করতেন। তখন থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল, উৎকৃষ্ট সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষে অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অসংগত যদি নাও হয়, তবু অস্বাভাবিক। বলাবাহুল্য, কবি-বালকের এই অদ্ভুত ধারণা অবিমৃষ্যকারী প্রথম যৌবনের বোহিসেবি খেয়ালেরই ফল। সেদিন থেকে গণিতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন মধুসূদন অঙ্কশাস্ত্রের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের চোখে খেয়াল আর বিশ্বাসের মধ্যে মৌলিক তফাৎ ত কিছু নেই!—"একবার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহপাঠীদিগের সহিত, সেক্‌স্‌পীয়র ও নিউটনের মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মধুসূদন সেক্‌স্‌পীয়রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, 'সেক্‌স্‌পীয়র চেষ্টা করিলে নিউটন্‌ হইতে পারিতেন; কিন্তু নিউটন্‌ চেষ্টা করিলে, কখনও সেক্‌স্‌পীয়র হইতে পারিতেন না। হঠাৎ, একদিন এই কথা সকলের সমক্ষে কার্যতঃ প্রতিপাদন করিয়া তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। অধ্যাপক রীজ (V. L. Rees) ক্লাসে গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে দিলে, যখন কোন ছাত্রই তাহা সমাধান করিতে পারিল না, তখন মধুসূদন খাড়ি হাতে লইয়া বোর্ডে গিয়া প্রণালী-শুদ্ধ রীতি অনুসারে তাহা সমাধান করেন এবং পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষীয় সহপাঠীদগকে লক্ষ্য করিয়া "And so Shakespeare could be Newton, if he tried" —বলিয়া সদম্ভে আসন গ্রহণ করিলেন।"২ "কিন্তু" ঐ দিন ঐ ঘটনার

কবি-কৈশোর

১। ঐ।

২। মধুস্মৃতি; নগেন্দ্রনাথ সোম। দ্রষ্টব্য—জীবন-চরিত।

পরেই বন্ধুদের তিনি বলেছিলেন,—"আমার গণিত শেখা এই পর্যন্তই শেষ।[১]

এই সমগ্র আচরণটির বহিরঙ্গে অতি-প্রত্যয়ান্বিত যৌবন-শক্তির অমিত দম্ভ ছড়িয়ে আছে। সেই সংগে রয়েছে—অ-পরিণামদর্শী প্রথম যৌবনের বোহিসৌবি উচ্ছ্বাস ও দুঃসাহস। ১৭।১৮ বছরের বালকের মনে কবি হবার আকাঙ্ক্ষা এমন তীব্র প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল যে, ঐ বয়সেই সেক্‌স্‌পীয়রের মত বিশ্ব-বন্দিত কবি-সত্তার সংগে নিজেকে একাত্ম করে নিতে কোনো কুণ্ঠা বা সংশয় জাগে নি তাঁর মনে। নিজে ভাল অঙ্ক কষ্‌তে পারলেই সেক্‌স্‌পীয়র নিউটন-বিজয়ী বলে প্রতিপন্ন হতে পারেন, এই যুক্তিসিদ্ধান্তের পেছনেও রয়েছে অ-পরিণত যৌবন-চিন্তার হাস্যকর অবিমৃষ্যকারিতা। কিন্তু, এই ঘটনারই অন্তরঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে আছে চিরজয়ী যৌবনের দুঃসাহসী তপস্যা, অসাধ্য সাধনের দুর্জয় অভিযান। একই কাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবন-চরিতকার জানিয়েছেন, —বন্ধুদের সংগে উল্লিখিত বিতর্কের পরেই মধুসূদন গোপনে গণিত অভ্যাসে ব্রতী হয়েছিলেন। নিজের আচরণের দ্বারা সেক্‌স্‌পীয়রকে জয়ী করে তুল্‌তেই হবে,—এই স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য যুবক-কবি একান্ত অপ্রীতিকর গণিতের চর্চায় সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন। এদিক্‌ থেকে তাঁর সার্থকতা তপঃ সিদ্ধির পূত মহিমায় দীপ্ত। তাই বল্‌ছিলাম, ব্যক্তি-মধুসূদনের বহিরাচরণে ছিল যৌবনের অতিচার-অমিতাচার। কিন্তু, কবি মধুসূদনের নিভৃত অন্তঃস্বভাব ছিল তপস্যার সংযম-কৃচ্ছ্রতা-সাধনায় সুমিত সুষমাময়।

তাঁর কবি-কর্ম সম্বন্ধে এ-কথা আরো অনেক বেশি পরিমাণে সত্য ছিল। নবোদ্ভিন্ন-যৌবন মধুসূদন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন-কন্যা দেবকীর প্রতি অমিত প্রেমাবেগে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শোনা যায়, তাঁর স্বধর্ম ও পরিবার-ত্যাগের পেছনেও এই প্রেমাকর্ষণের প্রভাব ছিল দুরপণেয়। তবু, ধর্ম ও স্বজন-ত্যক্ত মধুসূদন দেবকীকে লাভ করতে পারেন নি নাকি মদ্যাসক্তি ত্যাগ করতে না পারার অপরাধে। কিন্তু

কাব্যে কবি-জীবন

কাব্য-সরস্বতীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় কবি স্বেচ্ছায় সেই পানাসক্তি ত্যাগ করেছিলেন,—অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও। 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশের পর বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ—

"Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I never drink when engaged in writing poetry ; for if I do, I can never manage

১। মধুস্মৃতি।

to put two ideas together There is not a line in the Tilottoma written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer."১

য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিখ্যাত কবিদের কাব্য-রসাস্বাদন করেই মধুসূদন কবি-কর্মের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষতঃ কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধিলগ্নে ইংরেজ কবি Byron-এর কাব্য এবং Tom Moor-এর লেখা জীবনী পড়ে মধুসূদন আবেগে আত্মহারা হতেন। এই Byron-এর কবিতা ও জীবনী পড়েই উৎক্রান্ত-কৈশোর মধুসূদন আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তিনি একদিন যশস্বী কবি হবেন, আর সেদিন বন্ধু গৌরদাস লিখ্‌বেন তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন-কথা। পরবর্তী বয়সে বাংলা সাহিত্যের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি হয়েও তিনি এই সচেতন দম্ভ একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নি যে, প্রতীচ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ পড়ে, তবেই তিনি বাংলা ভাষায় "National Poetry" রচনায় বৃত হয়েছিলেন। সেকালের অন্যান্য বহু বাঙালির মত বাঙালি-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগরও তিলোত্তমা সম্ভবের অভিনব কবি-কৃতিকে প্রথমে স্বীকার করে উঠ্‌তে পারেন নি। এ-বিষয়ে মধুসূদন রাজনারায়ণের নিকট লিখিত পত্রে দম্ভোক্তি করেছিলেন,—

জীবন-স্বভাবে প্রতীচ্য-বনাম প্রাচ্য

"This does not surprise me. He cannot know much of the "Master singers" whom the author of Tilottoma imitates, and in whose school he has learnt to write poetry."২

কিন্তু, মধুসূদনের এই প্রতীচ্য-ধর্মিতার অভিমান সচেতন ব্যক্তিত্বের বহিরবয়বকে অতিক্রম করে তাঁর কবি-সত্তার মর্মস্পর্শ করতে পারে নি। দুর্মদ যৌবনের প্রথম মুক্তির দুর্বার উন্মাদনা তাঁর দুঃসাহসী অধ্যবসায়কে গ্রীক্‌, ল্যাটিন, হিব্রু, সংস্কৃত, ইংরেজি-তেলেগুর বিবিধ দুর্গম পথে প্র-সৃত করেছিল। আর, এই দুঃসাধ্য সাধনে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পিতামহদের মাতৃভাষাকে মন্ডন-সমৃদ্ধ করে তোলা ঃ—"embellishing the tongue of my forefathers."৩ কিন্তু এই দুর্লভ জ্ঞান-তপস্যাই কবি-কর্মে মধুসূদনের একমাত্র সম্বল হলে, তাঁর শিল্প-সাধনা রঙ্গলালের জ্ঞানমার্গী কাব্য-কলারই সম-পর্যায়ভুক্ত হত; বাঙালি জীবন-ধর্মের রুদ্ধ উৎসের মুক্তিবিধান তাঁর পক্ষে হত অসম্ভব। অন্তরে মধুসূদন ছিলেন স্বভাব-বাঙালি; স্বভাব ভারতীয়। Byron তাঁর ব্যক্তি-চিত্তের কাছে মনোহর,

১। দ্রষ্টব্য—ঐ (পরিশিষ্ট)।
২। ঐ।
৩। গৌরদাসকে লেখা মধুসূদনের চিঠি ঃ—দ্রষ্টব্য—ঐ।

কিন্তু তাঁর সৃজন-কর্মের মূলে আছে ব্যাস-বাল্মীকির সংযত-কৃচ্ছ্রতাময় তপস্যা। মধুসূদনের প্রথম কাব্যে ভারতীয় ভাবনার নিবিড়-গভীরতা দেখে রাজনারায়ণ বিস্মিত হয়েছিলেনঃ—

"Who knew that a man stinking perpetually of beer and fowl and beef and other abominations at which Vyas would be horrified, if he were now to descend from heaven—nay whose very dress is Anglican and who loved the English language so much as to lead him to spur his native tongue with contemptuous disdain would at once turn at a first rate Hindu poet, discoursing in strains of such sublimity and rapture of things about which the Rishis loved to converse at their asseemblies in the shade of the Ingudi."১

এখানে রাজনারায়ণ মধুসূদনের বহিরঙ্গের বৈপরীত্যকে অতিক্রম করে তাঁর ভারতীয় অন্তঃ-স্বভাবের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। মধুসূদন যেখানে বাঙালি জীবন-ধর্মের ভূয়োদর্শী কবি, সেখানে তিনি ঋষি-স্বভাবান্বিত। মধুসূদন অবশ্য রাজনারায়ণের এই প্রশ্নের যথার্থ জবাব সে-সময়ে এড়িয়ে গিয়েছিলেন রসিকতার উপলক্ষ্য করে। কিন্তু, ওপরে তিলোত্তমা রচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজ কবি-ধর্মের যে শুদ্ধ-পূত স্বভাবের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন, তাতে রাজনারায়ণ-প্রদত্ত কবি-পরিচিতির সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। 'পান'—সর্বস্ব মধুসূদনের কবি-চেতনা পানাসক্তির প্রসঙ্গ-মাত্রে বিবশ-নিষ্ক্রিয় হয়েছে,—Byron-ভক্ত প্রতীচ্য-প্রিয় মধুসূদনের এ-এক অ-পূর্ব পরাভব তাঁর প্রাচ্যধর্মী শিল্পি-সত্তার কাছে!

মধুসূদনের কবি-কর্মের মধ্যে এই সত্য স্পষ্টতর অভিব্যক্তি পেয়েছে। ব্যক্তি মধুসূদন সচেতন দম্ভে ঘোষণা করেন বাল্মীকি-কালিদাস অনুকরণ যোগ্য হলেও হোমার-মিল্‌টন অননুকরণীয়;—এখানে বাল্মীকির সমতুল্য শিল্পী-কীর্তির প্রতিস্পর্ধী তিনি। কিন্তু কবি মধুসূদন বিগলিত শ্রদ্ধায় বাল্মীকি-স্তোত্র উচ্চারণ করেনঃ—

"নমি আমি কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।"

ব্যক্তি-মধুসূদন সচেতন প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন,—'বাল্মীকির কাছ থেকে যথা সম্ভব কম ধার করব আমি; গ্রীক্ পুরাণ-কথার অপূর্ব মহিমাকে আমাদের

১। রাজনারায়ণের পত্র (মধুসূদনকে) দ্রষ্টব্য—ঐ।

মাতৃভাষায় আমদানি করাই আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা।১ কিন্তু তাঁর প্রাচ্যদেশীয় কবি-স্বভাব যখন গ্রীক্ পুরাণ-কথাকে উপলক্ষ্য করে ভারত-ঐতিহ্য কথাকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় বরণ করে নেয়, তখন বিস্মিত কবি স্বতঃ-ই বলে ওঠেন,

"I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christain youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it."২

অন্ততঃ মধুসূদনের সৃজনী-ধর্ম যে তাঁর সচেতন ব্যক্তিত্বের গ্রীক্-প্রীতিকে ছাপিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য-কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুক্তি পেয়েছিল, তাতে সংশয় নেই। ব্যক্তি-মধুসূদন নূতন ছন্দ রচনা করে Blank Verse-এর উত্তরাধিকার দাবি করেছেন সচেতনভাবে। কিন্তু, অবচেতনার জগতে তাঁর জ্ঞান-বাসনাকে আচ্ছন্ন করে তাঁর সৃজনী-প্রতিভা আসলে বাংলা পয়ারের মুক্তি-বিধান করেছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। গ্রীক্-জনোচিত আদর্শ কাব্য-কীর্তি রচনার দুঃসাহসী অভিযানে ব্যক্তি-মধুসূদন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দুর্জয় কাব্য-তরঙ্গলোকে;—কিন্তু পাড়িশেষে কবি-মধুসূদনের সৃজন-তরী যেখানে নোঙর করেছে, কবি মোহিতলালের ভাষায়, —"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।" ব্যক্তি-মধুসূদন বাঙালি পাঠকের জন্য পেত্রার্কার অনুসরণে সনেট্-এর রীতি-বিশুদ্ধ শিল্পলোক উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন,—দুঃসাধ্য তপঃসাধনায় কবি মধুসূদন বাঙালির জন্য রচনা করেছেন 'চতুর্দশপদী কবিতার' নব-রস লোক।

বস্তুতঃ, সৃষ্টির প্রতিপদে মধুসূদনের সচেতন ইচ্ছা বাধা পেয়েছে তাঁর কলা-কর্মের মধ্যে। আর, কবি-মধুসূদনের সার্থকতার সকল সম্পদ নিঃশেষে পূর্ণ হয়ে আছে ব্যক্তি-মধুসূদনের এই পরাভবের মর্মমূলে। অজ্ঞাত কুল-শীলা কাব্য-লক্ষ্মীকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জোরের সংগে কবি মধুসূদন বলতে পারতেন ঃ—

"এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী;
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই!
অন্তর মাঝে বসি অহরহঃ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ

মধুসূদনের কবি-ধর্মের ঐতিহাসিক অন্তঃস্বভাব

১। রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের পত্র ঃ—দ্রষ্টব্য—ঐ।
২। দ্রষ্টব্য—ঐ।

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।”

নিত্যকালের অনন্ত রহস্যময়ী এই সৃজন-দেবতার সুমধুর কৌতুক-খেলাই জ্ঞান-তাপস মধুসূদনের সৃষ্টি-ধর্মকে অপরূপ সৌন্দর্যে লীলায়িত করে তুলেছে। এ, রহস্য-লীলার অভাবে মধুসূদনের আপ্রাণ কাব্য-সাধনা শব্দ-সম্পদ ও রীতি-সিদ্ধির ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়েই থাকত চিরকাল। বস্তুতঃ, কাব্য-লীলানন্দের জগতে যাঁরা কেবল রূপদর্শী, তাঁদের কেউ কেউ মধুসূদনের কাব্যে নিষ্প্রাণতার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এতে বিস্ময়ের কারণ নেই,—প্রাণের আনা-গোনা কবির ব্যক্তি-চেতনা ও জীবনা-ধারের যে নিভৃত মর্মলোকে, সৃজন-লোকের সেই গহনে স্থূল দৃষ্টির প্রবেশ সহজে বারিত।

যা-ই হোক্, আপাত-বিপরীত এই দুই উপাদান মধুসূদনের কবি-স্বভাবকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে নি,—তাঁর মনন-চিন্তা-উপলব্ধি-সমাকুল অখণ্ড চেতনার এ-ছিল যেন পৃথক-বিচিত্র দুটি দিক্! এ-দুয়ের সর্বাঙ্গীন সমন্বয়-পরিণয়ে মধুসূদনের ‘একমেবাদ্বিতীয়’ স্বয়ম্পূর্ণ কবি-স্বভাব রূপায়িত হতে পেরেছে। আগে বলেছি, ডিরোজিও-রামমোহন-বিদ্যাসারের জীবন-সাধনার পথ বেয়ে উনিশ শতকের বাংলায় যে রেনেসাঁসের লক্ষণ সূচিত হয়েছিল, তার এক প্রান্তে ছিল প্রতীচ্য জ্ঞানলোকের প্রত্যয়-দীপ্ত আলোকোদ্ভাস। আর এক প্রান্তে ছিল শাশ্বত বাঙালি জীবন-ধর্মের প্রতি উপলব্ধি-নিমগ্ন অতলস্পর্শ নিষ্ঠা-বিশ্বাস। উনিশ শতকের বাঙালির কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন ছিলেন সেই জ্ঞান-প্রত্যয় ও উপলব্ধি-বিশ্বাসে মিলিত-পূত প্রবাহের প্রথম উদ্গাতা ভগীরথ।

মধুসূদনের চেতনায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়

প্রতীচ্য জ্ঞান-মনীষার সংগে মধুসূদনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ছিল পূর্বোক্ত প্রতিভা-ত্রয়ীর তুলনায় বহু ব্যাপক। বাংলা কাব্য রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হবার সময়ে ইংরেজি ছাড়াও হিব্রু, গ্রীক্, লাটিন ভাষার জ্ঞানরাজ্যে কবির প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। ফলে, প্রতীচ্য আদর্শ বুদ্ধির প্রতি তাঁর সচেতন প্রত্যয়ও ছিল দৃঢ়তর। তাছাড়া, ডিরোজিও-রামমোহনের রচিত প্রতীচ্য জ্ঞানের দীপ্ত পূর্বৈতিহ্য, ও হিন্দু কলেজের বিদগ্ধ-বলিষ্ঠ প্রতিবেশ মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের মূলে প্রতীচ্যাদর্শের প্রতি উচ্ছ্বাস-উদ্বেল অমিত প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছিল প্রথম থেকেই। এর তুলনায় প্রাচ্য-জীবন-বোধের আবেদন ছিল অনেক নিষ্প্রভ,—দুর্বল। কিন্তু, ওপরের আলোচনায় দেখেছি, সেই আপাত-দুর্বল নিষ্প্রভতাই মধুসূদনের কবি-স্বভাবের মর্মমূলে নিজ শাশ্বত প্রতিষ্ঠার আসন পেতে বসেছিল,

মধুসূদনের ভাব-চেতনার উৎস

ব্যক্তি-কবির সচেতন অনুভবের-ও অজ্ঞাতে। এই প্রভাব দুর্লক্ষ্য হলেও অনপনেয় ছিল, নিভৃতগোপন হয়েও ছিল একান্ত সত্য-সার্থক। তার কারণ, প্রতীচ্য জ্ঞানাদর্শের মত মধুসূদনের শিল্পি-মানসে এই প্রাচ্য, তথা, বাঙালি ভাবদ্যোতনা একটি অরূপ সত্তা বা একটি abstraction মাত্র হয়ে ছিল না; প্রত্যক্ষ পূর্ণাঙ্গ এক রূপমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। আর, সে মূর্তিটি ছিল মধুসূদনের মমতাতুরা দুর্ভাগিনী জননীর।

পূর্বে বলেছি, মধুসূদনের বাল্য-কৈশোরের প্রথম কয়টি বছর অতিবাহিত হয়েছিল সাগরদাঁড়ির নিভৃত পল্লী-পরিবেশে, জননীর স্নেহচ্ছায়ায়। সেখানে একমাত্র পুত্রের প্রতি জাহ্নবীদেবীর অপরিমিত,—অবিশ্বাস্য যত্নাদির কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু, পুত্রের শিল্পি-মনের ঊষালগ্নকে তিনি নবারুণ-রাগে রক্তিম করেছিলেন, সেবা-যত্নের ব্যবহারিকতা দিয়ে নয়,—নিজের স্পর্শ-কাতর চিত্তের কবোষ্ণ তাপ-নিষেকে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি মধুসূদন-জননীর আগ্রহ-সহৃদয়তা ছিল অপরিসীম। মধুসূদনের বন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে লিখেছিলেন;—

জননী জাহ্নবী

Jahnabi Dassy was a woman of great parts. She was very kind to her subordinates and she had a very good knowledge in Bengali literature. Her library was complete with 'Mahavharata', 'Ramayana', 'Chandi', 'Annada Mangal', etc., the few Bengali books then extant."১

পল্লিবাসকালে পাঠশালার শিক্ষার অবকাশে জাহ্নবী যে পুত্রকে ঐ সব কাব্য ও "অন্যান্য প্রাচীন কাব্য পাঠ" করিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। জননীর "প্রদত্ত শিক্ষার ফলে,"—জীবন চরিত-কার বলেছেন,—"রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনো খর্বতা হয় নাই। পূর্ণ বয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, লাটিন, গ্রীক্, ইংরাজী, ফরাসিক্, জার্মান এবং ইতালিয়ন, পৃথিবীর, এই আটটি প্রধান ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং যখন তিনি বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, দান্তে প্রভৃতি মহাকবি-দিগকে সুহৃদ্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।"

মধুসূদনের জীবনে এই তথ্যের অজস্র প্রমাণ রয়েছে। সুদূর মাদ্রাজে য়ুরোপীয় পত্নী-কন্যা নিয়ে যখন তিনি নূতন ঘর বেঁধেছেন,—কাব্য লিখ্‌ছেন ইংরেজি ভাষায়,—তখনও বন্ধু গৌরদাসকে ব্যাকুল অনুরোধ জানিয়েছেন একখানা করে কাশীদাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ

১। মধুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত।

পাঠাবার জন্যে।১ মাদ্রাজ-প্রত্যাগত মধুসূদনকে সাহেবি পোষাকে মহাভারত পড়তে দেখে কোন আত্মীয় বিস্মিত হয়েছিলেন।—এই বিস্ময়ের উত্তরে কবি বলেছিলেন, "রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।" মধুস্মৃতির লেখক বলেছেন,—কেবল বাংলা রামায়ণ মহাভারতই নয়;—"যে পৌরাণিক বিষয়সমূহে মধুসূদন পরবর্তী জীবনে আত্মহারা হইতেন, তাহার বীজ অতি শৈশবেই জননীর সাহায্যে তাঁহার উর্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে অংকুরিত হইয়াছিল।"

বলা বাহুল্য, মধুসূদনের বিশ্রুত-কীর্তির প্রতীচ্য শিক্ষকদের সংগে তাঁর প্রাচ্য ভাবনার একমাত্র ধাত্রী, স্বল্প শিক্ষিতা এক বাঙালি মহিলার পাণ্ডিত্য-তুলনার কল্পনা-মাত্রও বাতুলতা। তবু, তাঁর সমগ্র চেতনাকে যখন ব্যাপ্ত আচ্ছন্ন করেছিল প্রতীচ্য জ্ঞান-চিন্তার অপার সমৃদ্ধি, তখনো মধুসূদনের নিভৃত মর্মলোকে 'প্রাণধর্মের' জীবন্ত অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল,—ভারতীয়, তথা, বাঙালি জীবন-বাণীর বেদনামথিত আবেদন। মধুসূদন-জননীর মনোজীবনের পরিচয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নি। তা হলেও, মনে হয়, জাহ্নবী দেবী তাঁর ব্যক্তিত্বের আমূল গভীরে একটি অতি-তীক্ষ্ণ অথচ গোপন মর্যাদাবোধ, আর সেই সংগে মর্মাতুর বেদনার একটি চাপা অভিমান সর্বাংগে বহন করে ফিরতেন। মধুসূদনের পরে আরো দুটি শিশু পুত্রকে তিনি হারিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর গোপন বেদনার উৎস এই অভাববোধের মধ্যে নিহিত ছিল না। মধুসূদনের খৃীষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর রাজনারায়ণ যখন পুনঃ পুনঃ দারপরিগ্রহ করছিলেন, তখন শোকার্তা জাহ্নবী নাকি 'সঙ্গিনী'দের বলেছিলেন, "আমার এই জীবন্ত পুত্রশোকের উপরে উনি (স্বামী) আমাকে যে মনস্তাপ দিলেন, আমার যে অপমান করিলেন তাহাতে আর কি বলিব,......।"২ শুধু 'মনস্তাপ' নয় মধুসূদন-জননীর এই অপমান-বোধ সেকালের হিন্দু গৃহিণীর পক্ষে কেবল অস্বাভাবিক ছিল না—ছিল, প্রায় অসম্ভব। এই অ-পূর্ব মনো-ভাবের কারণ 'মধুস্মৃতি'কার অত্যন্ত মৃদু ভাষায় ব্যক্ত করে লিখেছেন,— "জাহ্নবী যেমন পতি-প্রাণা ছিলেন, সেইরূপ স্বামীর অনুরাগেও অতিশয় বিশ্বাস করিতেন।" সেকালের সতীত্বের আদর্শ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সর্বনিরপেক্ষ অন্ধ আসক্তিই দাবি করেছে। কিন্তু, স্ত্রীর প্রতিও যে স্বামীর "অনুরাগ" প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে, এ-'বিশ্বাস' ছিল কল্পনারও অতীত। আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন জাহ্নবী নিজ নারীত্বের পক্ষ থেকে স্বামীর এই 'অনুরাগ' সর্বদাই প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু, নিজ

জাহ্নবী আত্ম-সচেতন মর্মাতুর ব্যক্তিত্ব

১। ঐ।
২। মধুস্মৃতি।

স্পর্শকাতর মনোধর্ম ও সূক্ষ্ম রুচিবোধ নিয়ে এ-জন্য প্রকাশ্য জবরদস্তি করেন নি কখনো। আমাদের ধারণা, জাহ্নবীর মূক অথচ তীব্র ব্যক্তিধর্মের মর্যাদা-বুদ্ধির এই দাবি, শুধু ঐ একবারই নয়, আজীবন 'অপমানে'র আঘাতে আহত হয়েছে বারে বারে। প্রচলিত প্রথায় একটি বালিকাকে বিবাহ করার প্রস্তাবে মধুসূদন কেন এত রূঢ় হয়েছিলেন, রমেশ দত্ত তার একটি কারণ নির্দেশ করে বলেছেন,—

"....young Madhusudan must have contemplated with grief and humiliation the domestic arrangement under which his mother shared her husband's affection with three other fellow-wives."১

তথ্যের দিক্ থেকে এই মন্তব্যের মধ্যে ত্রুটি আছে। রাজনারায়ণ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরে,—তাও পুনরায় পুত্রলাভের আশায়। তা হলেও, তাঁর পারিবারিক জীবন-ব্যবস্থায় জাহ্নবী দেবীর প্রতি রাজনারায়ণের অনুরক্তি পত্নী-প্রেমের একটি আদর্শ পর্যায়ে কোনো কালেই পৌঁছায় নি,—ওপরের মন্তব্য থেকে এই ইঙ্গিত এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। রাজনারায়ণের জীবন-বৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যাবে, সেকালের কল্‌কাতায় তাঁর অর্থ ও প্রতিপত্তি দুর্লভ ছিল। কিন্তু, সেই তুলনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, সংযম এবং সূক্ষ্ম স্পর্শ-কাতরতা সুলভ ছিল না। আর, পূর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে উদ্ধৃত তথ্য থেকে সহজেই বোঝা যাবে, সে যুগে পারিবারিক সম্পর্কের বিশুদ্ধি ও নিবিড়তার প্রতি পবিত্র আদর্শ বুদ্ধি ছিল প্রায় অলভ্য। আইন ব্যবসায় উপলক্ষ্যে রাজনারায়ণ প্রথম একাকী কল্‌কাতাবাসী হয়েছিলেন। "অল্প দিন পরে"ই তিনি খিদিরপুরে "বড় রাস্তার উপরে একখানি সুন্দর দ্বিতল বাটি ক্রয়" করেছিলেন। কিন্তু, তখনো গ্রামবাসী পত্নী-পুত্রকে নিজের কাছে নিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করেন নি। রাজনারায়ণ কল্‌কাতাবাসী হবার প্রায় ছ'বছর পরে জাহ্নবী স্বামি-সহবাসিনী হতে পেরেছিলেন, তাও স্বামীর আগ্রহে নয়। "রাজনারায়ণ বাবু একেলা থাকেন দেখিয়া, বন্ধু রামকমল রাজনারায়ণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, যশোহর হইতে তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে খিদিরপুরে আনাইয়া দেন।"২ এর থেকে আর যা-ই হোক, পত্নীর প্রতি রাজনারায়ণের আগ্রহ-অনুরক্তির প্রাচুর্য অন্ততঃ সূচিত হয় না। অথচ "স্বামীর অনুরাগে" জাহ্নবী নাকি "অতিশয় বিশ্বাস করিতেন।"

তাই, জাহ্নবীর ব্যক্তিত্বের কল্পনামাত্রে মনে পড়ে, একটি স্পর্শকাতর,

১। Literature of Bengal.
২। মধুস্মৃতি।

ব্যক্তিত্ব, সমুজ্জ্বল, স্নেহমমতাতুর বাঙালি নারী মূর্তি। মধুসূদনের বাল্য বন্ধুরা তাঁর স্নেহ-যত্ন, রন্ধন-পরিবেশনের অজস্র সুখ্যাতি করেছেন; ভৃত্য-পরিচারিকাদের প্রতিও তাঁর মমতাপ্রাচুর্য ছিল সর্বজন বিদিত। রাজনারায়ণের সংসারে তিনি গৃহিণীর কর্তব্য করেছেন,—সকলের সেবা করেছেন দাসীর মত। কিন্তু আত্ম-মর্যাদাবোধ বিসর্জন দিয়ে সেকালের অসংখ্য বাঙালি গৃহিণীর মত নিজের নারীত্বকে দাসীত্বের মূল্যে বিকিয়ে দেন নি। জীবনের যে দুর্লভ প্রাপ্তি অনায়াসে আয়ত্ত হল না, তাঁর রুচিসূক্ষ্ম চরিত্র তার জন্যে আক্ষেপ-আর্তনাদ করে নি;—ক্রমেই তলিয়ে গেছে আপন চেতনার বিষাদঘন-নিভৃত-গভীরে। তাই, জাহ্নবীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংগে বিষণ্ণতা, স্নেহ-সেবা-যত্নের সংগে মর্মাতুরতার একটি অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে, নিজের একাকিত্ব-বিধুর মনোধর্মের বেদনাঘন রূপটিও তিনি একমাত্র কিশোর পুত্রের মর্মে বিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মধুসূদনের অবচেতন চিত্তের গভীরে সেই শিক্ষা অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। তার কারণ ভারতীয় অথবা বাঙালি জীবন-স্বভাবের কোনো বিশেষ গুণ নয়, তাঁর শিক্ষাদাত্রী,—জীবন-বিধাত্রী জননীর বেদনা-বিদ্ধ প্রাণধর্মের মর্মান্তিক স্পর্শ।

মধুসূদনের জীবনীকারেরা ভারতীয় ধর্মের সংগে বাঙালি জীবন-ধর্মকে একত্রবদ্ধ করে দেখেছেন। তাঁর কাব্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য আদর্শের দ্বন্দ্ব-বিচারেই আমাদের অনুসন্ধিৎসা চির মুখর। কিন্তু আমাদের বক্তব্য,—মধুসূদনের কাব্যসাহিত্যের অমরতার মূলে আছে তাঁর বাঙালি-জীবনবোধের বিশেষ প্রণোদনা। আগে বলেছি, সর্বভারতীয়তার অন্তর্ভুক্ত হয়েও বাঙালিত্ব আপন স্বতন্ত্র মহিমায় চিরভাস্বর। 'জীবনচরিত'-কার যোগীন্দ্রনাথ বলেছেন, মেঘনাদবধ কাব্যে বাল্মীকির তুলনায় কৃত্তিবাসের প্রেরণাই প্রবলতর হয়ে আছে। মধুসূদনের কবি-চেতনার মূলে বাল্মীকি-ব্যাসের তুলনায় কৃত্তিবাস-কাশীদাস, সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদর্শের তুলনায় বাঙালি জীবন-ধর্মের প্রবর্তনা ছিল আমূল প্রবল। আর, মধুসূদনের কবিচেতনার মর্মলোকে এই বাঙালি-ধর্মের মূর্তিমতী প্রতীক ছিলেন, আগে, বলেছি,—জননী জাহ্নবী।

মধুসূদনের কবি-চেতনা ও কাব্য

মাতার উল্লেখমাত্রে ব্যক্তি-মধুসূদন আজীবন বেদনার্তচিত্ত হয়েছিলেন। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি চিরদিন জাহ্নবীকে মাতৃসম্বোধন করতেন, —লিখেছেন,—"মাইকেলের অতিশয় মাতৃভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন, 'মায়ের আমি একমাত্র পুত্র।'—মাইকেলের খিদিরপুরস্থ ভদ্রাসন বাটি আমি ক্রয় করিয়া বাস করি। ঐ বাটিতে একবার জগদ্ধাত্রী পূজার দিন মাইকেল সন্ধ্যার সময় আইসেন। নিজের বসতবাটীতে পূজার সমারোহ দেখিয়া

অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতৃ উদ্দেশ্যে বলেন;—'মা! তুমি কোথায়? আজ আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র [হরিমোহন] তোমার বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে,—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখ! তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি।" 'মাতৃ উদ্দেশ্যে' মধুসূদনের বিধুর বেদনা-বোধ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অঝোরে ঝরেছে! নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে কবি রঙ্গলালের সংগে নিজ আবাল্য সম্পর্কের পরিচয় দিতে গিয়ে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন'—"we were boys together at Kidderpur and he used to called my mother (God rest her soul !) mother."১

কবি-জননী

মাতৃচিন্তা সম্বন্ধে মধুসূদনের ব্যক্তি-চিত্তের স্পর্শাতুরতা আরো স্পষ্ট হয়েছে তাঁর কাব্য-কবিতায়! মেঘনাদবধের সমাপ্তি মুখে ইন্দ্রজিতের চিতাশয্যায় অনুমৃতা হবার আগে বীরাঙ্গনা প্রমীলা সখীদের কাছে বিদায় প্রার্থনা করে বলেছে ঃ—

"—'লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এসব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর'—হায়রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে।"

মাতৃনাম উচ্চারণ মাত্রে এ হাহাকার কেবল প্রমীলারই কণ্ঠ-নিঃসৃত নয়; এর সংগে একান্তভাবে যুক্ত হয়েছে প্রমীলার স্রষ্টারও আজীবন-ব্যথিত আর্তস্বর।

মধুসূদনের এই মাতৃ-বেদনাতুরতার পেছনে তাঁর মাতৃভক্তির আতিশয্য একান্ত হয়েছিল বলে মনে করি না। নিজ মাতার মূর্তিতে তিনি ব্যক্তিত্ব-সচেতন বাঙালি নারীত্বের একটি নিগৃহীত, নিভৃত-আর্ত স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্ততঃ, মধুসূদনের মাতৃস্বভাবের মধ্যে বাঙালি নারীধর্মের এই ঐতিহাসিক লক্ষণ অসংশয়িতরূপেই পরিব্যক্ত হয়েছিল। অপরপক্ষে আলোচ্যকালের বাঙালি রেনেসাঁসের মূলে ছিল নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। তৎকালীন নাগরিক বাংলার সমাজ জীবনে গৃহিণী

১। ঐ—পরিশিষ্ট।

নারীকে পতির ছায়ামাত্র কল্পনা করে, তার স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মর্যাদা অস্বীকার করবার দুশ্চেষ্টার বিরুদ্ধে নৈতিক বিপ্লব রচনার সাধনা করে গেছেন রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মধুসূদনের পরমতম সৌভাগ্য,—সমাজ-জীবনে পরবর্তী কালের বাংলা-দেশে তিনি যে স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন,—প্রতীচ্য জ্ঞান-সাধনার মাধ্যমে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে আ-কৈশোর পূজা করেছেন প্রাণমনে,—জন্মলগ্নেই সেই স্বাতন্ত্র্য-মর্যাদাময়ী বাঙালি-জীবন-মূর্তির বেদনাঘন রূপটি তিনি আহৃদয় পান করে আয়ত্ত, আত্মস্থ করেছিলেন। মধুসূদনের সচেতন প্রাচ্য-প্রতীচ্য পাণ্ডিত্যের বৈদগ্ধ্যে মণ্ডিত করে বাংলার কলালক্ষ্মী তাঁর সমগ্র কাব্য-সাহিত্যে সেই আত্মার স্বরূপকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন কবির জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে। মেঘনাদবধের শিল্পী রাবণ-মেঘনাদের বীর্য-বিষাদ নিয়ে যখন উদ্বেলিত-হৃদয়, তখন মনের গোপন-গভীরে পৌরুষদীপ্ত সব-কটি চরিত্রের বৈচিত্র্যকে ছাপিয়ে প্রমীলার গরিমা ও বেদনা, সীতার সর্বংসহতা ও সহৃদয়তা, মন্দোদরীর শঙ্কাতুর মাতৃত্ব, সরমার অনুরাগ ও সহমর্মিতা কখন একান্ত প্রধান-প্রবল হয়ে উঠেছে, সে খবর কবি নিজেও কী যথাকালে রেখেছিলেন! উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নারীপ্রধান; আর সে কেবল বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যই নয়; মধুসূদনের সমগ্র কাব্য-কীর্তি উনিশ শতকের এ বাঙালি জীবন ও শিল্প-ধর্মের পথ-প্রবর্তনা করেছে। আর, এ-পথে কবির আগা-গোড়া রচনায় নারীপ্রধান জীবনমূল্যবোধের কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে আছেন জননী জাহ্নবী;—কেবল মাতা রূপে নয়, কোথাও ব্যক্তিত্বময়ী মর্মপীড়িতা নারীরূপে, কোথাও বা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার-প্রার্থিনী বিদ্রোহিনীরূপেও। এই জীবন-স্বভাবই প্রাচ্য-প্রতীচ্য কাব্য-অলংকার শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত মধুসূদনের আজীবন সারস্বত সাধনাকে এমন একটি বিশেষ রসলোকে উত্তীর্ণ করেছে,—যেখানে কেবল "গৌড়জন"ই "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" পরবর্তী আলোচনায় এই সুধা-রূপের অনুসন্ধান করব মধুসূদনের বিভিন্ন কবি-কর্মের মধ্যে।

মধুসূদনের মাতৃ-প্রেরণার ঐতিহাসিক স্বভাব

আলোচনার প্রথমেই চোখে পড়ে পূর্ণায়ত, বলিষ্ঠ আঙ্গিক-রচনার প্রতি মধুসূদনের-সুচিন্তিত প্রয়াস। আঙ্গিক-সচেতনতা 'আধুনিক', তথা পরিণত শিল্পধর্মের একটি স্বতঃস্ফূর্ত, অথচ অপরিহার্য উপাদান। ভাবের প্রেরণা থেকেই প্রকাশ-আকাঙ্ক্ষার জন্ম। অতএব, ভাব যত পরিণত,—সুপরিবদ্ধ হয়েছে, প্রকাশ-ভঙ্গিকে ঋজু ও দ্ব্যর্থহীন করে তোলার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে তত তীব্র থেকে তীব্রতর। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবহারিকতা সম্বন্ধে এ-কথা

কাব্য ও কাব্যাঙ্গিক

যত সত্য সাহিত্যের ভাব এবং রূপ-ধর্মের পক্ষেও তার চেয়ে কম সত্য নয়। পূর্বের আলোচনায় বলেছি, উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির চেতনা মানবশক্তির প্রতি অটল বিশ্বাস যৌবনোচিত স্বাতন্ত্র্য ও সচেতন বলিষ্ঠতা আয়ত্ত করেছিল দিনে দিনে। অপর পক্ষে, মধুসূদনের ব্যক্তি-মানসে এই আত্মবিশ্বাস প্রায় আত্মদম্ভের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। বক্তব্যের 'পরে অধিকার-বোধ যেখানে আ-মূল-গভীর, সেখানে ভাষা-বোধ ও প্রকাশ-রীতিও সহজেই অগ্রসর হয়েছে ধীর-বিন্যস্ত দৃঢ় পদক্ষেপে। উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম সকল পর্যায়ে সজীব-সত্য জীবন-অনুভবের মত পূর্ণাঙ্গ-সচল রূপাবয়বকেও আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। এদিক্ থেকে প্রত্যেক যুগের সফল সাহিত্যের মূলে অপরিহার্যরূপে রয়েছে ভাব-রূপের হরিহরাত্মকতার সম্পর্ক। কিন্তু, ভাব ও রূপের সৌষম্যপূর্ণ সমন্বয়, আর তাদের প্রত্যেকটির পূর্ণায়তি,—পূর্ণ পরিণতি এক কথা নয়। সদ্য শৈশবোত্তীর্ণ বালক হস্ত-পদ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার আয়ত্ত করতে পারার অফুরন্ত খুসিতে হাত-পা ছুড়ে ছুটে বেড়ায় জীবনের আ-দিগন্ত দুই প্রান্তে। বালখিল্যোচিত নধরগঠন হাত-পা ছোঁড়ার সহজ সামঞ্জস্য সেখানে গতিকে করে তোলে সুষমাময়। কিন্তু, যৌবন-শক্তির অধিকারে প্রত্যয়ান্বিত সৈনিক যখন সামরিক বাদ্যের সংগে তাল রেখে হাত-পা ফেলে এগিয়ে চলে, সেই গতি-গাম্ভীর্যের সংগে পূর্বোক্ত গতি-চাঞ্চল্যের সৌন্দর্য-সুষমাগত সাদৃশ্য নেই কোথাও। প্রথমক্ষেত্রে নূতন প্রাপ্তির আনন্দ কেবল অ-পরিমিতই নয়, পরিণাম-চেতনা-হীন-ও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের গাম্ভীর্য নিছক বলিষ্ঠতার সূচক নয়, আত্মবল সম্বন্ধে সুমিত-সুসংজ্ঞক সচেতনতার প্রভাবেই পরিমিত হয়েও ওজস্বী। মধুসূদনের হাতে বাংলা কাব্যকলা এই আত্মশক্তি-সচেতন পরিমিত প্রাঞ্জল রূপাবয়বকে আয়ত্ত করেছে। বাংলা-কাব্য-কলার সর্বাঙ্গে যৌবন-বলাধান করেছেন, যৌবনোচিত স্পর্শাতুর অথচ দৃপ্ত-সচেতন রূপ-সজ্জা রচনা করেছেন কলালক্ষ্মীর জন্য, —এখানেই মধুসূদন আধুনিক কবিকুলের পুরোধা।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপীয় কাব্যকলা-কৃতির প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়; আর এই উল্লেখের সূচক ছিলেন মধুসূদন নিজেই। কিন্তু, এর থেকে এমন মনে করবার কারণ নেই যে, মধুসূদনের রীতি-সচেতনতা তাঁর য়ুরোপীয় জ্ঞান-সম্পদেরই ছিল অপরিহার্য ফল। রঙ্গলাল বাংলা কাব্যে নূতন রীতি-সজ্জার অবতারণা করতে পারেন নি। মধুসূদনের তুলনায় তাঁর প্রতীচ্য জ্ঞান স্বল্পতর ছিল বলেই এরূপ ঘটেছিল, এমন ধারণাও অযৌক্তিক। পরবর্তীকালের ইতিহাসে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং অন্যান্য দেশি-বিদেশী নানা ছন্দোরূপ-রীতি আহরণ করে বাংলা কাব্যের-দেহকে সুসজ্জিত করার

অমিত্রাক্ষরের কল্পনা ও

অক্লান্ত প্রয়াস করেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সেদিনকার বাঙালি কাব্য-রসিককেরা খুশি হয়ে তাঁকে ছন্দোগুরু বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন। তবু, সাহিত্য-ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক সত্যেন্দ্রনাথের রূপোজ্জ্বল রচনাকে উৎকৃষ্ট কাব্যকলা বলে ভুল করবে না কখনো। আর, উৎকৃষ্ট কলাকর্মের আধার হয়ে উঠতে পারে নি যে রীতি, আলংকারিক বিশুদ্ধি থাকলেও তা যে উৎকৃষ্ট শিল্পাঙ্গিক বলে স্বীকৃত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। আসলে, রূপ-সচেতনতা আর রূপদক্ষতা এক কথা নয়। আমাদের দেশে শিল্পীকে 'রূপ-দক্ষ' বলা হয়েছে। সহজ রূপ-সচেতনতার সংগে বক্তব্যের 'পরে অনায়াসলব্ধ অধিকারের সংযোজনা ঘটলেই রূপ-দক্ষতা,—শিল্প-প্রাণের দক্ষ রূপায়ন সম্ভব হতে পারে। তাই, কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রীতি-সিদ্ধ রূপায়নের পূর্বাদর্শ মধুসূদন যদি তাঁর প্রতীচ্য কাব্য-চর্চার সহজ সংস্কার থেকে আয়ত্ত করেও থাকেন, তবু, সচেতন আঙ্গিক-শুদ্ধ রচনাকে শিল্পগুণান্বিত করে তোলার জীবনীশক্তি ছিল তাঁর কবি-সত্তার মর্ম-নিহিত। মধুসূদন তাঁর কবি-স্বভাব সম্বন্ধে অতি-অবহিত ছিলেন,—তিনি নিঃসংশয়ে জানতেন তাঁর সমগ্র সত্তার একটি কাব্য-বাচ্য রয়েছে,—যার প'রে নিঃশেষ অধিকার তিনি আয়ত্ত করেছেন। এই অধিকার-সচেতনতা নিয়েই তিনি তাঁর সৃজন-কর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে বারে বারে বাজি রেখেছেন,—বাজি জিতেছেন-ও।

তাঁর প্রথম বাংলা নাটক শর্মিষ্ঠা—বন্ধু গৌরদাসের সংগে বাজি রেখে রচিত হয়েছিল;—অবশ্য সেখানে তা ছিল অস্ফুট। মধুসূদনের প্রথম বাংলা কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব' সম্বন্ধে বাজি রাখার ব্যাপাবে কথা কাটাকাটি হয়েছিল বিস্তর। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর রচনা দুঃসাধ্য,—অসম্ভব, বলেছিলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন। প্রসঙ্গতঃ অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে গুপ্ত-কবির ব্যঙ্গ রচনার কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন,—

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

মধুসূদন জবাব দিয়েছিলেন,—

"Oh! it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it."১

যতীন্দ্রমোহন তখন ফরাসী ভাষাতে পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর-রচনা-চেষ্টার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। মধুসূদন তবুও দমে যান নি; তিনি বলেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা বাংলা ভাষাতে অমিত্রাক্ষর রচনা সম্ভব,—ফরাসি ভাষার ব্যর্থতা সত্ত্বেও।

১। গৌরদাসকে লেখা রাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র—মধুস্মৃতি।

যতীন্দ্রমোহন আবার বাংলা ভাষার তৎকালিক দুর্বলতা নিয়ে তর্ক করেছিলেন। তখন অধৈর্য আবেগে কবি বলেছিলেন,—

"Write me down an ass, if I am not able to convince you of your error within a short time."১

এই ভাবে তর্কের পথ থেকে সৃজন-কর্মের পথে প্রবাহিত হয়েছে তিলোত্তমা সম্ভবের জন্ম-ইতিহাস। লক্ষ্য করা উচিত, এই সৃজন প্রয়াসে আত্মশক্তির প্রতি অতন্ত্র সচেতন অতি-বিশ্বাসের দ্বারাই মধুসূদন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বাংলা অমিত্রাক্ষর-রীতি প্রসঙ্গে কবি বার বার মিলটন্-এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, এই রূপ-রচনাতেও রীতি-সিদ্ধ কাব্যাঙ্গিকের প্রতি তাঁর ব্যক্তি-মনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতাই সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছিল। রঙ্গলালের প্রসঙ্গে নিজের কবি-কর্মের স্বভাব-ধর্ম আলোচনা করে মধুসূদন একদা রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন,

বাংলা কাব্যের
যৌবন-শক্তি

—"Byron, Moore and Scott form the highest heaven of poetry in his (Rangalal's) estimation. . . . . .As for me, I never read any peotry except that of Valmiki, Homer, Vyas, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (Do) and Milton. These কবিকুল-গুরুs ought to make a fellow, a first rate poet—if Nature has been gracious to him."২

অতএব, মধুসূদন যে ক্লাসিক্যাল শিল্পীর মত সন্নদ্ধ-সংযত রূপাঙ্গিকের পক্ষপাতী ছিলেন, সে তাঁর নিজস্ব প্রবণতার ফল।* অপর পক্ষে রঙ্গলালের রূপসচেতনতার অভাবও তাঁর স্বভাবেরই মূলোদ্ভূত।

বস্তুতঃ, মিল্টনের Blank Verse-এর জ্ঞানকে উপলক্ষ্য মাত্র করে মধুসূদনের কবি-চেতনা অমিত্রাক্ষর-মাধ্যমে বাংলা পদ্য-ছন্দের বন্ধন-মুক্তি সাধন করেছিল। কবি-মানসের এই গোপন ইতিহাস মধুসূদন নিজেই ব্যক্ত করেছেন 'মিত্রাক্ষর' নামক চতুর্দশপদী কবিতায়ঃ—

অমিত্রাক্ষরের
প্রাণ-ধর্ম ও

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড়; কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভান্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?—

১। ঐ।
২। ঐ।

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত বাসে ?
প্রকৃত কবিতারূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে ?”

'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য করেছি, অপভ্রংশ পাদাকুলক ছন্দের গতিভঙ্গিকে স্বতোবিশিষ্ট করে বাংলা সাহিত্যের প্রাক্-প্রয়োজনেই একদিন মিত্রাক্ষর পয়ারের জন্ম হয়েছিল। কৃত্তিবাস-মুকুন্দরাম-কাশীদাস এই ছন্দ-অবয়বকে আশ্রয় করেই তাঁদের কবি-কর্মকে সার্থক মুক্তি দিয়েছিলেন। অতএব, মিত্রাক্ষর যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা মূলতঃ “ভাব-ধন”এ বঞ্চিত ছিলেন, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু, বাংলা ভাষার তখন ছিল কৈশোর কাল। বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি সেদিন গ্রামীণ-সমাজের সীমায়িত প্রাঙ্গণে অপরিণত বয়সের লীলাচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ফিরেছে। তাই, মিত্রাক্ষরের সীমিত গতিচ্ছন্দ, জীবনের সীমায়িত গণ্ডিবন্ধনের সৌষম্য রক্ষা করেই সৌন্দর্যের দ্যোতনা করেছে। কিন্তু, মধুসূদনের যুগে বাঙালির জীবনধারা গ্রামীণ সমাজের সুখ-নীড়কে ভেঙে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘর্ষ-সংঘাত পূর্ণ মুক্ত অরক্ষিত প্রাঙ্গণে হঠাৎ প্রবেশ করেছে। এখানে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-মানবনীতি-তাড়িত জটিল জীবনের দাবি যেমন দিনে দিনে উত্তুঙ্গ হয়েছে, তেমনি বাঙালির জীবন-চেতনাকে তা করে তুলেছে দূর-যানী। এই সুদূর পথের দুর্গম যাত্রার জন্যে বাঙালির ভাব-ভাবনাকে যেমন প্রস্তুত হতে হয়েছে; তেমনি সেই জীবন-বাসনার রূপাধার বাহনকেও করতে হয়েছে ত্বরান্বিত মুক্তগতি। বাঙালির কৈশোর মানসের পায়ের নূপুর সমুদ্ভিন্ন যৌবনে কেবলই পায়ে পায়ে আট্‌কে যাচ্ছিল; সেদিন মিত্রাক্ষর পয়ার হয়েছিল বাংলা কাব্য-সরস্বতীর পায়ের বেড়ি। মধুসূদন আপন যৌবন-শক্তিতে সেই বেড়ি ভেঙেছেন। বলা বাহুল, বাংলা কাব্যে সেই শক্তি কবির দৃপ্ত-মুক্ত জীবন-ভাবনার দ্বারাই সঞ্জীবিত। সেখানে সে শক্তি প্রাণরসের নিরন্তর নিষেক-সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন, সেখানে বাংলা ভাষার পক্ষেও অমিত্রাক্ষর নূতন মুক্তিপথ খনন করার নামে রচনা করেছে অন্ধ আবর্তের নূতন বন্ধন। এ-কথা হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহার সম্বন্ধেই কেবল সত্য নয়, তিলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধেও আংশিক সত্য।

নিরুদ্ধ কাব্য-চেতনার মুক্তি

অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনার প্রসঙ্গ মূলতঃ এসেছিল বাংলা নাটকের কথাকে উপলক্ষ্য করে। মধুসূদন বাংলা নাটকের আদর্শ হিসেবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সংলাপ রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু, এ-বিষয়ে বাঙালি শ্রোতার

অজ্ঞানতার জন্যই তিনি পূর্ণোদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হন নি। তা হলেও, 'তিলোত্তমা সম্ভবে'র আগেই 'পদ্মাবতী' নাটকের সংলাপে স্বল্পমাত্র অমিত্রাক্ষর কবিতার ব্যবহার তিনি করেছিলেন। 'তিলোত্তমার' কবিকর্মে সার্থকতার তুলনামূলক পরিমাপ করবার জন্যেই ঐ অংশ উদ্ধার করছি,—

নাটকের অমিত্রাক্ষর

"কলি ঃ—(প্রকাশ্যে) দেবি, আশীর্বাদ করি।
শচি ঃ— প্রণাম! হে দেববর, কি করেছ বল?
কলি ঃ—পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।
শচী ঃ— (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?
কলি ঃ— এই ঘোর বনে
সখী সহ আমি তারে রেখেছি মহিষি!
(সহাস্য বদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনি, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে।
মুরজা ঃ— (স্বগত)
হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে?
(প্রকাশ্যে)
ভাল কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?
কলি ঃ—সে কি দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?"

নাটকীয় সংলাপের উপলক্ষ্যে "ভঙ্গ-অভঙ্গ মিলহীন প্রবহমান পয়ার"এ—[১] অমিত্রাক্ষরের গতি এখানে মুক্ত পক্ষ যে হয়েছে, তাতে সংশয় নেই।

তার পাশেই পড়ি তিলোত্তমা সম্ভব-এ সচেতন অমিত্রাক্ষর রচনার প্রারম্ভিক প্রয়াস ঃ

"ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
নিমগ্ন তপঃ সাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুল ধ্যেয় যোগী।"

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খন্ড (২য় সং)—ডাঃ সুকুমার সেন।

গঠনরীতির অন্তঃ-স্বভাবের দিক থেকে এই ছন্দকে অমিত্রাক্ষর না বলে 'মিলহীন পয়ার' বলাই উচিত। অন্ততঃ, পদ্মাবতীর সংলাপ-এর তুলনায় আলোচ্য অংশের প্রবহমানতা-ও যে শ্লথ-গতি, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ছন্দরীতি বিষয়ক আনুষ্ঠানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও বলা চলে,—পয়ারের যতি ও পর্ব-বিভাগই বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্বাপেক্ষা স্বভাবানুকূল। কিন্তু, ছন্দযতির সংগে অর্থযতিকেও যুগপৎ নিয়মিত করতে গিয়েই পয়ারে ভাবের আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছিল। এদিক থেকে, পয়ারে প্রত্যেকটি চরণ একটি করে পূর্ণার্থ বাক্য এবং প্রায় প্রতি দুটি সন্নিহিত চরণ একটি করে পূর্ণ-ভাবদ্যোতক স্তবকরূপে কল্পিত হয়ে থাকত ঃ—

"মহাভারতের কথা। অমৃত সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে। শুনে পুণ্যবান্ ॥"

প্রতি চরণে এইরূপ চৌদ্দ অক্ষরের গাণিতিক সীমায় কবিতার অর্থকে একান্ত ভাবে বাঁধতে গিয়েই একদা দেখা দিয়েছিল ভাবের বিপর্যয়। মধুসূদনের ছন্দের দিক থেকে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট চরণ, ও ৮।৬ অক্ষরান্তের যতি-স্বভাবকে রক্ষা করেও অর্থকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন যথেচ্ছ ভাবে। অবশ্য এই মুক্তি-পথে অন্ত্যমিল আরও

ছন্দরীতি

একটি বাধা ছিল। অমিত্রাক্ষরের মুক্তিপথ রচনাকালে প্রসঙ্গতঃ মধুসূদন সেই অন্ত্যমিল-এর বন্ধনকেও অস্বীকার করেছেন। কিন্তু, মিলহীন পয়ারমাত্রই অমিত্রাক্ষর নয়। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অন্ত্যমিলযুক্ত অসংখ্য-সার্থক অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখেছেন। আসলে অমিত্রাক্ষর অর্থে বুঝি চৌদ্দ অক্ষরের সীমায় বন্ধ ভাবের যথেচ্ছ মুক্তি-সমুচ্ছল পয়ার ছন্দ। কিন্তু, ওপরে ধৃত তিলোত্তমা সম্ভবের প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে প্রায় প্রতি চরণের শেষে এসেই অর্থ যেন স্বতো-সীমিত হয়ে পড়েছে। কোনো চরণান্তেই অর্থ-সমাপ্তি ঘট্‌তে পারবে না, এমন নিয়মও আবার অ-নিয়মের নূতন নিগড় রচনা করে। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, তিলোত্তমার উদ্ধৃতাংশে প্রতি চরণান্তে অর্থ যেমন অস্ফুট-সমাপ্ত হয়ে আছে, তেমনি বাগ্‌-বিন্যাসেও ছড়িয়ে আছে অপ্রত্যাশিত আড়ষ্টতা। পদ্মাবতীর উদ্ধৃত অংশ 'তিলোত্তমা'র পদ্যাংশের তুলনায় আরো অনেক মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দগতি যে, সে কথা অনায়াসে বোঝা যাবে। এই মুক্তির স্বাদ নির্বন্ধন হয়েছে মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রারম্ভিক ছত্র-কটি থেকেই।

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃত ভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,

পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?"

বলা বাহুল্য, এখানে অমিত্রাক্ষর পয়ারের মুক্তি অবারিত হতে পেরেছে কবির মুক্ত জীবনের সহ-জ প্রেরণারই প্রভাবে। তিলোত্তমা সম্ভব সম্বন্ধে বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন,—

"The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women,"১

অথচ, মেঘনাদবধ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চল্‌ত,— সেখানেও এক-পক্ষে রয়েছেন নরনারায়ণ রামচন্দ্র আর তাঁর বানর কটক। অপরপক্ষে রয়েছে রাক্ষস দল। অথচ, অমানবিকতার বাধা সেখানে স্বতঃ-ই অপসারিত হয়েছে। রাম-লক্ষ্মণই কেবল মধুসূদনের চোখে মানুষ নন, রাবণ এবং মেঘনাদও যথাক্রমে "grand" এবং 'noble fellow.' ছিলেন তাঁর কাছে।

অমিত্রাক্ষরের মুক্তি

তাই, রাক্ষস জেনেও, রাক্ষস এবং রাক্ষস-বধূর জন্য, মানবিক সম-বেদনার অশ্রু অবারিত ধারায় উৎসারিত হয়েছে তাঁর চোখে।—রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন,—

"I can tell you have to shed many a tear for the glorious Rakhases, for poor Lakshmana, for Promila."২

আবার স্মরণ করি, রামায়ণ কাব্যে,—বাঙালির রামায়ণে প্রথম মধুসূদন প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর বাল্য-কৈশোরের সন্ধিলগ্নে জননী জাহ্নবীর মানস-সান্নিধ্যে। এই স্পর্শাতুরা মমতাময়ী বাঙালিনীর উচ্ছ্বসিত-ধার চোখের জলে কিশোর কবির ভাব-দৃষ্টির সম্মুখে সেদিন বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-লঙ্কার দেব-মানব-রাক্ষস-লোক যুগপৎ মানবিক আবেগে পরিস্রুত এক নব-মানবমূল্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল। বয়স-অভিজ্ঞতা যতই বেড়েছে, উপলব্ধি যত হয়েছে পরিণত, ততই এই অন্তঃসুপ্ত সহমর্মিতার ধারা স্তরে স্তরে আপনাকে মুক্ত, স্বত-অভিব্যক্ত করেছে। ইংরেজি কবিতা-বলীতেও প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গে মধুসূদন বার বার লঙ্কার সৌন্দর্য, সীতা-হরণের বেদনা ইত্যাদি রামায়ণ-কথার অবতারণা করেছেন। 'Captive Lady'-তেও কাব্যিক সহৃদয়তা সংগে এ-সব প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। সব কিছু লক্ষ্য করে মনে হয়, মধুসূদনের কবি-কল্পনা জ্ঞাতে-

মধুসূদনের নব-মানব-মূল্যবোধ

১। দ্রষ্টব্য মধুস্মৃতি—পরিশিষ্ট।
২। দ্রষ্টব্য ঃ—জীবনচরিত।

অজ্ঞাতে রামায়ণ-মহাভারতের,—বাংলা রামায়ণ মহাভারতের কল্প-লোকে আজীবন স্বপ্ন-চারণ করে ফিরেছে। আর, সেখানে তাঁর মধু-লোভী শিল্পিচিত্ত বারে বারে আমূল-চেতনায় আস্বাদন করেছেন তাঁর মাতৃস্নেহ-রস-নিষিক্ত মানবানুভূতির সহজ-স্বাভাবিক অমৃত-ধারা। মধুসূদনের কবিপ্রাণ তিলোত্তমার পুরাণ-কথাকে মানব-রস-নিষিক্ততার সেই অমৃত-স্পর্শ কোনোদিন দিতে পারে নি। তাই, জীবনের এই প্রথম কাব্য সম্বন্ধে অতৃপ্তি তাঁর ঘোচে নি কোনোকালে। তিলোত্তমা সম্ভব প্রথম পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে ১২৬৮ বঙ্গাব্দে বহুল পরিবর্তনের পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের থেকে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। তবু কবির তৃপ্তি নেই,—য়ুরোপ-প্রবাস কালে 'চতুর্দশপদী কবিতা' লিখ্‌বার সময়ে আবার তিলোত্তমার পরিশোধনে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রয়াস পূর্ণ করবার সুযোগ বিধাতার হাতে পান নি তিনি। ভাগ্যহীন যে সন্তানকে প্রাণের উত্তপ্ততম স্পর্শ দেওয়া সম্ভব হয় নি, তার প্রতি অপরাধিনী জননীর মত ব্যথাতুর মমতা নিয়ে মধুসূদন আজীবন লালন করেছেন, তাঁর এই প্রথম অথচ দুর্বল কাব্য-সন্তানকে।

তিলোত্তমা বনাম মেঘনাদবধ

তিলোত্তমা প্রসঙ্গে মেঘনাদবধের এই দীর্ঘায়ত তুলনা-বিচারের একমাত্র উদ্দেশ্য একটিমাত্র সত্য পরিচয়ের উদ্‌ঘাটন। মধুসূদন রূপ-সচেতন কবি ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু, সচেতন রূপ-সৌন্দর্যপ্রীতি যেখানে তাঁর মর্মলীন জীবন-বেদনার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে, সেখানেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তিনি সার্থক রূপ-দক্ষ শিল্পী। মধুসূদনের সার্থকতা বহিরঙ্গ রূপোজ্জ্বলতায় নয়,—নিভৃত-গভীর অন্তরঙ্গ জীবন-ভাবনায়। সে ভাবনা বলিষ্ঠ জ্ঞানগরিমার সংগে ভাবোদ্বেল চিত্তের নিবিষ্ট বেদনায় উচ্ছ্বসিত হলেও বিষণ্ণ-গৈরিক।

মেঘনাদবধে এসে ব্যক্তি-মধুসূদনের চিত্ত-তলশায়ী নিভৃত-গোপন জীবন-চেতনা প্রথম জাগ্রত,—উদ্বোধিত হতে আরম্ভ করেছে। এখানেই তাঁর বিশ্বপরিক্রমণশীল পাণ্ডিত্য শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যের প্রথম অঞ্জলি রচনা করেছে তাঁর অন্তর-লক্ষ্মীর পাদ-পীঠে। তাই, এখানেই মধুসূদনের সার্থক কবি-কীর্তির সূচনা,—সমাপ্তি-পরিণতি নয়।

মেঘনাদবধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

মেঘনাদবধের প্রারম্ভে রয়েছে প্রতীচ্য মহাকবি-কুলচূড়ামণি হোমারের উদাত্ত প্রণোদনা। এই কাব্য রচনা করবার সময় রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন,—

"....if the father of our Poetry had given Ram human

companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad."১

আর একটি চিঠিতে 'শূর কাব্য' ("Heroic poetry") রচনার পথে বানরেরা রসভঙ্গ করেছে ("Spoil the joke") জানিয়েও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,—"I shall look to them." নিজ ব্যক্তি-চিত্তের কাছে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার সচেতন প্রয়াস নিয়ে সুরু হয়েছে মেঘনাদবধের উদ্ধৃত প্রারম্ভিক বন্ধনা-ছত্র কয়টি। এ-বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেছেন, —"কাব্যারম্ভে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কবিতাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সেই বিষয় কহিতে বা গায়িতে প্রার্থনা করা য়ুরোপীয় রীতি।"২ এই প্রসঙ্গে Iliad এবং Paradise Lost-এর প্রারম্ভিক অংশের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মধুসূদন নিজে-ও এই তথ্য-প্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন। প্রাচ্য কাব্যাদর্শেরও আদিতে 'আশীঃ' কামনা এবং 'নমস্ক্রিয়াদি'র পূর্বাদর্শ রয়েছে।৩ এ-ক্ষেত্রে বন্দনাংশের সংগে সরস্বতীর মুখে কাব্যকথা-প্রকাশের আগ্রহ-ই প্রতীচ্য প্রভাবিত বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। অতএব, কবিতা-কলার প্রাণধর্মের পক্ষে 'এহো বাহ্য'। এই বহিরঙ্গ-সাদৃশ্যের খুঁটিনাটি প্রাসঙ্গিক যদি হয়ও, তবু অ-প্রধান। মুহূর্ত-পরে মধুসূদন এই বহিঃ-প্রভাবকে অতিক্রম করে নিজ কবি-স্বভাবের অনুবর্তী হয়েছেন,—

"বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি !"..................

প্রাচ্য পণ্ডিতেরা এবারে এখানে আলংকারিক নমস্ক্রিয়া পদ্ধতির ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু, কবি হিসেবে মধুসূদন যেখানে স্বয়ম্পূর্ণ, সেখানে তিনি প্রতীচ্য বা প্রাচ্যের অনুসারী নন,—স্বয়ং-স্বতন্ত্র বাঙালি জীবন-রেনেসাঁসের বাণীধর কবি। বঙ্কিমচন্দ্র মেঘনাদবধের আলোচনা করে Calcutta Review-তে লিখেছিলেন,—

"To Homer and Milton as well as Valmiki, he [মধুসূদন] is indebted in many ways. But he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken."

......এই assimilation,—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'স্বী-করণ' মেঘনাদবধের বিশ্বচারী ভাব-কল্পনা, ও চিত্র-রূপকল্পকে বাঙালি জীবন-ধর্মের মূলে নিবিড়-নিবিষ্ট করেছে।

মেঘনাদবধ-কাহিনীর বহিরঙ্গে রয়েছে Iliad-এর গল্পের সংগে ব্যাপক

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।
২। মেঘনাদবধ—দীননাথ সান্ন্যাল সম্পাদিত—(পাদটীকা)
৩। সাহিত্য দর্পণ।

সাদৃশ্য। সুদূর গ্রীস্‌দেশবাসী বীর ও রাজন্যবর্গ সকলে 'সাত সমুদ্র তের নদী' পেরিয়ে সাগর পারের 'ট্রয়' নগরী অবরোধ করেছিলেন বহু বৎসর ধরে। তার কারণ ছিল ট্রয় রাজকুমার কর্তৃক গ্রীক্‌ কুলবধূ হেলেনের অপহরণ। মেঘনাদবধেও দেখি সুদূর উত্তর ভারত থেকে অযোধ্যার 'রঘুপতি রাম' ভারতের দক্ষিণ সীমা-পদ-লগ্ন সমুদ্রস্রোতকে অতিক্রম করে 'বানর কটক' সহ এসেছেন সাগর তীরবর্তী লঙ্কার বহিঃসীমায়। উদ্দেশ্য রঘুকুল-বধূ সীতার উদ্ধার। Iliad কাব্যের মহাহবে ট্রয় রাজ্যের নিরপরাধ উদাত্ততম বীর হেক্টর দেহপাত করেছিলেন,—এখানেও "Noble fellow" মেঘনাদ আত্মদান করেছে। অতএব, কাহিনীগত সাদৃশ্য অপার।

মেঘনাদবধ ও Iliad

কিন্তু, রামায়ণ-কাহিনী তথা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংগে Iliad এর ভাবগত পার্থক্য প্রায় আমূল। Iliad কাব্যের মৌল প্রেরণা নিহিত রয়েছে রূপ-বুভুক্ষা আর রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যে। কিন্তু, বাঙালির রামায়ণ-কাহিনী, সমাজ ও পারিবারিক মূল্য-মহিমাবোধের বেদীমূলে একান্তে রচনা করেছে আ-হৃদয় শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।১ Iliad-এ দেখি, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা হেলেনের প্রতি রূপ-তৃষ্ণাতুরতায় গ্রীক্‌ রাজন্যবর্গ অধীর-প্রায় হয়েছিলেন; এমন কি, মানিলস্‌-এর সংগে তার বিবাহের ফলে যুদ্ধ-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তখন দেবরাজ জিউস্‌-এর নামে অন্য গ্রীক্‌রাজেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হন। তাঁদের প্রতিশ্রুতি ছিল,—এই নব বর-বধূর কোনো বিপদ ঘট্‌লে, সকলে মিলে তার প্রতিরোধ করবেন। বস্তুতঃ ট্রয়-এর যুদ্ধে হয়েও ছিল তাই। এই প্রতিশ্রুতি এবং তা রক্ষা করার কাহিনী থেকে বোঝা যায়, গ্রীস্‌ দেশের জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার সচেতন বুদ্ধিই ছিল গ্রীক্‌ রাজগোষ্ঠির সকল তৎপরতার কেন্দ্র-মূল। অন্য দিক থেকে এই সব গ্রীক্‌ বীর-গোষ্ঠির নৈতিক চরিত্রও ছিল নিতান্ত বিক্ষিপ্ত ও বিশুদ্ধি-হীন। বাংলা দেশের সমাজ-নির্ভর পারিবারিক জীবন-মূল্যবোধের প্রেরণাদর্শের কাছে এ-সকল জীবন-চিত্র ছিল নিতান্ত বি-ধর্মী, —বিপথগামী। ট্রয় রাজকুমারের সংগে হেলেনের পলায়ন বার্তা স্বয়ং মধুসূদন নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন,—"দেবী আপ্রাদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি স্কন্দরের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিনী হইয়া পতিব্রতা-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বপতি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক তাহার অনুগামিনী হইলেন।"২

অথচ, বাংলা রামায়ণের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে পাতিব্রত্য ও সতীধর্মের পারিবারিক জীবন-রস-মধুর অপূর্ব সৌরভ। সেখানে রাক্ষস পুরে

১। দ্রষ্টব্য—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়।
২। হেক্‌টর বধ।

বন্দিনী রঘুকুল-লক্ষ্মীই কেবল নিজের সতীধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষায় তৎপর নন, রক্ষো-রাজ্ঞী মন্দোদরীও সীতার সতীত্বের মর্যাদা বিধানের জন্য আকুল। বাঙালি স্বভাবের মূলীভূত এই পারিবারিক জীবন-মূল্যবোধকেই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন দৃষ্টিতে পুনরাবিষ্কার করেছিল উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি জাতি;—শাশ্বত পুরাতনের এই নবায়নই যথার্থ রেনেসাঁসের মৌল লক্ষণ। মধ্যযুগের বিপর্যয় লগ্নে নারীত্বের অবমাননা ও বিনষ্টিকে উপলক্ষ্য করে বাংলার সমাজ-জীবনের সকল স্তরে এক চরম অবক্ষয়ের সূচনা ঘটেছিল। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ আত্মস্থ-চিত্তে নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন,—চেয়েছিলেন বাংলার সেই স্নেহ-মমতাতুর শাশ্বত জীবন-মূল্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে। সে নারী আন্তর স্বাতন্ত্র্যে মহীয়সী হয়েও হবে সমাজ-পরিবারের মহৎ মঙ্গল-ব্রতে নিয়ত নিযুক্ত কল্যাণী। মধুসূদন উগ্র স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত কল্যাণ-ঋদ্ধ নব বাঙালি জীবনের স্বপ্নাকুল জীবন-শিল্পী; আর মেঘনাদবধ কাব্যে সেই নব-জীবন-মূল্যবোধের প্রথম সার্থক প্রকাশ।

মেঘনাদবধে মধুসূদনের বাঙালি-ধর্মী স্বয়ংসম্পূর্ণতা

বাল্মীকির কাব্যে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের কাহিনীর মূলে রাবণের দুর্নৈতিক ব্যভিচার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা অস্পষ্ট থাকেনি। তাঁর চোখে রাবণ-ভগ্নী শূর্পনখা রাক্ষসী, কারণ বিধবা হয়েও ইন্দ্রিয়-নিয়মনের সংযম-ব্রতকে সে অস্বীকার করেছে।—আবার, রাবণও বিভীষণতর রাক্ষস, কারণ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতার সংগে নারী-নির্যাতন ও নৈতিক ব্যভিচার ছিল তার স্বভাব-সংগী। বাংলা রামায়ণে শূর্পনখার অসামাজিক (?) প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি বিরূপতা অধিকতর প্রকট। তাছাড়া, রাবণের নৈতিক বিচ্যুতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাক্‌লেও সীতার প্রতি তার বলাৎকার চেষ্টার কোন উল্লেখ নেই সেখানে। এদিক্ থেকে উনিশ শতকীয় বাঙালির সম্ভ্রম-বোধ ও মর্যাদাবুদ্ধি ছিল আরো অনেক সূক্ষ্ম,—ছিল আরো স্পর্শাতুর।

রামায়ণের নীতি-বোধ এবং

রামমোহন থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সমাজ-পট-ভূমিতে বাঙালির নব-জীবন-সাধনার ইতিহাস একান্তভাবে ছিল নারী-কেন্দ্রিক। সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত নবীন বাঙালি পান ও আহারের ক্ষেত্রে প্রতিপদে প্রচলিত আচার লঙ্ঘন করেছেন,—বরং সেই আচার লঙ্ঘনকে বৈপ্লবিকতার লক্ষণ বলে গর্বিত বোধ করেছেন। কিন্তু, নারী সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব ছিল সহজে সম্ভ্রম-নত। মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনের 'উচ্ছৃঙ্খলতা' ঘোষণায় সেকাল এবং একালের তথ্যাভিজ্ঞরা পঞ্চমুখ। কিন্তু আমরা বলেছি,

শিল্পি-মধুসূদনের মানস-স্বভাব ছিল ঋষিতুল্য সংযম-নিয়ত। কেবল-কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি-জীবনেও নারী-সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব চিরকাল ছিল Puritan সুলভ অতি-সচেতনতায় সংকুচিত। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন-কন্যার প্রতি তিনি এককালে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহিত হতে পারেননি। রেবেকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু আদর্শ-সংঘাতের দরুণ তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘট্‌তেই বিলম্ব হয়নি। হেন্‌রিয়েটার সেবা-পূত সতীত্বের প্রতি বাকি সারা জীবন তিনি ছিলেন প্রেম-শ্রদ্ধানুরক্ত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানারূপ নারীর সংস্পর্শে এলেও মধুসূদন আবাল্য ছিলেন পুরুষোচিত মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধে সন্নত। এ-বিষয়ে তাঁর বাল্যবন্ধু বঙ্কুবিহারী দত্ত লিখেছিলেন,—

শিল্পী মধুসূদনের সংযম-ব্রত

"I can say this much that he was morally strict, and never offended in point of chastity with any of the beauties at Kidderpore. When in merry mood, his friends talked to him on the subject, but he turned a deaf ear to it, and would not allow them to enlarge on the point."১

নবোদ্ভিন্ন-যৌবন মধুসূদনের শক্তি-দীপ্ত কবি-স্বভাবেও এই সম্ভ্রম-বিনতির নিঃসংশয় পরিচয় পাই বীরাঙ্গনা কাব্যের 'সোমের প্রতি তারা' নামক দ্বিতীয় পত্রে। বীরাঙ্গনার প্রত্যেক কাব্য-পত্রের ভূমিকাতেই কবি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের গদ্য-পরিচয় বিবৃত করেছেন। গুরুপত্নী তারা সোমের প্রতি আসক্ত হয়ে যে পত্র লেখেন, তার বিবৃতিতে মধুসূদন লিখেছেন,— "সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকা পাঠে কি করিয়াছিলেন, এ-স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তা অবগত আছেন।"—নৈতিক দুরাচরণের প্রসঙ্গ মাত্রে মধুসূদনের অন্তরাত্মা এমনি সহজ সংকুচিত হয়ে ছিল।

ফলে, বাংলা রামায়ণের আবাল্য অনুরাগী পাঠক মধুসূদন তাঁর নারী ও পুরুষ চরিত্রাবলীকে যুগপৎ নৈতিক মর্যাদাবোধ ও নারীর প্রতি সম্ভ্রম-পূর্ণতায় দীপ্ত,—বলিষ্ঠ করে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে সতী কেবল সীতাই নয়, মন্দোদরী, প্রমীলা, সরমা, এঁরাও সীতার মতই সতী-কুলশ্রেষ্ঠা। রাবণ-মেঘনাদ, রাম-লক্ষ্মণের সকল পক্ষের সকলের মধ্যেই রয়েছে সতীত্ব-পূত নারীত্বের প্রতি স্পর্শাতুর শ্রদ্ধা-বুদ্ধি। ফলে, Iliad কাব্যে যেখানে গ্রীক্ বীরদের মধ্যে জীবনের প্রতি পদে চলেছে ঈর্ষা বিরোধ এবং নারী

১। দ্রষ্টব্য ঃ—মধুসূদন-পরিশিষ্ট।

দেহলোলুপ উচ্ছৃংখলতা,—সেখানে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিটি নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে সংযম-পূত উদাত্ত কল্যাণ-বুদ্ধি,—সামাজিক দায়িত্ব ও পারিবারিক স্নেহ-মমতাপূর্ণ মানব-ধর্মিতার অনাবিল-মধুর অভিব্যক্তি। জীবন-মূল্যবোধের এই পার্থক্য যেমন আমূল, তেমনি বিস্ময়কর। বিস্ময়কর কেবল Iliad-এর পাঠকের পক্ষেই নয়, বাল্মীকি-রামায়ণের চিরন্তন শিল্প-মূল্যে অতি-বিশ্বাসী হিন্দু পাঠকের কাছেও।

মধুসূদনের প্রাচ্য-প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ কবি-স্বাতন্ত্র্য

বাল্মীকির কাব্যে দৈহিক ও নৈতিক বিশুদ্ধির প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও দেখি, আর্য সভ্যতা ও আর্যসমাজের ব্যাপ্তি ও সমুন্নতির প্রতিই আদি কবির সমুৎসুক দৃষ্টি সর্বত্র অতন্দ্র-জাগ্রত হয়ে রয়েছে। রাম সেই আর্য রাজতন্ত্রের মূর্তিমান্ বিগ্রহ। তাই, আর্য রাজ-কর্তব্যের যে সু-উচ্চ গ্রামে রামের রাজসিংহাসন পাতা হয়েছে, সেখানে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা-ঘন মানব অন্তঃকরণের কোনো প্রভাবই ছায়া ফেলতে পারে না;—রাজ-অন্তঃপুরের বেদনা-মথিত কোন আর্তিই তাঁকে পারে না স্পর্শ করতে। রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞব্রতের পার্শ্বে স্বর্ণসীতার নিষ্প্রাণ মহিমা স্বর্ণবর্ণে চিত্রিত করেছেন বাল্মীকি, কিন্তু রামের সন্তান-জননী মানবী সীতা সেখানে চির-নির্বাসিতা। বাল্মীকির কাব্যে বীর্য আছে, আছে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ দুঃসাধ্য কর্তব্যব্রত। কিন্তু, মানবিকতা সেখানে 'দুর্বলতা'র অপবাদে চিরনির্বাসিত। বাল্মীকির কাব্য মানব-জীবন-গাথা নয়, দেব-রাক্ষসের যুদ্ধকীর্তি। রামচন্দ্র সেখানে যে পরিমাণে 'দশরথ-নন্দন', তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে 'পতিতপাবন' 'বৈকুণ্ঠপতি'। আর, রাবণ দশমুণ্ড কুড়ি হাতের বিরাট রাক্ষসী বিভীষিকা রূপে আছে চিরজাগ্রত হয়ে। এই কারণেই বাল্মীকির কাব্যে ওজস্বিতা আছে, সহৃদয়তা নেই। করুণ রস বাল্মীকির উদ্দিষ্ট শৃংগারাখ্য বীর রসের পক্ষে ব্যভিচারী,—কিন্তু 'বীভৎস' ও 'রৌদ্র' রস তাঁর সহায়ক।

বাল্মীকির কাব্য-ধর্ম

বাল্মীকির চেয়ে মধুসূদনের কবি-কল্পনা উৎকৃষ্টতর, এমন অদ্ভুত বক্তব্য কারো-ই থাকা উচিত নয়,—আমাদেরও নেই। ভারতীয় আর্য সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা-লগ্নের নবারুণ রাগে রঞ্জিত করে বাল্মীকি তাঁর যুগ-জীবন-বাণীকে, সর্বকালের পৃথিবীতে সানন্দ উপহার দিয়েছেন। তাঁর কবি-কীর্তি বিশ্ব-জয়ী। বাল্মীকির সেই পুরা-কথার সূত্র ধরে মধুসূদন আসলে উনিশ শতকের নাগরিক বাংলার রেনেসাঁসের নূতন মূল্যবোধকে উদ্গীত,—উৎসারিত করবার বিপ্লবী সাধনা করে গেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাম ত মানুষ বটেই, রাবণও এক অপূর্ব মানুষ,— "Grand

মেঘনাদবধ কাব্যের সর্ব-নিরপেক্ষ অভিনবতা

fellow।" রাবণ আর তার পুত্র মেঘনাদ মিলে ত্রিভুবন জয় করেছেন। স্বর্গের দেবতারাও তাদের ভয়ে ছিলেন সদা-সন্ত্রস্ত। এই বীরত্বের মধ্যে অপার মহিমা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অভিনবতা—অ-পূর্বতা নেই। বীর বলেই মধুসূদনের কাছে রাবণ 'Grand' এবং মেঘনাদ 'Noble' নয়। এই পিতা-পুত্রের মধ্যে বীরত্বের সংগে মানবত্ব, দিগ্বিজয়ী শৌর্যের সংগে স্নেহমমতা-প্রীতি-বাৎসল্য সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। 'ইন্দ্রজিত' হয়েও মেঘনাদ প্রেমিক, রক্ষোরাজ হয়েও রাবণ স্নেহময় পিতা। এদের শূরধর্মের সংগে হৃদয়ধর্মও হরিহরাত্মকতা লাভ করেছে। Iliad আর বাল্মীকির রামায়ণের তুলনায় এখানেই নিহিত রয়েছে মেঘনাদ বধের আমূল-পৃথক্ স্বভাব বিস্ময়। মধ্যযুগের বাংলা রামায়ণের পক্ষেও মধুসূদন অভিনব-তর। বাংলা রামায়ণে হৃদয়-ধর্মের কাছে শূরধর্ম দুর্বল,—আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু, মধুসূদন গোমুখীর দৃঢ়-কঠিন পাষাণ গহ্বর থেকে প্রাণোচ্ছল ভাগীরথীর পূত প্রবাহকে উৎসারিত করেছেন, এখানেই মেঘনাদবধের জীবন-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ বিস্ময়-রচনা।

এই বিস্ময়ের আঘাত সমুদ্ভিন্ন-যৌবন রবীন্দ্রনাথকে একদিন চকিত করেছিল; তার ফল ভারতী পত্রিকায় ষোল বছরের কবির মেঘনাদ বধ সমালোচনা। এই অংশে উত্তেজিত "গালি গালাজ"এর—জন্য রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে লজ্জাবোধ করেছেন,—সেই পুরাতন সমালোচনাকে অস্বীকার করে করেছেন পরিশুদ্ধতর মনোভাবের প্রকাশ। ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উত্তেজনার তুলনায় পরবর্তী-কালের কুণ্ঠাও আতিশয্য-মুক্ত বলে মনে হয় না। অন্ততঃ এই উত্তেজনার উৎসটুকু একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের 'উত্তেজনা ও গালি গালাজে'র পেছনে একটা কারণই সেদিন বারে বারে প্রবল হয়ে উঠেছিল; তা-হচ্ছে মেঘনাদবধের অনন্যতুল্যতা। বাল্মীকির মত মহাকবির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিয়ে সেদিন এই অ-তুলনীয়তা অ-স্বাভাবিকতা বলে ভুল করে অপরিণতবয়স্ক কবি-সমালোচক অভিমানাহত হয়েছিলেন।

কিশোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

এই অস্বাভাবিক অভিনবতার বিস্ময়াঘাত স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে কাব্যের একেবারে প্রথম সর্গ থেকেই। রাবণ মহাবীর; মধুসূদনের ভাষায় মেঘনাদবধ 'Epicling'এর মহানায়ক। আর কনক লঙ্কার স্বর্ণপুরী রাবণের রাজসভা বাল্মীকির কল্পনার এক অভিনব ধন। মধুসূদন সেই রাজ-সভার বর্ণনা করে বলেছেন—

"ভূতলে অতুল সভা—ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে
ধরায়। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
খচিত মুকুলে ফুলে পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে।"

এই বর্ণনা পড়ে ক্ষুব্ধচিত্ত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—"ইহা কি রাবণের সভা? ইহা ত নাট্যশালার বর্ণনা।" উদ্ভিন্ন যৌবনের অধীরতা নিয়ে কবি তাঁর নিজের প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারেন নি; অথচ প্রশ্নে আগেই স্বয়ং মধুসূদন এ-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে রেখেছেন উদ্ধৃত অংশেই। রাবণের রাজপুরীর এই বর্ণনা বাল্মীকির আদর্শ-সমুচিত উদাত্ততাপূর্ণ নয়। কিন্তু, সে রাজসভা বাংলা দেশের চূত-পল্লব-মুকুল-শোভিত ব্রতালয়ের স্পর্শাতুর হৃদয়-ধর্ম, মাঙ্গলিক চেতনা এবং গার্হস্থ্য জীবন-মহিমায় উদাত্ত যদি না-ও হয়, তবু পূত-মধুর।

ও মেঘনাদবধের অনন্য তুল্য কাব্য-স্বভাব

রাবণের রাজসভার কঠিন কর্তব্যের রূঢ়তম রাজাদেশই কেবল বিঘোষিত হয় না, শাসিতের প্রতি রাজ-সহানুভূতি, পরাভূতের প্রতি মানবিক করুণা-ধারাও সিঞ্চিত হয় অবচেতন-সহজ স্বতঃস্ফূর্তির সংগে। এক পুত্র শোকে বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা যখন রাবণকে ভর্ৎসনা করছিলেন মুক্ত কণ্ঠে, তখন রাজ-সিংহাসনাসীন রাবণ উত্তর দিয়েছেন—

"এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি! হায় দেবি যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুল শিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি এ বিপুল কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে।"

স্পষ্ট দেখছি, যে-শতপুত্রের অভাব-বেদনায় রাবণের পিতৃ-হৃদয় বিবশ, তারা সকলেই তার আত্ম-জ নয়, অনেকেই রাক্ষস কুল-জ। মধুসূদনের রাবণ বীর্যের ওজস্বিতা দিয়ে রাজ্য-শাসন করেন নি; বাৎসল্যের হৃদয়-তাপ দিয়ে রাজ্য-পালন করেছেন। শাসন ভারতীয় আর্য রাজ-ধর্মের মহৎ কর্তব্য,—পালন এবং লালন চিরন্তন বাঙালি জীবন-ধর্মের পরম ব্রত। মধুসূদনের বর্ণিত লঙ্কাপুরী, তাই, রাবণের রাজসভা হলেও "ব্রতালয়"।

এই কারণেই রাজসভাতে বসেই বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ যেমন পুত্রের বীর্যগাথা

শুনে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, তেমনি মৃত পুত্রের শোকে করে ওঠেন হাহাকার! শোকার্ত রাবণকে মন্ত্রী সারণ জীবনের নশ্বরতার কথা উল্লেখ করে প্রবোধ-শান্ত করতে চেয়েছিলেন। রাবণ তার উত্তরে বলেছেন,—

…"জানি হে আমি, এ ভব মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয় বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে
যবে কুবলয় ধন লয় কেহ হরি।"

তরুণ-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ আবার ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বীরের কণ্ঠে এ-কী অবুঝ কান্নার দুর্বলতা! আমাদের প্রচলিত সংস্কারে বীর কেবল যুদ্ধই করে,—পাষাণবৎ অটুট,—'অজরামর' সে। দুর্বল যে, সে-ই কেবল কাঁদে, কান্না নারীর স্বভাব-ধর্ম। কিন্তু, মহাকাব্য-সম্বন্ধীয় আলংকারিক বুদ্ধি, অথবা সংস্কৃত রসশাস্ত্রের পূর্বজ্ঞান দিয়ে এ-দিক থেকে মানুষকে ঘেঁষে রাখা আর সম্ভব নয়। উনিশ শতকের আধুনিকতা-প্রবুদ্ধ বাঙালি-চিত্ত যে সর্বাবয়ব মানুষের সন্ধান পেয়েছে, সে মানুষ অনন্ত বিচিত্র,—দুরবগাহ অতলস্পর্শ তার গভীরতা। এ-মানুষ যতই বিচিত্র,—ততই সে জটিল। মানব-স্বভাবের এই অন্তহীন জটিলতার গ্রন্থি-মোচন করে করেই আধুনিক মানুষের অভিযাত্রা চলেছে মহামানবতার আবিষ্কার পথে। এ পথ যত দুর্গম, —ততই বিস্ময়-রহস্যে ভরপুর! আধুনিক সাহিত্যের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে এই দুস্তর বিস্ময়ের অপার রহস্য-সৌন্দর্য। মধুসূদনের রাবণ সেই অনন্ত বিস্ময়-রহস্যপূর্ণ মানব-স্বভাবের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যরূপ প্রথম উন্মোচিত করেছে আমাদের অনভ্যস্ত চোখের 'পরে।

মেঘনাদবধে আধুনিক জীবন-বাণী :— রাবণ-চরিত্র

বীর চিরকাল যুদ্ধের নামে উল্লসিত হয়ে উঠবে,—আবার পিতৃহৃদয় চিরকাল পুত্রহীনতার বেদনায় হবে আর্ত। বীরধর্ম যেমন বীর-স্বভাবের অপরিহার্য উপাদান, তেমনি বাৎসল্যও পিতৃহৃদয়ের অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর, একই মানুষ আজ যুগপৎ বীর এবং পিতারূপে আবির্ভূত হতে পারছে,—আধুনিক মানুষের কল্পনাতেও। তাই, রাজা রাবণ বীরধর্ম-প্রণোদিত হয়ে পুত্র ও প্রজাকুলকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, আবার পিতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে কেঁদে ওঠেন তাদের মৃত্যুসংবাদে। কিন্তু, পিতা রাবণ যত কাঁদে, বীর রাবণ ততই মানে না পরাভব। উৎক্ষিপ্ত ক্রন্দনরোলকে হঠাৎ-স্তব্ধ করে বীর-নির্ঘোষে উচ্চারণ করে যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য রাজাদেশ। যত তার সাহস, আত্মশক্তির 'পরে তত তার বিশ্বাস;—ততোধিক তার আত্মমর্যাদাবোধ।

রাবণের এই দুঃসাহসী উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের পরিচয় উদ্ধার করে পরিণত বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—"এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য, ইহার হর্ম-চূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথরথি অশ্বেগজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায়, তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। তবু, যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মধ্যে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।"[১]

রেনেসাঁ যুগের জীবন-বোধের Tragic ধর্ম

আমাদের ধারণা, রাবণ কেবল ধর্মবিদ্রোহী নয়,—মর্মে বিদ্রোহী ছিল সে। এই বিদ্রোহের আদর্শ-চেতনা পুঞ্জিত হয়েছিল মধুসূদন-সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাংলার উগ্র, অমিত-বল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-দম্ভের মূল ভূমিতে। আধুনিকতার জন্ম-উৎস,—সুস্থ-বলিষ্ঠ অন্যনিরপেক্ষ মানব-বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের প্রথম-যৌবন-দীপ্ত উৎসাহ নিয়ে বয়ঃসন্ধির কবি মধুসূদন জীবনের সর্বস্ব অঞ্জলি দিয়েছিলেন শুদ্ধ-তপ্ত মানবতার পীঠতলে। এ মানুষ ধর্ম, সংস্কার, পরিবার, জাতি কোনো কিছুর বিষয়েই কোন পূর্ব-সংস্কারকে স্বীকার করে না। 'শিক্ষক ডিরোজিও'র দীক্ষা-পূত মনে ঈশ্বর-বিশ্বাসকেও বিচার করে দেখতে চায়। নিজের মধ্যে মনুষ্যত্বের অমেয় শক্তিকে আবিষ্কার করেছে সে; সেই শক্তিই তার কাছে একমাত্র,—অমোঘ সত্য। মানব-শক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করেছে এই নূতন মানুষ,—সে মর্যাদা-রক্ষায় অপারগ হয়ে সর্বস্বের বেশি নিঃশেষে দিয়েছে অঞ্জলি। পরাজিত হয়েও রাবণ পরাভব মানেনি, সবংশে মরেও করেন নি শক্তিহীনতার দুর্বলতা স্বীকার। কিন্তু, বিজয়হীন এই অপরাজেয়তার দম্ভ তার উদাত্ত-গম্ভীর বহিরঙ্গের মর্মে মর্মে ছড়িয়ে দিয়েছে অসার্থকতাবোধের দুঃসহ বিষজ্বালা। তাই, রাবণ কেবল 'Grand' নয়, Tragic-ও।

মেঘনাদবধের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে এমনি উদারতার সংগে কারুণ্য, আত্মবিশ্বাসের সংগে শঙ্কাতুরতা, এমন কি সার্থকতার মর্মমূলে বেদনার ঘন-নিবিড় স্পর্শ প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশের উদ্দীপনা নবম সর্গের চিতারোহণের ব্যথায় বিদীর্ণ হয়; সপ্তম সর্গে রাবণের বিজয় নবম সর্গের সমাপ্তি-লগ্নে গম্ভীর আর্তস্বরে হয়ে ওঠে কম্পিত! এমন কি মুক্তি-সম্ভাবিতা সীতার জীবনের আনন্দ-সম্ভাবনাও অনুশোচনা-মুখর হয়ে ওঠেঃ—

১। সাহিত্য।

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম দেখ বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজ সিংহাসন। মরিল জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ পক্ষে ভীম ভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে..."

তাই বলছিলাম, মধুসূদনের কাব্য-কলার, তথা কবি-ভাবনার মর্মমূলে ছড়িয়ে আছে, উত্তুঙ্গ-উদ্বেল আত্ম বিশ্বাসের সংগে, অন্তরঙ্গ বেদনার উদাস-বিষণ্ণতা। এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বয়ঃসন্ধি লগ্নের ধর্মই বুঝি এই,—রেনেসাঁসের এটি জাতীয় স্বভাব। অনাস্বাদিত-পূর্ব শক্তির উৎস উন্মোচিত হয়েছে,—কিন্তু সেই অমেয় শক্তির অনন্ত সম্ভাবনাময় পরিণাম-ধর্মের খবর জানা যায়নি। এমন অবস্থায় মানুষের চেতনা যত হয় দৃপ্ত, ততই হয় যন্ত্রণা-পীড়িত। মহৎ-প্রতিভার মহত্তম বিনষ্টির উৎসাহ-দীপ্ত যন্ত্রণাবোধ থেকেই Shakespeare-এর Tragedy-র মত মেঘনাদবধের Tragic-চেতনারও জন্ম। আর, আমাদের ধারণা, মধুসূদনের এই Tragic চেতনা তাঁর জীবন-বোধের মর্মমূলে-জাত। উনিশ শতকে আলোচ্য সময়ের নাগরিক বাংলায় সে ছিল এক অত্যুগ্র অন্ধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত কালজয়ী পৌরুষের মধ্যেই কেবল স্বতন্ত্র্য-ব্যক্তিত্বের দুরন্ত-দুর্মর রূপটি তখন আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, মধুসূদনের পিতার মত অপেক্ষাকৃত স্বল্পক্ষম প্রতিভার মধ্যেও সেই উগ্র, আত্মদম্ভী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ধূমকেতু-লীলা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নিজের শক্তিতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন,—তদ্বিরের অভাবে 'সরকারী' উকিল হতে না পারলেও, তার চেয়ে বেশি অর্থ, প্রতিপত্তি এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন; একমাত্র পুত্রকে ভাল-বাসার প্রশ্রয় দিতে গিয়ে প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রাখেননি। কিন্তু, অত শক্তি, দম্ভ, এবং অত প্রাচুর্য নিয়েও শেষ রক্ষা করতে পেরেছেন কী? "একে একে নিভেছে দেউটি?" এ কি কবি-পিতার নিজের জীবনেরও কথা নয়!একমাত্র পুত্র খৃষ্টমান হয়ে

মেঘনাদবধে বয়ঃসন্ধি-লক্ষণ

মেঘনাদ বধে কবি-পিতা

গেছে নিজের অজ্ঞাতে; দেশ থেকে লেঠেল আনিয়েও তার প্রতিবিধান করতে পারেননি;—অন্য দিকে পুত্রের জন্য নির্বাচিতা বধূর পিতৃপক্ষের কাছেও ছোট হতে হয়েছে,—এ এক দুঃসহ পরাভব! আর একদিন পুত্রকে স্বপক্ষে আনতে পারবার ভরসায় পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমাত্র পুত্রকে স্ববশে আনতে পারেননি। আরো পরে, Mr. Dealtry-র সংগে পুত্রের য়ুরোপযাত্রা স্থগিত করেছেন, ভরসা করেছেন এবার বিধর্মী আত্মজ খিদিরপুরের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও এসে থাকবে। এমন সময়ে আবার তাঁর অবাধ্যতা উৎক্ষিপ্ত করে তোলে; অবাধ্য ছেলেকে শাসন করবার জন্য রাজনারায়ণ দত্ত এবার বিশপস্ কলেজে তাঁর খরচ বন্ধ করে দেন। কিন্তু, উল্টে রাজনারায়ণকে চিরদিনের জন্য শাস্তি দিয়ে কবিপুত্র পালিয়ে যান মাদ্রাজের তমসালীন দুর্গমতায়। পুনরায় পুত্র-লাভের আশায় একের পর এক তিনটি বিবাহ করেছেন অন্ধ আক্রোশে,—কিন্তু পরাভূত হয়েছেন ভাগ্যের হাতে; সেই সংগে অর্জন করেছেন একমাত্র পুত্রের জননী যৌবন-সংগিনী প্রথমা-পত্নীর বিরূপতা। "ভাগ্যদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী?" একথা রাবণের মত রাজনারায়ণ দত্ত কী বলতে পারতেন না জাহ্নবী দেবীকে?

জীবনের সায়ংলগ্নে মধুসূদন নিখোঁজ, শোকোন্মাদিনী জাহ্নবী মৃতা,—আর অন্ধ আক্রোশ বশে যে তিনটি অসম-বয়স্কা নারীর সর্বনাশ করেছিলেন, তাঁদের সজীব অস্তিত্ব,—সব কিছু মিলে রাজনারায়ণ জলদ-মন্দ্র করুণ-গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। গৌরদাস বসাক লিখেছেন মৃত্যু-পূর্বে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার কথা উঠলে কবি-পিতা একটিমাত্র উত্তর দিয়েছিলেন,—"যাহার বিষয়, সে এসে নেবে।"[১] এই সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থাবহ শেষ উক্তিটির সংগে রাবণের শেষ আর্তধ্বনি কী মিশে একাকার হয়ে যায় না?—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!"

উনিশ শতকের রেনেসাঁস-উৎক্ষিপ্ত নাগরিক বাংলার একদিকে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছিল ইংরেজি শিক্ষিত স্বাতন্ত্র্য-দম্ভী পৌরুষের দুর্মর অভিযান। তার অপর প্রান্তে ছিল নির্যাতিত নারীত্বের মূক যন্ত্রণার মুক্তি-বিধান ও নারী-ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি সাধনের প্রয়াস। মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের পরম সৌভাগ্য; সেই জাতীয় জীবন-চেতনার আমূল-সম্পূর্ণ রূপটি তাঁর কৈশোর চেতনায় মর্ম-বিদ্ধ হয়েছিল নিজের পারিবারিক জীবন-অভিজ্ঞতার মুকুর-

১। জীবনচরিত—পরিশিষ্ট।

ফলকে। তাই, তাঁর মর্ম-মথিত জীবনাকৃতির বিষণ্ণ-সুন্দর উদাস-দুরন্ত শিল্পাঞ্জলি ভরে তুলেছে রেনেসাঁস যুগের বাঙালির জীবন-ধর্মান্বিত মহা-কাব্যের ডালা।

রাবণের পৌরুষ লক্ষণ যেমন মধুসূদনের পিতৃচরিত্রের শক্তি ও বিনষ্টির বিভায় সন্ধি-রক্তিম, তেমনি আগে বলেছি, মেঘনাদবধের বৈচিত্র্য-সুন্দর নারী-চরিত্রগুলির সব কয়টিই মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনের মাতৃ-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। আর, লক্ষ্য করা উচিত, বাঙালির এই 'মহাকাব্যে' পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারীচরিত্র কেবল বিচিত্র-ই নয়, পৃথক স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় সুষমাময়।

মেঘনাদ বধের নারী প্রেম

মধুসূদন কাব্যারম্ভে "বীররসে ভাসি" "মহাগীত" গাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু, মেঘনাদ-বধের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে স্নেহ-প্রেমাকুল মমতাতুর গার্হস্থ্য জীবনরস। পুত্রশোকের আর্তনাদে এই কাব্যের সূচনা, পুত্রশোকের বেদনার রঙে এর পরিসমাপ্তি। যুদ্ধচিত্র আছে একটি—সপ্তম সর্গে। আর একটি আছে যুদ্ধ-খেলা,—ষষ্ঠ সর্গে। কিন্তু এই দুই সর্গেরই বহুলাংশ ব্যয়িত হয়েছে গার্হস্থ্য জীবন-সৌন্দর্যের করুণ মধুর আস্বাদনে। ষষ্ঠ সর্গে মন্দোদরীর পূজা-মন্দিরে এবং পূজাঙ্গনের বাইরে ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার সাক্ষাৎ চিত্রের আবেদন-ব্যঞ্জনা মৃত্যুর বেদনাবোধকে অমর করেছে। সপ্তম সর্গে রাবণ-মন্দোদরীর বিদায়-দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল রাবণের বাহুতে বলাধানই করে নি, সমগ্র যুদ্ধ বর্ণনার উদাত্ততাকে ভরে তুলেছে অন্তর্লীন কারুণ্যের ব্যঞ্জনায়। মেঘনাদবধ উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক প্রতিনিধি,—বাংলার জাতীয় জীবন-কাব্য। কিন্তু সেই জীবনের প্রেরণা-মূলে আছে বীর্যের উৎসাহ নয়;—পারিবারিক-সামাজিক ব্যক্তিত্বের মর্মমূলে নবাদর্শের অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।

এই আদর্শ-চেতনার কাছে জাতীয়তা-বুদ্ধি, তথা স্বদেশ প্রীতির ভাবনা ক্ষণে ক্ষণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু, সমগ্র কাব্যের পক্ষে তা যেমন অ-প্রধান, অসম্পূর্ণ,—তেমনি প্রাসঙ্গিক মাত্র। বীরবাহুর শোকার্তা জননীকে প্রবোধ দিতে গিয়ে রাবণ প্রথম সর্গে একবার বলেছে,—স্বদেশের জন্য বীরের আত্মদানের তুল্য গৌরব পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু, এই সর্ব-জন-স্বীকৃত আদর্শবুদ্ধি পরবর্তী অংশে অনুকূল প্রশ্রয় পায় নি। ষষ্ঠ

স্বদেশপ্রীতি

সর্গে স্বাদেশিকতার আদর্শ সম্বন্ধে দেশদ্রোহী বিভীষণকে মেঘনাদের ভর্ৎসনা ঐতিহাসিক জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু, আগেও বলেছি, বঙ্কিম-পূর্ব নাগরিক বাঙালির কাছে স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি সমার্থবাচক ছিল না। সেদিনকার ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনে স্বাদেশিকতাবোধের একটি অ-স্বচ্ছ আবেগমাত্রই প্রবল হয়েছিল। এই অস্পষ্ট-সংজ্ঞক আবেগ-উচ্ছ্বাসের

পেছনে একদিকে ছিল ফরাসী বিপ্লব-প্রভাবিত প্রতীচ্য সাহিত্য-দর্শনের প্রেরণা, অপর দিকে ছিল সেদিনকার য়ুরোপীয় Indologist পণ্ডিতদের অনুপ্রেরিত 'Hindu Nationalsim'-এর একটি অ্যাব্‌সট্রাক্‌ট আদর্শ। মধুসূদনের কবি-মানসের কাছে প্রথমটির প্রভাবই ছিল বেশি; দ্বিতীয়টির প্রেরণা ছিল অতি দুর্বল। আ-কৈশোর ব্যক্তি-মধুসূদন ভারতবর্ষকে মাতৃ-বুদ্ধিতে ভক্তি করতে পারেন নি; এদিক থেকে "Albion's Shore"- এর প্রতিই তাঁর অনুরাগ-আকর্ষণ ছিল একান্ত,—প্রায় অন্ধ। কৈশোরে রচিত ক্ষুদ্র কবিতায় হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন লিখেছেন ঃ—

"My father, mother, sister all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear drops rush and fall
From my sad eyes like winters' dew.
And oh ! I sigh for Albon's Strand
As if she were my native land."

জীবন চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু জানিয়েছেন,—"যে সময়ে তিনি ইংলণ্ডে গমনের আদৃশ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই" নাকি হিন্দু কলেজে একটি কবিতার প্রথমাংশে লিখেছিলেন ঃ—

"Oh ! how my heart exalteth while I see
These future flowers to deck my country's brow.
Thus kindly nurtured in this nursery. !"—

এই পরস্পর-বিরোধী ভাবানুভূতির যুগপৎ প্রাধান্য সম্বন্ধে জীবন-চরিতকার ইঙ্গিত করেছেন,—মধুসূদনের সহজ অনুভূতি মূলতঃ স্বদেশ-প্রেমিক ছিল; কিন্তু শিক্ষাদোষেই সেই দেশপ্রেম হয়েছিল বিস্রস্ত বিনষ্ট।

মধুসূদন ও ডিরোজিও

এই প্রসঙ্গে তিনি ডিরোজিওর শিক্ষা-প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, মধুসূদন যে তাঁর য়ুরোপীয়তার স্বপ্ন-সর্বস্ব তারুণ্যের দিনে ভারত-ভূমিকে মাতৃভূমি বলে উল্লেখ করেছিলেন,—তার পেছনেই বরং ছিল ডিরোজিওর কবি-কর্মের প্রভাব। উদ্ধৃত কবিতা অথবা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে Literary Gleaner পত্রিকায় প্রকাশিত—"King Porus: A Legend of old"—কবিতার শেষ স্তবক ডিরোজিওর দেশ-প্রেমাত্মক কাব্য-কবিতার নিশ্চিত প্রভাব বহন করে থাকে। আমাদের বক্তব্য মধুসূদনের প্রতীচ্য-জ্ঞান, ও ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর চেতনা-মূলে দেশপ্রেমাত্মক একটি অরূপ ভাবালুতার (Abstract Patriotic Sentiment) আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারই আবেগে কবি কখনো 'Albion's Shore', কখনো বা "Fair Freedom !—thou—Once goddess of Ind's Sunny clime !" -এর স্বপ্ন-কল্পনায় ভাবোন্মাদ,—Sentimental হয়ে পড়েছেন।

'জীবন-চরিত'কার বলেছেন, পরবর্তী জীবনে ডিরোজিওর কাব্য-প্রভাব থেকে মধুসূদন মুক্ত হয়েছিলেন। আর আগে দেখেছি, ডিরোজিওর চেতনার মূলে ছিল য়ুরোপীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা-প্রীতির সংগে মাতৃ-রক্ত-প্রভাবিত ভারত-প্রেম। ডিরোজিওর চেয়েও মধুসূদনের স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি আরো হয়ত অপরিণামদর্শী ছিল। কিন্তু, সেই সংগে এ-কথাও স্মরণ করব,—মধুসূদনের জননী কেবল তাঁর দেহেরই নয়, মনোজগতেরও ছিলেন মৌল ধাত্রী। তাই, ডিরোজিওর ভারত-চিন্তা যেখানে প্রতীচ্যধর্মী নির্বিচার স্বাতন্ত্র্য-কামনার উদ্দীপনায় নিঃশেষিত হয়েছে, মধুসূদনের কবিভাবনা সেখানে ভারতের,—একান্তভাবে বাংলা ও বাঙালির সামাজিক রেনেসাঁসের মুক্তিপথে ধাপে ধাপে হয়েছে প্রাগ্রসর। আমাদের বক্তব্য এই নয় যে, মধুসূদনের দেশপ্রেম নিখাদ ছিল না। কেবল বল্‌তেই চাই, মধুসূদনের দেশপ্রেম ছিল বাংলার সমাজ-মানস ও বাঙালি পারিবারিক জীবন-মাধুর্যের স্নেহ-লালনে বিমুগ্ধ। তাই, তিনি যখন "National Poetry" বা 'National Theatre'-এর প্রসঙ্গ অবতারণা করেন, তখনো তার পেছনে স্বাধীন স্বরাট্ জাতিত্ব-(Independent Sovereign Nation)-বোধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রণোদনাই থাকে না। তাই, পরিণত বয়সে বাঙালির পারিবারিক সামাজিক জীবন-রস-তন্ময় কবি বঙ্গভূমিকে প্রণাম করেন দেশমাতৃকার রাজনৈতিক অভিধা-রূপের মধ্যে নয়,—"শ্যামা জন্মদে" বলে। এই কারণেই মধুসূদনের কবি-কর্মের মধ্যেও স্বাদেশিক রাজনৈতিক চেতনার প্ররোচনা নেই কোথাও। স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত নবীন সমাজ-মূল্য-বোধে উজ্জ্বল পারিবারিক জীবনাদর্শই সেদিন বাঙালির গোষ্ঠি-চেতনার, তথা মধুসূদনের কবিচেতনারও মধ্যে এক নূতন সমষ্টি-বুদ্ধি ব্যাপ্ত করে তুলেছিল। আগেও বলেছি, আবার বলি, হেমচন্দ্রের লিরিক্ ভাবালুতার (Sentiment) ক্ষেত্র ছাড়া বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে Nation-বাদ এই সামাজিক পারিবারিক নব-জীবন-বোধেরই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি।

মধুসূদন ও বাঙালি জীবন-মূল্যবোধ

তাই, মধুসূদনের সকল কবি-কর্মের প্রাণলোক আলোকিত হয়ে আছে স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল নারী-ব্যক্তিত্বের শক্তি-দীপ্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ বিচিত্র সৌন্দর্যে। মেঘনাদবধ বীররসের কাব্য নয়;—এ-কাব্য কারুণ্যঘন শৌর্যের উদাত্ত-লাবণ্যে বেদনা-মধুর। আর বলা বাহুল্য, এই শৌর্য-কারুণ্য রাবণের Tragic পৌরুষের দ্বারা যে পরিমাণে উদ্দীপ্ত, তেম্‌নি বিভিন্ন নারী-স্বভাবের বিচিত্র-সৌন্দর্যে ঘন-নিবিড়। মহাকাব্যের পক্ষে উদ্দীপনা ও উৎসাহ-ই মৌল রস-প্রেরণা হওয়া উচিত। ভাব-নিবিড়তা, বা

মেঘনাদ বধে নারী-ব্যক্তিত্ব

আন্তর নিবিষ্টতা মহাকাব্য-ধর্মের পরিপন্থী। এই ধরণের পূর্ব-সংস্কার হেতু চতুর্থসর্গের সীতা-কথা একদিন নানা আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। মধুসূদনও বন্ধুকে লিখেছিলেন,—

"Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it ?"১

এ প্রশ্নের জবাবে সেদিনকার বাঙালি রসিক সীতার বিরুদ্ধে নেতি-বাচক মনোভাব গড়ে তুল্‌তে পারেন নি। কারণ, উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালির নূতন পারিবারিক জীবন-স্বপ্নের তিল তিল আহরণ করেই মধুসূদন গড়ে তুলেছিলেন সীতার স্বপ্নাকুল তিলোত্তমা মূর্তি। কিশোর মধুসূদন কবে কোন্ অখ্যাত-বিস্মৃত সন্ধ্যায় কবতাক্ষতীরে দুরন্ত খেলার শেষে বাড়ির উঠানে পা দিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলেন,—তুলসী-তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপের সাম্‌নে তাঁর জননীর প্রণামরত কল্যাণ-মূর্তি প্রত্যক্ষ করে হয়েছিলেন ভাব-বিমুগ্ধ। সেদিনকার কৈশোর অনুরক্তির স্বর্ণরাগে রঞ্জিত করে সীতার পদমূলে সরমার মূর্তিকে অংকন করেছেন তিনিঃ— "তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি !"

কেবল ঐ এক ছত্রে নয়ঃ—সারাটি চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের কাব্য-স্বপ্ন বাংলার চিরন্তন পারিবারিক জীবনমূল্যবোধকে স্বর্ণচ্ছটায় করেছে উদ্ভাসিতঃ—

১। সীতা

"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চুড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে,—"

সীতা-কণ্ঠস্বরের সংগে কবি মধুসূদনের মর্মস্বর যুক্ত হয়ে উনিশ শতকের পরিবার-প্রেমিক বাঙালির জীবন মূলে তেম্‌নি এক পুণ্য স্পর্শ সিঞ্চিত করেছে,—

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা।"

এই কারণেই, মহাকাব্য-ধর্মের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক জেনেও, সেকালের বাঙালি জীবন-রসিকজন সীতার অভিনব জীবন-মহিমাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ-কালের ইতিহাস-সচেতন পাঠক লক্ষ্য কর্‌বে,—কেবল সীতার মধ্যেই নয়, সরমা-মন্দোদরী, এমন কি, প্রমীলার মধ্যেও সীতার সমধর্মী নারী-স্বভাবই নব নব বৈচিত্র্য-মাধুর্যে অনাবৃত হয়েছে, ধাপে ধাপে,—ধীরে ধীরে! সরমা

২। সরমা

১। দ্রষ্টব্য—জীবনচরিত।

রক্ষোবধূ হলেও কল্যাণ-মহিমায় সীতার সমধর্মী,—সীতা-তুলসীমূলে সে সোনার প্রদীপ! মন্দোদরীর মধ্যেও এই কল্যাণমূর্তি যে অস্পষ্ট নয় ত্রিজটা রাক্ষসী তার বার্তা বহন করেছে মেঘনাদের কাছে ঃ—

"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল হেতু তিনি
অনিদ্রায় অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর কার এ জগতে?
কার বা হেন মাতা?"

স্বয়ং মধুসূদন মন্দোদরীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, বাঙালির চিরন্তন মাতৃমূর্তি ঃ—

৩। মন্দোদরী

"হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ আগার
শুক্তি মুকুতার ধাম মণিময় খনি।"

কিন্তু, লক্ষ্য করতে হবে, সীতা-সরমা-মন্দোদরীর নারী-ধর্মের মূল স্বভাব অভিন্ন হলেও ব্যক্তি-ধর্মের বৈচিত্র্যে প্রত্যেকটি চরিত্র আমূল স্বতন্ত্র। রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষ চরিত্রাবলী সুসংজ্ঞক ব্যক্তিত্বের (Personality) ধর্মে সুচিহ্নিত; রাম বা বিভীষণেও এই ব্যক্তিত্বময় উপাদান (Element of personality) স্বল্পাধিক বিদ্যমান। কিন্তু, মেঘনাদবধের রসলোকে বৈচিত্র্যের প্রধান স্বাদ রচনা করেছে, বিভিন্ন নারী-চরিত্রের ব্যক্তি-স্বতন্ত্র (Individual) অভিনবতা। নিজ নিজ পরিবার-ধর্মের কল্যাণ-সাধনের ব্রতে সীতা, সরমা, মন্দোদরী সকলেই আপ্রাণ-প্রয়াসী। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা-আত্মদানের উদাত্ত মাধুর্য বাংলার পরিবার-ধর্মের কেন্দ্রবর্তী প্রাণ-শক্তিকে মহিমাদীপ্ত স্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। কিন্তু, সীতার কল্যাণ-সাধনের মূলে ঘন-নিবন্ধ হয়েছে অনন্ত করুণার পাথার, দুঃসহ সহনশীলতা, অতন্দ্র সত্য-সন্ধতা ও অনাসক্ত আত্ম-নিরপেক্ষতা। সরমার রাবণ-নিন্দার সূচনাতেই শত্রুর প্রতিও অবিচার শংকায় উৎকণ্ঠিতা এই সত্য-ব্রতা নারী মধ্য পথে বলে ওঠেন,

নারী-ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য-স্বাতন্ত্র্য

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখী।"

লক্ষ্য করা উচিত, সীতার মধ্যে সেকালের বাংলার নিপীড়িত পারিবারিক নারীত্বের একটি অশ্রু-ঘন মূর্তি রচনা করেছেন মধুসূদন;—তবু, এ-সীতা অনন্ত লাঞ্ছনা সয়েও সুসংজ্ঞক স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের স্বভাব-চিহ্নে সুদীপ্ত।

একই ব্যক্তিত্ব সরমার মধ্যে নবরূপে সুরভিত নূতন সৌন্দর্যে আভাসিত হয়ে উঠেছে। বিভীষণের দেশদ্রোহিতাকে মধুসূদন কখনো ক্ষমা করতে পারেন নি। কিন্তু, রক্ষপুরীতে সরমার নারী-হৃদয়ের নিঃসংগ একাকিত্বকে

লালন করেছেন সুগভীর মমতায়। সরমা বেদনাতুর হলেও লাঞ্ছিতা নয়, সত্য-সন্ধ হলেও সীতার মত নয় অত স্পর্শকাতর, করুণাঘন।

মন্দোদরীর মধ্যে পতি-পুত্রের কল্যাণ কামনার সংগে সহজে অনুস্যূত হয়ে আছে বাঙালি গৃহিণী-জননী সুলভ শঙ্কাতুর মর্মবেদনা; সেই সংগে রয়েছে বীর-গৃহিণী বীর-জননীত্বের সম্ভ্রম বৈভব-ও।

এদিক থেকে মধুসূদন সর্বাধিক বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন প্রমীলা চরিত্রের মধ্যে। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশের দৃপ্ত রূপ দেখে সেকালের বাঙালি পাঠকের চেতনা উদ্দীপ্ত-বিমূঢ় হয়েছিল। দীর্ঘ দিন ধরে পিতা-পতি-পুত্রের অভিভাবকতার নাবালকত্বের মধ্যে বাস করে বাংলা দেশের নারী-কুল সেদিন মর্মে নিষ্প্রভ হয়েছিল। এমন অবস্থায় গৃহসীমাতিক্রমী এই মহা বিক্রম-চিত্র বাঙালি জীবন-কল্পনার সৃষ্টি বলে সেদিনের রসিকেরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে নানা প্রতীচ্য-প্রভাবের কথা অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু, প্রতীচ্য-প্রাচ্য নানা চরিত্রের তুলনায় মধুসূদনের প্রমীলা এমন অভিনব ছিল যে, সমালোচক শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত চিত্তে বলেছেন,—"বীর রমণী এই প্রমীলার চিত্রের জন্য কবি কাহার কাছে ঋণী, বলা দুষ্কর। ত্যাসোর কাব্যে বীর রমণী Clorinda-র চিত্র আছে; ভার্জিলের কাব্যে বীর-রমণী Camilla-র চিত্র আছে; এবং বঙ্গ সাহিত্যে কাশীরামের প্রমীলা চিত্র এবং তৎসাময়িক কবি রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানে বীর-রমণী পদ্মিনীর চিত্র আছে।"[১] শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি প্রতীচ্যের চেয়ে প্রাচ্যের প্রতিই ঝুঁকেছেন,—প্রমীলার মধ্যে দেখেছেন পদ্মিনীর "ছায়া"-সম্পাৎ। কিন্তু, আমাদের ধারণা, প্রমীলা ও পদ্মিনীর স্বল্প-সাদৃশ্য তাদের অন্তর্নিহিত যুগ-জীবন-বাণীর সমান-ধর্মিতার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুতঃ, আমাদের ধারণা, উনিশ শতকের নবীন পারিবারিক মূল্যবোধে সঞ্জীবিত মধুসূদনের কবি-সত্তার মানস-কন্যা এই প্রমীলা।

৪। স্বতন্ত্রতম নারী-প্রমীলা

পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, সীতা, সরমা, মন্দোদরী সকলেই বাংলার চিরন্তন পারিবারিক কর্তব্য-সীমায় আবির্ভূত হয়েও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে বাঙালি নারী হিসেবে অসাধারণ। কিন্তু আবহমান কালের জীবন-প্রবাহের রুদ্ধগতির বেদনায় তাঁদের অসাধারণতা মর্ম-পীড়িত। নারী হিসেবে কেবল সীতা এবং সরমাই নন, মন্দোদরীও রাবণের দুর্ধর্ষ পৌরুষের পাষাণ-সদৃশ অটলত্বের সম্মুখে আপন স্নেহ-মমতার জীবনাঞ্জলি নিয়ে অসহায়তায় আতুর। এখানেই আবার মনে পড়ে

প্রমীলার অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র

১। দীননাথ সান্ন্যাল—মেঘনাদ বধ।

মধুসূদন-জননীর জীবন-বেদনার কথা। জাহ্নবী দেবীর অনন্যসাধারণ নারী-ব্যক্তিত্ব সমকালীন গতানুগতিকতান্ধ জীবনাচরণের সীমায় বাতাহত হয়ে ফিরছিল, দেখেছি। মধুসূদনও নিশ্চয় তাই দেখেছিলেন। তাই, মায়ের ব্যর্থতার বেদনাকে তিনি বিজয়-মাল্য দিয়ে বরণ করেছিলেন কবিতার কল্পলোকে। বাংলা দেশের 'সাধারণ মেয়ে'র হয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেছিলেন "শরৎবাবু"কে;—ঐ ব্যর্থতা-দীর্ণ সাধারণ বাঙালিনীকে তিনি যেন জিতিয়ে দেন। আমাদের ধারণা, বাঙালি জীবনের মধ্যযুগ-সাধারণ সীমায়তির মধ্যে রেনেসাঁস যুগের যে অ-সাধারণ নারী-ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মুক্তির বুভুক্ষায় অন্তরে অন্তরে পীড়িত ব্যথাহত হয়েছিল, তাকেই মধুসূদন সর্ব প্রথম জিতিয়ে দিলেন বাংলা-সাহিত্যের প্রাণধর্মের ইতিহাসে।

প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ নামক ঘটনাকে সর্বপরিচ্ছিন্ন করে দেখলেই বিভ্রান্তির সম্ভাবনা অ-পরিহার্য হয়ে ওঠে। মৌল স্বভাবে প্রমীলাও সীতা-সরমা-মন্দোদরীর সম-গোত্রীয়া; কুল-কন্যা, কুল বধূ, কুল-পাবনী কল্যাণী নারী। লঙ্কা-প্রবেশের মুখেও দৃপ্ত কণ্ঠে আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করেছে সদম্ভেঃ—

বীরাঙ্গনা প্রমীলা মূলতঃ কল্যাণী

> "দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুল-বধূ,
> রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
> আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?"

বস্তুতঃ, লঙ্কা-প্রবেশের পরে নিজস্ব পারিবারিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রমীলা এই আত্ম-পরিচয়কে বর্ণে বর্ণে সত্য প্রতিপন্ন করে তুলেছে। স্বামীর সংগে পঞ্চম সর্গে মন্দোদরী-সন্দর্শনে চলেছে যখন প্রমীলা, মধুসূদন তখন তার বর্ণনা করেছেনঃ—

> "সাজিলা রাবণ-বধূ রাবণ-নন্দন,
> অতুল জগতে দোঁহে, বামাকুলোত্তমা
> প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী।"

প্রমীলার এই পরিচয় মধুসূদন নবম সর্গের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছেন। ষষ্ঠ সর্গে মন্দোদরী যুদ্ধগামী পুত্রের দুশ্চিন্তা ভুলে থাকবার জন্য বধূ প্রমীলার সান্নিধ্য কামনা করেছেন। শাশুড়ীর আদেশকে অমোঘ বলে স্বীকার করে, স্বামি-সংগে শেষ গোপন সাক্ষাতের জন্য প্রমীলা সন্তর্পণে বেরিয়ে এসেছে যখন, তখন কেবল "সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।" মধুসূদন এখানে "দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে" বাঙালি-কুল-লক্ষ্মীর বাসর যাত্রার চিরন্তন ঐতিহ্য-চিত্রকেই যেন সাজিয়ে তুলেছেন। অথচ, এই প্রমীলারই লঙ্কা-

প্রবেশ দেখে আমরা বিভিন্ন প্রতীচ্য কাব্য-নায়িকার কথা কল্পনাও করতে পেরেছি। পূর্বে দেখেছি, প্রমীলার বিজয় অভিযান কি করে সাগর-পারে অসহায় শূন্যতাবোধে আছ্‌ড়ে পড়েছে! রাবণের পৌরুষের মত প্রমীলার অনন্ত সম্ভাবনাময় নারী-শক্তিও বেদনা-বিষন্ন পরিণামকে অপরিহার্য জেনে অনায়াসে তার অগ্নিজ্বালার মধ্যে করেছিল আত্মদাহ। এ কেবল পরাভব নয়, মহৎ মনুষ্যত্বের মহতী বিনষ্টি। আগে বলেছি, বয়ঃসন্ধির প্রথম যৌবন-মুক্তি, রেনেসাঁসের অপূর্ণ শক্তি-চেতনা নিজ সীমায়তি (Limitation)-র যন্ত্রণায় পীড়িত। এই মর্ম-যন্ত্রণাকেই মধুসূদন ভাগ্যবাদের দ্বারা সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। রেনেসাঁসের জীবন-চেতনা পরিণাম সম্বন্ধে যেমন অন্ধ, তেমনি অন্ধ মধুসূদনের এই অদৃষ্টবাদ। এ-টুকু কেবল গ্রীক-পুরাণ-চিন্তার প্রভাব নয়, মধুসূদনের বয়ঃসন্ধি-চেতনার সীমায়তির দ্বারাও পরিপুষ্ট।

রাবণ ও প্রমীলা-
রেনেসাঁসের Tragic মূল্য

সবশেষে স্বীকার করতে হয়, মেঘনাদবধে দৈহিক বীর্য-উৎসাহের চেয়ে মানসিক শৌর্য-দৃঢ়তা,—পৌরুষের কাঠিন্যের তুলনায় নারীর কোমল-স্পর্শাতুরতা উজ্জ্বলতর হয়েছে। এই কারণে, এই কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দিতে অনেকে সংশয়ান্বিত হয়েছেন। স্বয়ং মধুসূদনও অবশ্য মেঘনাদবধকে epic না বলে epicling বলেছেন। তাহলেও মনে রাখ্‌তে হবে, মৌলিক মহাকাব্য (authentic Epic) ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের (Literary Epic) সীমা পেরিয়েও আধুনিক রস-বুদ্ধি 'আধুনিক মহাকাব্য'—Modern Epic-এর কথাও ভেবেছে। একালের উপন্যাস-সাহিত্যকে আধুনিক মহাকাব্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, তা শৃঙ্গার-বীর-শান্ত রসের একটির একান্ত প্রাধান্যের জন্য নয়;—উপন্যাস-কলার পক্ষে এই রস-বোধ অবান্তর। আধুনিক যুগের স্বাতন্ত্র্য-সচেতন ব্যক্তি-অনুক চেতনাময় জীবন-রূপের অখণ্ড-পূর্ণ শিল্পায়নই উপন্যাস-কলার মৌল স্বভাব। বলা বাহুল্য, ব্যষ্টি-সমষ্টির আমূল পার্থক্য-দ্বন্দ্বের দ্বারা এই জীবন-পটভূমি যেমন বিস্তৃত, তেমনি জটিল। উনিশ শতকের বাংলা দেশে জটিল-ব্যাপ্ত এই আধুনিক জীবনবোধের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে প্রচলিত সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে;—নবীন স্বাতন্ত্র্য-সচেতন নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের সমস্যা থেকে। এই সমস্যার জিজ্ঞাসা ও গ্রন্থি-মোচনের চেষ্টাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সূচিত হয়েছে বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস। কিন্তু, এই জিজ্ঞাসা যেদিন পূর্ণাবয়ব সমস্যার রূপ ধরে নি, অথচ, জাতীয় মর্মে আপাত-বৈপরীত্যের জটিলতা ক্রমেই ধূমায়িত হয়ে উঠ্‌ছিল, সেদিনকার উদীয়মান বাঙালি গোষ্ঠি-

মেঘনাদবধের সাহিত্য-
ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

জীবনের অখণ্ড কামনার রূপটিকে সফল মূর্তি দানের গৌরবেই মেঘনাদবধ বাঙালির নতুন রেনেসাঁস যুগের জীবনালেখ্য,—মহাকাব্য।

যেখানে সেই জীবন-ধর্মের গার্হস্থ্য-সৌন্দর্যলোক থেকে কবি-কল্পনা বিচ্যুত হয়েছে,—যেখানে মহাকাব্যোচিত পৌরাণিক পূর্বৈতিহ্য অনুসরণের কৃত্রিম চেষ্টা চলেছে,—সেখানেই বাঙালি মহাকবির স্বভাব হয়েছে আড়ষ্ট। এই কারণেই মেঘনাদবধের দ্বিতীয় ও অষ্টম সর্গ সর্বাপেক্ষা নিষ্প্রভ; এই কারণেই বহুলাংশে সার্থক গীতিকবি হেমচন্দ্রের মহাকাব্য-প্রয়াস বৃত্রসংহার প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আবার, এই কারণেই নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী-কাব্য মহা-ভারতীয় ওজ-গুণের, এমন কি মধুসূদনের আবেগ-উদাত্ততার ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও স্থানে স্থানে মর্মস্পর্শী। মনে রাখ্‌তে হবে, মহাকাব্যের চিরন্তন ভাবাদর্শ হচ্ছে—বিশেষ দেশ-কালের আধারে একটি জাতির অখণ্ড জীবন-স্বভাবকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করা। আর, আলোচ্য যুগের ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির অখণ্ড জীবন-বাসনা ব্যক্তি-অনুক পারিবারিক মূল্যবোধের নবায়নেই হয়েছিল উদ্দীপ্ততম। এই কারণেই, মধুসূদনের সাহিত্যে রাবণের পৌরুষ grand হলেও সীতা-সরমা মন্দোদরী-প্রমীলার নারীত্ব-সচেতনা মাধুর্য-ঘন।—এই কারণেই নবীনচন্দ্রের নর-নারায়ণ উদাত্ততাচ্যুত হলেও সুভদ্রা-সুলোচনা জরৎকারু-শৈলজার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় (Individualistic) জীবন-সমস্যা বিচিত্র; ব্যথাতুর হয়েও সুষমাময়। আর, বাঙালি জীবন-ধর্মের এই ঐতিহাসিক স্বভাব-উন্মোচনের প্রেরণা-সাফল্যের দরুণই এটি বাংলা সাহিত্যের নব-মহাকাব্য রচনার যুগ;—কোনো পূর্বপরিকল্পিত অলঙ্কারিক অর্থে নয়।—ইতিহাসের এই শিক্ষা অবিস্মরণীয়।

যাই হোক্, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবি-কর্মে বাঙালির জাতীয় জীবন-কাব্য-রচনার ঐতিহাসিক পরিচায়ন আপাততঃ স্থগিত থাকতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবন-বোধের সূক্ষ্মতর রূপ-সন্ধান বেশি প্রয়োজনীয়। আমাদের ধারণা, নবীনচন্দ্র তাঁর ত্রয়ী কাব্য রচনায় মেঘনাদ-বধের চেয়েও মধুসূদন-পরবর্তী কাব্যের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বেশি।

মধুসূদনের গীতি-স্বভাব

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দুই পৃথক্ খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে এক থেকে পাঁচ সর্গ নিবন্ধ হয়েছিল। তখনো দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিতব্য শেষ চার সর্গ সম্পূর্ণ হয় নি। মেঘনাদবধের নবম সর্গ লিখ্‌বার সময়েই মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন,......

....“I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric

poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way."১

একই পত্রের প্রথম অংশে লিরিক্ গুণান্বিত চতুর্থ সর্গের উল্লেখও আছে। নিজের মর্মগত গীতি-ব্যাকুলতার সার্থক রূপ কবি হয়ত সীতা-চরিত্রায়ণেই প্রথম অনুভব করেছিলেন। আর, সেই গীতি-পথ বেয়েই আবির্ভূত হয়েছিল বীরাঙ্গনার রোমান্স সুন্দর নূতন কবিতাগুচ্ছ।

কিন্তু, এর আগে, এমন কি মেঘনাদবধ রচনায় প্রবৃত্ত হবার-ও আগে, মধুসূদন একখানি স্বয়ং-স্বতন্ত্র Lyric কাব্য রচনা করেছিলেন (১৮৬০)। প্রথমে কাব্যটির নাম ছিল 'রাধাবিরহ';—দীর্ঘদিন পরে প্রকাশকালে এর নূতন নামকরণ হয় ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১খৃঃ)। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,

ব্রজাঙ্গনা

—"হৃদয় পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহিয়াছে সেই নারীই মধসূদনের কাব্য-নাটকের নায়িকা......। ইহার মধ্যে দুইটি নায়িকা সবার উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—ভাগ্যবঞ্চিতা সীতা, আর বল্লভ-বঞ্চিতা রাধা। বিরহবিধুর রাধা এবং যমুনাতীর ও কদম্বতল কবির কল্পনাকে বার বার নাড়া দিয়াছে। শুধু ব্রজাঙ্গনা কাব্যে নয়, অন্যত্রও দেখি কবির চিত্ত ব্রজ-বধূর বিরহ-ছায়ামেদুর।"২ পূর্বে বলেছি, অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রূপের রচনায় মধুসূদনের অতি-সচেতনতা, এবং মূল পৌরাণিক গল্পের অতি-ওজস্বিতা তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্যে আবেগাকুল বাঙালি কবি-মানসের মুক্তি-পথ রুদ্ধ করেছিল। কবির পীড়িত-নিরুদ্ধ সেই মর্ম-চেতনা তাঁর অজ্ঞাতে চিরন্তন বাঙালি কবি-ধর্মের অন্তরঙ্গ সংযোগ কামনা করেছে 'ব্রজাঙ্গনার' মধ্য দিয়ে। 'মিত্রাক্ষর' কবিতা বলে এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে কবি দীর্ঘকাল দ্বিধা বোধ করেছেন। অথচ, তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ,—এই দুই অমিত্রাক্ষর কাব্য-রচনার মাঝামাঝি সময়েই ব্রজাঙ্গনা রচিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়,—দেশি-বিদেশী নানা মহৎ কাব্য এবং মহাকাব্যের অনন্তলোকে মধুসূদনের মহাকবি-মানস যখন তুরঙ্গ-গতিতে ছুটে ফির্ছে, তখন 'ব্রজাঙ্গনা'র নিভৃত বেদনার উৎস উৎসারিত হয়েছে, বাংলা দেশের বাঙালি-ধর্মী ভাবনার আশ্রয়-আনুকূল্যে।

ব্রজাঙ্গনার এই বাঙালি-স্বভাবকে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরূপের সংগে তুলনা করে অনেকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু, ইতিহাসের পাঠক অবশ্য-স্মরণ করবে— ষোড়শ শতকের জীবন-বাণী ও প্রাণ-চেতনা উনিশ শতকেও প্রত্যাশা করতে চাওয়া, ইতিহাসের কালাশ্রিত গতিকে রুদ্ধ করার

১। জীবনচরিত।
২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড (২য় সং)।

আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর। এই প্রয়াস যেমন প্রতিক্রিয়াশীল, তেমনি অসম্ভব-ও। রাধার পরিণামে-বঞ্চিত প্রেমঘন চিত্তের আর্তি নিত্যকালের বাঙালি মনের পক্ষে ধর্ম-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ আবেদনে ঋদ্ধ। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য-রচনার পেছনেও সেই চিরন্তন জীবনাবেদন দেশ-কাল-প্রভাবিত সবিশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর, আগে বলেছি, পরিবেশ-লাঞ্ছিতা আত্মসচেতন নারী-মানসের বেদনার্তি কেবল মধুসূদনের কাব্য-সাহিত্যকেই নয়, সমকালীন নাগরিক বাঙালি জীবনকেও দীপ্ত করেছিল বিপ্লবের মর্মান্তিক পথে। মধুসূদনের কাব্যে ব্রজাঙ্গনার রাধাও প্রমীলা-মন্দোদরী-সীতারই সমগোত্রীয়া। এ-বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখেছেন,— "এগুলি (ব্রজাঙ্গানার কবিতাবলী) সুরে গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়; আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালি গানও নয়। মধুসূদন স্বয়ং এগুলিকে Ode আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার মত মধুসূদন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতি কবিতারও জন্মদাতা।"১ ব্রজাঙ্গনা কাব্যেই মধুসূদনের হাতে আধুনিক Lyric কবিতারও জন্মসূচনা হয়েছে। মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য-কবিতার মতই এই 'রাধা-বিরহ' রেনেসাঁস-ধর্মী মর্মপীড়ায় বেদনা-মধুর;—

বৈষ্ণব কবিতা ও ব্রজাঙ্গনা

"কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?
আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজ কামিনী ?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বন শোভিনী ?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?"

'ব্রজাঙ্গনা'র বিষয় 'রাধা-বিরহ'। পরিকল্পিত কাব্যের এটি 'প্রথম সর্গ'। অন্যান্য সর্গের মধ্যে 'রাধা-বিহারে'র দুটিমাত্র কবিতা অনেক দিন পরে লিখবার সুযোগ পেয়েছিলেন মধুসূদন তাঁর বাকি সারা জীবনে।

কিন্তু, মধুসূদন-কবি-মানসের সচেতন গীতি-বাসনা প্রথম সার্থক

১। ব্রজাঙ্গনা (সাহিত্য পরিষৎ)—ভূমিকা।

মুক্তি পেয়েছিল বীরাঙ্গনা কাব্যে। এই কাব্য "১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।"১

ব্রজাঙ্গনা

পরবর্তী একাধিক সংস্করণেও উল্লেখ্য পরিবর্তন কিছু হয় নি। বীরাঙ্গনাই মধুসূদনের কবি-স্বভাবের মধুরতম অভিব্যক্তি।—এই কাব্যেই কবি তাঁর যথার্থ কবি-স্বভাবকে সচেতনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন;—আর সেই সদ্য-আবিষ্কৃত কবি-স্বভাবকে মুক্তিও দিয়েছেন অবাধ আনন্দে।

বহিরঙ্গ বিচারে মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যের মত 'বীরাঙ্গনা'র পেছনেও প্রতীচ্য রূপাঙ্গিক-প্রীতির প্রত্যক্ষ প্রণোদনা ছিল। প্রখ্যাত ইটালীয় কবি Publius Ovidius Naso বা Ovid (খ্রীঃ পূঃ ৪৩-১৮খ্রীঃ)-এর 'Heroides' কাব্যের আদর্শে বীরাঙ্গনা কাব্য প্রথম কল্পিত হয়েছিল।

বীরাঙ্গনা ও ওভীয়া

Heroides পত্র-কাব্য; বিভিন্ন নায়িকা এবং নায়ক২ তাঁদের পতি, প্রিয় বা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ প্রেম-উদ্বোধিত চিত্তে এই সকল পত্র রচনা করেছিলেন। প্রাচ্য (সংস্কৃত) সাহিত্যে এ-ধরণের পত্র কাব্য নেই, যদিও নায়ক বা নায়িকা কর্তৃক কবিতায় পত্র রচনার নিদর্শন বিরল নয়। এমন কি, বীরাঙ্গনা কাব্যে "কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণী"—পত্রের পূর্ব-সূত্র আছে শ্রীমদ্ভাগবতে। মধসূদন অবশ্য তার ভাব-প্রেরণা সর্বাংশে গ্রহণ করেননি। কাব্য-দেহের বিচারে বীরাঙ্গনার আঙ্গিক কল্পনা Ovid-এর অনুসারী। Ovid-এর কাব্যাদর্শের অনুসরণেই মধুসূদন তাঁর পত্র-কবিতাবলীকে বলেছেন "Heroic Epistles." Ovid-এর কাব্যে ২১টি পত্র-কবিতা রয়েছে বলে তিনিও সমান-সংখ্যক পত্র-কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন। যদিও ১১টির বেশি পূর্ণ করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অতএব, বহিরঙ্গ রূপের বিচারে বীরাঙ্গনা কাব্যের ক্ষেত্রেও মধুসূদন প্রতীচ্যানুসারী,—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বিভিন্ন পত্র-কবিতার বিষয়-কল্পনাতেও এই প্রতীচ্য অনুভাবনার ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়;—

১। Ovid-এর প্রথম পত্রটি,—Penelope to Ulysses:—ট্রয়-যুদ্ধের অবসানেও Ulysses-এর দেশ-প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখে তাঁর পত্নী Penelope এই পত্রখানি লিখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর শীঘ্র প্রত্যাগমনের জন্য স-প্রেম আবেদন রচনা। খুব দূরান্বিত হলেও, যুদ্ধ-

১। বীরাঙ্গনা কাব্য (সাহিত্য পরিষৎ-ভূমিকা)।

২। *'Heroides'* এ নায়ক-নায়িকার উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক তিন জোড়া—অর্থাৎ ছ'খানা পত্র পাওয়া গেছে। অনুমিত হয় ঐ ৬ খানা *Ovid*-এর লেখা নয়।

অনুমিত

ক্ষেত্র থেকে স্বামীর প্রত্যাগমন কামনায় ভানুমতী এবং দুঃশলার পত্র-কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধা নেই।

২। দ্বিতীয় পত্রটি Phyllis to Demophoon ঃ এই চিঠির লেখিকা Thrace-এর রাণী Phyllis. বিপন্ন বিদেশী বীর রাজকুমার Demophoonকে সহৃদয় আতিথ্য নিবেদন করতে গিয়ে নিজের দেহ-মনও তিনি নিবেদন করেছিলেন সানুরাগে। কিছুদিন একত্রবাসের পরে Demophoon পিতৃরাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য স্বদেশ যাত্রা করেন। যাবার আগে প্রণয়িনী পত্নীকে শীঘ্র ফিরে আসার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু, দেশে গিয়ে পূর্বকথা হয়েছিলেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত। তখন Phyllis আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে এই প্রেমকরুণ পত্র লিখেছিলেন Demophoon-এর প্রত্যাবর্তন ভিক্ষা করে। এই কাহিনীর সংগে শকুন্তলা-পত্রের বিষয়-সাদৃশ্য একেবারেই অস্পষ্ট নয়।

৩। চতুর্থ পত্র 'Phaedra to Hypplytus' ঃ অসংযত চরিত্র Phaedra স্বামীর অনুপস্থিতিতে সপত্নী-পুত্র পূতচরিত্র বীর যুবক 'Hypplytus'কে লিখেছিলেন, তাঁর সংগ-কামনা করে। এই পত্রের সংগে 'তারা' পত্রের সাধর্ম্য লক্ষ্য করবার মত।

৪। সপ্তমপত্র Dido to Æneas:—Sichaus-এর বিধবা পত্নী রাজ্ঞী Dido বিদেশী বিপন্ন রাজকুমার Æneas-এর প্রণয়াসক্ত হয়ে লিখেছিলেন। এই পত্র-কতিায় 'শূর্পণখা'পত্রের বিষয়গত পূর্ব-সূত্র ছায়ান্বিত হয়ে আছে।

৫। অষ্টম পত্র,—Hermione to Orestes। Hermione ছিলেন **Manedaus** এবং হেলেনের কন্যা। Orestes-এর নিকট তিনি বাগ্‌দত্তা হয়েছিলেন, এবং আকৃষ্টাও হয়েছিলেন তাঁর প্রতি। অথচ Manelaus এসব কথা না জেনে Pyrrhusকে Hermione সম্বন্ধে বাগ্‌দান করেছিলেন। বস্তুতঃ Pyrrhus ভুজবলে Hermioneকে অপহরণও করেছিলেন। কিন্তু, নারী-চিত্তের একনিষ্ঠা ও স্পর্শকাতরতা নিয়ে Hermione Orestes-এর কাছে প্রেমকুণ্ঠিত পত্র লেখেন—নিজেকে উদ্ধার করবার প্রার্থনা জানিয়ে। এই সংগে মধুসূদনের কাব্যে রুক্মিণীপত্র স্মরণীয়।

প্রসঙ্গ দীর্ঘতর করে লাভ নেই। ওপরের নিদর্শন থেকেই বোঝা যাবে, কেবল বাহ্য রূপাঙ্গিক নয়, অন্তর্বিষয়ের অবতারণার সময়েও মধুসূদনের সচেতন চিন্তায় Ovid-এর কাব্যাদর্শ অনুপস্থিত ছিল না। দুটি কাব্যে এই সদৃশতার প্রমাণ-পরিচয় নিয়ে এককালে পণ্ডিতেরা বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রাচ্য-বিরোধী প্রতীচ্য আদর্শ-বুদ্ধির প্রচুর নিন্দা করেছিলেন!

বীরাঙ্গনা ও মধুসূদনের প্রাচ্য-চেতনা

কিন্তু, মনে রাখতে হবে,—ভাব-প্রেরণার পক্ষে এ-ধরণের তথ্যানুসন্ধিৎসা কেবল আংশিক মূল্যাবহ,—'এহ বাহ্য'। বস্তুতঃ এই কাব্যের অন্তরঙ্গে আপাদমস্তক বিচ্ছুরিত হয়ে আছে সমকালীন রেনেসাঁস-সমুচ্ছ্বসিত জীবন-প্রেরণার শান্ত পরিমিত, বিচিত্র-সুন্দর ভাব-সুষমা।

বীরাঙ্গনার শিল্প-স্বভাব

বলা হয়ে থাকে,—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরে মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা'র রূপাঙ্গিককে বেছে নিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর-ছন্দকে আরো পিনদ্ধ-গম্ভীর পূর্ণতা দেবার উদ্দেশ্যে। বর্ণনাত্মক কাব্যের মধ্যে নাকি অমিত্রাক্ষরের উদাত্ততা সংসক্ত হতে পারছিল না,—তাই বীরাঙ্গনার ঘটনাত্মক নাট্যধর্মী রূপায়ন। ডঃ সুকুমার সেনও এই কাব্যে 'ভাণিকা' বা Monologue ধর্মিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। বীরাঙ্গনার সব কয়টি পত্রেরই আকার Monologue-এর মত হলেও সকল কবিতাই নাট্যধর্মী বা 'Dramatic' নয়। বরং, যে সাধারণ শিল্পগুণের দ্বারা এই বিভিন্ন বিষয়ক, বিচিত্র চরিত্রান্বিত পত্রাবলী বিভা-দীপ্ত, তাকে রোমাণ্টিক,—Lyric-সৌন্দর্য বলা যেতে পারে। Ovid-এর কাব্যেরও বৈশিষ্ট্য আসলে তাই। গ্রীক মহাকাব্য ও পুরাণের শূরধর্মী (Heroic) গল্প-দেহে প্রেমানুরক্তির রোমাণ্টিক শিল্প-মণ্ডন করেছেন তিনি। মধুসূদনের পক্ষে এ আকাঙ্ক্ষা ছিল স্পষ্টতর;—পূর্বোদ্ধৃত পত্রাংশ পুনরায় স্মরণ করিঃ—"Possibly I have got a tendency in the lyrical way."

বস্তুতঃ, মধুসসূদনের মৌল Lyric প্রবণতাকে সহজে ধারণ ও বহন করতে পারার ক্ষমতাতেই বীরাঙ্গানার অমিত্রচ্ছন্দের অ-পূর্বতা। অনায়াসে সম্পূর্ণ এ-ছন্দের প্রকৃতি কেবল উদাত্ত-গম্ভীর নয়, করুণ, মসৃণও। 'তিলোত্তমা সম্ভব'-এ প্রকাশিত অমিত্রাক্ষরের স্বভাব-কীর্তন করে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন,—'প্রগাঢ়' রচনার্থই অমিত্রাক্ষর ছন্দ "নিতান্ত" আবশ্যক"। আর, অমিত্রাক্ষরের প্রগাঢ়তার জন্য তাঁর মতে,—'সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক।' পয়ারাদি মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন,—"কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়।"১ 'তিলোত্তমা' এবং মেঘনাদবধের অধিকাংশের ছন্দ-স্বভাব সম্বন্ধে এই মন্তব্য সত্য। কিন্তু, আগে দেখেছি,—বাঙালির নবোদ্ভিন্ন জীবন-ভাবনার অবাধ মুক্তি-পথ রচনার কামনা-ই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। মধুসূদন নিজেও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। আর, এ কথাও লক্ষ্য করেছি যে, আলোচ্য বাঙালি

বীরাঙ্গনা ও অমিত্রাক্ষরের মসৃণতা

১। দ্রষ্টব্য—'জীবন-চরিত।'

জীবন-ভাবনা সেদিন প্রধানতঃ ছিল সামাজিক-পারিবারিক মূল্যবোধের অতলে বিধৃত। তাই, প্রগাঢ়তা অর্থে আলঙ্কারিক বীর-রস মনে করা উচিত নয়। গভীর আবেগ-অনুভবের সংগে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের মূলগত মহিমা ও করুণাকে যুগপৎ অভিব্যক্ত করেই বীরাঙ্গনার অমিত্রচ্ছন্দ হয়েছে চরিতার্থ। মেঘনাদবধে অমিত্রাক্ষরের ওজস্বিতা-কেই (grandeur) বহুলাংশে আবিষ্কার করেছিলেন কবি মধুসূদন। আর, বীরাঙ্গনার প্রথম পত্রেই সে ওজস্বিতার মর্মমূলে করেছিলেন গীত-সুষমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

"বন নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
হে রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে।
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী!"

"সংযুক্ত প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী নেই",—"কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত" হলেও কত ঘন-নিবন্ধ এই অমিত্রাক্ষরের সুর ঝঙ্কার! জীবন-চরিতকার এ-সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—"তাঁহার [মধুসূদনের] প্রতিভা মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য এবং ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য, একাধারে সম্মিলিত করিতে প্রস্তুত হইল; ইহার ফল বীরাঙ্গনা-কাব্য। বীরাঙ্গনায় সেইজন্য এক-দিকে বনবাসিনী, ঋষিবালিকা শকুন্তলার করুণ মর্মভেদী বেদনার এবং অপরদিকে বীর-প্রসূতি, তেজস্বিনী, জনার হৃদয়ভেদী তিরস্কার সম্মিলিত হইয়াছে। বীরাঙ্গনা মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সংযোগ-সূত্র স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর ও কোমল অংশের সম্মিলনস্থল।"

বীরাঙ্গনার ঐতিহাসিক স্বভাব

বীরাঙ্গনার ঐতিহাসিক স্বভাবের যথার্থতর পরিচায়ন অসম্ভব। তাই, 'গঙ্গা' 'জনা' অথবা 'কৈকেয়ী' পত্রের নাটকোচিত সংঘাত-উৎক্ষেপ দেখে অভিভূত হবার কারণ নেই। একই সংগে অনুভব করতে হবে শকুন্তলার কারুণ্য, রুক্মিণীর ব্রীড়া-কুণ্ঠিত অনুরাগ-রক্তিমা; দ্রৌপদী-কৈকেয়ী-শূর্পনখা-তারার আপাত-নিন্দিত স্বভাব-প্রকাশকেও পরিহার করলে চল্‌বে না। আসল কথা, মধুসূদন তাঁর সৌন্দর্য-সন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে বাংলার নারী-কেন্দ্রিক পরিবারানুক সমাজ-ধর্মের মূলে অবগাহন করেছেন,—সেখান থেকে অজস্র বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নারীজীবনের নানা চরিত্র আহরণ করেছেন,—অনুভূতির নিবিড়তায়, চরিত্রশক্তির অমোঘতায়, স্নেহ-প্রেম-মমতার কারুণ্যে, ব্যক্তি-স্বভাবের অনন্ত জটিলতায় যাদের আবেদন অপরিসীম! বাঙালি-ধর্মী জীবনাবেদনের এই নিঃসীম বৈচিত্র্য বীরাঙ্গনার কবি-ধর্মকে করেছে চরিতার্থ।

'বীরাঙ্গনা' কাব্য-নামের তাৎপর্য সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসা এযাবৎ উত্থাপিত হয়েছে। সাধারণ ভাবে Ovid-এর কাব্যের নামকরণের দ্বারাই

কিন্তু, মনে রাখতে হবে,—ভাব-প্রেরণার পক্ষে এ-ধরণের তথ্যানুসন্ধিৎসা কেবল আংশিক মূল্যাবহ,—'এহ বাহ্য'। বস্তুতঃ এই কাব্যের অন্তরঙ্গে আপাদমস্তক বিচ্ছুরিত হয়ে আছে সমকালীন রেনেসাঁস-সমুচ্ছ্বসিত জীবন-প্রেরণার শান্ত পরিমিত, বিচিত্র-সুন্দর ভাব-সুষমা।

বলা হয়ে থাকে,—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরে মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা'র রূপাঙ্গিককে বেছে নিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর-ছন্দকে আরো পিনদ্ধ-গম্ভীর পূর্ণতা দেবার উদ্দেশ্যে। বর্ণনাত্মক কাব্যের মধ্যে নাকি অমিত্রাক্ষরের উদাত্ততা সংসক্ত হতে পারছিল না,—তাই বীরাঙ্গনার ঘটনাত্মক নাট্যধর্মী রূপায়ন। ডঃ সুকুমার সেনও এই কাব্যে 'ভাণিকা' বা Monologue ধর্মিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। বীরাঙ্গনার সব কয়টি পত্রেরই আকার Monologue-এর মত হলেও সকল কবিতাই নাট্যধর্মী বা 'Dramatic' নয়। বরং, যে সাধারণ শিল্পগুণের দ্বারা এই বিভিন্ন বিষয়ক, বিচিত্র চরিত্রান্বিত পত্রাবলী বিভা-দীপ্ত, তাকে রোমাণ্টিক,—Lyric-সৌন্দর্য বলা যেতে পারে। Ovid-এর কাব্যেরও বৈশিষ্ট্য আসলে তাই। গ্রীক মহাকাব্য ও পুরাণের শূরধর্মী (Heroic) গল্প-দেহে প্রেমানুরক্তির রোমাণ্টিক শিল্প-মণ্ডন করেছেন তিনি। মধুসূদনের পক্ষে এ আকাঙ্ক্ষা ছিল স্পষ্টতর;—পূর্বোদ্ধৃত পত্রাংশ পুনরায় স্মরণ করি :—"Possibly I have got a tendency in the lyrical way."

বীরাঙ্গনার শিল্প-স্বভাব

বস্তুতঃ, মধুসসূদনের মৌল Lyric প্রবণতাকে সহজে ধারণ ও বহন করতে পারার ক্ষমতাতেই বীরাঙ্গানার অমিত্রচ্ছন্দের অ-পূর্বতা। অনায়াসে সম্পূর্ণ এ-ছন্দের প্রকৃতি কেবল উদাত্ত-গম্ভীর নয়, করুণ, মসৃণও। 'তিলোত্তমা সম্ভব'-এ প্রকাশিত অমিত্রাক্ষরের স্বভাব-কীর্তন করে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন,—'প্রগাঢ়' রচনার্থই অমিত্রাক্ষর ছন্দ "নিতান্ত" আবশ্যক"। আর, অমিত্রাক্ষরের প্রগাঢ়তার জন্য তাঁর মতে,—'সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক।' পয়ারাদি মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন,—"কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়।"[১] 'তিলোত্তমা' এবং মেঘনাদবধের অধিকাংশের ছন্দ-স্বভাব সম্বন্ধে এই মন্তব্য সত্য। কিন্তু, আগে দেখেছি,—বাঙালির নবোদ্ভিন্ন জীবন-ভাবনার অবাধ মুক্তি-পথ রচনার কামনা-ই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। মধুসূদন নিজেও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। আর, এ কথাও লক্ষ্য করেছি যে, আলোচ্য বাঙালি

বীরাঙ্গনা ও অমিত্রাক্ষরের মসৃণতা

১। দ্রষ্টব্য—'জীবন-চরিত।'

জীবন-ভাবনা সেদিন প্রধানতঃ ছিল সামাজিক-পারিবারিক মূল্যবোধের অতলে বিধৃত। তাই, প্রগাঢ়তা অর্থে আলঙ্কারিক বীর-রস মনে করা উচিত নয়। গভীর আবেগ-অনুভবের সংগে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের মূলগত মহিমা ও করুণাকে যুগপৎ অভিব্যক্ত করেই বীরাঙ্গনার অমিত্রচ্ছন্দ হয়েছে চরিতার্থ। মেঘনাদবধে অমিত্রাক্ষরের ওজস্বিতা-কেই (grandeur) বহুলাংশে আবিষ্কার করেছিলেন কবি মধুসূদন। আর, বীরাঙ্গনার প্রথম পত্রেই সে ওজস্বিতার মর্মমূলে করেছিলেন গীত-সুষমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

"বন নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
হে রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে।
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী!"

"সংযুক্ত প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী নেই",—"কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত" হলেও কত ঘন-নিবদ্ধ এই অমিত্রাক্ষরের সুর ঝঙ্কার! জীবন-চরিতকার এ-সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—"তাঁহার [মধুসূদনের] প্রতিভা মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য এবং ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য, একাধারে সম্মিলিত করিতে প্রস্তুত হইল; ইহার ফল বীরাঙ্গনা-কাব্য। বীরাঙ্গনায় সেইজন্য এক-দিকে বনবাসিনী, ঋষিবালিকা শকুন্তলার করুণ মর্মভেদী বেদনার এবং অপরদিকে বীর-প্রসূতি, তেজস্বিনী, জনার হৃদয়ভেদী তিরস্কার সম্মিলিত হইয়াছে। বীরাঙ্গনা মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সংযোগ-সূত্র স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর ও কোমল অংশের সম্মিলনস্থল।"

বীরাঙ্গনার ঐতিহাসিক স্বভাব

বীরাঙ্গনার ঐতিহাসিক স্বভাবের যথার্থতর পরিচায়ন অসম্ভব। তাই, 'গঙ্গা' 'জনা' অথবা 'কৈকেয়ী' পত্রের নাটকোচিত সংঘাত-উৎক্ষেপ দেখে অভিভূত হবার কারণ নেই। একই সংগে অনুভব করতে হবে শকুন্তলার কারুণ্য, রুক্মিণীর ব্রীড়া-কুণ্ঠিত অনুরাগ-রক্তিমা; দ্রৌপদী-কৈকেয়ী-শূর্পনখা-তারার আপাত-নিন্দিত স্বভাব-প্রকাশকেও পরিহার করলে চল্‌বে না। আসল কথা, মধুসূদন তাঁর সৌন্দর্য-সন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে বাংলার নারী-কেন্দ্রিক পরিবারানুক সমাজ-ধর্মের মূলে অবগাহন করেছেন,—সেখান থেকে অজস্র বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নারীজীবনের নানা চরিত্র আহরণ করেছেন,—অনুভূতির নিবিড়তায়, চরিত্রশক্তির অমোঘতায়, স্নেহ-প্রেম-মমতার কারুণ্যে, ব্যক্তি-স্বভাবের অনন্ত জটিলতায় যাদের আবেদন অপরিসীম! বাঙালি-ধর্মী জীবনাবেদনের এই নিঃসীম বৈচিত্র্য বীরাঙ্গনার কবি-ধর্মকে করেছে চরিতার্থ।

'বীরাঙ্গনা' কাব্য-নামের তাৎপর্য সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসা এযাবৎ উত্থাপিত হয়েছে। সাধারণ ভাবে Ovid-এর কাব্যের নামকরণের দ্বারাই

হয়ত মধুসূদন প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু, Ovid-এর কাব্য-নামের তাৎপর্য নির্দেশও সহজ নয়। আগে বলেছি, মহাকাব্যিক 'শূরযুগ'-এর (Heroic Age) নায়ক-নায়িকার আখ্যায়িকা পত্র বলেই হয়ত Heroid নাম পছন্দ করেছিলেন Ovid। তা ছাড়া, মূলতঃ রোমাণ্টিক প্রণয়ভাবুকতা-স্পৃষ্ট হলেও, তাঁর কাব্যের পৌরাণিক নায়িকাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন নিজে রাজ্যাধীশ্বরী, কেউ রাজ-পত্নী, কেউ-বা বীর-রাজ-প্রণয়িনী। এদের প্রণয়-পত্রেও তাই রোমাণ্টিক কোমলতার সংগে আদিম শৌর্যের অমসৃণতা দূরান্বিত ছিল না। কিন্তু, মধুসূদনের নায়িকা-পত্রলেখিকাদের সম্বন্ধে একথা সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়। জনা, গঙ্গা বা কৈকেয়ীর অন্তর্বর্তী রাজ-বংশোচিত দার্ঢ্যও অন্যান্য রাজ-সম্পর্কিত চরিত্রাদিতে নেই। প্রথমে শকুন্তলা-পত্রের উদ্ধৃত অংশের কথাই বলি :—উপেক্ষাকারী রাজ-স্বামীকে আত্ম-কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে যে নারী 'দাসী' বলে নিজের পরিচয় দিতে পারে, তাকে বীরঙ্গনা বলব কী করে?

বীরাঙ্গনা নাম

Ovid-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে; এমন কি সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যের পূর্ব-সংস্কারের কথা ভেবেও এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু, রেনেসাঁস-পীড়িত সমকালীন বাঙালি-চেতনার মর্মভেদ করে মধুসূদনের অবচেতন কবি-মানস, পরোক্ষে হলেও, সে উত্তর স্পষ্ট আবিষ্কার করেছে বলে মনে করি।—শকুন্তলা নিজেকে বিবাহিত স্বামীর দাসী বলে উল্লেখ করেছে,—কিন্তু, সে কালের অসংখ্য বাঙালিনীর মত নিজের নারী-ব্যক্তিত্বকে সতীত্বের নামের দাসীত্বের অপমানকর গ্লানিতে লাঞ্ছিত করেনি। আত্মকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বনবাসিনী তার রাজ-পতিকে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে :—

ও বীরাঙ্গনার নায়িকা-পরিচয়

"জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র সদৃশ
ঐশ্বর্য মহিমা তব, অতুল জগতে;
কুল, ধন, মানে তুমি রাজকুল-পতি।
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব, সেবিবে
দাসী ভাবে পা দু'খানি,—এই লোভ মনে,—
এই চির আশা, নাথ,—এ পোড়া হৃদয়ে!

শকুন্তলা এখানে আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। স্বামি-সঙ্গ-কামনার নৈতিক অধিকার-বুদ্ধিই তাকে এই পত্ররচনায় প্রবুদ্ধ করেছে, রাজ-সুখের কোনো প্রলোভন নয়। সংযত সম্ভ্রান্ত ভাষায় এই চরিত্র-মর্যাদাকে শকুন্তলা প্রকাশ করেছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সেই সংগে নিজ লাঞ্ছিত নারী-ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে তীব্রতর প্রশ্ন উত্থাপিত করেছে :—

'চির অভাগিনী আমি। জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি কি পাপে?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে।
এ নব-যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ যুগে।'

—এ প্রশ্ন পৌরাণিক দুষ্যন্তের কাছে পৌরাণিক শকুন্তলার নয়;—উনিশ শতকের নীতি-বিপর্যস্ত নাগরিক সমাজ-মানসের সামনে নবোদ্ভিন্ন-ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র-নারীত্বের আধুনিক জিজ্ঞাসা। মনে পড়ছে, "নারীত্বের দিক দিয়া রোহিণীর জীবন যে ব্যর্থ হইয়া গেল, সে কাহার অপরাধে এবং কিসের অপরাধে?"—এমনি একটি প্রশ্ন শরৎচন্দ্র একদা
১। শকুন্তলা করেছিলেন বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল প্রসঙ্গে। উনিশ শতকের বিদ্রোহী নারী-ব্যক্তিত্বের সেই একই প্রশ্ন অস্ফুট হলেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে এখানে শকুন্তলার কণ্ঠে! পূর্ব-কথার প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলব, এই ব্যক্তিত্বময়ী মর্ম-পীড়িতা নারী মধুসূদন-জননী জাহ্নবীর স্পর্শাতুর জীবন-বেদনা-ভারেই যেন আনমিতা।

অতএব দেখছি, শকুন্তলা সংযম-সংভ্রমে কুণ্ঠিতা হলেও মৌল স্বভাবে সে বিদ্রোহিনী। এই বিদ্রোহের-ই স্পষ্টতম
২। জনা ভেরি-নিনাদ শুনি 'জনা' পত্রে। কিন্তু, সেখানেও আছে প্রচলিত অনিয়ম-অন্ধতার বিরুদ্ধে তীব্র জ্বালাঃ—

"কুল নারী আমি নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা।"

সেই অক্ষমতা,—তথা সেই নারী-জীবন-সীমায়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জনা নিজেই পুড়ে মরেছে সে "মনাগুনে"। শকুন্তলার মধ্যে যে বিদ্রোহ-বহ্নি শান্ত-সমাহিত, জনা'য় তা শতশিখায় উৎক্ষিপ্ত-উদ্‌গীর্ণ। তাই জনা বিদ্রোহিনী!

এমনি করে, যুগ-দৃষ্টির ভাবানুষঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখব,—বীরাঙ্গনার প্রতি পত্রে রেনেসাঁস যুগের বিদ্রোহ ও মর্ম-পীড়া প্রতিটি নারী চরিত্রে কোন-না-কোনো রূপে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই বেদনার্ত বিদ্রোহের মর্মবাণী যেখানে তারা বহন করেছে, সেইখানেই নবজাগ্রত ভাবনার কাছে তারা বীরাঙ্গনা। প্রতি পত্রের অর্থ-প্রকাশ বর্তমান চেষ্টার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। সাহিত্য-দৃষ্টির মূলীভূত ঐতিহাসিক
অপরাপর নায়িকা প্রেরণাকে দ্ব্যর্থহীন মুক্তি দানই আমাদের এক-

মাত্র আকাঙ্ক্ষা। এ-দিক থেকে তথাকথিত অসামাজিক বিষয়-সম্বলিত আর চারটি পত্রের উল্লেখ করব।

প্রথমেই বলি দ্রৌপদীর কথা। ভারতীয় কাব্য-পুরাণে আভিধানিক অর্থেও দ্রৌপদীর তুল্য বীরাঙ্গনা অলভ্য-প্রায়। অথচ, মধুসূদন তার সেই বীর্য-দীপ্ত স্বভাবের প্রতি লক্ষ্যও করেন নি। এ-বিষয়ে জীবন-চরিত-কার নানারূপ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, তাঁর সব কথা মেনে নিয়েও স্মরণ করতে হবে,—দ্রৌপদীর পরিকল্পনা প্রচলিত সমাজ-সংস্কারেই আঘাত করেছে,—আর সে সংস্কার প্রধানতঃ তথাকথিত সতীত্বের। মহাভারতের শিল্পী দ্রৌপদীর স্বর্গারোহণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন তার 'অসতী-জনোচিত' আচরণের জন্য! পঞ্চ-স্বামীর এক পত্নীর পক্ষে সকলের প্রতি সমান প্রণয় বণ্টন সতীত্বাদর্শের অমোঘ দাবি। কিন্তু, এ দাবি মানবিক নয়,—যান্ত্রিক; একথা বুঝেছিলেন উনিশ শতকের বাঙালি মানবতা-বোধের পূজারী মধুসূদন। দ্রৌপদীর পতিপ্রেম ওজন মেপে চলতে পারে নি। এ যদি নৈতিক অপরাধ হয়ও, তবু তা মানবিক! এই মানবিক দুর্বলতার প্রতিই সমব্যথাতুর হয়ে আছেন কবি মধুসূদন।

৩। দ্রৌপদী

স্বামীর মৃত্যুর পরোক্ষ উপলক্ষ্য-মাত্র বলেই কৈকেয়ী চিরকাল স্বামি-হন্ত্রীর অনপনেয় কলঙ্কে বিভূষিত হয়ে আছেন। কিন্তু, তাঁর এ অপবাদ শতাংশের একাংশ সত্য যদি হয়ও, তবু তিনি যে "ভরত-জননী মহীয়সী", একথা অস্বীকার করব কী করে! নারীর মধ্যে পত্নীত্বের সংগে মাতৃত্ব-ও রয়েছে। আর, পত্নী-চেতনার সংগে মাতৃ-চেতনার বাসনা-দ্বন্দ্বে কোনো জটিলতা যদি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে-ই, তবু অজস্র-জটিলতা-তাড়িত আধুনিক মানুষ তাকে ঘৃণা বা উপেক্ষা করতে পারে না!

৪। কৈকেয়ী

তারপরে শূর্পনখার কথা! বিধবা-নারীর নব-জীবন-রচনার স্বপ্নকে উচ্ছৃঙ্খলতার অপরাধ-লাঞ্ছিত করে শূর্পনখার নাসিকা-কর্ণ-ছেদনের নিষ্ঠুর নির্দেশ দিয়েছেন আদিকবি। কিন্তু, বিদ্যাসাগরের করুণাসাগর-নিষিক্ত মধুসূদনের যুগ-জীবন বিধবা নারীর প্রতি সমমর্মী হয়েছে। সেই সংগে ইন্দ্রিয়-লালসাকে কোনো অবস্থাতেই সে স্বীকার করে নি। বিধবার মধ্যে নারীত্বের শূন্যতাবোধ-মাত্রই ইন্দ্রিয়াসক্তি নয়, উনিশ শতকের নারী-স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি এ-কথা ভুল্‌তে পারেনি। শূর্পনখার কণ্ঠে কবি মধুসূদন প্রেম-তপস্যার মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন ঃ—

৫। শূর্পনখা

"এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়-মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে।
নহে কহ প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!"

লক্ষ্য করলে দেখব,—ব্যক্তি নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা-বুদ্ধি, জীবন-বাসনা ও সৌন্দর্যবোধ সুপ্রাচীন সমাজ-সংস্কারের বিরোধিতা করে অনপনেয় জটিলতা সৃষ্টি করেছিল সেদিন। সেই জটিল জীবনাবর্ত বীরাঙ্গনার সৌন্দর্য-বেদীমূলে নবীন প্রাণের দীপ্তি যোজন করেছিল। শূর্পনখা-ও সেই জটিল প্রাণধর্মের যুগোচিত উজ্জ্বলতায় ভাস্বর।

৬। তারা

সর্বাধিক সমস্যা 'তারা'কে নিয়ে। আগে বলেছি, যৌন নীতিবোধের ব্যাপারে মধুসূদন-চেতনার বিশুদ্ধি Puritan-এর মত ছিল সদা-সন্ত্রস্ত। 'তারা' পত্রিকার প্রারম্ভের সূমিত-ভাষণে এই ত্রস্ত মনের পরিচয় উদ্ধার করেছি!—সমগ্র পত্রিকার মধ্যেও নৈতিক দুরাচরণের বিরুদ্ধে বিরক্ত আত্ম-ধিক্কারবাণী ঘন ঘন উচ্চারিত হয়েছে তারার নিজেরই কণ্ঠেঃ—

"জনম মম মহাঋষি কুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে
পরিমলাকার ফুলে, হায়, হলাহল?
কোকিলের নীড়ে কিরে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু?—কর্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী!—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে!"

কবি নিজে যে বিষয়ে কুণ্ঠাবোধ করেছেন, তার অনাবৃত আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্তি নেই। কেবল এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে শরৎচন্দ্রের আত্ম-সমর্থন বাণীঃ—"লোকে বলে আমি পতিতাদের সমর্থন করি। সমর্থন আমি কিছুই করিনে। কেবল অপমান করতেই মন চায় না। আমি বলি এরাও মানুষ; এদেরও নালিশ জানাবার অধিকার রয়েছে। এবং মহাকালের দরবারে এদেরও বিচারের দাবি একদিন তোলা রইল।"[১] উনিশ শতকের সদ্য-প্রবুদ্ধ নারীব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য-ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাপিষ্ঠা তারাও যুগ-প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে মানবিক সহানুভূতিপূর্ণ বিচারের দাবিই করেছে; এই ভূমিকায় তারা-ও যথার্থ বীরাঙ্গনা।

১। স্বদেশ ও সাহিত্য

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করি,—বীরাঙ্গনার এগারটি পত্রে এগারটি পৃথক বিচিত্র নারী-চরিত্রের অবতারণা কেবল করেন নি মধুসূদন, সেই স্বাতন্ত্র্যের চারিত্র-স্বভাবকে ব্যঞ্জিত,—সু-অবয়ব-বিন্যস্ত করে তুলেছেন। এই স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত, জটিলতাচ্ছন্ন, রোমাণ্টিক-পারিবারিক জীবন-সৌন্দর্যের ভিত্তিমূলেই পরোক্ষে উত্তপ্ত হয়েছে অনাগতকালের উপন্যাসকলার প্রাণ-বীজ।

সর্বশেষে মধুসূদনের শেষ উল্লেখ্য কাব্য চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কথা উল্লেখ করি। বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে,— মধুসূদনেরই হাতে। ঐ সময় ইটালীর ভাষা-সাহিত্যে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রবেশ সুরু হয়েছে। রাজনারায়ণের কাছে একটি চিঠিতে মধুসূদন তাঁর প্রথম সনেটটি লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ

"কবি-মাতৃভাষা"

"নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন শয়ন ত্যজে ইষ্টদেবে স্মরি,
তাহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গ কুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?"

চতুর্দশপদী কবিতা

তার পরে 'চতুর্দশপদী'র কাব্য-উৎস দীর্ঘদিন ঊষর হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, "ফরাসীস্ দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে" চতুর্দশপদীর পুনর্জন্ম।

'চতুর্দশপদীর ইতিহাস

চতুর্দশপদীর অর্থে প্রতীচ্য 'সনেট্'-এর কথাই বুঝেছিলেন মধুসূদন। আর, এই প্রসঙ্গে তিনি ইটালীর সনেট্-এর বিখ্যাত কবি Petrarch-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। ফলে, মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা-প্রসঙ্গে ইতালীর এবং অন্যান্য প্রতীচ্য দেশীয় সনেট কবিতার রূপাঙ্গকের বিচার এতাবৎ করা হয়েছে একান্তভাবে। সন্দেহ নেই, সনেট্ বিশেষভাবে রূপ-সচেতন কবিতা। কিন্তু, এ কথা আবার স্মরণ করব যে, নিছক রূপ-সিদ্ধি-ই কোনো কবি-কর্মকে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারে না। রসের প্রয়োজনেই

কাব্য-সাহিত্যে রূপের প্রাসঙ্গিকতা। সনেট্-এর জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কেও এ-কথা সমান সত্য।

সনেট্-এর জন্ম সম্বন্ধে অনুমান করা হয়েছে ঃ—"On the whole the most probable account is that it sprang, as the result of endless experiments, from the popular short poems sung, in early medeaval times, with or without refrain to musical accompaniment, as idyl of theocitus arose from similarly pastoral strains."১

ও সনেট্-এর জন্ম-কথা

—স্পষ্ট দেখছি, লোক-সঙ্গীতকে দৃঢ় রূপান্বিত করে তোলার ঐতিহাসিক চেষ্টা থেকেই সনেট্-এর জন্ম।—অন্তঃ-স্বভাবে সনেট্ বিশুদ্ধ গীতি-কবিতা,—Lyric। লোক-মানসের নিভৃত-শুদ্ধ ভাবানুভূতিকে পিনদ্ধ-দেহ সৌন্দর্যে ভূষিত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই কাব্যকলার জন্ম। অতএব, সার্থক সনেট্-রচয়িতার প্রধান বৈশিষ্ট্য কেবল তীব্র আঙ্গিক-সচেতনতা নয়, —বিশুদ্ধ (unadulterated) গভীর অনুভূতি-নিবিড়তা-ও।

সিসিলি দ্বীপের Piero delle Vigne (d. 1249)-ই নাকি সনেট রূপাঙ্গকের একটি 'সুপ্রাচীন সহনীয়' নিদর্শনের রচয়িতা। তাঁর পরের উল্লেখ্য কবি Guittone (১২৯৪ খৃীঃ); ইনি সনেটের আইন কানুনকে প্রথম দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দান করেন।—অষ্টক-ষট্‌ক-এর ভাব-বিভাগ; অষ্টকে ab ba ab ba ধরনের সুনির্দিষ্ট অন্ত্যমিল; ষটক্-এর বিশেষ গঠনভঙ্গি-নির্দেশ, সব কিছুই Guittone-এর দান।—

প্রথম উল্লেখ্য সনেট্-কবি

"It was the Guittonian sonnet which, in the hand of Dante and Petrarch, became—ceatain aberations not withstanding, —the unquestioned model for later Italian writers."১

Dante এবং Petrarch-ই যে য়ুরোপীয় সনেট্ সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন, তাতে সংশয় নেই। মধুসূদনও তাঁর সনেট প্রসঙ্গে বিশেষভাবে পেত্রার্কের (১৩০৪-১৩৭৪ খৃীঃ) কথাই বলেছেন। আগেই দেখেছি, সনেট-এর রূপাঙ্গিক পেত্রার্কের হাতে প্রাণবান হয়ে উঠেছিল। অবশ্য, গিটন্-এর অন্ত্যমিল-এর তুলনায় পেত্রার্কের অন্ত্যমিলে বিচিত্রতা আছে; তাই অভিনবতাও আছে কিছু কিছু। অষ্টকের অন্ত্যমিল প্রধানতঃ দু-রকমের ab ba ab ba এবং ab ab ab ab। ষট্‌ক-এর অন্ত্যমিল cde dce বা cde

দান্তে ও পেত্রার্কা

১। Encyclopaedia Britannica.
২। ঐ।

cde।১ অন্যতর বিচিত্রতাও দুর্লভ নয়। কিন্তু, নিছক এই রূপ-বিচিত্রতাই পেত্রার্কের সনেট-এর রস-সফলতার উৎস নয়। আসলে তিনি সনেট-কবিতার রূপলোকের মর্মে প্রাণের প্রবাহ রচনা করেছিলেন। গীটন্ সনেটের রূপকার,—পেত্রার্ক প্রথম জীবন-শিল্পী। আর, সে শিল্প-কর্ম পেত্রার্ক-এর জীবন-বেদনার দ্বারাই হয়েছিল একান্ত সঞ্জীবিত।

১৩২৭ খৃীঃ ইস্টার ফ্রাইডে-র দিনে Laura নাম্নী এক বিবাহিতা মহিলাকে প্রথম দেখেছিলেন কবি পেত্রার্ক,—দেখামাত্রই হয়েছিলেন তাঁর প্রণয়াসক্ত। সেখানেই তাঁর বিখ্যাত Laura Poems-এর জন্ম-সূচনা। আর এই Laura Poems-এরই প্রায় ৩০০টি ছিল "Sonnetti." ১৩৪৮ খৃীঃ Laura লোকান্তরিতা হয়েছিলেন,—কিন্তু পেত্রার্ক আ-মরণ বহন করেছিলেন এই প্রণয়-বেদনার সৌন্দর্য-দাহ। সে সঙ্গে তাঁর Laura কবিতার ধারাও অনির্বাণ প্রবাহিত হয়েছে। Laura Poems,—তথা পেত্রার্ক-এর সনেট-কবিতার অন্তঃস্বভাব নির্দেশ করে বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন,—

পেত্রার্কার সনেট্-এর প্রাণ উৎস

"The poetry springs form the struggle in Petrarch's mind between the senses and a Christian sense of their wrongness, a struggle finally solved by the abandönment of the creature for the Creator."২

স্পষ্টই দেখছি, গীটন-এর কঠিন কাব্য-রূপাঙ্গিক পেত্রার্কায় প্রাণ পেয়েছে, কবির অন্তঃসংগ্রামের বেদনা-দগ্ধ শুদ্ধি ও প্রশান্তির মধ্যে। এর পর থেকে সুমিত বহিরঙ্গ রূপাবয়বকে সত্য-শুদ্ধ প্রাণ-ধারায় প্রবাহিত করেই সনেট্-কবিতা হতে পেরেছে পূর্ণাঙ্গ সার্থক। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতার' রসোত্তীর্ণ সিদ্ধির মূলেও রয়েছে কেবল রূপাঙ্গিকগত বিশুদ্ধি নয়, তাঁর মর্মপীড়িত জীবনানুভূতির সত্যতা। এ-বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন;—"সেই সুদূর সাগর-পারের দেশে যখন ঘরছাড়া কবির চিত্তে 'মন-কেমনের হাওয়ার পাকে' অনেক স্মৃতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখনই সেই সনেট্গুলির জন্ম (১৮৬৫ খৃীঃ)! দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার রেশ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে ঝঙ্কৃত রহিয়াছে।"৩ কবি-চিত্তের এই বেদনা-বোধ যেখানে অনন্য-সাপেক্ষ পরিশুদ্ধি ও নিবিড়তা অর্জন করেছে, সেখানেই চতুর্দশপদীর রূপ-নিগড়ে শিল্প-প্রাণের হৃৎস্পন্দন

সনেট-শিল্পী মধুসূদন ও পেত্রার্কার প্রাণধর্ম

১। উদ্ধৃত অন্ত্যমিল-রীতির নিদর্শন হিসেবে যথাক্রমে দ্রষ্টব্য ঃ—Hindert Ausge Wahlte Sonette-র Sonette on Laura I কাব্যের XV সংখ্যক কবিতা ও একই কাব্য দ্বিতীয় খণ্ডের কবিতা সংখ্যার XLIII.

২। Chamber's Encyclopaedia.

৩। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।

হয়েছে লাবণ্য-বিভান্বিত। পূর্বে উদ্ধৃত সনেটটিতে মধুসূদন সচেতন-ভাবে কবিতার রূপাঙ্গিক রচনাতেই অতি অবহিত হয়েছিলেন।—রূপ তাতে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে,—কিন্তু নিষ্প্রাণ বলেই কবিতা নিখুঁত হতে পারে নি। অথচ, ঐ একই কবিতা সদ্য-কথিত প্রাণ-বেদনার রসে নিষিক্ত হয়ে নূতন শিল্প-সিদ্ধি লাভ করেছিল চতুর্দশপদী কবিতাবলীর তৃতীয় সংখ্যক পদে ঃ—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায় মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে;—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥"

রূপ-বিশুদ্ধির 'পরে লাবণ্যের স্পর্শ সঞ্চারিত হলে চতুর্দশ-পদীর শিল্প-স্বভাব যে অপূর্ব 'সুষমা' লাভ করে, তার পরিচয় নিঃসংশয় হতে পারে প্রথম কবিতার সংগে এই দ্বিতীয় কবিতার তুলনা-বিচারে!

চতুর্দশপদী কবিতার সব কয়টিই উৎকৃষ্ট এবং পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে, এমন দাবি করা চলে না। 'কবি', 'কবিতা' ইত্যাদি বহু 'চতুর্দশপদী' রয়েছে, নিছক রূপাঙ্গিকের আলোচনা-বিচারে যা অতি-সচেতন! এ-সব কবিতা শিল্পকর্ম হিসেবেই কেবল নীরস নয়, সনেট হিসেবেও দুর্বল। স্বল্পাধিক প্রায় ৪০টি কবিতায় মধুসূদন পেত্রার্কার ছন্দ-রীতির হুবহু অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তার সব কয়টিই সার্থক সনেট্ নয়। অন্য বহু সনেটে মিল্টনের রূপ-কর্মের ছায়া-সম্পাত ঘটেছে। কিন্তু, এই রূপ-সিদ্ধির মধ্যেই কোথাও মধুসূদনের সনেট্-এর সার্থকতা নিহিত নেই। সনেট্এর রুক্ষ পাষাণ-দেহ বিদীর্ণ করে চতুর্দশপদী কবিতায় প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, কবির মর্ম-পীড়িত বেদনার উচ্ছ্বাসে।

চতুর্দশপদী কবিতার রস-উৎস

এ-বেদনা কেবল প্রবাসী কবির দূরাবস্থানের বেদনা নয়; তাঁর সারা

জীবন-যৌবনের পরিণামী ব্যর্থতা-বোধের Tragedy-সুরভিত। সমুদ্ভিন্ন কৈশোরের উষালগ্ন থেকেই মধুসূদন স্বপ্ন দেখেছেন,—তিনি কবি হবেন;—তাঁর কবি-কর্ম হবে কালের হাতে শাশ্বত যশ-কিরীট-শোভিত। আর, আজীবন তিনি কল্পনা করেছেন,—Albio'ns Shore, —ইংলন্ডের সাগর পারে পোঁছে গেলেই সেই দুর্লভ কবি-সিদ্ধি হবে তাঁর অনায়াস-আয়ত্ত। ভাগ্যের প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে মাতৃভূমির স্নেহ-অঙ্কেই যুগোত্তীর্ণ কবি-সিদ্ধি তিনি লাভ করেছিলেন। অথচ, সত্যই যেদিন আজীবন-যৌবনের স্বপ্ন-তীর্থ প্রতীচ্য খন্ডে পদার্পণ করলেন তারপর থেকে ক্ষণে ক্ষণে কবি অস্থির,—সঙ্কুচিত হয়েছেন অন্তর-নিরুদ্ধ কাব্য-প্রেরণার ক্রম-বিশুষ্কতা—ক্রম ঊষরতা লক্ষ্য করে। এই বিশুষ্কতার জন্য শূন্যতাবোধ যত ছিল,—আজীবনের স্বপ্ন এক মুহূর্তে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়ে যাওয়ার মর্ম-যন্ত্রণা ছিল ততোধিক। তাই আজ যখন 'কবতাক্ষ-তীরের বটবৃক্ষের' কথা কবি নূতন করে স্মরণ করেছেন, তখন তাতে দূরগত স্বজনের প্রতি প্রবাসি-মনের সকরুণ মমতাবোধই কেবল উচ্ছ্বসিত হয় নি; ব্যর্থ-স্বপ্ন জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাবোধ যুক্ত হয়েছে তার সংগে; কারুণ্যকে Tragedy-র গরিমায় করেছে ভূষিত। জীবনের করুণ যন্ত্রণাকে Tragedy-র মহিমায় শুদ্ধ-দীপ্ত করে তোলার এই গৌরব-মহিমাতেই মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী' Petrarch-এর Sonnetti'র সমধর্মী বলে বিশ্বাস করি। জীবনের এই সূক্ষ্ম গভীর Tragic মহিম মণ্ডিত প্রাণরসের একটি সার্থক অভিব্যক্তি 'নূতন বৎসর' কবিতা ঃ—

ও মধুসূদনের জীবন-বেদনা

"ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল;
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল।
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা;—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!"

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা মধুসূদন-প্রতিভার অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা (?), এবং ব্যর্থতার কথা অবতারণা করেছেন। আক্ষেপ করেছেন,—এমন বিরাট্ শক্তি অমন অপচয়িত না হলে, বাংলা সাহিত্যে আরো কত কী হতে পারত ভেবে! একই উপলক্ষ্যে মধুসূদনের 'আত্ম-বিলাপ' কবিতাটিরও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আমাদের ধারণা, ইতিহাসের বিচারে এ-সব কথাই নিরর্থক। আগে বলেছি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন বয়ঃসন্ধি,—যৌবন-সন্ধি লগ্নের কবি!—তাই রেনেসাঁসের মর্ম-পীড়া তাঁর সকল জীবন-কর্মকে ট্রাজিক ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করেছে। মধুসূদনের প্রতিভা যেমন সু-মহৎ, তাঁর অপূর্ণতার বেদনা তেম্নি মহত্তম। কিন্তু, মধুসূদনের বিনষ্টি তাঁর ঐতিহাসিক পরাভব-বার্তা সূচনা করে না;—ব্যক্ত করে অনিশ্চিত-গতি প্রথম যৌবনের অগ্নিজ্বালা এবং মর্মদাহ।

মধুসূদন-প্রতিভা ও ইতিহাসের শিক্ষা

সগর রাজার ষাট্‌হাজার ছেলে দুর্মদ যৌবন-শক্তির অন্ধ দম্ভে কঠিন মাটির 'পরে মহাসাগরের মহাখাত রচনা করেছিল। কিন্তু, যৌবন-শক্তির অন্ধতা তাদের চেতনার অতলে আগ্নেয় আবর্তের সৃষ্টি করেছিল। সগর-সন্তানেরা প্রাণ-মূলীভূত সেই দুর্বার যৌবনাগ্নিকে মুক্তি দিতে পারে নি,—নিজেরাই তাতে পুড়ে হয়েছে ছাই;—তাদের রচিত সগর-খাত কঙ্কালের মুখ-ব্যাদানের মত বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের বহিরঙ্গে যৌবন-শক্তির সেই উন্মাদ অন্ধতা তাঁর ব্যক্তি-জীবনকে অশান্ত, জ্বালা-তপ্ত করেছিল,—সে খবর দেখেছি। কিন্তু, এ-ও জেনেছি, —তাঁর শিল্পি-মানস ছিল ভগীরথের মতই ধ্যান-সন্দীপ্ত। ভগীরথের মতই বাঙালির জীবনের নির্জীব খোলসের খাতে নবীন প্রাণধর্মের মন্দাকিনী-প্রবাহ সঞ্চালিত করেছিলেন তিনি। কিন্তু, ভগীরথ-ও সগর-বংশধর। নিজের ধ্যান-নিমগ্ন আত্মার গভীরে যৌবন-শক্তির অপরাজেয় উৎসকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন।—সেই শক্তির প্রাবল্য দিয়েই স্বর্গের কল্যাণ-স্রোতকে মর্ত্যের শ্মশান-খাতে করেছিলেন প্রবাহিত। কিন্তু, গঙ্গা যেদিন সেই দুর্মদ শক্তির প্রথম স্পর্শে মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন, সেদিন কত মুনির আশ্রম-কুটীর—কত তপোবন-জনপদ,—কত ঐরাবত সেই যৌবন-প্রবাহের মুখে ভেসে বিলুপ্ত হয়েছে। মধুসূদন বাংলা কাব্যের সেই সর্বপ্লাবী প্রাণপ্রবাহের মঙ্গল-নির্ঘোষ ধ্বনিত করেছেন তাঁর সাধনা দিয়ে; বাঙালি সমাজের অভিশপ্ত যৌবনকে দিয়েছেন অনন্ত মুক্তি। তাই, ইতিহাসের পথে তাঁর সাধনা বহুধাব্যাপ্ত,—সুমিত সংহত নয়। কিন্তু, ভাগীরথী যেদিন স্বখাতে শান্ত, স-লীল হয়ে উঠেছেন, সেদিন ভগীরথ কোথায়? প্রাণ-গঙ্গার নিরুদ্ধ গতিকে অবারিত মুক্তি দিয়ে তাঁর সাধনা

সমাপ্ত হয়েছে!—তারপর গৃহ-বলিভুক্ গ্রাম-প্রান্ত-লীনা বঙ্গ-গঙ্গা থেকে বাঙালির জীবন-লক্ষ্মী কক্ষ-কলসী ভরে পুণ্যবারি বহন করে নিত্য-দিনের জীবযাত্রাকে করেছেন নিষিক্ত। ভগীরথের প্রয়োজন সেদিন ফুরিয়েছে,—তাই সেদিন তিনি নিঃশেষিত। মধুসূদনের প্রথম জীবনের কবি-কর্মে সগর-সন্তানের আত্মদাহের সংগে ভগীরথের ধ্যান-দীপ্তি স্বতোযুক্ত হয়ে আছে। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে রয়েছে নিঃশেষিত-প্রয়োজন ভগীরথের মহৎ সার্থকতাবোধের সংগে মহত্তম পরিসমাপ্তির Tragic বেদনা-বুদ্ধি। মধুসূদনের কবি-কর্মে বেদনার এই লবণাম্বু সমুদ্র পেরিয়েই বাংলার সাহিত্য-লক্ষ্মী কৈশোরোৎক্রান্ত স্থিত-যৌবনের ঘাটের সীমায় এসে পৌঁচেছেন;—সেখানে খেয়াঘাটের পালের দড়ি ধরে বসেছিলেন পারানি বঙ্কিম। মধুসূদনের সূচনা বঙ্কিমের সাধনায় সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই, মধুসূদন-প্রতিভার দানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কেবল অক্ষুব্ধ-চিত্ত নয়, চির-চরিতার্থ-চেতন।

মধুসূদনের পরেই বয়ঃসন্ধি যুগের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখ্য কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি-কর্মের বিচারে মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র প্রায় সমকালীন ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য, তিলোত্তমার প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। আর, হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু, বয়সের দিক থেকে মধুসূদনের চেয়ে হেমচন্দ্র ছিলেন প্রায় চৌদ্দ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল হেমচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল; তাঁর পিতার নাম ছিল কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—মাতা ছিলেন আনন্দময়ী। মধুসূদন হিন্দুকলেজ ত্যাগ করেছিলেন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে; তিনি কলকাতা ত্যাগ করে মাদ্রাজ চলে গিয়েছিলেন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। আর, হেমচন্দ্র তাঁর নয় বছর বয়সে কল্কাতা খিদিরপুরে এসেছিলেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। ছাত্র হিসেবে তিনি হিন্দুকলেজে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হিসেবে হেমচন্দ্র বঙ্কিমেরও এক বছরের পরবর্তী। কালের দিক্ থেকে হেমচন্দ্রের এই পরাগমন তাঁর কবি-চেতনার পক্ষে বিফল হয় নি। বস্তুতঃ, হেমচন্দ্রের গীতি-কবিতাবলীতেই উনিশ শতকের বাঙালির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি প্রথম স্বাবলম্বিতার লক্ষণান্বিত হয়েছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির অন্তরে স্বদেশপ্রেমের ভাবালুতাময় প্রথম উদ্বোধন ঘটেছিল ইংরেজি শিক্ষা ও প্রতীচ্য বিপ্লবাদর্শের অনুসরণে। রামমোহনের রাজনৈতিক সচেতনতা আধুনিক কালের তুলনায়ও ছিল অতি প্রখর।

ডিরোজিওর মাধ্যমে তার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় রাজনৈতিক প্রয়োজনের যথার্থ স্বরূপটি অধিগত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু, প্রধানতঃ সেকালের ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য-তাড়িত ইংরেজ পণ্ডিতদের প্রণোদনায় ভারতীয় জাতিত্ববোধ সেদিন ব্যাহত হয়েছিল। পরিবর্তে, ইংরেজি শিক্ষিত বাংলাদেশে জেগে উঠেছিল,—হিন্দু জাতিত্ববোধের এক কৃত্রিম আদর্শ। এই দৃষ্টিভঙ্গির কাছে হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়ত্ব অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলে, মধ্যযুগের মুসলমান শাসকেরা কল্পিত হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতাপহারী শত্রুরূপী। অন্যদিকে, এই মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসকারী বলেই ইংরেজরা ভারত-সুহৃৎরূপে পরিগণিত হতে থাকেন। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে এ-ধরণের মনোভাবের ফলশ্রুতি লক্ষ্য করেছি।

হেমচন্দ্রের জীবন-পটভূমি

কিন্তু, ইংরেজ শাসকদের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি নাগরিকদের এই প্রাথমিক অতি-বিশ্বাস ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে;—পরিবর্তে ইংরেজ অনাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে দিনে দিনে। হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনেই এমন বহু ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে স্বাধীনতাকামী বাঙালির ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব দেশব্যাপী উত্তাপের সঞ্চার করে। হেমচন্দ্র তখন উদীয়মান যুবক, হিন্দুস্কুলের ছাত্র। সেদিনকার যৌবন-তপ্ত চিত্তের মর্মজ্বালাকে তিনি অসংখ্য গীতিকবিতার আকারে মুক্তি দিয়েছিলেন। এখানেই আলোচ্য-যুগের কবি হিসেবে তাঁর যথার্থ স্বাতন্ত্র্য।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কিশোর হেমচন্দ্র কলকাতায় এসেছিলেন; ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সারা বাংলার রাজনৈতিক আকাশ শিক্ষিত বাঙালির আত্ম-সম্ভ্রম-বোধে আমূল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল কুখ্যাত ব্ল্যাক-এ্যাক্ট্‌কে উপলক্ষ্য করে। সে সময়ে কলকাতা থেকে দূরাঞ্চলে ইংরেজ ব্যবসাদার ও জমিদারেরা বহুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। অথচ, প্রচলিত আইনে কল্‌কাতার সুপ্রিম্ কোর্ট ছাড়া মফঃস্বলের কোথাও তাদের বিচার করা চল্‌ত না। বিচারের আইন-কানুন বিষয়েও শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গে তফাৎ ছিল যথেষ্ট। এই সুযোগ নিয়ে দেশীয় প্রজা ও জনসাধারণের 'পরে, এমন কি, মাঝে মাঝে দেশীয় রাজকর্মচারীদের 'পরেও এই শ্বেতাঙ্গরা যথেচ্ছাচার করতে কুণ্ঠিত হত না। দীর্ঘদিন ধরে এই অনাচার উৎপীড়ন অসহ্য হয়ে ওঠায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বড়লাটের আইন সচিব ড্রিঙ্ক্ ওয়াটার বীটন একটি নতুন আইনের খসড়া করেন। এতে য়ুরোপীয় প্রজাদের অধিকার-সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। মফঃস্বল আদালতে জুরীর দ্বারা তাদের বিচারের

১। ব্ল্যাক্ এ্যাক্ট্(?)

ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সেকালের ইংরেজেরা সংঘবদ্ধতার জবরদস্তি দিয়ে এই আইনের প্রবর্তন নিরুদ্ধ করেন।

২। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

প্রধানতঃ এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই সর্বশ্রেণীর সকল মতাবলম্বী শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সমবেত সংঘবদ্ধতার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এইটিই বাংলাদেশে ইংরেজহীন প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, ইংরেজের অত্যাচার প্রতিরোধের সচেতন প্রবর্তনার ফলে, এই প্রতিষ্ঠান নগর বাংলার সকল অংশের সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব অর্জন করেছিল। বাঙালি রাজনৈতিক মানসে প্রত্যক্ষ ইংরেজ-বিমুখ মনোভাবের এই প্রথম প্রকাশ ইতিহাসের দিক্ থেকে বিশেষ লক্ষণীয়।

ও পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ শেষ হয়। তখন এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ভারতীয় প্রজাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ-মর্যাদা রক্ষার দাবিতে পার্লামেণ্টে পৃথক আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রতি ছত্রে বৃটিশ শাসকের সততা ও নিরপেক্ষতা বিষয়ে পূর্ব-বিশ্বাসের শিথিলতা দৃঢ় ব্যক্ত হয়েছে। এমন কি এ-কথাও স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সংগে যুক্ত থেকে ভারতবাসী যতখানি সুবিধা-সুযোগ লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করেছিল, এতদিনে তা অংশতঃ-ও পূর্ণ হয় নি।"[১]

সেদিনকার আবেদনপত্রে ব্রিটিশ অনাচার-অবিচারের তথ্য-পঞ্জীর সংখ্যা যতই সীমাহীন হয়েছিল, ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবও হয়েছিল তত ব্যাপক।

৩। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলবিপ্লব

আরো পরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে সারা-ভারতে। জাতীয় জীবনে এই ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয়ে আজও মতভেদ রয়েছে। কিন্তু, ইংরেজ পক্ষের দুঃসহ পীড়ন এবং ভারতীয়দের পরিণামী অসহায় পরাভব শিক্ষিত বাঙালির মনে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব দৃঢ়তর করে তোলে। 'মহারাণী'র সনন্দ পরোক্ষতঃ এই অবিচারের দায়িত্ব স্বীকারই করে নিয়েছিল। সবশেষে ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিপ্লব ব্রিটিশ বিরোধী বাঙালির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে তুলেছিল প্রদীপ্ত করে। হেমচন্দ্র তাঁর কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই জাতীয় ঘটনাপ্রবাহে আমূলে অবগাহন করেছিলেন। তাই, বাংলা সাহিত্যে

১। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল।

ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতার প্রথম প্রেরণা-বাণী ঝঙ্কৃত হয়েছিল তাঁরই মর্মোৎসারী গীতিকবিতায়।

লক্ষ্য করা উচিত, কাব্যক্ষেত্রে রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় সমসাময়িক কালে। আর, পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রায় প্রত্যেকটিরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল এঁদের সকলেরই। কিন্তু, সাহিত্যের জগতে সমকালীনতার বিচার জীবৎকালের বর্ষগণনার মধ্যে একান্ত নিবদ্ধ নয়। সাহিত্যে কাল-বিচার ভাব-প্রেরণার মূলোদ্ভূত। আর, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, মানব-চেতনায় ভাব-ধর্মের মুক্তি-বিকাশ-পরিণতির কাল প্রধানতঃ কৈশোর-যৌবনের সন্ধি-সীমায়। যৌবনের বিশ্বাস এবং স্বপ্ন আজীবন মানব-স্বভাবকে অনুপ্রেরিত করে থাকে। এদিক থেকে রঙ্গলালের চেয়ে মধুসূদন এবং মধুসূদনের তুলনায় হেমচন্দ্রের ঐতিহাসিক জীবন-চেতনা ছিল অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ। মধুসূদন ১৮৪৩ খৃীষ্টাব্দে কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলেন। ঐ বছরেই কলকাতায় গঠিত হয়েছিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি;—ব্রিটিশ নাগরিক টমসন ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকদের একজন। সুতরাং ব্রিটিশ নাগরিকের স্বভাবগত ন্যায়াচার এবং সেই ন্যায়-নিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুর জাতীয় অভ্যুত্থানের আশাবাদ শিক্ষিত বাঙালির মনে তখনো দৃঢ়-মূল হয়েছিল। তাই, মধুসূদন এক সংগে ভারতবর্ষের জাতীয়তার কল্পনা ও "Albio'ns Shore"-এর স্বপ্নকে একত্র জড়িয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কবি-স্বভাব

উনিশ শতকের বাংলায় জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধিতার ইতিহাস বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। উনিশ শতক-তীর্ণ বাংলা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় প্রবল হয়েছিল। বিশ শতকের জীবন ও সাহিত্যে তার প্রভাব একদিন একান্ত হতে চেয়েছিল;—যদিও সর্বাংশে সে চেষ্টা সার্থক হয় নি। কিন্তু, উনিশ শতকের জীবনাবর্ত প্রধানতঃ সামাজিক-পারিবারিক প্রবাহকে কেন্দ্র করেই ঘূর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য কালের সাহিত্যধারায় সেই বিবর্তনের ইতিহাস আমরা লক্ষ্য করব। অন্য দিকে একথাও স্মরণ করব যে, রাজনৈতিক-আর্থিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকেও আয়ত্ত করে না নিলে স্বাতন্ত্র্যধর্মী আধুনিকতা-বুদ্ধির পূর্ণতা বিহিত হতে পারে না। এদিক থেকে বয়ঃসন্ধি লগ্নের বাঙালি-চেতনা রঙ্গলাল-মধুসূদনের যুগ পর্যন্ত শিশু বা কিশোরোচিত পরমুখাপেক্ষিতায় দুর্বল ও ভাবালু ছিল। হেমচন্দ্রের কবি-কর্মে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা প্রথম স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে; অন্ততঃ বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত

ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ও হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক সচেতনা

সম্বন্ধে হয়েছে সচেতন। চেতনার একটি নূতনতর স্তরে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ এখানে সূচিত হয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাস্তব এবং যৌক্তিক দৃষ্টিতে ব্রিটিশ-নির্ভরতা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নয়, —বরং বাঙালির 'স্বরাট'ত্বের পরিপন্থী। এই সত্যবোধ প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি পেয়েছে হেমচন্দ্রের সুদীর্ঘ 'ভারত-বিলাপ' কবিতায়! একদা-সমৃদ্ধ বাংলার শূন্যতাবোধের বেদনা নিয়ে কবি গঙ্গাতীরে গিয়ে বসেছিলেন।—একদিকে "দ্বিতলা ত্রিতালা চৌতালা ভবন" সুন্দর রাজবর্ত্ম, গড়খাই, গড়, আনন্দ-উদ্যান-সুশোভিত রাজধানীর দিকে তাকিয়ে কবি বলেছেনঃ—

"অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা
অলকা-জিনিয়া হেন মনোহরা।
কার রাজধানী কি জাতি ইহারা?
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।
নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিধানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে
গরবে মেদিনী ঠেকেনা পায়॥
অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটন বাসীরা
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়।
হায়রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে, বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস?
ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।
কি হবে বিলাপ করিলে এখন
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
তখনি সে সাধ ঘুচেছে।"

কেবল নিরর্থক বলে নয়, নির্ভয় হতে পারেন নি বলেই হেমচন্দ্র তাঁর 'ভারত-বিলাপ'-কথাকে স্ব-প্রকাশ করে তুল্‌তে পারেন নি। কবিতাটির শেষ স্তবকে তিনি লিখেছিলেনঃ—

"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার
বাজিত গরজে, উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।"

কিন্তু, গর্জন ছাড়াও হেমচন্দ্রের বিলাপ-বাদন ব্রিটিশ-সিংহের কর্ণরন্ধ্রে পৌঁচেছিল। রাজরোষ-ভাজন হয়ে কবি দুর্ভোগ ভুগেছিলেন। কবিতাটির দ্বিতীয় সংস্করণে বহুল পরিবর্তন ত করেই ছিলেন, তা ছাড়া ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ রাজকুমারের (পরে ৭ম এডওয়ার্ড) ভারত আগমন উপলক্ষ্যে 'ভারতভিক্ষা' লিখে কবিকে পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তা হলেও, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিতে হেমচন্দ্র যে সদা-সচেতন ছিলেন, তাঁর 'পদ্মের মৃণাল', 'যমুনাতটে' ইত্যাদি কবিতা এ-কথার নিংসংশয় প্রমাণ।

হেমচন্দ্র ও বয়ঃসন্ধি

কিন্তু, সমকালীন জীবন-পটভূমি সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের ব্যক্তি-চিত্ত অ-তন্দ্র-জাগ্রত হলেও, তাঁর কবি-ভাবনা কখনোই কৈশোরোত্তীর্ণ স্বয়ম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে নি। তাঁর 'লজ্জাবতী-লতা', 'যমুনাতটে', 'পদ্মের মৃণাল' ইত্যাদি বেশ কয়েকটি গীতি-কবিতাতেই অনুভূতির মন্ময় নিবিড়তা লক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু, প্রায় কোনো পর্যায়েই সে সকল ভাবনা sentiment-এর গন্ডী অতিক্রম করে গাঢ়বদ্ধ emotion-এ পরিণত হতে পারে নি। তাই, লিরিক্ রচনায় হেমচন্দ্র sentimental, তেমনি কাহিনী-কাব্য রচনাতে পর-নির্ভরশীল।

ছাত্রজীবন থেকেই হেমচন্দ্র মাঝে মাঝে "কবিতাদি রচনা" করতেন। "সে সময়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল।"১ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ চিন্তাতরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে,—কবির ছাত্রজীবন তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। চিন্তাতরঙ্গিণীর ভাব-প্রেরণা সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই......ধর্মহীন, লক্ষ্যহীন শিক্ষায় শিক্ষিতের হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি আনিল। একই বৎসরের মধ্যে দুইজন সুশিক্ষিত এই অশান্তির আবেগে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন।"২ এঁদের একজন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন "হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী বাল্য বন্ধু। দুইজনে এক বৎসরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ পাশ করেন। এই উৎকট অকাল মৃত্যুতে হেমবাবু প্রথমে অত্যন্ত শোকার্ত, পরে গভীর চিন্তাকুলিত হইলেন। তাহারই ফল চিন্তাতরঙ্গিণী।"৩ 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে 'চিন্তা'র চেয়ে

১। হেমচন্দ্র—সাহিত্য সাধক চরিতমালা।
২। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
৩। ঐ।

আবেগ বেশি। ইংরেজি কবিতাদির ছাপ কিছু কিছু আছে, তার চেয়ে বেশি আছে রঙ্গলালের প্রভাব। তবে, হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার মত এই প্রথম প্রকাশিত কাব্যেও কবির পরিবেশ-সচেতনা দুর্লক্ষ্য নয়। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবকের অশিক্ষিতা বাল-বধূর অসহায় করুণ জীবন-ভূমিকা চিন্তাতরঙ্গিণীতে তীব্র প্রাঞ্জলতার সংগে প্রতিফলিত হয়েছেঃ—

চিন্তাতরঙ্গিণী

"সহায় বিহনে, ভাই, রমণী অবলা।
সংসার-সাগর মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা
একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা
তাহাতে অভাগা দেশে দাসীমত কেনা॥
পৃথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন।
রন্ধন-শালার সীমা-ভিতরে ভ্রমণ॥
সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ।
এর চেয়ে তার তরে আর কি অসুখ॥
বল দেশাচার দোষে পরের নন্দিনী।
কি কারণে অকারণ দুঃখের ভাগিনী॥"

সে কালের অ-বিকশিত-ব্যক্তিত্ব নারী-জীবনের মর্যাদাহীন দুঃসহতা এখানে চিত্রিত হয়েছে। 'বিধবা রমণী' বা 'কুলীন মহিলা-বিলাপ' প্রভৃতি পরবর্তীকালে রচিত গীতিকবিতার পূর্বাভাস এখানে ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে হয়। লক্ষ্য করা উচিত, পরিবেশ-সচেতন হেমচন্দ্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির যথার্থ রূপটিকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি সামাজিক-পারিবারিক বিপ্লব-চেতনার চলমান ধারাকেও উপেক্ষা করেননি। অবশ্য এদের কোনটি সম্বন্ধেই কবি-মানসের উপলব্ধি ভাবালুতার মাত্রা ক্বচিৎ অতিক্রম করতে পেরেছে।

বীরবাহু কাব্য

সামাজিক জীবন-বোধের চেয়ে হেমচন্দ্রের কাব্যে জাতিত্ববুদ্ধির সচেতন প্রণোদনাই ছিল প্রবলতর। তাঁর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ বীরাবাহু কাব্য (১৮৬৪ খ্রীঃ) এই তথ্যের নিদর্শন। দ্বিতীয় সংস্করণ মেঘনাদ বধের প্রশংসা-সূচক ভূমিকা হেমচন্দ্র তখন লিখে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও ছন্দ-প্রকরণে, ও রূপাঙ্গিকের গঠনে তখনো তিনি রঙ্গলালের ভাব-জগতে বিচরণ করছেন। বীরবাহু কাব্যের পরিচয় দিয়ে 'বিজ্ঞাপন'-এ কবি বলেছেন—"উপ্যাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাস-মূলক নহে। পূরাকালে হিন্দু-কুল-তিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।"

লক্ষ্য করা উচিত, এখানে বাঙালি জাতীয়তা বা ভারতীয় জাতীয়তা অর্থে হেমচন্দ্রও রঙ্গলালের মতই হিন্দু-জাতিত্ববোধ (Hindu Nationalism)-

এর কথাই বুঝেছিলেন। রঙ্গলালের জাতীয় ভাবাবেগ (sentiment)-প্রণোদিত ঐতিহাসিক কাব্য-কাঠামোর ছায়া-সম্পাৎও এতে হয়েছে বহু পরিমাণে। তা হলেও, এই প্রথম পর্যায় থেকেই হেমচন্দ্রের জাতীয় চেতনা স্বয়ং-স্বতন্ত্র, ঋজু এবং স্পষ্ট; এমন কি ব্রিটিশ বিরোধী-ও।—

"মাগো ও মা জন্মভূমি আরো কত কাল তুমি
এ বয়েসে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল, বল আর কত কাল
নিদয়, নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।
কতই ঘুমাবে মাগো, জাগো গো মা জাগো জাগো
কেঁদে সারা হয় দেখ পুত্রকন্যা সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর ডাকি গো, মা মা বলে।
কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহ মাঝে কালসর্প পুষিছ।"

এই কবিতাংশের বহিরঙ্গে রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায়" জাতীয় বিখ্যাত কবিতার অবয়বগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, স্বদেশ-প্রেম বিষয়ে হেমচন্দ্র রঙ্গলালের তুলনায় যে অনেক ঋজু এবং স্বয়ম্পূর্ণ তাতে সংশয় নেই। তা ছাড়া, ওপরের শেষ পংক্তিতে সমকালীন রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিরূপতা পরোক্ষ হলেও অস্পষ্ট নেই।

হেমচন্দ্র বহু গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সেক্‌স্‌পীয়রের দুটি নাটকের অনুবাদ রয়েছেঃ—১। 'নলিনীকান্ত' নামে টেম্‌পেস্‌ট্‌-এর অনুবাদ (১৮৬৮ খ্রীঃ) এবং ২। রোমিও-জুলিয়েত এর অনুবাদ (১৮৯৫ খ্রীঃ)। নাটক হিসেবে ইতিহাসের দিক্‌ থেকেও এ-সব রচনার উল্লেখ্য মূল্য কিছু নেই। পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে হেমচন্দ্র রূপাঙ্গিক সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "আশাকানন একখানি সাঙ্গ-রূপক কাব্য। মানব-জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরেজিভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে।"[১] মানব জীবনের কর্ম, ভাব, আশা-বিশ্বাস, বিবেক-নৈরাশ্য ইত্যাদির বিচিত্র অবস্থা ও পর্যায়ের দশটি 'কল্পনায়' নিবদ্ধ করে হেমচন্দ্র এই কাব্যে সর্বমানবের জীবন-লক্ষণকে নানারূপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য রচনা

১। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন—উমাকালি মুখোপাধ্যায়।

ছায়াময়ী কাব্য (১৮৮০ খ্রীঃ) রচিত হয়েছিল "প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় কবি ডাণ্টের লিখিত ডিভাইনা কমেডিয়ার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস" দেবার জন্যে। কেবল ভাববস্তু নয়, "রচনাপ্রণালীর" দিক্ থেকেও হেমচন্দ্র ঐ প্রতীচ্য মহাকবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ-কথা তিনি নিজেই কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন।

ছায়াময়ী কাব্য

হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২ খ্রীঃ) গীতিকাব্য। নাম দেখেই বোঝা যায় কাব্যটি ভারতীয় ভাব-প্রেরণার অনুসরণে রচিত। তবে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" এ-বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে,—"দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ, আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতা মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।"

দশমহাবিদ্যা

দশমহাবিদ্যার ভাব-বিষয়ে অস্পষ্টতা আছে এককালে এ নিয়ে মত-বিরোধেরও অন্ত ছিল না। কেবল ভাবের বিরোধে নয়, ছন্দ কৌশলের সচেতন প্রয়োগের দিক থেকেও কাব্যটি সেকালের পক্ষে অভিনব বলে মনে করা হয়েছিল। প্রতিটি কবিতা-খণ্ডের প্রারম্ভে ছন্দ-রীতির স্পষ্ট নাম নির্দেশ করা হয়েছে। এই ছন্দ-কর্ম সম্বন্ধে কবি বলেছেন,—"ইহাতে গুটিকতক নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনো সংস্কৃত অথবা প্রচলিত বাংলা ছন্দের অবিকল অনুসরণ নহে।"১ কবিশেখর কালিদাস রায় অধুনা এই ছন্দশৈলীর স্পষ্টতর পরিচয় প্রকাশ করেছেন,—"ইহাতে হেমচন্দ্র প্রচলিত ছন্দ ত্যাগ করিয়া হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রার প্রাকৃত ভাষার ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।"২ "হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রার" অনুরূপ ছন্দকর্মের দু'একটি অংশ আজও জনপ্রিয়তায় সাধারণ পাঠকের কণ্ঠস্থ হয়ে আছে ঃ—

"রে সতি অরে সতী কা-ন্দিল পশুপতি,
পা-গল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥"—ইত্যাদি।

ওপরের অংশটি আলোচ্য রচনাধারার একটি উদাহরণ। কবিতাংশটির শীর্ষে ছন্দ-নির্দেশ করা হয়েছিল—'দীর্ঘ-ভঙ্গ ত্রিপদী'। পাদটীকায় বলা হয়েছে,—"(—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের অন্তে স্থিত 'অ' উচ্চারিত হইবে।"

১। গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।
২। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়—১ম খণ্ড।

এই সব অপেক্ষাকৃত অ-প্রধান কাব্য-কবিতায় হেমচন্দ্রের রূপাঙ্গিক-সচেতনতা তাঁর পরিবেশ সম্বন্ধীয় অবধানতার আরো একটি নিদর্শন। আগে বলেছি, মধুসূদনের যুগ থেকেই এই কাব্যাঙ্গিক-সচেতনা স্বতস্ফূর্ত হতে আরম্ভ করেছে। এই রকম নূতন রূপাবয়ব বিশিষ্ট আর একটি ক্ষুদ্র রচনা,—'হাস্য কাব্য' নাকেখৎ—(১৮৮৫ খৃীঃ)।

হেমচন্দ্রের আঙ্গিক সচেতনা

হেমচন্দ্রের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্ত-বিলাস' (১৮৯৮) কতকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি; যে অবস্থায় কাব্যগ্রন্থটি রচিত, তাতে উৎকৃষ্ট শিল্প-কর্ম অসম্ভব ছিল; কবি নিজেই এ কথা বিজ্ঞাপনে স্বীকার করেছেন। তবু, গভীর মর্মবেদনার উৎস-জাত বলেই হয়ত কয়েকটি কবিতার গীতিধর্ম সহজে অন্তর স্পর্শ করে।

চিত্তবিলাস

যে কাব্যকে আশ্রয় করে হেমচন্দ্র একদিন বাংলা সাহিত্যের কবি-কুল-জয়ী একচ্ছত্রতার মর্যাদা পেয়েছিলেন, সে কাব্যের নাম 'বৃত্রসংহার'। সুদীর্ঘ ২৪টি সর্গে এই কাব্য সমাপ্তি লাভ করে। বৃত্রসংহারের প্রথম প্রকাশ ঘটে দুই খন্ডে। প্রথম খন্ডে ১১টি সর্গ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ খৃীষ্টাব্দে, পরে বাকি ১৩ সর্গে সম্পূর্ণ দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় আরো দু বছর পরে (১৮৭৭ খৃীঃ)। হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারকে 'কাব্য' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু, এই বৃহৎ কবিতাগ্রন্থ রচনার মূলগত সংকেত অনুসরণ করলে বোঝা যায়, 'মেঘনাদ বধ'-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থেকেই বৃত্রসংহারের প্রথম সূত্রপাত। ভাবভাষা-ছন্দে অ-ভাবিত-পূর্ব 'মেঘনাদ বধ' একটি "যথার্থ বি-এ"-র লিখিত ভূমিকা শিরোধার্য করে তবেই বাঙালি পাঠক-সাধারণের নিকট পাংক্তেয় হতে পেরেছিল। আর, সেই শ্লাঘনীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন কবি হেমচন্দ্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তফাৎ আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' মোটামুটি প্রশংসাই করেছিলেন হেমচন্দ্র। তবু, কাব্য-বিষয়ের ভারতীয় ঐতিহ্য-বিমুখতা, যুদ্ধবর্ণনার স্বল্পতা, সর্গ সংখ্যার আপেক্ষিক ন্যূনতা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের আনুপূর্বিকতা জনিত একঘেঁয়েমি ইত্যাদি আলংকারিক ত্রুটি বিষয়ে তৎকালীন আলোচনার প্রতি হেমচন্দ্র অনবহিত ছিলেন না। ফলকথা, বৃত্রসংহার পড়লে মনে হয়, মধুসূদনের মহাকাব্য-রচনার প্রশংসনীয় প্রয়াসের একটি ত্রুটিহীন প্রতিরূপ রচনার উদ্দেশ্যেই কাব্যটি পরিকল্পিত হয়েছিল।

বৃত্রসহার

কিন্তু, এই ধরণের দুঃসাধ্য-সাধনের উপযোগী কবি-ব্যক্তিত্ব হেমচন্দ্রের ছিল না। সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুব-সমুচিত পরিবেশ-

সচেতনতা তাঁর ছিল; আর ছিল গীতি-ধর্মী ভাবাবেগ। অনেক ক্ষেত্রেই আবার সেই আবেগ দুর্বল Sentiment-এর পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি। হেমচন্দ্রের কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যে জীবন-চেতনার দূরবগাহতা ছিল না —ছিল না মধুসূদনোচিত উপলব্ধির সর্বপ্লাবী উদ্দীপনা। তাই, একটি মাত্র নিভৃত অনুভূতির সীমায়িত কল্প-লোকে নিজের কল্পনাকে মুক্তি দেবার সুযোগ যেখানে পেয়েছেন, সেখানেই হেমচন্দ্র অন্তর-স্পর্শী। অন্যত্র তাঁর কবি-স্বভাব শিথিল-গতি, দ্বিধা-কম্পিত, পরমুখাপেক্ষী। 'দশমহা-বিদ্যার' বিষয়বস্তুতে যে তর্ক-যোগ্য অস্পষ্টতা রয়েছে, তা কোন রহস্যময় কাব্য-প্রেরণার ফল নয়। হেমচন্দ্রের কবি-স্বভাবের দ্বিধা ও শিথিল-চিন্তা এর জন্য দায়ী। ছায়াময়ীতে সার্থকতা-ব্যর্থতার একমাত্র উৎস তাঁর পরমুখাপেক্ষিতা। 'চিন্তাতরঙ্গিনীতে' ভারতচন্দ্র এবং বীর-বাহুকাব্যে রঙ্গলাল দ্বিধাহীন অকম্পিত পদে আত্মপ্রকাশ করেছেন। হেমচন্দ্রের রূপ-কর্মের সার্থকতার পেছনেও তাঁর পর-নির্ভরতার পরিচয় দুর্লভ নয়।

ও হেমচন্দ্রের পর-নির্ভরশীল কবি-মানস

বৃত্রসংহারের কল্পনারম্ভই কবি করেছিলেন পর-নির্ভরতা দিয়ে। এই কাব্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে দান্তের 'ইন্‌ফার্ণোর' পর্যন্ত 'গল্প' পেয়েছেন।[১] তা হলেও এ কাব্যের আদ্যান্ত পরিকল্পনায় শ্রেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করেছে মধুসূদনের বিখ্যাত দুটি কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'। 'তিলোত্তমা' কাব্যে মধুসূদন দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের;—বিশেষ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্ভ্রমযোগ্য মর্যাদার অধিকার দিয়ে চিত্রিত করেছেন। ইন্দ্রের চরিত্রকে হেমচন্দ্র আদ্যন্ত সেই কাব্য থেকে তুলে নিয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের 'জীবন-চরিত'-এ এ-বিষয়ে ব্যাপক প্রমাণ-বিচার উদ্ধার করেছেন। বৃত্রসংহারের শচী 'তিলোত্তমার' শচী, এবং মেঘনাদবধের সীতার ছায়ামূর্তি। রুদ্রপীড়-ইন্দুবালার মধ্যে মেঘনাদ-সরমার প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু, সব কয়টি ছবিই অত্যন্ত দুর্বল। কী ওজস্বিতাপূর্ণ বীর্য-চিত্রের কল্পনায়, কি গার্হস্থ্য সৌন্দর্যের রূপায়নে, হেমচন্দ্র কোথাও সমকালীন বাঙালি জীবন-প্রবাহের সংগে একাত্ম হয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। তাঁর দুর্বল ভাবালুতা মধুসূদনের উদাত্ততার অনুসরণ করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই হেমচন্দ্রকে করেছে ব্যর্থকাম। বৃত্র-চরিত্রে অংলকার-নির্দেশিত শৃঙ্গার ও বীররসের উদাত্ততা সম্পাদনের চেষ্টায় তাকে কামাতুর গোঁয়ার

বৃত্রসংহারে মধুসূদনের প্রভাব

১। দ্রষ্টব্য—সাহিত্য—১৩১৯ বাংলা সাল।

করে তোলা হয়েছে। ইন্দুবালার মধ্যে প্রেম-স্নেহাতুর নারীত্বের চিত্রণ ভীরু বালিকার মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। রুদ্রপীড় যে পরিমাণে বীর্যবান্, ততোধিক পরিমাণে দাম্ভিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ইন্দ্রের মধ্যে আক্রোশের অন্ধতা আছে, আত্ম-মুক্তি সাধন-ব্রতের যোগ্য নৈর্ব্যক্তিক উদারতা নেই। ফল কথা, চরিত্র-চিত্রায়ণে বা কাহিনীর উপস্থাপনে মহাকাব্যোচিত পরিবেশ কোথাও রচিত হয়নি।

প্রকাশভঙ্গির দিক্ থেকেও কাব্যের আগাগোড়াই শিথিলতা লক্ষিত হয়েছে। অমিত্রচ্ছন্দের অপার সম্ভাবনা সম্বন্ধে হেমচন্দ্র মধুসূদনের মত নিঃসংশয় ছিলেন না। তা-ছাড়া রূপ-কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর দুর্বল কবি-মানস ছিল পরমুখাপেক্ষী। তাই, ভারতচন্দ্র থেকে মধুসূদন পর্যন্ত সকলের কাছেই তিনি বারে বারে ঋণ-স্বীকার করেছেন। আর, রূপ-কর্মের দিক্ থেকে হেমচন্দ্র হয়ত ভারতচন্দ্রেরই ছিলেন মুগ্ধ শিষ্য। তাই, মিত্রাক্ষরের প্রতিই তাঁর ঝোঁক বেশি। এ-সম্বন্ধে 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' কবি লিখেছিলেন,—"নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশংকা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে।"—পূর্বে দেখেছি সোম-প্রকাশের আলোচনায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অমিত্রাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রচনার "প্রগাঢ়-তার" উল্লেখ করেছিলেন। মনে হয়, এই মন্তব্য হেমচন্দ্রের চিত্ত স্পর্শ করেছিল! তাই 'বৃত্রসংহার কাব্যে' কেবল যুদ্ধ, বা যুদ্ধ-প্রস্তুতি বিষয়ক ওজস্বী বর্ণনাতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার আছে; অন্যত্র রয়েছে নানা-রকম 'মিত্রাক্ষরের' বিচিত্রতা সৃষ্টির চেষ্টা। অমিত্রাক্ষর রচনায় কবি আবার মধুসূদনের "প্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন" করেন নি। মধুসূদনের ছন্দো-স্বভাবকে বুঝতে কিংবা আয়ত্ত করতে না পারার দরুণ হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর সৃষ্টির প্রয়াস প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে ঃ—

বৃত্রসংহারের রূপ-প্রকাশ

"উড়িলা কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশ মার্গেতে—
সমর কেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।
বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ, দূত কোন জন
বার্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর শিবিরে;
কহিলা সেনানী বর্গে উচ্চ সম্বোধনে
বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে-হেতু প্রেরিলা।"

বৃত্রসংহারে অমিত্রাক্ষর

স্পষ্টই দেখ্ছি, হেমচন্দ্রের কাছে অমিত্রাক্ষরের মুক্তি-সূত্র অলক্ষিত ছিল।

অমিত্রাক্ষর নামে তিনি মিলহীন পয়ার রচনা করেছেন; আর তাকেও সাজিয়েছেন সংস্কৃত শ্লোকের মত চার পংক্তি যুক্ত স্তবকের অর্থ-সীমা-বন্ধনে। বন্ধন-মুক্তির নামে হেমচন্দ্র বাংলা ছন্দের নূতন নিগড় রচনা করেছেন।

মিত্রাক্ষরের অপেক্ষাকৃত 'কোমল' বিষয় বর্ণনাতেও কবির ভাব-কল্পনা দুর্বল পেলবতায় এলিয়ে পড়েছে ঃ—

মিত্রাক্ষর

"নিশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে,
অর্ধচেতনের সংগে
অদূরে মুরলীধ্বনি বাজিলে যেমন
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া
পরাণেতে জড়াইয়া
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে
তেমনি প্রবেশ করে
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন।"

এই রচনায় লালিত্যের গুণাগুণ বিচারের তর্ক পরিহার করলেও, স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, এ ধরণের পেলবতা মহাকাব্যের প্রগাঢ়তার নিতান্ত পরিপন্থী।

বৃত্রসংহারের ব্যর্থতা

ফল কথা, মহাকাব্য বিষয়ে হেমচন্দ্রের আলংকারিক জ্ঞান একজন 'Real B. A.'-র মত হলেও তাঁর কবি-চেতনা গভীর ভাবযুক্ত শিল্প রচনার পক্ষে ছিল নিতান্ত দুর্বল। এমন অবস্থায় কবি যে একদিন মধুসূদন-সমতুল মর্যাদার আসন পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে বিস্মিত হতে হয়। তথ্যাদি সহযোগে শ্রীসজনীকান্ত দাস ইঙ্গিত করেছেন,—এই অসম্ভব চিন্তার সূত্রপাত করেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।[১] বিস্ময়ের সংগে ভাবতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মত এমন যথাপরিমিত বিচারকের পক্ষে এ ধরণের ভ্রান্তি সম্ভব হল কী করে? অবশ্য এ-রকম ভুল বঙ্কিমচন্দ্র আর একবার করেছিলেন আলালের ঘরের দুলাল প্রসঙ্গে।

হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার ফলশ্রুতি

আসলে, মহাকাব্য ত নয়-ই, কোনো রকমের কাব্য-রচনাতেই হেমচন্দ্র কালোত্তীর্ণ রস-সৃষ্টির দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। তা হলেও, তাঁর আজীবন সাধনাকে ইতিহাসের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। হেমচন্দ্রের কবি-কর্মের নিরপেক্ষ ফলশ্রুতি সার্থক ঐতিহাসিকের মতই নির্দেশ করেছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস ঃ—"হেমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ও

১। দ্রষ্টব্য বৃত্রসংহার কাব্য—ভূমিকা ঃ—সাহিত্যপরিষৎ সং।

বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন; কারণ, তিনি আমাদের সাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ-প্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এমন আর সে যুগে কোন কবি করেন নাই।"১ বৃত্রসংহারেও জাতি-বৈরীর নিন্দা ও পরাধীনতার গ্লানি স্পষ্ট ঝঙ্কৃত হয়েছে। বিশেষ করে কোন কোন গীতিকবিতায় এই দেশপ্রীতি ও পরাধীনতার বেদনা-বোধ ভাব-নিভৃতির প্রভাবে এ-কালের পাঠকেরও চিত্ত-স্পর্শ করে; এ কথা পূর্বে বলেছি।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

হেমচন্দ্রের পরেই এ-যুগের গাথা-কাব্যের ইতিহাসে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর (১৮৫১—১৮৯৮ খ্রীঃ) নাম উল্লেখ করতে হয়। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনাকে কেন্দ্র করে বাংলা কাব্যের একটি যুগলক্ষণের নামকরণ করা হয়েছে; ইংরেজি করে তাকে Pseudo Classicism বা Neo Classicism বলে অভিহিত করা হয়। ডঃ সুকুমার সেন একে "ক্লাসিকতার কৃত্রিম অনুবৃত্তি" অভিধায় চিহ্নিত করেছেন।২ দেখেছি, মধুসূদন তাঁর তীক্ষ্ণ আঙ্গিক-সচেতনতা নিয়ে Homer, Milton, বাল্মীকি এবং অন্যান্য মহাকবি-শ্রেষ্ঠের উদ্বর্তনে রীতি-সম্পূর্ণ Epic না হোক্, রীতি-সিদ্ধ 'Epicling' লিখ্‌তে চেয়েছিলেন স্পষ্টতঃ। হেমচন্দ্রও তাঁর বৃত্রসংহার কাব্যে মহাকাব্য-রূপকেই আরো আলংকারিক বিশুদ্ধি-মণ্ডিত করতে যে চেয়েছিলেন আদ্যন্ত গ্রন্থ পড়লে এ-বিষয়ে সংশয় থাকে না। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী-কাব্য 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "Mahabharata of the Nineteenth Century"-র সম্ভাব্য নবরূপায়ণের কথা কল্পনা করেছিলেন। স্বয়ং কবি যে এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের চেয়েও সচেতন ও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।৩ তা হলেও, নবীনচন্দ্রের লেখনী-প্রভাবে কুরুক্ষেত্রের মহাভারতীয় মহাপরিণাম শেষ পর্যন্ত "ট্যাং ট্যাং ধনুর টঙ্কার-"এ পর্যবসিত হয়েছে। মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার প্রয়াস-ও যে গীতিকাব্যিক বেদনা-ভারে বহিরঙ্গে বিস্রস্ত হয়েছিল, সে-কথা পুনঃ পুনঃ বলেছি।

সেই সংগে এ-কথাও বলেছি,—রূপাবয়বে আলংকারিক মহাকাব্যাঙ্গিকের একান্ত বিনষ্টি সত্ত্বেও, এই সব কাব্যের ভাব-স্বরূপে নিহিত ছিল একটি নূতন গোষ্ঠি-জীবন-চেতনা—একটি নবাদর্শ-মহিম সমবেত-জীবন-মূল্যবোধের সংসক্তি। এই সকল কাব্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষিত অর্থে

১। ঐ।
২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।
৩। দ্রষ্টব্য—আমার জীবন—নবীনচন্দ্র।

"Epic of modern age"-এর সম্ভাবনা উদ্বোধিত হয়েছিল। মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্যের নারী চরিত্রে অনাগত যুগের ঔপন্যাসিক পূর্বসংকেত ছায়া রূপে লক্ষ্য করেছি। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যে সেই সম্ভাব্যতাই স্ফুটতর হয়েছে খন্ড খন্ড কাহিনীর আকারে। গীতিপ্রবণতা-প্রধান মেঘনাদবধ কাব্যকে মধুসূদনের প্রতিভা ও কল্পনার ওজস্বিতা উদাত্ততায় মণ্ডিত করে রেখেছে। কিন্তু, নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে গীতিমুখর বাঙালি জীবন-ধর্মের গার্হস্থ্য-মমতা-ভরা নূপুর-ঝঙ্কার। সুভদ্রার পূর্বরাগ, 'কারু'র ব্যর্থ প্রণয়ের আজীবন জ্বালা, প্রত্যাখ্যাতা শৈলর প্রেম-তপস্যা, সুলোচনার রসিকতা-দীপ্ত নারীত্ব ও মাতৃত্ব, সব কিছু মিলে নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয় কবিতাকারে Romantic গল্প বা গাথাকাব্যের রূপ পেয়েছে। মধুসূদনের উদাত্ততা যে পথ বেয়ে Romantic কল্পনার মসৃণ স্পর্শকাতরতার মধ্যে ক্রম-তরলিত হয়েছে, তার অপরিহার্য যোগসূত্র হয়ে আছেন আত্মগোপনচারী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যে মধুসূদনরে প্রবর্তিত "ক্লাসিকতার কৃত্রিম অনুবৃত্তি"র তুলনায় এই রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য বা গাথাকাব্যের ধর্মই বেশি। ডঃ সুকুমার সেন নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন,—এদিক থেকে কেবল নবীনচন্দ্রই নন, ঈশানচন্দ্র এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অক্ষয়চন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ও বয়ঃসন্ধির কাব্য-স্বভাব

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি জানিয়েছেন স-শ্রদ্ধায়।[১] তিনিও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, "মহাকাব্য-সংরচনে" 'নাব্‌বার'। আর যেদিন কবি-প্রতিভার আঘাতে সে "কল্পনাটি" "হাজার গীতে ফেটে" যায়নি, সেদিন তিনিও 'কবি-কাহিনী'র মত গাথা কাব্য-ই রচনা করেছিলেন; আর, তাতে অক্ষয়চন্দ্রের পূর্ব-প্রভাব ছিল প্রচুর। বাংলা কাব্যে ক্লাসিক রূপাঙ্গিক রচনায় যে-পরিমাণ কৃত্রিমতা ছিল, মধুসূদনের চেষ্টা সেই পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে তাঁর উত্তর-সূরীদের হাতে। কিন্তু, যে ভাব-প্রেরণার ফলে সেকালের জীবন-বেদনা সর্বকালীন বাঙালিচিত্তের করুণা-ঘন ব্যঞ্জনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, সেই পরিমাণে তা ইতিহাসের হাতে হয়েছে সংবর্ধিত। দৃঢ়-নিবদ্ধ রূপাবয়বের মধ্যে মধুসূদন সেই জীবন-পরিচয়কে কেবল প্রথম উদ্ভাসিত করেছিলেন। মধুসূদন-ভগীরথের প্রবাহিত মর্ত্যগঙ্গায় প্রেমঘন গার্হস্থ্য জীবন-চিন্তার প্রথম মঙ্গল-কলসটি যিনি ভরে নিয়েছিলেন, তিনি অক্ষয়চন্দ্র,—আর সে কাব্য-কলসীর নাম উদাসিনী (১৮৭৪ খৃীঃ)।

অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

যোড়াসাঁকের ঠাকুর বাড়ির সংগে অক্ষয়চন্দ্রের গভীর যোগ ছিল,—

১। দ্রষ্টব্য—জীবনস্মৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তিনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যন্ত্রবাদনের সংগে বহু গানও লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল, একান্ত সহৃদয় সমঝদার। ভারতীর সম্পাদক-সভার সংগে অক্ষয়চন্দ্র সস্ত্রীক যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভার' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের একাধিক সংগীত অক্ষয়চন্দ্রের লেখা।

কিন্তু, নিজের রচনা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্‌সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমনি প্রাচুর্য, তেমনি ঔদাসীন্যও ছিল।"১ বস্তুতঃ এই রচনা-প্রাচুর্যের মধ্যে মাত্র তিনখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্যের খবর পাওয়া গেছে:—১। উদাসিনী (১৮৭৪); ২। সাগর সঙ্গমে (১৮৮১) গাথাকাব্য প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়ে পরে গ্রন্থাকার লাভ করে। ৩। ভারতগাথা প্রথমাবধি পাঠ্যগ্রন্থের আকারে কল্পিত হয়েছিল। তাছাড়া, ভারতীতে ও সাধনা পত্রিকায় তাঁর কিছু সংখ্যাক গীতিকবিতা প্রকাশিত হয়। তার মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাতসংগীতের প্রথম সংস্করণে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার সংগে ছাপা হয়েছিল অক্ষয়চন্দ্রের 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'। জ্ঞানাঙ্কুরে আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল মাধব-মালতী নামক আর একটি কাহিনী কাব্য।

অক্ষয়চন্দ্রের রচনা-পরিচয়

'উদাসিনী' কাব্যের মূল পরিকল্পনা সেকালে বহু প্রচলিত ইংরেজি আখ্যায়িকা পার্নেল-এর 'হার্মিট্' কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত। ঐ কাব্য সে-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। 'উদাসিনী' রূপে কল্পিত হয়েছে অজ্ঞাত-পরিচয় রাজকন্যা সরলা। বিদর্ভরাজ বিজয়ের কন্যা ছিল সে, কিন্তু রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাস করতেন, কন্যাও আত্ম-পরিচয় জান্‌ত না। বিজয়ের মৃত্যুর পূর্বে সুরেন্দ্র নামে একটি যুবক সরলাকে আকস্মিক বিপদ থেকে উদ্ধার করে তার প্রণয়ভাজন হয়েছিল। বিজয়ের মৃত্যুর পর সুরেন্দ্র এবং সরলার অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়। তারপর দীর্ঘদিন সুরেন্দ্রের আর কোনো সন্ধান নেই। পরে সরলা সেই দেশের রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় লাভ করে। রাজপুত্র সরলাকে দেখে মুগ্ধ হয়; কিন্তু সরলা সুরেন্দ্রে সমর্পিত-প্রাণা। সরলার মনে শান্তি নেই; নিভৃত রাজ-উদ্যানে বিষণ্ণ চিত্তে সে বসে ছিল। এমন সময় সুরেন্দ্র এসে

উদাসিনী:—কাব্য-কথা

১। ঐ।

গোপনে সরলার সংগে মিলিত হল। কিন্তু, রাত্রিকালে অন্তঃপুর-উদ্যান থেকে পালাবার সময় সুরেন্দ্র ধরা পড়ে এবং তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। উন্মাদিনী সরলা রাজপুত্রের কাছে ছুটে গিয়ে কাতর প্রার্থনা জানাল,—সুরেন্দ্রকে মুক্তি দিলে সে রাজপুত্রকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। সুরেন্দ্র মুক্তি পেল, রাজ অন্তঃপুরে বিষাদিনী সরলার বিবাহ-ব্যবস্থা চল্‌তে লাগ্‌ল। এতদিনে সরলা জান্‌তে পেরেছে, সে রাজকন্যা। বিবাহ রাত্রিতে আকুল-চিত্তে রাজ-উদ্যানে ভ্রমণকালে বৃক্ষমূলে সুরেন্দ্রের একটি পত্র পেল,—সরলার জন্য সে বিরাগী হয়েছে। সরলাও তৎক্ষণাৎ প্রাচীর ডিঙিয়ে সুরেন্দ্রের অনুসন্ধানে ছুট্‌ল। পথে কিন্নর কাননে সুরেন্দ্রের হাতে তার পরানো আংটি এবং কয়েকটি হাড় দেখে সে সুরেন্দ্রের মৃত্যু সম্ভাবনা অনুমান করে নিজেও অগ্নিপ্রবেশ করতে প্রস্তুত হল। এমন সময়ে বনদেবী এবং একটি পথিকের উপস্থিতির দরুণ তাকে ক্ষান্ত হতে হয়। তিনজনে হিমালয় পথে ভ্রমণ করতে করতে গোমুখী-মুখে এসে এক তপস্যামগ্ন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায়। সরলা তাকে দেখেই মূর্চ্ছিত হল,—সেই সন্ন্যাসী সুরেন্দ্র। মূর্ছাভংগে সরলা-সুরেন্দ্রের মিলন রোমাণ্টিক সৌরিভে ভরে উঠেছে। বনদেবী ততক্ষণে রতি দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, বনভূমি হয়েছে বসন্ত-পুলকিত। এই অপরূপ মধুর পরিবেশে দুই প্রণয়ি-প্রণয়িণী পরিণয়-সূত্রে বন্ধ হয়েছে।

'উদাসিনী'র কাব্য-সৌন্দর্য

কাব্যের বর্ণনা আগাগোড়া সরস;—গল্পরস সর্বত্র কেবল সজীব-ই নয়, রোমাণ্টিক কারুণ্যে সুরভিত। রচনা-ভঙ্গিতেও অনুচ্ছ্বসিত আবেগ আয়াসহীন সাবলীলতায় অগ্রসর হয়েছে। অতি-কল্পনা বা অতি-মণ্ডনের আলংকারিক ভার কাব্যটির গতি কোথাও রুদ্ধ করেনি। এবং রূপের লঘু-পক্ষতা ভাব-কল্পনার রোমাণ্টিক গগনচারিতার (Romantic evaporation) অবকাশ নিবিড়তর করেছে। রাজপুত্রের সংগে বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তরে সরলা সুলোচনাকে বলেছে,—

"রাজপুত্র-বধূ হব অসীম ঐশ্বর্যে রব,
ছি ছি আর বল না আমায়।
কি হবে বৈভব লয়ে, কি কাজ ইন্দ্রাণী হয়ে,
অনন্ত সৌভাগ্য কেবা চায়॥
বরঞ্চ ভিক্ষার তরে, নগরের ঘরে ঘরে,
ফিরিব গো ভিখারিণী বেশে।
বরঞ্চ যোগিনী হয়ে, অক্ষ কমণ্ডলু লয়ে,
পর্যটিব অরণ্য প্রদেশে॥

অনাহারে অনিদ্রায়, বরঞ্চ ত্যজিব কায়,
সিন্ধুতীরে রহিব শয়ান।
শকুনি গৃধিনী রাশি, করিবে সকলে আসি
সরলার অন্ত্যেষ্টি বিধান॥
তবুও থাকিতে প্রাণ, প্রণয়ের অপমান,
কখন হবে না সুলক্ষণে॥
যার প্রেমে অনুরাগী, সর্বত্যাগী যার লাগি
বাঁচিব মরিব তারি সনে॥"

আগে বলেছি, মালতী-মাধব পূর্ণপ্রকাশিত হয় নি। ভারতগাথা রচিত হয়েছিল পাঠ্যগ্রন্থ রূপে। হিন্দুযুগ থেকে পাঠান, মোগল আমল পার হয়ে ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি পদ্য-চুম্বক আছে এই গাথা-কাব্যে। সংক্ষিপ্ত হলেও রচনা প্রাঞ্জল ও গতিশীলঃ—

"বিক্রমে কেশরী-সম 'হার্ডিঞ্জ' নরেশ,
চাহিলা শীখের দর্প করিবারে শেষ।
শতদ্রু হইয়ে পার ইংরাজের অধিকার
ভারত গাথা শীখেরা করিছে আক্রমণ।
ইংরাজের মহাকোপ গড় গড় দাগে তোপ
বেধে গেল নিদারুণ রণ।"

অক্ষয় চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আত্ম-বিস্মৃত সৌন্দর্য-স্বপ্নাকুলতা; রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,—"আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোন বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় কার্পণ্য করিতে জানিতেন না।"১ 'উদাসিনী গাথায় যেমন, তেমনি 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতাতেও স্বপ্ন-সুরভিত প্রেম-সৌন্দর্যের রোমান্টিক পিপাসা গীত-মূর্ছনায় তরঙ্গিত হয়েছেঃ—

অভিমানিনী নির্ঝরিণী

"মহান জলধি জলে
প্রাণ ঢেলে দিব বলে
সুদূর পর্বত হতে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ
না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া!
কিন্তু—কিন্তু তবে কেন,

১। ঐ।

আশাতে নিরাশা হেন
কিছুই আশার মত হল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে
থাকিব রে হেসে খেলে
কই রে? সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়।
সুগম্ভীর গরজনে,
বহে সে আপন মনে
বহে সে দিগন্ত ভেদি কে জানে কোথায়
কই রে সে করে না তো ভ্রূক্ষেপ আমায়!"

চরিতকার, ঐতিহাসিক, আত্মচরিত-লেখক, পণ্ডিত-মনীষী, ধর্ম ও সমাজের সংস্কারক ইত্যাদি বিচিত্র ভূমিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বাংলা গদ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আজ সুখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু, উপন্যাস ও কবিতাগ্রন্থও তিনি একাধিক রচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"শিবনাথের স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল পদ্য রচনায়, কিন্তু সে ক্ষমতা বিকশিত হইতে পারে নাই।" তিনি আরো বলেছেন "ইঁহার অন্তরবাসী কবি-মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মত সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষক ও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাবে স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন।"[১]

কবি শিবনাথ শাস্ত্রী

শিবনাথের প্রকাশিত কাব্য-সংখ্যা পাঁচটি। প্রথম কাব্য 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮ খ্রীঃ) প্রকাশ প্রসঙ্গে কবি জানিয়েছিলেন, "নির্বাসিতের বিলাপের জন্মের কথা কিছু বলা উচিত, প্রায় দুই বৎসর গত হইল একজন ভদ্রসন্তান কোন গুরুতর অপরাধের জন্য চিরজীবনের মত নির্বাসিত হন। তাঁহার যাইবার দিন তাঁহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল; সেই উপলক্ষ্যে গুটিকতক পংক্তি লিখিয়া 'সোম প্রকাশে' প্রকাশ করিলাম।" [বিজ্ঞাপন] পরে সোম প্রকাশ সম্পাদক এবং অন্যান্য অনেকের প্রশংসা ও উৎসাহে কবিতাটি ব্যাপকতর পুস্তকের আকার লাভ করে। শিবনাথের "মনের কষ্ট" তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে একান্ত যুক্ত হয়ে স্থানে স্থানে গীতি-সুর ঝঙ্কৃত করে তুলেছে। 'উৎসর্গ পত্রে'র সরস্বতী-বন্দনা কবি-হৃদয়ের ভাব-নিভৃতির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন!—

নির্বাসিতের বিলাপ

"হে সারদে আসিবে কি বারেক জননি!
অকৃতি পুত্রের কাছে। কত রত্নমণি
দিয়াছ মা দয়াময়ি! পূর্ব-কবিগণে,

১। বাঙালা-সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড—২য় সং।

চাহি না মা সে সকল। আশা একবার
গাঁথিব কোমল গুণে কবিতার।"

কেবল ঐ একটি কাব্যেই নয়, শিবনাথের সে 'আশা' পুষ্পমালা (১৮৮৫) ও পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮) খন্ড, গীতি-কবিতাবলীতে স্ফুটতর সফলতা লাভ করেছিল। ঐ গীতি-কবিতা-গ্রন্থ দুটি এককালে কবির বহুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কারণ হয়েছিল। আজও ঐ সব কবিতার বহু অংশ যথার্থ রসিক জনের কাছে স্মরণীয়তার দাবি রাখে। এই দুই কাব্যের একাধিক খন্ড-কবিতায় শিবনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব নিভৃত-সুন্দর অভিব্যক্তি পেয়েছে, ঃ—

পুষ্পমালা ও পুষ্পাঞ্জলি

বহুদূর নয়

(গভীর নিশীথে লিখিত)

"গভীর রজনী! ডুবেছে ধরণী
জাগরে জাগরে সাধের লেখনি
প্রাণ প্রিয় ভাই ভারত সন্তান
জাগরে সকলে শোন করি গান
ভারতের গতি ভারত-নিয়তি
ভেবে কাহিনী তাই করি গান।

আজ যাও নিদ্রে! আজ ঘুমাব না,
সুখের শয্যায় আজ শুইব না;
মৃত প্রায় পড়ে জন্ম-ভূমি যার
এ সকল কিরে ভাল লাগে তার?
কিরূপে ঘুমাই? শুনিবারে পাই
যেন আর্তনাদ, যেন হাহাকার,
শুনে যে কেঁদেছে পরাণ আমার!"

[পুষ্পমালা]

"প্রভাতের ফুল"-এ ভৃঙ্গের সুধাস্বাদনের ছবি দেখে কবি-কল্পনা নিভৃতে উত্তীর্ণ হয়েছে মানব-কল্পলোকে!—

"কি ফুল সে ফুল ভাই, যাহার সুবাসে,
মানব-কানন পূর্ণ! সে ফুলের আশে
পিয়াসী ভ্রমর সম কত নর
ভ্রমে অন্বেষিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কোথা সে লুকান স্থান?—যথা তরু পাশে
আছে লতা, গন্ধ যার, মিশিয়া বাতাসে
প্রাণ মন ভরিছে উল্লাসে।
কোথা সে ভকত সাধু প্রেমিক সুজন,
প্রাণ-পাত্রে ভক্তি-সুধা ভরিয়া যেজন
আপনা লুকায়ে, আছে দীন হয়ে,
গেলে যাঁর পাশ প্রাণের পিয়াস
জনমের তরে মোর হবে নিবারণ;
জনমের মত মোর ঘুচিবে রোদন?
তত্ত্ব পেলে করি রে গমন।" (পুষ্পাঞ্জলি)

অন্যান্য কাব্য

শিবনাথের 'হিমাদ্রি কুসুম' (১৮৮৭) নীতি-বিষয়ক পাঁচটি ছোট-বড় কবিতার সংকলন; 'ছায়াময়ী পরিণয়' (১৮৮৯) একটি 'রূপক কাব্য'।

নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) প্রথম কাব্য 'অবকাশ রঞ্জিনী' প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে; আর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদাসিনী প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। 'অবকাশ রঞ্জিনী'র প্রসঙ্গে কবি অনন্যপূর্ব স্বকীয়তাও দাবি করেছেন ঃ—"প্রথমতঃ আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খন্ড কবিতা বঙ্গ-

নবীনচন্দ্রের কবি-স্বভাব

ভাষায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমি এডুকেশন গেজেট্-এ লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয় স্বদেশ প্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।"[১] নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয় দাবিটি যে অসার, তাতে সন্দেহ নেই। হেম-চন্দ্রের স্বাদেশিকতা-উদ্বুদ্ধ কবিতাদি তখন যদি রচিত না-ও হয়ে থাকে ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালের স্বদেশ-প্রীতির যুগ এর আগে অতিবাহিত হয়েছে। তা ছাড়া, নবীনচন্দ্রের দেশ-প্রীতির উদ্দীপনা ক্বচিৎ ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালের আবছা আবেগের পর্যায় অতিক্রম করতে পেরেছিল। হেমচন্দ্রের মত রাজ-নৈতিক বুদ্ধির সতেজ প্রবর্তনা নবীনচন্দ্রের কবি-মানসে প্রায় কোথাও ছিল না। ভারত-প্রীতির কবিতা লিখে বিপদ বরণের চেয়ে 'ভারত-উচ্ছ্বাস' লিখে রাজ-পারিতোষিক পাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়ে ছিল প্রবলতর।

উদ্ধৃত অংশে নবীনচন্দ্রের প্রথম দাবিটিও সম্পূর্ণ প্রামাণ্য নয়। আর, যদি তা হয়-ও, তবু, গীতিধর্মী খন্ড-কবিতা রচনার দক্ষতাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য গুণ নয়। নবীনচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা, আগে বলেছি, তাঁর ত্রয়ীকাব্যে। এই কাব্য রচনার পেছনে মহাভারতীয় প্রেরণা থাকলেও, মহাভারতীয় উদাত্ততার সম্ভাবনাকে নবীনচন্দ্র সর্বাংশে নষ্ট করেছেন; এ-বিষয়ে দ্বিমত বড় একটা নেই। কিন্তু, পরবর্তী আলোচনায় দেখব,—রোমাণ্টিক কাহিনী বর্ণনায় এই কাব্য-ত্রয়ী মাঝে মাঝে উল্লেখ্য শিল্প-সার্থকতার আকর হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কাব্য-ত্রয়ীর আগে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র স্কট-এর আখ্যায়িকা-কাব্যের আদর্শে 'রঙ্গ-মতী' রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের দেহে-মনে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর

ও অক্ষয় চৌধুরী

'উদাসিনী'-র ছায়া অনায়াস-লক্ষ্য হয়ে আছে। ডঃ সুকুমার সেন সম্ভবতঃ এই কাব্য সম্বন্ধেই নবীনচন্দ্রের 'পরে অক্ষয়চন্দ্রের কাব্য-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের ধারণা, রঙ্গমতীর এই কাব্য-স্বভাবই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের ব্যাপক পটভূমিতে পূর্ণ ও স্পষ্টতর হয়েছে।

১। আমার জীবন—নবীনচন্দ্র।

অতএব, নবীনচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের পূর্বে কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকলেও, তাঁর উল্লেখ্য কবি-স্বভাব অক্ষয়চন্দ্রের ভাবনার ছায়ানুকূল্যে পরিবর্ধিত হয়েছিল। এই অর্থে-ই তিনি অক্ষয়চন্দ্রের উত্তরসূরী বলে বিবেচিত হতে পারেন।

অবকাশ রঞ্জিনী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে কবির ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সের মধ্যে লেখা ২১টি খণ্ড-কবিতা ধৃত হয়েছে। কবিতাগুলির কোন কোনটি কাহিনী-সমাশ্রিত এবং সুদীর্ঘ। এর কিছু কিছু অংশ এডুকেশন গেজেট-এ প্রকাশিত হয়েছিল। গেজেট-সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার, কৃষ্ণ-কমল ভট্টাচার্য ও শিবনাথ শাস্ত্রী নবীনচন্দ্রের প্রথম জীবনের কবি-কর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অবকাশ রঞ্জিনী ও নবীনচন্দ্রের Lyric sentiment

নবীনচন্দ্রের কবি-চেতনায় ভাবাকুলতা বাঙালি সুলভ আতিশয্যের সীমাকেও অতিক্রম করেছিল; তাঁর আত্মসচেতনতা ছিল প্রবল আত্মম্ভরিতার নামান্তর। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত সুদীর্ঘ আত্মচরিত,—'আমার জীবন'—এই আবেগাতিশায়ী আত্মম্ভরিতার প্রাচুর্যে কৌতুকাবহ হয়ে আছে। অবকাশ রঞ্জিনীর প্রায় সব কবিতাই মন্ময় ভাবনা-জাত; ফলে, কবির ব্যক্তিত্বের এই সহজ বৈশিষ্ট্যে অনায়াস-পূর্ণ। এই কারণেই, অবকাশ রঞ্জিনীর অধিকাংশ কবিতা অসংযত-বাক্, শিথিল-বন্ধ এবং আতিশয্য-দুষ্ট হয়ে আছে। নবীন-চন্দ্রের এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিলে খণ্ড কবিতাগুলির কোন কোন অংশ নিতান্ত অপাঠ্য মনে হয় না, মাঝে মাঝে কবি-চিত্তের সহজ অনাড়ম্বর প্রকাশ বরং মনোভিরাম হয়েছে। "পিতৃহীন যুবক"-এর মনো-বেদনা ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন,—

"পথ পার্শ্বে তরুতলে, সরোবর তীরে,
বসি কেহ চেয়ে আছে চাতকের প্রায়;
দুনয়নে অশ্রুধারা ঝরে ধীরে ধীরে,
ভাবিছে "সপ্তাহ শেষ জনক কোথায় ?"
মলিন কমল মুখ দেখি তরুগণ,
পত্রচ্ছলে অশ্রুবিন্দু করে বরিষণ।

* * *

কে চাহিবে অভাগারে ? কে চাহে কখন
রাজপথপাশে বসি দরিদ্র নির্ধন
করে যবে হাহাকার ? কে করে যতন
বিকচ কমল আহা ! শুকায় যখন ?
যেই দিন মরেছেন জনক আমার,
সেদিন জেনেছি পর হয়েছে সংসার।"

"পতি প্রেমে দুঃখিনী কামিনী" শেষ দুঃখবার্তা নিবেদন করে বলেছে ঃ—

"কাল যদি পতি ফিরেন আলয়ে,
বলিও তাঁহার কানে,
গত প্রেম স্মরি, হত দুঃখিনীরে
পবিত্রা প্রেয়সী জ্ঞানে;
লইতে হৃদয়ে তা হলে নিশ্চয়,
বাঁচিবে দুঃখিনী প্রাণে।"

এ-সবক্ষেত্রে কবিতা ভাবালুতার (Sentiment) পর্যায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি, তবু অ-মিশ্র sentiment-ও নির্ভেজাল পরিশুদ্ধতার গুণে হৃদয়-স্পর্শী হয়েছে।

'সায়ং চিন্তা'র মত কবিতায় অজস্র বিশৃঙ্খল ভাবনার মধ্যে হঠাৎ কবির মনে পড়েছে ঃ—

"স্বদেশের রাজনীতি, শাসনপ্রণালী,
কেবা রাজা, কিবা জাতি, কোথায় বসতি;
কেমনে ভারতে পশি, দাসত্বে করিল মসি
আর্য-সুত-বীর্য-ভানু-পতঙ্গ যেমতি
ভস্মিল যবন-লক্ষ্মী কি অনল জ্বালি।"

কিন্তু, এ-ধরণের প্রসঙ্গ-কথাকে ছাপিয়ে 'অবকাশ রঞ্জিনী'র প্রথম খণ্ডেই নবীনচন্দ্রের রাজানুগত্য স্বয়ংস্ফুট হয়েছে "মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ্ এডিনবরার প্রতি" কবিতায়। আগে বলেছি, নবীনচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা মুক্তির চেয়ে বেশি পরিমাণে ছিল রাজ-প্রসাদ প্রিয়।

'অবকাশ রঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। অল্পাধিক চল্লিশটি কবিতার এই সংগ্রহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাঙালির বিষপান এবং ভারত উচ্ছ্বাস (যুবরাজ-প্রশস্তি), ক্লিওপেট্রা, আর্যদর্শন ও 'জুমিয়া জীবন' পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কবির বয়ঃপরিণতির সংগে অবকাশ রঞ্জিনীর কাব্য-স্বভাবের কোনো উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে করবার কারণ নেই। অবকাশ রঞ্জিনী দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ভারত উচ্ছ্বাস ও ক্লিওপেট্রা প্রথম স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যুবরাজের ভারত দর্শন উপলক্ষ্যে প্রথম কবিতাটি লিখে নবীনচন্দ্র বিলাতের Crown Perfumery Co.-র কাছ থেকে পঞ্চাশ গিনি পেয়েছিলেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, সেকালে, "সকলের ধারণা এরূপ হইল যে, যুবরাজের কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে এই (পুরস্কার) ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে।"১

অবকাশ রঞ্জিনী
২য় খণ্ড

১। 'আমার জীবন।'

নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্য ছিল পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫)। এই কাব্য প্রকাশের সংগে সংগেই তাঁর কবি-খ্যাতি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঙালির রাষ্ট্রীয় পরতন্ত্রতার ক্ষোভ সংবাদ-প্রভাকর-এর যুগ থেকে গদ্যে-পদ্যে মুখর হয়েছিল,—রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান সেই বিচ্ছিন্ন-বিচিত্র ক্ষোভের সংহত রূপ-প্রকাশ। কিন্তু, আগে বলেছি, প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের কাহিনী থেকেই রঙ্গলাল ও তাঁর পরবর্তী কবিদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য-কামনার কাব্য-কাঠামো রচিত হয়েছিল। পলাশির যুদ্ধ-তে বাংলার অব্যবহিত পরাধীনতার ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কাব্যের সাঙ্গীভূত হয়েছিল। এই কারণেই এই কাব্য সম্বন্ধে সেকালের পাঠকেরা এত উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু, কাব্যটির আভ্যন্তর বিষয় বিচার করলে দেখব, রাজনৈতিক চিন্তার কোনো প্রাগ্রসরতা বা কবির স্বচ্ছ বস্তু-নিষ্ঠার পরিচয় কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। নবীনচন্দ্রের স্বাদেশিকতা রঙ্গলালের ভাবচিন্তার পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি; বাঙালির জাতিত্ব-বোধ ও হিন্দুত্বসচেতনতা তাঁর পক্ষে সমর্থক ছিল। এই কারণেই, তাঁর ভাব-দৃষ্টিতে পলাশির ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি বাঙালি স্বাধীনতার সর্বজনীন বিনষ্টিতে নয়,—

পলাশির যুদ্ধ

> "যেই খানে মোগলের মুকুট রতন
> খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে!
> যেই খানে চির রুচি স্বাধীনতা ধন
> হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে!"

পলাশির ক্ষেত্রে সিরাজের হিন্দু সেনাপতি-দ্বয়ের পরাভব, তথা পলাশির ব্যর্থতা সম্বন্ধে কবির ধারণা—

> "পাণিপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
> ভারতে উদয় নাহি হইল আবার;
> পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
> ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
> কিন্তু পলাশিতে সেই নিবিড় নীরদ
> করিল তিমিরাবৃত ভারত গগন,
> অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ
> হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?"

এর পরেও সিরাজের হত্যা প্রসঙ্গে কবি যখন বলেন ঃ—

> নিবিল তখন,
> ভারতের শেষ আশা,—হইল স্বপন।"—

তখন কল্পনার অস্বচ্ছতায় আগাগোড়া কাব্যের বক্তব্য প্রায় অর্থহীন

হয়ে পড়ে। কারণ, কাব্যের কোথাও সিরাজকে তিনি প্রতিহত বাঙালি জাতীয়তার নায়ক বলে কল্পনা করতে পারেন নি।

তাঁর কল্পনায়ঃ—"সিরাজ দুর্দান্ত বটে নিষ্ঠুর পামর।" তাছাড়া, হিন্দু রাজপরিজনদের সিরাজ-বিরোধিতার কারণ হিসেবে সিরাজ কর্তৃক নারীত্বের লাঞ্ছনাও প্রবল ভাবে বিঘোষিত হয়েছে। অবশ্য, সিরাজের সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক তথ্যাদি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ফল কথা, নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর যৌবন-সীমায় শিক্ষিত বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সংহত-তর হয়ে উঠেছিল।

ও নবীনচন্দ্রের রাষ্ট্রীয়-সচেতনতা

কিন্তু, নিয়ত ভাব-তন্দ্রাচ্ছন্ন নবীনচন্দ্রের আকুল স্বভাব সেই বলিষ্ঠ শক্তিকে ধারণ করার উপযোগী ছিল না। ফলে, হিন্দু-জাতিত্ব-বোধের সুচির-স্থায়ী দুর্বল Sentiment-এর সূত্রে ইংরেজ-বিরোধী রাজনৈতিক ঘনঘটা-চ্ছন্নতাকে গাঁথতে গিয়ে একটি আবেগাকুল গাথা-কাব্যই তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন। সমকালীন পাঠকদের উত্তেজনা পলাশি-কথা এবং ইংরেজ-প্রতিরোধের প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্রেই উদ্দীপ্ত হয়েছিল। এ-ছাড়া, সেকালে কাব্যটির অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তার উপযোগী আর কোনো শিল্পগুণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পাঁচ সর্গে বিন্যস্ত এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষা-প্রয়োগে কবির স্বভাবগত অতি-উচ্ছ্বাস অনায়াসে উৎসারিত হয়েছে। যুদ্ধ-গাথার পরি-সমাপ্তিতে এই উচ্ছ্বাস রোমান্টিক বেদনার ব্যঞ্জনা রচনা করেছে বাঙালি নারীত্বের করুণাঘন বর্ণনায়ঃ—

"মীরজাফরের কারাগারে একটি রমণী
চিন্তা-অভিভূত তন্দ্রা ভাঙিলে, অমনি
জাগিল সন্ত্রাসে বামা; সিরাজদ্দৌলার
শিবির-সঙ্গিনী হায়! সেই বিষাদিনী!
বিষাদ-জলদে আরো গাঢ়তা সঞ্চার
হইয়াছে রমণীর অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগল রেখা কপোল-কমলে।"

গুরুগাম্ভীর্যের ফাঁকে ফাঁকে প্রধানতঃ এই কমল-কোমল পেলবতাই পলাশির যুদ্ধকে সর্বকালীন বাঙালির হৃদ্য করে রেখেছে। বঙ্গদর্শন-এ লেখা এক প্রবন্ধে পলাশির যুদ্ধে বায়রণের প্রভাবের কথা বলেছেন বঙ্কিম। নবীনচন্দ্রের এই সময়কার অন্যান্য কবিতাতেও অনুরূপ প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

গুরুগম্ভীর কাহিনীর উপলক্ষ্যে স্নেহ-প্রেম-ঘন গাথা-কাব্য রচনার ধারাটি আরো স্ফুটতর হয়েছে রঙ্গমতী (১৮৮০) কাব্যে। ডঃ সুকুমার সেন এই "আখ্যায়িকা কাব্যে"র প্রসঙ্গে "স্কট্‌এর আদর্শে"-র কথাও উল্লেখ করেছেন।

রঙ্গমতী

হয়ত প্রধানতঃ এই কাব্য সম্বন্ধেই তিনি অক্ষয় চৌধুরীর প্রভাব-কথারও অবতারণা করেছিলেন।

ডঃ সেন এ-বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করেন নি। কিন্তু 'রঙ্গমতী'তেই 'উদাসিনী'-কাব্যের ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে সমধিক। কাব্যের পটভূমি প্রধান-ভাবে "ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বিপুল কানন রাজ্য"। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি (রঙ্গমতী) নায়কের জন্মভূমি। নায়ক বীরেন্দ্রের পিতা ঐ অঞ্চলে মোগল-প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু, সপত্নীর তাড়নায় সন্তান-সম্ভবা বীরেন্দ্র-জননী বনে পলায়ন করেন; সেখানে দেব-মন্দিরে বীরেন্দ্রের জন্ম হয়। শিশু বীরেন্দ্রকে নিজের বাল্য-পরিচারক শংকরের কাছে রেখে বীরেন্দ্র-জননী বারাণসী গিয়ে নিখোঁজ হন। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে বীরেন্দ্র মাতৃসন্ধানে বারাণসী যায়। সেখানে হিন্দু-কীর্তি ও মোগল-বিধ্বংসের চিত্র দেখে সে স্বাধীনতা কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রথমে মোগল বাহিনীতে, পরে শিবাজীর মহারাষ্ট্র বাহিনীর সান্নিধ্যে এসে বীরেন্দ্র যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। শিবজীর প্রভাবে সে আর্য-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে হয় উদ্বুদ্ধ। এই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই শিবজীর নির্দেশে বীরেন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসে। এখানেই গল্প স্বাধীনতার স্বপ্নকল্পনার ক্ষেত্র থেকে রোমাণ্টিক প্রণয়গাথার পথে মোড় ফিরেছে।

কাব্য-কাহিনী

কুসুমিকা ছিল বীরেন্দ্রের আবাল্য প্রণয়িণী। তাদের বিবাহের প্রস্তাব পূর্বাবধি সুস্থির ছিল। বীরেন্দ্র স্বদেশ-প্রত্যাগত হলে মর্কট রায় নামক একটি দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি সে-পথে বাদ সাধল। ক্রমে কুসুমিকার রূপ-মুগ্ধ চন্দ্রশেখর তীর্থের মোহান্ত, মর্কট রায়, পর্তুগীজ দস্যু-সর্দার বেঞ্জামিন সকলে মিলে বীরেন্দ্র-কুসুমিকার প্রণয়-বিপাকে নিত্যনূতন বিপত্তির সৃষ্টি করতে লাগল। মাঝে মাঝে অসির ঝঙ্কার এবং যুদ্ধের দামামা কাহিনীর বৈচিত্র্য-সঞ্চারে সহায়তা করে। সবশেষে মোগল পক্ষে পর্তুগীজ-যুদ্ধ জয় করে বীরেন্দ্র ফিরে আসে কুসুমিকার সন্ধানে ঃ—

"লিখেছিল কুসুমিকা—'অষ্টমী নিশিতে
নাহি দেখা দেও যদি, দেখিবে না আর
অভাগিনী কুসুমেরে'।"

আজ সেই অষ্টমীর নিশি;—বক্ষ-ক্ষতের মরণান্তিক আঘাত বহন করে বীরেন্দ্র প্রবল বেগে কুসুমের সন্ধানে ছুটে যায়। নারী কণ্ঠের আর্ত-ধ্বনির অনুসরণ করে বীরেন্দ্র ও বৃদ্ধ শংকর এক বিবাহ সভায় গিয়ে উপস্থিত হয়। ঢেঁকি পঞ্চানন সেখানে বর,—পাশের ঘরে অচেতন কুসুমিকা ঃ—

"এক খন্ড চন্দ্ররশ্মি
পড়ে আছে যেন কোন আঁধার কুটিরে।"

কুসুমিকার এই করুণ অবস্থা বীরেন্দ্রকে আবেগ-উচ্ছ্বসিত করে তোলে; বক্ষ-ক্ষতে রক্ত-নিঃসরণের ফলে সে হয়ে পড়ে হত-চেতন। কুসুমিকা জ্ঞান

ফিরে পেয়ে বীরেন্দ্রকে দেখে ক্রন্দনাকুল হয়ে ওঠে; বীরেন্দ্র 'মা'-বলে চোখ খুলল,—সংগে সংগে হল তার প্রাণান্ত। তখনও তপস্বিনীর ছদ্মবেশে মা তার শিয়রে;—পুত্র-প্রণয়িণী কুসুমিকাকে তিনিই শত্রু-হস্ত থেকে রক্ষা করেছেন বারে বারে। কুসুমিকাও প্রণয়ীর বক্ষে পড়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ করল :—

"এক বৃন্তে
ফুটেছিল দুটি ফুল সংসার কাননে;
এক সংগে দুটি ফুল পড়িল ঝরিয়া।"

তার পরে রইল তপস্বিনী জননীর অনির্বাণ শোক-বহ্নি; মশালের আগুন দিয়ে রাঙামাটিকে সে দগ্ধ করতে লাগল,—সংগে চলল দস্যু বেঞ্জামিনের অপ্রতিহত লুণ্ঠন;—

"নিশি পোহাল যখন
স্বপ্নশেষ রঙ্গমতী সুন্দর কানন।"

পার্বত্য পরিবেশ, আদিমতাগন্ধী চরিত্রাবলী ও বিভিন্ন-প্রকারের শৌর্য-কাহিনীর প্রভাবে রঙ্গমতী কাব্যে ওজস্বিতা-ব্যঞ্জক জীবন-চিত্র-রচনার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু, গোটা কাব্যের কোথাও শৌর্য-কথা প্রাসঙ্গিকতার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। ছদ্মবেশী বঞ্চিতা জননী ও লাঞ্ছিতা প্রণয়িণীর বিয়োগ-মেদুর জীবন-রূপ একটি করুণা-মথিত রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের আবহাওয়া রচনা করেছে সারাটি কাব্যে। বীরেন্দ্রের চরিত্রেও রাজ্য-জয়ের চেয়ে প্রণয়িণীর চিত্ত-জয়ের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হয়েছিল; ভৃত্য শঙ্কর বলেছিল;—

"পিতৃ-স্নেহ, রাজ্য-আশা, দুর্লভ জীবন,
সকল সংসার নাহি বুঝিনু কেমনে,
একটি বালিকা তরে দিলে বিসর্জন।"

বলিষ্ঠ চারিত্র ধর্মের সকল উপাদানই বীরেন্দ্র-তে বর্তমান ছিল। কিন্তু, আবেগের আতিশয্য ও শৌর্যে-প্রেমে, যুদ্ধে, নিভৃত-চিন্তায় সর্বপ্লাবী উচ্ছ্বাস তার অমেয় বলশালিতাকে অমিতাচারীর দুর্বলতায় আচ্ছন্ন করেছিল। হিন্দু জাতিত্ববোধের ভাবালুতায় অধীর হয়ে নবীনচন্দ্রের কল্পনা সর্ব-শক্তিমান হিন্দু-পৌরুষের স্বপ্ন দেখেছে, আর, তাঁর তন্দ্রাতুর আবেগোচ্ছ্বাস সেই শৌর্য-স্বপ্নের সর্বাঙ্গে প্রণয়-বিহ্বলতার পেলব-মধুরিমা দিয়েছে ছড়িয়ে। এ-যেন পাঞ্চজন্যধারী কৃষ্ণের এক হাতে কপিধ্বজ রথ-রশ্মি, আর এক হাতে বৃন্দাবন-মুরলী। বস্তুতঃ, এই তন্দ্রালু স্বপ্নাচ্ছন্নতাই মূর্ততম বিকাশ লাভ করেছে ত্রয়ীকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে।

এই কাব্যত্রয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রভাসের উৎসর্গ পত্রে কবি লিখে-ছিলেন :—"রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্য-

লীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিম লীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।"

ত্রয়ীকাব্যের

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে এই কাব্যত্রয়ীর উন্মেষ-ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন। রৈবতক কাব্যের প্রারম্ভে পত্রটি সংযোজিত আছে। মহাভারতীয় ঐতিহ্য-পূত জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুর,—রাজগৃহ, অধুনাতন রাজগীরে নবীনচন্দ্র একবার রাজকর্মে বৃত ছিলেন। তখন "স্থান মাহাত্ম্যে উদ্বেলিত হৃদয়ে" তিনি মহাভারত মহাকাব্য আর একবার পাঠ করেন। চারদিকে জরাসন্ধ-রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে ছিল,—মূল ব্যাসের কাব্যে প্রত্যক্ষ করছিলেন তার পূর্বরূপ! নবীনচন্দ্রের মনে হয়েছিল, যেন,—"বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকায়, সেই শেখর মালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে।"১ সেদিনকার মহাভারত পাঠ কবির কল্পনা-দৃষ্টির সামনে মহাভারতের এক নূতন আবেদনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল—তিনি সমাগত বিপ্লবের মুক্তিপথ দেখতে পেয়েছিলেন তার মধ্যে; —"দেখিলাম,...বাসুদেব—অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর—পতিত মানব-জাতির—উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।"২

মহাভারতীয় কৃষ্ণের এই বিশ্ব-সমুদ্ধারী বিপ্লবী ভূমিকার কথা নবীন-চন্দ্র তাঁর আত্ম-জীবনীতে আরো ব্যক্ত করেছেন:—"বুঝিলাম, অন্তরবিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম মহাভারত। বুঝিলাম, মহাভারত ভরত বংশের ইতিহাস নহে, মহাভারত সাম্রাজ্য (The Great Indian Empire)। এই মহাসাম্রাজ্যের নাম 'ধর্মরাজ্য'; যে মহা-ক্ষেত্রে ইহা স্থাপিত হয়, তাহার নাম "ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র"। এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁহার গীতোক্ত অনাসক্ত বা নিষ্কাম ধর্ম। এই জন্য ইহার নাম ধর্মরাজ্য। বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত ধর্মরাজ্যই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য। বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না।"৩

ভাব-প্রেরণা

শ্রীকৃষ্ণের ঐ বৈপ্লবিক ভূমিকাকে কবি মানবিক মূল্যে বিভূষিত করে দেখেছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণের ভগবত্তা তাঁর "অতি মানুষিক" শক্তি ও কৌশলের ফলশ্রুতিমাত্র:—"বুঝিলাম অতিমানুষিক শক্তি বলে ও কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ এক সংগে ধর্ম, রাজ্য ও সমাজ সংস্কার করিয়া এবং তিন-ই নিষ্কামত্বের

১। ঈশানচন্দ্র বনন্দ্যাপাধ্যায়কে লেখা পত্র।
২। ঐ।
৩। আমার জীবন।

উপর স্থাপিত করিয়া এই মহা ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে সকলে অবতার। কিন্তু কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।"১

নবীনচন্দ্রের স্বভাবগত অতিকথনের ভার পরিহার করে ওপরের আলোচনা থেকে ত্রয়ীকাব্যে কবির বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ করা যেতে পারে ঃ—

(১) "পতিত ভারতবাসীর" উদ্ধারের একমাত্র উপায় কৃষ্ণের "পদাঙ্ক অনুসরণে" ধর্ম-সাম্রাজ্যের স্থাপন।

(২) এই ধর্ম সাম্রাজ্য কেবল রাজনৈতিক সংস্থা মাত্র হবে না,—"ধর্ম, রাজ্য, সমাজ" এই তিনের যুগপৎ আমূল সংস্কার দ্বারাই অনুরূপ ধর্ম সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব।

(৩) ভারতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই এই বৈপ্লবিক সাম্রাজ্য সর্বপ্রথম, এবং ঐ একবার মাত্র সংস্থাপিত হতে পেরেছিল। তার পরে এ-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার প্রধান কারণ,—ভারত প্রথমাবধিই "অন্তরবিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত"। আত্মহত্যার এই স্বভাব-ধর্ম থেকে ভারতবর্ষকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করেছিলেন "গীতোক্ত অনাসক্ত" বা নিষ্কাম ধর্মের প্রভাবে। এই নিষ্কামতার মনোভাব একদিকে আত্ম-পর বিভেদহীন,—উদাসীন। অন্যদিকে তা অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহ মোচনের প্রয়াসে সর্বজীবে সহজ-প্রেমময়।

নবীনচন্দ্রের এই মহাভারত-অর্থ কল্পনা কতদূর তথ্যসহ, বর্তমান প্রসঙ্গে সে বিতর্ক অবান্তর। কিন্তু, এর পেছনে নব-ভারতীয় আর্য-জাতিত্ব-বোধের সমকালীন ভাব-প্রেরণা আত্মগোপন করে আছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একদা আর্য-হিন্দুর মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি "ভগবান্ স্বয়ং"। আবার সেই সাম্রাজ্য স্থাপনের আবেগাকুল স্বপ্ন দেখেছেন নবীনচন্দ্র,—"বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে না।" প্রাচীন মহাভারতের এই নব-পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্র সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির ভাব-স্বপ্নের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। তাই, বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—"If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharata of the Nineteenth Century।"২ আবার এই কারণেই সেকালের উচ্ছ্বসিত-আবেগ বহু পাঠক এই কাব্যত্রয়ীকে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাকাব্য-রূপে বরণ করেছিলেন।

ও 'উনিশ শতকের মহাভারত'

কিন্তু, আসলে মহাকাব্যিক সম্ভাবনা যে ত্রয়ীকাব্যে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ-কালে সকলেই সে-বিষয়ে এক মত। নবীনচন্দ্রের ভাব-উচ্ছ্বসিত

১। ঐ।
২। দ্রষ্টব্য—ঐ।

তন্দ্রালু ব্যক্তিত্ব মহাকাব্যের দৃঢ়-পিনদ্ধ সম্ভাবনাকে সচেতনভাবে ধারণ করার ক্ষমতা কখনোই অর্জন করতে পারেনি; —পারা যে সম্ভব নয়, সে কথা বঙ্কিম তাঁর উদ্ধৃত পত্রের একাধিক অংশে ইঙ্গিতও করেছিলেন। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে মহাকাব্যিক সংঘাতের পটভূমি রচনা করা হয়েছে আর্য-অনার্য, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও আর্য-ক্ষত্রিয় শক্তির ত্রিকোণ দ্বন্দ্বে। ব্রাহ্মণেরা বেদ-বিধির সংগে বৃহত্তম মানব-জীবন-বিধিকেও কর-করঙ্ক-নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে যথেচ্ছাচারী ক্ষত্রিয়-শক্তি বৃহৎ মানবতার 'পরে চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। ভগবান নারায়ণ কৃষ্ণবেশে বেদ-বিধির অন্ধ সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্যের যথেচ্ছাচার থেকে ভারতভূমিকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। সেই সংগে পাপাচারী ক্ষাত্র শক্তির উৎপাটনও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে, আর্য-ক্ষত্রিয়রা এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের রাজ্যাপহরণ করে প্রথমাবধি তাদের শত্রুতাভাজন হয়েছেন। আলোচ্য কাব্য তিনটিতে দুর্বাসা নির্জিত ব্রাহ্মণ্য-শক্তির পুনরাভ্যুত্থানের দুরভিসন্ধিতে নিমগ্ন। পাপাচারী ক্ষত্রিয়-নেতা দুর্যোধনকে তিনি কৃষ্ণ-পাণ্ডবের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করেছেন, অনার্য নাগরাজ বাসুকীকেও আর্য-বিরোধী সংগ্রামে করেছেন প্রবুদ্ধ। তাঁর উদ্দেশ্য, বেদ-বিরোধী গোলাপক কৃষ্ণ ও তাঁর সংগী পাণ্ডব বীর-শ্রেষ্ঠদের নির্মূল করে অনার্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠা। নির্বোধ অনার্যরা রাজ্য পেলেই ব্রাহ্মণের আধিপত্য নিরঙ্কুশ হবে। একদিকে এই রক্ত-ক্ষরা সম্ভাবনার বিভীষিকা। অন্যদিকে পুণ্য-প্রশান্তি-অনন্ততার আকর শ্রীকৃষ্ণ;—অর্জুন তাঁর বাহু; বেদব্যাস একাধারে মস্তিষ্ক-হৃদয়;—সুভদ্রা তাঁর অমৃত-নিস্যন্দী মহাবাণী।

শিল্প-পরিণাম

কিন্তু, এই উদাত্ত-মহিম বীভৎস-সুন্দর কাহিনী-সম্ভাবনা প্রথম থেকেই করুণাঘন মর্মাতুরতার পথ গ্রহণ করেছে। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ-নীতিগত ত্রিকোণ-সংগ্রাম প্রথমেই পরিবর্তিত হয়েছে ত্রিমুখী প্রণয়-দ্বন্দ্বে। যৌবনে কৃষ্ণ ছিলেন নাগরাজ বাসুকীর পিতৃ-আশ্রিত। বাসুকী তখন ছিল তাঁর বন্ধু, বাসুকী-অনুজা জরৎকারু তাঁর সঙ্গিনী। এই অবকাশে জরৎকারু ভালবেসেছিল দূর্বাদল শ্যামকান্তি তরুণ কৃষ্ণকে; বাসুকী গোপনে হৃদয় সঁপেছিল কৃষ্ণ-ভগ্নী সুভদ্রার অতুল্য নারী-বিভামূলে। কৃষ্ণ জরৎকারুকে গ্রহণ করেন নি; রুক্মিণী-সত্যভামা হয়েছেন তাঁর অঙ্ক-অলংকার। বাসুকীর ভাগ্যে সুভদ্রা রয়েছে চিত অলভ্য,—অর্জুন-প্রণয়িনী সে, পরিণামে হয়েছে অর্জুনের জীবনসঙ্গিনী। অচরিতার্থ প্রেমের এই জ্বালাই উৎক্ষিপ্ত করেছে বাসুকী-জরৎকারুকে,—সেই জ্বালার পরিসমাপ্তিতেই প্রভাসের কাব্য-সমাপ্তি।

ত্রয়ীকাব্যে করুণাঘন মর্মাতুরতা

স্পষ্ট দেখ্‌ছি,—মূল কাব্য পাঠ করলে এ-কথা আরো স্পষ্ট হবে,—এই ত্রয়ীকাব্য রচনায় নবীনচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুত মহোদাত্ত পরিকল্পনার প্রসঙ্গচ্যুত হয়েছেন। কবির দুর্বল ভাবালুতা এর জন্যে যত দায়ি, তাঁর অনিয়ত উচ্ছ্বাসের অ-নিঃশেষ উত্তালতাও তার চেয়ে কম নয়। নবীনচন্দ্রের কল্পনার মত তাঁর লেখনীও চল্‌তে আরম্ভ করলে থাম্‌তে চাইত না,—যথেচ্ছ-বিহার ছিল তাঁর কবি-স্বভাব। এই কাব্য-ত্রয়ীতে সে স্বভাব স্ফুটতম,—রৈবতকে (১৮৮৬) সর্গ সংখ্যা কুড়ি, কুরুক্ষেত্রে (১৮৯৩) সতেরো; প্রভাস (১৮৯৬) শেষ হয়েছে ত্রয়োদশ সর্গে। আর, প্রায় প্রতি সর্গেই সমুচিত দৈর্ঘ্যের সকল সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র রৈবতকের প্রথম কয়েক সর্গ এবং গোটা কাব্যের পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখ্‌তে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের অতি-দীর্ঘতা সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলেন; পরিকল্পনার ভারকেন্দ্রচ্যুতির সম্ভাবনা বিষয়েও উচ্চারণ করেছিলেন সাবধানবাণী। বঙ্কিমের নিষেধ নবীনচন্দ্র যে-পরিমাণে পরিহার করেছেন, সেই পরিমাণে তাঁর কাব্য হয়েছে শিথিলবন্ধ, আবেগাতুর, শ্লথগতি। কিন্তু, এই কারণে নবীনচন্দ্র সর্বাংশেই নিন্দনীয় নন। কৃষ্ণ-কথা-সমাশ্রিত মহাভারতীয় মহাকাব্যের সকল প্রত্যাশা তিনি ব্যর্থ করেছেন। কিন্তু, সেই সংগে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন-স্বভাবের একটি ভক্তি-আবেগতুর কাহিনী-কাব্যের যে রস সঞ্চার করেছিলেন, তাকে উপেক্ষা করা চলে না।

ও নবীনচন্দ্রের প্রসঙ্গচ্যুতি

কাব্যের একেবারে প্রথমাবধিই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য থেকে উপলক্ষ্যে পরিণত হয়েছেন। রৈবতকের প্রধান বিষয় ভদ্রার্জুন;—সুভদ্রার কুমারী জীবনের মূক প্রণয়, তাঁর চিত্র-রচনা, সুলোচনা-সত্যভামার কৌশলে ভদ্রার্জুনের গোপন মিলন, বিবাহ এবং সুভদ্রা-হরণ। ফাঁকে ফাঁকে আছে রুক্মিণী-সত্যভামার প্রেমে স্নিগ্ধ কৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন, কারু-কৃষ্ণের প্রণয় কথা, বাসুকীর সুভদ্রাসক্তি, ছদ্মবেশিনী শৈলজার গোপন প্রেম। এ-সব-কিছুই যেন মূল রোমাণ্টিক প্রণয়-কথার পরিপোষক পার্শ্বচিত্র;—ভদ্রার্জুন-গাথায় এরা স্বাদের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে,—মূল কাহিনীর করেছে সৌন্দর্য বর্ধন। দুর্বাসার ষড়যন্ত্র, কৌরব রণসজ্জা ইত্যাদিও নূতন রস-বৈচিত্র্যের আকর। প্রভাস, ব্যাসাশ্রম, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি আলোচনা নিতান্ত গৃহ-বলি-ভুক্ প্রণয় কথামালাকে একটি ব্যাপক উদাত্ততার পটভূমিতে উত্তীর্ণ করে নূতন স্বাদ ও মর্যাদায় বিশেষিত করেছে। রৈবতক আগা-গোড়াই রোমাণ্টিক্ প্রণয়-গাথা,—ওজস্বিতা যেটুকু আছে, সেটুকুও রঙ্গমতীর স্বভাবান্বিত। রৈবতক রঙ্গমতীর পরিণততর সংস্করণ।

রৈবতক

রৈবতক রঙ্গমতীর পরিণততর সংস্করণ, কুরুক্ষেত্র আবার রৈবতকেরই শিল্প-পরিণতি। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র দুই পুরুষের পারিবারিক ইতিহাস, —অর্জুন-সুভদ্রার রৈবতকের ভূমিকা কুরুক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে অভিমন্যু-উত্তরা। কুরুক্ষেত্রের ভাব-ভূমি বিদীর্ণ করে মহাভারতের মহাযুদ্ধ আজও নিত্যকালের শ্রবণ-মনে বীর্য-নির্ঘোষ প্রচার করছে। কিন্তু, নবীনচন্দ্রের কাব্যে দিবসের রণক্ষেত্রের চেয়ে রাত্রির শিবিরেই কুরুক্ষেত্রের মহানুষ্ঠান অতিবাহিত হয়েছে বেশি। সুলোচনা বিরাটের, সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের, উত্তরা অর্জুনের সেবায় নিরত; কত দুঃখ কত করুণা কত হাস্য-পরিহাস-কৌতুক! সেই স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-বাৎসল্য-স্নিগ্ধ পরিবেশে কেবল উত্তরারই নয়, পাঠকেরও মনে হয়ঃ—

কুরুক্ষেত্র

"পোড়া বীরধর্ম ছাই।
সংসার ছাড়িয়া যাক্ যমপুরে
লইয়া সব বালাই।"

কারণ, কুরুক্ষেত্র কাব্যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা অবান্তর। উত্তরা সেখানে পুতুল খেলে, অভিমন্যু-উত্তরা ছবি আঁকে, আর দাই-মার কাছে গিয়ে করে কৃত্রিম কলহ।—তারও বেশি তারা খিল্ খিল্ হাসে,—ছুটে বেড়ায় চঞ্চল চরণে। এমন পরিবেশে দূর হতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঝঙ্কার ভেসে আসে "ট্যাং ট্যাং ধনুর টঙ্কার" নিয়ে।

রাত্রির অন্ধকারে "সূর্যমুখী" জরৎকারু অন্তরের বিষ-জ্বালা নিয়ে ছুটে ফিরে কৃষ্ণ-সন্ধানে। ব্যাসাশ্রম থেকে প্রেম-যোগিনী শৈলজা বহন করে আনে গীতার অমৃত-রস। সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বীরের রক্ত-স্রোতের চেয়ে সুভদ্রার মাতৃধর্মী অশ্রুধারা ঘন-উৎসারিত হতে থাকে; সেই সংগে যুগপৎ চলে ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল-এর মত আহতসেবা। বীর্য নয়, করুণা; রক্ত নয় অশ্রুই কুরুক্ষেত্রের প্রাণ-স্বভাব। সেই অশ্রুর প্রবাহ ঘন-পিনদ্ধ বিচিত্র অবয়বান্বিত হয়েছে কুরুক্ষেত্র-শেষে অভিমন্যুর মৃত্যুতে। সুলোচনা দেহত্যাগ করেছে, অভিমন্যুর সন্তান-সম্ভবা উত্তরা হয়েছে যৌবনে যোগিনী; —সুভদ্রার বিকেন্দ্রিত নিষ্কাম প্রেম এবারে হয়েছে বিশ্বময়। সেই আর্য-প্রেম-গঙ্গার সংগে এসে মিলিত হয়েছে অনার্যা শৈলজার নিষ্কাম-প্রেমের যমুনা-ধারা।

প্রভাসে সেই সঙ্গম-তীর্থ-বারি আর্য-অনার্যের বৃহত্তর জীবনলোকে ভারতব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে;—কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন হয়েছে নিঃশেষিত। অতএব, যদুবংশের ধ্বংস এবং জরৎকারুর হস্তে কৃষ্ণের দেহান্ত! কিন্তু, সেই চরম মুহূর্তেও বাসুকী-জরৎকারু কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করেছে। প্রভাসের শেষ হয়েছে, কৃষ্ণ-

প্রভাস

জীবনান্তে শ্রীক্ষেত্রের জাতি-সম্প্রদায়-বিভেদ-নির্মুক্ত মিলন-তীর্থ রচনার স্বপ্ন-কল্পনায়।

কুরুক্ষেত্র এই ত্রয়ীকাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ,—প্রভাস দুর্বলতম। আর, আগে বলেছি, কুরুক্ষেত্রের উৎকর্ষ তার উদাত্ত শৌর্য-গুণে নয়, বাঙালি জীবন-ধর্মী গার্হস্থ্য স্নেহ-প্রেমাকুলতার প্রাবল্যে। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী-কাব্যে, এদিক্ থেকে, উদীয়মান নাগরিক বাঙালি সমাজের এক নূতন ঐতিহ্য-চিত্র গড়ে উঠেছে। অকুণ্ঠ ভাগবত-বিশ্বাসের সংগে নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষাময় নিষ্কাম প্রেমের বিচিত্র রূপ-প্রকাশে তা অভিনব-সুন্দর। কেবল কাহিনী কল্পনার দিক্ থেকেই নয়, চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও নারী-কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবন-ধর্মের ভাব-প্রেরণাই এই কাব্য-ত্রয়ীকে নিয়ত রস-নিষেকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। জরৎকারুর প্রেমে কৃষ্ণ-দেহাসক্তির প্রত্যক্ষতা নিয়ে ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় আপত্তি করেছিলেন। নবীনচন্দ্র জরৎকারুকে সমর্থন করে অন্যান্য যুক্তির সংগে বলেছিলেন, জরৎ-কারুর এই স্বভাব পরিবর্তিত করলে সুভদ্রা-শৈলজার সংগে সে অভিন্ন হয়ে পড়ে।[১] বস্তুতঃ, নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে নারী-চরিত্রাবলী পরস্পর-বিভিন্ন জীবনের সজীব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এই বৈচিত্র্য-কল্পনা চেষ্টাকৃত নয়, বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্বের মূলোদ্ভূত। সুভদ্রা, সুলোচনা, শৈলজা এবং সেই সংগে সত্যভামা-রুক্মিণীও সাধারণভাবে কল্যাণী নারী, প্রেম-স্নেহ বাৎসল্য-অনুরাগের ত্যাগ-সাধনায় এঁরা মূর্তিমতী তাপসী। কিন্তু, এই নির্বিশেষতার সাধারণ ভূমিকাকে আশ্রয় করে প্রত্যেকটি চরিত্রই বিশেষিত হয়ে উঠেছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পৃথক্ বৈচিত্র্যে। প্রত্যেকেই এঁরা এক-একটি পূর্ণাঙ্গ 'Individual', জরৎকারুর অনন্য-সাপেক্ষ বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র আসলে নিজের অজ্ঞাতেই তার এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ত্রয়ী কাব্যের শিল্প-স্বভাব

নারী-ব্যক্তিত্বের সুসংজ্ঞক ব্যঞ্জনাযুক্ত সামাজিক-পারিবারিক জীবন-বোধের একটি কালোপযোগী আখ্যায়িকা চিত্র গেঁথে তুলেছেন নবীনচন্দ্র। এদিক্ থেকে বয়ঃসন্ধিযুগের একটি অখণ্ড প্রেরণাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। নবীনচন্দ্র এই কাব্য-প্রসঙ্গে রাজনীতি-সমাজনীতি-ধর্ম-নীতি-নির্ভর এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করেছিলেন। ত্রয়ী-কাব্যে তার পটভূমি রচিত হয়েছে বৃহত্তর ঐতিহাসিক ভারতে নয়, উনিশ শতকের রেনেসাঁস-তাড়িত বাঙালির আবেগাদর্শের মূলে। আর, সে

ও বাঙালির সামাজিক-পারিবারিক জীবন-মূল্য বোধ

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।

সাম্রাজ্য অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্য নয়, পারিবারিক জীবনাদর্শ-প্রেমিক বাঙালির নবাবিষ্কৃত সাম্রাজ্য,—কল্যাণী-নারীর প্রেম-ঋদ্ধ মানস-রাজ্য।

এ-কালের পাঠকেরাও নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যকে এই 'অকিঞ্চিৎকর' (?) মূল্যটুকু দিতে হয়ত কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু, তাঁদের বক্তব্য, মহাভারত কোথায় ?—ব্যাসাশ্রমের,—রৈবতক-প্রভাসের উদাত্ত ঐতিহ্যের সংগে এ বর্ণনা যে অনৌচিত্য-দোষে একান্ত আবিল হয়ে পড়ে! কিন্তু, অনৌচিত্য-দোষ আসলে নিহিত আছে আলংকারিক পূর্ব-সচেতনার প্রভাবে বিমুখ আধুনিক পাঠকের মর্মে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের উপরিকথিত মূল ভাব-প্রেরণার সংগে কাহিনী-সজ্জার অন্তর্বিরোধ কোথাও বড় একটা নেই। সন্দেহ নেই, এখানে ব্যাসাশ্রমে গীতা 'সুগীত' হয়ে থাকে; কিন্তু কোনো অনাসক্ত বৈরাগ্যের সুর তাতে নেই। রৈবতকের ব্যাসাশ্রম ও কুরুক্ষেত্রে বর্ণিত শৈলজার প্রেমাশ্রমে পার্থক্য কোথায়? ব্যাসাশ্রমের পথে চল্‌তে চল্‌তে যুবক-কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন,—সেখানে "কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি", —গাছে গাছে ফোটে ফুল,—চারিদিকে লতা-পল্লবের অজস্র সমারোহ। তারই মাঝে হঠাৎ কলকণ্ঠ ঋষি-বালক ছুটে এসে হাত তুলে বলে "মহারাজ, আচ্ছিব্বাদ করি।" তার পরে কৃষ্ণার্জুনকে ঘিরে ঋষি বালকদের চলে অভিনব বালখিল্য-লীলা,—কেউ ঘাড়ে ওঠে,—কেউ পীঠে-কোলে। তাঁরাও সানন্দে বণ্টন করেন অসংখ্য উপহার-পুত্তলি! মহাভারতীয় গীতা না হোক্‌,—ওপরে বর্ণিত নব-বাঙালি-জীবনের নবীন মহাগীতা ত একদা রচিত হয়েছিল এম্‌নি সামাজিক-পারিবারিক মূল্যবোধেরই নূতন পরিবেশে!

অতএব, নবীনচন্দ্রে 'মহাভারত' নেই দেখে নিরাশ হতে পারি; কিন্তু, তাঁর রচনাকে নির্জীবন বলে ধিক্‌কার দিতে পারি না। তাছাড়া সুলোচনার মধ্যে পরের ছেলের মা হওয়ার নিষ্কাম বাৎসল্যের আদর্শে শরৎচন্দ্রের নারী-কল্পনার স্বরূপ-ই আভাসিত হয়ে নেই কী? বিবাহিতা কারু স্বামি-স্পর্শমাত্র স্বীকার করে না,—কৃষ্ণ-প্রেমে সে সদা বিহ্বল। শৈলজা অনার্যা,—অর্জুনের প্রতি তার প্রণয়াসক্তি বৈবাহিক পরিণতি লাভ করতে পারে নি। অর্জুনের বিবাহিতা পত্নী সুভদ্রার প্রতি বাসুকী পোষণ করেছে অনির্বাণ প্রেম-জ্বালা। নারী-ব্যক্তিত্ব-প্রধান সমাজের নবীন মূল্যবোধের সমস্যার পরিচয় এখানেই পরোক্ষভাবে হলেও, স্পষ্ট-আভাসিত হয়েছে। মধুসূদনের কাব্যে এই সমস্যা-চিত্রাবলী আরো সংসক্ততর; নবীনচন্দ্রে তা শ্লথ-বিচ্ছিন্ন হলেও অরো বিচিত্র,—আরো রোমান্‌স্-পেলব।

নবীনচন্দ্রে বয়ঃসন্ধির জীবন-ব্যঞ্জনা

আগে বলেছি, মধুসূদনের ভবলোক-চারী জীবন-সমস্যা বঙ্কিমের

হাতে বস্তু-কঠিন মৃন্ময় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে। সেই পূর্ণাঙ্গ-তীব্র তির্যক দৃষ্টির সামনে বাংলা সাহিত্যের বয়ঃসন্ধির আবরণ নির্মোচিত হয়েছে; মুক্ত যৌবনের ঘটেছে প্রথম আবির্ভাব। কবি এবং কাব্যেরও বয়স বিচারে নবীনচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমের বয়ঃ-কনিষ্ঠ। বঙ্কিমের শিল্প-বুদ্ধির প্রভাব থেকে তিনি নির্মুক্ত ছিলেন না; তবু বয়ঃসন্ধির স্বপ্নাকুলতা ও অস্বচ্ছতাকেও অতিক্রম করতে পারে নি তাঁর মনোধর্ম। এই কারণেই বঙ্কিম-যুগের অধিবাসী হয়েও তিনি মধুসূদনের যুগের কবি।

ইতিহাসের সিদ্ধান্ত

নবীনচন্দ্র জীবনীমূলক তিনখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন,—(১) খৃষ্ট (১২৯৭ বাং), (২) অমিতাভ (১৩০২ বাংলা)—বুদ্ধলীলা, (৩) অমৃতাভ (১৩১৬) চৈতন্য লীলা! অমৃতাভ-ই নবীনচন্দ্রের শেষ কাব্য; এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। ভগবদ্‌গীতা (১৮৮৯) ও মার্কণ্ডেয় চন্ডীর (১৮৯৪) পদ্যানুবাদও নবীনচন্দ্র করেছিলেন। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে 'আমার জীবন' পাঁচখন্ড ছাড়া আছে ভানুমতী আখ্যায়িকা (১৯০০)। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি একটি নাটকও লিখেছিলেন নির্মাল্য নামে। সাহিত্যকর্ম হিসেবে এদের কোনো উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল কবি-জীবনী রূপে 'আমার জীবন' যেমন কৌতূহলাবহ, তেমনি কৌতুককর।

নবীনচন্দ্রের অপরাপর রচনা

নবীনচন্দ্রের পরম সুহৃৎ ছিলেন কবি হেমচন্দ্রের অনুজ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭)। ঈশানচন্দ্রের প্রকাশিত কাব্য চারখানির মধ্যে তিনখানিই 'গীতিকাব্য'—গীতি-কবিতার সংকলন। প্রথম কাব্য চিত্ত-মুকুর প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। 'বাসন্তীর' প্রকাশ কাল ১৮৮০ খৃীঃ, এবং 'চিন্তা'র ১৮৮৭ খৃীঃ। এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাবলী বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বান্ধব, এডুকেশন গেজেট, ভারতী, নবজীবন, প্রচার, সাধারণী ইত্যাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গীতি-কবিতা রচনায় ঈশানচন্দ্রের দক্ষতা সেকালের পক্ষে ছিল অনন্যপূর্ব। ঈশানচন্দ্রের ব্যক্তি-হৃদয়ে একটি অন্তর্গূঢ় যৌবন-জ্বালা সর্বদা দাহ সঞ্চার করে ফিরছিল; তাঁর অধিকাংশ খন্ড-কবিতাই কবি-হৃদয়ের এই অনন্যপর যন্ত্রণায় তপ্ত। এঁর প্রকাশিত একমাত্র পদ্য আখ্যায়িকা 'যোগেশ কাব্যে' (১৮৮১) সেই বিষজ্বালা অনেকটা অবয়ব পরিগ্রহ করেছে।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ঈশানচন্দ্রের জীবনকথা আমরা বিশেষ কিছুই জানি না; এইটুকুমাত্র জানা আছে যে, তিনি অনেকদিন

হুগলী কলেক্‌টরীতে এবং শেষ জীবনে হাইকোর্টে কর্ম করিয়াছিলেন!"১ কিন্তু, কবি সম্বন্ধে আরো একটি খবর জানা যায়; তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার পক্ষে সে খবর সর্বাধিক প্রয়োজনীয়ঃ—ঈশানচন্দ্র ৪২ বছর বয়সে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"যে কারণে তিনি মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে নিজ হাতে নিজের জীবনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের মূলে সেই কারণই ছিল; অধিকাংশ কবিতাই, বিশেষ করিয়া 'যোগেশকাব্য'খানি একটা অন্তর্গূঢ় জ্বালায় জর্জরিত। সক্ষম রচনা বলিয়াই সেগুলি পাঠকের মনেও জ্বালা ধরাইয়া দেয়।"২ ব্রজেন্দ্রনাথ এই মর্মজ্বালার স্বরূপ বিবৃত করেন নি;—সে ছিল অপরিতৃপ্ত,—ব্যর্থ-প্রেমের নিরন্তর দাহ।

জীবন ও কাব্য

'যোগেশ কাব্য'-এর নায়ক যে কবিরই মর্মপুরুষ কাব্যের উৎসর্গপত্রে তার আভাস আছেঃ—"যোগেশ কাল্পনিক উপন্যাস নহে;—যোগেশ অধিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার আজীবন সুহৃদ—আমার সংসারের সান্ত্বনা—আমার অন্তরের অন্তর—আমার কাব্যের সহায় ছিলেন।"

'যোগেশ কাব্য' 'উদাসিনীর' মত গাথাকাব্যের আকারে লেখা। কিন্তু কেবল সমাপ্তিতেই নয়, যোগেশ উদাসিনী থেকে আমূল-পৃথক্ ভাব-প্রেরণাযুক্ত। উদাসিনীতে ব্যথাহত প্রেম সার্থক-পরিণামী। বেদনার করুণাশ্রু আছে তাতে, সফলতায় আছে আনন্দ। কিন্তু সর্বত্রই আছে কবি-মানসের নিস্তাপ উদার প্রশান্তির ছায়া। 'যোগেশ' কাব্যে আদ্যন্ত যন্ত্রণা,—কেবল তাপদাহ! কাহিনীটি নিম্নরূপঃ—

নর্মদাকে বিবাহ করতে গিয়ে তার সখী মন্দাকিনীকে দেখে যোগেশ প্রণয়-বিহ্বল হয়। নর্মদা গৌরবর্ণা, মন্দাকিনী অপেক্ষা সুন্দরী। কিন্তু যোগেশ মন্দাকিনীর প্রতি একান্ত আকৃষ্ট। উদ্বেলিত চিত্তে সে একদিন মন্দাকিনীকে প্রণয়-পত্র প্রেরণ করে। মন্দাকিনী যোগেশকে অগ্রজের মতই শ্রদ্ধা করতঃ এই পত্র পেয়ে প্রবল বিরক্তি ও তিরস্কারের সংগে সে যোগেশের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করল। যেগেশ স্বভাবতঃ দুর্বল বা নীতিহীন ছিল না; —সে ছিলঃ—

"সততার চিত্রপট—নীতির দর্পণ।"—মহত্ত্ব, গাম্ভীর্য, করুণা, বিদ্যা ও

১। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য সাধকচরিত-মালা)।
২। ঐ।

সম্পদের সে ছিল এক পুণ্যমূর্তি। মন্দাকিনী তাকে রূপ-লালসাতুর মনে করেছে,—এই ধিক্কারে যোগেশ গৃহত্যাগ করে। মালাবার পর্বতে ভৈরব মন্দিরের কাছে সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে ছিল; এক ব্যাধ ও মন্দিরের ভৈরবীর চেষ্টায় সুস্থ হয়ে ওঠে। তখন একদিকে তার মনে পত্নী-পুত্র-ভ্রাতার আকর্ষণ, অন্যদিকে মন্দাকিনী-প্রেম তাকে নিরন্তর অধীর করে তোলে। অবশেষে ভৈরবীর প্রেরণায় তার মৃত্যুমুহূর্তে স্বামীর সংগে মন্দাকিনী এসে উপস্থিত হয়। মন্দাকিনীকে উদ্দেশ করে যোগেশ শেষ বারের মত বলে!

'যোগেশ কাব্য'-কাহিনী

"ঘৃণায় লজ্জায় নিজে মুহূর্তে মুহূর্তে
মরিয়াছি কতবার—প্রাণের ভিতর
ভীষণ নরককুণ্ড ছিলাম ধরিয়া;
আজ সে পিপাসা মম গেছে শুকাইয়া
কিন্তু উন্মাদের জ্ঞান মরণের আগে।"

যোগেশের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নর্মদারও দেহান্ত ঘটে; কারণ সে সতী; সতী কখনো বিধবা হয় না। মৃত্যুর পরে নর্মদার আত্মা স্বর্গলোক-বাসী হয়; কিন্তু যোগেশ তার পশ্চাৎ-অনুসরণ করতে গিয়ে হয় ব্যর্থ! দুঃসহ নরক-যন্ত্রণাই তার মত পাপীর ভাগ্য-লিপি।

ঈশানচন্দ্রের মর্মযন্ত্রণা তাঁর আবেগকে কখনো নবীনচন্দ্রের মত পল্লব-চারি উচ্ছলতায় উদ্বেল করতে পারে নি। তাঁর অনুভূতি যেমন ব্যক্তি-চিত্তের দাহ-তপ্ত, তেমনি ছিল সুগভীর। তাই, কি গীতিকবিতায়, কি 'যোগেশ-কাব্যে' সর্বত্র একটি পূর্ণ অবয়বান্বিত ভাব-স্বভাবের (emotion) তীব্র প্রতিফলন ঘটেছে। বলা বাহুল্য, সু-গঠিত ভাবানুভূতির সত্যতা ও প্রত্যক্ষতাই সার্থক Lyric কবিতার ধর্ম। ঈশানচন্দ্রের কোন কোন কবিতায় এই Lyric গুণ স্বচ্ছ-শুদ্ধরূপে আভাসিত হয়েছে ঃ—

"দেবি!
আবৃত শরীরে তুমি চক্ষুর কণিকা জালে
বিরাজ আমার।
স্পর্শ শক্তি রূপে তুমি এই শরীরের ত্বকে
সতত প্রচার॥
শব্দ শক্তি রূপে তুমি শ্রবণের মূলে
কর অবস্থান।
জ্ঞানরূপে চিত্তে মম ঢালিয়া অমৃত ধারা
তুমি বিদ্যমান॥

ঈশানের কবি-স্বভাব ও সার্থক Lyric কবিতা

দর্পণ বিহীনে যথা আপন আকৃতি কিবা
নহে অনুমান।
তোমা বিনা সেইরূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড মম
নহে বিদ্যমান॥
তুমি মম—আমি তব, যেই তুমি, সেই আমি,
নহি ভিন্নাকার।
তব অপার্থিব রূপে আমারো তদ্গত প্রাণে
করি নমস্কার॥
(স্তোত্র—চিন্তা)

ঈশানচন্দ্রের জীবন-সমস্যা এবং 'যোগেশ কাব্য' রেনেসাঁস-সমকালীন জটিল গ্রন্থি-বন্ধনে পীড়িত। ওপরের কবিতাতেও তেমনি দেহ-মনে নিবিড় প্রেমের একটি সমস্যাময় রূপ গীতি-ভাবনায় পরিস্রুত সফল হয়ে উঠেছে। আধুনিকতার জ্বালার সংগে কবির জীবন ও কাব্য একান্ত ব্যক্তি-নিবন্ধ গভীর অনুভূতিকে শুদ্ধ রূপান্বিত মুক্তি দিয়েছে,—দিয়েছে বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার জন্ম। এদিক থেকে বয়ঃসন্ধি-পীড়িত আধুনিকতার ইতিহাসে ঈশানচন্দ্র অবশ্য স্মরণীয়। যোগেশ-কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখাঃ হেম-চন্দ্রের কাব্যের মত তা একান্ত আড়ষ্টগতি নয়, নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষরের মত তা নয় লঘু-চপল। পূর্ণিমা নামক একটি মাসিক পত্র প্রচলন ও প্রবর্তনে ঈশানচন্দ্র ছিলেন পুরোধা।

এ-যুগের আরো একজন সমুল্লেখ্য কবি ছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)।১ সেকালের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁর লেখনীর দ্রুতগতি ও বহুচারিতা বিস্ময়কর। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ রচিত ৭০ খানি গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন।২ তার মধ্যে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, খোসগল্প থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই আছে। রাজকৃষ্ণ রচিত নাটক-প্রহসন-গীতি-নাট্যাদির সংখ্যাই বেশি। কিন্তু, কাব্য-কবিতা-গানের সংখ্যাও বাইশটির কম নয়। একাধিক কাব্য আবার বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত। ডঃ সুকুমার সেন এই সুদীর্ঘ-তালিকায় আরো একাধিক নাম যোগ করেছেন। তাতে মূল সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ, কাব্যপুরাণের পদ্যানুবাদ থেকে আখ্যায়িকা কাব্য, শিশু-কবিতা, স্তবমালা, দেব-সংগীত সবই আছে। রচনার প্রাচুর্য ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণের কবি-কৃতি সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মহাভারত-অনুবাদের যুগপৎ প্রামাণ্য ও জনপ্রিয় স্বভাবের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর শিশু-কবিতাবলী এককালে যথার্থই শিশু-চিত্তের মনোহরণ করেছিল।

রাজকৃষ্ণ রায়

১। জন্ম সাল সঠিক জানা যায় নি; দ্রষ্টব্য সাহিত্য সাধক চরিত-মালা—৫০

২। ঐ।

রাজকৃষ্ণের প্রথম কাব্য বঙ্গভূষণ-এ (১৮৭৪) 'বঙ্গ-দেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দশপদী কবিতানুসারে লিখিত হয়েছে। এতে তেষট্টিটি সনেট আছে; 'পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকার বাগীশ' থেকে 'বঙ্গ বিশারদ শ্যামচাঁদ গোস্বামী' পর্যন্ত বহু কৃতী বাঙালি-বাঙালিনী সনেট-এর বিষয় সরবরাহ করেছেন। রাজকৃষ্ণের কাব্য হিসেবে সর্বাপেক্ষা খ্যাত গ্রন্থ 'অবসর সরোজিনী'। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ কাব্য বিচিত্র প্রকার কবিতার সঙ্কলন।

কবিতাকার হিসেবে রাজকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল তাঁর বিষয়-সচেতনতা এবং পরিচ্ছন্ন আঙ্গিক-চিন্তায়। 'পদ্য লেখায় রাজকৃষ্ণের স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল।'১ তাই, যখনই যে বিষয়ে তিনি লেখনী ধারণ করেছেন, সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্তি জনিত স্বচ্ছন্দতা লক্ষিত হয়েছে। মহাভারতের মত বৃহৎ দুরূহ গ্রন্থের মূলানুগ অনুবাদ শ্রম ও অধ্যবসায় সাধ্য। রাজকৃষ্ণ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটির অবকাশ রাখেন নি। অথচ, তা সত্ত্বেও তাঁর পদ্য-কর্ম হয়েছে স্বচ্ছন্দ সাবলীল। প্রামাণ্যতার সংগে এই জন-প্রিয়তার সহজ সঞ্চয় রাজকৃষ্ণের সহজাত কবি-প্রতিভারই পরিচয় বহন করে। শিশু-কবিতার ভাব ও রূপাঙ্গিক রচনার সময়েও তেমনি তিনি অনায়াসে শিশু-ভাবনার নির্বাধ কল্পলোকে বিচরণ করেছেন।

কবি-স্বভাব

ভাবের চেয়ে অবশ্য রূপ-সিদ্ধির দিকে রাজকৃষ্ণের ঝোঁক ছিল বেশি। প্রথম সম্পূর্ণ কাব্যের কল্পনা তিনি করেছিলেন সনেট আকারে। সেকালের পক্ষে তাঁর এই নবীন রূপাঙ্গিক-প্রীতি প্রগতিশীল চিত্তবৃত্তির পরিচয় বহন করে থাকে। 'কবিবর মাইকেল মধুসূদন' সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ লিখেছেন ঃ—

"বঙ্গ কবি-কুল-ধন, হে মধুসূদন!
নব মধু বরষিলে এ বঙ্গ-সমাজে
প্রকাশি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সুরতন,
সাজায়ে তাহারে চারু নব নব সাজে।
ছিল না বঙ্গেতে যাহা, গুণেতে তোমার
এ বঙ্গ লভিয়া তাহা মাতিল হরষে;
দীন যথা করে পেলে গজমতি হার
সন্তরে বিভোর হয়ে আনন্দ-সরসে।
তব সুলেখনী মুখে বীর রসময়
'মেঘনাদ বধ কাব্য' হইল প্রসব;

রাজকৃষ্ণের রূপ-সিদ্ধি ও সনেট্

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড ২য় সং।

মৃগরাজ-বধূ বই কেশরী ভৈরব
শৃগালী হইতে কভু জনম কি লয় ?
তব গুণ-গুণে বঙ্গ আজীবন হেতু
আবন্ধ রহিল তুলি তব যশ-কেতু।"

নূতন ও পুরাতন ছন্দ নিয়ে রাজকৃষ্ণ আরো নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য "কাব্যাত্মক গদ্যকে" "পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক" প্রণালীতে সাজিয়ে লেখা। বাংলা ভাষায় গদ্য কবিতা রচনার প্রথম পরোক্ষ প্রয়াস এখানেই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আর্য দর্শন পত্রিকায় 'বর্ষার মেঘ' নামক কবিতা লিখে পাদটীকায় রাজকৃষ্ণ লিখেছিলেন :—"যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ।" কবিতাটির প্রারম্ভিক ছত্রগুলি নিম্নরূপ :—

'পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক কাব্যাত্মক গদ্য' :— গদ্য কবিতা (?)

"আকাশ নীল—অনন্ত নীল ;
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল।
দক্ষিণ দিক শোভিত দিগঙ্গনার অঞ্জলি হতে
ধীরে ধীরে বায়ু স্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।"

বলা বাহুল্য, ছন্দগুণান্বিত গদ্য, আর গদ্য কবিতার ছন্দ এক নয়। আবার, পদ্যগুণান্বিত গদ্যকে "পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক" করে সাজালেই তা গদ্য কবিতা হয় না। রবীন্দ্রনাথের "লিপিকার" বহুলাংশ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবু, পদ্য-ছন্দের গুণহীন গদ্যকে 'পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক' করে সাজালে "ভাষার একটি নূতন অঙ্গ" বিকশিত হতে পারে ; সেকালের পক্ষে এই আঙ্গিকচেতনা সত্যই বিস্ময়কর। এখানে কবির অসংজ্ঞান ভাবনায় গদ্য কবিতার পূর্ব সম্ভাবনা ছায়া-মুকুলিত হয়েছে কি না, এ-কথা ভেবে দেখবার মত।

মধুসূদনোত্তর বাংলা সাহিত্যে, ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"নাট্যকার-যশোলোভীর মতই কবি যশঃপ্রার্থীর ঘাট্‌তি ছিল না।" বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি এ-বিষয়ে সুদীর্ঘ কবি-তালিকা পেশ করেছেন। সাধারণতঃ, এই সব কবিতায় তিনটি পৃথক ধারা চলে আসছিল। এক, ঈশ্বর গুপ্তানুসারী প্রাচীন ধারা ; দুই, রঙ্গলালের মত ঐতিহাসিক কাব্য রচনার ধারা ; তিন,, মধুসূদন-বিমুখ সংস্কৃত কাব্য-কবিতানুসারীদের ধারা। মধুসূদনের ওজস্বী প্রতিভার অনুবর্তন প্রতিভাহীন ঐসব কবি-যশঃ-প্রার্থীদের পক্ষে সম্ভব

সমকালীন কাব্য-ধারা

ছিল না। আর, শিল্পকর্ম হিসেবেও এ-সব রচনা নিছক তথ্য-ভার বর্ধনের গৌরব ছাড়া আর কোন মূল্য দাবি করতে পারে না। কেবল দু-একজন লেখকের রচনা ক্বচিৎ কৌতূহল, কখনো বা কৌতুকের উদ্রেক করে। তাঁদেরই উল্লেখ করব নিচে।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯২২) এক কালে প্রবল কৌতুক ও কৌতূহলের উদ্রেক করেছিলেন। ভুবনমোহিনী দেবীর ছদ্ম নামে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখে তিনি প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। স্বয়ং ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ভুবনমোহিনী দেবীর "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" (প্রথম ভাগ ১৮৬৫, ২য় ভাগ ১৮৭৭) পড়ে এই মহিলা কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। পরে, স্বনামে, পুরুষরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে কবিকে বেগ পেতে হয়েছিল। নারীর ছদ্মনাম ব্যবহার করার কারণটিও কৌতুকপ্রদ। মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় স্বনামে কবিতা পঠালে তা ছাপা হয়নি; সম্পাদক জানিয়েছিলেন ঐ "কবিতা কবিতাই হয় নাই।" পরে আর একটি কবিতা ভুবনমোহিনী দেবীর "স্বাক্ষরে" পাঠালে "সম্পাদক মহাশয় আহ্লাদে অধীর হইয়া ভূয়সী প্রশংসা-বাদ সহকারে মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন।"[১] এই কৌতুক বহু-দূর গড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁর কোনো বন্ধু এই 'ভুবন-মোহিনী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ভুবনমোহিনীর ঠিকানায় "কাপড়টা, বইটা" ভক্তি উপহার পাঠাতেন।[২] নবীনচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভা সত্যই যে উল্লেখ্য ছিল না, ভুবনমোহিনী নাম-মোহের অন্তরাল থেকেও রবীন্দ্রনাথ তা আবিষ্কার করেছিলেন। এঁর আর দুটি প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'আর্য-সংগীত' ও 'সিন্ধু দূত'।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে ভুবনমোহিনী দেবী

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭) গীতি-কবিতা লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর কারণ, তাঁর দুটি কবিতা জাতীয়-সংগীতের মহৎ মর্যাদা নিয়ে এককালে বাঙালির মুখে মুখে ফিরেছিল। কবিতা দুটি "যমুনা লহরী" ও "ভারত বিলাপ"। 'ভারত বিলাপ'-এর একদা বহু-শ্রুত প্রারম্ভিক ছত্রগুলো নিম্নরূপ ঃ—

"কত কাল পরে! বল ভারত রে!
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।

১। 'অপ্রকাশিত আত্ম-জীবন—দ্রষ্টব্য সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৪৪।
২। দ্রষ্টব্য—জীবনস্মৃতি।

নিজ বাস ভূমে, পরবাসি হলে
গোবিন্দচন্দ্র রায় পর দাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহ বিনির্মিত হার বুকে
পর ভাষণ আসন, আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু, আপন রে।"

এঁর কবিতাবলী 'গীতি-কবিতা' নামক চারখণ্ডে সম্পূর্ণ সংগ্রহ-গ্রন্থে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আরো অপ্রকাশিত রচনাও রয়েছে!

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮) একদা পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় কবি ছিলেন। ইনি গীতি-কবিতা এবং উপন্যাস দুই-ই লিখেছিলেন। কাব্য গ্রন্থের মধ্যে আছে,—১। মানস বিকাশ (১৮৭৩); ২। কবি কাহিনী (১৮৭৬); ৩। মহাপ্রস্থান কাব্য (১২৯৪ সাল)। উপন্যাস দুইখানি,—১। কুলকলঙ্কিনী ও ২। নিরাশপ্রণয়। দীনেশচরণ 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'ঢাকা বার্তা' পত্রিকা কিছুকাল সম্পাদন করেছিলেন।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র প্রখ্যাত সমাজ-বিপ্লবী সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) কাঙাল ও ফিকিরচাঁদ ভণিতায় মনোহর বাউল গীতিও রচনা করেছিলেন। এককালে এঁর বাউল গানে গ্রাম-বাংলা আকুল হয়েছিল ঃ

"আমি করব এ রাখালী কতকাল।
পালের ছ'টা গরু ছুটে, কোরছে আমায় হাল-বেহাল।
আমি গাদা করে নাদা পুরে রে, কত যত্ন করে খেতে দিই ঘরে;
তারা ছটা যে গুখেগো গরু রে; তারা নরক খায়রে হামেহাল।
কাঙাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালি নাও হে আর পারিনে গরু চরাতে।
আমি আগে তোমার যা ছিলেম হে, আমায় তাই কর হে দীন দয়াল।"

হরিনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে চারু চরিত্র (১৮৬৩) এবং স্কুল-পাঠ্য পদ্য পুণ্ডরীক (১৮৬২) ও কাব্য কৌমুদী (১৮৬৬)। অক্রূর সংবাদ (১৮৭৩) ও সাবিত্রী নাটিকা (১৮৭৪) গীতাভিনয়-এর আগের লেখা। চিত্তচপলা (১৮৭৬) হরিনাথের লেখা উপন্যাস।

কাঙাল হরিনাথ

কাঙাল ফিকির চাঁদ ফকীরের গীতাবলী ষোল খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ থেকে ১৩০০ বাংলা সালের মধ্যে। হরিনাথের লেখা আরো কিছু গ্রন্থ-গ্রন্থিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৬) প্রধানতঃ স্কুলপাঠ্য নীতিগর্ভ কবিতা লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর সদ্ভাবশতক (১৮৬১) "পারস্য কবি" হাফেজের "প্রণীত গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা কলাপের মর্মমাত্র গ্রহণ"

করে রচিত। সুফী কবি 'সাদী'র ফারসী কবিতার অনুসরণও এতে কিছু পরিমাণে আছে। এই কাব্যের কিছু কিছু কবিতা হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'কবিতাকুসুমাবলী' নামক কাব্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি স্বয়ং কিছুকাল 'ঢাকাপ্রকাশ' সম্পাদনা করেছিলেন। 'মোহভাগ' (১৮৭১) নামক নীতি-কাব্য ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' (১৮৮২) তত্ত্বমূলক গদ্য গ্রন্থও কৃষ্ণচন্দ্রেরই লেখা। 'রা স-র ইতিবৃত্ত' নামে ইনি নিজের আত্মকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৮৩৮(?)—১৮৭২) বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তার মধ্যে কবিতা-কুসুমাবলী ও চিত্তরঞ্জিকা নামে দুটি ছিল কবিতাবহুল পত্র-পত্রিকা। ইনি নাটক, প্রহসন, গদ্য-পদ্য রচনা এবং কাব্য সবই লিখে গেছেন। কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তিন-খণ্ডে প্রকাশিত কবিতা কৌমুদী (১৮৬৩-৭০), বিধবা বঙ্গাঙ্গনা (১৮৬৩), বীর বাক্যাবলী (১৮৬৪), রামায়ণ আদিকাণ্ড (১৮৬৯), কবি রহস্য (১৮৭০), কবিতাবলী (১৮৭২) ইত্যাদি। তাছাড়া, নির্বাসিতা সীতা (১৮৭১) এবং কীচক বধ-এ (১৮৬৫) মধুসূদনের প্রভাব আছে।

হরিশচন্দ্র মিত্র

মধুসূদন-বিরোধিতার এক কৌতুকাবহ প্রতিরূপ সৃষ্টি করে জগদ্বন্ধু ভদ্র বাংলা কাব্যে এককালে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্য মেঘনাদ বধ কাব্যের প্যারডি। প্রারম্ভিক ছত্রগুলি নিম্নরূপঃ—

'ছুছুন্দরীবধ'-এর জগদ্বন্ধু ভদ্র

"দ্রুহিন-বাহন সাধু, অনুগ্রহিণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে,—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল বলে শকুন্ত-দুর্জয়—
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিলা?"

বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহের সংকলয়িতা হিসেবে জগদ্বন্ধু সমধিক খ্যাত। 'মহাজন-পদাবলী সংগ্রহ' এবং 'গৌরপদ তরঙ্গিণী'র সম্পাদনা ও প্রকাশ এঁর ঐতিহাসিক কীর্তি। 'ভারতের হীনাবস্থা' নামে একখানি মিত্রাক্ষর এবং 'তপতী উদ্ধার' নামে আর একখানি অমিত্রাক্ষর নাটক ইনি রচনা করে-ছিলেন। 'দেবলদবী' এঁর রচিত নাটক। ভক্ত বৈষ্ণব জগদ্বন্ধু নিজেও বৈষ্ণব পদ লিখেছিলেন।

এ যুগের অনুল্লেখ্য-তর কবিতা এবং তাদের রচয়িতাদের নামের তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। এতাবৎ আলোচনা থেকে এবারে বয়ঃসন্ধি লগ্নের

সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ঃ—১। মধুসূদন-হেম-নবীন-অক্ষয়চন্দ্র-ঈশানচন্দ্রের মত স্বাতন্ত্র্যযুক্ত কবিদের কথা ছেড়ে দিলে, এ-কালের দুর্বল রচয়িতাদের কাব্য-ভাবনা ছিল অনিশ্চয়তায় মন্থর ও বিচিত্রগামী। সুস্থ-চেতন বাঙালি মানসে মধুসূদনের কাব্য-ধর্ম কবির জীবৎকালেই সুচিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। কিন্তু যাঁরা দুর্বল,—যৌবনের দৃঢ়-ভিত্তি সীমায় পৌঁছেও যাঁরা কৈশোর-স্বপ্নে কুণ্ঠিত, উদ্বেল, তাঁরা ভারতচন্দ্র থেকে রঙ্গলালের ভাব-জগতে বিশৃঙ্খল স্বেচ্ছা-বিচরণ করে ফিরেছেন।

বয়ঃসন্ধির কাব্যধর্ম ও ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

২। যৌবনের প্রতিষ্ঠা—আত্মসচেতনা, আত্ম-নির্ভর ও আত্ম-সংসক্তিতে। আত্মানুভূতির এই নিভৃত বিশুদ্ধিই Lyric কবি-কর্মের উৎস। পরবর্তী আলোচনায় দেখব,—বঙ্কিম ও বঙ্কিমোত্তর যৌবন-বিকাশের যুগে এই আত্ম-সংসক্তি যে পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক ছিল, সেই পরিমাণে ছিল নিতান্ত ব্যাপ্তি-বিমুখ। বাংলা কবিতায় সদ্য-বিকশিত যৌবনের এই আত্ম-নিরোধ ও মন্ময়তার মধ্যে বিহারীলালের হাতে বিশুদ্ধ লিরিক কবিতা-ধর্মের জন্ম। আমাদের আলোচ্য যুগে বয়ঃসন্ধি-চিহ্নিত কাব্য-কবিতায় তীব্র-যৌবনের পদক্ষেপ-সম্ভাবনা আভাষিত হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মন্ময়, স্পর্শকাতর ভাবালু কবিতাবলীতে। পরিণত-তর লিরিক স্বভাবের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছি ঈশানচন্দ্রের বিষণ্ণ-গম্ভীর ভাব-গভীর গীতিকবিতায়।

৩। বয়ঃসন্ধি-যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বক্তব্য এই যে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন আজও অননুকরণীয় হয়ে আছেন। প্রথম থেকেই কবির ব্যক্তি-জীবনকে ধূমকেতু-জ্বালার সদৃশ বলে অনুভব করেছি। এই তাপ-দগ্ধ অগ্নিপিণ্ড থেকে চলমান জীবনের গতিপথটুকুকে চকিতের জন্য প্রত্যক্ষ করে নেওয়া চলে। কিন্তু, সে আগুন দিয়ে শান্ত জীবনের দীপ-শিখাটি জ্বালিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। মধুসূদনের কবি-ধর্মের দুটি দিক,—এক বিপ্লবী-চিত্তের যন্ত্রণাদাহ ঃ—সেই বেদনায় তিনি সাংসারিক সুখ এবং দুঃখে সর্বাধিক জ্বলে পুড়েছেন। তাঁর 'আত্মবিলাপ' কবিতা লেখা হয়েছিল আইন ব্যবসায়ে সচ্ছল-সার্থক উপার্জন-সূচনার দিনে। এই আগুন দিয়ে বিপর্যয় যুগের সকল পাপ, সকল গ্লানিকে তিনি দগ্ধ করেছিলেন। কিন্তু, আগে বলেছি, মধুসূদনের কবি-কর্মের শ্রেষ্ঠ দিক হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ বিশুদ্ধ স্বর্ণের উজ্জ্বলতার দিক্। মধুসূদনের রাবণ অনির্বাণ অগ্নিদাহ, তাঁর সীতা-সরমা-প্রমীলা স্বর্ণকান্ত-কল্যাণ-বিভাময়ী; মধুসূদনের তারা-কৈকেয়ী-শূর্পনখা যন্ত্রণা-ব্যথিত, কিন্তু তাঁর শকুন্তলা-জনা ভানুমতী-দুঃশলা ইত্যাদি বেদনাগ্নিপূত মঙ্গল-মহিমায় ঋদ্ধ। মধুসূদনের যে প্রতপ্ততা তাঁর নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; তাই দিয়ে উত্তরসূরীদের

জন্য শাশ্বত গভীর জীবন-পথ-রেখা রচনা করেছেন তিনি। সেই কল্যাণ-সুষমা-ঋদ্ধ পথে চলেছেন 'নিও ক্লাসিক' কবি হেমচন্দ্র। অক্ষয় চৌধুরী-সমুত্তর যুগে সে পথ-রেখা আরো মসৃণ-পেলব হয়েছে। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যে ক্ষণে ক্ষণে করুণা ছল ছল করে উঠেছে, কিন্তু সেই রোমাণ্টিক মাধুর্যের মধ্যেও সে ট্রাজিক যন্ত্রণা কোথায়? হেমচন্দ্র-ঈশানচন্দ্রের গীতি-কবিতায় বিষণ্ণ যন্ত্রণা-বোধ রয়েছে; কিন্তু প্রকাশ ও কল্পনার সে উদাত্ততা নেই। মধুসূদন-প্রেমিক বহু মনীষী আক্ষেপ করেছেন,—কবির জীবন যদি সুস্থির, মন্থর, সুপরিকল্পিত হত, তা হলে আরো কত দুর্লভ সমৃদ্ধির কল্পনাতীত মাধুরী তিনি আহরণ করতে পারতেন বঙ্গ কাব্য-সরস্বতীর জন্য। কিন্তু এ আক্ষেপ নিরর্থক। ইতিহাসের অগ্নি-শলাকা যাঁকে যুগপৎ রেনেসাঁসের দাহ এবং দাহনোত্তর পরিশুদ্ধতা রচনার অধিকার দিয়ে পাঠিয়েছিল, তাঁর পক্ষে শান্তি অর্থ মৃত্যু; মন্থরতা ও নিশ্চলতা সমতুল্য। মধুসূদন শান্ত-সুধীর হতে পারলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের রেনেসাঁস থাক্‌ত তখনো আকাশ-কুসুম হয়ে। মধুসূদনে আছে বয়ঃসন্ধির আত্মোৎক্ষেপ ও আত্মমুক্তি; মধুসূদনোত্তরেরা সেই মুক্তিপথ দিয়ে বিস্ময়-বিচরণ করেছেন, কখনো স্বপ্নাকুল চঞ্চলতায়; কখনো-বা ধীর বিষণ্ণ মন্থর গতিতে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বয়ঃসন্ধি যুগের নাটক

পূর্বের আলোচনায় বলেছি, নাটক যৌথ-শিল্প। জাতির জীবনের সমষ্টিগত জীবন-বাসনা যেখানে ঘন-নিবদ্ধ, সু-অবয়বান্বিত হয়ে উঠ্‌তে পেরেছে, সেখানেই উৎকৃষ্ট নাট্য-রচনার সম্ভাবনা সহজে স্ফূর্ত হয়। 'প্রস্তুতি যুগের বাংলা নাটক'-এর প্রসঙ্গে দেখেছি,—নারী-ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক একটি নূতন সামাজিক-পারিবারিক জীবন-মূল্যবোধ সে-যুগে গড়ে উঠ্‌ছিল। সেই মূল্যবোধের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মধ্যযুগীয় সমাজের নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির আবেগানুভূতি দৃঢ়-সংসক্ত সর্বজনীনতা লাভ করে। অন্যদিকে ছিল ইংরেজি নাট্য-রসিক নবীন মনের আঙ্গিক-সিদ্ধ নাটক রচনার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, প্রথমটির প্রেরণা তখনও যেমন অ-পূর্ণ ছিল, দ্বিতীয়টির প্রয়াস তেম্‌নি সবেমাত্র হয়েছিল অঙ্কুরিত। এই কারণেই সেকালের নাটকে বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা,

বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাশ্রিত বিষয়ে অতি উচ্ছ্বসিত কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। অবশ্য উচ্ছ্বাস থাকলেও ঐ সব নাট্য-কথায় বাস্তবতার অপলাপ ঘটে নি বড় একটা। বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই বরং অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আঙ্গিকের দিক্ থেকে ঐ সব রচনাকে নাটক না বলে সামাজিক নক্সা বা ব্যঙ্গচিত্র নামে অভিহিত করা ভাল।

পূর্বসূত্র

ফল কথা, সেযুগে বাঙালি মানসে একটি সহজ দ্বিধা সদা-অনুস্যূত হয়েছিল। তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি যাঁরা আঙ্গিক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁদের জীবনবোধ ছিল অ-গভীর। আবার 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র রামনারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক সহানুভূতি স্বচ্ছ হলেও তাঁর আঙ্গিক-চিন্তা পরিচ্ছন্ন ছিল না। ভাব-রূপে সেকালের নবজীবনার্তিকে অখণ্ড-রূপায়িত করে তোলার মত নাট্য-প্রতিভার অভাব ত ছিল-ই, সেই সংগে কালগত অপরিণতির কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। মধুসূদনের আবির্ভাব-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের সকল দিকেই তখনো যৌবন-সমাগমের প্রস্তুতি চল্‌ছিল। তখনো সমুত্তীর্ণ কৈশোরের দ্বিধা এবং অনাগত যৌবনের কৌতূহল 'রেনেসাঁসের মর্মযন্ত্রণার 'জারকরসে জারিত' হয়ে অখণ্ড-সম্পূর্ণ জীবনবোধের উদ্বোধন সম্ভব হয় নি। বাংলা কাব্যের মত নাটকের ক্ষেত্রেও নবজীবনবোধের সংগে নবীনতম আঙ্গিক-চেতনার পরিপূর্ণ মিলন-সূত্র রচনা করেছে রেনেসাঁস-বিদ্ধ কবি মধুসূদনের প্রাণধর্ম !

বস্তুতঃ, নাটকের সূত্র ধরেই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯) বাংলা ভাষায় মধুসূদনের লিখিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থেই বাংলা নাটক প্রথম সুস্পষ্ট জীবন-চিত্রান্বিত ও অবয়ব সুগঠিত হয়ে উঠেছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের সৃজন-উৎস, তথা বাংলার সাহিত্যজগতে মধুসূদনের প্রথম প্রবেশের কাহিনী কৌতূহলপ্রদ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইক্‌পাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্বোধন করা হয় রামনারায়ণের রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দিয়ে। বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় দর্শক-ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য মধুসূদনকে দিয়ে ঐ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করানো হয়। অনুবাদ মূল নাটকের চেয়েও বেশি প্রশংসা পেয়েছিল। রত্নাবলীর 'অভিনয়াভ্যাস' দেখ্‌তে গিয়ে মধুসূদন বাংলা নাটকের দীনতা সম্বন্ধে গৌরদাস বসাকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন,—সেই দীনতা নিরসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজের 'পরে। গৌরদাস সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন; তখনো বাংলাভাষায় মধুসূদনের অধিকার হাস্যকরতার সীমা অতিক্রম করে

নাটকের মধুসূদন

নি। কিন্তু, ঐ আলোচনার পরেই মধুসূদন সংস্কৃত-বাংলা নাটকের অধ্যয়নে তৎপর হন, এবং অল্পকালের মধ্যে শর্মিষ্ঠার প্রথমাংশের পাণ্ডুলিপি বন্ধুকে প্রেরণ করেন।

অনেকের ধারণা, বাংলা নাটকে মধুসূদন প্রথমাবধিই য়ুরোপীয় রীতির প্রয়োগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং কবিও গৌরদাসকে লিখিত একটি পত্রে সম্ভাব্য "foreign air"-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু, 'শর্মিষ্ঠা'র ভাব-বস্তুতে ত বটে-ই, এমন কি রূপাঙ্গকেও য়ুরোপীয় স্বভাবের তুলনায় সংস্কৃত নাট্য-স্বভাবকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। নাটকের প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত নাটকের আদর্শমত আরম্ভে প্রস্তাবনা এবং নাট্য সমাপ্তিতে উপসংহার-গীত যুক্ত হয়েছিল। প্রস্তাবনা কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ—

শর্মিষ্ঠার নাট্যস্বভাব

"মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারত ভূমি, কত নিদ্রা যাও তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল, হইল ভোর;
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগ মাগো, বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়॥"

উপসংহার গীতিটি হচ্ছে ঃ—

"শুন হে সভাজন!
আমি অভাজন,
দীনক্ষীণ জ্ঞানগুণে,
ভয় হয় দেখে শুনে,
পাছে কপাল বিগুণে,
হারাই পূর্ব মূলধন!

যদি অনুরাগ পাই,
আনন্দের সীমা নাই,
এ কাজেতে এক যাই
দিব দরশন !”

পরবর্তী সংস্করণে মধুসূদন সূচনা ও সমাপ্তির এই গান দুটি পরিহার করেছিলেন। কিন্তু, তাতেও নাটকের সংস্কৃতধর্মী কাব্যিক স্বভাব ব্যাহত হয়নি। নাট্যারম্ভে মধুসূদন প্রাচীন ভারতীয় নাটকের রস-ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করেছিলেন;—নাটকের মধ্যেও কবি-মানসের সেই শ্রদ্ধাবোধ একান্ত হয়ে আছে। ‘শর্মিষ্ঠা’র মূল কাহিনী সংস্কৃত মহাভারত থেকে নেওয়া। মধুসূদন তার ’পরে কালিদাসোচিত রোমাণ্টিক স্পর্শকাতরতার সঞ্চার করেছিলেন। মহাভারত শূরযুগের আদিমতা-ধর্মী কাব্য;—বীররসের চেয়ে শৃংগার-ভোগের মাত্রা তাতে কম নয়। মহাভারতের শৃংগার-রসোৎক্ষিপ্ত কামাতুর শকুন্তলা-কাহিনীকে কালিদাস কল্যাণ-সৌন্দর্যে ঋদ্ধ প্রণয়-কাব্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। মধুসূদনও মহাভারতীয় কামবিহ্বল দেবযানী-শর্মিষ্ঠা-যযাতির গল্পে ভারতীয় কল্যাণ-সৌন্দর্যের রূপমাধুরী সংযোজিত করেছেন। সেই সংগে যোগ করেছেন নব-জাগ্রত বাঙালি জীবন-ধর্মের নারী-কেন্দ্রিক সামাজিক-পারিবারিক মূল্যবোধের অরুণ-রক্তিমা।

মহাভারতে দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা দুজনেই প্রগল্‌ভা, দুজনেই যযাতির শৌর্য-লোলুপ। যযাতির কাছে তারা দুজনই আগে প্রণয় নিবেদন করেছিল। যযাতিও সেখানে নারী-দেহ-বুভুক্ষু,—কামাতুর। মধুসূদন তাঁর রচনায় উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বরাগ-পরিকল্পনা করেছেন;—আর, উভয়ত্রই যযাতিকে করেছেন দেবযানী-শর্মিষ্ঠা দুজনেরই প্রণয়-ভিক্ষু। এই প্রসংগে পণ্ডিতেরা মধুসূদনের নাটকে প্রতীচ্যধর্মী প্রণয়কলা এবং পূর্বরাগ-চিত্রের প্রভাব কল্পনা করেছেন। কিন্তু, সংস্কৃত নাটকাদিতেও নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ দুর্লভ ছিল না। কাহিনী দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কামাতুরতাচ্ছন্ন মুহূর্তের মহাভারতীয় গল্পকে স্বয়ং কালিদাস শকুন্তলাকাব্যে প্রসন্ন-ব্যাপক রোমাণ্টিক প্রচ্ছদে গেঁথে তুলেছিলেন; প্রারম্ভিক পূর্বরাগ বর্ণন ছিল তার মধুময় মাধ্যম। ডঃ সুকুমার সেন শর্মিষ্ঠার মধ্যে ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকের বহুল প্রভাব প্রদর্শন করেছেন। মধুসূদনের যযাতিতে কালি-দাসের দুষ্যন্তের, বিদূষকে মাধব্যের ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে নিঃসংশয়ে। বাচনভঙ্গিতেও রয়েছে কালিদাসীয় বাগ্‌-ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব; কোথাও বা কালিদাসের সংস্কৃতের হুবহু ভাবানুবাদ-ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।—তৃতীয় অংক তৃতীয় গর্ভাংকে ‘রাজান্তঃপুর-সংক্রান্ত উদ্যান-এ প্রবেশ করে

যযাতি বলেছেন,—"একি? আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হতে লাগ্‌লো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে।" এটি শর্মিষ্ঠা-সম্মেলনের পূর্ব মুহূর্ত। এই প্রসঙ্গে এখানে কালিদাস-কাব্যের বিখ্যাত অংশের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়। কন্বাশ্রমে প্রবেশ করে শকুন্তলা-সাক্ষাতের আগে দুষ্যন্ত, বলেছিলেন,—শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য। অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"। কালিদাস, ভবভূতি, এবং ক্বচিৎ অন্যান্য সংস্কৃত কবিরও প্রতিধ্বনি শোনা যায় মধুসূদনের সংলাপ রচনায়। শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর প্রথম প্রণয়ের ব্রীড়াকুণ্ঠিত রক্তিমা কালিদাস-কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু, শর্মিষ্ঠার চরিত্রায়ণে মধুসূদন স্বয়ং-স্বতন্ত্র। ডঃ সুকুমার সেন শকুন্তলা-শর্মিষ্ঠার সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তথ্যগত নিঃসংশয় প্রমাণকে অস্বীকার করবার উপায় নেই,—প্রয়োজনও নেই। কিন্তু, শর্মিষ্ঠার ভাব-স্বভাব সেই সাদৃশ্য-সীমাকেও বহুদূর অতিক্রম করেছে। মহাভারতে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে শর্মিষ্ঠাই প্রখর-স্বভাবা, ঈর্ষাতুরা রুক্ষভাষিণী। কিন্তু, অপার সৌন্দর্য-সভাবনাময়ী রাজকন্যা যেখানে সমাজ ও স্বজাতির প্রয়োজনে আজীবন দাসীত্ব-গ্লানি বহন করতে বাধ্য হয়েছে, মধুসূদনের করুণাঘন শিল্পি-স্বভাব সেখানে তারই কণ্ঠে কাব্য-কলা-লক্ষ্মীর জয়মাল্য নির্বিচারে অর্পণ করেছে। এখানে তিনি নির্যাতিত নারী-ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহী পূজারী, উনিশ শতকীয় নববাঙালি জীবন-ধর্মের সার্থক বাণীকার। শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠা করে তুলতে গিয়ে মধুসূদন তাকে উনিশ শতকীয় বাঙালি কল্পনার কল্যাণীত্বের আধার করে তুলেছেন। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার প্রণয়িনী শর্মিষ্ঠার পরিচয় উদ্ধার করে বলেছেন,—"শর্মিষ্ঠা তখন দাসী, এবং সহিষ্ণুতায় ও ধৈর্যে শর্মিষ্ঠা তখন তপস্বিনী।" প্রণয়িণীর এই তপস্বিনী মূর্তি ভারতীয় স্বপ্ন-কল্পনার,—উনিশ শতকীয় নারী-কেন্দ্রিক পরিবার-জীবনের প্রেমিক বাঙালির ধ্যানের কল্পমূর্তি। দেবযানী, শুক্রাচার্য, নিজের পিতা,—কারো প্রতি তার বিদ্বেষ নেই। নিজের কর্মফল জেনেই তিনি দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; তাতেও কোন ক্ষোভ নেই। এই শর্মিষ্ঠা যেন সীতার পূর্বচ্ছায়া। নারী চরিত্র রচনাতেই মধুসূদন দক্ষ। দেবযানীকেও তিনি ঘৃণ্য করে তোলেননি, বরং বঞ্চিতা নারীর মর্মদাহে সে আমাদের অনুকম্পাভাজন হয়ে উঠেছে। যদিও যযাতির স্বভাবের কামাতুরতা নিন্দনীয়তার সীমা ক্বচিৎ করতে পেরেছে অতিক্রম।

'শর্মিষ্ঠায়' রেনেসাঁসের ধর্ম

এই প্রসঙ্গে 'কুলীন কুল সর্বস্ব'র কথা স্মরণ করি। সমকালীন

সমাজ-জীবনের যন্ত্রণা-চিত্রকে রামনারায়ণ ব্যঙ্গাত্মক নক্সাবন্ধ করেছেন। আর, এই বিপর্যয়-বিনষ্টির মূলীভূত মর্মবিদ্ধতাকেই রোমাণ্টিক কল্যাণ-সৌন্দর্যে ঋদ্ধ অখণ্ডতা দিয়েছেন মধুসূদন! এমন কথা বলা অসংগত নয়।

শর্মিষ্ঠা নাট্য-কাহিনীর উপস্থাপনায় সংস্কৃত নাটকের মত অতি-বিস্তার ও গতি-শিথিলতা রয়েছে। কিন্তু, মন্থর চরণে হলেও নাট্য-বক্তব্য দ্বিধাহীন সুনিশ্চিত পদক্ষেপে মূল পরিণামের পথে অগ্রসর হয়েছে। সেকালের নাটকের পক্ষে এই সামগ্রিকতা মধুসূদনের প্রথম দান। সংলাপের মধ্যেও সংস্কৃত নাটকের অলংকার-ঝঙ্কৃত শ্লোক-ধর্মিতার প্রভাব রয়েছে। গদ্যে কবিত্বের অতি দীর্ঘতা ও অতি-আলংকারিতা মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক এবং ভার বহুল মনে হয়ঃ—

"শর্মিষ্ঠা।—মহাশয় আমার পিতা মাতা আমার মানস মন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে, আমিও আমার জনক-জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।"

এ ধরণের সংলাপ কেবল সংস্কৃত কাব্য-প্রভাবেরই ফল নয়ঃ—মধুসূদনের কবি-ধর্মের প্রেরণা এবং প্রণোদনাও রয়েছে এর পেছনে। 'কৃষ্ণকুমারী' পর্যন্ত এ ধরণের বাগ্‌বিন্যাস দুর্লভ নয়। হয়ত এই জন্যই মধুসূদন নাট্য-সংলাপের ভাষা হিসেবে অমিত্রাক্ষরের অপরিহার্যতা অত তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। মাত্র আট ছত্রের মিত্রাক্ষর ছাড়া শর্মিষ্ঠার সংলাপে সর্বত্র গদ্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রহসন রচনায় মধুসূদন

শর্মিষ্ঠার স্বপ্নাকুল জীবন-সৌন্দর্যের রোমান্স-গভীর চিত্রায়ণে যে কবি উচ্ছ্বসিত, অমিত-বাক্, জাতীয় দুর্বলতার বাস্তব চিত্রাঙ্কণে ও ব্যঙ্গাত্মক আঘাত রচনায় তিনিই কত তীব্র, যথাযথ এবং যথোচিত,—ভেবে বিস্মিত হতে হয়। 'শর্মিষ্ঠা' এবং মধুসূদনের লেখা প্রহসনদ্বয় 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' প্রায় একই সময়ে রচিত হয়েছিল। এদের প্রকাশ-কালের পার্থক্যও দূর-পরাহত নয়। তবু, প্রথমটিতে যত আবেগ, পরের দুটিতে তত বিদ্রূপ ও জ্বালা; প্রথমটির প্রকাশে যত কাব্য ও উচ্ছ্বাস, শেষের দুটির সংলাপে তত তীব্রতা, ততই ঔচিত্য বোধ। 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র প্রারম্ভিক সংলাপ নিম্নরূপঃ—

"কালী। বল কি?

নব। আর ভাই বল্‌বো কি? কর্তা এতদিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ি থেকে বেরনো ভার।

একেই কি বলে সভ্যতা

কালী। কি সর্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি?

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখছি এবলিস্ কত্তো হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি? যখন আমাদের সাবস্ক্রিপসন্ লিষ্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্ করেছিলেম, এখন—"

কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির সাবলীলতা এখানে প্রত্যাশার অতীত। Standard colloquial-এর কাঠামোয় মধুসূদন এখানে গদ্য সংলাপের একটি আদর্শ রূপ গড়ে তুলেছেন। কেবল, অসমাপিকা ক্রিয়া রূপে "কত্তো" ইত্যাদি উত্তর-বঙ্গীয় উচ্চারণ-ভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করবার মত। তারও চেয়ে বেশি লক্ষণীয় সংলাপের চরিত্রোচিত ভঙ্গিটুকু। ওপরের চরিত্র দুটি সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের প্রতিভূ; তাদের 'ইঙ্গবঙ্গ' কথার ঢং এ-কালের পক্ষেও কত বাস্তব, কত কৌতুককর!

ভূমিকা-লিপি-সমুচিত বাগভঙ্গির আরো দুটি কৌতুককর, অথচ বিচিত্রতর পরিচয় পাই 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—তে। কপট ধর্মাচারী নারী-মাংস-লোলুপ বৃদ্ধ জমিদার, তার সহায়ক গ্রাম্য কুট্টনী পুঁটি এবং মুসলমান প্রজার সহজে-পতিভাবিনী পত্নী ফাতিমার সংলাপ-অংশ উদ্ধার করিঃ—

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

"ভক্ত। আহা! এমন খোস-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো! —আঃ!

* * *

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, এক্‌শো বার ঐ এক কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে "তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।"—তোদের জাত আছে, না ধর্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্।

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেছি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে মুই যাই ভাই।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই বাগভঙ্গি, চরিত্রোচিত সংলাপ এবং বাস্তব পরিবেশ-সচেতনতা যে-কোনো কালের নাট্যাদর্শ হতে পারে সগৌরবে।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সকলকালের সকল রসিক-পণ্ডিত মধুসূদনের প্রহসন দুটিকে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল উৎকৃষ্ট কলাঙ্গিকের সম্পন্নতার ফল নয়, এই দুটি প্রহসনের রুচির শুচিতা ও জীবনাদর্শবোধের অতন্দ্রতাও ছিল বাংলা প্রহসনের পক্ষে অনন্যপূর্ব। নব্যবঙ্গ সমাজ, এবং প্রাচীন বক-ধার্মিক বৃদ্ধ সমাজের নৈতিক অনাচারকে মধুসূদন রূঢ় আঘাত করেছেন। কিন্তু, কি চরিত্র চিত্রণে, কি কাহিনীর উপস্থাপনায় কোথাও তাঁর রচনা আচারভ্রষ্ট বা শীলতাহীন হয় নি। মধুসূদনের কবি-কর্ম প্রসঙ্গে তাঁর Puritan-সমুচিত শুচিতা-বুদ্ধির কথা বলেছি। বর্তমান ক্ষেত্রেও তিনি নীতি-নম্র জীবনাদর্শ-বোধের স্পর্শ সঞ্চার করে বাংলা প্রহসনকে ভাঁড়ামির কদর্য বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছেন। এদিক থেকে মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের সম্ভ্রম ও শুচিতা-বুদ্ধির অনন্যতা দীনবন্ধুর রচনার-সংগে তুলনায় ব্যক্ত হতে পারে। প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু মধুসূদনের উত্তরসূরী হয়েও তাঁর প্রসন্ন পরিচ্ছন্ন নীতি ও রুচিবোধের অধিকারী হতে পারেন নি।

মধুসূদনের সুমিত শিল্পায়ন

মধুসূদনের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক পদ্মাবতী (১৮৬০) শর্মিষ্ঠার ঠিক পরে পরেই রচিত হয়েছিল। গ্রীক পুরাণের 'Apple of discord'-এর গল্পকে ভারতীয় পটভূমিতে সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত করা হয়েছে। সৌন্দর্য নিয়ে শচী, রতি ও কুবেরপত্নী মুরজার দ্বন্দ্বে রাজা ইন্দ্রনীল রতির পক্ষে রায় দেন। ফলে, রতির কৃপায় তিনি সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা পদ্মাবতীকে লাভ করেন। কিন্তু, শচীর আক্রোশে তাঁর অজস্র ক্লেশ ও পদ্মাবতী-বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়। কিন্তু পরিণামে ইন্দ্রনীলের জীবন-কথা শুভ-শেষ হয়েছে। শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, —বিদেশ থেকে তিনি "can borrow a necktie or even a waist-coat, but not the whole suit," পদ্মাবতী প্রসঙ্গে উক্তিটি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে; পদ্মাবতী পড়ে মূল গল্পের বিদেশীয়তার কথা কল্পনা করবারও উপায় নেই। নাট্যাঙ্গিকে সংস্কৃত আদর্শের ছায়া আছে, সংলাপেও তাই। সর্বোপরি পদ্মাবতী একটি পতিপ্রাণা রোমাণ্টিক নারীর ভাব-মূর্তি হয়ে আছে। এই নাটকে চরিত্র-চিত্রণ বা ঘটনাসংঘাত শর্মিষ্ঠার মত বলিষ্ঠ নয়; সবই যেন কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করেছে। এই নাটকেই যে মধুসূদন

পদ্মাবতী

প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন, সে কথা বলেছি। শর্মিষ্ঠার গানগুলির মধ্যে সর্বশেষ শঙ্কর-স্তোত্রটি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের লেখা। পদ্মাবতীর আটটি গানই মধুসূদন নিজে লিখেছেন; এবারকার গানগুলো উৎকৃষ্টতর।

কৃষ্ণকুমারী

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে খ্যাত কৃষ্ণকুমারীকে (১৮৬১) বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ট্রাজেডি বলা হয়। এই নাটকে কবি প্রতীচ্য কলাঙ্গিকের প্রথম সচেতন ব্যবহার করেছিলেন। পদ্মাবতী রচনার পরেই তিনি নাট্যকলায় সাহিত্য দর্পণের নির্দেশ (dicta) আর মেনে না চলার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাহিনী টডের 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, স্বয়ং নাট্যকার এক চিঠিতে এ-কথা জানিয়েছেন,—

"For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A. M. last Saturday, the muses smiled ![১]

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন "ইতিহাস অবলম্বনে বাঙালায় নাটক লেখা এই প্রথম"।[২]

কাহিনী

উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় জয়পুর-রাজ জয়সিংহ এবং মরুদেশাধিপতি মানসিংহ দুজনেই উদয়পুর আক্রমণে বদ্ধপরিকর হন। অবশ্য এই বিরোধের মূলে ছিল জয়পুর-রাজের প্রণয়িনী রক্ষিতা বিলাসবতীর প্রভাব। ঈর্ষিত ধনদাস বিলাসবতীর প্রতিপত্তিনাশের আকাঙ্ক্ষায় জয়সিংহ-কৃষ্ণকুমারীর পরিণয় সাধনে তৎপর হয়। বিলাসবতী 'সতী-স্ত্রী' না হলেও জয়সিংহ-প্রেম-সর্বস্বা। তার দুঃসহ আর্তি লক্ষ্য করে বিলাসবতীর সখী মদনিকা উদয়পুরে উপস্থিত হয়ে কৌশলে কৃষ্ণকুমারী ও মানসিংহের প্রণয়াসক্তির সূচনা করে। উদয়পুর তখন মারাঠা দস্যুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সর্বরিক্ত। পুনরায় যুদ্ধের ঝুঁকি নেবার সাধ্য নেই। অথচ, মানসিংহের সংগে মারাঠা দস্যু আবার এসে জুটেছে। এমন অবস্থায় রাজ্য রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে মন্ত্রী কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু বিধানের প্রস্তাব করলেন। স্নেহাতুর রাজ-ভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের প্রতি এই রাজকীয় কর্তব্য সাধনের নির্দেশ দেওয়া হল। চরম মুহূর্তে বলেন্দ্র-সিংহের হৃদয় এবং হস্ত কম্পিত হল। কিন্তু, কৃষ্ণকুমারী দেশের জন্য নিজেই নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করে গেল।

মূল রাজপুত কাহিনীতে রাষ্ট্র-সংঘাতের যে সম্ভাবনা ছিল, কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাকে ছাপিয়ে উঠেছে গার্হস্থ্য জীবন-বেদনা। কেবল

১। দ্রষ্টব্য—মধুস্মৃতি।
২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।

উদয়পুর রাজ্যে রাজকুমারী কৃষ্ণা, তার জননী এবং তপস্বিনীই নয়, জয়পুরে রাজ-বিলাসিনী বিলাসবতীর মধ্যেও একাগ্র প্রণয়ের নিষ্ঠাপূত আর্তি রোমান্স-সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিলাসবতীর অভিসন্ধি-পরায়ণা অনুচরী মদনিকার মধ্যেও নারী-স্নেহের একটি কল্যাণ-স্নিগ্ধ রূপ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে লাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বী ধনদাসের প্রতি সকরুণ ব্যবহারে। বিলাসিনী নারীর মধ্যে পুরাঙ্গনা-দুর্লভ নিষ্ঠা ও তন্মাত্র প্রেমের রূপায়নে মধুসূদন আলোচ্য রেনেসাঁস যুগের সমাজ-বিপ্লবাদর্শকে বাস্তব অভিব্যক্তি দিয়েছেন। মুহূর্তের পদস্খলনের মধ্যেই নারীত্বের প্রাণ-মূল্যকে নির্জিত করে রাখার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিলাসবতী যেন একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবাদ।

নাটকীয় ধর্ম

একদিকে ধনদাস-মদনিকার পরস্পর-বিরোধী ষড়যন্ত্র, অন্য দিকে ত্রিমুখী রাষ্ট্রদ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে নাটকীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীতে প্রতীচ্যধর্মী Action দৃঢ়-পিনদ্ধ করে তুলেছেন। আঙ্গিকের দিক্ থেকে প্রতীচ্য পদ্ধতি সিদ্ধ-রূপ পেয়েছে। কিন্তু, কৃষ্ণকুমারীর জীবনের রোমান্স-করুণ জীবন-বেদনার অতিপ্রকাশে,—তার মনোধর্ম উদ্ঘাটনের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহে, নাট্য-ঘটনার ঘন-সংসক্তি অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। ফলে, 'ট্রাজেডি'র সম্ভাবনাও ঘন-বদ্ধ হতে পারে নি। কাহিনীর রোমাণ্টিক অতিব্যাপ্তি, ঘটনা-সংঘাতের শ্লথবন্ধতা কৃষ্ণকুমারীর জীবন-পরিণতিকে ট্রাজেডির চেয়ে করুণরসের গুণান্বিত করেছে বেশি। অলংকার-ঋদ্ধ গদ্য সংলাপ স্বাভাবিক-তর হলেও উচ্ছ্বাস-মুক্ত হতে পারে নি। আর, আবেগপূর্ণ স্বগতোক্তিসমূহ অতি-দৈর্ঘ্যে ও কাব্যাতিশয্যে মাঝে মাঝে হয়েছে অতি-নাটকীয়।

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, য়ুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের নিরপেক্ষ বিচারে এ-যুগের প্রায় প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বাংলা নাটকই অতিনাটকীয়তা-দুষ্ট হয়েছে, —হয়েছে 'Melo dramatic'। কিন্তু, পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, এটি বাঙালির নাট্য-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রণোদিত। য়ুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের যান্ত্রিক অনুকরণ পরিহার করে বাঙালি জীবনের যৌথ স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করলে দেখি, এই তথাকথিত বিচ্যুতি বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র স্বাদুতায় ভরে আছে। এই কারণেই, বাঙালি নাট্য-রসিকের দৃষ্টিতে কৃষ্ণকুমারী বাংলা-সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি, শ্রেষ্ঠ বাঙালি নাট্যকারদের সার্থক পূর্বসূরী,—পরমাদর্শ।

বাঙালির নাট্যস্বভাব

কৃষ্ণকুমারী নাটকে রাজপুত দেশ-প্রেমকথা প্রাসঙ্গিকতার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাটক মায়াকানন। পূর্ণাঙ্গ হলেও নাটকটি

অ-সংস্কৃত অবস্থায় পড়েছিল তাঁর মৃত্যুসময়ে। রিজিয়া নামে একখানি ইস্‌লামি বিষয়াত্মক নাটকও লিখ্‌তে সুরু করে তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

প্রত্যক্ষ স্বজন-প্রেম, ও বিদেশী শাসকের প্রজা-পীড়নের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ নিয়ে নাট্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৮-১২৮০) সাল। তাঁর প্রথম নাটক "নীলদর্পণম্‌ নাটকম্‌"—প্রথমে বেনামিতে ছাপা হয়েছিল,—"নীলকর-বিষধর-দংশনকাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনাচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্‌।" লেখকের এই আত্মগুপ্তির কারণও স্পষ্টঃ—

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ

"নীল চাষ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এর পর কুড়ি বছরের মধ্যেই নীল চাষীদের দুঃখ চরমে ওঠে।......নীল চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার 'সার্ফ' ও আমেরিকার নিগ্রো দাসদের সামিল হয়ে পড়েছিল। নীল-কর কর্তৃক টাকা দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীকে প্ররোচনা, আশানুরূপ ফসল না হলে পর বছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্য দশ বছরের চুক্তি, পুরুষানুক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী তালুক-দারী ক্রয়, প্রজাবৃন্দের দ্বারা বেগার খাটান, চুক্তি-ভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা, প্রভৃতি যত রকম অত্যাচার উৎপীড়ন হতে পারে, নীলকররা নির্বিঘ্নে নীল চাষীদের উপর তা সবই করতে লাগ্‌ল।"১ অত্যাচারের সীমা এ-পর্যন্তই আবদ্ধ ছিল না। নারীনির্যাতন, পারিবারিক সম্ভ্রমহানি, নরঘাতন ইত্যাদি পৈশাচিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশব্যাপী নীল চাষীদের ব্যাপক ধর্মঘট হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বসে নীল কমিশন। রাজ্যব্যাপী এই বিপ্লব-আন্দোলনের সময়ে রাজকর্মচারীর পক্ষে এ-রূপ বিপ্লবাত্মক গ্রন্থ-রচনা নিরাপদ ছিল না। তাই, গ্রন্থকার হিসেবে দীনবন্ধু আত্মগোপন করেছিলেন। নীলদর্পণ বঙ্গব্যাপী আন্দোলনের আগুনকে প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। ইংরেজি ভাষায় মধুসূদন এর অনুবাদ করেছিলেন বেনামে। ফলে, ইংলণ্ডেও বিক্ষোভ প্রজ্বলিত হয়। ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক হিসেবে নাম প্রকাশ করে লং-সাহেব রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

নীলদর্পণের ঐতিহাসিক পটভূমি

যাই হোক্‌, দীনবন্ধুর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য কিন্তু রাজদ্রোহ ছিল না। ভূমিকায় তিনি বলেছেন,—"এক্ষণে তাঁহারা ["নীলকর-নিকর"] নিজ নিজ

১। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল।

মুখ দর্শন পূর্বক তাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজা-ব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখরক্ষা হয়।" ফলতঃ "বিলাতের মুখরক্ষার" আগ্রহ-ও শিল্পীর কম ছিল না। বিলাত-রাজ্ঞী এবং এদেশে শাসনকর্মে নিযুক্ত তাঁর অনুচরদের প্রতি লেখকের বিশ্বাস ছিল অগাধঃ—"দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন।" তাঁর নূতন রাজ-কর্মচারীরাও সব ন্যায়পরায়ণ। "অতএব,"—নাট্যকারের ভরসা,—"ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর-দুষ্ট রাহুগ্রস্ত প্রজাগণের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ (রাজ প্রতিনিধি) অচিরাৎ সদ্বিচার রূপ সুদর্শন চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন।"

নাট্য-উদ্দেশ্যের ভাব-ফল

ফলকথা, দেশীয় অসহায় প্রজাপুঞ্জের দুঃসহ লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ চিত্র উদ্ধার করে "প্রজা জননীর" করুণা উদ্রেক্ করাই দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি সফলকামও হয়েছিলেন। আর, এই সফলতাই নীলদর্পণের নাট্য-সম্ভাবনাকে চূড়ান্ত পর্যুদস্ত করেছে। বস্তুতঃ, করুণ থেকে করুণতম,—বীভৎস থেকে বীভৎসতম চিত্রের উদ্ধারে নীলদর্পণ নাটক লোম-হর্ষণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল;—নীলকরদের পাশবিক উৎপীড়নের হয়ে উঠেছিল যথার্থ 'দর্পণ'। তাই, প্রকাশ্য মঞ্চে আত্মহত্যা, শ্বাস-নিরুদ্ধ করে উন্মাদিনী শাশুড়ী কর্তৃক পুষ্প-প্রতিমা বালিকা বধূর হত্যা, মৃত্যু, নারীধর্ষণ, ইত্যাদি দুঃসহ-বীভৎস চিত্রের একের পর এক অবতারণা করা হয়েছে। এই অপরিমিত অতিচার দর্শক-চিত্তকে ভারগ্রস্ত, —উন্মত্ত করে তোলে; রসানন্দে চরিতার্থ করে না।

কাহিনী-কল্পনার মধ্যেও নাট্যাদর্শের দিক্ থেকে ত্রুটি আছে প্রচুর। দীনবন্ধুর শিল্পি-স্বভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,—"তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন।"১ কেবল "চরিত্র-প্রণয়নেই" নয়; কাহিনী-কল্পনায়, রূপাঙ্গিক-রচনায় সর্বত্রই দীনবন্ধু ছিলেন 'চিত্রকর'। তাঁকে চিত্রশিল্পী বলা চলে না, কেবলই চিত্রকর,—Photographer ! বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, সেখানেই দীনবন্ধু সার্থক,—যেখানে তাঁকে কল্পনা করতে হয়েছে সেখানেই তিনি অস্বাভাবিক। নীলদর্পণের পেছনেও দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল,—"নদীয়ার অন্তর্গত

১। দীনবন্ধুর কবিত্ব।

গয়াতৌলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তি-ভূমি।"১ নীলদর্পণের জমিদার পরিবারের কর্তা গোলক বসু। তাঁর বড় ছেলে নবীনমাধব জমিদারীর সহৃদয় দক্ষ নিয়ন্তা;—প্রজাবৎসল এবং আদর্শ যুবক। ছোট ছেলে বিন্দুমাধব কলকাতায় বিদ্যাভাস করে; আদর্শ ছাত্র ও আদর্শ যুবক সে। শাশুড়ি এবং দুই জা' সরলতা-সৈরিন্ধ্রিতে মিলে বাড়িতে যেন একটি আদর্শ পারিবারিক আশ্রম গড়ে তুলেছিল। কিন্তু, সব কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নীলকর উড্ ও রোগ সাহেবের উৎপীড়নে। সাধুচরণ, রাইচরণ, ও তোরাপের মত স্বভাব-মহৎ চাষারা অকথ্য নিগ্রহ ভোগ করে; সাধুচরণের সন্তান-সম্ভবা কন্যা লালসা-মত্ত নীলকর-বর্বরের পদাঘাতে দেহত্যাগ করে। চারদিকের পরিবেশ হয়ে ওঠে বীভৎস। নবীনমাধব এই উৎপীড়নের সফল প্রতিরোধ করতে গিয়ে সবংশে নিঃশেষিত হন। নীলকরদের কারসাজিতে গোলোক বসু মিথ্যা মোকদ্দমায় কারারুদ্ধ হন, এবং সেখানে আত্মহত্যা করেন। নবীনমাধব নীলকরদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণান্ত আঘাত লাভ করে। শোকে উন্মত্ত হয়ে সাবিত্রী ছোট বধূকে গলা টিপে হত্যা করেন; তারপর হঠাৎ জ্ঞানলাভ করে দুষ্কর্মের ভারে নিজেও করেন মৃত্যুবরণ।

নাট্যবৈশিষ্ট্য ও কাহিনী

স্পষ্টই দেখ্‌ছি কাহিনীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পারম্পর্য যত আছে, কল্পনার শৃঙ্খলা তত নেই। চরিত্র চিত্রণেও দীনবন্ধু তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর জীবনকে তাঁদের সংলাপের মধ্যে অখণ্ড রূপ দিয়েছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাষার প্রতিধ্বনি করে বলা চলে,—রাইচরণ, তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী যেন এক একটি আস্ত রাইচরণ-তোরাপ-ক্ষেত্রমণি-আদুরী।২ অথচ, জমিদার পরিবারের জীবনে মহত্ত্বের আরোপ করতে গিয়ে দীনবন্ধু হাস্যকর ব্যর্থতার সৃষ্টি করেছিলেন। সরলতা ও বিন্দুমাধব প্রসঙ্গে মধুসূদনের নাট্যোচিত রোমান্স-রস পরিবেশন করতে গিয়ে, কি শব্দ-ব্যবহারে, কি প্রকাশভঙ্গি ও পরিবেশ-কল্পনায়, সর্বত্রই দীনবন্ধু চরম অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করেছেন। ফলকথা, নীলদর্পণ নাটক হিসেবে উৎকৃষ্ট না হলেও "বাংলার Uncle Tom's Cabin'. টম কাকার কুটির আমেরিকার কাফ্রিদের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্ব-মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।"৩

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩)। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন এই নাটকের বৃত্তান্ত "কতক প্রকৃত।"

১। দ্রষ্টব্য—সাহিত্য সাধক চরিতমালা,—২১।
২। দীনবন্ধুর কবিত্ব; বঙ্কিমচন্দ্র।
৩। ঐ।

মধুসূদনের নাট্যকলা এবং প্রহসনের নবাদর্শ-মহিম পরিবেশে দীনবন্ধু নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; আর নাট্যকারের শিল্প-ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন একান্ত ভাবে। সুরধুনীকাব্য ১ম খণ্ড (১৮৭১)১ এবং দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২) নামে দুখানি কাব্য গ্রন্থের সংগে সব শুদ্ধ সাতখানি নাটক-প্রহসন লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু, মধুসূদনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর নাট্যকলার অবতারণা দীনবন্ধু করতে পারেন নি। এমন কি, মধুসূদনের সার্থক অনুসরণও সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। নবীন তপস্বিনীতে নীলদর্পণের মতই কাহিনী দ্বিধা-বিভক্ত, একটি গল্প রোমাণ্টিক,—গুরুগম্ভীর;—বিজয়-কামিনীর কল্যাণ-পরিণামী প্রণয়কথা। অপরটি নীলদর্পণের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জীবন-চিত্রের মত স্থূলতাধর্মী, অমসৃণ। কিন্তু, এই দ্বিতীয় জগদম্বা-জলধর কাহিনীটিই উৎরেছে ভাল। জলধর-নারী-মাংস-লোলুপ জঘন্য পশু; জগদম্বা তেম্নি তার কদর্য-দর্শনা কুট্টনী। হাস্যরসের অবতারণায় দীনবন্ধু স্বভাবতঃই এই কাহিনীতে আদি-রসাশ্রয় করেছেন। আর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছে।

নবীন তপস্বিনী

প্রথমজীবনে দীনবন্ধু ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের ভাব-শিষ্য। ছাত্রাবস্থা থেকেই সংবাদ প্রভাকরে তাঁর কবিতাদি প্রকাশিত হত। সেই সূত্রে সংবাদ প্রভাকরের অন্যতর প্রতিযোগী ছাত্র-লেখক বঙ্কিমের সংগে তাঁর অভিন্ন-হৃদয় সৌহৃদ্যের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু, মধুসূদনের উত্তর-সূরী, বঙ্কিমের সমপ্রাণ সখা হয়েও দীনবন্ধুর শিল্প-ভাবনা ছিল ঈশ্বর গুপ্তেরই পুচ্ছানুসারী। সামাজিক নানা পরিবর্তন-বিপর্যয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি প্রখর ছিল। কিন্তু তাঁর সামাজিক সহানুভূতি গুপ্তকবির অগভীর কৌতুক-কৌতূহলের পর্যায় অতিক্রম করে নি। কি গভীর, কি কৌতুকাবহ, যে-কোনো বিষয়ের নাট্য-রূপায়নে তাঁর অনুভূতি যত তীব্র, তার চেয়ে বেশি তীর্যক; গভীরতার চেয়ে সেখানে কৌতুক ও পরিহাসপরতা প্রধান। আর, এই পরিহাস রচনাতেও গুপ্ত-কবির মতই রুচির বালাই দীনবন্ধুর বড় একটা ছিল না।

দীনবন্ধুর নাট্য-স্বভাব

নবীন তপস্বিনীর জলধর-জগদম্বা প্রসঙ্গে একথা যত সত্য, 'সধবার একাদশী' প্রহসন (১৮৬৬) প্রসঙ্গে তার চেয়ে অনেক মর্মান্তিক ভাবে সত্য। এই প্রহসনে দীনবন্ধু মধুসূদনের মতই 'নব্যবঙ্গ' সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার ও বিনষ্টিকে বিদ্রূপাঘাত করতে চেয়েছেন। অনেকের ধারণা, এই নাটকে নব্যবঙ্গ-প্রতীক 'নিমচাঁদ' চরিত্র মধুসূদনের প্রতিরূপ হিসেবেই কল্পিত হয়েছিল। গ্রন্থকার এ-কথা অস্বীকার করলেও, সংলাপে মধুসূদনীয় বাচনভঙ্গির অনুকৃতি আছে। কিন্তু, মধুসূদনের

১। সুরধুনী কাব্য (২য় খণ্ড) দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় (১৮৭৬)।

ব্যক্তিত্বের "Grand & Lofty" মহিমাকে উপলব্ধি করবার গভীরতা দীনবন্ধুর প্রতিভায় ছিল না। শুধু তাই নয়, মধুসূদনের সংলাপটুকুর যান্ত্রিক প্রতিধ্বনিই দীনবন্ধু এই নাটকে কিঞ্চিৎমাত্র অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। একটি আনুপূর্বিক চরিত্র গড়ে তুল্‌বার,—এমন কি, মধুসূদনের বিকৃত চরিত্র গড়ে তোলার মত ধৈর্য-ও তাঁর শিল্পি-স্বভাবে ছিল না। ফলে, গোটা রচনাটি প্রহসনের নামে ভাঁড়ামি হয়েছে। প্রহসনও যে নাট্যকলা-সচেতনতার অপেক্ষা রাখে, মধুসূদন প্রহসন লিখে এ-কথা প্রমাণ করে-ছিলেন। দীনবন্ধুর রচনায় সে নাট্য-চেতনা নেই; সেকালের এক শ্রেণীর পাঠক মধুসূদনের হাস্যকর প্রতিকৃতি হিসেবেই একে আস্বাদন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকার করেছেন, এই প্রহসন "বিশুদ্ধরুচির অনুমোদিত নহে।"

সধবার একাদশী

'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' (১৮৬৬) 'সধবার একাদশীর' পরে রচিত; কিন্তু আগে প্রকাশিত। এই কাহিনীতেও বাস্তব ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কন্যা-দৌহিত্র প্রভৃতি রেখে একটি বিপত্নীক বৃদ্ধ গোপনে অসহায় বালিকাকে বিবাহ করতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের হাতে কিরূপ নাকাল হয়েছিল, এই কৌতুক-চিত্রই প্রহসনটির বিষয়। দীনবন্ধু এখানে স্বক্ষেত্রে অবস্থিত; অতএব, সাবলীল! ডঃ সুকুমার সেন নীলদর্পণকে "নাট্যচিত্র" বলেছেন।১ বস্তুতঃ, এই 'নাট্যচিত্র' রচনাতেই দীনবন্ধু সিদ্ধহস্ত ছিলেন; রামনারায়ণের নক্সার মত সে চিত্র হয়ত অত লঘু নয়। তবে এদের পার্থক্য কেবল যুগ-প্রভাবগত।

বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো

লীলাবতী নাটক (১৮৬৭)-ও আর একটি নাট্যচিত্র। একটি শিক্ষিত মেয়ের অসচ্চরিত্র নেশাখোর কুলীন-পুত্রের সংগে বিবাহ-বিভ্রাট চিত্রিত হয়েছে এখানে। কয়েকটি সরস পার্শ্বচরিত্র ছাড়া আর কিছুই উৎরায় নি।

লীলাবতী

জামাই বারিক (১৮৭২) সামাজিক প্রহসন। এর কাহিনীতেও বাস্তবের ছায়া আছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন। একদিকে ধনিগৃহে অলস জামাতৃ-পোষণ; অন্যদিকে একাধিক বিবাহিত কুলীন ব্রাহ্মণের জীবনে সতীন-কোন্দল-জনিত বিভ্রাট্-এর কৌতুকচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে দীনবন্ধু স্বচ্ছ এবং সাবলীল; পারিবারিক জীবনবোধের প্রতি পরিণামী মমতাবোধ-ও এখানে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন।

জামাই বারিক

দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক 'কমলে কামিনী'র (১৮৭৩) কাহিনী

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২য় সং।

কাছাড়ের ইতিহাসের নাম-মাত্র ছায়াবলম্বনে রোমাণ্টিক প্রণয়-চিত্র হিসেবে কল্পিত হয়েছিল। রোমাণ্টিক জীবন-বোধ দীনবন্ধুর যে-পরিমাণে স্বভাব-বিরুদ্ধ, সেই পরিমাণেই নাটকটিও ব্যর্থ।

কমলে কামিনী

নাট্যকার হিসেবে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) প্রাচীনপন্থী, যদিও কালের দিক থেকে তিনি দীনবন্ধুর চেয়ে প্রাগ্রসর। দীনবন্ধু বঙ্কিম-বন্ধু হলেও তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ; তাঁর নাট্য সাহিত্য-ও বঙ্কিম-প্রতিভা-বিকাশের আগেই সূচিত হয়েছিল। কিন্তু, মনোমোহনের প্রথম প্রকাশিত রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭) দুর্গেশনন্দিনীর অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-দিক থেকে, বঙ্কিমের যৌবন-কালীন জাতীয়-চেতনার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব হয়েছিল। তা ছাড়া, সে-যুগের বাংলায় রাজনৈতিক-সামাজিক জাতীয়-চেতনা সৃষ্টির প্রাণ-তীর্থ 'হিন্দুমেলার' একজন সক্রিয় উদ্যোক্তা ছিলেন মনোমোহন। নাগরিক বাংলার ইতিহাসে গণসম্মিলনের প্রথম সার্থকতম মহাজীবন-পীঠ ছিল এই হিন্দুমেলা। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭) চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে 'বেলগাছিয়া ভিলায়' 'হিন্দুমেলার' প্রথম অনুষ্ঠান হয়। জাতীয় সম্মিলন হিসেবে এর বিঘোষিত আদর্শের মধ্যে ছিল :—

মনোমোহন বসু

......"আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ভারতভূমির জন্য।

ও হিন্দুমেলা

"ইহার আরো একটি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্ম-নির্ভর, এই আত্ম-নির্ভর ইংরেজ জাতির একটি মহৎ গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য-যাচ্ঞা করি। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি?.........যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়; তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য!"[১]

বাংলার জাতীয় সাধনার ইতিহাসে হিন্দুমেলা ছিল একটি উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি বা আন্দোলন পরিচালনার চেয়ে পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং স্বাধীনতা কামনার উদ্দীপনা, স্বদেশপ্রীতি এবং ঐতিহ্যগর্বের জাগরণই এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১। মুক্তির সন্ধানে ভারত থেকে উদ্ধৃত।

গান, কাব্য-কবিতা-সাহিত্য-শিল্প বিজ্ঞান-কারুকলাদির প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা ছিল সমধিক। ঠাকুর বাড়ির শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিমানেরা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী উদ্যোক্তা-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান।

"মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।" ইত্যাদি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গানটি এই উপলক্ষ্যেই রচিত এবং গীত হয়েছিল।

মনোমোহন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী পুরোধা। এর থেকেই তাঁর ব্যক্তি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট অনুভূত হতে পারবে। সমকালীন বাঙালি জীবন-ধর্মের প্রাগ্রসরমানতার প্রতি তাঁর উৎসাহ ছিল, ছিল শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। কিন্তু, সেই সংগে এ-কথাও স্মরণ করি, মনোমোহন তাঁর ভাব-সাধনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন গুপ্ত-কবির মানসাগারে। ফলে, তাঁর ভারতপ্রেম, স্বদেশীয় ঐতিহ্য-ভক্তি ও প্রগতিশীল কর্মধারার মূলে নিহিত হয়েছিল সহজ রক্ষণশীলতা। এই কারণেই বঙ্কিম-যুগে জাত ও সমকালীন জীবন-প্রেরণার অভিঘাত-পূত হয়েও মনোমোহন আসলে এই বয়ঃসন্ধি-যুগের ভাব-শিল্পী। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের অমোঘতা আছে, সেই সংগে আছে অগ্রসূয়মানতার নিঃসংশয় প্রতিশ্রুতি; আছে পরিণামী জীবন-বোধের শৃঙ্খলা-বুদ্ধি। কিন্তু, নব-যুবকের মতই তিনি অতীত-স্বপ্নচারী, কিশোরের মত পূর্ব-সূরীদের সাধন-ঐতিহ্যে অতি-নির্ভরশীল। অতীত-ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি সার্থক অগ্রগামিতার লক্ষণ নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু, অনাগত পথের পথিক অতীতকে পাথেয় রূপে বহন করে। অতীত সেখানে বর্তমানের সংগে চলমান; পথিককে সে আপন অবিচলতার স্থানুত্বে বেঁধে রাখে নি। মনোমোহন অনাগতের পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন; কিন্তু অতীতের সীমাবন্ধনে বারে বারে পড়েছেন বাঁধা।

মনোমোহন-প্রতিভার বয়ঃসন্ধি-স্বভাব

তা হলেও, তাঁর শিল্প-সাধনা ব্যর্থ হয় নি। যৌবনোচিত আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-বিচারণার বশে মনোমোহন নিজ প্রতিভার স্বরূপটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে, অতীতের ভাব-স্বভাবকে তিনি অনাগত কালের ঐতিহ্য-পাথেয় রূপে সঞ্চিত করে গেছেন বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে।

এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে দেখেছি, উনিশ শতকে নব-রূপায়িত বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাব-প্রেরণা অপসারিত হয়েছিল রেনেসাঁস-যুগের বিশেষ জীবন-মূল্যবোধের প্রভাবে। আর, সেকালের নাট্যসাহিত্যের রূপ-সৌন্দর্যের সম্বন্ধে নূতন আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল জাগ্রত করেছিল য়ুরোপীয় নাট্যকলা। তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, হরচন্দ্র ঘোষের কাল

থেকে মধুসূদন-দীনবন্ধু পর্যন্ত এই য়ুরোপীয় কলাকৃতি অনুসরণের প্রয়াস এ-পর্যন্ত লক্ষ্য করে এসেছি। কিন্তু, মধুসূদন ছাড়া এ-পথে আর কেউ সার্থক হতে পারেন নি। অপর পক্ষে, যাত্রা-সাহিত্যের একটি বিশেষ পর্যায়ে বাঙালির নাট্য-স্বভাবের অনুকূল সার্থক রূপ-কল্প সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল,—একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মনোমোহন উভয়বিধ আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার সমন্বয় সাধন করেছিলেন তাঁর নাটকে। মঞ্চাশ্রয়ী নাট্যকলার কাঠামোর 'পরে তিনি যাত্রাধর্মী বর্ণনা, আবেগ ও সংগীতরস পরিবেশন করে বাঙালির পক্ষে এক নূতন নাট্য-স্বাদ-সম্ভাবনার পথ উৎসারিত করেছিলেন। বাঙালির নাট্য-স্বভাবে আবেগের অতিমাত্রিকতা ও গীতপ্রীতির সম্বন্ধে মনোমোহন সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, য়ুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের হুবহু অনুসরণ এ-দেশে রস-প্রসূ হবে নাঃ—"ভারতবর্ষ যে য়ুরোপ নয়, য়ুরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, য়ুরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ;"[১] এ-কথা জেনেই তিনি এই নূতন নাট্যাঙ্গিকের অবতারণা করেছিলেন। এই আবেগ-প্রধান, শ্লথ-ঘটনা, সংগীত-উচ্ছ্বসিত নাট্যকলা-কৃতিই পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্রের হাতে পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের রূপ লাভ করেছিল। বস্তুতঃ, পৌরাণিক নাট্যকলার প্রবর্তয়িতা মনোমোহন বসু। তাঁর প্রথম রচনা "রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস"এ লেখক এই ধরণের নাট্যোপাদানের বিশিষ্টতার কথা প্রস্তাবনাংশে বিবৃত করেছেনঃ—"এখনকার কৃতবিদ্য নব্যদলের মধ্যে অনেকে বাৎসল্য, সখ্য, করুণা প্রভৃতি রসের অনুরাগী আছেন। আর, এখন তাঁদের কাব্য ও সংগীতাস্বাদ বিশুদ্ধ হওয়াতে এদেশে জঘন্য যাত্রার পরিবর্তে পুনর্বার নাট্যাভিনয় উদয় হচ্ছে। তাঁরা চান—অভিনয়ের নায়ক-নায়িকার নির্মল চরিত্র হবে।"

মনোমোহনের সৃষ্ট নূতন নাট্য-রূপ

প্রথম নাটক,—রামাভিষেক

এই সব "নির্মল চরিত্র" নায়ক-নায়িকার জীবন-উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মনোমোহন প্রায়ই ভারতীয় পুরাণ-কথার জগতে প্রবেশ করেছেন। রামাভিষেক ছাড়াও তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে,—সতী নাটক (১৮৭৩), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থপরাজয় নাটক [অর্থাৎ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব] (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০)। কিন্তু, পৌরাণিক ভাবানুভূতির আবেগাতিশায়িতা সৃষ্টি করেই মনোমোহন ক্ষান্ত হতে পারেন নি। হিন্দুমেলার মত জাতীয়

অন্যান্য নাটক ও দেশ-প্রেম

১। জাতীয় নাট্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

নাট্যশালারও (ন্যাশনাল থিয়েটার) তিনি ছিলেন অন্যতম মৌল পৃষ্ঠ-পোষক। আর, সেই নাট্যশালার ন্যাশন-প্রীতির পেছনে একান্ত প্রেরণা ছিল হিন্দুমেলার। তাই, মনোমোহনের পুরাণ-বিষয়ক নাট্য-কথায়ও সহজে অনুস্যূত হয়েছে সমকালীন দেশ-প্রীতির প্রাণবন্যা। তাঁর হরিশ্চন্দ্র নাটকের একটি গান দীর্ঘদিন অগ্নিযুগের বাঙালিদের মুখ মুখে ফিরে আজ বিস্মৃত হতে চলেছে ঃ—

"দিনের দিন্ সবে দীন্ পরাধীন্।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ অপমানে তনুক্ষীন্!
সে সাহস বীর্য নাহি আর্য ভূমে, পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা-রাহু মুখে লীন! ১।
অতুলিত ধন-রত্ন দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন্! ২।
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোষাভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন্! ৩।
তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার্, সূতা যাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার্—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর্, হলো দেশের কি দুর্দিন! ৪।
আজ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ্, কলের্ বসন্ বিনা কিসে রবে লাজ্,
ধর্বে কি লোক্ তবে দিগম্বরের সাজ্— বাকল্, টেনা, ডোর্, কপিন্! ৫।
ছুঁই সূতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে দীয়াসলাই কাটি, তাও আসে পোতে;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন! ৬।"

কেবল দেশাত্মবোধের নিরঙ্গ উচ্ছ্বাস নয়, এই গানটিতে সেকালের পরাধীনতাবোধের তথ্যাবহ ঐতিহ্য-চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। মনোমোহনের রচনায় এমন গানের সংখ্যা কম নয়। উত্তরসূরীদের মধ্যে গিরিশ ঘোষ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ পরবর্তী কালে পৌরাণিক নাটকে যথাক্রমে ভক্তি-আবেগ ও স্বাদেশিকতা-বুদ্ধিকে পরিণততর ব্যাপ্তি ও পুষ্টি দান করেছেন। গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ মনোমোহন-ঐতিহ্য-বৃক্ষের মূলোদ্ভূত দুটি মহীরুহ।

সামাজিক নাটক

প্রহসন

সামাজিক বিষয় নিয়ে মনোমোহনের একমাত্র রচনা 'প্রণয় পরীক্ষা নাটক'। স্বাভাবিক কারণেই এটি তাঁর প্রতিভার স্বয়ং-স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে নি। নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫) নামে একখানি প্রহসনও তিনি লিখে-ছিলেন।

নাট্যক্ষেত্র ছাড়াও মনোমোহনের সাহিত্য-কৃতি ছিল বহুমুখী। তাঁর

প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে পদ্যমালা ১ম—৩য় ভাগ (১৮৭০-১৮৯৪) "শিশুপাঠ্য সরল পদ্য গ্রন্থ।" তা ছাড়া আছে বিখ্যাত "মনোমোহন গীতাবলী"। "ঈশ্বর বিষয়ক গান" থেকে সুরু করে হাফ্ আখ্ড়াই, দাঁড়াকবি, পাঁচালী, বাউল, টপ্পা, এমনকি, "সামাজিক ও রাজনৈতিক গান" পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ে গীতাবলীর গ্রন্থ-সূচি ঋদ্ধ হয়ে আছে।

অন্যান্য গদ্য-পদ্য রচনা

দুলীন (১৮৯১) মনোমোহনের রচিত একটি ঐতিহাসিক নবন্যাস। এই লেখকের গভীর ভাবনার পরিচয় রয়েছে 'হিন্দু আচার ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক' গদ্য-নিবন্ধ গ্রন্থে ও তাঁর বক্তৃতামালায়।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও মনোমোহন স্বল্পজ্ঞাত ছিলেন না। সংবাদ বিভাকর নামে একখানি অর্ধসাপ্তাহিক তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত "সাপ্তাহিক" (পরে মাসিক) "মধ্যস্থ" বঙ্গদর্শন-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়ে বঙ্গদর্শনেরই পূর্বভূমিকা অভিনয় করেছিল।

সাংবাদিক মনোমোহন

এ-যুগের নাটকে মনোমোহনের ভাবধারাকে আঙ্গিক-পুষ্ট করেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালিকায় দেখ্‌ছি নাটক, গীতিনাট্য, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, প্রহসন, প্রাহসনিক নাটক ইত্যাদি অসংখ্য পর্যায়ে রাজকৃষ্ণের লেখা নাট্য-সংখ্যা ত্রিংশাধিক।[১] রাজকৃষ্ণের নাট্য রচনার সংগে তাঁর মঞ্চ-পরিচালনার ইতিহাস অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। প্রথম জীবনে রাজকৃষ্ণ সাংবাদিকতার দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। প্রথমে সমাজ দর্পণ পত্রিকার সম্পাদনার সংগে তাঁর যোগ ছিল। পরে বীণা নামে একখানি কাব্য-পত্রিকা মাসিক আকারে সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। অভিনয়-কুশলতার উৎসাহেই তিনি বীণা রঙ্গভূমি স্থাপন করেন। তার বহু নাটক বীণা রঙ্গভূমি এবং তৎকালীন অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের প্রসঙ্গেই লিখিত। এই বীণা রঙ্গভূমি রাজকৃষ্ণের জীবনে পতন ও দুঃসহ আর্থিক দুরবস্থার কারণ হয়েছিল।

রাজকৃষ্ণ রায়

রাজকৃষ্ণের প্রথমতম "নাট্যগীতি" পতিব্রতা (১৮৭৫) সাবিত্রীর পৌরাণিক কথাশ্রয়ে রচিত। শুধু ঐ প্রথম নাটকটিই নয়, তাঁর অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে সর্বাধিক মঞ্চ-খ্যাতি অর্জন করেছিল প্রহ্লাদ চরিত্র (প্রথম অভিনয় ১২৯১) ও নরমেধ যজ্ঞ (১২৯৮)। রাজকৃষ্ণ তাঁর একাধিক পৌরাণিক নাটকে আধুনিক সমস্যাবোধের ছায়া-

---

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৫০।

সম্পাত করেছেন। নরমেধ যজ্ঞ নাটকটিতে ঐতিহ্যাগত পিতৃভক্তির সংগে নব-মানবিকতাবোধের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। পৌরাণিক পরিবেশটি মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে,—কুশীলবদের মধ্যে "সম্রাট নহুষের প্রেতাত্মাও" রয়েছেন। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' বেঙ্গল থিয়েটারে এবং 'নরমেধ যজ্ঞ' ষ্টার মঞ্চে অভিনীত হয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

পতিব্রতা নাট্যগীতি ও অন্যান্য নাটক

'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) নাটকে সীতার অগ্নি পরীক্ষার গল্পকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়েছে। চরিত্র রচনায় আছে দক্ষতার প্রকাশ। কিন্তু, যেমন পদ্যে, তেমনি নাটকেও ছন্দ-বিন্যাসের অভিনবতার দরুণই রাজকৃষ্ণ তাঁর সমকালীনদের মধ্যে অনন্য-তুল্য। অনলে বিজলী নাটকের অধিকাংশই মধুসূদনানুসারী অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মিত্র-অমিত্রাক্ষর বিশিষ্ট সংলাপও আছে বহুলাংশে। এই নাটকে গদ্যের ব্যবহার খুব কম করা হয়েছে।

ছান্দসিক রাজকৃষ্ণ

কিন্তু, বাংলা নাট্য-সংলাপে ছান্দসিক অনন্যপূর্বতা রচনায় রাজ-কৃষ্ণের হরধনুর্ভঙ্গের (১২৮৫ সাল) ঐতিহাসিক সার্থকতা সমধিক। এই নাটকেই লেখক সর্বপ্রথম "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের" নাটকীয় ব্যবহার করেন। এই নাটকের ভূমিকায় সুদীর্ঘ আলোচনা করে তিনি নাট্য-সংলাপের পক্ষে অমিত্রাক্ষর পদ্যের চেয়ে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষরের' উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করেছেন। ঐ ভূমিকা থেকেই জানা যায় ১২৮৫ বাংলা সনে 'নিভৃত নিবাস' কাব্যে রাজকৃষ্ণ প্রথম 'ভাঙগা অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রয়োগ করেন। কিন্তু কবিতার পক্ষে যা "একঘেঁয়ে" মনে হয়েছিল, তারই নাট্যোপযোগিতা এতদিনে লেখক আবিষ্কার করেছিলেন। এখানেই গৈরিশ ছন্দের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম।

নাটকীয় অমিত্রাক্ষর ও ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর

রাজকৃষ্ণের অন্যান্য বহু পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আছে রামের বনবাস, (১৮৮২), তরণীসেন বধ (১৮৮৪), প্রহ্লাদ মহিমা (১৮৯১), ঋষ্যশৃঙ্গ (১৮৯২) ইত্যাদি। 'ঐতিহাসিক নাটক' রাজা বিক্রমাদিত্য (১৮৮৪)-র সংলাপে লেখক "পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক গদ্যের" ব্যবহার করেছেন, এবং তা রীতিমত সাবলীল।

অন্যান্য নাটক

রাজকৃষ্ণের লেখা প্রহসন সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। অন্যান্যের মধ্যে তাতে আছে কলির প্রহ্লাদ (১৮৮৮), টাট্‌কা টোট্‌কা (১৮৯০), জগা পাগলা (১৮৯০) ইত্যাদি।

আলোচ্য সময়ের নাট্যকারদের মধ্যে মধুসূদনের পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্র-

মোহন ও তাঁর ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহনের নাম উল্লেখযোগ্য। পাইকপাড়ার রঙ্গমঞ্চের পরে পাথুরেঘাটার বাড়িতে পারিবারিক রঙ্গমঞ্চ নূতন সার্থকতায় গড়ে ওঠে। যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের সংগে জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভ্রাতৃদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে পরম উৎসাহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শৌরীন্দ্রমোহন মালবিকাগ্নিমিত্র (১২৬৬ বাং) অনুবাদ করেছিলেন।

পাথুরেঘাটা রঙ্গমঞ্চ
ও শৌরীন্দ্রমোহন

যতীন্দ্রমোহনের নামে প্রচলিত নাটকগুলির মধ্যে আছে বিদ্যা-সুন্দর নাটক (১৮৫৮) ও বুঝলে কিনা!! প্রহসন (১২৭৩ বাং)।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

নাট্য রচনা ব্যাপারে ঠাকুর-ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগী ছিলেন কালিদাস সান্ন্যাল। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের রচনায় কালিদাসের হস্তাবলেপ ঘটেছিল।১ কালিদাস সান্ন্যাল নিজে মুক্তাবলী নাটিকা (১৮৫৯), নল দময়ন্তী নাটক (১৮৬৮) এবং বিদ্যাসুন্দর অভিনয় (১৮৮১) লিখেছিলেন। মুক্তাবলীতে রামনারায়ণের এবং নলদময়ন্তীতে মধুসূদনের আদর্শের প্রভাব রয়েছে।

কালিদাস সান্ন্যাল

যতীন্দ্রমোহনের "বুঝলে কিনা!!" প্রহসনের জবাব দিয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসন (১৮৬৭) লিখেছিলেন। ভোলানাথের অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে আছে 'কোনের মা কাঁদে টাকার পুঁটলি বাঁধে', মোহন্তের চক্রান্ত, ভ্যালারে মোর বাপ ইত্যাদি।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

এ-যুগে মনোমোহন বসুর অনুসরণ করে যাত্রা-রীতি-সিদ্ধ 'গীতাভিনয়' রচনার বাহুল্য দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে গীতাভিনয়ের মঞ্চ-রূপায়নে স্টেজ-এর প্রয়োজন ছিল না বলে মফঃস্বল ও গ্রাম-বাংলায় এই ধরণের রচনার বিশেষ সমাদর হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন "বাঙালা গীতিকা" বা গীতিনাট্যের মূলে ইংরেজি অপেরার ছায়া যতটা না থাক, যাত্রার প্রভাবই বেশি।"২ এই সব "গীতাভিনয়" বা নাট্যগীতিতে পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণা করা হত বেশি। ভোলানাথও এই ধরণের পৌরাণিক গীতিকা রচনা করেছিলেন কয়েকটি।

ও নূতন যাত্রা

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খন্ড ২য় সং।
২। ঐ।

ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্র কবিতার মত নাটকও যে লিখেছিলেন সে-কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি। বিধবা বিবাহ নিয়ে তাঁর দুটি প্রহসন লিখিত হয়, (১) ম্যাও ধরবে কে? এবং (২) শুভস্য শীঘ্রং। অন্যান্যের মধ্যে আছে জানকী নাটক, জয়দ্রথবধ, আগমনী এবং হতভাগ্য শিক্ষক।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "বাঙালায় মহিলা-রচিত প্রথম নাটক হইতেছে 'দ্বিজ-তনয়ার' উর্বশী নাটক (১৮৬৬)। লেখিকার নাম কামিনী সুন্দরী দেবী।"১ তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ঊষা নাটক (১৮৭১) ও রামের বনবাস নাটক।

প্রথম মহিলা নাট্যকার

এ-যুগে নাট্যগীতি ও নাটক রচনার উৎসাহ মাত্রাতিক্রমী ছিল। একদিকে মফঃস্বলের নাট্যোৎসাহীর দল এবং অন্যদিকে বটতলার ছাপাখানা মিলে এঁদের প্রতাপ দুর্বার করে তুলেছিল। সকলের নামমাত্র উল্লেখ করলেও গ্রন্থের আকার দুরায়ত্ত হবে। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য সময়ের নাটক রচনার আরো একটি ধারার কথা উল্লেখ করেই প্রসঙ্গ শেষ করব।

এই সময়ে সামাজিক দুর্নীতি বিষয়েও নানারকম নাটক রচিত হতে থাকে। অবশ্য এই সব রচনার কোনটিই প্রহসন অথবা নিছক অশ্লীল নক্সার পর্যায় অতিক্রম করে নাট্য-মর্যাদায় আসীন হতে পারে নি। মধুসূদনের সমাজ-দরদী চিত্তের প্রহসন সৃষ্টির এই পরিণতি দুঃখাবহ। ক্কচিৎ দু-একটি ভাল, অন্ততঃ রুচিসহ রচনার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তাতেও নাট্যরূপের উল্লেখ্য উৎকর্ষ নেই। বিপিনমোহন সেনগুপ্ত এবং বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় জোড়াসাঁকো নাট্যশালার আহ্বানে 'হিন্দুমহিলা নাটক' লিখেছিলেন, বিঘোষিত পুরস্কার কামনায়। "পুরস্কার পাইয়াছিলেন বিপিন মোহন।"২

সামাজিক দুর্নীতি বিষয়ে নাটক

১। ঐ।
২। ঐ।

ষোড়শ অধ্যায়

বয়ঃসন্ধি যুগে বাংলা গদ্য

আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্যের ইতিহাস প্রধানতঃ পরিপুষ্ট হয়েছে হিন্দু কলেজের প্রথম পর্যায়ের দুই সহপাঠী বন্ধুর সাধনায়।—তাঁরা বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় দুই মনীষী,—রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে, রাজনারায়ণ-ভূদেব হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন;— আর সে বন্ধুত্ব প্রায় আমরণ ছিল অক্ষুণ্ণ। কেবল কালের দিক থেকেই নয়, সহৃদয়তার বিচারেও রাজনারায়ণ-ভূদেব মধুসূদনের সম-সাময়িক,—সমধর্মা। অতএব, রাজনারায়ণ-ভূদেবের হাতে বাংলা গদ্যের বয়ঃসন্ধিলীলা সমুদ্ভাসিত হয়েছে দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

বাংলা গদ্যে যুগ্ম-ব্যক্তিত্ব

এই প্রসঙ্গে সমকালীন বাংলা গদ্যের আরো একটি পৃথক ধারার কথা উল্লেখ করতে হয়। সে দিকটি প্রস্ফুট হয়েছে প্রথমতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনার মাধ্যমে। রাজ-নারায়ণ-ভূদেব যেমন চিন্তায়, তেমনি প্রকাশ-ভঙ্গিতেও ছিলেন গুরু গম্ভীর। দৃঢ়-সুচিন্তিত বক্তব্য তাঁদের রচনায় প্রকাশিত হয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষা ও যুক্তির অসংশয়িত স্বচ্ছতায়। কালীপ্রসন্নাদির চিন্তায় দুরবগাহতা আছে, আছে জীবনের মর্মোৎসারী গভীর দৃষ্টি। কিন্তু চলার ছন্দ সেখানে লঘু, প্রকাশের চাল সরস হলেও চঞ্চল।

বাংলা গদ্যের বিচিত্র-তর ধারা

স্মরণ রাখতে হবে, আলোচ্য কাল পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও কর্ম-সংঘাতে বাংলায় নবযুগের জন্ম-যন্ত্রণার কাল। অতএব, এ-যুগে সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিয়েছে অনন্য-পূর্ব জটিলতার আস্বাদ নিয়ে। সচেতন সামাজিক-ব্যক্তির ভাব-চিন্তার দ্বারে অভিঘাত রচনা করে দাবি করেছে যুগোচিত সমাধানের। ফলে, প্রত্যেকটি আত্ম-সচেতন স্পর্শকাতর ব্যক্তিত্ব প্রাণান্ত প্রয়াস করেছে গ্রন্থিবদ্ধ জীবন-জটিলতার সীমাতিক্রমণের চেষ্টায়। মধুসূদন ও তাঁর পরবর্তীদের কাব্য-কবিতা-নাটকে সেই আত্মোৎক্রমণের ঐতিহাসিক চেষ্টা লক্ষ্য করেছি। গদ্য সাহিত্যেও সেই যুগ-যন্ত্রণারই ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে।

বাংলা গদ্যে বয়ঃসন্ধি

রামমোহনের যুগ থেকেই নগর-বাংলায় স্বদেশ, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সূত্রেই সুরু হয় নানা রকম বাদানুবাদ মূলক বিতর্ক-রচনা। সেকালের সাময়িক পত্রিকা-

বলী এই বিচিত্র-মুখী চিন্তা ও আদর্শের দ্বন্দ্বকে কিভাবে বহন করে নিয়ে চলেছিল, সে-কথা যথাস্থানে বলেছি। এ-কথাও লক্ষ্য করেছি যে, সে সব বিতর্ক-বিক্ষোভ বাঙালির জীবন-ইতিহাসে কেবল বিতণ্ডা মাত্র ছিল না,—ছিল বিশেষ পারিণামী অর্থাবহ। প্রথমতঃ, ঐ উপলক্ষ্যেই শিক্ষিত বাঙালি প্রথম আবিষ্কার করেছিল যে, জীবন একটি নিয়ত চলমান জটিল অস্তিত্ব। যে-কোনো মানুষের পক্ষেই,—তাঁরা যত বড় জ্ঞানী ও ধ্যানযোগী-ই হোন না কেন,—জীবনের অনাদ্যন্ত জটিলতাকে কারো জ্ঞান-সীমায় চিরকালের জন্য বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের পূর্বপিতামহদের জ্ঞান-সিদ্ধিকে বহন করে আমাদেরও স্বতন্ত্র ভাবে এগিয়ে যেতে হবে জীবনের পথে।

পূর্বসূত্র ও

দ্বিতীয়তঃ, এই অনুভূতির সংগে সংগে অন্ধ সংস্কারের স্থানুত্ব থেকে সেকালের বাঙালি মুক্ত হয়েছে। সেই সংগে স্বীকার করেছে জীবনের গ্রন্থি-মোচনের স্বতন্ত্র দায়িত্ব। এখানেই উনিশ শতকীয় নাগরিক জীবনের পরমুখাপেক্ষিতার বিলোপ ঘোষিত হয়েছে,—পরোক্ষে আভাসিত হয়েছে আত্মনির্ভরতার যৌবন-সম্ভাবনা।

তৃতীয়তঃ, এই বিচার-বিতর্ককে উপলক্ষ্য করেই জীবনের বহুমূল্য জটিলতার গ্রন্থি মোচনের প্রসঙ্গে, তার অনন্তমুখী বৈচিত্র্য ও বিস্তার দেখে বাঙালি বিস্মিত হয়েছে। সেখানে কত স্বাবিরোধ, কত আন্তর এবং বহিঃসংঘাত, একই জীবনে পাশাপাশি পরিবর্ধিত হয়ে চলেছে। তবু, জীবনের বিনষ্টি ঘটছে না,—তার অগ্রসৃয়মানতা বরং হয়ে উঠছে বিচিত্রতর, —বিচিত্রতম।

যুক্তি দিয়ে, বিচার করে এই সব বিস্ময়-বৈপরীত্যের গ্রন্থি-মোচন করতে চেয়েছেন সে-কালের একদল গদ্য লেখক। সব-কিছুকে যথামূল্যে প্রতিষ্ঠিত করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন জীবনের ভার-সমতার মৌল উৎসটিকে। তাঁদের প্রতি পদক্ষেপ সুচিন্তিত, প্রতিটি বাক্য সুব্যক্ত, প্রতিটি শব্দ সু-মিত। তাঁদের চালে যে গাম্ভীর্য আছে, তা কৃত্রিম নয়; তাঁদের নিজ নিজ ভাব-স্বভাবের দ্বারা তা চিহ্নিত।

কিন্তু, আরো একদল ছিলেন, যাঁদের চোখে জীবনের ভার-সমতার বহিরঙ্গ অভাব তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ, আগে বলেছি, জীবনকে তার যথাস্থিত বিচার-সম (Rational) রূপে প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে আধুনিকতার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা যত অতৃপ্ত থেকেছে, ততই তাঁরা আহত হয়েছেন, কখনো বোধ করেছেন বিস্ময়ান্বিত কৌতুক। জীবনের মর্ম-গত ঐক্য-সূত্র আবিষ্কারের পথে এই আপাত-বিক্ষেপ তাঁদের দৃষ্টিকে

ফলশ্রুতি

তীক্ষ্ন করেছে; প্রকাশকে কোথাও করেছে ব্যঙ্গ-তীব্র, কোথাও বা করেছে কৌতুক-চপল।

বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি-যুগে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কাল থেকেই গদ্য রচনার এই দুই ধারা ক্রমশঃ অবয়ব-সন্নদ্ধ হয়ে উঠছিল। রামমোহনের 'সহ-মরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' প্রথম শ্রেণীর, এবং 'অতি অল্প হইল'; 'আবার অতি অল্প হইল' দ্বিতীয় প্রকার গদ্য রচনার অন্যতম প্রাথমিক নিদর্শন। কিন্তু, ঐ সব রচনায় রচিতব্য বিষয় সম্বন্ধে লেখকের অতি-অবধাবনতা ও উৎসাহের দরুণ উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণ আভাসিত হতে পারে নি। সাহিত্য, তথা শিল্প-কর্ম মাত্রেরই পক্ষে স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব-স্পর্শ অপরিহার্য। কিন্তু, ব্যক্তি-চিত্তের অতি-সান্নিধ্য-কর্ষণের ফলে রচয়িতার ভাবলোক ও পরিবেশ থেকে রচনা মুক্ত হতে পারে না। ফলে, শিল্পের সাধারণীকরণ হয় নিরুদ্ধ। রাম-মোহন-বিদ্যাসাগরের কালের জীবন-জটিলতার প্রথম আবিষ্কার-জনিত অতি-আক্ষিপ্ততা আলোচ্য বয়ঃসন্ধি যুগে স্তিমিত হয়েছে। সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, স্বদেশ বিষয়ে পূর্বচিন্তার ধারা ক্রমবর্ধিত, ক্রম-সংস্থিত হয়ে হয়েছে ক্রম-অবয়বান্বিত। অর্থাৎ, একালের স্বভাবে যৌবনোচিত ভার-সমতা ও ধীরতা স্পষ্টতর হয়েছে, এই কারণেই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রস্তুতিযুগের গদ্য-লক্ষণই এ-বারে হয়েছে পরিণত-তর।

রাজনারায়ণ-ভূদেব আলোচ্যকালের যে গদ্য ধারার নিয়ামক, তাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা চলে। এঁরা দুজন বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন প্রাবন্ধিক। রাজনারায়ণ বসু তাঁর বিভিন্ন গদ্য গ্রন্থিকা ও পৃথক রচনাবলীর সংকলন গ্রন্থকে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮২) নামে অভিহিত করেন। আর, ভূদেব ত পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ-প্রবাহের একক-সচেতন গ্রন্থকার।

গদ্য প্রবন্ধ

বর্তমান প্রসঙ্গে 'প্রবন্ধ' কথাটির বিশেষিত প্রয়োগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অবধানতা প্রয়োজন। 'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে "প্রকৃষ্ট বন্ধন।"[১] বঙ্গীয় শব্দকোষ একই শব্দের প্রয়োগগত আরো আঠারটি পৃথক অর্থের উদ্ধার করেছেন। এদের প্রায় সব কয়টিই 'সম্বন্ধ, সংযোগ, পারস্পরিক শৃঙ্খলা' ইত্যাদি 'প্রকৃষ্ট বন্ধনাত্মক' অর্থের দ্যোতনা করে। অবশ্য, 'প্রকৃষ্ট বন্ধনে'র দ্যোতনা পূর্বাপর অতি ব্যাপক এবং অস্পষ্ট ছিল। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ শব্দের প্রাচীনতম প্রয়োগ হয়ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

১। বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়।

লক্ষিত হবে;—"এ-সব কাজের আম্মো জানিএ প্রবন্ধ।" এখানেও 'প্রবন্ধ' শব্দটি কৌশল, উপায় বা কাজের পদ্ধতির কথাই অভাসিত করছে। কাশীরাম দাস "পাঁচালী প্রবন্ধে" তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয়ার্ধে, আমাদের আলোচ্য কাল থেকেই প্রবন্ধ শব্দটি শৃঙ্খলা-নিবদ্ধ যুক্তি-চিন্তা-সিদ্ধান্তের গদ্য অভিব্যক্তিকে,—গদ্য-সন্দর্ভকে বিশেষ ও একান্ত ভাবে নির্দেশ করতে আরম্ভ করেছে।

বাংলা ভাষা--সাহিত্যে "প্রবন্ধ"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—"বাংলা গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনার অন্যতম প্রবর্তক রামমোহন।"১ কেবল "প্রবর্তক নিবর্তকের প্রস্তাব" নয়, চিন্তার ভারে, যুক্তির ব্যাপ্তি ও প্রাঞ্জলতায়, অখণ্ড ব্যক্তিত্বের সংগ্রন্থনে রামমোহনের একাধিক গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-প্রবন্ধ,—তথা গদ্য-সন্দর্ভের গুণ দাবি করতে পারে। এ-বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র কোন কোন লেখার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হতে বাধা নেই। কিন্তু, স্মরণ রাখতে হবে, কি রামমোহন, কি মৃত্যুঞ্জয়, কারো মূল রচনার কাঠামোতেই 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' নেই; এঁদের দুজনের গদ্য-রচনাই অ-পূর্ণাবয়ব। গদ্য ভাষা যেখানে ভাব-চিন্তা-যুক্তিকে নিবদ্ধ করবার আধার, সেখানে আধেয়-র 'বন্ধন'-সম্পূর্ণতার জন্য ভাষার সুসংগঠনও অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ-দিক থেকে বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' উন্নততর রচনা।

কিন্তু, এঁরা কেউই সচেতন ভাবে 'প্রবন্ধ' কথাটির উল্লেখ-প্রয়োগ করেন নি। এ-ধরণের গদ্য রচনার প্রসঙ্গে 'প্রস্তাব' শব্দটি পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এখানে 'প্রস্তাব' কথাটি অ-স্পষ্টার্থে 'প্রসঙ্গ-কথা' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রবন্ধ শব্দের বিশেষিত প্রয়োগ হয়ত ইংরেজি Essay, Dissertation ইত্যাদি শব্দের প্রেরণা থেকে এসেছে। ইংরেজি গদ্য নিবন্ধ থেকে বাংলা ভাষায় প্রথম সুপরিকল্পিত নিয়মে অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর আলোচ্য ইংরেজি 'Essay'র প্রসঙ্গেও একাধিক স্থলে তিনি প্রস্তাব শব্দটির ব্যবহার করেছেন।২ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"-এর উপক্রমণিকায় দেখি, **H. H. Wilson**-এর লিখিত ইংরেজি 'Essay' উপলক্ষ্যে "দুইটি প্রবন্ধ" কথার উল্লেখ আছে। 'প্রবন্ধ' কথাটি গদ্য সন্দর্ভের প্রসঙ্গে যখনই ব্যবহৃত হয়ে থাক্, মনে হয়,—অক্ষয়-কুমারের এই প্রয়োগ-প্রসঙ্গের ঐতিহাসিক পরিণতিতে শব্দটির বর্তমান ব্যবহার সিদ্ধ হয়েছে।

এবং 'প্রবন্ধ' শব্দার্থের বিশেষ প্রয়োগ

১। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—১৬।

২। দ্রষ্টব্য—'বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'—বিজ্ঞাপন।

এ-দিক্ থেকে, বাংলা গদ্য প্রবন্ধের প্রবর্তক হিসেবে অক্ষয়কুমারের কথা বিশেষ স্মরণীয়। তা ছাড়া, বিবিধার্থ সংগ্রহের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দক্ষতাও অবশ্য উল্লেখ্য। বস্তুতঃ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ সংগ্রহকে আশ্রয় করেই গুরুগম্ভীর চিন্তা-সন্নদ্ধ প্রবন্ধ-ধর্মী বাংলা গদ্য রচনার ইতিহাস এক কালে দূর-প্রসারী হয়েছিল।

প্রাচীনতর প্রবন্ধ লেখক

আগে বলেছি, রামমোহনোত্তর কাল থেকেই বাঙালির আধুনিকতাধর্মী মননে যে জিজ্ঞাসা ও চিন্তা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছিল, সাময়িক পত্রিকার স্তম্ভে তার সর্বাভিমুখী প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটে। সংবাদ প্রভাকর এবং অন্যান্য পত্রিকাতে এ ধরণের আলোচনার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তারও আগে, এই চিন্তাশীল মননের ধারাকে আরো দূর-প্রসারী করা চলে সমাচার দর্পণ-এর যুগ পর্যন্ত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেখছি নিশ্চিন্তপুরবাসি কোন "শ্রী যথার্থ বাদিনঃ" লেখা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় আত্মসমালোচনার স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা আভাসিত হয়েছে। ভাষা অবশ্য অপূর্ণাঙ্গ, অস্ফুটবাক্ঃ—"যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বিষয়কর্মে নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতে হইলে সুতরাং তাহারদিগের বোধজনক ভাষা কহিতেই হয় কিন্তু স্নানাদি সময়ে ও স্বদেশীয় লোকের সহিত আলাপে সংস্কৃত কিম্বা তদনুযায়ী ভাষা কহেন এবং পূর্বপুরুষ রীত্যনুসারে ব্যবহার করেন। যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহারা স্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের ভেদ জ্ঞাত নহেন সুতরাং অভীষ্টমত ব্যবহার করেন।"[১]

কেবল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির জন্যই নয়, বিষয় বস্তুর দিক থেকেও লেখাটিতে ঐতিহাসিক কৌতূহল জমা হয়েছে। বাংলার রেনেসাঁসের যুগে পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাত এত বিচিত্র এবং আ-মূল ছিল যে, দৈনন্দিন ব্যবহারে ভাষা-প্রয়োগ বিষয়েও সংশয়-জটিলতা হয়েছিল দুর-পনেয়। এ-কালের মানুষের পক্ষে এ-তথ্য কৌতুককর মনে হবে। কিন্তু, সেই সংগে স্পষ্ট হবে আলোচ্য রেনেসাঁসের কালের অপূর্ব-জ্ঞাত জটিল জীবন-গ্রন্থির বিস্ময়কর স্বভাব।

প্রবন্ধে বয়ঃসন্ধি

নূতন যুগ ও জীবনের এই বিস্ময়-জটিলতা কাটিয়ে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-রাজেন্দ্রলালের মনন-চিন্তার পুষ্টি ও ঋদ্ধির উত্তর-ভূমিতে বাঙালির জীবন ও সাহিত্য যতই প্রাগ্রসর হয়েছে, বাংলা গদ্য রচনারও ততই ঘটেছে শক্তি-বিকাশ। সেই বিকাশ পথে বয়ঃসন্ধি-লগ্ন চিহ্নিত হয়েছে রাজনারায়ণ-ভূদেবের সচেতন প্রাবন্ধিকতায়।

রামমোহনের যুগ থেকে বাংলা গদ্যের ভাব ও ভাষায় ব্যক্তিত্বের ছাপ

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খন্ড।

সুচিহ্নিত হয়ে উঠেছিল। সে-যুগের ছিল একটা সুগঠিত বক্তব্য, আর তা বলার ছিল একটা বিশেষ ভঙ্গি,—Style। তাতে যুক্তির দুর্বলতা বা চিন্তার অস্বচ্ছন্দতা নিশ্চয় ছিল না। কিন্তু ছিল, ব্যক্তিত্বের অতি-স্পর্শ। ফলে, বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনার স্বভাবগত ভার-সমতা ছিল না। আমাদের আলোচ্য যুগের গদ্য রচনায় প্রতিবাদি-নিরপেক্ষ চিন্তা ও সংযত-গম্ভীর আত্মসমালোচন-ক্ষমতার প্রভাবে মনন হয়েছে সুগভীর, প্রকাশ সুগম্ভীর। এই গভীর গম্ভীর মনন-চিন্তান্বিত গদ্যকেই আজও প্রবন্ধ নামাঙ্কিত করা হচ্ছে।

প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণ

এই প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রাজনারায়ণ ছিলেন অন্যতম যুগন্ধর। আগে বলেছি, মধুসূদনের মত রাজনারায়ণও হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন,—তিনি ছিলেন মধুসূদনের সহপাঠী। বহির্বিশ্বের নবাবিষ্কৃত পরিচয়ের অপূর্বতা মধুসূদনের আবেগকে অনন্ত প্রসারী,—উদ্বেল করেছিল। ঠিক একই সময়ে সেই জীবন-লোক রাজনারায়ণকে আহ্বান করেছিল তার জ্ঞান-সমৃদ্ধির অতল-স্পর্শতায় অবগাহন করবার জন্যে। রাজনারায়ণ যুগের সে-দাবিকে চরিতার্থ করেছেন, তাই তিনি নিজেও চরিতার্থম্মন্য।

ব্যক্তি-পরিচিত

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুরা পরগণার বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। রাজ-নারায়ণের চরিত্রে আত্মোৎক্রমণের একটি অপূর্ব ক্ষমতা ছিল,—তাঁর মননের ছিল এক আশ্চর্য আত্ম-নিরপেক্ষতা। স্বভাবের নৈর্ব্যক্তিক ভার-সমতা তাঁকে কোনো বিষয়ে অতি-উচ্ছ্বসিত হতে দেয় নি; তাঁর রচনা, চিন্তা, বিচার এবং প্রকাশে সর্বত্র রয়েছে এক অনন্যপূর্ব যাথাযাথ্য ও মিতাচার। হিন্দু কলেজে পড়বার সময় যুগ-প্রভাবে তিনি মদ্যপায়ী ও অমিতাচারী হয়েছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে পরিমিত-পায়ী করার একান্ত চেষ্টা করেও হয়েছিলেন ব্যর্থ।[১] অথচ, পরবর্তীকালে তাঁর সামাজিক বিবেক বয়সের সংগে যখন পরিচ্ছন্ন হয়েছে, তখন থেকে সুরাপান প্রথার প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তিনি আ-জীবন। এ-বিষয়ে আত্মচরিতে রাজনারায়ণ যে বর্ণনা দিয়েছেন, বাংলা-গদ্যে আত্ম-নিরপেক্ষ সংযত-ভাষণের সে এক অপূর্ব নিদর্শন। রাজনারায়ণের গদ্য প্রবন্ধাবলীতেও ব্রাহ্ম আচার্যোচিত এই নৈর্ব্যক্তিতার সংগে, ইতিহাস-প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি যুক্ত হয়ে তাঁর গদ্য-রচনাকে অনায়াস-গতি সাবলীলতা দান করেছে। সেই সংগে তথ্যবহুল রচনাতেও অনুস্যূত হয়েছে নির্ভার প্রাঞ্জলতা।

১। দ্রষ্টব্য—আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু।

পূর্বে দেখেছি, দেশী এবং বিদেশী ভাষার সমুচিত প্রয়োগ বিষয়ে সংশয় সমাচার দর্পণের কোনো 'যথার্থদর্শী' লেখকের মননকে উদ্ব্যাজিত করেছিল। সেই চিন্তার ধারা পরিণততর হয়ে রাজনারায়ণের যুগে নূতন জিজ্ঞাসার অভ্যুদয় ঘটে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশী এবং বিদেশী ভাষার প্রাধান্য বিষয়ে এই সময়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। মাতৃভাষার পক্ষ সমর্থন করে রাজনারায়ণ লিখেছিলেন ঃ—"দেশীয় ভাষায় অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই কারণ বশতঃ উদয় হন; প্রথম কারণ মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের ন্যায়। মাতৃদুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয় পশুদুগ্ধ সেরূপ নহে, তেমনি মাতৃ ভাষার প্রেমার্দ্র আশ্রয়ে মনের ভাবসকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না।"১

ও রচনা-বৈশিষ্ট্য

চিন্তার প্রাঞ্জলতা, যুক্তির স্বচ্ছতা ও রূপ-চিত্রের যথোচিত্য এই আদর্শ প্রাবন্ধিকের মনন-চিন্তাকেও একই সংগে পরিব্যক্ত করে থাকে। শুধু তাই নয়, বক্তব্য বিষয়ের সংগে লেখকের অন্তরঙ্গতা-জনিত আবেগ-স্পন্দন রচনার অন্তর্লীন হলেও দুর্লক্ষ্য নয়। রাজনারায়ণের মনন ও চিন্তা এখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েছে।

সুমিত-সংযত আত্মস্থ এই ব্যক্তিত্বের স্পর্শ অন্তরঙ্গ বলেই নিবিড়। ভাবানুভূতির এই নিবিড়তা রাজনারায়ণের অনুচ্ছ্বসিত গদ্যভঙ্গিতেও ব্যক্তিত্ব-ধর্মী রচনার পূর্ব-পরিচয় সার্থকভাবে আভাসিত করেছে। বিবিধ প্রবন্ধের 'আশ্চর্য স্বপ্ন'-তে রাজনারায়ণ লিখেছেন,—"সে দিবস রাত্রে নিদ্রার পূর্বে বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। * * নিদ্রাযোগে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম; * * ।

ব্যক্তিত্ব-ধর্মরচনা

"বোধ হইল বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরেজেরা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেও এমন সুসভ্য হইয়াছে যে, পূর্বে পৃথিবীতে কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর ইংলন্ড বঙ্গদেশ হারাইবার সময় যে প্রকার সভ্য ছিল তাহাই রহিয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'আমার দুর্গোৎসবে'র জাগ্রৎ-স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। বঙ্কিমের জাগর-স্বপ্নের পূর্বসূরী এই সুপ্তি-স্বপ্ন। বঙ্কিমের জ্বালা, উচ্ছ্বাস ও কবিত্বের তীব্রতা নেই এখানে, তবু মিত-ভাষণ এবং আত্মগত আকাঙ্ক্ষার নিভৃত-যথার্থ বর্ণনে রচনাটি মর্মস্পর্শী হয়েছে। মনে

১। স্বদেশীয় ভাবানুশীলন—বিবিধ প্রবন্ধ।

হয়, প্রাবন্ধিক যেন কেবল একবারের মত শিল্পীকে লেখনীটি ধার দিয়েছিলেন।

বস্তুতঃ, রাজনারায়ণের সব রচনাই এই ধরণের আবেগাত্মক নয়। গুরু-গম্ভীর মননশীল রচনায় তাঁর লেখনী মন্ময়তা-নির্মুক্ত তদাত্মতার অনুশীলন করেছে। রাজনারায়ণ সেখানে ঋজু বলেই হয়ত কঠিনও ঃ—"জাতি-তত্ত্ব অর্থাৎ যে বিদ্যা মনুষ্য জাতিসকলের উৎপত্তি ও পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ভাষাতত্ত্ব অর্থাৎ যে বিদ্যা পৃথিবীস্থ ভাষা সকলের উৎপত্তি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করে, অশীতি বৎসর পূর্বে য়ুরোপ খণ্ডে এই দুই বিদ্যার সমধিক চর্চা ছিল বটে, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের যেরূপ শৃঙ্খলা ও যেরূপ নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা উচিত তাহা কিছুই ছিল না।"[১]

বক্তব্যকে যথাপরিমিত, যথাযথ ও প্রাঞ্জল করেও 'প্রকৃষ্ট বন্ধনা'বন্ধ করার সচেতন প্রয়াস থেকে এই ভাষার জন্ম। আর বলাবাহুল্য, সেই প্রয়াসের মূলে আছে প্রত্যক্ষ বিষয়-সচেতনা। সব কিছু মিলিয়ে, রাজনারায়ণ যুগপৎ প্রাবন্ধিক ও শিল্পী যদি না-ও হন; তবু বাংলা সাহিত্যের প্রথম সিদ্ধকাম প্রবন্ধ-শিল্পী।

তাঁর যুগ-প্রসিদ্ধ রচনাবলীর মধ্যে আছে ঃ—

(১) রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫, ১৮৭০)।

রাজনারায়ণের রচনাপঞ্জী

(২) ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৬, ১৮৬৭)।

(৩) আত্মীয় সভার বৃত্তান্ত (১৮৬৭)।

(৪) সেকাল আর একাল (১৮৭৪)।

(৫) হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের বৃত্তান্ত (১৮৭৬)।

(৬) বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮) ইত্যাদি।

প্রাবন্ধিক হিসেবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন আরো সচেতন,—আরো তীক্ষ্ন প্রখর। পারিবারিক প্রবন্ধ, (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৪) বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ-এর (১৮৯৪) গ্রন্থনামের বিচারেও প্রবন্ধ-বিষয়ে লেখকের বিশেষ অবধানতার পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু, ঐটুকুই সব নয়। রচনা-বিষয়ের অসংখ্য বৈচিত্র্য ও বাচনভঙ্গির অসংশয়িত পদক্ষেপে, ভূদেবের পরিবেশ-সচেতন মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা ও তাঁর বিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের পৌরুষ-দৃঢ় স্বভাব অকুণ্ঠ প্রকাশ পেয়েছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বর্তমান কালের পাঠকের অতি-আধুনিকতা-উদ্বেল মনের কাছে ভূদেব-

১। আর্য জাতির উৎপত্তি ও বিচার।

প্রতিভার ঐতিহাসিক মর্যাদা নিরপেক্ষ মূল্যায়নে উদ্ভাসিত হতে পারে নি। মধুসূদনের নির্বন্ধন মুক্তি-কামনার গগনচারী স্বপ্নাভিযান এ-কালের তরুণ পাঠককে বিস্ময়-গদ্‌গদ করে তোলে। সেই তুলনায় ভূদেবের মৃন্ময় ভিত্তি-নির্ভর, দৃঢ়-কঠিন আদর্শবাদ ও ঐতিহ্য-প্রীতিকে পরিহার করা হয় রক্ষণশীলতার নামে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, দূরযানিতামাত্র-ই অগ্রগতি নয়, কেন্দ্র-বদ্ধতামাত্রই নয় স্থানুত্ব। আগে বলেছি, রেনেসাঁসের মর্মমূলে পরস্পর-বিরোধী জীবন-প্রেরণার দ্বন্দ্ব-জটিলতা জনিত যন্ত্রণা-বোধ সহজে অনুস্যূত হয়ে আছে। এর সার্থক উদ্‌যাপন-পরিণতি সম্ভাবিত হতে পারে বিচিত্র-জটিলের বিচার-সম (Rational) সমন্বয়-সম্পূর্ণতার মধ্যে। এ-দিক্ থেকে রেনেসাঁসের জীবনাতুর একটি দিক্ যদি মধুসূদনের সার্থক অভিব্যক্তি পেয়ে থাকে, অপর দিক পূর্ণ ব্যঞ্জিত হয়েছে ভূদেবের মধ্যে। মধুসূদনে অনাগতের প্রতি রেনেসাঁস্-যুগের উৎকণ্ঠা উচ্ছ্বসিত মুক্তি পেয়েছে, ভূদেবের মধ্যে অতীত-ঐতিহ্যের পাষাণ-ভিত্তিটুকু অটুট দৃঢ়তার সংগে হয়েছে রচিত;—অনাগত জীবন-সৌধের এটি অপরিহার্য ভিত্তি।

ও বাঙালির রেনেসাঁস

ভিত্তিহীন জীবন-চূড়া যেমন মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে; ভূদেব-চেতনাহীন রেনেসাঁসের ধর্ম তেম্‌নি স্বপ্ন-কল্পনার আকাশে নিরাশ্রয়ে মাথা কুটে মরত বলে মনে করি। মধুসূদন ও ভূদেবের সম্মিলিত প্রতিভা বাংলার রেনেসাঁস-পরিণতির যুগ্ম-মূর্তিরূপ;—বয়ঃসন্ধি-সমুত্তীর্ণ যৌবনের মূল উৎস নিহিত রয়েছে এই মূর্তি-যুগ্মকের একাত্মতা বিধানে। মধুসূদনের স্বপ্ন-কল্পনার ভাব-নির্যাস, এবং ভূদেবের দৃঢ়-সংহত ব্যক্তিত্বের কঠিন সার-নিষ্কাণ করে গড়ে উঠেছে কবি-মনীষী বঙ্কিমের শিল্পি-স্বভাব। অতএব, মধুসূদন রেনেসাঁসের কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal force) হলে ভূদেব তার কেন্দ্রানুগ শক্তিরূপ (Centripetal force)। এই দুয়ের ভার-সমতার পরিণামেই বাংলা সাহিত্যের বিচার-সম (Rational) যৌবন-বিকাশ সার্থক হয়েছে।

হিন্দু কলেজে ভূদেবও মধুসূদন-রাজনারায়ণের সহপাঠী ছিলেন,—ছিলেন মধুসূদনের অন্তরঙ্গতম বন্ধুদের একজন। ছাত্র-মধুসূদনের কবি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য সহাধ্যায়ীদের মতই ভূদেব ছিলেন আশান্বিত উৎসুক। কিন্তু, ঐ পরিবেশে, অমন করে নিজের মনোজগৎকে প্রতিদিন উদ্বোধিত বিকশিত হতে দিয়েও তরুণ ভূদেব একদিনের জন্যও পদস্খলিত হন নি; ভারতীয় ঐতিহ্যের মহিমাবোধে অ-স্খলিত-চেতন ভূদেব একদিনের জন্য নিজ দৃঢ় আদর্শ-ভূমি থেকে হন নি বিচ্যুত। তা বলে, সংস্কারান্ধ গোঁড়ামির আতিশয্য ছিল না তাঁর মধ্যে। মধুসূদন অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে ভূদেবের বাড়িতে যেতেন, জলযোগাদির সংগে 'মধু' ভূদেবের মাতৃস্নেহ

ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু, ভূদেব একদিনও মধুসূদনের বাড়ি যান নি, 'মধু'-ও তাঁকে অনুরোধ করেন নি। এ-বিষয়ে ভূদেব বলেছেন,—"বোধহয় আমাদের বাড়ির ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ির ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়। এই জন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোনো দিন করে নাই।" অথচ "ক্লাসে আমি ও মধু এক সংগে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমায় না পড়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না।"১ অপার উদারতার সংগে এই তীব্র স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি, অকুণ্ঠ বন্ধু ও প্রতিভা-প্রীতির সংগে এই দৃঢ়-বলিষ্ঠ আদর্শ প্রত্যয়কেই বলেছি, রেনেসাঁসের কেন্দ্রানুগ (Centripetal) শক্তি।

ভূদেবের ব্যক্তি-স্বভাব

এ পথে ভূদেবের পূর্বৈতিহ্য তাঁর পক্ষে অনেকটা সহায়ক ছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ভূদেবের জন্ম হয়েছিল এক নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের পরিবারে; তাঁর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ছিলেন সেকালের একজন প্রখ্যাত পন্ডিত। বহু প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা ও টীকা রচনাদির ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠা সেকালে প্রায় অতুলনীয় হয়েছিল। বিশ্বনাথ আচারান্ধ ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে পান্ডিত্য জনিত উদারতা দূরপ্রসারী হয়েছিল। পিতার সমুদার পন্ডিত-ব্যক্তিত্বের সংগে প্রথম কয় বছরের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার প্রভাব যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষীয়তার প্রতি ভূদেবের শ্রদ্ধাবোধ আমূল হয়েছিল। সেই সংগে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অবিচল দৃঢ়তা। ফলে, সেকালের সহজে-বিচলিত-চিত্ততার দিনে ভূদেব আপন আদর্শবুদ্ধিতে ছিলেন অবিচল।

ও পূর্বৈতিহ্য

তাই বলে, আগে বলেছি, ভূদেবকে গোঁড়া বলা চলে না। হিন্দু কলেজের এবং যুগ-ধর্মের শিক্ষা তাঁর মধ্যে ব্যর্থ হয় নি। পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ-নামাবলী থেকেই বুঝব, সমকালীন বাংলা দেশে, পরিবার, সমাজ এবং সাধারণ আচার-আচরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দুরপনেয় সমস্যা-বুদ্ধি দেখা দিয়েছিল, ভূদেব তার প্রতি পর্যায়ে জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। অবশ্য, প্রায় প্রত্যেক স্থলেই অনিবার্য ভাবে তাঁর সমাধান প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যাদর্শের অনুবর্তী হয়েছে। তাহলেও ভূদেবের দৃষ্টি ও বিচারের মর্মানুসন্ধিৎসা স্থানে স্থানে বিস্ময়কর বোধ হয়। 'উদ্বাহ সংস্কার'-এর মানবিক ফলশ্রুতি সম্বন্ধে পারিবারিক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেনঃ—"মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর।" অথচ মানবসমাজে "স্বার্থ শূন্যতা বড়ই প্রশংসীয়।"

পারিবারিক প্রবন্ধ

১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।
২। সাহিত্যসাধকচরিতমালা—৪৩ দ্রষ্টব্য।

"মনুষ্য মনে যখন এই স্ব-বিসম্বাদী ভাব বিদ্যমান, তখন মনুষ্যের পক্ষে সুখী এবং সন্তুষ্ট হওয়া যে কেমন দুরূহ ব্যাপার তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হইতে পারে। উহা অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা সর্বদাই আপনার দিকে আকর্ষণ করিবে। অথচ সেই আকর্ষণের বশীভূত হইলেই আত্মগ্লানি আসিয়া আবার লাঞ্ছনা করিবে। উভয় দিকেই সংকট!

"বিবাহ-প্রণালী সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় দ্বারা মনুষ্যদিগকে ঐ বিষম সংকট হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। স্ত্রীপুরুষ দুইজন প্রণয়-সম্বন্ধ হইলে পরস্পরকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া থাকে, এবং সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে যে কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হইয়া যায়।"

ভূদেবের সামাজিক চেতনার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

কোনো সুমহৎ কল্পনা নয়, নভোলোক-চারী কোনো উন্নত আদর্শ-স্বপ্ন নয়। আটপৌরে জীবনের ব্যবহারিক আচরণের কেন্দ্রগত মানবধর্মের মূল স্বভাব ও পরিবার-বন্ধনের উৎসস্থিত মনস্তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষাটিকে সহৃদয় প্রাঞ্জলতা এবং স্পষ্ট ঋজুতার সংগে এখানে প্রকাশ করেছেন ভূদেব।

সামাজিক প্রবন্ধ

সামাজিক প্রবন্ধেও সমকালীন সামাজিক সমস্যার বিচিত্র আলোচনায় এইরূপ দূরদর্শন ও যথার্থ দর্শনের বহুল পরিচয় রয়েছে।

আচার প্রবন্ধ

আচার প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রে পুত্র ও পৌত্রদের উদ্দেশ করে ভূদেব লিখেছিলেনঃ—"দেশীয় পরম পবিত্র সদাচার পালন, ইহ এবং পারলৌকিক হিতসাধন-পক্ষে কিরূপ কার্যকরী, তাহার জ্ঞান বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সজ্ঞান ও সভক্তিক শাস্ত্র শিক্ষার ত্রুটিতে দেশ মধ্যে ন্যূন হইবার উপক্রম হইতেছে।"

ভূদেবের দেশীয় শাস্ত্র-নিষ্ঠা কত 'সজ্ঞান' ছিল তার পরিচয় ওপরে উদ্ধার করেছি। এই 'সজ্ঞানতা'ই তাঁর তীক্ষ্ণ-গভীর সন্ধানী দৃষ্টি, তাঁর ঋজু বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির উৎস। অন্য দিকে ভূদেবের 'সভক্তিকতা' তাঁর চিত্তমূলে একটি সানুরাগ শিল্প-স্বভাব উৎসারিত করেছিল। পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গপত্র প্রথম থেকেই এই অনুরাগ-উদ্বেল শিল্প-স্বাদে ভরপুরঃ—

"মন যেন কি চায়, পায় না—কি যে চায়, তা জানেই না। যাহারা শৈশবে আমাকে কোলে পিঠে করিত এবং আপনাদের বলিত, তাহারা ত অনেকেই নাই—যাহারা আছে তাহারাও থাকিবে না। পৃথিবী শ্মশানভূমি—এখানে থেকে কাজ কি?

"মনের এইভাব, এমত সময়ে একটি দেবীমূর্তি আমার সম্মুখীন হইল —আমার দুই চক্ষুতে চক্ষু মিলাইল—আমার হাতে হাত দিল—বলিল 'আমি তোমার'।

ভূদেবের শিল্প-স্বভাব

" 'আমার' আছে। তবে আমি একজন! আমি থাকিব, আমি করিব, আমি বাড়িব, আমি বাড়াইব। ইতি স্থিতি বিধায়িনী।"

আবার স্মরণ করি, এই সূচনা 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর নয়,—পারিবারিক প্রবন্ধের। সেই সংগে একথাও স্মরণ করি যে, ভূদেবের এই ঋজু, মর্মভেদী, তির্যক্ দৃষ্টির সংগে তাঁর ভাব-কল্পনার সানুরাগ স্পর্শ সমন্বিত হয়েই 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' এবং 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র মত উপন্যাস-শিল্পের জন্ম দিয়েছে। বাংলা ভাষায় টেকচাঁদ নয়, ভূদেবই প্রথম যথার্থ-নামা ঔপন্যাসিক। উপন্যাস কলার ঐতিহাসিক স্বরূপ ও উদ্ভবের স্বভাব নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। এখানে কেবল বলে রাখি, বিচারসম (Rational) তথ্যানুসন্ধিৎসা এবং বাস্তব পরিবেশের যথার্থ দর্শনের ক্ষমতাই উপন্যাস রচনার একমাত্র উপাদান নয়। সার্থক ঔপন্যাসিকের পক্ষে মানস-আবেদনের বিশুদ্ধতা এবং অখণ্ডতাও একান্ত প্রয়োজন। বহু-বিচিত্র, জটিল, স্ববিরোধী জীবনের সমস্যাকে সর্বাবয়বে পূর্ণ শিল্পরূপান্বিত করে তুল্‌তে পারে কেবল ঐ সানুরাগ জীবন-বোধই। ভূদেবের মধ্যে এই উভয়বিধ গুণাবলীর যুগপৎ সমন্বয় তাঁর মধ্যে সার্থক ঔপন্যাসিকের পূর্বসম্ভাবনাকে পূর্ণব্যক্ত করে তুলেছিল। পরবর্তী আলোচনায় দেখব, ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ভূদেবেরই উত্তরসূরী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থ পরিচয় দিয়ে প্রথমবারের বিজ্ঞাপন-এ ভূদেব লিখেছিলেন,—"ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধ নাই।

"ইংরেজিতে 'রোমান্‌স্ অব হিস্‌ট্রি' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া সফল স্বপ্ন নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। অঙ্গুরীয় বিনিময় নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"

১। সফলস্বপ্ন

সফল-স্বপ্ন গল্পে আছে একটি অসম্ভব নৈশস্বপ্নের সফলতার বর্ণনা। একজন পথিক সহজাত জীবপ্রেম, প্রাণান্তকর সত্য-নিষ্ঠা ও আজীবন কর্তব্য সাধনের পরিণামে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে রাজমন্ত্রী এবং আরো পরে রাজকন্যার সঙ্গে পূর্ণ রাজত্বলাভ করেছিল, তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই ক্ষুদ্র

গ্রন্থিকায়। নীতি-নিষ্ঠা, ভগবৎ-প্রেম ইত্যাদির সঙ্গে কিঞ্চিৎ অলৌকিকতার ছাপও রয়েছে গল্পাংশে। বাস্তব অংশের বর্ণনাও স্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে দুর্গেশনন্দিনীর পূর্ব-ধ্বনি স্পষ্ট ঝঙ্কৃত হয়েছেঃ—"একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গন্ধার দেশে নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দীনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণনিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুত রসের আস্পদ হইয়া আছে।"

দ্বিতীয় কাহিনী অঙ্গুরীয় বিনিময় ঔরঙ্গজীব-কন্যা রোসিনারা ও শিবাজীর প্রণয় মূলক। ঔরঙ্গজীব পুনঃ পুনঃ সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করছিলেন। সেই অপচেষ্টা রোধ করবার জন্যে শিবাজী কৌশলে ঔরঙ্গজীব-কন্যা রোসিনারাকে অপহৃত করে, পর্বত-বদ্ধ এক দুর্গে প্রেরণ করেন। চতুর্দিকে পার্বত্য প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য সেখানে ক্ষণে ক্ষণে রোমাণ্টিক স্বপ্নাবেশ রচনা করত। বাদ্‌শাহ-কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় সকলেই ছিল সদা সচেতন,—সর্বদা সম্ভ্রমনত। বিশেষ করে, দুর্গরক্ষক সেনাধ্যক্ষের সহৃদয়তা ও সশ্রদ্ধতা, ও সেই সংগে তার পৌরুষ-দৃপ্ত মধুর ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য রাজকুমারীর বন্ধন-জীবনের দুঃখকে অবলুপ্ত দেয় করে। ক্রমে উভয়ের মধ্যে নবানুরাগের রক্তিম সৌন্দর্য বিকশিত হতে থাকে। বলাবাহুল্য, দুর্গরক্ষক ছিলেন সেনানীর ছদ্মবেশে শিবাজী। এই ছদ্মবেশের পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না। রাজকুমারীর কোন অসুবিধা বা অমর্যাদা হচ্ছে কিনা এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষে সুনিশ্চিত হবার জন্যই প্রথমে তিনি দুর্গে আস্‌তেন। ছদ্মবেশে আসতেন পিতৃ-দ্রোহীর প্রতি রাজকন্যার সহজ বিরূপতাকে অতিক্রম করবার উদ্দেশ্যে। ক্রমে উভয়পক্ষের প্রণয়-বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। তখন শিবাজীর পরিচয় জেনেও তাকে বরণ করতে ঔরঙ্গজীব-কন্যা ছিলেন অকুণ্ঠিতা;—শিবাজীর ব্যক্তি-স্বভাবের উদাত্ত-মহিমা তখন তাঁর কাছে ছিল মুক্ত,—নিরাবরণ।

২। অঙ্গুরীয় বিনিময়

তবু, পরিণামে কাহিনীটি অশুভশেষ হয়েছে। শিবাজীর প্রেরিত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে রোসিনারা উত্তর লিখে পাঠিয়েছিলঃ—

"...আমি আর অধিক কি বলিব,—তুমিই আমার স্বামী। তাহার চিহ্নস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম,—অতএব অদ্যাবধি আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কিন্তু, আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ

হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে—এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামিসহবাস সুখে বঞ্চিত করিলাম। যদি বল, আমাকে লইয়া রাজ্য-ভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না—সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু মনে করিয়া দেখ, শুদ্ধ রাজা হওয়ামাত্র তোমার মনের মানস নহে। অতএব, আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই।—একান্ত অধীনা রোসিনারা।”

লক্ষ্য করলে দেখব, ভারতীয় ইতিহাসের অতীত প্রচ্ছদে ভূদেব এই উপন্যাসে সেকালের পক্ষে একটি ‘আধুনিক’ জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রকট করে তুলেছিলেন। প্রেম এবং বিজাতীয়তা,—একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মগত বিজাতীয়তার দ্বন্দ্ব যুগপৎ সুস্পষ্ট হয়েছে উপন্যাস-কাহিনীর অন্তর-বাইরে। বহিরঙ্গে এই দ্বন্দ্বের উৎস শিবাজী-ঔরঙ্গজীবের রাষ্ট্র-বৈর। অন্তরঙ্গে আছে পিতৃশত্রু হিন্দু-রাজার প্রতি ক্রমশঃ অনুরাগ সঞ্চারের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গ্রন্থি মোচন। নারীর স্বয়ং-স্বতন্ত্র প্রণয়াধিকার ও সমাজ-পটভূমির বিরোধিতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনীতে উনিশ শতকের জাগ্রত জীবন-দ্বন্দ্বের গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে। গল্পের গ্রন্থনে যেমন উপন্যাসোচিত পরিণতিবোধ ও সমস্যা-সচেতনতা রয়েছে; তেমনি তার পরিণতি নির্দেশে আছে, দুর্বল হলেও অখণ্ড জীবন-বোধের নিশ্চিত প্রেরণা।

ও ঔপন্যাসিক জীবনচেত্যা

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস-এর রচনাকাল ১৮৯৫ খ্রীঃ। ভূদেবের কোন আত্মীয় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখছিলেন। তাতে তৃতীয় পাণিপথ-যুদ্ধের বর্ণনা পড়ে লেখক ভাব-বিচলিত বিহ্বলতা প্রাপ্ত হন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল,—“ঐ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত।” নিদ্রাবশে সে রাত্রে লেখক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাত্রিশেষে নিদ্রোত্থিত হয়ে শিয়রে “কয়েকখণ্ড” লিখিত কাগজ দেখ্‌তে পান। সেই লেখাই স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস। গ্রন্থটি প্রথমে এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভূদেবের অপ্রধান গদ্য রচনাগুলির অনেক কয়টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের পরে ভূদেব ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্। এই সব রচনার মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব-এর (১৮৫৬) বিজ্ঞাপন-এ জানানো হয়েছিল,—“এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের

অপরাপর রচনা

অধ্যাপকগণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। ইহার প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকবর্গের কর্তব্যতা তথা কি প্রকার শিক্ষা এইক্ষণে এতদ্দেশীয় বালকদিগের প্রতি বিহিত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে।”

ছাত্রগণের জন্য লিখিত গ্রন্থমালার মধ্যে আছে,—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫৪, ১৮৫৯), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২) ইত্যাদি। পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬) গ্রন্থে ব্যাস-মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে “হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য” বিবৃত হয়েছে।

ভূদেব-প্রতিভার ফলশ্রুতি

এ-পর্যন্ত আলোচিত ভূদেবের রচনাবলীতে একদিকে অনুভব করেছি, যুক্তি-বিচারনিষ্ঠ গুরুগম্ভীর জীবন-জিজ্ঞাসা। অন্য আর একদিকে, অন্ততঃ অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসে রয়েছে সমস্যা-সঙ্কুল জীবন-বোধের মর্মানুগতা। এই দ্বিতীয় প্রকার রচনাতে অতীতের পটভূমি জীবন-বোধের আধার ছিল বলে-ই এর জীবনাবেদন সমসাময়িক কালে অনেকটাই পরোক্ষ হয়ে পড়েছিল।

আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্যের আর একটি পৃথক ধারার কথা বলেছি, তাতে নব-বিকাশমান স্ববিরোধ এবং অন্তর্জ্বালা কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও কোথাও কৌতুকের গুরু-লঘু আঘাতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

সমকালীন জীবন-সমস্যার অস্ফুট লঘু আঘাত

এ-ধরণের রচনার প্রথমতম পরিচয় এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে সমাচার দর্পণের পাতায়। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকায় যথাক্রমে বাবুর উপাখ্যান, শৌকীন বাবু, বৃদ্ধের বিবাহ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বৈষ্ণব ও বৈদ্য সম্বাদ প্রভৃতি-বিদ্রূপ ও হাস্য রসাত্মক চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন,—“এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই (বন্দ্যোপাধ্যায়) রচনা।”[১] অন্ততঃ এ-ধরণের পৃথক গ্রন্থ-রচনার প্রথম গৌরব যে ভবানীচরণের, তাতে সন্দেহ নেই। কাল-বিচারে ভবানীচরণ বর্তমান বয়ঃসন্ধিকালের পূর্ববর্তী। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক, বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি-যুগের শিল্পী ইনি। বাংলা সাময়িক পত্রের আলোচনায় সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক ভবানীচরণের ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্ধার করেছি। কিন্তু, গদ্য লেখক ভবানীচরণকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই করেছি যথাকাল-চ্যুত। কারণ, আমাদের ধারণা, ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক বাংলা গদ্যের রচয়িতা হিসেবে ভবানীচরণ যে-পরিমাণে তাঁর সমকালীন যুগ-চেতনার পরিবাহক, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে তিনি আলোচ্য যুগধর্মের ঐতিহাসিক পূর্বসূরী।

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৪নং।

ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণকে "বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক" বলে অভিহিত করেছেন। যুগ-চেতনার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে দেখব, কথা-সাহিত্যের প্রবর্তনা বাংলা গদ্যে এই বয়ঃসন্ধি-লগ্নেই আভাসিত হতে আরম্ভ করেছে। ভূদেবের বিচার-সম সশ্রদ্ধ জীবন-চেতনা এবং প্যারীচাঁদ (টেকচাঁদ), কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) প্রভৃতির বিচার তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গ-কষা-তপ্ত মহাজীবন-বোধ ক্রম-পরিণত হয়ে বঙ্কিমের হাতে অখণ্ড উপন্যাস-কলার জন্ম সম্ভাবিত করেছিল। বাংলা সাহিত্যে সে হচ্ছে, বয়ঃসন্ধি-সমুত্তীর্ণ যৌবন-বিকাশের যুগ। আলোচ্যকালে তার অঙ্কুরোদ্গমের মূল সূত্রটি ধারণ করে রেখেছেন ভবানীচরণ।

ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীচরণের ব্যঙ্গরসাত্মক রচনার ফলশ্রুতি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ—"নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের যুগে তিনি বাংলা ভাষায় যে লালিত্য ও রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস লিখিত হইলে সে সংবাদ বাঙালির অগোচর থাকিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণ সামাজিক চিত্র রচয়িতা হিসাবে তাঁহার নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়।"১

ভবানীচরণ-প্রতিভা

বর্তমান অধ্যায়ের সূচনায় বলেছি, সমকালীন সমাজ-জীবন প্রসঙ্গে আত্ম-বিচারণা মূলক ব্যঙ্গ-গদ্য রামমোহন-বিদ্যাসাগরও লিখেছিলেন। কিন্তু সে রচনায় পরিহাসের চেয়ে জ্বালা বেশি ছিল, ব্যঙ্গের চেয়ে প্রবল ছিল প্রতিপক্ষ-নিরোধের অতি-আগ্রহ। ফলে, ব্যক্তি সম্পর্কের অতি তাড়নার প্রভাবে ঐসব রচনায় সরসতার চেয়ে প্রতপ্ততাই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। সেকালের সমাজ-নায়ক, সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ হলেও ভবানীচরণের ব্যঙ্গ রচনায় ব্যক্তি-চিত্ত-জ্বালার এই তীব্রতা অনুভূত হয় না। টেকচাঁদ-হুতোমের রচনাতেও সে যন্ত্রণা-তীব্রতা তির্যক পরিহাসের স্মিত মন্দগতি লাভ করেছে। এই নিস্তাপতা কালগত দূরাগতির ফল; তাতে দাহ যত কমেছে, চিত্রের বাস্তবতা ও রস-তীব্রতা তত হয়েছে ঋজু ও প্রাঞ্জল। ভবানীচরণের ব্যঙ্গ-রসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই স্তিমিত-দাহ পরিহাস-বিদগ্ধতার পরিচয় স্মিত-মন্দ সাচ্ছন্দ্যে প্রথম বিকশিত হয়েছে। এই অর্থেই তিনি পূর্বযুগ-ধুরন্ধর হয়েও, বাংলা গদ্যে আলোচ্য যুগের পূর্বসূরী।

ও বয়ঃসন্ধির পূর্বাভাস

ভবানীচরণের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কলিকাতা কমলালয় (১৮২৫)।

১। ঐ।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন,—"পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হন," তাঁদের জ্ঞানসৌকর্যের জন্য "কলিকাতা মহানগরের স্থূল বৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থকরণে" লেখক প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কলিকাতা কমলালয়ে ব্যঙ্গের তীব্রতা নেই, কিন্তু ঐ প্রথম রচনাতেই সমকালীন জীবন-রূপের যথার্থ-দর্শনের ক্ষমতা পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে; সেই সংগে Wit-এর দীপ্তিও হয়েছে আলোকিত।—"অমুক অমুক বাবু কত প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ করিয়াছেন আর অনেক ভদ্রলোকের সন্তানেরা অগ্রে সংস্কৃতানুযায়ী বাংলা ভাষা ও লেখাপড়া অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজি ও পার্শি বিদ্যা শিক্ষা করেন। অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।"

কলিকাতা কমলালয়

প্রমথনাথ শর্মণ-এর ছদ্মনামে নববাবু বিলাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু আসলে ঐটিই ভবানীচরণের "প্রথম রচনা।"[১] মনে রাখতে হবে, নববাবু বিলাসের উদ্ভবকাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। হিন্দু কলেজের প্রবর্তিত রেনেসাঁসের জীবনালোক-উজ্জ্বল ভিত্তি তখনো রচিত হতে পারে নি। তখনো নগর-বাংলার সমাজ জীবনে চলেছে হঠাৎ-রাজাদের নিরন্ধ্র অন্ধকারময় রাজত্ব। নববাবু বিলাসে অজ্ঞানান্ধ অর্থ-মদমত্ত হঠাৎ বাবুদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নৈতিক গ্লানি-চিত্রকে ভবানীচরণ তির্যক ব্যঙ্গরসে কষাহত করেছেন।

নববাবু বিলাস

দূতীবিলাস (১৮২৫) এবং নববিবি বিলাস (১৮৩১?) নববাবু বিলাসের-ই পরিপূরক। প্রথমটি পদ্য ছন্দে রচিত, দ্বিতীয়টি গদ্যে। নববিবি বিলাস সম্বন্ধে লেখক নিজেই গ্রন্থমধ্যে বলেছেন,—"যদ্যপি নববাবু বিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি। সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই। এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে, প্রয়াসপূর্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।" 'নববিবি বিলাস'-এ লেখক ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। নববাবু রচনার পরিচয় নিম্নে উদ্ধার করি,—এটি খোসামুদে মোসাহেবদের উক্তি ঃ—

দূতীবিলাস নববিবি বিলাস

"অমাত্য বর্গরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ দৃষ্টচর প্রায় নহে,...আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয়।"

১। ঐ।

ভবানীচরণের অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে শ্রীগয়া তীর্থ বিস্তার (১৮৩১) ও আশ্চর্য উপাখ্যান (১৮৩৫) পদ্যে রচিত।

অপরাপর রচনা

আলোচ্যকালের জীবন-রূপের প্রথম ব্যঙ্গ-চিত্র-রচয়িতা হিসেবে প্যারী-চাঁদ মিত্র, তথা টেকচাঁদ ঠাকুর একদা অতি-প্রখ্যাত হয়েছিলেন। সে সংগে দৈনন্দিন জীবনানুসারী গদ্যরীতির প্রথম প্রবর্তয়িতা, এমন কি, প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখক হিসেবেও প্যারীচাঁদ এতাবৎ অতি-মূল্যায়িত হয়ে আসছেন। তাঁর এই সমস্ত খ্যাতির একটি মাত্র উৎস হচ্ছে গদ্য নক্সা অলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)।

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪ খৃীষ্টাব্দে কলকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম হয়েছিল, তাঁর পিতার নাম ছিল রামনারায়ণ মিত্র। প্যারীচাঁদ প্রধানতঃ জ্ঞানবীর ছিলেন এবং কৃষিবিজ্ঞান, প্রেততত্ত্ব ও 'থিয়োসফি'তে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইংরেজি ও বাংলায় লিখিত বহু প্রবন্ধ ও পুস্তকে প্যারী-চাঁদের এই জ্ঞানানুরাগের পরিচয় আছে। তাঁর বাংলা প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে কৃষিপাঠ (১৮৬১), যৎকিঞ্চিৎ (ঈশ্বর উপনিষদাদি বিষয়ক আলোচনা—১৮৬৫), ডেবিড্ হেয়ারের জীবন-চরিত (১৮৭৮) ইত্যাদি বিখ্যাত। রামারঞ্জিকা (১৮৬০) অভেদী (১৮৭১), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০) বামাতোষিণী (১৮৮১) ইত্যাদি কথোপকথন ও গল্পমূলক রচনা মূলতঃ নীতি বিষয়ক। গীতাঙ্কুর ব্রহ্ম-বিষয়ক গানের সমষ্টি। প্যারীচাঁদের ব্যঙ্গাত্মক গদ্য-রচনার সংখ্যামাত্র দুটি,—'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)।

ও রচনাবলী

আগে বলেছি, বাংলা সৃজনমূলক সাহিত্য, তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ আজ অবিস্মরণীয় কেবল ঐ একখানি গ্রন্থের জন্য;—আলালের ঘরের দুলাল তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে যে তিন বিষয়ে প্যারীচাঁদের ঐতিহাসিক অনন্য-পূর্বতার দাবি করা হয়, তার প্রথমটির অ-যথার্থতা ভবানীচরণ সম্বন্ধীয় আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। এমন কি, সম সাময়িক স্বয়ং রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে প্যারীচাঁদের গ্রন্থের আলোচনা করে প্রতিপন্ন করেন,—"ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবু বিলাস।"[১]

আলালের ঘরের দুলাল

কেবল সমাজ-চিত্রের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনেই নয়, গল্পের দিক থেকেও 'আলাল' নববাবুবিলাসের কাছে ঋণী। নববাবুর কাহিনী-সার রাজেন্দ্র-

১। দ্রষ্টব্য ঐ।

লালের ভাষায়,—"পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে কি পর্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রাঞ্জলরূপে বর্ণিত হইয়াছে।" আলাল-এর বিষয়বস্তুতেও বাবুরামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র মতিলালের জীবনে একই ধরণের বিড়ম্বনা ঘটেছিল। কিন্তু, প্যারীচাঁদের গল্পের একটি ইতিবাচক দিকও ছিল,—সেটি বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় পুত্র "রামলালের উত্তম চরিত্র হওনে"র কাহিনী। মাতার অতি-লালন, শিক্ষাবিষয়ে পিতার দৃষ্টিহীনতা ও সংগদোষে মতিলাল দুশ্চরিত্র, মদ্যপ এবং আত্ম-পরনাশী হয়ে ওঠে। কিন্তু, বরদাবাবুর মত উচ্চশিক্ষিত উদার-প্রসন্নচিত্ত আদর্শবাদী শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্যে রামলাল সার্থক-সুন্দর জীবন-ধর্মের মূর্তরূপ ধারণ করে। মতিলাল সহ বাবুরামবাবুর অসহায় পরিবারকে সে-ই নিজের চরিত্র-বৈভবে পরিণামী সর্বনাশ থেকে উদ্ধার করেছিল। এখানে প্যারীচাঁদ ভবানীচরণের চেয়ে একধাপ প্রাগ্রসর। আর, সেটুকু কালের হাতের দান। হিন্দু কলেজের বিপ্লব-রচনা-প্রয়াস ততদিনে সার্থক হয়েছে, নাগরিক বাংলার দিকে দিকে নব-শিক্ষা-পূত আত্ম-প্রবুদ্ধ নবীন বাঙালি ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘট্‌ছে। সেই সংগে জেগে উঠেছিল নবাদর্শ-মহিম নূতন আশাবাদ। ভবানীচরণ বাঙালি জীবনের নিরন্ধ্র অন্ধকারে আঘাত করে অসাড় চিত্তকে জাগাতে চেয়েছেন। প্যারীচাঁদ বয়ঃসন্ধির প্রত্যয়ালোকের দীপ্ত যুগে আঘাতের সংগে আঘাত-প্রবুদ্ধ মনের জীবন্ত আদর্শও সৃষ্টি করেছেন।

ও নববাবুবিলাস

'আলালের ঘরের দুলাল' সম্বন্ধে দ্বিতীয় দাবি, এটি বাংলাভাষার প্রথম উপন্যাস। পূর্বোদ্ধৃত আলোচনার অপরাংশে রাজেন্দ্রলাল মিত্র নববাবু-বিলাসকে উপন্যাস নামে অভিহিত করেছিলেন। আলালের ঘরের দুলালের দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকায় এই গ্রন্থটিকেও উপন্যাস নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১] এই সংগে প্রস্তাব, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিশেষণেও গ্রন্থটিকে বিশেষিত করা হয়েছে। কিন্তু, এ-সব ক্ষেত্রে উপন্যাস শব্দটি ইংরেজি 'নভেল' শব্দের সচেতন প্রতিরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। উপন্যাস অর্থে এখানে "অলীকবচন", "অস্বাভাবিক কল্পিত উপাখ্যান, উপকথা, গল্প"[২] ইত্যাদিই বোঝানো হয়েছে। বিশেষভাবে, কল্পিত-গল্পের অর্থ-দ্যোতনাই এখানে সমধিক। একালেও, 'আলাল'-প্রসঙ্গে নভেল অর্থে উপন্যাস শব্দের প্রয়োগ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অনবধানের ফল বলে মনে করি। আলালের উপন্যাস (নভেল্‌)-গুণ সম্বন্ধে প্রথমেই তার কাহিনীগত

'আলাল'-এর উপন্যাস গুণ

১। ঐ।
২। বঙ্গীয় শব্দকোষ।

সুপরিণতির কথা বলা হয়ে থাকে। এদিক থেকে, গল্প-মাত্রেরই একটি করে সমাপ্তি আছে। কিন্তু, সমাপ্তিমাত্রই সুপরিণতি নয়। কাহিনীর বিভিন্নমুখী বৈচিত্র্য-জটিলতা যখন অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত হয়, কেবল তখনই উপন্যাসের সার্থক পরিণাম লাভের সম্ভাবনা হয় লক্ষণীয়। উপন্যাসের পরিণতির জন্য অন্ততঃ আধুনিক জীবন-বোধের অ-খণ্ডতা অপরিহার্য বলে মনে করি। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে সাহিত্য-ইতিহাসের জিজ্ঞাসা,—সেই অখণ্ড পরিণাম আলালের গল্পে আছে কী? মতিলাল ও রামলালের দুটি বিপরীত স্বভাব-যুক্ত চরিত্র-কথাকে একেবারে শেষে এনে একত্রবন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু, সে ত অভিনয়-শেষে রঙ্গমঞ্চে কুশীলবদের একসংগে দাঁড়িয়ে নমস্কার করার মত! আগাগোড়া বাবুরাম-মতিলাল-কাহিনী ও বরদাবাবু-রামলাল-কথা পৃথক-বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদের পৃথক পৃথক জীবন-ঘটনার বর্ণনাতেও কোনো অন্তর্বন্ধ সংযোগ নেই। আগাগোড়া বর্ণনাটি যেন একই জীবনের কতকগুলি পৃথক পৃথক ঘটনার ছবি,—নক্সা!

কাহিনী

আলাল প্রসঙ্গে সার্থক চরিত্রায়ণের কথাও ওঠে! কিন্তু, উপন্যাসের চরিত্র বলতে কি বুঝব? অন্ততঃ পৃথক ব্যক্তিত্ব-লক্ষণে সুচিহ্নিত একটি স্বতন্ত্র জীবন-পরিচয়কেই নয় কী? কঠোপনিষদে 'নচিকেতা'র চরিত্র আছে। সে কতকগুলি তত্ত্বকথার বাঙ্‌মূর্তি। তেমনি এই চরিত্রগুলিও কতিকগুলি সদসৎ ঘটনা বর্ণনার নামময় মাধ্যম। আলালের কোনো চরিত্রেই ব্যক্তিত্ব-লক্ষণ-এর (Element of Personality) সঞ্জীবন-শক্তি আছে কী;—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-র (Individuality) ত প্রশ্নই ওঠে না। অথচ, বঙ্কিম পূর্ব বাংলা সাহিত্যেও এই সব গুণাবলী একেবারে অনুপস্থিত ছিল না,—তার প্রমাণ অংগুরীয় বিনিময়, তার প্রমাণ স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

চরিত্র

আসলে আলালের ঘরের দুলাল-ও বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক সামাজিক নক্সা। জটিল-বিচিত্র গ্রন্থিবন্ধ জীবন-স্বভাবকে প্রাণ-স্পন্দিত অখণ্ডতায় তুলে ধরবার মত গভীর উপলব্ধি প্যারীচাঁদের ছিল না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জ্ঞানযোগী; স্রষ্টা নন,—দ্রষ্টা। আর ভূয়োদর্শনের ব্যাপারে প্যারীচাঁদের যে কোথাও ত্রুটি ছিল না, তার প্রমাণ আছে গ্রন্থটির প্রায় প্রতি পত্রে। কল্‌কাতার সমকালীন শিক্ষাবিভ্রাটের পরিচয় প্যারীচাঁদ নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছেন,—"প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না—ভারি ভারি বহি পড়িবার অগ্রে সহজ সহজ বহি ভালরূপে বুঝিতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান হইত না—

'আলাল' উপন্যাস নয়—নক্সা

অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল,—বুঝুক বা না বুঝুক জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কি কি শিক্ষা করাইলে উত্তরকালে কর্মে লাগিতে পারিবে তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত স্কুলে যে ছেলে পড়ে তাহার বিদ্যাশিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।”

তথ্যবর্ণনার খুঁটিনাটি ও আদর্শ শিক্ষার এই তথ্য-ঋদ্ধ প্রাসঙ্গিক বর্ণনার একই অংশে অযোগ্য মূর্খ-শিক্ষকের বিবরণ কৌতুককর হয়েছে,—"বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস্ সাহেবের সোনার কাটি রূপার কাটি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড় মানুষের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে, না হবে কেন? সে তো ছেলে নয়, পরশ পাথর! স্কুলের উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কিনা, সন্দেহ। এ কথা প্রকাশ পাইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল যখন পড়াইতেন —মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ডিক্সনেরি দেখ। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটা কুটি করিতে হয়; সব বজায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম শব্দ কাটিয়া কার্য লিখিতেন—ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমরা বড় বেআদব, আমি যাহা বলিব, তাহার উপর আবার কথা কও?”

অতএব দেখছি,—কি সমকালীন জীবনধারার যথার্থ-দর্শনে, কি তার কৌতুক-বর্ণনে প্যারীচাঁদ ছিলেন সে-যুগের উৎকৃষ্ট এক নক্সাকার।

ভাষার দিক থেকেও প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব অতি-মূল্যায়িত হয়েছে বলে মনে করি। একদা তাঁকে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের বন্ধন-মুক্তির অগ্রদূত রূপে কল্পনা করা হয়েছিল। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করি;—"আমি এমন বলিতেছি না যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু, উহাতেই প্রথম এ বাঙলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ।”[১]

ভাষা-কৃৎ প্যারীচাঁদ

প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে ঐটুকুই একমাত্র সত্য ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও

১। বাঙালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান।

ঐ একই প্রবন্ধে লিখেছিলেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এইরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।" তাহলেও, বাংলা গদ্যের 'সাধু' (chaste) রূপ রচনার অতি উৎসাহে অনেকেই সেকালে ভাষাকে অতি মাত্রায় তৎসম শব্দ-সর্বস্ব করে তুল্‌ছিলেন। প্যারীচাঁদ সদলে সেই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তৎপর হন। তাঁর আন্দোলনের সব চেয়ে বড় ফলশ্রুতি,—সাহিত্যিক গদ্যকে জীবনের সান্নিধ্যবদ্ধ করার অতি-আধুনিক আকাঙ্ক্ষা তাতে অংকুরিত হতে আরম্ভ করেছিল। প্যারীচাঁদকে প্রমথ চৌধুরীর পূর্বসূরী বলব না কিছুতেই। তবু, মনে হয়, তিনি হয়ত ছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেই ধারারই পূর্বচ্ছায়া মাত্র।

প্যারীচাঁদ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্যারীচাঁদের ভাষাবোধ পরিচ্ছন্ন ছিল না। তাই, কি ঠক্‌চাচার মুসলমানী শব্দ-বহুল সংলাপে কি বর্ণনীয় ভাষায়, কোনো স্থলেই সংযত সুমিতির পরিচয়-সুলভ নয়। যেমন সেকালের জীবনচিত্র নিয়ে, তেমনি ভাষা নিয়েও লঘু কৌতুক করে গেছেন প্যারীচাঁদ। অবশ্য সে কৌতুক তাঁর গভীর আদর্শবাদ ও গঠনমূলক জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বারা ছিল একান্ত অনুপ্রেরিত।

প্যারীচাঁদের ভাষায় অপরিচ্ছন্ন অপরিমিতি

বস্তুতঃ, প্যারীচাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা নূতনতার ভাব-রূপে পূর্ণতা লাভ করেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে। যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনবান ও সংস্কৃতি-পোষক সিংহ পরিবারে কালীপ্রসন্নের জন্ম হয় সম্ভবতঃ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে;—তাঁর পিতার নাম ছিল নন্দলাল। পিতামহ ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-ডাইরেক্‌টার জয়কৃষ্ণ সিংহ। বংশগত ঐতিহ্যের অনুসরণে কালীপ্রসন্ন-ও সেকালের সমাজ সংস্কৃতিমূলক প্রগতির অগ্রবাহী হয়েছিলেন। বাংলা দেশে মধুসূদনের কবি-প্রতিভা প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন লাভ করেছিল কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভায়। নীল-দর্পণের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করার দরুণ পাদ্রি লং-এর এক হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল; কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ আদালতে সেই টাকা পেশ করে লং-কে মুক্ত করে আনেন। কালীপ্রসন্নের সমাজ-হিতৈষণা ও সমাজ-সচেতনার বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনের আরো উল্লেখ কেবল গ্রন্থকলেবরই বৃদ্ধি করবে। তাঁর সহৃদয় ব্যক্তিত্বের মৌল স্বভাব উদ্ধৃত তথ্য দুটি থেকেই পরিস্ফুট হওয়া উচিত। কালীপ্রসন্নের এই সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রকাশ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা।' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'নক্সা'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, পরে দুইভাগ একত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

এই গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সচেতনভাবে নক্সা কথাটি ব্যবহার করেছিলেন; আর সেই উপলক্ষ্যে বাংলা সাহিত্যে নূতন আঙ্গিক প্রবর্তনের কৃতিত্বও দাবি করেছেন,—"আজ কাল্ বাংলা ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিশ লুচীর ময়দা। তৈইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তৈইরি করে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিশ বাঙালি ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্ছেন; * * * সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাংলা ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেশির ভাগই অ্যাক্‌চেটে, কাজে কাজেই এই নক্‌সাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো। কথায় বলে 'একজন বড়মানুষ, তারে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো দ্যাখাবার জন্য একজন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নূতন নূতন ভাঁড়ামো করে বড়মানুষ মহাশয়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছুদিন যায়, একদিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা-মুটে ভাড়া করে বড়মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড় মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাঁকা-মুটের ওপরে বসে আসতে দেখে বল্লেন, ভাঁড়! এ কি হে? ভাঁড় বল্ল ধর্মাবতার আজকের এই এক নতুন!' আমরাও এই নক্সাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।"১

হুতোম প্যাঁচার নক্সা

এবং কালীপ্রসন্নের আঙ্গিক-সচেতনতা

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে হুতোমপ্যাঁচার শিল্প স্বভাব পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে পারবে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করছি, হুতোম ব্যঙ্গ এবং রঙ্গে সমান পটু ছিলেন। 'আলালের' উদ্ধৃত অংশ-দুটি'র তুলনায় বিচার করলে দেখব, টেকচাঁদ কোথাও আদর্শবাদ-তাড়িত গুরুগম্ভীর ধীর পদে চলেছেন, কোথাও বা চলেছেন ব্যঙ্গ-চপল লঘুচরণে। তাতে রচনার ছন্দ পতন ঘটেছে। বিশেষ করে এই দুই প্রকার রচনার ভার-সাম্যতার অভাব ছিল প্রকট। হুতোমের চাল আগাগোড়াই লঘু, কিন্তু উদ্দেশ্য কোথাও তরল-চপল নয়। উদ্ধৃত অংশের প্রারম্ভিক ছত্রে লঘু সরসতার সংগে সমকালীন সাহিত্য জগতের বিশৃঙ্খলার প্রতি হুতোমের কশাঘাত ব্যর্থ হয় নি।

আলাল ও হুতোম

অন্যদিক্ থেকে হুতোমের বাচন-পদ্ধতির বৈঠকী ভঙ্গিটিও লক্ষ্য করবার মত। ঢিলেঢালা ফরাস পেতে তিনি যেন বসেছেন জীবনের রাজ-

১। ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটা কথা—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

ছত্রাতপ তলে, লঘুলয়ে চল্‌ছে গল্পের ধারা। কথা বাড়ছে, কিন্তু কথ্য বিষয় এগোচ্ছে ধীর-মন্থর পদে। তবু, কোনো পর্যায়েই বক্তব্য একেবারে থেমে যাচ্ছে না। বলার ভঙ্গির বহুপল্লবিত রস-প্রবাহের গভীরে বক্তব্যের গতিও থাকছে নিয়ত-চলমান, সজীব। অনেক পরে বীরবলের রচনায় যে বৈঠকী ঢং পূর্ণ তাল লয়ে বিকশিত হয়েছে, তারই পূর্বসূরিত্ব হুতোম্ দাবি করতে পারেন।

হুতোমের রচনায় বৈঠকী রীতি

সর্বশেষ ভাষা-ভঙ্গির কথা। প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্যকে দৈনন্দিন জীবনের বচনভঙ্গির সান্নিধ্যে আন্‌তে চেয়েছিলেন। ~~কিন্তু সে সাধ্য তাঁর ছিল না~~। তিনি কেবল বর্ণনাত্মক সাধু গদ্য-রীতির আধারে যথেচ্ছ, অনিয়ন্ত্রিত চলিত শব্দ ব্যবহার করে গেছেন। কিন্তু, হুতোম বিশুদ্ধ চলিত রীতিটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চলিত ভাষা কেবল ব্যাকরণের বিচারেই বিশুদ্ধ নয়, বাচন-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যেও যথার্থ 'চলিত'। বানান পদ্ধতির মধ্যে চলিত-উচ্চারণের ঢং-টিকে তুলে ধরবার সুচেতন আকাঙ্ক্ষাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য লক্ষিতব্য।

'হুতোম'-এ বিশুদ্ধ চলিত ভাষা

অথচ হুতোমের এই অ-ভূতপূর্ব ভাষা-শিল্পের জ্ঞান পর্যন্ত এ-কালের সাহিত্যের দরবারে উল্লেখ্য স্বীকৃতি পায় নি। বঙ্গদর্শনে একদা বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের সর্বাত্মক নিন্দা করেছিলেন; তাঁর মনোভাব অবশ্য সর্বাংশে ছিল নৈতিক :—"লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র; ইহার তত শব্দ-ধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনো গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত নহে।" স্পষ্ট দেখ্‌ছি, পবিত্রতাশূন্যতা ও 'অশ্লীলতা'র বিষয়েই এখানে বঙ্কিমের অভিযোগ। বঙ্কিমের এ আলোচনার সূত্র ধরে আজও বাংলা গদ্য-ভাষা ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার ইতিহাসে হুতোমের ওপরে টেকচাঁদ কুলপতি হয়ে আছেন। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে বঙ্কিমের বিচার যে নিরপেক্ষ নয়, ওপরের হুতোম-পরিচয় তার প্রমাণ।

বঙ্কিমের সমালোচনা

অবশ্য, এই নিরপেক্ষতা ঐতিহাসিক কারণেই অসম্ভব ছিল। হুতোম প্যাঁচার নক্সার সমকালীন জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের জীবনীকার লিখেছেন,—"ইহা কেবল নক্সা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই, অনেক ভণ্ড সমাজ-দ্রোহীর পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাত পূর্বক তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ-সংস্কার সাধন করিয়াছিল, তজ্জন্যও ইহা কম

প্রশংসা লাভ করে নাই।"[১] বস্তুতঃ, হুতোমের নিন্দিত হওয়ার কারণও ঐখানে। সেকালের 'অনেক ভণ্ড সমাজ-দ্রোহী' তখন সমাজ-পতিদের দুর্লভ অধিকারেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নক্সার রহস্যাবরণে হুতোম তাঁদের যথার্থ পরিচয়কে আচ্ছন্ন করেন নি; স্থানে স্থানে তাঁরা "আপনারে আপনি" দেখ্‌তে পেয়েছেন। এ-বিষয়ে কালীপ্রসন্নের যুক্তি সহজবোধ্য,—আলোচ্য স্পষ্টতার ফলেই কষাঘাত যথাস্থানে উদ্দিষ্ট ফল প্রসব করেছে। অথচ বঙ্গদর্শনের আলোচনায় বঙ্কিম মনে করেছেন,—হুতোমের রচনা ঈর্ষা-বিদ্বেষতাড়িত ছিল। এমন অবস্থায়, সমকালীন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিরূপতা-বিচারের প্রশ্ন যেখানে দেখা দিয়েছে, সেখানে বঙ্কিমের মত বিচারকও সাহিত্য-মূল্য নির্ণয়ে নিরপেক্ষ থাক্‌তে পারেন নি। এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

ও হুতোম-এর নক্সায় জীবন-চিত্র

হুতোম অবশ্য "দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকায়" বঙ্কিমের অভিযোগ তীব্রভাবে অস্বীকার করেছেন,—"পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নকসা অতি কদর্য বই; কেবল পরনিন্দা পরচর্চা, খেউড় ও পচালে পোরা ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্র-লোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম, অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো—ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, অভিসন্ধি নয়; হুতোম ততদূর নীচ নন যে দাদ্‌ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন, জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌শা প্রসব করেছে, সেই কলমে ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু, সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।"

হুতোম-এর সামাজিক ফলশ্রুতি

কালীপ্রসন্ন এখানে মহাভারত অনুবাদের শ্লাঘনীয় গৌরব সচেতন ভাবে দাবি করেছেন। "৭ জন কৃতবিদ্য সদস্য" পণ্ডিতের সহযোগিতায় ব্যাসের আদ্যন্ত মহাভারত সচ্ছন্দ বাংলা গদ্যে রচনা করে তিনি দেশ বিদেশে বিতরণ করেছিলেন। জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় প্রেরণার পুনর্জাগৃতিই ছিল এই প্রাণান্ত শ্রম ও অ-কল্পনীয় ব্যয়-সাধ্য চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। পরোক্ষভাবে হলেও, উপরের উদ্ধৃতিতে কালীপ্রসন্ন সেই জাতীয় কল্যাণকর মহাদর্শ সাধনার সংগে হুতোমী রচনাকেও যুক্ত করতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ, ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক কালীপ্রসন্নের এই দাবি সম্পূর্ণ

কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ

রেনেসাঁস

১। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ।

উপেক্ষা করতে পারে না। হুতোমী-ভাষায় যেমন লঘু চালের চলিত গদ্য রচিত হয়েছে, তেম্‌নি গুরু-গম্ভীর ছন্দে প্রবাহিত হয়েছে মহাভারতের গদ্য ভাষা। এই দ্বিতীয় রচনার আদর্শ ছিল, মনে হয়, বিদ্যাসাগরীয় প্রাঞ্জলতাঃ—"অনন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজ দ্রোণ দ্রুপদ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া দ্রুপদ কহিলেন, যাদৃশ অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের ও অরথী রথির মিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন, তিনি কি প্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন! এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভগ্নমনে হস্তিনা নগরীতে গমন করিলেন।"

গদ্য-শিল্পী কালীপ্রসন্ন

হুতোমের উদ্ধৃত চলিত ভাষা-ভঙ্গির সংগে এই সাধু গদ্য-রীতি পড়লে সন্দেহ থাকে না, আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্যে কালীপ্রসন্ন ছিলেন একজন অতুল্য শিল্পী।

বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ ও কালীপ্রসন্নের নাটক

বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা, এবং বিবিধার্থ সংগ্রহের পুনঃ প্রবর্তন কালীপ্রসন্নের সামাজিক কীর্তির অন্যতম। বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারকে উপলক্ষ্য করেই তিনি প্রথমে অনুবাদ-নাট্য বিক্রমোর্বশী এবং পরে পুরাণাশ্রিত নাটক সাবিত্রী-সত্যবান্ রচনা করেন। শেষ বয়সে 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একটি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন।

মধুসূদনের গদ্য, হেক্‌টর বধ

মধুসূদনের গদ্য রচনার উল্লেখ ছাড়া আলোচ্য যুগের গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তাঁর একমাত্র গদ্য আখ্যায়িকা হেক্‌টর বধ ইলিয়াড্-এর বঙ্গানুবাদ। একদা ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছিলেন, মধুসূদনের প্রবর্তিত পথে বাংলা গদ্যের প্রসার ঘট্‌লে আজ তা, ওজো-গুণান্বিত বীর্য-বলিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ত। মধুসূদনের কাব্য-প্রসঙ্গে হেক্‌টর বধের রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তার থেকে ডঃ সেনের এই মন্তব্যের যথার্থতা পূর্ণ প্রতিপাদিত হবে।

প্রাবন্ধিক শিবনাথ

এ-যুগের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আর একজন অবশ্য-স্মরণীয় মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী। আগে বলেছি, শিবনাথের ব্যক্তিত্বের আ-মূলে নিহিত ছিল তাঁর কবি-স্বভাব। কিন্তু, তিনি স্বক্ষেত্র পরিহার করে সেকালের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস শিবনাথের একনিষ্ঠ সাধনার অভাবে অনুশোচনা করবে; কিন্তু সমাজ-ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে শিবনাথকে কোনো দিন অনুশোচনা করতে হয়নি। সেকালের ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা। সেই জীবন-হিতব্রতে

উৎসর্গিত মনীষার অজস্র জ্ঞান ও ভাব-সম্পদ্ উৎসারিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গদ্য গ্রন্থ-গ্রন্থিকায়। এই সব রচনার মধ্যে রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪) এবং আত্মচরিত (১৯১৮) ইতিহাস-তথ্য-সমৃদ্ধির অনন্য-তুল্যতায় বর্তমান কালের পাঠকের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। অপেক্ষাকৃত পূর্বকালে রচিত রামমোহন রায় (১৮৮৬) বক্তৃতা প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। পঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ, নবযুগের নবপ্রশ্ন, ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে 'প্রবন্ধাবলি'তে। শিবনাথের জীবৎকাল বিশ শতকের প্রথমাবধি ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু, কি কাব্যে, কি গদ্যে তাঁর মানস-লোকের নিত্য আশ্রয় ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থিত বাঙালি রেনেসাঁসের ঊষালগ্ন। সেখানে চলেছে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-রামতনু লাহিড়ীর যুগাধিকার। তাই, বর্তমান প্রসঙ্গে শিবনাথের প্রাবন্ধিক পরিচয় উদ্ধার করেছি। তাঁর গদ্য প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অতুলনীয়তার নিঃসংশয় প্রমাণ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত অসংখ্য রচনাংশ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি ঃ বাংলা উপন্যাস

'সাহিত্যে আধুনিকতা' বিষয়ের আলোচনায় বলেছি, (বাংলা সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি ও যৌবন-মুক্তি একই ভাব-পর্যায়ের দুটি ক্রম-বন্ধ স্তর; দুই পৃথক্ পর্যায় নয়। বয়ঃসন্ধি-লগ্নের সদ্য সমাপ্ত সাহিত্যালোচনায় লক্ষ্য করেছি, পরমুখাপেক্ষী কৈশোর-ভাবনার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি মানস সে পর্যায়ে যৌবন-সমুচিত স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।

সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি বনাম যৌবন-মুক্তি

বয়ঃসন্ধির বাংলা সাহিত্য আত্ম-সচেতন ও আত্ম-নির্ভরশীল হলেও, আত্মাধিকার লাভের প্রথম উৎসাহে তা অতি-স্ফীত, উচ্ছ্বাস-উদ্বেল। অপর পক্ষে, যৌবনাধিকার লাভের সগৌরব সচেতনতার সংগে যৌবন-পরিণাম বিষয়ে অনিশ্চয়তা-বোধ হেতু, সে যুগের সাহিত্য ছিল মর্ম-যন্ত্রণায় পীড়িত। এই আবেগ-উচ্ছ্বাস, এই নিভৃত যন্ত্রণার গভীরে নিহিত আছে কিশোরোচিত চাঞ্চল্য। কিন্তু, এই সব উচ্ছ্বাস-যন্ত্রণার শেষেও বয়ঃসন্ধি কালের শিল্পি-সাহিত্যিক আপন আদর্শ-বুদ্ধিতে ছিলেন অবিচল। এইখানেই বয়ঃসন্ধির কাল অসংশয়িত যৌবন-লক্ষণের সংগে অন্বিত।

পূর্বালোচনায় লক্ষ্য করে এসেছি, বয়ঃসন্ধির উচ্ছ্বসিত যৌবন-স্বভাব মধুসূদনের জীবন ও শিল্পে মূর্তিরূপ ধারণ করেছিল। এবারে, যৌবন-মুক্তির উপপর্যায়ে বয়ঃসন্ধি-বিলগ্ন কৈশোর-লক্ষণ সম্পূর্ণ মোচিত হয়েছে, রেনেসাঁস যুগের নবীন জীবন-মূল্যবোধ আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্বপ্নপথ পরিত্যাগ করে বিচার-সম (Rational) যুক্তি-জিজ্ঞাসার পথ অবলম্বন করেছে! মধুসূদন যেমন বয়ঃসন্ধি যুগের, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র এই যৌবন-মুক্তি-লগ্নের শিল্পি-মূর্তি। প্রথম জন স্বভাবতঃ কবি, দ্বিতীয় জন প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক। আবার বলি, এঁদের মধ্যে জীবনবোধের পার্থক্য গুণগত নয়, পরিমাণগত। মধুসূদনের ভাব-চেতনা কিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রে পরিণতি লাভ করেছে, তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত স্পষ্ট হতে পারবে রমেশ-চন্দ্র দত্তের অর্থাবহ উক্তিতেঃ—

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র

"Bankim Chandra is in prose what Madhu Sudan was in verse,—the founder of a new style, the exponent of a new idea. In creative imagination, in gorgeous description, in power to conceive and in skill to describe, Madhusudan and Bankim Chandra stand apart from the other writers of the century; they are the first, the second is no where... .. .. The palm must be given to the poet, who has bodied forth beings of heaven and earth and the lower regions in gorgeous verse which sprang in to existence like an echo of his ideas; but the reader, after he has traversed the universe on the wings of the mighty poet, will descend with a sense of pleasure to the homely scenes of the novelist, peopled with figures and faces so true and life-like, so sparkling and animated, so rich in their variety and beauty, that they seem to be a world by themselves, created by the will of the great enchanter.১

ফল কথা, মধুসূদন যৌবনের দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে বিশ্ব-পরিক্রমা করে ফিরেছেন অনন্ত কল্পনার নভোলোকে; তাঁর কবি-কর্মের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ছিল বিহঙ্গম-দুর্লভ ভাব-পক্ষ। অন্য দিকে, বঙ্কিমের সাহিত্যে রেনেসাঁস যুগের বিশ্বপ্রসারী জীবন-জিজ্ঞাসা স্থান-কাল-পাত্রোচিত বিশেষ গৃহ-লোক-সীমায় যুক্তি-বিচার-সম বাস্তব উত্তরের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়েছে। ঔপন্যাসিকের শিল্প-স্বভাবের মূলে অপরিহার্য ভাবে নিহিত আছে, যুক্তি-বিচার-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মনোভাব,—পরিবেশ-সচেতন বাস্তব জীবন-

কবি ও ঔপন্যাসিক

১। Literature of Bengal.

বুদ্ধি। ঐ বিশেষ লক্ষণান্বিত জীবন-মূল্যবোধের অভাবে উপন্যাস-কলার সার্থক জন্ম বারিত হতে বাধ্য ঃ—

“The Novel is the epic form of our modern, bourgeois society,...... It did not exist, except in very rudimentary form before that modern civilisation which began with the rennaissance and like every new art form it has served its purpose of extending and deepening human consciousness.”১

উদ্ধৃত মন্তব্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ মতবাদ-পুষ্ট। তাহলেও, এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উপন্যাস একটি আধুনিক কলারূপ (art form)। মানব-চেতনাকে যুগোচিত ব্যাপ্তি ও গভীরতার সংগে অন্বিত করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকেই এই কলাঙ্গিকের উদ্ভব। একই আলোচক উপন্যাস-শৈলীর জন্ম-প্রেরণার বিশিষ্টতা নির্দেশ করে বলেছেন,—

উপন্যাস-শিল্পের মৌল-স্বভাব

“The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man’s life, the first art to take the whole man and give him expression.”২

এই অর্থে পূর্ণাবয়ব মানব-জীবনকে কাহিনী-বন্ধ করার প্রেরণা থেকে স্বত-উদ্ভূত শিল্প-রূপ হচ্ছে উপন্যাস। পূর্ণাবয়ব মানুষ বল্‌তে কি বুঝি, তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট করা হয়েছে ঃ—

“Indeed the Iliad is more a picture of the society than of any one of its characters, a society in which the individual does not feel himself in opposition to the collective, any more than he feels himself in conflict with nature. He is a part of his society, and at times at most a part of nature, or else dominated by nature, but never in conflict with it or master of it.”৩

সম্পূর্ণ মানুষের প্রসঙ্গে এখানে প্রথমেই স্বতন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ মানুষের কথা বোঝানো হয়েছে। এ-মানুষ কোনো বিশেষ গোষ্ঠী অথবা প্রাকৃতিক জগতের নির্বিশেষ অংশ মাত্র নয়, নয় একান্তভাবে তার অঙ্গীভূত। পারিপার্শ্বিক সমষ্টি-জীবন ও নিজ দেশ-কাল-ধৃত পরিবেশে সে স্বয়ং-স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার জন্য সে পূর্বকথিত শক্তি সমূহের সংগে প্রথমে সংঘাত-রত, পরে হয়েছে ঐ শক্তি সমষ্টির একান্ত অধিকার লাভে বৃত। এই স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির জাগৃতি আধুনিকতার একটি

ঔপন্যাসিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

১। The Novel and the people—Ralph Fox.
২। ঐ।
৩। ঐ।

মৌল উপাদান। এই অর্থেই প্রাচীন উপন্যাস-কলা-সন্ধানীদের সকলেই এক বাক্যে বলেছেন,—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি-র (Individuality) বিকাশ ও গঠনের আগে কোনো সমাজে উপন্যাস-শিল্পের উদ্ভব সম্ভব নয়।

রেনেসাঁস যুগের নাগরিক বাংলায় এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির সাধারণ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। মধুসূদন ও মধুসূদনোত্তর বাংলা সাহিত্যের সকল দিকেই এই স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সুস্ফুট। তবু, সে-যুগে উপন্যাস রচনা সম্ভব হয়নি; কারণ মানুষের অখণ্ড স্বভাব-ধর্ম আভাসিত হলেও শিল্পকর্ম বা শিল্পিমানসে তখনও তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি। মানব-স্বভাবের সম্পূর্ণতার প্রাথমিক উপাদান তার স্বাতন্ত্র্যে।

ও মধুসূদনের কাব্য

কিন্তু, স্বতন্ত্রতা ও সম্পূর্ণতা এক কথা নয়। কোনো কোনো মানুষ স্বয়ম্ভূ যদি হন-ও, তবু, কোনো মানুষই স্বয়ম্পূর্ণ নয়। সমাজ, পরিবেশ, —তথা সমকালীন দেশ-কাল-পাত্রের আধারেই মানব-স্বভাব চির-বিধৃত। সেই জীবন-পরিপ্রেক্ষিতের সংগে সংঘাত ও সামঞ্জস্য-বিধানের,—আধারের সংগে আধেয়ের দ্বন্দ্ব-মিলনের পরিণতির মধ্যেই যে-কোনো মানুষের অখণ্ড জীবন-রূপ পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে। অতএব, পূর্ণাঙ্গ মানুষের জীবনায়নের জন্য শিল্পীকে জীবনের স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের সংগে কার্য-কারণ পরম্পরাবদ্ধ পরিবেশ-সচেতনাকেও আত্মস্থ করতে হয়। মধুসূদনের কাব্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আত্মমোক্ষণের আকাঙ্ক্ষা আছে, মাঝে মাঝে তাতে প্রাচীন সংস্কার ও গোষ্ঠি-জীবন-মূল্যবোধের প্রতিরোধ বাসনাও হয়েছে তীব্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে মেঘনাদবধের প্রমীলা, অথবা বীরাঙ্গনার জনার উল্লেখ করা চলে। কিন্তু, কোনো অবস্থাতেই বয়ঃসন্ধি-যুগের সাহিত্য আনুপূর্বিক পরিবেশ-সচেতন নয়,—কার্য-পরম্পরা নিবদ্ধ অখণ্ড জীবনরূপের পরিচায়নে নয় একান্ত তৎপর। প্রমীলা একদিন প্রবল শক্তিতে লঙ্কা প্রবেশ করেছিল, আর একদিন ঘনতম কারুণ্য-বেদনার মধ্যে করেছে স্বামীর চিতা-প্রবেশ। উভয় ক্ষেত্রেই তার ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবু, লঙ্কা-প্রবেশ থেকে চিতা-প্রবেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রমীলা-জীবনের অখণ্ড পরিচয় প্রতিমুহূর্তের উত্থান-পতন, আশা আশঙ্কা, শ্রম-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে নি। জনা পত্রিকায় দেখি, কৃষ্ণার্জুনের দেবত্ব-সংজ্ঞার প্রতিটি উপাদানকে সে সমষ্টি-মঙ্গলবুদ্ধির-নিরপেক্ষভাবে নূতন ব্যক্তিত্বের আধারে ধরে তীক্ষ্ন বিচার করতে চেয়েছে। সে চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্যের তীব্রতা আছে, আছে যুক্তির অকাট্যতা। কিন্তু, একটি বিশেষ আবেগ-সীমাকে অতিক্রম করে এই নব-বিচারণা পরম্পরা-বদ্ধ পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি।

এই অর্থেই রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন, মধুসূদনের কাব্যে সমকালীন জীবন-বোধ বিশেষ ভাব-কল্পনার পক্ষ 'পরে ভর করে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে

বিচরণ করে ফিরেছে। বঙ্কিম-রচনার মত দৈনন্দিন জীবন-জটিলতার বাস্তব গৃহ-লোকে তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। পারে নি যে, তার কারণ শিল্পীর অক্ষমতা নয়;—কারণ, জীবন-ভঙ্গির কালোচিত বৈশিষ্ট্য। পূর্বে একাধিক পর্যায়ে বলেছি, বাঙালি জীবন-ভঙ্গির পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে রেনেসাঁসযুগে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সংঘাত-মূলক প্রকাশ ঘটেছিল সামাজিক-পারিবারিক জীবন-পটভূমিতে। আর, সেই নব-জাগ্রত স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির প্রায় একমাত্র আধার ছিল নবাদর্শ-মহিম নারী-ব্যক্তিত্ব। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ-বিপ্লব ও বিদ্যাসাগর থেকে মধুসূদন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যিক রেনেসাঁসের ইতিহাসে পরিবারাশ্রিত নারী-ব্যক্তিত্বের বিকাশমানতার ক্রমপরিণতি এ-পর্যন্ত লক্ষ্য করে এসেছি। সর্বশেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করেছি, বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান সমাজ-ব্যাপী আলোড়নকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। সেই সংগে হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষিত নব্য-বঙ্গ দল যতই স্ব-স্থ হয়েছেন, ততই সমাজ-কল্যাণ ও পারিবারিক জীবনমূল্য-ঋদ্ধ সংস্কার-চেষ্টা সার্থক, বলিষ্ঠতর হয়েছে। কিন্তু, চেষ্টার পরোক্ষতার মধ্যে পূর্ণ ফললাভের প্রত্যাশা করাও অবাস্তব। রামমোহন থেকে বিদ্যা-সাগরোত্তর যুগে নারীকে ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল আন্দোলন চলেছে পুরুষের পক্ষ থেকে। এই প্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা স্বভাবতঃ-ই নারীর-আত্ম-শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার অপেক্ষা করেছিল। বীটন্-বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় নারী-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার ফলে সে পথের সম্ভাবনাও অবারিত হয়েছিল। বস্তুতঃ, সদ্য-অঙ্কুরিত সেই সর্বাবয়ব জীবন-সম্ভাবনার নিঃসংশয় জয়গাথাই রচিত হয়েছে বয়ঃসন্ধি-যুগের সাহিত্যে। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব-সংগঠনের যুগ থেকে বঙ্কিমের যৌবন-পরিণতির সময়ে এই জীবনাঙ্কুর মহীরুহ-রূপের-সম্ভাবনায় দৃঢ় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

বাংলা উপন্যাসের জীবন-প্রচ্ছদ

রচনাগত কাল-বিচারে দেখ্‌ব, মধুসূদনের প্রথম বাংলা নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ও বঙ্কিমের প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী-র (১৮৬৫) প্রথম প্রকাশকালের মধ্যে পার্থক্য মাত্র ছ সাত বছরের। কিন্তু, আগে বলেছি, সাহিত্যের কাল বিচারের আধার প্রকাশ-সময়ের বহিরঙ্গ পটভূমিতে নয়, শিল্পীর মনোভাবগত (mood) বৈশিষ্ট্যের 'পরে নির্ভরশীল। এ দিক্ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের উত্তর-যুগ-বর্তী। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন কাঁটালপাড়ার পৈতৃক বাটিতে যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমের জন্ম হয়। জন্মসালের হিসাবে তিনি কবি হেমচন্দ্রের (১৮৩৮) সমবয়স্ক; হেমচন্দ্রের মাত্র একবছর আগে বঙ্কিম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হিসেবে সমাবর্তন করেন। অতএব, বঙ্কিমের জীবন-যৌবনের প্রেরণা হেমচন্দ্রের যৌবন-কালীন জীবন-পরিবেশের সংগে অভিন্ন ছিল।

এই সময়কার রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-লক্ষণের পরিচয় হেমচন্দ্র প্রসঙ্গে উদ্ধার করেছি। বঙ্কিম-জীবনের প্রেক্ষিতে এই পটভূমির বিশেষতর পরিচয় উদ্ধৃত হবে যথাস্থানে। বর্তমান উপলক্ষ্যে কেবল বঙ্কিমের যৌবনকালীন বাংলার সামাজিক-পারিবারিক জীবন-পর্যায়ের ফলশ্রুতি উদ্ধার করিঃ— "এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা হইতেছে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হইতেছে, লোক বিলাত যাইতেছে, বিধবার বিবাহ হইতেছে, অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে বহির্গমন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এক্ষণকার কালে চতুর্দিকে পরিবর্তন, পরিবর্তন বই আর কথা নাই।"

বাংলার যৌবন-মুক্তি যুগের জীবনপটভূমির এই ঐতিহাসিক সার সংকলন করেছিলেন মনীষী রাজনারায়ণ 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থিকায়। সে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কিন্তু, এই বৈপ্লবিক মহাপরিবর্তন এক বছরেই গড়ে ওঠে নি, তার জন্য বহু বছরের বিবর্তন-পরিবর্তন অপরিহার্য হয়েছিল; এ-কথা বলা বাহুল্য। রাজনারায়ণের আলোচ্য গ্রন্থিকা এবং সমকালীন ইতিহাসের পূর্ণ পরিচয় অনুসরণ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, উদ্ধৃত সামাজিক ফলশ্রুতি বঙ্কিমের যৌবন-স্বপ্নকে আলোড়িত, অনুপ্রেরিত করার সুযোগ পেয়েছিল। বস্তুতঃ, আলোচিত সমাজ-পটভূমির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই বঙ্কিম-মানস বাংলা ভাষার প্রথম সার্থকনামা উপন্যাস রচনায় সিদ্ধকাম হতে পেরেছিল।

ও সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি

এ-বিষয়ে সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃত পরোক্ষ প্রমাণ-ও কম নয়। হেমচন্দ্রের চিন্তাতরঙ্গিণী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। আগে বলেছি, ইংরেজি শিক্ষিত একটি অতি-স্পর্শাতুর বিভ্রান্ত যুবকের আত্মহত্যা ছিল চিন্তাতরঙ্গিণীর প্রেরণা-উৎস। "পিতার কোন আদেশ বিবেকবিরুদ্ধ" মনে হয়েছিল বলেই যুবকটি এই আত্মনাশী পথ গ্রহণ করেন।১ স্পষ্ট দেখ্‌ছি, পিতৃ আদেশ পালনের সামাজিক পূর্বৈতিহ্যের সংগে নব-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উগ্রতা নূতন জীবন-জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। বয়ঃসন্ধি যুগের বাঙালি যুবক সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে জীবন দান করেছেন। এটি সেকালের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, ঐ একই বছরের মধ্যে,—ঐ ঘটনার কিছু আগে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-বিখ্যাত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অগ্রজও আত্মহত্যা করে-ছিলেন। কবি ঈশানচন্দ্রের আত্মবিনাশের কথাও পূর্বে বলেছি। এই ঘটনার কাল অপেক্ষাকৃত পরে হলেও, রেনেসাঁস-উত্তর যুগের একই জীবন-যন্ত্রণার ঐতিহাসিক পরিচয় তাতে সু-স্ফুট। বয়ঃসন্ধিলগ্নের স্বাতন্ত্র্য

১। পুরাতন প্রসঙ্গ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

ও তীব্র আত্মমর্যাদার জ্ঞান উদ্দাম হয়েছে, অথচ, পারিপার্শ্বিক জীবন ব্যবস্থার সংগে এই নবজাগ্রত ব্যক্তিত্ব-শিশুর সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে অসম্ভব। এইরূপ এক সমস্যা-জটিল জীবনের বিচার-মূঢ় পরিণতিই উদ্ধৃত প্রতিটি ঘটনার মধ্যে ইতিহাস-চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই জাগ্রত জীবন-জটিলতার বিচারসম (Rational) স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন অখণ্ডরূপে। একেবারে শেষ পর্যায়ের উপন্যাসত্রয়ীতে [আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম] এর বৌদ্ধিক সমাধান রচনা করতেও চেয়েছেন।

বঙ্কিম-যুগে বয়ঃসন্ধিকালের জীবন-যন্ত্রণা আত্ম-মুক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার আবেগে বিচার-সম হয়ে উঠ্‌তে চেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগাকাঙ্ক্ষারই যেন ব্যক্তিত্বময় অখণ্ড-ঘন বিভূতি। কেবল, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে নয়, নিজ শিল্পি-চিত্তের নিভৃত মর্মপীড়া দিয়ে তিনি আলোচ্য যুগ-জীবন-বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস সৃষ্টির পেছনে কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, ব্যক্তিগত উপলব্ধির নিবিড়তাও ছিল একান্ত।

যুগ-বাসনা

উনিশ শতক ছিল ব্যক্তি-পূজার আবেগে আচ্ছন্ন। তাই, "প্রজাপতি"-সমতুল সিদ্ধকাম সাহিত্য-শিল্পীকে প্রজাপতি ব্রহ্মার মতই নির্বিকার করে তোলার প্রয়াস ছিল অন্ধ। এই কারণে, এক মধুসূদনের ছাড়া, আলোচ্য কালের কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পি-ব্যক্তির-ই অখণ্ড ব্যক্তি-পরিচয় খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।১ রেনেসাঁ যুগের সাহিত্য-ইতিহাস এদিক থেকে তথ্যদীন। সাহিত্যের ইতিহাস কেবল সাহিত্যের বহিরঙ্গ জীবনের এবং গ্রন্থরচনা-কালের তথ্য-পঞ্জী নয়। বৃহৎ জীবনের পটভূমিতে বিকশিত শিল্পীর নিভৃত মনোধর্মের অনন্যপরতার মূলেই নিহিত থাকে সৃষ্টির সৌন্দর্য-স্বভাব। সার্থক সাহিত্য-ইতিহাসের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সেই মূলাভি-মুখী। বিশেষভাবে বঙ্কিম-প্রসঙ্গে ইতিহাসের সেই উৎকণ্ঠা একেবারেই অচরিতার্থ হয়ে আছে। একান্ত স্বজনদের লিখিত একাধিক সুবৃহৎ জীবনীগ্রন্থ আছে বঙ্কিমের। তার কোনোটিতেই সুচিহ্নিত ব্যক্তিত্বে নিভৃত-স্বতন্ত্র অখণ্ড তাঁর মানব রূপটি বিকশিত হতে পারে নি। সর্বত্রই বঙ্কিম মহত্তম জীবনাদর্শের অখণ্ড প্রতীক,—মহাপুরুষ;—সর্বত্রই তিনি দেব-প্রতিম অ-মানব। তাই, মাঝে মাঝে সংশয় হয়, বঙ্কিমের শিল্প-সৃষ্টিও বুঝি তাঁর জ্ঞান-দীপ্ত প্রতিভার চিদ্‌বৃত্তি প্রসূত। হৃদ্‌বৃত্তির নিভৃত-গভীর গৃহিণীপনার কান্তিতে বুঝি তা লাবণ্য-বিভান্বিত হয়ে ওঠে নি। হয়ত এই কারণেই আজ বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যকে অ-গভীর, অসম্পূর্ণ শিল্প-কৃতি বলে ঘোষণা করার উগ্রতা কোথাও কোথাও লক্ষিত হচ্ছে।

১। দীর্ঘ ছয় খণ্ডে সমাপ্ত নবীন চন্দ্রের 'আমার জীবন'-এ নিরপেক্ষ তথ্যের তুলনায় আত্মস্তুতি ও বাগাড়ম্বর বেশি।

কিন্তু, নিবিষ্ট পাঠকের চোখে বহিরঙ্গ উপাদানের অভাব-জনিত অ-স্পষ্টতা মুহূর্তে বিমোচিত হয়,—বঙ্কিমের শিল্প-কলায় তাঁর ব্যক্তি-হৃদয়ার্তি কোথাও অস্পষ্ট থাকে না। তা ছাড়া, হৃদয়সান্নিধ্যের নিতান্ত বহিরঙ্গ উপাদান এখনো খুঁজলে একেবারে হয়ত দুর্লভ হবে না। এ রকম একটি তথ্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আছে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন'-এ। বঙ্কিমের সংগে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—"বঙ্কিমবাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন, আমি তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রন্থাবলী উপস্থিত হইল। জিদ্ করিয়া আমার একটি কবিতা পড়াইলেন, * * *। তাহার পর তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়বাবু (অক্ষয়চন্দ্র সরকার) আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম 'বিষবৃক্ষ'। তিনি—'কোন স্থান পড়িব?' আমি 'যে স্থান আপনার অভিরুচি।' তিনি—'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতি-প্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন —'বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি!' আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্যমুখী।"

ও বঙ্কিমচন্দ্র

'সূর্যমুখী'র সন্ধান পাওয়া গেল। বঙ্কিমের এক ভ্রাতুষ্পৌত্রীর মুখে অপ্রত্যাশিত পরিবেশে একদিন শুনেছিলাম,—"কুন্দনন্দিনী ছিলেন; কে ছিলেন!"—সে প্রশ্নের জবাব পাই নি। না পেলেও ওপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট দেখছি,—বঙ্কিমের 'নভেল'-রচনার মূলে ছিল তাঁর জীবন-যন্ত্রণার অভিঘাতময় উপলব্ধির গভীরতা। কিন্তু, বঙ্কিমের শিল্প-স্বভাবের পরিচয় রচনাকালে আজও শিল্পি-মানসের সেই মর্মানুভূতির ইতিহাস অ-লভ্য। এ-বিষয়ে একটি বক্তব্য স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। শিল্পি-স্বভাবের ঐতিহাসিক সন্ধানের প্রসঙ্গে অতি-আধুনিক কালের জিজ্ঞাসা কোথাও কোথাও ব্যক্তি-মনের গোপন অঞ্চলে নিষিদ্ধ কৌতূহলের বেসাত করে ফেরে। শিল্প বা শিল্পীকে জানার তুলনায় অসামাজিক বা অ-নৈতিক কৌতূহল চরিতার্থ করার মনোবৃত্তিই সেখানে প্রধান। কিন্তু, কু-রুচি-বিলাস ও সাহিত্য-ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা সমার্থক নয়। নবীনচন্দ্রের উল্লিখিত বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে কুন্দনন্দিনীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কি না, এবং থাকলেও তা কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল, সে উল্লেখ নেই বলে অনুশোচনার কারণ নেই। কারণ, এ-টুকু বুঝি, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে অনুরূপ দুর্বলতা,—যদি তা 'দুর্বলতা'-ও হয়—কিছু যদি ঘটে-ও বা থাকে, তবু বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য তার সার্থক উৎক্রমণে।

এখানেই বঙ্কিম-প্রতিভার যথার্থ স্বকীয়তা। বলা হয়ে থাকে, ট্রাজিক-শিল্পী হিসেবে বঙ্কিম দুর্বল,—সেক্‌স্‌পীয়রের তুলনায় এই দুর্বলতার স্পষ্ট পরিচয় বিবৃত করে গেছেন মনস্বী মোহিতলাল মজুমদার। এ-কালের পাঠককে ভেবে দেখতে হবে, মধুসূদনের ট্রাজিক-শিল্পের তুলনায়ও বঙ্কিম-ট্রাজেডির মর্মদাহ কি স্তিমিত নয়? তা বলে, শিল্পী হিসাবে মধুসূদনের তুলনায় বঙ্কিম দুর্বলতর ছিলেন, এমন প্রলাপোক্তি কেউ করবে না। মধুসূদন সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁর যুগ ও ব্যক্তিত্ব-নিহিত যে অশান্ত যন্ত্রণাবোধের কথা উল্লেখ করেছি, বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব সেই যন্ত্রণায় জ্বলেও ভস্ম হয়ে যায় নি, অগ্নি-শুদ্ধ কাঞ্চনের মত প্রশান্ত-বলিষ্ঠ বিশ্বাসের দৃপ্ততা নিয়ে লাভ করেছে পুনঃ প্রকাশ।

ব্যক্তি ও শিল্পী

মেঘনাদবধ-এর সমাপ্তি লগ্নে রাবণের কণ্ঠে রেনেসাঁসের মর্মাগ্নি 'রাবণের চিতার' মত-ই জ্বলতে থাকে। কিন্তু, কৃষ্ণকান্তের উইল-এ গোবিন্দ-লালের সর্বস্বহীনতার অপ্রতিবিধেয় যন্ত্রণা 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর'-এর উপলব্ধিময় প্রশান্তিতে হয়ে ওঠে ঋদ্ধ-গম্ভীর। ফলকথা, মধুসূদনে যা কেবলই যন্ত্রণা, বঙ্কিমচন্দ্রে সেই যন্ত্রণার দাহ-বোধের সংগে তার সার্থক উৎক্রান্তির প্রতিশ্রুতি ভাস্বর। এই অর্থেই বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি-পরিণামী যৌবন-মুক্তির জীবন-শিল্পী। সেই শিল্প-স্বভাবের যে সহজ উৎস বঙ্কিমের ব্যক্তি-জীবন-উপলব্ধির মধ্যে গুহায়িত হয়েছিল, ইতিহাসের অতলগর্ভ থেকে তার সমাহরণ সম্ভব হলে বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডি-সমুত্তীর্ণ জীবনবোধের প্রথম উৎস-পরিচয় স্বচ্ছতর হতে পারত।

তা না হলেও, বঙ্কিমের উপন্যাস সাহিত্যের প্রচ্ছদ-মূল সেকালের সমস্যা-জটিল জীবনের পূর্ণায়ত বাস্তব-জিজ্ঞাসার 'পরে যে প্রসৃত ছিল, তাতে সংশয় নেই। আর, ওপরের দীর্ঘ আলোচনায় বলেছি, সে জিজ্ঞাসা নব-উদ্ভূত নারী-ব্যক্তিত্বের সামাজিক প্রতিষ্ঠা-ভূমি সন্ধানের জটিলতার মধ্যেই ছিল বিশেষ-ভাবে নিহিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতেই (১৮৬৫) এ জিজ্ঞাসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। দুই পরিচ্ছেদে সমাপ্ত "বিমলার পত্র" তার স্পষ্ট প্রমাণ।

দুর্গেশ নন্দিনী

'দুর্গেশনন্দিনী'র সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় চরিত্র অভিরাম স্বামী,—শশিশেখর ভট্টাচার্য। তাঁর "বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; দর্শনাদিতে অত্যন্ত সুপটু হইলেন, জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন।"—এটুকু অভিরাম স্বামীর, যৌবনের ইতিহাস; পরিণত বয়সে তিনি গভীর মনীষা, প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধি, প্রবলতম হিন্দু জাতীয়তা-বোধ, সর্বোপরি সুমিত সংযমাচারে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিলেন। একই সংগে তিনি বীরেন্দ্র

সিংহের গুরু, এবং মানসিংহের পরম শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু "জগদীশ্বর শশিশেখরকে সর্বপ্রকার গুণ দান করিয়াও এক দোষ প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন, সে যৌবন কালের দোষ।" উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাগরিক বাংলায় অনুরূপ "গুণরাশি নাশী" এই এক-দোষ-বিশিষ্ট সর্বগুণবান্ ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু, বঙ্কিম-যুগের সমস্যা সেখানে নয়।

ও যুগ-জীবন-দ্বন্দ্ব

শিক্ষিত, প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের লালসাগ্নিতে সমাজে যে অসামাজিক ফলশ্রুতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার প্রতীক বীরেন্দ্র সিংহের দুই পত্নী, অভিরাম স্বামীর দুই কানীন কন্যা। তিলোত্তমা-জননীর জন্ম সধবা-নারীর পদস্খলনের মূলে; বিমলা কাশীর শূদ্রানী কুমারীর গর্ভ-জাত। তিলোত্তমার জননীকে নিয়ে উপন্যাসে কোনো জটিলতা দেখা দেয়নি। কিন্তু, বিমলা এবং বিমলার জননীকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হতে চেয়েছেন। নিজের মা'র প্রসঙ্গে বিমলা লিখে-ছিল ঃ—"মন্ত্রপূত ব্যতীত যাহার পাণি গ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহরণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।"

বিমলা-জননী সম্বন্ধে বঙ্কিম-যুগের বাঙালির প্রধান জিজ্ঞাসা হতে পারত, স্বর্গে যাই হোক, মর্ত্যের জীবন-মূল্যবোধের ইতিহাসে তার স্থান কোথায়? 'মন্ত্রপূতিহীন' নারী-ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সশ্রদ্ধায় স্বীকার করেও বঙ্কিম এই জটিল জিজ্ঞাসার উত্তর এড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু, বিমলার পারিবারিক-সামাজিক ব্যক্তিত্বকে এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। অভিরাম স্বামীর দুর্লভ ব্যক্তিত্ব-শক্তির যোগ্য উত্তরাধিকারিনী সে; জ্ঞানে-গুণে সংগীতে-শিল্পগুণে রাণী ঊর্মিলারও ছিল সার্থক সহচরী। কিন্তু, শূদ্রী-পুত্রী এই কানীন কন্যার প্রতি সর্বাংশে প্রেম-মুগ্ধ হয়েও বীরেন্দ্র সিংহ গড়মান্দারণের কুলবধূত্বে তাকে বরণ করবেন কি করে? এই জিজ্ঞাসার সমাধানে বঙ্কিম জন্মদোষের জন্য ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে লালসার যূপকাষ্ঠে হত্যা করেন নি। বীরেন্দ্র সিংহের পুরাঙ্গনা হিসেবে সামাজিক-পারিবারিক জীবনে পরম কল্যাণময়ীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাকে। অবশ্য, প্রথমতঃ বিমলার এই মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিধানে বালিকার নিজ ব্যক্তি-শক্তির চেয়ে অভিরাম স্বামীর অভিসন্ধিপরতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও কন্যার কল্যাণ-কামনাই প্রধানভাবে সক্রিয় হয়েছিল। তা ছাড়া উপায়ও কিছু ছিল না। বঙ্কিম-যুগে নারীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সাধিত হতে থাকলেও তার আত্ম-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয় নি। তার জন্য নাগরিক বাংলার সমাজ জীবনের

দুর্গেশনন্দিনীতে সামাজিক-পারিবারিক জীবন-স্বভাব

আর এক পর্যায় প্রাগ্রসরণ প্রয়োজন হয়েছিল। তাই, বিমলার নারী-ব্যক্তিত্বের ভাবপরিণতির প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি 'চোখের বালির' 'বিনোদিনীতে'। সে যাই হোক, আলোচ্য ক্ষেত্রে বিমলার স্বকীয়তা অস্ফুট হলেও উপেক্ষনীয় নয়;—বীরেন্দ্র সিংহের প্রতি পূর্বরাগ পর্যায়ের বিবৃতিতে সে লিখেছে;—"কেবল একমাত্র পরিতাপ যে যাঁহার জন্য ধর্ম ভিন্ন সর্ব-ত্যাগী হইতে প্রস্তুত ছিলাম, তাঁহার দর্শন পাইতাম না।" এই 'ধর্ম' অর্থে বিমলা যে 'নারী ধর্ম'-র কথাই বলেছিল, তা বলাই বাহুল্য। ব্যক্তিত্ব-গুণে দৃঢ়তম-পিনদ্ধ এই নারী-ধর্মকেই আমরা নারী ব্যক্তিত্ব নামে অভিহিত করেছি। বিমলার মধ্যে ব্যক্তিত্বময়ী নারীর জীবন-জটিলতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে,—শৈবলিনী, সূর্যমুখী, সর্বশেষে ভ্রমরে তার বঙ্কিম-সাহিত্যিক চরম পরিণতি।

যাই হোক, এই প্রথম চেষ্টাতেও বঙ্কিম যে তাঁর যুগবাসনার দ্বারা প্রবল প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। নারী-ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুটনে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত যুগ-নায়কদের বিপ্লবী চেষ্টার উল্লেখ বারে বারে করেছি। কিন্তু, এ-বিষয়ে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালি মানসেও যে উল্লেখ্য প্রতিক্রিয়া রচিত হয়েছিল, সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠায় তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।[১] ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে 'চুঁচুড়া নিবাসী স্ত্রীগণস্য' নিবেদিত একটি চিঠিতে দেখি,—"...১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্য দেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমাদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমার দিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন।......

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমার দিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন। আমরা কি আপনারাই বিবেচনা পূর্বক স্বামী নির্বাচন করিতে পারি না।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ কেহ টাকা লইয়া আমার দিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমাদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহাদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই।

৫। যাঁহাদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহাদের সংগে কেন আমাদের বিবাহ দিতেছেন। যাহার অনেক ভার্যা তিনি প্রত্যেক ভার্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্যার মৃত্যুর পর স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয়পিতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমার দিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয় করেছেন,—পত্রটি হয়ত যথার্থই "স্ত্রীগণস্য" রচিত নয়।[১] বর্তমান প্রসঙ্গে এটি বড় কথা নয়; সমাচার দর্পণে এই ধরণের পত্র-সংখ্যা অজস্র। তার একটাও যদি নারী-লিখিত না হয়, তবু, এ-কথা সত্য যে, সমকালীন পুরুষ চিত্তে নারী-স্বাতন্ত্র্য-কামনার ক্রমবিকশিত উগ্রতাই ঐ-সব পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নারী "বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায়" "হস্তান্তর" যোগ্য নয়, পুরুষের যথেচ্ছাচরণের অনুসারিণী হয়ে "দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা" সে হতে পারে না; বিমলা বস্তুতঃ নবজাগ্রত বাংলার এই সামাজিক আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক ফলশ্রুতি মাত্র।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস নামে কথিত Richardson-এর Pamela-র (১৭৪০) কথা মনে পড়ে। সেখানেও দুর্দান্ত লর্ড পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল পৌরুষ-লালসার সম্মুখে একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দরী পরিচারিকা নারী নিজ নৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। কিন্তু, পামেলা'র মধ্যে ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের মূলে আছে সমকালীন য়ুরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার শ্রেণি-সংঘাতের প্রেরণা। বিমলার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্ন নিছক নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক। ইংলণ্ডের জীবন-ধারা চিরকাল রাষ্ট্র-চেতনা প্রধান, আর উনিশ শতকের আলোচ্য পর্যায়ে বাঙালির জীবন-বুদ্ধি ছিল সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ; এ-কথা লক্ষ্য করবার মত। এখানেই য়ুরোপীয় উপন্যাস সাহিত্যের থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আমূল পার্থক্য।

দুর্গেশনন্দিনী বনাম Pamela

উদ্ধৃত পত্রের আরো একটি অভিযোগের শৈল্পিক প্রত্যুত্তর লক্ষ্য করি তিলোত্তমা চরিত্রে। নারী যে পুরুষের "ক্রীতা সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা" নয়, তারা যে "আপনারাই বিবেচনা পূর্বক স্বামী নির্বাচন" করতে পারে,—এই সামাজিক দাবি সুপ্রকট হয়েছে তিলোত্তমার চরিত্রে। বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা, 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের এই প্রধান তিনটি নারী চরিত্রের মধ্যে তিলোত্তমা-ই সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রিয়,—পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু, একটি

১। দ্রষ্টব্য—ঐ (ভূমিকা)

ক্ষেত্রে সে স্বয়ং-স্বতন্ত্র এবং অবিচল-চিত্ত,—সে তার "পতি নির্বাচন"-এর সুদৃঢ়তায়। মানসিংহ-পুত্র জগৎসিংহকে পিতার শত্রু-পুত্র জেনেও তার প্রথম অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

তিলোত্তমার ব্যক্তিত্ব ও জীবন-সমস্যা সমগ্র উপন্যাসে নিতান্ত অস্ফুট। অন্যদিকে আয়েষার স্বভাব-বিকাশ অতুলনীয়,—সম্পূর্ণাঙ্গ! এই আয়েষা চরিত্রে, ভূদেবের অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসের রোসিনারার ছায়া সম্পাৎ ঘটেছে। আয়েষা রোসিনারার স্ফুটতম ঔপন্যাসিক রূপ। আগে বলেছি, অঙ্গুরীয় বিনিময়ই, আমাদের ধারণায়, বাংলা সাহিত্যের এতাবৎ জ্ঞাত প্রথম উল্লেখ্য উপন্যাস। এই প্রসঙ্গে আলালের ঘরের দুলালের কথা আবার অবতারণা করি। উপন্যাস রচনার প্রয়োজনে মানব জীবনবোধের সম্পূর্ণতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের সুসংজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছি। আলালের ঘরের দুলালের গল্প বা চরিত্র রচনায় তার কোনো সুদূর সম্ভাবনাও জাগ্রত হয় নি। গল্পের যে সমাপ্তি সেখানে আছে, তাতে একটি সমাজ-ইতিহাসের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেলেও, তাকে অখণ্ড জীবনায়ন বলা চলে না। আলাল-এর চরিত্রাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব-বোধ (Individuality) দূরে থাক্, কোনো অস্পষ্ট চিহ্নিত ব্যক্তিত্বের (Personlity) ছাপও পড়ে নি।

অন্য দিকে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ শিবাজী ও রোসিনারার দুটি চরিত্র-ই সু-সংজ্ঞক,—স্পষ্ট-অবয়বান্বিত। শিবাজীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তার রোমাণ্টিক্ ভূমিকার দ্বারা মোটেই আচ্ছন্ন হয়নি! অন্যদিকে পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত সমাপ্তি-পত্রের মধ্যেই রোসিনারার ব্যক্তি-স্বভাব সার্থক অভিব্যক্তি পেয়েছে। তাহলেও, মূল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিসরে চরিত্র দুটির খুঁটিনাটি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তাদের Individuality-র পূর্ণ স্বরূপ আভাসিত হতে পারে নি। ব্যাপকতর জীবন-ভূমিতে আয়েষা সেই অভাবকে সম্পূর্ণ করেছে।

দুর্গেশনন্দিনী ও অঙ্গুরীয় বিনিময়

ডঃ সুকুমার সেন যথার্থ বলেছেন,—"বঙ্কিমের অঙ্কিত দাম্পত্য চিত্র রোমাণ্টিক্ প্রেম-সর্বস্ব। সেই জন্যই, বোধ করি, তাহাতে বাৎসল্য প্রভৃতি রসান্তরের মশলা দিয়া প্রণয়ের তীব্রতাকে মন্দীভূত করা হয় নাই। বঙ্কিমের কোন বিবাহিতা নায়িকা সন্তানবতী নয়।"[১] কেবল সন্তানবতী নায়িকা নয়,—নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ যে কল্যাণী স্বরূপের কথা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, বঙ্কিম সাহিত্যে সেই ধাত্রী, পুরুষের জীবন-বিধাত্রী নারীর পরিচয় দুর্লভ। সূর্যমুখী বা ভ্রমর একান্ত পতি-পরায়ণা। কিন্তু, তাদের সমগ্র নারী-ব্যক্তিত্ব পুরুষের, তথা স্বামীর জীবনে যথোচিত

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড (২য় সং)।

মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভের অতি-উৎকণ্ঠায় ছিল অধীর। এর কারণও অবশ্যই ছিল। আগে বলেছি,— বঙ্কিম-সমকালীন শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির সামাজিক জীবন-বোধ নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা বিধানে অত্যুগ্র হয়ে উঠেছিল। আর, তারই ফল, বঙ্কিম-নায়িকাদের একান্ত প্রতিযোগিতা-মূলক প্রেমিকা-স্বভাব। কিন্তু, এই ধারার একটি অতি সার্থক ব্যতিক্রম আয়েষা। আমাদের ধারণা, জীবনবোধের এই আমূল পার্থক্যপূর্ণ চরিত্রাদর্শ রোসিনারারই প্রভাবজাত।

দুর্গেশনন্দিনী ও Ivan ho

প্রধানতঃ এই আয়েষা চরিত্রের প্রসঙ্গেই দুর্গেশনন্দিনীতে স্কট্-এর আইভান্হো'র প্রভাবের কথা বলা হয়। আয়েষা নাকি আইভান-হো-র রেবেকা চরিত্রের প্রতিরূপ। কিন্তু, "বঙ্কিমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, আইভান-হো পড়িবার আগে দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলাম।"১ তা ছাড়া, আয়েষা চরিত্র যদি বিদেশী ছাঁচে ঢালাও হয়, "তবুও আয়েষা অপরিচিতা বিদেশিনী নয়, গম্ভীর মহিমাময়তা এবং আত্মসমাহিত-চিত্ততায় বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা বাণভট্টের মহাশ্বেতার ভগিনী।"২ কুমারী জীবনের পূর্বরাগ সাধনে আয়েষা প্রতীচ্য সাহিত্যাদর্শের অনুসারিণী, 'আত্মসমাহিত চিত্ততায়' মহাশ্বেতার ভগিনী। ঠিক্ তেম্নি ত্যাগ-তিতিক্ষাময় জীবনা-চরণে দয়িতের একান্ত কল্যাণসাধিকারূপে উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি জীবনবোধের প্রতীক সার্থক বাঙালিনী; রোসিনারার উত্তর সাধিকা।

আয়েষার নারী-স্বাতন্ত্র্য, পিতার শত্রুপুত্রের সংগে অবাধ-মিশ্রণ ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ, এ-সব কিছুর-ই গোপন আকাঙ্ক্ষা আলোচ্য যুগের শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির মনে অনুস্যূত হয়েছিল। সমাচার দর্পণে'র উদ্ধৃত পত্রের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফা অভিযোগের শৈল্পিক সদুত্তর রচনা করেছে আয়েষা;—"অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকদের মত স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সংগে আলাপাদি" করেছে; করেছে "আপনার বিবেচনাপূর্বক স্বামী নির্বাচন।" সমকালীন বাংলার রক্ষণশীল জীবন-ব্যবস্থার সম্বন্ধেও বঙ্কিমকে অবহিত হতে হয়েছে। ফলে, রেনেসাঁস যুগের বিপ্লবি-মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যের দরবারে জিতিয়ে দিতে গিয়েও তাঁকে অতীত প্রচ্ছদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে,—করতে হয়েছে বিদেশী ধারার অনুসরণ। কিন্তু, এ-সব কিছুর পরেও, আয়েষার সংযম, জগৎ সিংহের একান্ত প্রীত্যর্থে তিলোত্তমার হাতে তাকে সমর্পণ, চরম মুহূর্তে আত্ম-হত্যা করতে গিয়েও ভাগ্যের হাতে তিতিক্ষাময় আত্মদান, তাকে সেকালের স্বপ্ন-কল্পনার কল্যাণী নারীর মহিমায় মণ্ডিত করেছে। রোসিনারার

১। বঙ্কিমজীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।

পত্র পড়ে শিবাজীর গুরু রামদাস বলেছিলেন,—"যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন দ্বারা পাতিব্রত্য রক্ষা করেন তাঁহারাও ইঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা নহেন,—...যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহ-কন্যাই আপনার সহধর্মিণী হইবেন—ইহার সন্দেহ নাই।"

আয়েষার জীবনে সেই মর্মকথাই অকথিত থেকে প্রবলতর রহস্যের সৌন্দর্য রচনা করেছে।

সব কিছুর শেষে বলতে হয়, দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র নারী-ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক নবজাগ্রত সামাজিক-পারিবারিক জীবন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন; সেই জটিলতার বিচার-সম (Rational) সমাধান করতে চেয়েছেন। কিন্তু, সেই সমাধান-চেষ্টার সব কয়টিই পরবর্তী কালের বাস্তব ঘটনাভিঘাতের তুলনায় বঙ্কিমের স্বপ্ন-কল্পনার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। এর জন্য যৌবন-বিকাশ কালের বিশেষ পারিপার্শ্বিক মনোভাবই ছিল সমধিক দায়ী। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজি উপন্যাস 'পামেলা' রচিত হয়েছিল। ঐ সময়কার (১৭৪০—১৭৮০) ইংলন্ডের নব-জাগ্রত সমাজ-স্বভাবকে পরিচায়িত করে অধ্যাপক Travelyan লিখেছেন তখন ঃ—

যুগ-জীবন ও বঙ্কিমের উপন্যাসের স্বভাব

"We find....a society with a mental out-look of its own, self poised, self judged, and self-approved, freed from the disturbing passions of the past and not yet troubled with anxieties about a very different future."১

বঙ্কিম-সমকালীন নাগরিক বাংলার সমাজ-স্বভাব সম্বন্ধেও এই ফল-শ্রুতি বহুলাংশে সত্য। বঙ্কিমের সাহিত্যেও বিমলা, দুর্গেশনন্দিনী, আয়েষা অতীতের "disturbing passions" থেকে মুক্ত একটি দৃপ্ত মনোভাব নিয়ে সদর্পে, সবল আত্ম-বিশ্বাসে এগিয়ে চলেছে উদ্দিষ্ট পরিণাম রচনার অভিমুখে। সে পরিণাম যে-হেতু self judged and self approved,"—সেই হেতুই তার বাস্তব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ। শূদ্রাণী গর্ভজাতা কানীন কন্যার গৃহিণীত্বের অধিকার লাভ, কিংবা কানীন কন্যার কন্যা তিলোত্তমার সামাজিক বিবাহ-প্রতিষ্ঠা এ দেশের রক্ষণশীল সামাজিক প্রতিবেশে যে বাস্তব বিক্ষোভ-আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারত, বঙ্কিম সে-সব সমস্যাকে এড়িয়ে সকল সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁর আদর্শ ভাবকল্পনার স্বর্গে। এই অর্থেই দুর্গেশনন্দিনী বাস্তব সমস্যাভিমুখিতা সত্ত্বেও একান্তভাবেই রোমান্টিক্।

দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় (১৮৬৬) এই সমস্যা-সচেতনতা যেমন

১। Illustrated English Social History —Vol. III.

তীব্র, তেমনি কাহিনীর গঠন ও সমাপ্তি আরো স্বপ্ন-কল্পনা-ঘন, রোমাণ্টিক! বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র জানিয়েছেন,—কপালকুণ্ডলা রচনার আগে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন দীনবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, শিশুকাল অবধি ষোল বছর বয়স পর্যন্ত কোনো নারী সমাজ-বহির্ভূত সমুদ্রতীরে কাপালিকের হাতে প্রতিপালিত হয়ে যদি সমুদ্ভিন্ন যৌবনে সমাজ-সংসর্গে বিবাহিত জীবন যাপন করে, তবে তার চরিত্রে বন্য স্বভাব ও কাপালিকের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে কী? দীনবন্ধু এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র আলোচনার স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, প্রথমে কিছুদিন মেয়েটি বন্য প্রকৃতি বিশিষ্টা থাক্‌লেও, সন্তানবতী হলে ক্রমশঃ গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।১ প্রতীচ্য সাহিত্যের নানা বিখ্যাত রচনায় বনবাসিনীর জনপদাধিকারিণী হয়ে ওঠার কাহিনী বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্কিম-চিত্ত ঐসব কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক বিশিষ্টতা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল অনুসন্ধিৎসু হয়েছিল। এ-বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর 'শকুন্তলা ও মিরান্দা' প্রবন্ধ। 'কপালকুণ্ডলা' রচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষতর প্রভাব পূর্ব-কথিত আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। তা ছাড়া, কপালকুণ্ডলার কাপালিক প্রসঙ্গের বাস্তব পূর্ব-সূত্র রয়েছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরের নেগুয়া (বর্তমান কাঁথি) অঞ্চলে চাক্‌রি উপলক্ষ্যে অবস্থান করছিলেন। সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ির পাশেই তাঁর বাস ছিল। সেখানে কিছুদিন এক কাপালিক প্রায়ই অধিক রাত্রিতে তাঁর কাছে আস্‌তেন। কপালকুণ্ডলার প্রারম্ভিক পটভূমিতে কাঁথির সমুদ্রবেলা অমর হয়ে আছে। তেম্‌নি, অনেকের ধারণা, কাঁথির সেই কাপালিক-ই শিল্পমূর্তি লাভ করেছে কপাল-কুণ্ডলার কাপালিক চরিত্রে।

কপাল-কুণ্ডলা
উৎস

যাই হোক্, কপালকুণ্ডলার জিজ্ঞাসা নারীর দেহ-মনোগত এক অতি জটিল আধুনিক জিজ্ঞাসা। এই উপন্যাসে বঙ্কিমের বক্তব্য,—"এই sex attraction, এই আসঙ্গলিপ্সা, এই যৌন সম্বন্ধ, এই হৃদয় মিলন, এই প্রণয়, এই দাম্পত্য-প্রেম, হয়ত সম্পূর্ণ নৈসর্গিক বৃত্তি জাত নহে; শরীর-বৃত্তিই বল, আর হৃদয়বৃত্তিই বল, এই আকর্ষণ, এই আকাঙ্ক্ষা, হয়ত নারী-প্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নহে; ইহা কতকটা কৃত্রিম, সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শে সঞ্জাত, মানব জাতির হৃদয়বৃত্তির ক্রমিক অনুশীলনে উদ্ভূত। যেখানে সমাজের, সভ্যতার প্রভাব নাই, এবং সেই প্রভাবে নারীপ্রকৃতি প্রভাবিত হয় নাই; সেখানে ইহা

জীবন-সমস্যা

১। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—দ্রষ্টব্য।

না-ও জন্মিতে পারে। এই প্রণয়-প্রবৃত্তির অভাব কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বিশিষ্টতা।"১

কিন্তু, এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক বিচার-কুশলতা বা বাস্তব তথ্যাদির দ্বারা প্রভাবিত নয়; এ সিদ্ধান্ত "Self poised, Self judged, Self approved." ডঃ সুকুমার সেন অনুযোগ করেছেন,—কপালকুণ্ডলার জীবনের বিনষ্টিকর ভবিষ্যৎ তার নিজের জীবন-সীমাতেই বদ্ধ ছিল। নবকুমারের অস্বাভাবিক রূপতৃষ্ণা তার গৃহিণীত্বের সম্ভাবনাকে দূরান্বিত করে তুলছিল। এদিক থেকে, মতিবিবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কাপালিকের ঈর্ষা-কথার অবতারণা অপরিহার্য ছিল না। এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা সংশয়-রহিত। কিন্তু, কপালকুণ্ডলার জীবন-সম্ভাবনাকে অখণ্ড রূপায়িত করতে হলে তার নারী-দেহ-মনের আনুপূর্বিক বিচার-সন্ধান অপরিহার্য ছিল। বলা বাহুল্য, সেক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলার জীবন-পরিণতি বঙ্কিমের সিদ্ধান্তের অনুকূল না-ও হতে পারত। নিজ সিদ্ধান্তের পরিপোষণের জন্য বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার জীবনকে তাঁর স্বপ্ন-কল্পনালোকের বাইরে একটি পদক্ষেপও করতে দেন নি। সেখানে বঙ্কিমের স্বপ্ন, আদর্শবাদ ও কবি-কল্পনার যৌগিক মিশ্রণে কপালকুণ্ডলা একটি কাব্য-মূর্তি লাভ করেছে। উপন্যাস-পাঠকের চোখে বৃহত্তর জীবনের স্বাদুতার অভাব ও অতৃপ্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যই মতিবিবি-কাহিনীর কল্পনা। বহিরঙ্গ প্রচ্ছদে সেই গল্প ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রত্যন্তে বারে বারে ঘুরে ফিরেছে। সেই অবকাশে কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে বঙ্কিম আপন মনে যেখানে বিচরণ করেছেন,—সে অবিমিশ্র রোমান্টিক স্বপ্নের জগৎ। উপন্যাসের একেবারে প্রারম্ভে স্বপ্নলোকের একপারে কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন-মদির "কণ্ঠস্বর যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।"

ও সমাধান

উপন্যাসের শেষে আবার সেই সৌন্দর্যের লয় 'হৃদয়তন্ত্রীতে' একই ভাবে উচ্চকিত হয়েছে,—স্বপ্নলোকের আর এক পারে,—"কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানস লোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিলেন না,—"

উপন্যাসের সুরুতে কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব যেমন অপ্রত্যাশিত, তার

১। কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিসমাপ্তিতে উদ্ধৃত মানস-ফলশ্রুতি-ও তেমনি আকস্মিক। ঘটনা পরম্পরার মাধ্যমে কোথাও কপালকুণ্ডলা চরিত্র পরিস্ফুট হয় নি। কপাল-কুণ্ডলার জীবন-পরিণাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও সর্বত্র ভ্রমমুক্ত নয়। তবু, বঙ্কিমের স্বপ্ন-কল্পনার ঘন-পিনদ্ধ একান্ততা এই কাহিনীর স্বপ্নাবিষ্ট পরিণতিকে অনিবার্য,—অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। সিদ্ধান্তের সংগে দ্বিমত পোষণ করেও একনিঃশ্বাসে বই শেষ না করে উপায় থাকে না। এই অর্থেই কপাল-কুণ্ডলা কেবল উৎকৃষ্ট রোমান্স নয়,—উৎকৃষ্ট কাব্য-ও।

শিল্প-পরিণাম

বঙ্কিমের রোমান্স-প্রধান কাহিনীর মধ্যে তৃতীয় মৃণালিনী (১৮৬৯) সর্বাপেক্ষা শ্লথ-বন্ধন। বঙ্কিমের "Self approved" কবি-স্বপ্ন এখানে দুর্বার হয়েছে। তাই, কাহিনীর উপন্যাসোচিত সামগ্রিকতা রক্ষায় যথোচিত অবধানতারও ঘটেছে অভাব। মৃণালিনীর প্রেরণা সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"বক্তিয়ার খিলজির নেতৃত্বে সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গ-বিজয়ের অবিশ্বাস্য গল্প বাঙালির গৌরবে ও বলে আস্থাবান বঙ্কিমচন্দ্রকে বরাবর পীড়া দিত। ইতিহাসের কলঙ্ক তিনি কল্পনার জল-সিঞ্চনে ক্ষালন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। পশুপতি চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া তিনি সেদিন লাঞ্ছিত বাঙালির পক্ষে লেখনী ধারণ করেন।"[১] বঙ্কিমের "কল্পনাজল" মৃণালিনীকে কাব্য সুষমায় ঋদ্ধ করেছে; উপন্যাসদেহে এখানেই বঙ্কিম প্রথম উৎকৃষ্ট গান ও ছড়ার ব্যবহার করেছেন। "ললিতা ও মানস"-এর একদা ব্যর্থকাম কবি যেন তাঁর সার্থক কবি-লেখনীকে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছেন মৃণালিনীর গদ্য-পদ্য রচনায়।

মৃণালিণী

বিষবৃক্ষ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন ঘট্‌ল। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—"এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্ব-ই এদের মুখ্য উপকরণ।............বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"[২] দুর্গেশনন্দিনী থেকেই সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস যে একটি স্বনির্বাচিত আত্মকেন্দ্রিক সমাধানের পথে চলেছিল, সেকথা আগে বলেছি। শুধু তাই নয়, কপালকুণ্ডলা-কাহিনীর বিভিন্ন অংশে বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ

বিষবৃক্ষ

১। ভূমিকা—সাহিত্য পরিষৎ সং।
২। দ্রষ্টব্য—ঐ।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও ছাপ পড়েছে। মৃণালিনীর বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে আছে বঙ্কিমের কবি হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা।

কিন্তু বিষবৃক্ষের পর্যায়ে এসেই বঙ্কিম ঔপন্যাসিকের স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এবার থেকে তাঁর জীবন-সমস্যাবোধ যেমন ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে নিবিড়, তেম্‌নি তাঁর বিচার-বিকাশ সব কিছুই হয়েছে তথ্যানুসারী ও বৈজ্ঞানিক। বিষবৃক্ষের সংগে বঙ্কিমের ব্যক্তি-জীবনের সান্নিধ্য বিষয়ে নবীনচন্দ্রের বর্ণনা পূর্বে উদ্ধার করেছি। তা ছাড়া, একদিন কুন্দনন্দিনী প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার উপলক্ষ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—"শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?"

ও বঙ্কিমের ব্যক্তিজীবন

বঙ্কিম উত্তর করেছিলেন,—"কতক সত্য বই কি? তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েছে।"[১]

আর একবার বহুদিন পরে (১৮৯৩) নবীনচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর অসামাজিক আবেদনের জন্য অনুযোগ করেছিলেন। সাশ্রুনেত্রে মৃতা কনিষ্ঠা কন্যার অয়েল পেণ্টিং দেখিয়ে বঙ্কিম তখন বলেছিলেন,—"এই কন্যাটিও কুন্দনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল।"[২]

যাই হোক্, বিষবৃক্ষ রচনার কালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-উপলব্ধির দ্বারা প্রভাবিত যে হয়েছিলেন, তাতে সংশয় নেই। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সংগে শিল্প-বাচ্যের সম্পর্ক যেখানে এত অপরিচ্ছেদ্য, সেখানে কল্পনা ও আদর্শ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা চলে না। আদর্শ যত-ই মহৎ হোক্, প্রত্যক্ষ যন্ত্রণাকে শান্ত করার পথে একটা সীমাকে সে লঙ্ঘন করতে পারে না। তা ছাড়া, ঐ সময় থেকে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের সম্পাদনায় "সব্যসাচী"র ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ১২৭৯ বাংলা সনের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ ঘটে। ঐ প্রথম সংখ্যা থেকেই বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হতে থাকে; যদিও গ্রন্থরূপে এই উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ কাল ১২৮০ সাল (১৮৭৩ খ্রীঃ)। বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হিসেবেও বিষবৃক্ষের তাৎপর্য আছে। প্রথমাবধি বলেছি, বয়ঃসন্ধি-যুগের আবেগ-স্ফীত জীবন-যন্ত্রণাকে বঙ্কিম একটি বিচার-সম সমাধানের মুখোমুখী টেনে তোলার চেষ্টা করে আস্‌ছিলেন। মধুসূদন থেকে বঙ্কিম-প্রতিভার পার্থক্য মূলতঃ বিচার-সমতার (Rationality) আপেক্ষিক প্রাধান্যে। তা হলেও, প্রথম পর্যায়ের কলাকর্মে বঙ্কিম-প্রতিভা প্রথম

বিষবৃক্ষের অনন্য-পূর্বতার কারণ

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।
২। আমার জীবন (৪র্থ খণ্ড)।

যৌবনের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নকল্পনায় পরিস্ফীত হয়েছিল। কিন্তু, বঙ্গদর্শন-রচনার কালে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়সের আপেক্ষিক পরিণতি যেমন ঘটেছিল, তেম্‌নি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসেবে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য আত্ম-সমালোচনার দায়িত্বও সেদিক থেকে কম ছিল না। বঙ্কিমের সহজে বিচারমূলক স্বভাব বঙ্গদর্শনের যুগে এসে জীবন ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে যুক্তি-বিচারমুখী হয়েছিল। তারই প্রথম প্রত্যক্ষ ফল বিষবৃক্ষ। এই কারণে কুন্দনন্দিনীর ব্যথা-ঘন জীবন-পরিণাম অত স্বাভাবিক,—অত প্রশ্নাতীত, সাবলীল। এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। বঙ্কিমের সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস-সমূহে তাঁর সামাজিক সহানুভূতি ও নৈতিক দূরদর্শনের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, প্রায়ই ঘটনা ও সমস্যাস্রোতের ইচ্ছামত মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে সূত্রধরের মত বঙ্কিম গ্রন্থ কাহিনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ব্যর্থ জীবনের বেদনাভারে শৈবলিনীর অতীত-চারণ যখন শিল্পীর সমবেদনাতুর চিত্তে স্বপ্নাবিষ্ট কারুণ্যের সৃষ্টি করে, তখনই দৃঢ়হস্ত বঙ্কিম 'চন্দ্রশেখর' গল্পের রথরশ্মি ধরে বলেন,—"পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর একথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে একথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে আমরা এ পাপ-চিত্রের অবতারণা করিতাম না।"

বিষবৃক্ষ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের শিল্প-ব্যক্তিত্বের এই আকস্মিক-তীব্র প্রকাশ কোথাও লক্ষিত হয় না। কেবল গ্রন্থ সমাপ্তিতে শেষ ছত্রে লিখেছিলেন,

বিষবৃক্ষের জীবন ও আদর্শ

—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" এই সমাপ্তিক ছত্রকে উপন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার না করলেও চলে। স্বীকার করলেও, মূলগত জীবন-সমস্যার ঔপন্যাসিক পরিণামের আস্বাদনে কোথাও বাধা ঘটে না। এই অর্থেই বল্‌ছিলাম, কুন্দনন্দিনীর করুণাঘন পরিণতি সূর্যমুখীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে যেমন স্বাভাবিক, তেম্‌নি সাবলীল।

কিন্তু, সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর অধিকার-দ্বন্দ্ব বিষবৃক্ষের প্রধান হলেও শ্রেষ্ঠ উপাদান নয়। বিষবৃক্ষের ট্রাজেডির প্রাণ-কেন্দ্র হীরাদাসী। প্রেমের কুণ্ঠিত পরোক্ষতা, বাসনার আদ্যন্ত লজ্জারুণ দুর্বলতা, আত্মদাহ ও আত্ম-

বিষবৃক্ষের ট্রাজেডি

দানের নীরব গোপনীয়তায় কুন্দ করুণাবহ। কিন্তু, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সচেতন চেষ্টায়, আত্মবিস্মরণের অসহ্য ধিক্কারবোধে দৃপ্ত-ব্যক্তিত্বময়ী

উন্মাদিনী হীরা যথার্থ ট্রাজিক। তাই, নগেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিষদাহে তপ্ত কুন্দ-কণ্ঠের কাতরোক্তির তুলনায় বিষবৃক্ষের যন্ত্রণা-রূপ পরিণামী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে উন্মাদিনী স্ত্রীকণ্ঠের সংগীতে :—

"স্মরগরল খন্ডনং মম শিরসি মন্ডনং
দেহি পদপল্লব-মুদারম্।"

বর্তমান প্রসঙ্গের সূচনায় উদ্ধৃত সমাচার দর্পণের পত্রে সর্বশেষ অভিযোগ করা হয়েছিল,—বিধবা নারীর কি জীবন-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই। হীরার ক্ষেত্রে বঙ্কিম দেখিয়েছেন, বিধবার জীবন-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা তার সহজ বৃত্তি। কেবল জৈবিক দুষ্প্রবৃত্তি নামে একে অভিহিত করা চলে না। হীরাকে স্খলিতা বল্‌লেও, বঙ্কিম পাপিষ্ঠা বল্‌তে পারেন না। সরল স্বভাবা নারীর সহজ সংযম-ব্রতকে বিধ্বস্ত করে যৌবনের স্বাভাবিক আকূতি কি করে গোপনে গোপনে নিজ লেলিহ জিহ্বা বিস্তার করে, তারই মানবিক আর্তি-ঘন চিত্র হীরা। ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে এই জীবন-চিত্রকেই বঙ্কিম পরিণত করতে চেয়েছেন কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর মধ্যে। কিন্তু, হীরা রোহিণীতে সম্পূর্ণ হয় নি।

সে আলোচনা পরে হবে। তার আগে, ইতিহাসের ক্রমে নিবন্ধ আছে অন্যতর প্রসঙ্গ-কথা। বিষবৃক্ষের একই বৎসরে প্রকাশিত হয় ইন্দিরা (১৮৭৩); এটি প্রথমে ১২৭৯ সালের চৈত্রসংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দিরা প্রথমে ছোট ছিল, পরে পঞ্চম সংস্করণে বড় হয়। বিষবৃক্ষের জীবন মন্থিত ট্রাজিক যন্ত্রণার সফল চিত্রায়ণের পরে ইন্দিরাতে বঙ্কিম-প্রতিভা যেন মনের বিশ্রাম খুঁজেছিল। ইন্দিরা লঘু চালের সরস গল্প। একটি বিবাহিতা বালিকা শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে দস্যু-বিড়ম্বিত হয়ে অনেক দিন পরে আবার স্বামী এবং শ্বশুর ঘরের অধিকার ফিরে পেয়েছিল,—ইন্দিরার গল্প-বিষয় ঐটুকুই। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুপরিচিত 'মন্মথকাব্য' প্রভৃতি আদিরসাল আখ্যায়িকার নায়িকার মত ইন্দিরাও হারানো স্বামীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং স্বামীকে হস্তগত করিবার জন্য যাবতীয় নারীকলার প্রয়োগ করিয়াছে।"[১] তা হলেও, ইন্দিরার গল্পে আদি-রসিকতা কোথাও প্রবল হতে পারে নি। বঙ্কিমের শালীন রুচিবোধ লঘু গল্পকে যেমন হৃদ্য করেছে, তেম্‌নি তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে দাম্পত্য জীবনাদর্শের ভাব-বিভূতি।

ইন্দিরা

যুগলাঙ্গুরীয় ১২৮০ বাংলা সালের বঙ্গদর্শন বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে গল্পগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৭৪ খ্রীঃ।

যুগলাঙ্গুরীয়

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খন্ড, ২য় সং।

এই দুটি অ-প্রধান গল্প রচনার পরেই বঙ্কিমের সর্বাপেক্ষা সমস্যা-জটিল উপন্যাস চন্দ্রশেখর-এর (১৮৭৫) উদ্ভব। ১২৮০ সালে উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে' বৎসরাধিক কাল পরে শেষ হয়েছিল। রেনেসাঁস যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছি,—মধ্যযুগীয় সমষ্টিগত মূল্যবোধ, তথা সুচিরকালস্থায়ী সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ তীব্র বিরোধ রচনাই ছিল একালের ব্যক্তি-স্বতন্ত্র জীবন-চেতনার মৌল স্বভাব। আর, সমকালীন বাংলার বিশেষিত সমাজ পটভূমিতে এই বৈপ্লবিক উৎক্ষেপ নারী-ব্যক্তিত্বের মুক্তি-কামনাকে কেন্দ্র করেই রচনা করেছিল নিত্য নূতন জটিলতাময় জীবনাবর্ত। এ-পর্যন্ত বঙ্কিম-উপন্যাস-ধারার বিবর্তনেও দেখেছি, ব্যক্তি-নারীর পক্ষ থেকে এই জটিলতা রচনার প্রয়াস ছিল নিতান্ত পরোক্ষ; অনেক ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের নায়িকারা ছিল অপ্রত্যাশিত জীবন-পরিবেশের যূপকাষ্ঠে করুণতম বলি। বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর পক্ষে এ কথা যত সত্য, হীরা'র পক্ষে তার চেয়ে কম নয়। অথচ, বঙ্কিম-উপন্যাসে শৈবলিনীর পরেই হীরার নারী-ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বাপেক্ষা সুগঠিত,—সর্বাধিক তীব্র প্রতিফলিত। এই কারণেই, কুন্দনন্দিনীর জীবন-পরিণাম দুঃখ-কারুণ্যে চিত্তকে দ্রবীভূত করে; এই কারণেই হীরার পরিণতি চিত্তকে উত্তপ্ত করলেও ট্রাজিক অনুভূতির সম্পূর্ণতা বিধান করতে পারে না।

চন্দ্রশেখর ও জীবন-সমস্যার সমাধুনিকতা

এই পরোক্ষ নিষ্ক্রিয়তার ভাব-লোকে শৈবলিনী আপন জীবনের রথ-রশ্মি ধারণ করে বিরোধ-জটিলতার প্রত্যক্ষ পটভূমিতে এসে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একদিন অভিযোগ করেছিলেন,—

শৈবলিনী

> "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেন নাহি দিবে অধিকার,
> হে বিধাতা।"

তার বহুপূর্বে, বঙ্কিম-সাহিত্যে অন্ততঃ এই একবার উনিশ শতকের রেনেসাঁস-যন্ত্রণায় পীড়িত ব্যক্তি-নারী বিধাতার প্রতিস্পর্ধিতা করে আপন ভাগ্য জয়ের অধিকার জোর করে দাবি করেছে। সাহিত্যিক রেনেসাঁসের ইতিহাসে এই ঘটনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আগে বলেছি, উনিশ শতকীয় সমাজ-বিপ্লবের ধারায় নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস ছিল পুরুষ-লগ্ন। অর্থাৎ, ইংরেজি শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যমূলক আদর্শে উদ্দীপ্ত, সমাজ-কেন্দ্রিক জাতিত্ববোধের সচেতনতায় সক্রিয়, সেকালের বাঙালি পুরুষেরাই নারী-ব্যক্তিত্বকে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় একান্ত অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু, একথাও বলেছি যে, নারীত্বের স্বয়ম্পূর্ণতার অভাবে পর-পুষ্ট এই মহৎ প্রয়াস হয়ে রয়েছিল স্বভাব-দুর্বল। বিশেষ

করে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাপক প্রয়াসের ফলে নগর এবং মফঃস্বল বাংলায়ও বালিকা শিক্ষার উৎসাহ ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় পঁচিশ বছর পরে নারী-শিক্ষা প্রয়াসের নৈতিক ও সামাজিক ফলশ্রুতি নারী-ব্যক্তিত্বের ইতিমূলক অবয়ব সংগঠনে সহায়ক যে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সমকালীন জীবন

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, বঙ্কিমের বাস্তব উপন্যাসগুলির সমস্যা-পটভূমিও সমকালীন বাংলার ব্যবহারিক জীবন-লোকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনীর সমস্যা নিয়ে বঙ্কিম ইতিহাসের প্রেক্ষালোকে পলায়ন করেছিলেন। চন্দ্রশেখর সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। কিন্তু, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এর প্লট্ বঙ্কিম-সমকালীন জীবন-প্রচ্ছদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। তবু, দেখ্‌ব, এই সব কাহিনীর জটিলতা বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আনুপূর্বিক পরিবেশ-সচেতনতা রক্ষা করতে পারেন নি। কুন্দনন্দিনীর পলায়নের পর থেকে, তার হীরার গৃহে বাস এবং পুনরায় আত্ম-প্রকাশ পর্যন্ত কালের বর্ণনা সেকালের গ্রামীন জীবন-পরিবেশে কতদূর স্বাভাবিক ছিল, সে সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ আছে। তাছাড়া, কৃষ্ণকান্তের অন্তঃপুরে ভ্রমরকে রোহিণীর গিল্‌টির গহনা দেখিয়ে যাওয়ার পরিণতি যে কিছুতেই সে-কালের সমাজে বঙ্কিম-নির্দেশিত পথে যেত না, তাতে সংশয় নেই। গোবিন্দলালের প্রত্যাবর্তনের, এমন কি, ভ্রমরের পিতৃগৃহ-যাত্রারও আগে কাহিনীর বাস্তব পরিসমাপ্তি ঘট্‌তে পারত রোহিণীর চির-সমাপ্তিতে।

ও বঙ্কিমের বাস্তব উপন্যাস

বস্তুতঃ, কাহিনীর বহিরঙ্গ প্রচ্ছদ সম্বন্ধে অনবধানের জন্য বঙ্কিমকে দায়ি করা চলে না। পূর্ববর্তী জীবনালোচনায় দেখেছি, সেকালের নগর বাংলায় নূতন মূল্যবোধের প্রস্তুত জটিল জীবন-বন্ধন দিকে দিকে কেবল অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছে; বৃহত্তর সমাজ-ভূমিতে তার ব্যাপক প্রতিষ্ঠার জন্য আরো দীর্ঘ কালের অপেক্ষা ছিল। বঙ্কিমের উত্তর-ভূমিতে 'চোখের বালি'-নষ্টনীড়ের রবীন্দ্রনাথ সেই জীবন-স্বভাবকে নিয়ে বাস্তব প্রেক্ষিতে প্রথম পদক্ষেপ করতে পেরেছিলেন।

এদিক্ থেকে বিনোদিনী শৈবলিনীর উত্তরসূরী।

কিন্তু, বঙ্কিম তাঁর যুগের সদ্য-অঙ্কুরিত জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সাহস-ভরে। তার সমাধান রচনা করতে চেয়েছেন বিচার-সম দৃষ্টিতে। তাই যতটুকু আছে, তারই 'পরে নির্ভর করে যা হতে পারত, বা যা হওয়া সম্ভব, বঙ্কিম নিজের মানস-লোকে তার একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি রচনা করেছেন। এই অর্থেই বঙ্কিমের জীবন-বোধ

"Self poised, Self judged, & Selfapproved." ঔপন্যাসিক বঙ্কিম কেবল সমকালীন জীবন-জটিলতার অখণ্ড-সম্পূর্ণ রূপ-কারই নন,—তিনি বাঙালি জীবন-ধর্মের অনাগত-বিধাতা ধ্যানী কবি-ও। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলাদি প্রথম পর্যায়ের সৃজন-প্রবাহে বঙ্কিমের ধ্যান-দৃষ্টি ছিল স্বপ্ন-বিহ্বল। ফলে, এই রচনাবলী হয়েছে রোমাণ্টিক। কিন্তু, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল-এর পরিণত পর্যায়ে সেই ধ্যান বাস্তব-জীবন-ভিত্তিক। যে পরিমাণে দুঃসাহসী, প্রায় সমপরিমাণেই যথাযথ-ও। চন্দ্রশেখরের ঔপন্যাসিক জটিল-তার পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্যের মূলে যুগপৎ নিহিত রয়েছে ঔপন্যাসিকের তথ্য-সচেতনতা ও কবির ধ্যান। এই কারণেই আমাদের ধারণা, শৈবলিনীর মধ্যে নারীর যে স্বয়ংক্রিয় বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব প্রথম উপন্যাসোচিত রূপলাভ করেছে, তার মূলে ছিল প্রতীচ্য শিক্ষিত বাঙালি নারীর প্রথম স্বভাবাঙ্কুরের প্রণোদনা।

বাস্তবের সমস্যা

এটুকু ছাড়া, বাংলার সমকালীন জীবন-প্রচ্ছদের নিরন্ধ্র-জটিল ভাব-ভূমিতে শৈবলিনীকে নিয়ে বঙ্কিম আগাগোড়া উপন্যাসে সঞ্চরণ করেছেন তাঁর বিচার-সম (Rational) কল্পনা-লীলার বাসনা-লোকে। প্রথমেই উপন্যাসের কাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ইতিহাসের অতীত-ভূমিতে,—মীরকাসিম ও ইংরেজ-বিরোধের যুগে। ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রামাণ্য দাবি করে 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম গোলামহোসেন্-এর 'সয়ের মোতাক্ষরীন্'-এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, মূল উপন্যাস-সমস্যার পক্ষে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা গৌণ; মুখ্য কাহিনীটি সমাজ-সমস্যামূলক। সেই সমস্যার চিত্রায়ণে সমকালীন সংস্কার-তীব্রতার বাধাকেই এড়িয়ে যাবার জন্যে কবি-বঙ্কিম ইতিহাসের প্রচ্ছদ আশ্রয় করেছেন। মীরকাসিম-গুর্‌গন-ফস্‌টর-আমিয়ট্ কথা 'ঐতিহাসিক' হলেও চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনী বঙ্কিমের মানস-সন্তান। আর, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের মনোধর্ম সমকালীন জীবন-সমস্যার প্রতি ছিল অবহিত। অতএব, ঐতিহাসিকতা ও জীবন-সচেতনতার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে উপন্যাসের বহিরঙ্গে অসামঞ্জস্যের আলোড়ন জেগেছে ক্ষণে ক্ষণে। বঙ্কিমের বিচার-দৃষ্টি তাকে উপেক্ষা করে গেছে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রচনা করেছে কল্পনার স্বপ্ন-বিহ্বল পরিবেশ। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে সম্ভাব্য জীবন-সমস্যার উত্তুঙ্গতম মুহূর্তে কল্পনার সৌন্দর্য-স্বপ্ন যে পরিমাণে বিচার-সংগতিকে আচ্ছন্ন করেছে, উপন্যাসটি কেবল ততটুকুই রোমান্টিক।

ও চন্দ্রশেখরে
রোমান্সের স্বরূপ

উপন্যাসের প্রারম্ভিক উপক্রমণিকাংশেই একবার রোমান্টিক্ স্বপ্না-চ্ছন্নতা বিচারগত অসংগতিকে গোপন করতে চেয়েছে। প্রতাপ-শৈবলিনীর

"বাল্যকালের ভালবাসা"র বর্ণনায় বঙ্কিম এখানে কেবল প্রাণ-চপলই নন, হয়ত সচেতনভাবে স্বপ্নাভিসারী। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র এই প্রণয় সংঘটন ব্যাপারের বাস্তব-সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১] কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিচার যদি নিরপেক্ষ না-ও হয়, তবু বলতেই হয়,—শৈবলিনীর চরিত্রায়ণে এখানেই স্ব-বিরোধের বীজ উপ্ত হয়েছে। কৈশোর-প্রণয়ের চঞ্চল বর্ণনা যখন মোহাবেশে নিবিড় হয়েছে,—বঙ্কিম তখন প্রতাপ-শৈবলিনীর ছবি এঁকেছেন,—"নৌকা গণ! কয়খান নৌকা যাইতেছে বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠার খানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর একবার গণিয়া একুশ হইল। তারপর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে!" এই স্বর্ণাভ আলোক-চ্ছটার অবকাশে সচেতন অন্য-মনস্কতায় বঙ্কিম একটি প্রয়োজনীয় তথ্য নিক্ষেপ করে গেছেন,—শৈবলিনী নিরক্ষর ছিল! কিন্তু, সমগ্র উপন্যাসে তার মধ্যে সংহততম ব্যক্তিত্বের যে কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করি, শিক্ষা-দীপ্ত সুকর্ষিত মননের অভাবে তার বিকাশ বা পরিণতি নিতান্ত অসম্ভব। এ-ক্ষেত্রে কেবল ইংরেজি শিক্ষার কথা বলছি না,—শিক্ষা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বের একটি চরম রূপ সেকালের হটি বিদ্যালঙ্কারের নারীস্বভাবেও সু-অবয়বান্বিত হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের ঘন-কেন্দ্রীভবনের জন্য শিক্ষার কর্ষণ যে কত অপরিহার্য, বিদ্যালঙ্কারের জীবন তার সমুৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে এক বিনোদিনী [চোখের বালি] ছাড়া শৈবলিনীর মত এমন উগ্র-তীব্র প্রতিফলিত নারী-ব্যক্তিত্ব দুর্লভ। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের উগ্র-ঘনতার মূলে ছিল তার সুকর্ষিত শিক্ষিত মননের সংগঠন। আমাদের ধারণা, শৈবলিনীর মধ্যে বঙ্কিমের ধ্যান নারীত্বের এমন সু-অবয়বান্বিত ব্যক্তিত্বকে সজীব করে তোলার প্রেরণা পেয়েছিল সেকালের প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত নারী সমাজের মধ্য থেকে। কিন্তু, ইতিহাসের যে যুগে বঙ্কিম তাঁর গল্পকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,—সে যুগে গ্রামীন্ নারীর মধ্যে নিরক্ষরতা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই কালৌচিত্য রক্ষার জন্যই শৈবলিনীকে নিরক্ষর করতে হয়েছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসে অতীত ও বর্তমান

মূল উপন্যাসের প্রসঙ্গে এই অতি-বিস্তারিত আলোচনা কেবল অপ্রাসঙ্গিক নয়, নিরর্থকও মনে হতে পারে। কিন্তু, এই উপলক্ষ্যে একটি বক্তব্য পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। বঙ্কিমের উপন্যাস-কলা মাত্রকেই প্রধানতঃ অতীতচারী, অতি রোমান্টিক্ বলে মনে করা হয়। জীবনের

১। স্বদেশ ও সাহিত্য।

মৌল বস্তু-ভূমি থেকে দূরবর্তী বলেই অনেক সময় এদের ঔপন্যাসিক স্বভাবের প্রতি সংশয়-দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই দেখব, বঙ্কিম তাঁর সমকালীন সমাজে অঙ্কুরিত জীবন-সমস্যাকে নিয়ে দূরযাত্রা করেছেন ভাবী পরিণাম নির্দেশের প্রয়াসে। এই কারণেই, বিরোধিতামূলক বাস্তব বিক্রিয়ার সম্বন্ধেও সামাজিক বঙ্কিমকে অবহিত হতে হয়েছে। ফলে, বর্তমানের কাহিনীকে নিয়ে তাঁকে অতীতের প্রচ্ছদে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে। তাতে কাহিনীর বর্ণনা বা চরিত্রের উপস্থাপনায় স্ব-বিরোধ কিছু কিছু ঘটেছে। কিন্তু, বঙ্কিম-সমকালীন রেনেসাঁস-উত্তর জীবন-ভূমির প্রতি ধ্রুব দৃষ্টিতে অন্বিত হলে এই সব আপাত-বিরোধের অন্তরালে যথার্থ জীবন-সমস্যার পরিচয় আবিষ্কারে অসুবিধা ঘটে না। চন্দ্রশেখর-এ সেই জীবন-সমস্যার ভিত্তি শিক্ষিত নারীর স্বাতন্ত্র্য-কামনার বিষ-জ্বালার মধ্যে।

বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে শৈবলিনী সমাজ-জীবন-শিল্পী বঙ্কিমের দুঃসাহসিকতম সৃষ্টি। শিল্পী হিসেবে বঙ্কিম যে তাঁর নিজ কালের পক্ষে অনাগত-বিধাতা ছিলেন, শৈবলিনী তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্কিম-সমকালীন বাংলায় বিধবা-নারীর বঞ্চিত জীবনের সমস্যাই ছিল সমাজ-বিপ্লবীদের শ্রেষ্ঠ চিন্তার বিষয়। শিক্ষা-পুষ্ট কুমারী-হৃদয়ের মূক প্রণয়-বেদনা মুক্তির ভাষা খুঁজে পায় নি সেদিন। সবচেয়ে বড় কথা সে-কালের সমাজ-জীবন একটি মাত্র ধ্রুব আদর্শ-কেন্দ্রের চারপাশে বিচরণ করে ফিরেছে। সধবা, বিধবা, কুমারী নির্বিশেষে সকল নারীই সেখানে অবিচল কল্যাণ-ধর্মের সাধনায় শাশ্বত কল্যাণীত্বে প্রতিষ্ঠিত। আর, সেই কল্যাণধর্মের সাধনা ছিল নবজাগ্রত পারিবারিক জীবন-ঐতিহ্যের,—নবীন কৌল-ধর্মের নিষ্ঠা-পূত অনুসরণ-ব্রত। বিধবার পুনর্বিবাহ ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা কেবল শাস্ত্রীয় বলেই নয়, কল্যাণময় বলেও সে-কালে সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু, কৌমার্যের ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালায় বিবাহিতা কুলরমণীর "ম্লেচ্ছ" সংগে পতিগৃহ ত্যাগের মত দুরাচরণ সেকালের জীবনাদর্শের পক্ষে চরম দুঃস্বপ্নেরও ছিল কল্পনাতীত। বিশেষ করে শৈবলিনীর স্বামী ছিলেন আদর্শ জ্ঞানতাপস,—দেবতুল্য মহাপুরুষ! আবহমানকালের আদর্শ শৈবলিনীকে, তথা এ-কালের নারীত্বকে একটিমাত্র নির্দেশই দিয়ে এসেছিল;—সেদিনও দিতে চেয়েছিল—"তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক।"১

শৈবলিনী ঃ—
বঙ্কিমের দুঃসাহসিকতম দৃষ্টি

১। চন্দ্রশেখর—প্রথম খণ্ড; চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু, আধুনিক মনুষ্যত্বের সব চেয়ে বড় সমস্যা,—জীবনের চরম সার্থকতা এবং পরমবাসনা কখনো একপথ বেয়ে চলে না। আদর্শ যেখানে কেবলই অনুশাসনের চোখ রাঙায়, জীবন সেখানেই তার সীমাকে চায় লঙ্ঘন করতে। দিনে দিনে সমস্যা হয় অনপনেয়,—জটিলতার গ্রন্থিমোচন করা মনে হয় অসম্ভব। শৈবলিনীও তা পেরে ওঠে নি। তাই সর্বমুখী সামাজিক তিরস্কারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিন সে প্রতাপকে তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল,—"কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন?"

স্পষ্টই দেখ্‌ছি, চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনীতির কথাকেই একান্ত করে তোলেন নি। নারী-প্রণয়,—ব্যক্তিত্বময়ী নারীর অন্তর্জ্বালাকে একটি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে ধরে বিচার করতে চেয়েছেন। শৈবলিনীর নারী-ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তার জীবন-পরিণামে সব কিছুরই ঘটেছে মহাবিনষ্টি। একে মহৎ বিনাশ বলা চলে কি না, তাতে সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু, শৈবলিনীর দুর্ভাগ্যের জন্য কেবল কি তার 'পাপিষ্ঠতা' অথবা, তার অদৃষ্টদেবতাই দায়ী? প্রথম কৈশোরের সান্নিধ্যের অবচেতন প্রভাব ছাড়াও চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ নামক দুটি পুরুষশ্রেষ্ঠের রচিত বিড়ম্বনাও শৈবলিনীর জীবনে কম নয়। শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবেসেছিল নিজের অজ্ঞাতে,—সমুত্তীর্ণ কৈশোরে হঠাৎ সে একদিন "বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

শৈবলিনী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

অতএব, প্রতাপকে নিয়ে শৈবলিনী ভাগীরথীতে সাঁতার দিয়েছিল মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু চরম মুহূর্তে "শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল।" চঞ্চলা কিশোরীর পক্ষে এ আচরণ অসংগত হলেও সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল না। তারপর শৈবলিনীর একদিন "বর মিলিল," সে বর দেব-দুর্লভ চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের গার্হস্থ্যে দায়িত্ব-ব্রতের কর্ণধারণ করে স্বল্পকালের জন্য হলেও শৈবলিনী অতীত-যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হয়েছিল। প্রতাপের প্রতি তার উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট। জীবনের একটা সুখ-স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নের মত পরিহার করে শৈবলিনী বাঁচতে চেয়েছিল কোনো রকমে। তাকে বাঁচতে দেয় নি, চন্দ্রশেখর আর প্রতাপ। যাকে ভুল্‌তে চাইছিল, সেই প্রতাপ চন্দ্রশেখরের

অনুরক্ত শিষ্যের মত তাঁর চারপাশে ঘুরতে লাগ্‌ল। শৈবলিনীর প্রতি তাঁর কোনো গোপন আসক্তিই অন্ততঃ পরিব্যক্ত হয় নি সেদিন। সেই অনাসক্ত সংযমপূত স্বভাব এবার দ্বিগুণ বেগে শৈবলিনীর চিত্তে প্রতিফলিত হল দেবমূর্তির মহিমায়।

অন্যদিকে যাঁকে আশ্রয় করে শৈবলিনী অতীতকে বিস্মৃত হতে,—নূতন করে বাঁচতে চেয়েছিল, সেই চন্দ্রশেখর নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত তাকে নিরাশ্রয় করেছেন। চরম দুর্দিনে শৈবলিনী একদিন বলেছিল,—"আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না।"—এই অনুভূতির চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য শৈবলিনীর জীবনে আর কিছু নেই। চন্দ্রশেখর নিজের মনে মনেও একথা অনুভব করেছিলেন,—"হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত, শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব— অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া নবযুবতীর কি সুখ?...এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশ-সঞ্চিত পুস্তকের রাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণী মুখপদ্ম কি জীবনের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী

শৈবলিনী তাই করেছে।—বিদ্যা ও প্রণয় সাধনার এই দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসা তীব্র-প্রতিফলিত হয়েছিল রবীন্দ্রকাব্যে কচ-এর জীবনেঃ—

"বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি
কোনো নর মহাতপ!" [বিদায় অভিশাপ]

—যে যাই করে থাক্‌, উনিশ শতকীয় বাঙালির সমাজ-জীবনে এমন একান্ত প্রণয়-তপস্যার মত লজ্জাকর অপরাধ আর কিছু ছিল না। সেকালে বাঙালি হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৈদিক মন্ত্র-বলে পত্নীর হৃদয়ের 'পরে চির জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিদিনের জীবনাচরণে প্রণয়ের স্পর্শ দিয়ে সেই অধিকারকে নিত্য-নব করে নেবার দায়িত্ব সেকালের পুরুষ কেবল প্রবল শক্তির বলেই করেছে অস্বীকার। জীবনে-জীবন যোগ করার দাবি সেদিন ছিল হাস্যকর বাতুলতা মাত্র। তাই, চন্দ্রশেখর তার কলপনা-মাত্রে ছি, ছি, করে উঠেছিলেন মনে মনে। কচও

চন্দ্রশেখরের মতই প্রণয়কে ছেড়ে বিদ্যাকে বরণ করে নিয়েছিল, তার শাস্তি স্বরূপ নিজ জীবনে বহন করেছে প্রণয়-অভিশাপ। চন্দ্রশেখর সেই বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন শৈবলিনীর জীবনের 'পরে। একদিকে বিবাহিত জীবনে প্রণয়-বঞ্চনা, অপর দিকে বিবাহ-পূর্ব জীবনে প্রণয় প্রাচুর্যের স্মৃতি-যন্ত্রণা নিয়ে শৈবলিনী স্বামিগৃহ ত্যাগ করে এসেছিল। স্বামীর সম্বন্ধে সে বলেছে, "তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভার আরও ভারি হইল।" কারণ স্বামীকে সে ভক্তি করত। ভালবাসার উৎস হৃদয়ের সমমর্মিতার মধ্যে; তার জন্য প্রয়োজন দুটি হৃদয়ের সমান-ধর্মিতা। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর থেকে আজীবন দূরত্ব বজায় রেখেছেন,—তার নারী-সত্তার উপযোগী সমানধর্মী হয়ে ওঠার নাম-মাত্রে হয়েছেন সংকুচিত-চিত্ত। তাই, শৈবলিনী তাঁকে আত্মার নিভৃতলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি,—দূর থেকে ঊর্ধ্বমুখে করেছে প্রণাম। তাই সে বলে, "আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

শৈবলিনী ও প্রতাপ

একই প্রসঙ্গে প্রতাপকে সে বলেছে;—"তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

ফল কথা, শৈবলিনী তার জীবনের একান্ত সংগী রূপে যাকে পেয়েছিল, তাঁর মধ্যে সে তার নিভৃত জীবন-রূপকে প্রতিবিম্বিত করবার অবকাশ পায়নি। অথচ, অপরের মধ্যে আপন আত্মার প্রতিবিম্বনই প্রেমের মৌলধর্ম। অন্যদিকে যাকে পেলে তার সব পাওয়া চরিতার্থ হতে পারত, যার "শিরে শিরে, শোনিতে শোনিতে, অস্থিতে অস্থিতে" শৈবলিনী-অনুরাগ "অহোরাত্র বিচরণ" করেছে, শৈবলিনীর তৃষ্ণাতপ্ত চিত্তের কাছে সে হয়ে রইল চির-অলভ্য! এখানেই মানব জীবনের,—চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি।

চন্দ্রশেখর-এ ট্রাজেডি

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি প্রতাপের আত্মদানে নয়; শৈবলিনীর পুনঃ সংবিৎলাভে! প্রতাপের মৃত্যুতে সমাপ্তি আছে, কিন্তু মানবতার পরাভব-জ্বালা নেই;—প্রতাপের সমাপ্তি মহিম-করুণ, কিন্তু তার পরিণাম ট্রাজেডির যন্ত্রণা-তপ্ত নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতাপের মহাপ্রয়াণ লক্ষ্য করি এক অনন্ত কল্প-লোকে,—"যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য"—! সেখানে "লক্ষ শৈবলিনী পদ প্রান্তে পাইলেও," লেখক বলেছেন,—প্রতাপ "ভাল বাসিতে চাহিবে না।"

অতএব,—ট্রাজেডি কোথায়,—এই অনন্ত পরিণামের সবটুকুই অনন্ত পূর্ণতার ধর্মে অভিব্যঞ্জিত। এখানে,—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

কিন্তু, শৈবলিনী যেখানে পড়ে রইল, সেখানে "ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট" আছে, "রূপে মোহ" আছে, আছে "প্রণয়ে পাপ।" রমানন্দ স্বামীর 'যোগবল বা Psychic force'-ও সে চিত্তকে 'অ-পাপ-বিদ্ধ' করতে পারে নি। জ্ঞানোন্মেষের পরেও প্রথমেই সকলের অন্তরালে সে প্রতাপকেই কাছে ডেকেছে,—বলেছে,—"আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।" বলেছে,—"যতদিন তুমি এই পৃথিবীতে থাকিবে আমার সংগে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না।"—অর্থাৎ, শৈবলিনী-চিত্ত তখনই যে বিবশ হয়েছিল, তাতে সংশয় নেই। এ-যন্ত্রণার শেষ কোথায়,—প্রতাপের মৃত্যুতে,—না তার আশীর্বাদে?

বাঙালি জীবন-ধর্মের পক্ষে শৈবলিনীর এই ট্রাজেডি-সন্তাপ ব্যর্থ হয়নি! সারা জীবনের বৈপ্লবিক আদর্শ-সংঘাতের ট্রাজেডি-মুখে সে একটি বক্তব্যকে স্থায়ি প্রতিষ্ঠা দান করে গেছে ঃ—"রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।"

শৈবলিনীর স্রষ্টার পক্ষে সেকালের জীবন-ভূমিতে এই সত্য-ঘোষণার দুঃসাহসিকতাও কম নয়। যে-কালের শিক্ষিত সমাজে দাম্পত্য-সম্পর্কের আজীবন অধিকার কেবল মুহূর্তের বেদ-মন্ত্র পাঠের মূল্যেই অনায়াসে ক্রীত হত, সে যুগে নিত্য দিনের জীবন-ব্যবহারে প্রেম-সাধনার দায়িত্ব-ব্রতের ঘোষণা, যথার্থই ছিল বৈপ্লবিক। শৈবলিনী জীবন-মূল্য দিয়ে নরনারীর দাম্পত্য-সম্পর্কের এই নবীন প্রণয়-বিজয় ঘোষণা করে গেছে। রেনেসাঁস যুগের বাংলার সাহিত্য ও সমাজে এখানেই তার যুগপৎ ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা।

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ্‌তে হবে, বঙ্কিমোত্তর যুগের পাঠকের কাছে চন্দ্রশেখর বিশুদ্ধ শিল্প-কর্ম হিসেবেই বিচার্য। কিন্তু, বঙ্কিমের পক্ষে শিল্প-কর্মের সংগে জীবন-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও একান্ত ভাবে যুক্ত হয়েছিল। রেনেসাঁস যুগের বাঙালি সমাজের নিরন্ধ্র জীবন-যন্ত্রণাকে শিল্প-বঙ্কিম তাঁর বিচার-সম প্রতিভার স্পর্শে প্রশান্ত-সমাহিত করতে চেয়েছিলেন,—বিধান করতে চেয়েছিলেন সমকালীন জীবন-সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান। একালের পক্ষে কৌতুকজনক বোধ হলেও, এ-কথা মর্মান্তিক ভাবে সত্য যে, বঙ্কিমের দুর্ভাগিনী কনিষ্ঠা কন্যা কুন্দনন্দিনীর অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিল। বিষবৃক্ষের বিষফল বৃহত্তর বঙ্গসমাজের অন্যত্রও নিতান্ত

চন্দ্রশেখর-এ শিল্প বনাম জীবন

দুর্লভ ছিল না। বস্তুতঃ, বিষবৃক্ষের শিল্প-সাথর্কতা বহুল প্রশংসিত হলেও তার সামাজিক ফলশ্রুতির জন্য নৈতিক নিন্দাও কম হয়েছিল না। কেবল লোক-নিন্দার জন্যই নয়, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হেতু-ই বঙ্কিমকে এ-বিষয়ে অবহিত হতে হয়েছিল। জীবনের জন্যই বঙ্কিম শিল্প-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।—তিনি বিশ্বাস করতেন—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু, নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন,—চিত্ত-শুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্ত-শুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য।"[১] একই আলোচনার পরবর্তী অংশে লেখক এবিষয়ের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে বুঝি, "সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ" বল্‌তে জীবনের একটি মনোভিরাম পরিণতিকেই তিনি অনুভব করেছিলেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপের মৃত্যু-উত্তর প্রার্থনায় ত্যাগ-ব্রতী জীবনের বঞ্চনার 'পরে বঙ্কিম অনন্ত-বিস্তারী উদাত্ত শান্তি-মন্ত্র পাঠ করেছেন,—রিক্ত জীবনকে মহত্তম পরিণামের সম্ভাবনামুখী করে "সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ" বিধান করেছেন। শৈবলিনীর সম্বন্ধেও একথা কম সত্য নয়। অগাধ জলে সাঁতার-এর পরে তাই তার জীবনে 'যোগবল বা Psychic force' প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। বিশুদ্ধ শিল্প-কৃতির দিক্ থেকে না হলেও, সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমের সচেতন-তার পক্ষে এটুকু অপরিহার্য ছিল। জীবনের দুঃখ এবং বিনষ্টিকে বঙ্কিম চরম মূল্য দিয়েছেন। কেবল কুন্দনন্দিনী নয়, শৈবলিনী এবং ভ্রমর-রোহিণীরও বেদনা-রক্তিম জীবন-বেদীতে তিনি অশ্রুর অঞ্জলি নিবেদন করেছেন। কিন্তু, জীবনের কাছে সংগ্রামী বঙ্কিম পরাভব মানেন নি। দুঃখ-যন্ত্রণাতপ্ত জীবনের শান্তি-পরিণামী ফলশ্রুতি ঘোষণা করে রবীন্দ্রনাথ 'অনন্ত জীবনে'র মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন,

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ,—তবু অনন্ত জাগে।"

দুঃখতপ্ত জীবনের উষ্ণ অনুভূতি নিয়ে বঙ্কিম এই শান্তি ও সান্ত্বনার অনন্ত উৎসকে সন্ধান করে ফিরছেন। 'চন্দ্রশেখর'-এ যার আরম্ভ, দেবী চৌধুরাণীতে তার সিদ্ধি। এই কারণেই, চন্দ্রশেখর থেকে বঙ্কিমের রচনায় ট্রাজিক উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কবি মোহিতলালের সিদ্ধ উপলব্ধির কথা মনে পড়ে।

১। উত্তর রামচরিত—বিবিধ প্রবন্ধ।

সেক্‌স্‌পীয়রের-এর তুলনায় তিনি বঙ্কিমের 'ট্রাজিক আর্ট'-এর দুর্বলতা প্রতিপন্ন করেছেন বহুল প্রমাণ-বিচারের-সাহায্যে।১ এই সত্য মেনে নিয়েও বল্‌ব, কেবল এই কারণেই বঙ্কিম দুর্বল আর্টিস্‌ট্‌ ছিলেন না। সেক্‌স্‌পীয়রের পৃথিবী-দুর্লভ ট্রাজিক আর্ট-এর সবটুকুই তাঁর নিজের সৃষ্ট নয়,—রেনেসাঁস পীড়িত সমকালীন ইংলণ্ডের জীবন-যন্ত্রণার দান তাতে অপরিসীম। শিল্পী সেক্‌স্‌পীয়র সেখানে তাঁর যুগ-জীবনের বাঙ্ময় প্রতিভূস্ব করেছেন। আলোচ্য কালের বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাসেও মধুসূদনের সাহিত্যে ট্রাজেডির মর্মপীড়া একান্ত হতে দেখেছি। কিন্তু, স্মরণ করি,—আমাদের ধারণায় বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বয়ঃসন্ধি-সমুত্তর যৌবন-মুক্তির শিল্পী। রেনেসাঁসের জীবনবোধে যন্ত্রণা যেমন আছে, বয়ঃসন্ধির মর্মে তেমনি রয়েছে যন্ত্রণা উপভোগের লোভাতুরতা (massochism)। ফলে, রেনেসাঁস যুগের জীবন-স্বভাব যেমন ট্রাজিক্‌, একালের শিল্প-কর্মও তেমনি ট্রাজেডি-ঋদ্ধ। কিন্তু, ট্রাজেডিতেই জীবন-বোধের পরিসমাপ্তি যদি ঘটে, তাতে জীবন-সাধকেরও হয় পরাভব। বঙ্কিম সেই যন্ত্রণা-লোভাতুর বিনষ্টির হাত থেকে বাঙালির জীবন-বিশ্বাসকে মুক্তি দিয়েছেন,—এখানেই তিনি বাঙালির যৌবন-মুক্তির,—বয়ঃসন্ধি-যন্ত্রণার মুক্তি-বিধাতা। বাঙালির ইতিহাসে শিল্পি-বঙ্কিম কেবল জীবনের স্রষ্টা নন,—শান্ত, শুদ্ধ, অনন্ত-পরিণামী জীবনবোধের ধ্যানী ঋষিও। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস থেকে বঙ্কিমের জীবনদর্শনে এই আর্ষ লক্ষণ ক্রম-বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। এপথে বঙ্কিমের সিদ্ধি যতটুকু, তাঁর উপন্যাসের ট্রাজিক বুনন ততই শিথিল;—কিন্তু, তত সার্থক ট্রাজেডি-সমুত্তর শান্ত জীবন-পরিণামের নিঃসংশয় সংকেত রচনায়।

ট্রাজেডি রচনায় বঙ্কিমের দুর্বলতা

কৃষ্ণকান্তের উইলের (১৮৭৮) চতুর্থ-সংস্করণে এই জীবন-মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট হয়েছে পরিবর্ধিত পরিশিষ্টাংশে। কিন্তু তার আগে, ট্রাজেডি-তীর্ণ পরিণাম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত-চেতন হতে বঙ্কিমের শিল্পি-মানসকে উত্থান-পতনে বন্ধুর ব্যক্তি-মানবের অন্তহীন জীবন-জটিলতার পথে দূরাভিযান করে ফিরতে হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রজনী'র (১৮৭৭) জীবন-ধ্যানের পরবর্তী স্তর। তারও আগে লিখিত হয়েছিল রাধারাণী (১৮৭৫)।

ও নূতন জীবন-মূল্যবোধ

বিষবৃক্ষের পরে যেমন ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয়, তেম্‌নি চন্দ্রশেখর-এর পরে রাধারাণী; বঙ্কিম-কল্পনার লঘু রোমান্স-পরিক্রমা। শচীশ

১। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।

চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁদের কুলদেবতা 'রাধাবল্লভজীউ'র উৎসবের সমারোহের মধ্যে একটি বালিকা একবার হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যান্যদের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রও তার স্বজনদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। শচীশচন্দ্রের ধারণা, রাধারাণীর কাহিনীতে ঐ ঘটনার ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে।[১] অন্ততঃ রাধারাণী ঐ বছরেই (১৮৭৫) বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি "১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত" হয়।

রাধারাণী

একটি দুঃস্থ বালিকা মাহেশের রথের মেলায় রুগ্নাজননীর পথ্য ব্যবস্থার জন্য অনভ্যস্ত হাতে ফুলের মালা বিক্রী করতে আসে। রুক্মিণী-কুমার ছদ্মনামধারী একটি সহৃদয় ধনাঢ্যের অনুরাগ-ঋদ্ধ দানে সে যাত্রা তার দুর্গতিমোচন হয়। পরে রাধারাণী নিজের বৃহৎ পিতৃ-সম্পত্তির অধিকার পায়। আরো অনেক পরে রোমান্টিক উৎকণ্ঠার চরম অভিব্যক্তির শেষে ছদ্ম রুক্মিণীকুমারের পরিচয় পেয়ে তার সংগে পরিণয়াবদ্ধ হয়। রাধারাণীর গল্প এইটুকুই।

এই লঘু রচনার পরেই বঙ্কিম আবার পদক্ষেপ করেছেন অনপনেয় জটিলতায় আচ্ছন্ন আধুনিক জীবন-সমস্যার গভীরে। 'রজনী' বঙ্কিম-রচনাবলীর মধ্যে ঘনতম-পিনদ্ধ ট্রাজেডি। ১২৮১-৮২ বাংলা সালে উপন্যাসটি প্রথমে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। রজনী জন্মান্ধ ফুলওয়ালী,—নানা দৈব-দুর্বিপাক ও বহুজীবন-বিলম্বী জটিলতার অবসানে তার জীবনের সফল পরিণতিই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। বঙ্কিম 'বিজ্ঞাপন'-এ জানিয়েছেন, —"প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত "Last days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।" তা ছাড়া, এই উপন্যাসের কাহিনীটিকে বঙ্কিম বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার বকলমায় উপস্থিত করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য,— " উইল্‌কি কলিন্‌স্‌ কৃত Woman in white নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথাই তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।" নায়িকা রজনীর প্রতি নায়ক শচীন্দ্রনাথের প্রণয় সংঘটনে সন্ন্যাসীর অনৈসর্গিক প্রভাবের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক স্মরণীয়। বলাবাহুল্য, নায়ক-নায়িকার বকলমায় উপন্যাসের বক্তব্য উপস্থিত

রজনী ঃ জন্মকথা

১। বঙ্কিমজীবনী।

করলেই তা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না। অথবা, লেখকের বাস্তব-বিন্যাসের দায়িত্বও কেবল এই একটি কারণে বিন্দুমাত্র ক্ষালিত হয় না। এ দিক্ থেকে রজনীর কাহিনীগত দুর্বলতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু, তাতে মূল উপন্যাস-বিষয়ের রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ, 'রজনী'র সবটুকুই রজনী-শচীন্দ্রের জীবন-সীমায় বন্ধ নয়। বরং তুলনায় অমরনাথ-লবঙ্গ প্রসঙ্গই যথার্থ ঔপন্যাসিক জটিলাবর্ত রচনা করেছে,—আর ঐখানেই ব্যক্ত-অব্যক্ত ব্যঞ্জনায় রসায়িত হয়ে উঠেছে বঙ্কিম জীবন-বোধের ট্রাজিক্ চেতনা।

রজনীর অন্ধতার প্রসঙ্গে বঙ্কিম বিজ্ঞাপন-এ বলেছেন,—"যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।" বস্তুতঃ, রজনী চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা-বিন্যাস বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তখনো ছিল অভূতপূর্ব। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে "ইহাই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। 'ইন্দিরা'ও তাই। কিন্তু, প্রথম সংস্করণ 'ইন্দিরা' 'রজনী'র পূর্ব-গামী হইলেও ৪৫ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র গল্পমাত্র ছিল; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ম সংস্করণে তাহা রীতিমত উপন্যাস গৌরব পাইয়াছে।"[১] বিশেষ করে অন্ধ নারীর শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় প্রণয়-চেতনা ও তার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ কেবল বিস্ময়কর নয়, প্রাণ-প্রোজ্জ্বল। প্রণয়িণী নারীর মনোলোকে স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশের মদির কৌতূহল রজনীর প্রধান গল্পাংশকে রোমাণ্টিক রসে রঙে ভরপুর করেছে। রজনীর দুঃখ-তীর্ণ জীবন-পরিণামও রোমাণ্টিক মিলন-সৌন্দর্যে পূর্ণতা পেয়েছে।

রজনীতে রোমান্স

কিন্তু, 'রজনী' উপন্যাস হয়েছে, রোমান্‌স্ নয়,—সে কেবল অমরনাথ-লবঙ্গ-কথা নিয়ে। বরং আরো স্পষ্ট করে বললে, অমরনাথের মর্ম-যন্ত্রণার মধ্যে। বিদ্যায়, অর্থ-গৌরবে, রূপে অমরনাথ ছিল নারীর কাম্য সুসিদ্ধ নর। লবঙ্গলতাকে সে ভালবেসেছিল, লবঙ্গলতাও তাই। তাদের বিবাহ-সম্ভাবনাও নিশ্চিত প্রায় হয়েছিল। কিন্তু, অমরনাথের কৌলিক কলঙ্ক প্রকাশিত হয়ে পড়ায় সে প্রস্তাব ভেঙে যায়। প্রণয়োন্মত্ত অমরনাথ গভীর রাত্রিতে লবঙ্গের শয্যাগৃহে প্রবেশ করেছিল,—লবঙ্গ সেই অপরাধকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছিল তপ্ত শলাকার দ্বারা অমরনাথের পীঠে 'চোর' লিখে দিয়ে। লবঙ্গ স-পত্নীক ধনবান্ বৃদ্ধের তরুণীভার্যার পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল; অমরনাথ হল দেশত্যাগী।

'রজনী'র উপন্যাস-স্বভাব

১। রজনী—সাহিত্য পরিষৎ নং—ভূমিকা।

কিন্তু, একদিনের ক্ষণিক পদস্খলনের যন্ত্রণা চিরজীবনের অসহ্য তাপ-দাহের কারণ হয়ে থাকে কেন; সমস্ত জীবনে দিয়ে অমরনাথ তার জবাব পায় নি। সেই উত্তরহীন জীবন-যন্ত্রণার ট্রাজেডি বর্ণনা করে অমরনাথ প্রথমেই বলেছে,—"আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙিয়া গেল তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব। দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সাবধান হইতে পারিবে।"

'রজনী'তে বাস্তববাদ

অপরে যে যাই করুক, রজনী উপন্যাসের সবচেয়ে বড়-কথা বিশ্ব-চরাচরে অমরনাথের ভাঙা নৌকা যোড়া লাগে নি। একদিন অন্ধ রজনীর জন্য সর্বস্বপণ করে জীবন দিয়ে সে তাকে পাবার স্বপ্ন দেখেছিল,—অকূলে খুঁজেছিল কূল। কিন্তু, অমরনাথের ভাঙানৌকা তীরের কাছে এসে ভরাডুবি করেছে। সেই ট্রাজিক্ যন্ত্রণার নূতনতর লাভা উৎক্ষেপের দাহে তপ্ত অমরনাথ নিরন্ধ্র অন্ধকারে আশ্রয় হাত্ড়ে ফিরেছে,—"এ হাট ভাঙিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব,—যিনি সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।"

"প্রভো! তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটি-তোন্মুখ হৃৎপদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।"

বনাম আদর্শবাদ

এর সবটুকুকেই বঙ্কিমের আদর্শবাদ বা দার্শনিকতা বলে মনে করলে ভুল হবে। ভগবানের অস্তিত্ব ও তাঁর কাছে আত্ম সমর্পণ কেবল ধ্যান-দর্শনের সামগ্রী নয়। নিতান্ত সাধারণ মানুষও যখন জীবনের নিরন্ধ্র অন্ধকারে কোথাও পথ খুঁজে পায় না, তখনই বিপথের ভয়ে নূতন পথ খোঁজে। তখন মনে হয়, 'বিশ্বের নিয়ন্তা কেউ যদি না-ও থাকেন, তবু আমার নিরালম্ব দুর্বলতা অসহনীয়তাকে আশ্রয় দেবার জন্যেও যেন তিনি থাকেন, মুহূর্তের জন্য থাকুন তিনি।' এর চেয়ে বাস্তব আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতি মানুষের জীবনে খুব কম আছে; অমরনাথের পক্ষে সে মুহূর্তে আর কিছু ছিল না। তাই, ঐ একই প্রসঙ্গ-সমাপ্তির মুখে সে বলেছে,—"সুখ! তোমাকে সর্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?

"প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জন দিব।"

কিন্তু, মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি "বিসর্জন দিব"

বললেই বিসর্জন দেওয়া চলে না। অমরনাথ-ও তা পারে নি। তাই উপন্যাস-শেষে সে ছুটে পালিয়েছে কেবল শচীন্দ্র-রজনীর পারিবারিক জীবন থেকেই নয়,— সমাধানহীন সমস্যায় কণ্টকিত আধুনিক জীবন-ভূমি থেকে। এর পাশে পরলোকের জন্য লবঙ্গলতার প্রণয়-প্রতীক্ষা দুর্বল হলেও ব্যঞ্জনাময়।

রজনীতে যা সম্ভব হয় নি, কৃষ্ণকান্তের উইল-এ (১৮৭৮) তা সম্পূর্ণ হল। সুখদুঃখাতীত অসীম-অনন্তের উদ্দেশে আত্মবিসর্জন করে অমরনাথ দুঃখাবর্তিত জীবন-সমস্যার মুক্তিপথ খুঁজেছিল। কিন্তু, তার আত্মদানে সে সাধনা সিদ্ধ হয় নি। কৃষ্ণকান্তের উইল-এর গোবিন্দলাল সেই সর্বশঙ্কা-হর অনন্ত জীবনাশ্রয় লাভ করেছিল। শচীকান্ত-কে সে বলেছিল,—

কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ— বঙ্কিম-জীবনাদর্শের স্বভাব-পরিণতি

"বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।" এই শান্তির স্বরূপ বিশদ করে গোবিন্দলাল আবার বলেছে, —"ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃ স্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

একালের পাঠকেরা এ-সব আলোচনাকে উপন্যাস-শিল্পের মধ্যে অধ্যাত্ম-বাদের অনধিকার-প্রবেশ বলে উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। কেবল সাহিত্যে নয়, বাঙালির জীবন্মুক্তির ইতিহাসের জগতেও তাঁরা মোহগ্রস্ত। বস্তুতঃ, বঙ্কিম-সাহিত্যে জীবনধর্ম বনাম অধ্যাত্মবাদ-এর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক প্রবলতম হয়েছিল কৃষ্ণকান্তের উইলকে উপলক্ষ্য করে। সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসার ঝড় উঠেছিল রোহিণীর হত্যাঘটনার শৈল্পিক ও নৈতিক বিচার নিয়ে। বঙ্কিমকে বারে বারে এর জবাব দিতে হয়েছে, মৃত্যুর পরেও এ-বিষয়ে তাঁকে অন্যান্যদের মধ্যে দায়রা-সোপর্দ করেছিলেন স্বয়ং শরৎ-চন্দ্র। বঙ্কিম একবার বঙ্গদর্শনে (১২৮৪ সাল) লিখেছিলেন,—"অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়ই উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছি, "আমার ঘাট হইয়াছে।" কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

বস্তুতঃ বঙ্কিমের সকল উপন্যাসই "মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা"ঃ—সমকালীন বয়ঃসন্ধির জীবন-যন্ত্রণার সমাধান কামনা তাঁর শিল্পি-মনকে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নিয়ত প্রভাবিত করেছে। আর, এতাবৎ ইতিহাসের আলোচনায় বারে বারে দেখেছি,—বাঙালি রেনেসাঁসের এই

আধুনিক জীবনবোধ তার প্রতীচ্য জ্ঞান-চিন্তা ও মূল্যচেতনার স্বী-করণ-অবধারণার দ্বারা একান্ত প্রভাবিত হয়েছে। বাঙালির আবহমান জীবন-ঐতিহ্যের পূর্ব-প্রবাহ থেকে এই নূতন জীবন-বিশ্বাসের ধারা আমূল পৃথক ছিল বলেই, তার বিমূঢ়তা, তথা যন্ত্রণাবোধের অসহায়তা ছিল এমন মর্মান্তিক।

প্রাচ্য-বনাম প্রতীচ্য

বিশ শতকের বিশ্ব ঐতিহাসিক Arlond Toynbee তাঁর The World & the West গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতির সংগে প্রতীচ্য সংস্কৃতির আমূল বৈপরীত্যের (extremely alien) স্বভাব বিবৃত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বিশ্বের সমগ্র ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে মোটা দুটি মাত্র ভাগে ভাগ করলে তার এক কোটিতে থাকবে প্রতীচ্য সংস্কৃতি-ধর্ম, আর দূরতম বিপরীত কোটিতে অবস্থান করছে ভারতীয় (হিন্দু) ঐতিহ্য। তা সত্ত্বেও, একালের ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা ব্যবহারিক জীবনে ব্যাপক মাত্রায় পশ্চিমী ধারাকে অনুসরণ করেছেন দেখে Toynbee তৃপ্ত হয়েছেন। সেই সংগে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন,—

"On the surface, those Hindus who have adopted our, to them, extremely alien Western culture on the planes of technology and science, language and literature, administration & law, appear to have been more successful than the Russians in harmonizing with their native way of life a Western way that is intrisically more alien to them than it is to the Russians. Yet the tension in Hindu souls must be extreme, and sooner or later it must find some means of discharging itself."

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচার আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাত-সমন্বয় জনিত উত্তাপ আমাদের আলোচ্যকালের নাগরিক বাঙালির জীবনে একবার অতি-উত্তুঙ্গ হয়েছিল। হিন্দু-আত্মার সেই ভাব-উৎক্ষেপ সেদিন একান্তভাবে আত্ম-মুক্তির পথ খুঁজে ফিরেছিল।

লক্ষ্য করলে দেখব, প্রাচীন সমষ্টিগত মূল্যবোধের ভাবভূমিতে সদ্য-জাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মের উগ্র প্রতিষ্ঠাকামনার মধ্যেই আলোচ্যযুগের জীবন-সমস্যা অনপনেয় আকার ধারণ করেছে। আর, ব্যক্তিত্ব,—তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রনৈতিক উগ্রতা-প্রধান প্রতীচ্য সভ্যতার মর্মসম্পদ। ভারতীয় চেতনার মুক্তি উদার ব্যাপ্তি ও অখণ্ড সম্পূর্ণতায়। বঙ্কিম-যুগের বাঙালি জীবনে সেই একান্ত অখণ্ড-সর্বস্বতার ভাবলোকে ব্যক্তি-অনুক খণ্ডের যথার্থ মূল্যায়নের দাবি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ঐক্যের মধ্যে দেখা দিল বিচ্ছিন্নতা,

সমন্বয়-সামঞ্জস্যের জগতে বিরোধ-বিক্ষেপ। সেদিনকার নাগরিক বাঙালি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সৌ-সম্য বিধান করতে গিয়ে অনন্তের জন্য 'সান্ত'কে,—সমাজের জন্য ব্যক্তিকে বিসর্জন দিতে পারে নি। কিন্তু, বিরোধকে বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপান্তরিত করে, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে খুঁজেছে পরিণামী 'ঐক্যকে'। 'Unity in diversity'—এটি প্রতীচ্য চিন্তা-বিক্ষিপ্ত সমন্বয়বাদী ভারতীয় চেতনার নূতন জীবন-বাণী। এই মূল্যবোধ ব্যক্তির দাবিকে অস্বীকার করে নি। কিন্তু, ব্যক্তিকে করতে চেয়েছে সমষ্টির অভিমুখী,—খন্ডকে দেখতে চেয়েছে অখন্ডের অংশরূপে, তারই সংগে সমন্বিত করে। কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিবর্তিত পরিশিষ্টাংশে বঙ্কিম সান্ত-কে অনন্তপরিণামী প্রশান্তি-স্নিগ্ধ করে দেখেছেন প্রথম,—এখানেই Toynbee-র ভাষায় 'হিন্দু আত্মা তার প্রথম নিভৃত আশ্বস্তি' (the relief that Hindu Souls are going to find for themselves) খুঁজে পেয়েছে।

এটুকু আরো স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়েছে দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) উপন্যাসে। দেবীচৌধুরাণীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের মানস-সম্ভাবনা ছিল ঘনতম। ভবানী পাঠকের আজীবন অনুসন্ধানের সিদ্ধি প্রফুল্লের সহজ ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তি-স্বভাবের চূড়ান্ত তীক্ষ্ণতা-বিধান করা হয়েছিল দ্বাদশ-বার্ষিক দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপনের মাধ্যমে। স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের অনু (Individualistic Unit) হিসেবে প্রফুল্ল পূর্ণতম অভিব্যক্ত। কিন্তু, তার সেই ব্যক্তি-স্বভাবের চরম সার্থকতা বিহিত হয়েছে বৃহত্তর মানবধর্ম,—তথা, প্রেম-ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্জনে। বঙ্কিম জনকল্যাণের সুবৃহৎ জীবন-বেদীতে দেবীচৌধুরাণীকে প্রতিষ্ঠিত করে আহবান করেছেন,—"এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি,—"আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র......।

দেবীচৌধুরাণী ও জীবনব্রতী বঙ্কিমের সিদ্ধি

"পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এ বাক্য পুরাতন,—কিন্তু নতুন করে,—নূতন মূল্যে উচ্চারিত হয়েছে, রেনেসাঁসের যন্ত্রণা-পীড়িত জীবন-ভূমিতে। এই সূত্রের চরম ফলশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে রবীন্দ্র-কবিতায়,

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো ॥"

প্রতীচ্যের অ-চিন্তিত-পূর্ব জীবনোচ্ছ্বাস একদিন নূতন দ্বন্দ্ব-বিরোধের

আলোড়নে আমাদের জীবনমূলকে উৎক্ষিপ্ত করেছিল। তার তাড়না থেকে মুক্তিপথ খুঁজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল আমাদের জীবন। ধাপে ধাপে নূতনকে লাভ করার সৌভাগ্য-যন্ত্রণা প্রশান্ত হয়েছে তাকে আত্মস্থ করতে পারার স্নিগ্ধ আনন্দে। প্রতীচ্য "Harmonised" হয়েছে প্রাচ্যের আত্ম-স্বভাবে। এই আত্মস্থতার প্রথম মুক্তি বঙ্কিমের উপন্যাস সাহিত্যে, তার স্ব-স্থ প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ধ্যানী উপলব্ধিতে।

তাই, বঙ্কিমের সাধনায় রেনেসাঁস-উত্তর বাংলাসাহিত্য ও বাঙালি জীবনের যৌবন-মুক্তি,—রবীন্দ্রনাথে সেই যৌবনদীপ্ত আত্মশক্তির সার্থক প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন ও স্বী-করণের মূলীভূত চিত্ত উৎক্ষেপটুকুও (tension) অবশ্য লক্ষণীয়। এর প্রভাবে মধুসূদন তাঁর শিল্পকর্মকে নিঃশেষিত করেছেন ট্রাজেডির অফুরন্তধারায়। মধুসূদন-উত্তর বহু বাঙালি সামাজিকের জীবন-মূল্য সেই ট্রাজেডির বাস্তব-সৌধ নির্মাণ করেছে। বঙ্কিমকেও ট্রাজেডি-সমুত্তর এই জীবন-মূল্যের আবিষ্কারে আ-যৌবন অগ্নিজ্বালাময় তপস্যায় বৃত থাকতে হয়েছে। বিষ-বৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনীতে সেই অগ্নিতাপই ট্রাজেডির আকার ধরেছে। কৃষ্ণকান্তের উইল-এও রোহিণীর চরিত্র কল্পনায় বঙ্কিম দ্বিধাকম্পিত-হস্ত। ব্যক্তিত্বের স্বাধিকার, তথা ব্যক্তিগত জীবন-সিদ্ধি-কামা রোহিণীকে বঙ্কিম প্রথম সংস্করণে লোভাতুরা, লালসাময়ী রূপে চিত্রিত করেছেন। পরবর্তী সংস্করণ সমূহে রোহিণী সম্বন্ধে তিনি অধিকতর উদার। ব্যক্তিত্বের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিণাম-কামনা ও লালসাতুরতার মধ্যে মৌল পার্থক্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তবু, সামাজিক ফলশ্রুতির সম্বন্ধে অতি অবধানতা হয়ত তাঁকে রোহিণীর প্রতি সম্পূর্ণ শৈল্পিক সুবিচার করতে বাধা দিয়েছে। তাই বলেছিলাম, হীরা রোহিণীতে সম্পূর্ণ নয়। তাছাড়া, লক্ষ্য করে দেখব, কৃষ্ণকান্তের উইল-এর প্রথম তিন সংস্করণের সমাপ্তি ঘটেছিল গোবিন্দলালের মৃত্যুতে। চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯২), অর্থাৎ তাঁর জীবৎ-কালের শেষতম সংস্করণেই বঙ্কিম গোবিন্দলাল, তথা সমকালীন ব্যক্তিত্ব-সন্তাড়িত বাঙালির জন্য মৃত্যুতীর্ণ অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন।

ভ্রমরের লোকান্তরিত আত্মার ভাষায়,—"মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাহাকে পাইবে।"

আত্মহত্যায় অন্ধ রেনেসাঁস যুগের বাঙালিকে এখানে আত্মরক্ষার,—আত্মপ্রসারের জীবন-মন্ত্রে ঋদ্ধ করেই বঙ্কিম তাকে দিয়েছেন চূড়ান্ত মুক্তি। বাঙালি জীবনের আদর্শ-দ্বন্দ্বে এই অনন্ত পরিণামবোধ, আগে বলেছি, দেবীচৌধুরাণীতে স্ফুট-

সীতারাম

তম হয়েছে। বাঙালি জীবন-ধ্যানের এই তপঃ সিদ্ধি নিয়েই বঙ্কিম সীতারামের (১৮৮৭) আত্মনাশী পরিণামকে মহামৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এখানেই তিনি যৌবনমুক্তির অমৃতবার্তাবহ,—যুগপৎ বাঙালির সাহিত্যে ও বৃহৎ জীবনে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে আর দুটি রচনা অনুল্লিখিত আছেঃ (১) রাজসিংহ (১৮৮২) এবং (২) আনন্দমঠ (১৮৮২)। প্রথমটি ইতিহাসাশ্রিত সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টি অনাগত ইতিহাসের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে যুগখ্যাত হয়ে আছে। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং অপ্রধান গল্প তিনটি (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী) ছাড়া বঙ্কিমের আর সব উপন্যাসেই ইতিহাস প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। সকল স্থলেই ইতিহাসের পটভূমি স্পষ্ট নয়; বরং কালানৌচিত্য দোষই প্রায়শঃ লক্ষিত হয়ে থাকে। এর কারণও অবশ্য ছিল। জীবনের বহু-বিতর্কিত সমস্যার শিল্প-রূপায়ণে বঙ্কিম ইতিহাসের প্রচ্ছদকে আশ্রয় করে অতীতচারী হয়েছিলেন, অনেক স্থানেই উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন সামাজিক বিক্রিয়া থেকে উত্তরণ। কিন্তু, রাজসিংহ বঙ্কিমের রচিত সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস,—এই উপন্যাসের কেবল আকৃতি নয়, উদ্দেশ্যও ঐতিহাসিক। রাজসিংহ প্রথম তিন সংস্করণে ক্ষুদ্রাকৃতি ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "পুনঃপ্রণীত" চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসটি বর্তমান আকার ও প্রকৃতি লাভ করে। তখন বঙ্কিমের শেষতম উপন্যাস সীতারাম রচনাও শেষ হয়েছে।

রাজসিংহ

চতুর্থ সংস্করণ রাজসিংহের বিজ্ঞাপন-এ বঙ্কিম লিখেছিলেন,—"আমি পূর্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" ঐ উপন্যাসে ঐতিহাসিক বিষয় প্রকটনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও লেখক জানিয়েছিলেন, "ব্যায়ামের অভাবে মানুষের সর্বাঙ্গ দুর্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ-স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।

"………উপন্যাসে সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে……রাজসিংহের সংগে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে।"

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাসের তথ্য ও কল্পনা সমাবেশের আদর্শ সম্বন্ধেও

বঙ্কিম তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন,—"স্থূলঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তেমনি রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরংগজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা, উদিপুরী ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেই-রূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

রাজসিংহে ইতিহাস

ডঃ যদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক তথ্যাদির দিক থেকে বঙ্কিমের কয়েকটি ভ্রান্তি নির্দেশ করেও ব্যাপক বিচার শেষে মন্তব্য করেছেন,—"তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই, অজ্ঞ ধর্মান্ধতা দ্বারা লেশমাত্রও প্রণোদিত হন নাই।"[১] ডঃ যদুনাথের আলোচিত তথ্যাদির মধ্যে জেবুন্নিসার চারিত্র বিশুদ্ধির কথা একান্ত উল্লেখ্য,—বঙ্কিম টড্-এর রাজস্থান অনুসারে তাকে মোগল-হারেম-এর গতানুগতিক চরিত্ররূপে বর্ণনা করেছেন।

রাজসিংহে উপন্যাস

পরিশেষে বলা উচিত, রাজসিংহ যে পরিমাণে ইতিহাস তার চেয়ে বেশি পরিমাণে উপন্যাস-রস-ঋদ্ধ। এর ঐতিহাসিক স্বচ্ছতার প্রমাণ স্বয়ং ডঃ যদুনাথ। অপর পক্ষে রাজসিংহের দুর্লভ শিল্পগুণের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে' রাজসিংহ সম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র বিচার স্থান পেয়েছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসে পর্যায়ত্রয়

প্রচলিত বিচার অনুসারে আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাস রচনার আরম্ভ। আগে বলেছি, দুর্গেশনন্দিনী থেকে মৃণালিনী পর্যন্ত রচনায় সমকালীন জীবন-সমস্যাকে নিয়ে বঙ্কিম প্রধানতঃ স্বপ্ন-কল্পনার জগতে বিচরণ করেছেন। বিষবৃক্ষ থেকে কৃষ্ণকান্তের উইল-এ বলিষ্ঠ বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে তিনি রেনেসাঁস-উত্তর জীবন-জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। এই অর্থে সিদ্ধ সমালোচকেরা প্রথম ধারার রচনাবলীকে বঙ্কিমের রোমান্স-সৃষ্টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ কয়টিকে বাস্তবতা-ঋদ্ধ উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। সেই বিচারে আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) এই শেষ তিনখানি উপন্যাস প্রচারধর্মী বা তত্ত্ব-মূলক রচনা বলে আখ্যাত।

পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক তত্ত্ব-দৃষ্টি তাঁর

১। ঐতিহাসিক ভূমিকা—রাজসিংহ সাহিত্য পরিষৎ সং।

সমকালীন প্রতপ্ত-জীবন-জিজ্ঞাসারই ফলশ্রুতি। নিতান্ত বিরুদ্ধ স্বভাব-যুক্ত প্রতীচ্য জীবন-প্রেরণার উৎক্ষেপকে চিরাচরিত ভারতীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আয়ত্ত ও সমন্বয়-বদ্ধ করতে পারার সমস্যাই সেদিনকার বাঙালি জীবনে জটিলতম হয়েছিল। এই দুঃসাধ্য সাধন যতই অনায়ত্ত থেকেছে, রেনেসাঁস যুগের যন্ত্রণাবোধ জীবনে ও সাহিত্যে যুগপৎ ততই হয়েছে অন্ধ, আত্মঘাতী। বঙ্কিম-সাহিত্যেও রেনেসাঁস যুগের পথ-হীনতার ক্ষুব্ধ মর্মপীড়া কুন্দ-হীরা, শৈবলিনী ও ভ্রমর-রোহিণীর ট্রাজেডিকে করে তুলেছে অনির্বার। কৃষ্ণকান্তের উইলের চতুর্থ সংস্করণে পৌঁছে, তবেই বঙ্কিম ট্রাজেডি-সমুত্তর প্রশান্ত জীবন-বাণীকে উদ্গীত করে তুল্‌তে পেরেছিলেন গোবিন্দলালের জীবনে। সে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন সীতারাম রচনাও সমাপ্ত হয়েছে। এদিক থেকে, আনন্দমঠেই বঙ্কিমের প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়ী বিবেক প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে।

আনন্দমঠ ও বঙ্কিমের শিল্পবোধ

গোটা উপন্যাসটির চেয়েও 'বন্দেমাতরম্' গানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি আজ অনন্যতুল্য শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই 'বন্দেমাতরম্' প্রতীচ্য ধর্মী রাজনৈতিক প্রেরণা-প্রধান, না ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবাবেদন প্রধান, এ নিয়ে একদা বিতর্ক উত্তাল হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত Encyclopaedia Britannicaতে এই সংগীতের অর্থ নির্দেশ করে লিখেছিলেন,—

বন্দেমাতরম্ ঃ—ও প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমন্বয়

"The poem, then, is the work of a Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualised Kali".

এই উপলক্ষ্যে বন্দেমাতরম্ সংগীতে "দশপ্রহরণ ধারিণী" দুর্গা এবং "কমলদল বিহারিনী" কমলার যুগপৎ উল্লেখ-তাৎপর্যের প্রতিও সফল সংকেত করা হয়েছে। তবু এখানেই বিতর্কের শেষ হয় না। ডঃ গ্রীয়ার্সন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের Times পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে প্রতিপন্ন করেছিলেন, —মাতৃভূমিকে বন্দনা করার কোনো পূর্বসংস্কার ভারতবর্ষের চেতনায় নেই। অতএব, তাঁর মতে,—"হিন্দুধর্মের কোনো দেবীর উদ্দেশে—সম্ভবতঃ সংহারকর্ত্রী কালীর উদ্দেশে এই গান লিখিত হইয়াছে।"১ রমেশচন্দ্র তাঁর পূর্বোদ্ধৃত রচনায় এর উত্তর দিয়ে লিখেছেন,—

"But though, as Dr. Grierson points out, the idea of the "motherland" is wholly alien to Hindu ideas, it is quite possible that Bankim Chandra may have assimilated it with his European Culture............।" আমাদের বক্তব্য, কেবল বন্দেমাতরম

১। মূল ইংরেজির শচীশচন্দ্র কৃত অনুবাদ ঃ—'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে গৃহীত।

সংগীতেই নয়,—সমগ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেই হিন্দু আদর্শ-চেতনার সংগে প্রতীচ্য সংস্কৃতির স্বী-করণ প্রয়াস সচেতন ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

"প্রথমবারের বিজ্ঞাপন"-এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বঙ্কিম বলেছিলেন,

আনন্দমঠে বঙ্কিমের জীবন-বাচ্য

—"বাঙালির স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙালির সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল।"

স্পষ্ট দেখ্‌ছি, সমাজ-বিপ্লব ও বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে একটি বিশেষিত বক্তব্য আনন্দমঠের কাহিনীতে অনুস্যূত ছিল। সেই সংগে ইংরেজ অধিকারের রাজনৈতিক ফলশ্রুতির প্রতিও ইঙ্গিত ছিল। উপন্যাসের কাহিনীতে এই বক্তব্য বিন্যাসের পরিচয় বিবৃত করে রমেশ দত্ত বলেছিলেন, —"The general moral of the Ananda Math, then, is that British rule and British education are to be accepted as the only alternative to Musalman oppression,. . . .But acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom of India."১ এই ধারণার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে প্রথম সংস্করণের সমাপ্তি অংশে। প্রচলিত সংস্করণ আনন্দমঠ-এর শেষ অংশে, সফল যুদ্ধাবসানের পরে মহাপুরুষ এসে বিষ্ণুমণ্ডপ থেকে সত্যানন্দকে মহত্তর জীবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ করে নিয়েছেন। বঙ্কিমের ভাষায়,—"বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।"

প্রথম সংস্করণ আনন্দমঠে এই শেষছত্রের পরে ছিল ঃ—"বিষ্ণু মণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা এই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।" বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা আর বলে যেতে পারেন নি; বরং এই আশাবাদটুকুকেও নিশ্চিহ্ন করেছিলেন পরবর্তী সংস্করণ সমূহে। তা হলেও ঐ উক্তির মধ্যেই আনন্দমঠের মৌল প্রেরণা আত্মগোপন করে আছে।

বস্তুতঃ, আনন্দমঠ-কাহিনীতে ইস্‌লামিক ইতিহাসের অবতারণা কেবল উপলক্ষ্য ঃ মূল প্রেরণা ছিল ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে সমাগত-প্রায় বিপ্লবের পথ-রচনা। আনন্দমঠের সূচনা হয়েছে '৭৬-এর মন্বন্তরের ভিত্তির 'পরে। বঙ্কিমের সেই মন্বন্তর বর্ণনা W. W. Hunter-এর

১। Encyclopaedia Britannica.

ইংরেজি বিবৃতিকে প্রায় হুবহু অনুসরণ করেছে।১ আর আলোচ্য মন্বন্তরের পটভূমি রচনায় ভঙ্গুর ইস্‌লামিক শাসন-কর্তৃপক্ষের চেয়ে মধ্য-মুনাফা-ভোগী ইংরেজ কোম্পানীর দায়িত্ব-ও কম ছিল না। তাছাড়া, সন্তান বিদ্রোহের আগাগোড়াই যে বঙ্কিমের কল্পিত, তাতে সংশয় নেই। ডঃ যদুনাথ লিখেছেন,—

আনন্দমঠে ইতিহাস উপলক্ষ্য

"তাঁহার সন্তানেরা বাঙালি ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত; কিন্তু যে সব "সন্ন্যাসী ফকিরেরা" সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তর বঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে, তাহারা কাশী, ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তান-সেনা বৈষ্ণব, আসল 'সন্ন্যাসী'রা ছিল শৈব,......।"২

পরবর্তী সংস্করণাদিতে বঙ্কিম আনন্দমঠের ঘটনাস্থল বীরভূম থেকে রংপুর-এ পরিবর্তিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, তাতে ইতিহাসের দিক থেকে গ্রন্থ-কাহিনীর মূল্যের কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। এদিক থেকে অতীত ইতিহাসের অনুসারী না হলেও, অনাগত ইতিহাসের সার্থক দ্রষ্টা ছিল বঙ্কিমের আনন্দমঠ,—এখানেই তার সার্থক ঐতিহাসিক মূল্য। মোগল শাসনের দিক থেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের এই গল্প স্বপ্ন-বিড়ম্বনা ছাড়া কিছু নয়। ইতিহাসের সন্ন্যাসীরা যথার্থ বিদ্রোহী নয়,—অস্থিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ডাকাতি করে ফিরেছে তারা। কিন্তু, বঙ্কিমের সন্তানেরা যথার্থ বিপ্লবী,—মাতৃভূমির মুক্তি সাধনায় তাঁরা "জীবন সর্বস্ব" পণ করেছে; —সন্ন্যাসীর বেশে 'বন্দেমাতরম্‌' ও মুর-নিসূদন মন্ত্র উচ্চারণ করে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিযোগ ক্ষত্রিয়োচিত শক্তিযোগ-এর সাধনা করেছিল যুগপৎ। সমকালীন ভারতবর্ষীয় জীবনের নবজাগরণে এই 'কর্মসন্ন্যাস'-এর প্রস্তুতি চলছিল সেদিন।

লক্ষ্য ঃ—'কর্মসন্ন্যাস'-এর বৈপ্লবিক চেষ্টা

শ্বেতাঙ্গ সমাজের হাতে তথাকথিত 'Black Act' নির্যাতনের ফলে বাঙালির মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি ধূমায়িত অবিশ্বাস স্বতন্ত্র অবয়বান্বিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে নীলবিপ্লব ইত্যাদির কথাও পূর্বে বলেছি। এ সব সত্ত্বেও, আনন্দমঠ রচনা-পূর্ব বাঙালির ইতিহাসের ধূমায়িত জীবনক্ষেত্রে প্রতস্ততম অগ্নিশলাকারূপে এসে পড়েছিলেন সিবিল-সার্ভিস-তাড়িত সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির কারণ নিতান্ত অনুল্লেখ্য ছিল। তবু, বিলেতে প্রিভি-কাউন্সিল-এ আপীল করেও এই অন্যায় রদ করা সম্ভব

১। History of Rural Bengal—দ্রষ্টব্য।
২। আনন্দমঠ—ঐতিহাসিক ভূমিকা—সাহিত্য পরিষৎ সং।

হয় নি। কারণ সুরেন্দ্রনাথের বিতাড়নের মূলে ছিল ইংরেজ শাসকদের পক্ষে ভীতিকর, তাঁর উগ্র স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি। এ-দেশের ইংরেজদের অ-সততা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও দীর্ঘদিন ধরে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি বাঙালি প্রবল শ্রদ্ধা পোষণ করত। তাই সুরেন্দ্রনাথ এ-দেশীয় রাজ-প্রতিনিধিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবার জন্য স্বয়ং বিলাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় (১৮৭৫)। এমন কি, ব্যারিস্টারি পাশ করা সত্ত্বেও তাঁকে ব্যারিস্টার হতে দেওয়া হয়নি পদচ্যুতির অপরাধে। এই ব্যাপারে বাঙালি মাত্রেরই ক্ষোভ এবং নৈরাশ্য প্রবল হয়েছিল। সেই সংগে ইংরেজ জাতির সহজ ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধেও বাঙালির বিশ্বাস আমূল বিচলিত হয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে রাজ-পদের শৃঙ্খলমুক্ত সুরেন্দ্রনাথের অভিযানই বাঙালির, তথা সারা ভারতের রাজনৈতিক সম্ভা-বনার পথকে নির্ধারিত করে।

আনন্দমঠে রাজনৈতিক চেতনার বাস্তব পূর্ব-সূত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কৈশোর থেকেই ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড, আয়র্লান্ড-এ চলেছে আত্মমুক্তির সংগ্রাম। প্রতীচ্যের বৈপ্লবিক জগতে তখন চলেছে বিস্‌মার্ক, ম্যাট্‌সিনীর যুগ। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে প্রধানত সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের জগতে ঐ সব প্রতীচ্য বিপ্লবের উত্তাপ ক্রমশঃ সঞ্চিত হচ্ছিল। বিপিন-চন্দ্র পাল তাঁর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখেছেন,—"সুরেন্দ্র নাথের বাগ্মি-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনীর দৈবী প্রতিভা, গ্যারিবল্‌ডীর স্বদেশ উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্ম-চেষ্টা, য়ুন ইটালি (Young Italy) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়র্লন্ডের (New Ireland) আত্মোৎ-সর্গপূর্ণ দেশ-চর্যা এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ-দেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণ কবি-কল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।"[১]

আনন্দমঠ রচনার পূর্বে নানা দেশি-বিদেশী ঘটনার সংঘাতে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা ক্রম-পিনদ্ধ হয়ে আরো 'বস্তুতন্ত্র'-ময় হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের উপন্যাস সেই বস্তুময় রাজনৈতিক অভিঘাতের সাহিত্যিক ফল-শ্রুতি। এই অর্থেই আগে বলেছি, বাঙালির কল্পনা-নির্ভর স্বদেশাভিমান

১। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এ উদ্ধৃত।

প্রথম অবয়ব পরিগ্রহ করেছে আনন্দমঠে। এই উপলক্ষে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও অবকাশ নেই। কেবল স্মরণ করি, সমকালীন ইটালীয় ইতিহাসের অনুসরণ করেই, বাংলা দেশে প্রথম রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতি গঠিত হতে আরম্ভ করে। সুরেন্দ্রনাথ এমন বহু গুপ্তপ্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন। তখনো এ-সবের মধ্যে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রেরণা লক্ষিত হয়নি। কিন্তু, ভাবী বিপ্লবী সমিতিগুলির বীজ এখানেই প্রথম উপ্ত হয়েছিল। তা ছাড়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে ধর্মীয় আদর্শ-বুদ্ধিকে যুক্ত করার প্রবণতাও এসেছে এই সময়েই। এর পেছনে বাংলার কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিশ্রুত দয়ানন্দের প্রেরণা ছিল সর্বাধিক। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই শিবনাথ শাস্ত্রীর গৃহে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করে সেকালের প্রখ্যাত দেশনায়কেরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিলেন,—ব্রিটিশ সরকারের দাসত্ব তাঁরা করবেন না। বাংলার প্রখ্যাত বৈপ্লবিক-দ্বয় বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাসও এই দলে ছিলেন। ঐ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই সুরেন্দ্রনাথ ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্যদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির সশস্ত্র অভিযানের পূর্বাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় ওয়াহাবিদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। ওয়াহাবি আন্দোলন দমনের মুখে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিচারপতি নরম্যান্ কলকাতায় ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট মেয়ো আন্দামানে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নিপীড়িত মানুষের এই বিক্ষোভ ভারতবর্ষে,—তথা বাংলা দেশেও একদিন পূর্ণাবয়ব বিপ্লবের আকার পাবে, বঙ্কিমচন্দ্র এ-কথা অনুভব করেছিলেন। এ-কথাও তিনি বুঝেছিলেন যে, অর্থনৈতিক নির্যাতনই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিপ্লবকে করবে অপরিহার্য। আনন্দমঠের ভাবভূমির পক্ষে '৭৬-এর মন্বন্তরের প্রচ্ছদ উপলক্ষ্য মাত্র,—মূল লক্ষ্য ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ মহীশূর-ব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুই বছর ধরে এই দুর্ভিক্ষে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছিল। অথচ, দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য সংগৃহীত সকল টাকা ব্যয়িত হল ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ (ভারত)-আফগান যুদ্ধে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠ হল নিরুদ্ধ। সেদিন ভারতব্যাপী বিপ্লবের সম্ভাবনায় রক্ষণশীল ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। এই পটভূমিতে আনন্দমঠ লিখিত। ইল্‌বার্ট বিল্-আন্দোলন ও আনন্দমঠের প্রকাশ একই সালে।

আনন্দমঠ ও বঙ্কিমের দূরদর্শন

এর তাৎপর্য আরো স্পষ্ট হয়েছে বঙ্কিমের পরবর্তী কালের উক্তিতে।

মৃত্যুর (১৮৯৪) বছর দু-চার আগে নাকি বঙ্কিম তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে জানিয়েছিলেন,—"একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙালি উন্মত্ত হইয়াছে,—বাঙালি মাতিয়াছে।"১ এই ভবিষ্যৎ বাণীতে সন্দেহ করবার, বা বিস্মিত হবার কিছু নেই। বাঙালির জীবনে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী জেনেই বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে অনাগতের পথ-নির্দেশ করেছিলেন। কারণ, এ-বিষয়ে বঙ্কিমের একটি বক্তব্য ছিল, সেটি তাঁর প্রাচ্য মনের আবিষ্কার।

সমকালীন প্রতীচ্য পৃথিবীতে বিপ্লবের মহৎ-ভীষণরূপ ইতিহাস-সচেতন বঙ্কিম বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সংগে এ-কথাও বুঝেছিলেন যে, য়ুরোপব্যাপী অগ্নিযজ্ঞে অমৃতের তুলনায় ভস্মের পরিমাণই হচ্ছিল স্তূপীকৃত। "সমাজ-বিপ্লব অনেক ক্ষেত্রেই আত্ম-পীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"। এটুকু সমকালীন প্রতীচ্য ইতিহাসে বঙ্কিমের আবিষ্কৃত ফলশ্রুতি। আনন্দমঠে তাই তিনি বাঙালি জীবনের সমাগত বিপ্লবকে সেই আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন সচেতনভাবে।

আনন্দমঠের দৃষ্টিতে 'বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী'—কারণ তারা ভক্তিমাত্র সর্বস্ব,—নির্জ্ঞান। আগেও বলেছি;—জ্ঞানহীন ভক্তি বন্ধ্যা। সত্যানন্দের আজীবন সাধনার পরিণামও ঠিক তাই। সমসাময়িক প্রতীচ্য পৃথিবীর সকল বিপ্লব মানবজীবনের মুক্তি-সাধনার মহত্তর আকাঙ্ক্ষায় ছিল আবেগান্ধ। আর, মুক্তির চেতনা-মাত্রকেই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সীমায়িত করে তোলার ফলে তার দুর্দৈব-রচনাও হয়েছিল সর্বজনীন। বঙ্কিমের বক্তব্য হচ্ছে,—বৃহত্তর জীবন-মূল্যবোধের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্ঠামাত্র-সর্বস্ব রাজনৈতিক বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। জীবন একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য। জীবনের কোনো বিশেষ প্রয়োজনকে উদ্ধার করার সাধনায় অন্যান্য বৃত্তিকে অস্বীকার করার মধ্যে সর্ব-ব্যপ্ত বিচিত্র ও জটিল মানব-ধর্মের কণ্ঠ নিরোধ করা হয়। ফলে, জীবন আপন স্বরূপে প্রতিশোধ গ্রহণ করে,—বিপ্লবীর আত্ম-নিরোধের কৃত্রিম চেষ্টা পরিণামে ব্যর্থ হয়,— সার হয় কেবল আত্মনির্যাতন। জীবানন্দ, ভবানন্দ এবং অন্যান্য সন্তানেরা মাতৃভূমির উদ্ধার সাধনের জন্য বৃহত্তর সংসার কর্তব্যকে পরিহার করতে চেয়েছিল। তাদের জীবনে আত্মবঞ্চনাই সার হয়েছে। সে কেবল জীবানন্দ ভবানন্দেরই নয়,—তাদের গুরু সত্যানন্দেরও। একদিন সকল সন্তানকে তিনি প্রতিশ্রুত করেছিলেন, সন্তানব্রত উদযাপনের আগে নারী-সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে,—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে করতে হবে আত্মনাশ। অথচ চরম

বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী কেন?

১। বঙ্কিমজীবনী ঃ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মুহূর্তে অসহায়ের মত তিনি শান্তির কাছে আবেদন করেছেন,—"তোমারে আমি চিনতাম না। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্যোদ্ধার হইতে পারে।"

সত্যানন্দের পক্ষে অতবড় আত্মবঞ্চনা আর আত্মহত্যায় তফাৎ কোথায়?

আনন্দমঠ উপাখ্যানে "স্ত্রী" প্রসঙ্গ সাংকেতিক। বঙ্কিমের ভাষায়,—"এই সত্যানন্দ শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।"

নারীর দ্বিবিধ স্বরূপেই দেখেছি, শান্তি ও কল্যাণী দুজনেই যেখানে তাঁদের স্বামীর জীবনে যথোচিত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই তাঁরা জীবনের "প্রধান সহায়"। আবার কৃত্রিম নীতিবশে সেই জীবন-ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তা নয়। জীবানন্দের পাশে নবীনানন্দ এবং পদ-চিহ্নের দুর্গে মহেন্দ্রের পাশে কল্যাণী প্রথম বক্তব্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। দ্বিতীয় বক্তব্য প্রতিপাদিত হয়েছে ভৈরবপুরে জীবানন্দের গৃহে নির্বাসিতা শান্তি এবং গৌরীঠাকুরাণীর গৃহে বন্দিনী কল্যাণীর জীবন-পরিণতিতে। আবার বলি, শান্তি-কল্যাণী-কথার সংকেত অর্থাবহ। আনন্দমঠে এরা বৃহত্তর জীবন-প্রেরণার প্রতীক। এই বৃহৎ জীবন-সাধনার সংগে বিপ্লবের আগ্নেয় কর্তব্যের সার্থক সমন্বয় বিধানের জন্য চাই জ্ঞান। মহাপুরুষ সেই জ্ঞান-সাধনার উদ্দেশ্যেই সত্যানন্দকে আহবান করেছিলেন হিমালয়ের দুর্গমতায়। শান্তি ও জীবানন্দও পৃথক ভাবে সেই পথের অভিমুখী হয়েছিল। বিফল বিপ্লবের এই চিত্রাঙ্কণ করে প্রথম সংস্করণ আনন্দমঠের সমাপ্তিতে বঙ্কিম সফলতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সত্যানন্দের ভক্তির সংগে মহাপুরুষের জ্ঞান, শান্তির সংগে কল্যাণীর,—প্রতিষ্ঠার সংগে যুগপৎ বিসর্জনের জীবন-সমন্বয় যেখানে ঘটবে,—সেখানেই সত্যানন্দের প্রজ্বলিত আগুন "উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল—নিভিল না।"

আনন্দমঠের বিপ্লব-চেতনা

ফল কথা, প্রতীচ্য প্রভাবিত রাজনৈতিক বিপ্লব-বুদ্ধিকে ভারতীয় মননের সর্বাত্মক মূল্যবোধের সূত্রে গেঁথে স্বরাট বাঙালির আত্মঘাতহীন নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্কিম। আনন্দমঠ উপন্যাস নয়,—বাঙালির রচিত স্বপ্ন-কবিতা। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দূর-দর্শনের মধ্যে বঙ্কিমের এই স্বপ্ন সার্থক বস্তু-ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রেও বঙ্কিম যে পথের প্রথম ধ্যানী ঋষি,—রবীন্দ্রনাথ সেই

ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য চেতনার সমন্বয়

ধারার শ্রেষ্ঠ জীবন-শিল্পী। বঙ্কিমে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জীবনের যে যৌবন-মুক্তি,—রবীন্দ্রনাথে সেই যৌবন-ধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলার উপন্যাস সাহিত্য গুণে ও সংখ্যায় অজস্র প্রবাহিত হয়ে চলে। এই রচনার লেখকেরা সকলেই উল্লেখ্য নন,—অনেকেই পূর্বসূরীদের অনুকরণ করে গেছেন। কিন্তু, ঐ সব রচনার রুচিগত শালীনতা, পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ ও কাহিনী সৃষ্টির ঔচিত্য-বুদ্ধি একটি প্রশংসনীয়-সুন্দর সাধারণ শিল্প-মান রচনা করেছিল। বাংলা উপন্যাসের জগতে বঙ্কিমের আবির্ভাবকে সংবর্ধিত করে রবীন্দ্রনাথ উল্লাসের সংগে বলেছেন,—"কোথায় গেল সেই বিজয় বসন্ত,—সেই গোলে বকায়লি ?"[১] বিজয় বসন্ত বাংলা দেশের একটি প্রাচীন রূপকথার গল্প; গোলে বকায়লি হিন্দী ভাষার পথ বেয়ে আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে মধ্য যুগের ইসলামী বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করে। কিন্তু, এই নির্দোষ কাহিনী দুটি বাঙালির রুচি-বিপর্যয় ও বটতলার ছাপাখানার সংমিশ্রণে এক অসহনীয় আবিল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। আলোচ্য কালের দুর্বলতম গদ্য রচনাও এই দুর্বল নীতিবোধ ও অসম্ভাব্য গল্প-গ্রন্থের পথ গ্রহণ করে নি। বঙ্কিমানুসারী অনুল্লেখ্য কথা-সাহিত্য-ধারার এইটুকুই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি।

বঙ্কিম-প্রতিভার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

তা ছাড়া, গুণ-বিচারে এ কালের উল্লেখ্য উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে আছেন বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯)। সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে একটি সহজ গল্প-রসিক মন আত্মগোপন করেছিল,—তাঁর লিখিত কথা-সাহিত্যে সেই অন্তঃস্বভাব সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা-কহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত —ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া। এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে। তাহার পরে সেই মুখে-বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি আবার প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।" সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যও এই দুর্লভ গুণে ঋদ্ধ। ফলে, উপন্যাসের জটিলতা প্রায়ই সংসক্তি হারিয়েছে,—কিন্তু গল্পের পীঠে গল্প জমে উঠেছে নিবিড় ভাবে।

সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম উল্লেখ্য উপন্যাস কণ্ঠমালাতে (১৮৭৭) এই বৈশিষ্ট্য

১। আধুনিক সাহিত্য।

প্রস্ফুট। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"কণ্ঠমালার বিংশ পরিচ্ছেদে যে 'মহাকুলীন' উপাধিধারী 'শুভানুধ্যায়ী' সম্প্রদায় উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই বঙ্কিমচন্দ্রকে আনন্দমঠের পরিকল্পনা যোগাইয়াছিল বলিয়া মনে করি।"১

এর আগে রামেশ্বরের অদৃষ্ট এবং দামিনী প্রকাশিত হয়েছিল ভ্রমর নামক সঞ্জীবচন্দ্র পরিচালিত পত্রিকায়।

সঞ্জীবের মাধবীলতা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। জালপ্রতাপ চাঁদ মূলতঃ ঐতিহাসিক রচনা; কিন্তু সঞ্জীবের গাল্পিক বাচনভঙ্গির প্রভাবে কাহিনীটি ঔপন্যাসিক স্বাদুতায় ঋদ্ধ হয়েছে। পালামৌ ভ্রমণ-কাহিনী হয়েও শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্য, একথা সর্বজন-বিদিত।

সঞ্জীবের রস-সুন্দর এই রচনা-প্রবাহের পরিমাণ-স্বল্পতা পাঠকের অতৃপ্তির কারণ হয়। সঞ্জীবের "প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না"—, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। "তাঁহার চেয়ে অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; কারণ তাঁহার প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে।"২

বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র মধুমতী নামে একটি গল্প এবং শৈশব সহচরী নামে উপন্যাস লিখেছিলেন।

বঙ্কিমানুসারী উপন্যাস লেখকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করে ইতঃপূর্বে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সুখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থাদি আজও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্মরণীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, ইংরেজি ভাষায় ছদ্ম নামে তিনি কবিতাদি-ও প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে বঙ্কিমই রমেশচন্দ্রকে আহবান করে আনেন। রমেশচন্দ্র নিজে লিখেছেন,—"একদিন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যদি বাংলা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাংলা লেখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম,—'আমি যে বাংলা কিছুই জানি না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাংলা শিখি নাই, কখনো বাংলা রচনা-পদ্ধতি জানি না।'। গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, রচনা পদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে

রমেশ দত্ত

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।
২। আধুনিকসাহিত্য।

গঠিত করিবে।' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।"১

এর পরেও বঙ্কিম পুনঃ পুনঃ রমেশচন্দ্রকে এ-বিষয়ে অনুপ্রেরিত করেছেন। সে ইতিহাস 'Literature of Bengal' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অবশেষে বঙ্কিমের প্রবর্তনায় কুণ্ঠামুক্ত হয়ে রমেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। মনীষী রমেশচন্দ্র বিশেষ করে অর্থনীতি ও ইতিহাসের পণ্ডিত ছিলেন; ইতিহাসের প্রতিই তাঁর প্রবণতা সমধিক। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক স্বপ্ন-কল্পনার ধারাকে আশ্রয় করে নূতন সাহিত্যিক রূপ পেয়েছিল। তাঁর সকল রচনাই উপন্যাসের সরস আবরণে ধৃত ইতিহাস। প্রথম গ্রন্থ বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) ইতিহাসের ভারে একটু বেশি ভারাক্রান্ত। গ্রন্থটি প্রথম জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ও বাংলা উপন্যাস

'বঙ্গবিজেতার' বিষয়বস্তু আকবরের সময়কার বাংলার ইতিহাসকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক দিক্ থেকে টোডর-মল্ল উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। কিন্তু, ঐটুকুই সব নয়। রমেশচন্দ্রের সকল ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই কাহিনীতে যুগপৎ দুটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে; —একটি ইতিহাসাশ্রিত; দ্বিতীয়টি কাল্পনিক,—রোমান্স ধর্মান্বিত। অপেক্ষাকৃত সার্থকতর ঐতিহাসিক উপন্যাস জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) ও জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)-তে এই দুটি ধারা যুগপৎ সংসক্ত, একত্র বিন্যস্ত হতে পেরেছে। কিন্তু 'বঙ্গবিজেতা'তে কাহিনীর এই অখণ্ডতা সম্পাদিত হতে পারে নি। ঐতিহাসিক কাহিনী যেমন তথ্যভারে অপেক্ষাকৃত নীরস হয়েছে;—তেম্‌নি রোমাণ্টিক গল্পাংশ ও বৈশিষ্ট্য-হীন বর্ণনাধর্মিতার ফলে হয়েছে নির্জীব। তবে, ঔপন্যাসিক রোমান্স রচনায় রমেশচন্দ্র বঙ্কিম-পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন আ-মূল। কেবল ভাব বা প্রকাশ ভঙ্গিতেই নয়, ভাষা-বিন্যাস ও শব্দ-প্রয়োগেও এই বঙ্কিমানুসারিতার অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ জীবন-প্রভাত-এর একেবারে প্রারম্ভিক অংশ। দুর্গেশনন্দিনীর সূচনার সংগে এর সাদৃশ্য হুবহু। বঙ্গবিজেতার গল্পাংশের উপস্থাপনা ভঙ্গিতেও এই প্রবণতার পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়;—"উপাসনা সাঙ্গ হইলে রমণী প্রদীপ লইয়া বহির্গত হইবার জন্য কবাট খুলিলেন। খুলিবামাত্র বাতাসে প্রদীপ নির্বাপিত হইল। সেই অন্ধকার নিশীথ সময়ে ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুবেগে কিঞ্চিৎ-মাত্র কাতর না হইয়া ধীরে ধীরে রুদ্রপুরের গ্রাম্য পথ দিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"

বঙ্গবিজেতা

১। নব্যভারত (১৩০০ সাল)।

বঙ্গবিজেতা ছাড়া রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা আরো তিনটি ঃ—১। মাধবী কঙ্কণ (১৮৭৭), ২। জীবন প্রভাত (১৮৭৮) এবং ৩। জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)। এই রচনা তিনটিতে রমেশচন্দ্রের রোমান্স সৃষ্টির দক্ষতা ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করেছে;—ইতিহাসের সংগে স্বপ্নকল্পনার গ্রন্থন ক্রমে হয়েছে ভার-সমসম। এদিক্ থেকে মাধবীকঙ্কণ 'বঙ্গবিজেতার' চেয়ে উপভোগ্য; কিন্তু সম্পূর্ণ সজীব নয়। তার পরবর্তী উপন্যাস দুইটিতে রমেশচন্দ্রের দক্ষতা পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে।

মাধবীকঙ্কণ-এর গল্প শাজাহানের শেষ জীবনে তাঁর রাজ্য-লোভাতুর পুত্রদের অন্তর্বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—"মাধবী কঙ্কণ মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস। ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ।"[১] অর্থাৎ, নায়কের জীবন-সমস্যার পক্ষে ঐতিহাসিক প্রচ্ছদের প্রভাব প্রাসঙ্গিকতার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। উপন্যাসের নায়ক গৃহত্যাগী হয়ে আলোচ্য রাষ্ট্র-বিপ্লবের আওতায় এসে পড়েছিল। আর, তার জীবনের ব্যর্থ পরিণতির মধ্যে সেই ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার প্রভাব হয়েছিল উল্লেখ্য। তা ছাড়া, গোটা গল্পটি নায়ক নরেন্দ্র, নায়িকা হেমলতা এবং প্রতিনায়ক শ্রীশচন্দ্রের প্রেম-জটিলতার পরিবার-জীবনাশ্রিত মনোজ্ঞ কাহিনী। এখানে রমেশচন্দ্রের গল্প-বর্ণনা ও চরিত্রায়ণ সজীবতা-দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মাধবীকঙ্কণ

রমেশচন্দ্রের সমুল্লেখ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস জীবনপ্রভাত আসলে 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'। ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে শিবজীর সফল অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তথ্যাংশই উপন্যাসটির উপজীব্য জীবনের পটভূমি। মাধবীকঙ্কণে উপন্যাস-কলাগত সজীবতা সরস হয়েছে; কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকেছে অপ্রাধান্যে নিক্ষিপ্ত। জীবনপ্রভাতে, উপন্যাস ও ইতিহাস হয়েছে সম-প্রাণ, —ভারসম। জীবনপ্রভাতে ইতিহাস কেবল পটভূমি নয়; ইতিহাসই গল্পের বিষয়। স্বয়ং শিবাজী গ্রন্থের নায়ক,—প্রতিনায়ক সম্রাট ঔরঙ্গজীব। কি বিষয়-বিন্যাসে, কি চরিত্র-চিত্রণে, কোথাও ঐতিহাসিক তথ্য বা ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার কোনো অপলাপ ঘটে নি। তা হলেও উপন্যাসের পক্ষে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির ইতিহাস-নির্ভর ভূমিকাই সব নয়; মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে এই অসাধারণেরাও পরিচিত জীবনের ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐতিহাসিক জীবনের অপরিচয়ের দূরত্বকে নিবিড়তর করেছে রঘুনাথ-সরযুর রোমাণ্টিক্, অথচ সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক প্রণয়-কথা।

জীবনপ্রভাত

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

জীবন সন্ধ্যা,—'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'। প্রতাপসিংহোত্তর যুগে রাজপুত জাতীয় জীবনের ঘনায়মান সান্ধ্য অন্ধকার জীবনসন্ধ্যার জীবন-ভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে। এটি জাহাঙ্গীরের সময়ের ইতিহাস। জীবন-সন্ধ্যায় ইতিহাসের প্রাধান্য বেশি; কিন্তু তাকে রোমান্স-রসায়িত করা হয়েছে তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রণয় কথায়। তা হলেও, ইতিহাসের ভার উপন্যাসটিতে অনপনেয় হয়ে আছে। তাতে উপন্যাসগুণ দুর্বল যদি হয়ও, তবু, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক অবয়ব গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা সার্থকতম ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন। এদিক থেকে আজও উপন্যাস দুটি প্রায় অনন্যতুল্য।

জীবন সন্ধ্যা

রমেশচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসও লিখেছিলেন দুখানিঃ—(১) সংসার (১৮৮৬) এবং (২) সমাজ (১৮৯৪)। এই উপন্যাস দুটিতে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র জীবনের অতীত-ভূমি থেকে বর্তমানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন। চলমান জীবন-ধারাকে তিনি ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে সামাজিক জীবন-চিত্র হিসেবে গ্রন্থ দুটি পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত হয়েছে। তা ছাড়া, শিল্প-মনের সহজ সহৃদয়তার প্রভাবে গল্প দুটি ঔপন্যাসিক সরসতাও অর্জন করেছে। অবশ্য ঐতিহাসিকোচিত দৃষ্টির অতি-বিস্তারের দরুণ, রমেশচন্দ্রের এই শ্রেণীর উপন্যাসে সংসক্তি অপেক্ষাকৃত কম।

সামাজিক উপন্যাস ঃ—

'সংসার' পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য জীবন-কথা। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের পথ-প্রদর্শক ছিলেন পাদ্রি লালবিহারী দে। লালবিহারীর Bengal Peasant Life বা Govinda Samanta-এ (১৮৭৪) বর্ধমানের উত্তর অঞ্চলের চাষী ঘরের নিখুঁত চিত্র আছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের স্থলও এই অঞ্চল।"[১]

১। সংসার

সামাজিক উপন্যাস হিসেবে 'সমাজ' ঘনতর-নিবন্ধ। বিধবা-বিবাহের সামাজিক সমস্যা এই উপন্যাসে সহৃদয় সমর্থন পেয়েছে। তাহলেও, রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবেই বিশেষ স্মরণীয়। বঙ্কিমের রাজসিংহে ইতিহাস সম্পূর্ণ উপন্যাসত্ব লাভ করেছে; রমেশচন্দ্রের রচনায় ইতিহাস এবং উপন্যাস সমসূত্রে বিধৃত। সেই সংগে উদ্দীপ্ত হয়ে আছে রমেশচন্দ্রের সুগভীর স্বদেশ-প্রীতি।

২। সমাজ

বঙ্কিম-সমকালে সামাজিক উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে প্রখ্যাত হয়ে-

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খন্ড, ২য় সং।

ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। এঁর পিতার নাম ছিল মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। তারকনাথ ডাক্তারি পড়ে সরকারি চিকিৎসা বিভাগে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যানুরাগ ছিল তাঁর স্বভাবগত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন,—"আমি ও তারকবাবু যৌবনে কলিকাতা হিন্দু হোস্‌টেলে থাকিতাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতাম, তারকবাবু মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেন। তারকবাবুকে মেডিকেল কলেজের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে অতি অল্প সময়েই দেখিতাম। তিনি অধিকাংশ সময়েই হয় ডিকেন্সের কোন উপন্যাস, না হয় মেকলে কিংবা গিবনের ইতিহাস পড়িতেছেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল।"১

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্কিম-সমকালীন যুগে তারকনাথের উপন্যাসের অ-তুল্য খ্যাতির মূলে ছিল তার স্বাদের স্বাতন্ত্র্য;—রচনার উৎকর্ষ তত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বল্‌তে গিয়েছেন, সেখানে তাঁহাকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন; তাঁদের মধ্যে জাতি ও দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি।"২ পূর্বের আলোচনাতে দেখেছি, ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির সদ্য-অঙ্কুরিত জীবন-সমস্যাই বঙ্কিম উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য ছিল। গ্রামীন বাংলার আদিম জীবন-ধারার, নিস্তাপ হলেও তরঙ্গায়িত বিচিত্র পরিচয় তাঁর উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। তারকনাথের উপন্যাসে সেই বহুদিনের চেনা মানব মানবীর সংগে মিলিত হয়ে বাঙালির গল্প-পিপাসা স্বজন-সান্নিধ্যের তৃপ্তি লাভ করেছে। স্বর্ণলতার জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে এইটিই সবচেয়ে বড় কথা।

রচনার স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবতা

শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাই অপার স্নেহের সম্পর্কে বন্ধ। জ্যেষ্ঠ যখন বৈষয়িক জ্ঞানে তৎপর হয়ে উঠেছেন, কনিষ্ঠ তখন "অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়" নিয়ে ছিলেন ব্যস্ত। বড় ভাই জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করে মাইনের ওপরেও দ্বিগুণ, চতুর্গুণ গুছিয়েছেন; ছোট ভাই তখন যাত্রাগানে করেছেন সংগীত-চর্চা। তারপরে পাপিষ্ঠা বড়বধু প্রমদার চক্রান্তে বিধুভূষণ ভ্রাতৃস্নেহে বঞ্চিত, অন্ন-দীন হয়ে পড়েন। উপার্জনের আশায় সংসার-অনভিজ্ঞ বিধুভূষণ কলকাতায় গিয়ে বহু সুখ-দুঃখে পূর্ণ জটিল-

স্বর্ণলতা

১। দ্রষ্টব্য সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৫৭।
২। ছিন্নপত্র।

তার মধ্য দিয়ে ক্রমে সমুন্নতি লাভ করে। কিন্তু, ততদিনে পতিপরায়ণা ছোট বউ সরলা কপর্দকহীনতা ও পতিচিন্তার যন্ত্রণায় মুমূর্ষু হয়েছে,—বিধুভূষণের সান্নিধ্যলাভ করে সে প্রাণ ত্যাগ করে। এর পরে গল্প দ্বিতীয় পুরুষে এসে পৌঁচেছে। বিধুভূষণের পুত্র গোপাল ও তার সহপাঠী হেম-এর ভগ্নী স্বর্ণলতার প্রণয়, বিপদ ও পরিণামী মিলনে হয়েছে উপন্যাসের সমাপ্তি। কিন্তু সে কাহিনীতে উপন্যাসোচিত অখণ্ডতা নেই; অনন্ত বিস্তারী বৈচিত্র্যের তুলনায় নেই সমস্যা-জটিলতার সর্বাবয়ব সংসক্তি। ফলে, স্বর্ণলতা উপভোগ্য হয়েছে সমকালীন সমাজ-জীবনের যথার্থ-বর্ণিত চিত্র-সমষ্টিরূপে। স্থানে স্থানে এই সব বর্ণনা কৌতূহলের সংগে কৌতুককেও অবারিত করে তোলে। দৃষ্টান্ত-হিসেবে বিধুভূষণ ও নীলকমলের কালীঘাট দর্শনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে এসে মনে হয়, —মানুষের ইতিহাস বুঝি নিশ্চল হয়ে আছে, মহাকালীর পদতলে কালের গতি হয়েছে নিরুদ্ধ। সেই পাণ্ডার লোলুপ অত্যাচার, সেই মালাওয়ালার উৎপীড়ন,—সেই গতানুগতিকতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাসে সব চেয়ে সজীব চরিত্র নীলকমল। তার হাস্যকর আবির্ভাব ও বেদনাদায়ক পরিণতি, উভয় ক্ষেত্রেই নগণ্য মানুষের হাস্যকর নগণ্য জীবন-বাসনা অপার ট্রাজেডির সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুতঃ, এখানেই তারকনাথের প্রতিভার যথার্থ অনন্যতুল্যতা।

তারকনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'হরিষেবিষাদ' বা নায়ক-নায়িকা-শূন্য উপন্যাস (১৮৮৭), 'অদৃষ্ট' সামাজিক উপন্যাস (১৮৯২) ও তিনটি গল্প (১৮৯৮)। সর্বশেষ রচনা 'বিধিলিপি' উপন্যাস লেখকের মৃত্যুকালে অসমাপ্ত ছিল।

তারকনাথের অন্যান্য রচনা

তারকনাথের আর কোনো লেখাই উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তার কারণ হয়ত বিষয়গত বৈচিত্র্যের অভাব। আগে বলেছি, লেখকের জনপ্রিয়তার কারণ ছিল বাঙালির পরিচিত জীবনের প্রথম রূপায়নের সফলতা। বস্তুতঃ, স্বর্ণলতায় গৃহ-সীমায়িত সেই জীবনের প্রায় সকল দিক্‌ই নিঃশেষ পুঙখানুপুঙখতার সংগে বর্ণিত হয়েছিল। ফলে, পরের উপন্যাসগুলিতে পুরাতন রচনা-চিত্রাদির ছায়াসম্পাৎ ঘটেছে। অথচ, কলা-কর্ম কোনো ক্ষেত্রেই সফল রসোত্তীর্ণতার উপযোগী হতে পারে নি। ফলে, পাঠকের কৌতূহল ক্রমে স্তিমিত হয়েছে। তা না হলে, তারকনাথের অন্যান্য রচনা স্বর্ণলতার তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। বরং, 'অদৃষ্ট' উপন্যাসের বহুস্থল সমসাময়িক জীবন-পরিচয় হিসেবে আরো কৌতুক-সজীব।

বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত ঔপন্যাসিক হিসেবে তারকনাথেরই সমপর্যায়ে উল্লেখ্য প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। তারকনাথ লিখেছিলেন সামাজিক বিষয় নিয়ে,

প্রতাপচন্দ্রের দুইখণ্ডে সমাপ্ত বঙ্গাধিপ পরাজয় (১৮৬৯-১৮৮৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস। যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের জীবন-কথা 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর বিষয়বস্তু। লেখক নিজে ঐতিহাসিক ছিলেন। ফলে, রচনায় ইতিহাসানুগত্য সুগভীর। কিন্তু, বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা, অতিবিস্তার, এবং ভাষায় নীরস বর্ণনামূলকতা হেতু উপন্যাস হিসেবে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি,—এমন কি, সুখপাঠ্য-ও হয়নি। প্রতাপচন্দ্রের রচনায় স্কট্-এর ইংরেজি উপন্যাসের বহুল প্রভাব আছে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

বঙ্কিমোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৫—১৯৩২)। মহর্ষির তিনি চতুর্থ কন্যা, রবীন্দ্রনাথের ছিলেন 'ন-দিদি'। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, স্বর্ণকুমারীই ছিলেন, "বাঙালা সাহিত্যের প্রথম ভাল লেখিকা"। স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ (১৮৭৬) ইতিহাস-বিষয়ক,—পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী। কিন্তু তাঁর সব রচনাতেই রোমান্স ঘন-গভীর। ভাব ও ভাষায় সে রোমান্স রস-নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে নারীসুলভ স্পর্শকাতরতার মৃদু আন্দোলনে। স্বর্ণময়ীর এই ধরণের উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৬), 'মালতী' (১৮৮৬), 'হুগ্‌লির ইমাম বাড়ী', 'কাহাকে ?'। প্রথম দুটি উপন্যাস ভাই-বোনের স্নেহ-সম্পর্ককে আশ্রয় করে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন-ভাবনায় নূতন রোমান্স্-রসের সঞ্চয় করেছিল। মিবাররাজ (১৮৮৭), বিদ্রোহ (১৮৯০), ফুলের মালা ইত্যাদি ইতিহাসাশ্রিত রচনা। তা ছাড়া আছে বিচিত্রা (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১) মিলন-রাত্রি (১৯২৫)।

স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারীর স্নেহলতা উপন্যাস (১২৯৯ সাল) সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"বাঙালি-সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।"১

স্বর্ণকুমারী দীর্ঘকাল ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি কবিতা এবং নাটকও রচনা করেছিলেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসকে আশ্রয় করেই তিনি বাংলার উপন্যাসক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। কপালকুণ্ডলা গল্পাংশের পরিণতিগত অস্পষ্টতা গল্প-রসান্ধ পাঠকদের কৌতূহলকে অতৃপ্ত করে রেখেছিল। মৃণ্ময়ী উপন্যাসে (১৮৭৪) দামোদর সেই কাহিনীকে সম্পূর্ণ করলেন;—কপালকুণ্ডলার মৃণ্ময়ী রূপে পরিণতি

দামোদর মুখোপাধ্যায়

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।

দেখে গল্পামুদে পাঠক খুশি হয়ে উঠল। ফলে, মৃণ্ময়ী অপূর্ব সমাদর লাভ করেছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে, দামোদর আয়েষার গল্প সম্পূর্ণ করে নূতন করে লিখেছিলেন "নবাব-নন্দিনী বা আয়েষা।"

দামোদরের গাল-গল্প লেখার হাত ছিল। কিন্তু পরিণত কাহিনী রচনার দক্ষতা ছিল না। তাই, তাঁর নিজস্বতা-মণ্ডিত রচনাগুলি অপরাধ মূলক ডিটেকটিভ্ গল্প হয়ে উঠেছে অনেকটা। দামোদর-গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে বিমলা (১৮৭৭), দুই ভগিনী, জয়চাঁদের চিঠি, মা ও মেয়ে, কর্ম-ক্ষেত্র, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, প্রতাপসিংহ, নবীনা ইত্যাদি।

"ইংরেজি উপন্যাসকে বাঙালায় রূপান্তরিত করণে দামোদর দক্ষতা দেখাইয়াছেন।"১ 'কমলকুমারী' স্কট্-এর 'দি ব্রাইড্ অব্ ল্যামার মুর' ও 'শুক্লবসনা সুন্দরী' কলিন্স-এর 'দি ওম্যান্ ইন্ হোয়াইট্' অবলম্বন করে লেখা।

'সুকন্যা' নামে দামোদর একটি নাটক লিখেছিলেন, মহাভারতীয় বিষয় আশ্রয় করে।

কবি শিবনাথের উপন্যাস রচনার দক্ষতাও অনুল্লেখ্য ছিল না, যদিও তিনি মননশীল গদ্য-লেখক হিসেবেই সর্বাধিক খ্যাত। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলির কাহিনী শিথিলবদ্ধ; গল্পে জীবন-মূলোভূত কোনো জটিলতা নেই। ক্ষণে ক্ষণে দুর্ঘটনা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে ঃ—কিন্তু তার প্রায় কোনোটিই জীবনের অপরিহার্য জটিলতাকে আশ্রয় করে নি। পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষিতের সমস্যার সংগেও চরিত্রগুলি দেহ-মনোগত সজীব প্রতিক্রিয়া রচনা করতে পারেনি। ফলে, শিবনাথের গদ্য গল্প-রচনা উপাখ্যান-এর পর্যায় অতিক্রম করে উপন্যাস হয়ে উঠ্তে পারে নি।

শিবনাথ শাস্ত্রী

তাঁর প্রথম উপন্যাস মেজবৌ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যুগান্তর (১৮৯৫) শিবনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'মেজবৌ' ক্ষুদ্রাকৃতি ছিল, যুগান্তর-এর আকার বৃহৎ। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবনে সর্বমুখী যুগান্তর-এর পরিচয়-বহ এই উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের রসদৃষ্টির তুলনায় ঐতিহাসিকের বিচক্ষণতা ও প্রাবন্ধিকের মনন এই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার সংগে যুক্ত হয়েছিল শিবনাথের তীব্র আদর্শ-সচেতনা। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

শিবনাথের আরো দুটি উপন্যাস 'নয়নতারা' (১৮৯৯) এবং 'বিধবার ছেলে' (১৩২২ সাল)। শেষ লেখাটি লেখকের মৃত্যুকালে অসংস্কৃত অবস্থায় পড়েছিল।

১। ঐ।

পল্লী-বাংলার জীবন-চিত্রকে অন্তর-বাহিরে সুষম-বিন্যস্ত করে হৃদ্য করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন,—"আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে।......সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে নিরানন্দময় ইতিহাস, তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরি মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহ-মিলন হাসি কান্না নিয়ে যে মানব-জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।"১ শ্রীশচন্দ্রের ঔপন্যাসিক স্বভাব এখানে সুস্পষ্ট-ব্যক্ত। তাঁর উপন্যাস চারখানির মধ্যে আছে শক্তিকানন (১৮৮৭), ফুলজানি (১৮৯৪), কৃতজ্ঞতা (১৮৯৬) এবং বিশ্বনাথ (১৮৯৬)। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ফুলজানি'র সুদীর্ঘ সমালোচনা 'আধুনিক সাহিত্যে' ধৃত হয়েছে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

উনিশ শতকের বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি উল্লেখ্য ব্যতিক্রম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়। এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে দেখেছি, জীবনের মর্মোৎসারিত জটিল সমস্যা-গ্রন্থির উপস্থাপনা ও বিচার-বিশ্লেষণেই বাংলা কথা-সাহিত্য গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছিল। তাতে চঞ্চল চলমানতার নূতন ধারা প্রবর্তিত করেছিলেন আলোচ্য গল্পশিল্পিদ্বয়। এ-পথে দুজনেই ছিলেন দু'টি পৃথক্ শিল্প-স্বভাবের প্রবর্তক,—প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব-তন্ত্র।

ইন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁর হাস্যরসাত্মক নক্শা জাতীয় রচনায়। এদিক্ থেকে তিনি আঙ্গিক-সম্পূর্ণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভবানীচরণের ধারাকে নূতন করে প্রয়োগ করলেন। তাই, তাঁর প্রথম গদ্য রচনা কল্পতরু (১৮৭৪) "বাঙালার প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস"। গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ নিজে লিখেছিলেন,—"রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু, শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই।"২

ইন্দ্রনাথ

অন্যত্র, একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—"আমি Satire টাকে বাঙালির উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী Satirist দিগের বই পড়িয়া আমার এই সাধ হইয়াছিল।"৩

১। ছিন্নপত্র।
১। পাঁচুঠাকুর—মুখপাত।
৩। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৩৪—দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রনাথের প্রথম Satire একটি প্রকাশমান নাটককে উপলক্ষ্য করে রচিত হয়। এ'র 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' (১৮৭০) পদ্যে লেখা।

কল্পতরু প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। নব্য-হিন্দুত্বের (Neo-Hindiusm) পক্ষ থেকে বিশেষ করে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধেই ইন্দ্রনাথ Satire-এর আঘাত রচনা করেছিলেন। রচনায় সরসতা ও বিদ্রূপে কশাঘাতের তীব্রতা থাক্‌লেও ইন্দ্রনাথের রুচি ও ইঙ্গিত সর্বত্র পরিচ্ছন্ন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে কল্পতরুর বহুল প্রশংসা করেছিলেন।

ইন্দ্রনাথের তৃতীয় রচনা 'ভারত উদ্ধার' পদ্যে লিখিত। কাব্যটি বাঙালির সমকালীন দেশ-প্রেমের দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা ঃ—

"গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি,
কমল আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দান্ত বাঙালি—
ত্যজিয়া বিলাস ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ায় ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল কোঁচা,—
ভারতের নির্বাপিত গৌরব-প্রদীপ,—
তৈলহীন, সল্‌তে-হীন, আভাহীন এবে
জ্বালাইলা পুনর্বার উজ্জ্বলিয়া মহী।"

ইন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পঞ্চানন্দ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী কালে পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীর অংশ-ভুক্ত হয়। ঐ সব রচনা একত্র সংগ্রথিত করে তিনখন্ডে সম্পূর্ণ পাঁচুঠাকুর (১২৯১—১২৯২ সাল) প্রকাশিত হয়।

ক্ষুদিরাম (গাল গল্প)-এর প্রকাশ কাল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-সরস কাহিনী রচনার জন্য উল্লেখ্য হয়ে আছেন। কিন্তু, ইন্দ্রনাথের রচনার মত ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ-রচনায় বিদ্রূপের তীব্র জ্বালা নেই। বরং, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের অন্তরালে গোপন রয়েছে স্নিগ্ধ কৌতুকরস।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তি-জীবন রূপকথার চেয়েও আজগুবি ছিল। তাঁর আবাল্য যন্ত্রণা-তিক্ত জীবন-সংগ্রাম পরিণামে আশাতীত সফলতায় হয়েছিল ঋদ্ধ।[১] কিন্তু, দুঃখে যেমন অবিচলিত দৃঢ়মনা ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ, তেম্‌নি জীবনের সমুন্নতি বিষয়েও ছিলেন বীতস্পৃহ। তাঁর সারাজীবন মানব-হিতব্রত এবং প্রখর জ্ঞান-সাধনায় অতিবাহিত হয়েছিল। সেকালের ব্রাহ্মণ-পন্ডিতের

১। দ্রষ্টব্য—বঙ্গ ভাষার লেখক ও সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৩৬)।

সন্তান হয়েও একাধিকবার প্রতীচ্য ভূমিতে ঘুরে আসার অবকাশ তাঁর ঘটেছিল। ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রত্যন্ত পর্যন্ত বিচরণ করে ফেরাও নিরর্থক হয় নি ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পি-জীবনে। তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টির সংগে যুক্ত হয়েছিল ভূয়োদর্শন জনিত সহজ অনাসক্তি, তাঁর চেতনার মধ্যে নিহিত হয়েছিল উদার প্রসন্ন ব্যাপ্তি। ফলে, তাঁর ব্যঙ্গ রচনা কখনো তীব্র-তির্যক হতে পারেনি; সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে একটি স্মিত-প্রসন্ন কৌতুক। এদিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের রচনা যেমন সরস, তেম্নি স্নিগ্ধ।

তাঁর প্রথম রচনা কঙ্কাবতী-তেই (১২৯৯) এই সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ স্ফুট হতে পেরেছে। কঙ্কাবতী "উপকথার উপন্যাস";—রূপকথার কঙ্কাবতী-গল্পকে আশ্রয় করে লেখা। ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য রচনা-বলীতেও রূপকথা-ধর্মী অসম্ভবের রস অফুরন্ত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এই কারণেই একদা তিনি ছেলে-ভুলানো গল্পের লেখক বলে বড়দের সাহিত্য-

উপন্যাস

আলোচনায় উপেক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু, বড়দের জীবনেও গম্ভীরতা এবং গভীরতা-ই সব নয়। জীবনের আস্বাদনকে তরল না করেও, তাকে কৌতুকোচ্ছলতায় চঞ্চল, চল-চপল যে করা চলে. উনিশ শতকের কথা-সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ তার অনন্যতুল্য উদাহরণ। তাঁর সূক্ষ্ম কারুকর্ম ও কৌতুক-প্রসন্ন রচনাভঙ্গির কল্যাণে রূপকথার গল্পও কেবল চিত্তাকর্ষক হয়নি,—নূতন স্বাদের অবতারণা করেছে। এই প্রসঙ্গে নানা প্রতীচ্য লেখকের প্রভাবেরও বিশদ পরিচয় দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন।১

কঙ্কাবতী ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে আছে ফোক্‌লা দিগম্বর (১৯০১), মুক্তা-মালা (১৯০১) ও ময়না কোথায়! (১৯১১)। কঙ্কাবতী এবং ফোক্‌লা দিগম্বর-এর জনপ্রিয়তা একদা বহু-ব্যাপ্ত হয়েছিল।

উপন্যাসের চেয়েও ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-সাহিত্যের উপাদেয়তা ঘনতর-নিবিষ্ট হয়েছে। গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে ভূত ও মানুষ (১৯০১), মজার গল্প (১৩১২ সাল), ডমরুচরিত (১৯২৩)। এই সকল গ্রন্থের বহু গল্প একসংগে কৌতুক-স্নিগ্ধতা ও রসহৃদ্যতার আকর। ডমরুচরিত প্রকাশিত হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পরে। ডঃ সুকুমার সেন

গল্প

লিখেছেন,—"বাঙালা সাহিত্যে ডমরুধর-চরিত্র নূতনতর সৃষ্টি। এই ভূমিকাটির মধ্যে সাহিত্য-রূপ সৃষ্টির অমরতা আছে। অতিশয়োক্তির ভয় সত্ত্বেও একথা বলিতে

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।

পারি যে, সেরভান্তের ডন্‌কুইক্‌সোট্‌, কোনান ডয়েলের শার্লক্‌ হোম্‌স্‌ এবং আর্নেস্‌ট্‌ ব্রামার কাইলুঙের মত ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধরও কল্পনা-প্রসূত হইয়াও সাহিত্যের সনাতন বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছে।”২

এই সাদৃশ্য-চিত্র থেকে ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পি-স্বভাবের যথার্থ পরিচয় প্রতিপন্ন হতে পারবে।—

“একবার একজন ধাঙড়ের সংগে আমি সুন্দর বনের ভিতর বেড়াইতে ছিলাম। একস্থানে এক গাছের নিম্নে স্তূপীকৃত হাড় পড়িয়াছিল। প্রথম মনে করিলাম, মানুষের অস্থি, ব্যাঘ্রগণ বোধ হয় মানুষ ধরিয়া এ স্থানে আনিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহার পর আরো নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে সে সব বানরের হাড়। গাছটি দেখিলাম যে হেঁতাল নহে, খেজুরও নহে। খেজুরের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু খেজুর গাছের পাতাগুলি যেমন উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পাতা সেরূপ ছিল না, ইহার যাবতীয় কাঁচা পাতা নিম্নমুখ হইয়া গাছের গায়ে লাগিয়াছিল। গাছের মাথায় কাঁদি কাঁদি সোনার বর্ণের অতি চমৎকার ফল ফলিয়াছিল। সেই ফল পাড়িতে ধাঙড়কে আমি গাছের উপরে উঠিতে বলিলাম। ধাঙড় গাছে উঠিল। পাতার ভিতর দিয়া যেই গাছের মাথার নিকট উঠিয়াছে, আর পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময় ধাঙড়ও “প্রাণ গেল প্রাণ গেল” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার পরে ধাঙড়ের চর্মাবৃত ভগ্ন হাড়গুলি নীচে পড়িতে লাগিল। তাহার পরে পাতাগুলি পুনরায় নিম্নমুখ হইয়া গাছের গায়ে আসিয়া লাগিল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, এই ভয়াবহ বৃক্ষ ধাঙড়ের রক্ত মাংস, মায় হাড়ের রস পর্যন্ত চুষিয়া খাইয়াছে।” [ডমরু চরিত]

ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ রচনাই বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসী-পোষিত জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথের রচনাবলীর প্রকাশেও বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উৎসাহ পূর্বে লক্ষ্য করেছি। তাঁর সাহিত্য-প্রীতির এই বৈশিষ্ট্য যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। চার ভাগে সমাপ্ত ‘মডেল ভগিনী’ (১২৯৩—১২৯৫? সাল) তারই সাহিত্যিক প্রমাণ। যোগেন্দ্রচন্দ্র অবশ্য ব্যঙ্গ-কাহিনী রচনায় ইন্দ্রনাথের তীব্র ঝাঁঝাঁলো পথই অনুসরণ করেছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

যোগেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ-দৃষ্টির সংগে সাংবাদিকের তথ্য-দর্শন যুক্ত হয়েছিল। ফলে, অতিশয়োক্তি ও অশালীনতার ভার সত্ত্বেও অনেক

২। ঐ।

জায়গায় তাঁর রচনা সরসতার সংগে ঐতিহাসিক জীবন-পরিবেশকেও জীবন্ত করে তুলেছে। কলকাতার গ্রীষ্ম বর্ণনার প্রাসঙ্গিক চিত্রে যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন,—"কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর তো আগুনের খাপ্‌রা। টিনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চূনকাম-করা শাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্ন তপনের তাপ লাগিয়া গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে।

মডেল ভগিনী

যে বাড়িগুলার হলুদে রং, সে গুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে! তক্তাচাপা-অসূর্যম্পশ্য-নবদূর্বাদল-শ্যাম রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়িতে আজ কাল একটু হরিতালি গোছ রং মাখানো হয়, সেই খানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মনপ্রাণ-শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।

"বড় সুখের বিষয়, কলিকাতার বাড়ি যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই ঐ হরিতাল-রঙে একটু 'নিকোন-পোছান' করিয়া তাহার ভাড়া বাড়ান হইতেছে। বাড়ি পড় পড়, বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে; ছাদ ফাটিয়াছে, কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটি হইতে দুচার দিনের মধ্যে উহাকে ভাঙিয়া দিবার আজ্ঞা আসিবে। ওমা! পনের দিন পরে দেখি, কতকগুলা রাজমিস্ত্রি সেই হরিতালী রং হাঁড়া হাঁড়া গুলিয়া হু হু শব্দে তাহার অষ্ঠ-পৃষ্ঠ ললাট মাখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে দিব্য ফুট্‌ফুটেটি হইল। তখন বাড়ির কর্তা প্রচার করিতে লাগিলেন, 'আমার ইচ্ছা, (ত্রিশ টাকা ভাড়া ছিল) দশটাকা বাড়াইয়া চল্লিশ টাকা করি।' গিন্নী বলিলেন, 'তা হবে না; পঞ্চাশ টাকার কম ও বাড়ি ছাড়া হবে না।' পঁয়তাল্লিশ বর্ষ বয়স্কা বারাঙ্গনা, গোলাপী রঙে ছোপান পুরাণ কাপড়ের কাঁচুলি-কসনে ডবল বিজিটের দাবি করে।" [মডেল ভগিনী]

যোগেন্দ্রচন্দ্রের শিল্প-স্বভাব এখানে সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনভাগে সম্পূর্ণ বাঙালি চরিত (১২৯২-৯৩ সাল), চিনিবাস চরিতামৃত (১৮৮৬), মহীরাবণের আত্মকথা (১২৯৫), পাঁচপর্ব-কালাচাঁদ (১৮৮৯—৯০)। এই সব রচনাবলীতে ইন্দ্রনাথের রচনার মতই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট চরিত্রাবলীকে গ্রহণ করে অতিশয় রঞ্জিত করা হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২) তিন ভাগে সম্পূর্ণ রোমান্স।

অন্যান্য রচনা

যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত হয়েছিল মডেলভগিনী। এই গ্রন্থের বহুল অনুকৃতি-অনুসৃতি চলেছিল। 'মডেলভ্রাতা বা আদর্শ যুবক' এদের মধ্যে একটি।

বঙ্কিমোত্তর বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাস রচনার ছড়াছড়ি চলেছিল।

শুধু বিষয়গত কৌতূহলের দিক্ থেকে এদের আরো কটির নামমাত্র উল্লেখ করব।

মাত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) সেকালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) শ্রেষ্ঠ শোককাব্য। লেখকের প্রথম পত্নীর মৃত্যু উপলক্ষ্য করে ৭টি পৃথক্ 'শোকোচ্ছ্বাস' নিয়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়। চন্দ্রশেখর আসলে উৎকৃষ্ট গদ্য প্রাবন্ধিক ছিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম-ও পৃথক্ রচনার সমষ্টি। লেখক-মনের শোকানুভবের অখণ্ডতার সূত্রে গাঁথা পড়ে সম্পূর্ণ উপন্যাসের রসস্বাদ অর্জন করেছে। এই গ্রন্থের 'শ্মশানে' নামক রচনাংশটি বাছাই করে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন। পৃথক্ প্রকাশরে প্রেরণার মূলে ছিল বঙ্কিমের এই উৎসাহ-পূর্ণ স্বীকৃতি। গ্রন্থটি সেকালের তরুণ চিত্তে প্রবল রস-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

এই লেখকের অপরাপর গ্রন্থ সব কয়টিই নিবন্ধ, নয়ত রস-নিবন্ধ। এদের মধ্যে আছে,—মসলা বাঁধা কাগজ, সারস্বতকুঞ্জ (১৮৮৫), স্ত্রী-চরিত্র (১৮৯০), কুঞ্জলতার মনের কথা (১৯০২), রস গ্রন্থাবলী (১৯০৫)।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'গদাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা' (১৮৮৩) নাম-বৈশিষ্ট্যের জন্য উল্লেখ্য। গ্রাম-বাংলা সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রন্থটিতে চিত্রিত হয়েছে। এই একই লেখক 'ভারত ভ্রমণ কাব্য' এবং 'রাজবালা' নাটক লিখেছিলেন।

সুরলোকের বঙ্গের পরিচয়

দুইখণ্ডে সমাপ্ত 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' (১৯৩৩—৩৪)-এর লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু, বইটির সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ উল্লেখ্য। সমকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের প্রায় সর্বমুখী পরিচয় সুদীর্ঘ গ্রন্থটিতে উদ্ধৃত হয়েছে ব্যঙ্গ-সরস নক্সার মাধ্যমে।

চন্দ্রনাথ বসু

নিছক সংবাদ হিসেবে বলা চলে, বঙ্কিমযুগের রক্ষণশীল প্রাবন্ধিক চন্দ্রনাথ বসু পশুপতি সম্বাদ (১২৯০ সাল) নামে একটি ব্যঙ্গ-উপন্যাস লিখেছিলেন। রচনায় মৌলিকতা নেই, বঙ্কিম ও ইন্দ্রনাথের প্রভাব বহুল।

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের মুক্তি

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"প্রবন্ধ-শ্রেণীর রচনা সাহিত্য-শ্রেণীর প্রান্তবাসী। যদি বস্তুর অতিরিক্ত কিছু উপাদেয়তা থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবন্ধের স্বাদুতা পরিপূর্ণ বস্তু-নির্ভর না হয়, তবেই সাহিত্যের আসরে প্রবন্ধ স্থান পায়, তা না হলে তার স্থান বিদ্যার সভায়।

প্রবন্ধ ও সাহিত্য

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অপর বিভাগের মত প্রবন্ধেরও প্রবর্তন হয়েছিল বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে প্রবন্ধ দৈবাৎ সাহিত্য রসবাহী ছিল।"[১] ডঃ সেন এখানে ইঙ্গিত করেছেন,—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শেই সাহিত্য-রসের সংগে বাংলা প্রবন্ধ প্রথম অপরিহার্য সম্পর্কে অন্বিত হয়েছিল। এই সহজ সাহিত্য-রস-সিক্ততার মধ্যেই বাংলা প্রবন্ধের যৌবন-মুক্তি ঘটেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পূর্বের আলোচনায় বলেছি, বস্তু-ঋদ্ধ মনন-ভূয়িষ্ঠ গদ্য রচনাকেই আমরা আজকাল প্রবন্ধ নামে অভিহিত করে থাকি। একথাও বলেছি যে, সাহিত্যের উৎকর্ষ বুদ্ধির প্রখরতায় নয়, হৃদ্-বৃত্তির একান্ত সান্নিধ্যে। দেহ-মন, বুদ্ধি-অহঙ্কারের সকল বিষয়ই অনায়াসে সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠ্‌তে পারে, যদি শিল্পি-হৃদয়ের তপ্ত-অনুভবের দ্বারা তা হয় প্রাণ-সঞ্জীবিত। কিন্তু, গদ্য মূলতঃ প্রয়োজনের বাহন, যে প্রয়োজনের প্রতি হৃদয়ের নিরন্তর অবধান অপরিহার্য নয়। অন্যদিকে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখেছি, গদ্যের আবির্ভাব যুক্তি-বিচার ও মননকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করে। লিখ্য গদ্য মৌল স্বভাবে চিদ্‌বৃত্তি-নির্ভর বলেই গদ্য-লেখকের হৃদয়-ধর্মের সংগে তার যোগ অব্যবহিত বা অপরিহার্য নয়। তা হলেও, মননশীল চিন্তাঋদ্ধ প্রবন্ধের গদ্য ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের পংক্তিভুক্ত হতে বাধা নেই। কারণ, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্",—সাহিত্য সবন্ধে এটি চরম কথা হলেও, অন্ততঃ এ-যুগে একমাত্র কথা নয়। নিতান্ত স্থূল অর্থেও জীবন-সম্পৃক্ততাই এ-যুগে সাহিত্য রচনার অপরিহার্য পূর্ব-সূত্র (Pre-condition)। এদিক্ থেকে, আধুনিক জীবন তার বহু বিচিত্র উপাদান নিয়ে যেমন সমুন্নত, তেমনি গ্রন্থি-জটিল। এখানে বস্তুময়তা, চিন্তা ও মনন থেকে মানুষের অনুভবকে একান্ত পরিচ্ছিন্ন করা চলে না। গভীর আবেগের মধ্যেও জড়িয়ে থাকে

সাহিত্য ও জীবন

১। 'বাংলা প্রবন্ধ ১৯০১-২৫' [দেশ—১৩৬৪ বাং]।

রূপতৃষ্ণা,—থাকে বৌদ্ধিক আস্বাদনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাই, একালের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-পিপাসা সখেদে অনুভব করে ঃ—

"তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রু রাশি।"

[উর্বশী]

মানবধর্মী আধুনিক জীবন ও প্রবন্ধের মুক্তি

আধুনিক সাহিত্য-কর্ম জীবনের বিচিত্রতায় জটিল। আর, আধুনিক ভাবনাকে দৃঢ় পুষ্ট, বলিষ্ঠ করে দার্শনিক মনন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা। এদিক থেকে, মননশীল রচনা যদি সাহিত্য না-ও হয়, তবু সাহিত্যের উপাদান হিসেবে অপরিহার্য। কিন্তু, উপায় যেখানে পরিণাম হয়ে ওঠার যোগ্য পরিণতি লাভ করে, সেখানে শিল্প-চিন্তা নিঃসন্দেহে পূর্ণ বলিষ্ঠ। আগে বলেছি, নিছক হৃদয়ধর্মী রচনাতেও চিন্তা অথবা বুদ্ধির প্রেরণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনস্যুত হয়ে থাকে। অন্য দিকে, হৃদ্‌বৃত্তি যেখানে মনন-চিন্তার জগতে নিঃশংকায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সেখানে প্রবন্ধও হয়ে ওঠে যথার্থ সাহিত্য-স্বাদী। কিন্তু, চেতনার আলো-কে অনুভবের আনন্দে দোলায়িত করার জন্যে চিন্তা ও অনুভূতির 'পরে লেখকের সম্পূর্ণ স্বাধিকার প্রবর্তন অপরিহার্য। আর, শিল্পি-ব্যক্তিত্বের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ণায়তিকেই আমরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ যৌবন-লক্ষণ বলে লক্ষ্য করে এসেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাঁর শিল্পি চেতনার নিঃশেষ অধিকার এমন সহজে আয়ত্ত হয়েছিল যে, তাঁর মনন-চিন্তার মধ্যেও শৈল্পিক অনুভবের প্রেরণা হয়েছে তরঙ্গায়িত। ফলে, যুক্তির নিগড়ে একান্ত-বদ্ধ গদ্য-প্রবন্ধও সাহিত্যিক রস-লোকে মুক্তি পেয়েছে।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের স্বভাব

এ মুক্তি কেবল সাহিত্যের নয়, সাহিত্যিকেরও। পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করে এসেছি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে একটি মহৎ শিল্প-প্রাণ ছিল। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ, 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ, এমন কি, পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্রেও সেই শিল্প-ভাবুকতার পরিচয় সু-ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু, মূল প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বুদ্ধিমান (Intellectual) ভূদেব যেখানে চিন্তামগ্ন, সেখানে তাঁর সুগঠিত হৃদ্‌ বৃত্তি কচিৎ প্রবেশাধিকার পেয়েছে। অর্থাৎ, ভূদেবের শিল্পানুভব সুগঠিত হলে, নিরন্তর স্ফুরিত নয়। বঙ্কিমের মধ্যে তাঁর শিল্প-স্বভাব পূর্ণমুক্ত হয়েছে, হয়েছে

অবিচ্ছিন্ন প্রবাহিত। তাই, কেবল উপন্যাসের জগতে নয়, প্রাবন্ধিক বঙ্কিম যখন ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য-সমালোচনার জগতে মননচারণ করেছেন, তখনো সর্বত্র তাঁর শিল্পিমন তাঁর সদা-সঙ্গী হয়ে ফিরেছে। শিল্পীর ভাবনা ও জীবনাচরণে শিল্প-স্বভাব যেখানে অবাধ-গতি আয়ত্ত করেছে, সেখানেই, কেবল সাহিত্যের নয়, সাহিত্যিকেরও যৌবন-মুক্তি।

বাংলা গদ্য-প্রবন্ধের এই মুক্তির ইতিহাসে, প্রত্যক্ষ পটভূমি রচনা করে-ছিল বঙ্কিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৭৯ সাল (১৮৭২-এপ্রিল—মে) থেকে। সেই প্রথম সংখ্যা থেকেই ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা, সংগীত, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে বঙ্কিম গদ্য প্রবন্ধ রচনা করে চলেছিলেন। ক্রমে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদিও রচনার বিষয়ীভূত হয়ে পড়ে। বঙ্গদর্শন প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের মুক্তি-চারণ-তীর্থ। ইতিহাসের দিক থেকে এ-বিষয়ের তাৎপর্য কম নয়। সাময়িক পত্রিকার একটি অসংশয়িত শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব 'ভিন্ন রুচি' পাঠকসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কৌতূহল নিবৃত্তি। কেবল বৈষয়িকতা বা জনপ্রিয়তার জন্যই নয়, পত্রিকা-প্রকাশের মৌল প্রয়োজন-বুদ্ধির চরিতার্থতার জন্যও সাময়িক পত্র-পত্রিকাকে সর্বাভিমুখী হতে হয়। এজন্য, একালের সার্থক পত্রিকা-ধ্যক্ষরা বিভিন্ন রুচি ও দক্ষতা সম্পন্ন লেখকেরও সমাবেশ করে থাকেন। কিন্তু, বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিম একাই ছিলেন একশ,—তা ছাড়া, তিনি ছিলেন প্রায় অ-দ্বিতীয়ও। সেকালে লেখার কোনো পূর্বাদর্শ ছিল না, —লেখকেরও ছিল অভাব। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন,—সব্যসাচী বঙ্কিম তখন একহাতে মৌলিক সৃষ্টির দ্বারা নূতন রচনার পথ-সূচনা করছিলেন; অন্যদিকে অতি-উৎসাহী লেখকদের সীমাতিক্রমণের চেষ্টাকে কঠিন কষাঘাতে করছিলেন বারিত। ফল কথা, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি দু-একজন একান্ত নির্ভরযোগ্য ভাব-শিষ্য ছাড়া বঙ্গদর্শনের রচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম আর কারো 'পরে নির্ভর করতে পারেন নি। বঙ্গদর্শনে সকলের জন্য প্রায় সকল লেখাই বঙ্কিম একা লিখেছেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের জন্ম-পীঠ—'বঙ্গ দর্শন'

এখানে শিল্পি-বঙ্কিম বহুরূপী। অর্থাৎ, বিষয়ের দিক্ থেকে বৈচিত্র্য আহরণ করেই তিনি সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারেন নি। বিভিন্ন বিষয়ক রচনায় বিচিত্র প্রকারের স্বাদুতা তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে। কোথাও বা আছে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে ভাবগভীর চিন্তার প্রকাশ; কোথাও গুরু চিন্তা লঘু-তীব্র ব্যঙ্গের আকার পেয়েছে; কোথাও শিল্প-সাহিত্যের

বঙ্গদর্শন ও 'বহুরূপী' বঙ্কিম

বিষয় নিয়ে মনন হয়ে উঠেছে রসান্বিত; আবার কোথাও কৌতুক সঞ্চারী স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল করে তুলতে হয়েছে জীবনের লঘু-গুরুতায়-বিচিত্র ভাবনা ও অভিজ্ঞতাকে। প্রতি ক্ষেত্রেই বঙ্কিম যথাযথ, যথাপরিমিত হয়ে আছেন। এটুকু সম্ভব হতে পেরেছিল তাঁর শিল্প-স্বভাবের অবাধ-সঞ্চরণ ক্ষমতার ফলে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, রচয়িতার সকল ভূমিকাতেই গদ্য-লেখক বঙ্কিম রসোত্তীর্ণ, কারণ তাঁর হৃদ্‌বৃত্তি সমকালীন জীবন-ভাবনার সকল পথেই সমপ্রবাহিত হয়েছিল।

এই সব বিচিত্র বিষয় ও রূপাঙ্গিক বিশিষ্ট গদ্য রচনাবলীকে মোটা দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। একশ্রেণীর লেখায় চিন্তা ও মনন-ঋদ্ধ গদ্যকে শিল্পি-হৃদয়ের সান্নিধ্য-নিবিষ্ট করে সাহিত্যিক স্বাদুতার সৃষ্টি করা হয়েছে।

বঙ্কিম-প্রবন্ধের দুটি ধারা

এখানে গদ্য লেখক বঙ্কিম প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণ-ভূদেবের সার্থক উত্তরসূরী। রাজনারায়ণ-ভূদেবের প্রবর্তিত প্রবন্ধকে তিনি যুক্তি-চিন্তার 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' থেকে মুক্ত করেছেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত 'উত্তররামচরিত' প্রবন্ধ বঙ্কিম-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট ব্যক্ত করে থাকে। 'উত্তমরামচরিত' সাহিত্য সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ। কিন্তু, জ্ঞান-জিজ্ঞাসা-প্রধান প্রবন্ধেও যুক্তি-বিচারকে আবেগ স্নিগ্ধ সাহিত্যিক স্বাদে মণ্ডিত করতে পারার দক্ষতা প্রথমাবধি স্পষ্ট হয়ে আছে। বঙ্গদর্শন প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিম 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন; প্রবন্ধটির শীর্ষভূমি জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত,—'ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' এই প্রবন্ধের একেবারে আরম্ভে বঙ্কিম লিখেছিলেন,—"ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারত-বর্ষীয়েরা হীনবল, এইজন্য। "Effeminate Hindoos" য়ুরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু, আবার য়ুরোপীয়-দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারত জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন, আর না-ই করুন, সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদের কাছে—মহারাষ্ট্র এবং শিখের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।"

প্রবন্ধের বিষয়-বিন্যাস প্রসঙ্গে বঙ্কিম এখানে নৈয়ায়িকের অমোঘ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্রথমে পূর্বপক্ষ উপস্থিত করে, নিরবচ্ছিন্ন তথ্য-বর্ষণের দ্বারা সেই পূর্বপক্ষের খণ্ডন ও উত্তরপক্ষের প্রতিষ্ঠা করেছেন নিঃসংশয়িত-ভাবে। এইটুকুই সব নয়। রচনার বিন্যাসভঙ্গির ফলে বক্তব্যের অমোঘতা

বুদ্ধিকে ছাপিয়ে মর্মকে স্পর্শ করে। উপরের অংশটি পড়লেই অনুভব করা চলে যে, হিন্দুর ঐতিহ্য সম্বন্ধে লেখকের শ্রদ্ধাবোধ বাচ্য এবং বাচনভঙ্গির ঝঙ্কৃত অন্বয়ে আবেগ কম্পিত হয়ে উঠেছে। আর, তথ্য যেখানে কাষ্ঠ-শুষ্ক বিচারের একান্ততা পরিহার করে শিল্পি-ব্যক্তিত্বের সংগে এমনি অন্বিত হয়েছে, সেখানে প্রবন্ধ সহজেই হয়েছে সাহিত্য-স্বাদী। একই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে পুঞ্জীভূত তথ্যের সহায়তায় বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুর সংশয়াতীত বীর্যবত্তার পরিচয় আবেগভরে প্রতিপন্ন করেছেন। তবু যে প্রাচীন হিন্দু নির্বীর্য বলে কল্পিত, শিল্পী তার তিনটি কারণ নির্দেশ করেছেন।—প্রথম কারণটি বিবৃত করে তিনি লিখেছেন,—"প্রথম হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই;—আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়,—গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণ-কুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।"

১। সাহিত্য-গুণান্বিত প্রবন্ধ

লেখকের সহৃদয় প্রকাশ-ভঙ্গির প্রভাবে হিন্দুর দুর্বলতা এখানে ধিক্কারকে কেবল অতিক্রম করে নি, হিন্দুর সহজ আত্ম-বিমুখতাকে করেছে শ্লাঘনীয়। বলা বাহুল্য, প্রকাশ-ভঙ্গি এখানে লেখকের ব্যক্তি-বিশ্বাসের সংগে অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। শিল্পীর ব্যক্তিচিত্তের এই আবেগ-কম্পন 'বিবিধ প্রবন্ধের' প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধকেই সাহিত্যিক স্বাদুতায় হৃদ্য করেছে।

কিন্তু বঙ্কিমের গদ্য প্রবন্ধ রচনার আরো একটি পৃথক ধারা আছে। নিছক শিল্পীর হৃদ্যতা-স্পর্শেই প্রবন্ধ সেখানে সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে ওঠেনি। বরং, সাহিত্যের আধারে প্রবন্ধের বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে, প্রবন্ধের প্রবন্ধত্ব,—অর্থাৎ তার জ্ঞান-চিন্তাময় বিভার প্রাধান্য নেপথ্যাশ্রয় করেছে। ব্যঙ্গ-কৌতুক-চিত্রে চঞ্চল সাহিত্যের স্বাদ হয়েছে প্রধান। বঙ্কিমের প্রথম প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থ লোকরহস্য (১৮৭৫) বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনার এই বিশেষ ধারার প্রথম সচেতন বাহক। লোকরহস্য-এর অধিকাংশ রচনাও বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি কিছু সংখ্যক রচনার প্রথম প্রকাশস্থল ছিল প্রচার-পত্রিকা। লোকরহস্যের প্রথম লেখা,—ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল বঙ্গদর্শনের

২। সাহিত্যের আধারে প্রবন্ধের বিষয়

একেবারে প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল; প্রারম্ভিক ছত্রগুলি নিম্নরূপঃ—

লোকরহস্য

"একদা সুন্দরবন মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা হইয়াছিল। নিবিড় বন-মধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রা প্রভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণপূর্বক সভার কার্য আরম্ভ করিলেন।"

স্পষ্ট দেখছি, মানব-সমাজে প্রচলিত একটি সভার বিবরণ এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পরবর্তী আলোচনাদিতেও চলমান মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আভাস ইঙ্গিত আছে। বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য তাঁর বক্তৃতার এক-স্থলে মুদ্রার পরিচয় দিয়েছেন,—"মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ * * *। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইঁহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ, টিন, এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম কার্পাস ,চর্ম প্রভৃতিতে ইঁহার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষগণ রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়িতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়িতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে। এমনই ভক্তি, কিছুতেই সেই বাড়ি ছাড়ে না,—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট যুক্ত করে স্তব স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রা-দেবীর অধিকারী তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।"

স্পষ্টই দেখছি, এই রচনাংশের মূলে কাঞ্চনকৌলীন্য পীড়িত সমাজের নীতিগত দুর্বলতার প্রতি কৌতুকের মৃদু আঘাত নিহিত রয়েছে। কিন্তু, গোটা রচনাটির আদ্যন্ত সমাজনীতি আলোচিত হলেও, কোথাও সে বিষয় প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। রূপকধর্মী উপাখ্যান ও কৌতুক-রসের আবরণে প্রবন্ধের বক্তব্য বস্তু এখানে আগাগোড়া রয়েছে সাহিত্য-রসাচ্ছাদিত।

প্রতীচ্য সাহিত্যে Essay

প্রাবন্ধিকতা যে-রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়, ইংরেজিতে তেমন শ্রেণীর গদ্য লেখার একটি বিশেষ নাম কল্পিত হয়েছে,—Essays. Essay শব্দটির উদ্ভব সুপ্রাচীন। কিন্তু এক বিশেষ ধরণের গদ্য রচনার প্রসঙ্গে এই অভিধাটির উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগ করেছিলেন ষোড়শ শতকে ফরাসী লেখক Montaigne (১৫৩৩-৯২)। বিশেষার্থে Montaigne প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রথম Essayist.

এই ধরণের রচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধ থেকে তার পার্থক্য নির্দেশ করে বলা হয়েছে, "As a form of literature, the essay is a composition of moderate length, usually in prose, which deals in an essay, cursory way with a subject, and, in strictness with that subject only as it affects the writer."১

অর্থাৎ Essay-র বিশেষ আঙ্গিকের উদ্ভবমূলে রয়েছে বক্তব্য বিষয়ের সংগে শিল্পীর একান্ত আত্ম-সাপেক্ষতা। "শিল্পীর ব্যক্তি-চেতনার দ্বারা" সবিশেষ পরিস্রুত হতে পারলে যে-কোনো বিষয় সার্থক Essay-র উপাদান রচনা করতে পারে। প্রবন্ধের বিষয়, অর্থাৎ সমকালীন জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর চিন্তা-ভাবনা-অভিজ্ঞতা যেখানে তাঁর ব্যক্তি-চিত্তের 'জারক রসে জারিত' হয়ে 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছে, সেখানেই তা Essay। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত Essay কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'রচনা' বা 'সাহিত্যিক রচনা' শব্দের ব্যবহার করেছেন।২ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র আবার এই ব্যবহারে আপত্তি করেছেন।৩ কোনো রকম বিতর্কে প্রবেশ না করেও আমরা এই শ্রেণীর রচনাকে 'ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত প্রবন্ধ' বলে অভিহিত করব। এ বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য আলংকারিক নয়, নিছক ঐতিহাসিক। এদিক থেকে সাহিত্যের জগতে যুক্তি চিন্তার দৃঢ়বন্ধন থেকে মুক্তির আনন্দ বাঙালির জীবন-ভাবনা, তথা, সাধারণ জীবনাচরণের ক্ষেত্রেও বহুধা ব্যাপ্ত হয়েছে, দৈনন্দিন জীবন-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর হৃদ্‌বৃত্তি হয়েছে সদা-চকিত-সচেতন :—সাহিত্যের ইতিহাসে জীবন-বোধের এই প্রাগ্রসৃতির সংবাদ বহন করে এনেছে এই নূতন ধরণের রচনাবলী।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা উচিত, প্রবন্ধের মধ্যে যুক্তি-চিন্তার অবস্থানকে নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুক্তি-বিচারহীন কল্পনা আকাশ-কুসুমের মতই অসম্ভব-সন্ধানী। কিন্তু, যুক্তি-বিচারই যেখানে একান্ত এবং সর্বস্ব, প্রাণের ধর্ম সেখানে নিরুদ্ধ। একান্ত কল্পনার মত অনন্য-পর যুক্তি-মননও সাহিত্যের জগতে একদেশ-দর্শী,—অসম্পূর্ণ। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, কল্পনা-সর্বস্ব পদ্যময় জগতে যুক্তি বিচারপূর্ণ গদ্য-রচনার প্রবর্তন করেছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর। রচিতব্য বিষয়ের সংগে তাঁদের ব্যক্তিচিত্তের আসক্তি অতিমাত্রায় একান্ত ছিল; ফলে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়নি তাঁদের হাতে। সাহিত্যিক নির্মিতির পক্ষে সৃষ্টির সংগে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের অন্বয় (Self-Contact) অপরিহার্য, এ-কথা বলেছি।

১। Encyclopaedia Britannica.
২। বাংলা সাহিত্যের একদিক।
৩। সাহিত্য পাঠকের ডায়েরি—১ম পর্যায়।

কিন্তু, সেই সংগে রসাবেদনের সাধারণীকরণের প্রয়োজনে প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের-পরিস্রুতিও (Self-Purgation) আবশ্যিক। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের রচনায় Self Contact অতি তীব্র বলেই Self Purgation অসম্ভব হয়েছে। গদ্য রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাজনারায়ণ-ভূদেবের চেতনা অনুভূতি-ঘন, তাঁদের মননও ছিল বুদ্ধি-দীপ্ত। কিন্তু, প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে মননের সংগে হৃদ্‌বৃত্তির অন্বয় অখণ্ড সম্পূর্ণ হতে পারে নি বলেই তাঁরা চিন্তা-বন্ধনে-পূর্ণ সার্থক 'প্রবন্ধ' রচনা করেছেন। কিন্তু, বঙ্কিমের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবনের অনন্তমুখী অভিজ্ঞতার মধ্যে সহজ-মুক্ত পদক্ষেপে বিচরণ করে ফিরেছে। কোথাও আড়ষ্ট হয় নি,— হয় নি আবদ্ধ। শিল্পি-স্বভাবের এই প্রবহমানতা (mobility) সকল ক্ষেত্রেই স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টির বিষয়ের সংগে অনায়াসে অন্বিত করেছে। আবার, এই প্রবহমানতার ফলেই বঙ্কিম-প্রতিভা জীবনের কোনো অভিজ্ঞতার মধ্যে বাঁধা পড়ে নি, সকল কিছুকেই অনায়াসে করেছে উৎক্রমণ (Transcend)। শিল্পি-ব্যক্তিত্বের এই প্রবহমানতা, বৌদ্ধিক মননের সংগে তার সহজ অন্বয়, এবং তার সহজ-তর উৎক্রমণ, এই সব কিছু মিলেই ব্যক্তিত্বধর্মী গদ্য-রচনার আঙ্গিক-পদ্ধতি মুক্তপক্ষ হতে পেরেছে। মনে রাখতে হবে, মন ও মননের এই যুগপৎ-মুক্তি-বিধানের ক্ষমতার জন্য জীবনভাবনার মধ্যে একটি উদার-ব্যাপ্ত দূরদৃষ্টি এবং নিঃসীমতা অবশ্য প্রয়োজন।

সার্থক Essay-র শিল্প-স্বভাব

Montaigne-এর রচনার সিদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"In the summer of 1580 the first two books of 'Essais' were published at Bordeaux. Immediately afterwards Montaigne set off on a journey through France, Germany and Italy which was to last nearly 18 months. Reasons of health......were only one of his motives for travel. The Journal de Voyage (discovered in the 18th century) and the second edition of the Essais (1582) prove how much mental stimulus he derived from his observation of men and affairs."১ ইতিহাসের দিক থেকে আমাদের বক্তব্য, মানুষ এবং জীবন-বিষয় (men and affairs) সম্বন্ধে শিল্পি-চিত্তের সচেতনতা (mental stimulus) যখন পূর্ণ অবয়বান্বিত হয়েছে, তখনই প্রবন্ধের মধ্যে স্বাধিকার-সুমিত ব্যক্তিত্বের অন্বয়ে ব্যক্তিত্ব-ধর্মী প্রবন্ধ রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের যৌবন-

Essayist Montaigne

১। Chamber's Encyclopaedia.

মুক্তির ইতিহাসে বঙ্কিমের ব্যক্তিত্ব-ধর্মী প্রবন্ধাবলী শিল্পি-ব্যক্তির পূর্ণ অবয়বান্বিত হয়ে ওঠার সংবাদের সাহিত্যিক বাহক।

বঙ্কিম-প্রবন্ধে দ্বি-ধারার যথার্থ স্বরূপ

এদিক থেকে, প্রবন্ধের জগতে বঙ্কিম-প্রতিভা দ্বিবিধ পথে বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মুক্তির সম্ভাবনাকে অবারিত করেছে। ১। বিচার-মনন সর্বস্ব প্রাচীন প্রবন্ধে শিল্পির ব্যক্তিত্ব-স্পৃষ্ট সাহিত্যিক স্বাদের সংমিশ্রণ। ২। প্রবন্ধের জীবন-জিজ্ঞাসাকে নিতান্ত আত্মসাপেক্ষ শিল্পাধারে তুলে ধরে ব্যক্তিত্বধর্মী সাহিত্যিক প্রবন্ধের নূতন প্রবর্তন।

১। প্রবন্ধ

প্রথম প্রকারের প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮৭ ও ১৮৯২)। সব কয়টি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন অথবা প্রচার পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত। বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম ভাগের প্রবন্ধাবলী প্রথমে বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬) ও প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯) নামে গ্রন্থিত হয়েছিল। পরে "দুইখানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সংকলন করিয়া বিবিধ প্রবন্ধ নাম দেওয়া গেল।"১ পূর্বের প্রবন্ধাবলীর অতি পুরাতন কয়েকটি 'বিবিধ প্রবন্ধতে' বাদ দেওয়া হয়েছিল।

বিবিধ প্রবন্ধ

বিবিধ প্রবন্ধের রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি, —রচনাংশ থেকে উদ্ধারও করেছি। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, বাচনভঙ্গি ও প্রসঙ্গ-বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক প্রবন্ধে এমন নিত্যনব যে, প্রতি রচনার পৃথক আলোচনা প্রায় অ-পরিহার্য। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে সে অবকাশ নেই। কেবল অনুভব করব,—উনিশ শতকীয় বাঙালি জীবন-ভাবনার একটি সাহিত্য-গুণান্বিত বিশ্বকোষ-গ্রন্থ এই বিবিধ প্রবন্ধ। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যঙ্গ-কৌতুক, সমাজচিত্র,—সমসাময়িক জীবনের সকল বিষয়কেই বঙ্কিম নিজে আত্মস্থ করে নিয়ে, বাঙালির আত্মস্বরূপকে সর্বাবয়ব-পূর্ণ রূপ দিয়েছেন এই প্রবন্ধাবলীতে। ফলে, লেখকের কাল নিত্যকালের জীবন-ভূমিতে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

প্রবন্ধধর্মী রচনার মধ্যে আরো আছে বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫) ও সাম্য (১৮৭৯)। দুটি গ্রন্থেরই প্রবন্ধাবলীর আকর বঙ্গদর্শন পত্রিকা। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে 'বিজ্ঞান-কৌতুক' শিরোনামা দিয়ে বঙ্কিম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনাকেই তিনি স্বদেশি-ভাষায় জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিকের পক্ষে 'বিজ্ঞান-কৌতুক' নামটি বিশেষ লক্ষণীয়। বিজ্ঞানের আলোচনাকে মানবিক কৌতূ-

১। বিজ্ঞাপন—বিবিধপ্রবন্ধ।

হলের সূত্রে গেঁথে বঙ্কিম তাঁর আলোচ্য রচনাবলীকে সত্যই কৌতুকাবহ করে তুলেছেন। প্রসঙ্গগুলির নামও সাহিত্য-

বিজ্ঞান রহস্য

ব্যঞ্জনার ধর্মে কৌতুকাবহ,—আশ্চর্য সৌরোৎপাত, আকাশে কত তারা, ধূলা ইত্যাদি। নামের গুণেই বিজ্ঞান কখনো সাহিত্য হয়ে উঠেছে, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু, নাম নির্বাচনের মধ্যেও বাঙালির সহজে-রসাতুর মনকে কৌতূহলী করে তোলার সাহিত্যিক প্রয়াস লক্ষ্য করার মত।

রচনার মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য আছে। 'ধূলা' সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন,—

"ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর নাই। কিন্তু আচার্য টিণ্ডেল ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন।......

"১। ধূলা এই পৃথিবী তলে এক প্রকার সর্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত 'বাবুগিরি' করিনা কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্ধ্র-নিপাতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্ চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ. তাহা জানিবার জন্য আচার্য-টিণ্ডেলের উপদেশের আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু, বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটি করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন।"

বিজ্ঞানের তথ্যকে উপাখ্যানের মত সরস বর্ণনা করেছেন বঙ্কিম, সেই সংগে কৌতূহলকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছেন। এখানেই বিজ্ঞানের আলোচনা সাহিত্য-স্বাদী হয়েছে।

সাম্য রচনাবলীর 'বিজ্ঞাপন'এ বঙ্কিম লিখেছিলেন,—"সাম্যনীতি নূতন নহে, কিন্তু, য়ুরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি, সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব, নীতি-শাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে

সাম্য

কেহ রাগ করিবেন না। আরও স্বদেশীয় সাধারণ জনকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।" সাম্য সম্বন্ধে লেখকের এই মন্তব্য একালের পাঠকের অবশ্য স্মরণীয়। বঙ্কিমের সাম্য-বিষয়ক রচনাবলীর ছাত্রপাঠ্য ভাষ্যকারেরা আজ প্রতীচ্য সাম্যতত্ত্বের সম্ভব অসম্ভব উদ্ধৃতি-ব্যাখ্যায় বাংলাভাষা-জননীকে কণ্টক-জর্জর করে তুলেছেন। কিন্তু, একথা ভাবা উচিত, অসাম্য ইতিহাসের একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা।

দেশ-কালে কেবল তার স্থানীয় উপাদান (Local features) পৃথক্ হয়ে থাকে। জীবন-সচেতন ভাবুক মাত্রই অসাম্য-পীড়িত অব্যবহিত জীবন থেকে সাম্য-ভাবনার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন। বঙ্কিম প্রসঙ্গেও এ-কথা সর্বাংশে সত্য। তাঁর প্রতীচ্য জ্ঞান এপথে তাঁর ভাবনার সহায়তা করেছে। কিন্তু, বঙ্কিমের আলোচ্য রচনার মধ্যে জাতীয় অসাম্য-পীড়ার একটি ঐতিহাসিক প্রচ্ছদ যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, একথা ভুললে তার সাহিত্যিক মূল্যই নয়, ঐতিহাসিক মূল্যও নিতান্ত বিড়ম্বিত হবে। একেবারে প্রথম থেকে আলোচনার পটভূমিকে বঙ্কিম কি করে আমাদের দেশীয় জীবনের কেন্দ্রভূমিতে টেনে এনেছিলেন, অবহিত পাঠক অনায়াসে তা অনুভব করতে পারবেন।

কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব

কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬) ও ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) বঙ্কিমের প্রৌঢ় বয়সে লিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রবন্ধ গ্রন্থ দুটিতে ধর্মচিন্তা, দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার এবং ভারতীয় ঐতিহ্য-ভক্তি যুগপৎ একত্রবদ্ধ হয়েছে। ফলে চিন্তার ভার যে পরিমাণে আছে, বুদ্ধির ধারও তার চেয়ে কম নেই। সবচেয়ে বড় কথা, এই ঘন-পিনদ্ধ চিন্তার জগতেও প্রকাশ-ভঙ্গি সহজ সরসতা থেকে চ্যুত হয় নি।

২। ব্যক্তিত্বধর্মী সাহিত্যিক প্রবন্ধ

বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বধর্মী সাহিত্যিক প্রবন্ধের মধ্যে লোকরহস্যের কথা প্রথমে বলেছি। এই রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)। 'দপ্তর' গুলিও প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। শচীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কমলাকান্তের দপ্তরকেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচনা করতেন।[১] তার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে,—"স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্ত চরিত্রের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন, কমলাকান্ত বলিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি। ইতিপূর্বে য়ুরোপে এইভাবে সৃষ্ট চরিত্রের সহিত স্রষ্টার মিলন একাধিক কবি ও ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশে ও সাহিত্যে, বোধহয় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেই, সৃষ্টি ও সৃষ্টি-কর্তার এই অভিন্নহৃদয়তা এই প্রথম।"[২] বস্তুতঃ, এদিক থেকে সাহিত্যের জগতে 'কমলাকান্ত' এক নূতন স্বাদের আমদানি করেছে। কমলাকান্তের দপ্তরের বিষয়-বৈচিত্র্য প্রায় বিবিধ-প্রবন্ধের মতই বহুমুখী। কিন্তু, বিষয়-গত আস্বাদন এই রচনার একটি অকিঞ্চিৎকর উপাদান। এখানে প্রধান আস্বাদ্য বঙ্কিমের ব্যক্তিত্ব।

লোকরহস্য ও কমলাকান্তের দপ্তর

কমলাকান্তের দপ্তরে 'Confessions of an

১। দ্রষ্টব্য—বঙ্কিমচন্দ্র।
২। কমলাকান্তের দপ্তর—সাহিত্য পরিষৎ সং—সম্পাদকীয় ভূমিকা।

English Opium Eater' এবং 'Pickwicks Papers'-এর যথাক্রমে আঙ্গিক ও বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু, আবার বলি, কমলাকান্তের সাহিত্য-রস একান্তভাবে বিষয় এবং আঙ্গিক-নিরপেক্ষ। এই প্রবন্ধাবলীর, রস-ধর্মের একমাত্র উপজীব্য বঙ্কিমের নিভৃত-গভীর ব্যক্তিত্ব।

আধুনিক বাঙালি চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হিসেবে বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব বিচিত্র-জটিল, অনন্তমুখী চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের আকর। স্বাদেশিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ইত্যাদি অজস্র বিচিত্র চেতনার সমবেত ফলশ্রুতি সু-বৃহৎ বঙ্কিম-প্রতিভা। কিন্তু, কমলাকান্তের দপ্তরে সেই অখণ্ড ব্যক্তিত্ব এক-একটি রচনায় এক-একটি বিশেষ চরিত্রোপাদানকে নিভৃত-একান্ত অভিব্যক্তি দিয়েছে। সেই সংগে পরিবেশ বর্ণনা, এবং সেই পরিবেশ-বৈশিষ্ট্যের সংগে ব্যক্তিমানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া রচনার ব্যঞ্জনা খণ্ডকে অখণ্ডরূপে উদ্ভাসিত করেছে,—অংশের মধ্যে পূর্ণকে করেছে প্রতিবিম্বিত। ফলে, অখণ্ড বিরাট বঙ্কিম-প্রতিভা বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে অনন্তমুখী বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায়। মনে রাখতে হবে, এ হীরকচূর্ণ। মূল প্রতিভার হীরার ধার ও দীপ্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূর্ণ বিম্বিত; অথচ সীমিত বলে অনেক সহজে আয়ত্তগম্য। এদিক থেকে, একটি বিচিত্র জটিল ব্যক্তিমনকে তাঁর মনের গভীরে ধাপে ধাপে আবিষ্কার করার জীবনানন্দটুকুই কমলাকান্তের দপ্তরের যথার্থ রসমূল্য। এই আস্বাদনের ঐতিহাসিক বিভা কমলাকান্তের ছত্রে ছত্রে প্রদীপ্ত হয়ে আছে, অংশতঃ উদ্ধার করার সার্থকতা নেই,—"সুখের কথায় বাঙালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যতই হৃদয়-বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙালির মর্মোক্তি। আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণ সুখীও সুখকালে পূর্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণ কোথায়? সুখও দুঃখময়—

কমলাকান্তের অভিনব সাহিত্য-স্বাদ

> 'তোমায় যখন পড়ে মনে,
> আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
> আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।'

এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা।" প্রত্যাশা করব পাঠক এর পরেও পড়ে চলবেন 'একটি গীত'-এর অবশিষ্টাংশ, পড়তে পড়তে ক্রমে উপায় থাকবে না গোটা দপ্তরে খণ্ড-বিক্ষিপ্ত বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বকে অখণ্ড,—সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করে।

কমলাকান্তের দপ্তরে তিনটি রচনা বঙ্কিমের নিজের লেখা নয়।

'চন্দ্রালোকে' ও 'মশক' লিখেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'স্ত্রীলোকের রূপ'-এর লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত বঙ্গদর্শন থেকে প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজের তাঁবেদার সরকারি-চাকুরের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রয়োগ করেছেন বঙ্কিম এই রচনায়। তাঁর Satire-এর মধ্যে এই গ্রন্থেই বিদ্রূপের ঝাঁজ সবচেয়ে বেশি।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

'ললিতা ও মানস' বঙ্কিমের অপরিণত বয়সে লেখা কবিতা। Raj-mohan's wife অপরিণত মনের কল্পিত প্রথম উপন্যাস,—ইংরেজি ভাষায় লেখা। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেও তিনি শেষ করে যান নি। বঙ্কিমের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতগীতারও উল্লেখ না করলে তাঁর সাহিত্যিক রচনাপঞ্জীর উদ্ধার সম্পূর্ণ হয় না।

বঙ্কিমের অপরাপর রচনা

আলোচ্য যুগের বঙ্কিমানুসারী প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে সমুল্লেখ্য ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এই দুজনেরই লেখা বঙ্কিম তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের রচনার উৎকর্ষ ও সমধর্মিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিঃসংশয়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এতেই নিহিত আছে। অক্ষয়চন্দ্রের (১৮৪৬-১৯১৭) পিতা গঙ্গাচরণ সরকার। তিনি কৃতী-সাহিত্যিক ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গ দর্শনে রস-প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর নিজের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' ও মাসিক 'নবযুগ'-এ অক্ষয়চন্দ্রের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। সরস প্রবন্ধ রচনাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল সর্বাধিক; কমলাকান্তের 'চন্দ্রালোকে' এ বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গম্ভীর চালের প্রবন্ধও লিখেছেন অক্ষয়চন্দ্র, আর সর্বত্র তা খুব অ-গভীর নয়। তার এই সকল রচনা সমাজ সমালোচন (১৮৭৪), আলোচনা (১৮৮২), সনাতনী (১৯১১), রূপক ও রহস্য (১৩৩০ বাং) ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত হয়ে আছে। সরস বহিরাবরণের অন্তরালে গভীর ভাবনার ছায়া-সংকেত যুক্ত অক্ষয়কুমারের রচনার একটি নিদর্শনঃ—"ভাই হাততালি! তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি ক্ষান্ত হও, —তোমার চট্ চট্ গর্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্যে তোমাদের এত আড়ম্বর কেন?"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

অক্ষয়চন্দ্রের পদ্য রচনার নিদর্শন শিক্ষানবীশের পদ্য (১৮৭৪) এবং গোচারণের মাঠ (১২৮৭ সাল)। শেষেরটি "যুক্তাক্ষর বর্জিত পয়ার ছন্দে

লিখিত পল্লীচিত্র।" 'হাতে হাতে ফল' নামে একখানি প্রহসনও তিনি লিখেছিলেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে বঙ্কিমের রস-ভাবনার সংগে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-জিজ্ঞাসার প্রবণতা যুক্ত হয়েছিল। নানাপ্রবন্ধ-তে (১৮৮৫) এঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির বিষয়-সূচীতে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিও আছে,—ভারত মহিমা, বিদ্যাপতি, কার্যকারণ সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, চার্বাক দর্শন, কোমত্ দর্শন, সভ্যতা, মনুষ্য, ও বাহ্যজগৎ। এই নাম-তালিকা থেকেই রাজকৃষ্ণের জিজ্ঞাসার বহুমুখিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রসার ও গভীরতার যুগপৎ পরিচয় প্রকাশিত হতে পারবে প্রবন্ধগুলির অধ্যয়নের মাধ্যমে। রাজকৃষ্ণের প্রায় সকল প্রবন্ধেই তথ্যানুসন্ধিৎসা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রবল। কিন্তু, তাঁর ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে রয়েছে সার্থক সাহিত্যিক সরসতা। বিদ্যাপতির ব্যক্তি-পরিচয়ের সার্থক আবিষ্কর্তা রাজকৃষ্ণ। ঐতিহাসিক যুক্তি-সিদ্ধান্তে পূর্ণ সে গবেষণা-প্রবন্ধের আরম্ভ হয়েছে নিম্নরূপেঃ—

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

"বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্য-কাননের পিকবর। তাঁহার সংগীত ধ্বনির সংগে সংগেই সরস কবিতা-কুসুমের বসন্ত সৌরভ বাঙালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুল আনন্দানিল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। এমন অমৃতময় স্বরলহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতু-রাজের আগমন বার্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি, তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তন্তু পর্যন্ত বাজিয়া উঠে, এই কলকণ্ঠ ভাবুক-পিকবরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়!"

প্রাবন্ধিক রাজকৃষ্ণের রচনা-বৈশিষ্ট্য এখানে স্বতোভাস্বর। ইনি রাজবালা নামে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাছাড়া, বিভিন্ন কবিতা-রচনাতেও দক্ষতা প্রকাশ করেছেন।

বঙ্কিম-ভক্ত রক্ষণশীল হিন্দু প্রাবন্ধিকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১০) সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। চন্দ্রনাথের রচনা-ভঙ্গি, অথবা ভাব-দৃষ্টির সংগে বঙ্কিমের সাদৃশ্য দূরান্বিত। এদিক থেকে তাঁর রক্ষণশীল মনন এবং প্রকাশ ভঙ্গিও বরং ভূদেবের অনুসারী। কিন্তু, ভূদেবের চিন্তার প্রসার এবং দূরগামিতা চন্দ্রনাথে সর্বদা সুলভ নয়। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তর্ক-বিচার অনেক

চন্দ্রনাথ বসু

সময়েই রক্ষণশীল সংস্কারের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। চন্দ্রনাথের প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আছে শকুন্তলা তত্ত্ব (১৮৮১), ফুল ও ফল (১৮৮৫), হিন্দু বিবাহ (১৮৮৭), ত্রিধারা (১৮৯১), হিন্দুত্ব (১৮৯২) কঃ পন্থাঃ (১৮৯৮), সাবিত্রীতত্ত্ব (১৯০০) ইত্যাদি। পশুপতি সম্বাদ (১৮৮৪) নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও চন্দ্রনাথ লিখেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩—১৯৩১) সাহিত্য-সাধনা বঙ্কিম প্রভাবিত যুগে সূচিত হলেও এঁর শিল্প-ভাবনা প্রাগ্রসর হয়েছিল। অতএব, তাঁর প্রবন্ধ, গবেষণা-নিবন্ধ, উপন্যাসাদির বিচার পরবর্তী পর্যায়ের অন্তর্ভূত হবে।

আলোচ্য কালের সাহিত্য-প্রবন্ধকারদের মধ্যে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নামও অবশ্য উল্লেখ্য। এঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই হয় কাব্য, নয় 'কৌতুক চিত্রাবলী'। কিন্তু, ঠাকুরদাসের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা আসলে তাঁর প্রবন্ধ রচনার জন্যে। এঁর একমাত্র প্রকাশিত সন্দর্ভ-গ্রন্থ সাহিত্য-

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

মঙ্গল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, তাঁর বহু গদ্য-নিবন্ধ নবভারত, প্রচার, নবজীবন, জন্মভূমি, সাহিত্য, ভারতী, প্রদীপ, নারায়ণ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, আজও গ্রন্থিত হয় নি। ঠাকুরদাস নিজেও পাক্ষিক সমালোচক, মাসিক মালঞ্চ এবং বঙ্গবাসীর সম্পাদনকর্মের সংগে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুরদাসের রচনাবলীর মধ্যে আছে, দুর্গোৎসব (১৮৮৩) উদ্ভট কাব্য, সাতনরী (১৮৮৮) খণ্ডকাব্য, সহরচিত্র ও সোহাগচিত্র (১৯০১) 'কৌতুক চিত্রাবলী।'

এ সময়কার প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। এঁর প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা,

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

নিশীথ-চিন্তা এবং আরো বহুগ্রন্থ বিষয়গুণে সমকালীন সমাজে প্রবল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। কিন্তু, কালীপ্রসন্নের কোন লেখাই কালের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। ফলে, একালের পাঠকের কাছে নিছক বিষয় ও বিবৃতিগত কৌতূহল ছাড়া এ-সব রচনার আর কোনো গভীর মূল্য প্রায় নেই।

বহু গ্রন্থের লেখক বীরেশ্বর পাড়ে নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যের কঠোর সমালোচনা 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' লিখে নিজে এককালে প্রবল আলোচনার বিষয় হয়েছিলেন।

আলোচ্য সময়ে গদ্য-নিবন্ধ রচনার একটি নূতন ধারা-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে ঠাকুর বাড়ির প্রভাবে। মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ধারার প্রধান স্তম্ভ। তাঁর রচনার মধ্যে ধর্মভাবুকতার সংগে দার্শনিকতা ও কবিত্ব যুগপৎ সংযুক্ত হয়েছে। এ ধরণের ধর্মচিন্তাশীলতার হৃদয়গ্রাহী

প্রকাশ প্রথম সূচিত হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাবলীর মধ্যে। কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তার সংগে স্বদেশ-চিন্তা অনায়াসে যুক্ত হয়েছিল। আর, তার মূলে ছিল তাঁর আবেগ-পূত বিশ্বাস। ফলে, কেশবচন্দ্রের ইংরেজি-বাংলা বক্তৃতাবলী সাহিত্য-স্বাদুতায় ঋদ্ধ হয়ে আছে। ব্রহ্মোৎসব, আচার্যের উপদেশ, সেবকের নিবেদন ইত্যাদি রচনাগুচ্ছে ঐ সব বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। "জীবনবেদ (১৮৮৪) কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনীর মত।"[১]

কেশবচন্দ্র সেন

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী কেবল বক্তৃতার সীমায় নিবন্ধ নয়। তাঁর মননের মধ্যে একটি সহজ দার্শনিক বুদ্ধি ছিল; সকল বিষয়েই দৃষ্টি ছিল মূল-সন্ধিৎসু। তাছাড়া, দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একটি ভক্তি-প্রবল কবি-প্রাণ। দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রেরণায় ভাষা যেমন ঋজু ও প্রাঞ্জল হয়েছে,—তেম্‌নি কবি-ভাবনার প্রভাবে রচনা হয়েছে সত্যনিষ্ঠ, সুন্দর। কাব্য, গণিত, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম, নানা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিবন্ধ রচনা করেছেন। কিন্তু, সর্বত্রই তাঁর রচনার স্বভাব অপরিবর্তিত। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তথ্যসন্ধিৎসার সংগে সত্যরসের সমন্বয়ের একটি নিদর্শনঃ—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার বিরচিত কোনো গ্রন্থের কোনো একস্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়াছেন "দ্বৈতং ন সহতে শ্রুতি" শ্রুতি দ্বৈত সহেনা; ইহার জুড়ি ধাঁচার একটি কথা ইংরেজিতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, অমুক কথা Does not bear scrutiny অর্থাৎ অমুক কথা অনুসন্ধান সহে না। ইংরেজি এবং সংস্কৃত উভয় স্থলেই "সহে না" কথাটার ভাবার্থ অবিকল সমান। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ; অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায়। ইংরেজি ভাষায় ইহার অবিকল জুড়ি বচন সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—One blind man leading another, এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, সংস্কৃত ইংরেজির সৌসাদৃশ্যের টানা জালে ভাষার একটু আধটু খোঁচ খাঁচ পর্যন্তও এড়ায় নাই।

"বিভীষণ যখন রাবণকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, রামকে সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়, তখন রাবণ বলিলেন, "আমি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারি কিন্তু নত হইতে পারি না" I can break but cannot bend। বাল্মীকি কথাটি বলিয়াছেন আই রক্ষা—আমরা যদি কেহ প্রসঙ্গ ক্রমে ঐ কথাটি কোথাও লিখিতে সাহস করিতাম তবে নিশ্চয়ই তাহা সমালোচকের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া ইংরেজি অনুকরণের কোটায় সজোরে নিক্ষিপ্ত হইত।"

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২য় সং।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এরূপ উদাহরণ-ভূয়িষ্ঠ ও তত্ত্ব-ঋদ্ধ হয়েও এমন রসসিক্ত হতে পারে, এ-কালে তা আমাদের কল্পনাতীত। এঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে চারখণ্ড তত্ত্ববিদ্যা (১৮৬৬-৬৯), নানা চিন্তা (১৩২৭ সাল), প্রবন্ধমালা (১৩২৭ সাল), চিন্তামণি (১৩২৯ সাল), গীতাপাঠের ভূমিকা ইত্যাদি রয়েছে। তা ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রনাথের তথ্য-ঋদ্ধ সরস ভাবনা আরো বহু ছোট ছোট পুস্তিকায় নিবদ্ধ আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য-বৃত্তির ব্যাপক অনুসরণ করেন নি। তাহলেও, আলোচ্য যুগের গদ্য রচনার ইতিহাসে তাঁর বৌদ্ধধর্ম, বোম্বাই চিত্র, বাল্যকথা ইত্যাদি সমুল্লেখ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ ও

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও গদ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন,—প্রবন্ধ মঞ্জরীতে তার কিছু কিছু সংকলিত আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ আলোচ্যকালের গদ্য সাহিত্যে একটি অনন্যতুল্য ব্যক্তিত্ব। ধর্মসাধনা ও দেশপ্রেম, ভক্তি ও আবেগ, মনন ও ভাবুকতা তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধমালাকে এক অভূতপূর্ব শিল্প সৌন্দর্যে ভরে তুলেছে। এক কালের বাংলাদেশে কেশবচন্দ্র-বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনা, ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে যুগপৎ বৈপ্লবিক আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। সেই ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে অনেক দূরে এসে আজও স্বামীজির বহু ভাবনাই ব্যবহারিক বিচারেও মূল্যহীন হয়ে যায় নি। য়ুরোপীয় রাষ্ট্র-সর্বস্ব গণতন্ত্রের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন,—"ও তোমার পার্লামেণ্ট দেখলুম, সেনেট্ দেখ্‌লুম, ভোট্, ব্যালট, মেজরিটি, সব দেখ্‌লুম। রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে, সমাজ চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।* * *

"অবশ্য ভোট ব্যালটের সংগে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না। কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশ খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্য দেশে, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখ্‌তে, ত মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। 'গোরস্ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ্ বিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি কস্‌বিন্ পেহ্‌না খাসা॥' যাদের হাতে টাকা তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্‌ছে, শুষ্‌ছে, তারপর সেপাই করে দেশ দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাদের ঘরে ধন ধান্য আস্‌বে।

প্রজাগুলো ত সেখানেই মারা গেল,— হে রাম। চমকে যেয়ো না, ভাঁওতায় ভুলো না।”

দেশে-বিদেশে গণতন্ত্রের এই 'ভাঁওতার' সম্বন্ধে আজও আমাদের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিবেকানন্দের অসংখ্য গদ্য রচনাবলীতে তাঁর ভাবনা সমকালকে আশ্রয় করে অনন্ত কালের পীঠভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে,—কেবল ভাব ও ভাষায় নয়,—বিষয়-ভাবনাতেও।

একালের গদ্যে আরো একটা নতুন রূপ দেখা দিয়েছিল,—সে জীবন-চরিত ও আত্মচরিত রচনার ধারা। ইতিহাস-নিষ্ঠার সংগে সমকালীন জীবন ও মনুষ্যত্বের সম্বন্ধে সুগঠিত কৌতূহল এই সব রচনার জন্ম দিয়েছে। এদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (১৮৮১), যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (১৮৮৫), বিহারীলাল সরকার এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই খানি 'বিদ্যাসাগর'-এর চরিতগ্রন্থ উল্লেখ্য। শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ ও আত্মচরিতের কথা উল্লেখ করেছি। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় 'ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতে' 'নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ' দিয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁর আত্মচরিতও বিশেষ উল্লেখ্য গ্রন্থ।

জীবনচরিত ও আত্মচরিত

জীবনচরিত ধারার একটি নূতন বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন করে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বাংলাদেশে তখন য়ুরোপের আদর্শে রাজনৈতিক বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত হচ্ছে। যোগেন্দ্রনাথ এই সময়ে লিখ্লেন জোসেফ্ ম্যাট্সিনি ও নব্য ইতালি, ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত, জনস্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত ইত্যাদি। এই সব রচনার ফলশ্রুতি সহজে অনুমেয়। যোগেন্দ্রনাথ আর্য দর্শন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় ভাষায় লিখিত এঁর একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নাটকের মুক্তি ও পূর্ণবিকাশ

বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি কাল বাংলা নাটকেরও স্বর্ণযুগ। পূর্ববর্তী একাধিক অধ্যায়ে বলেছি, নাটক যৌথ শিল্প। জাতীয় চেতনার সকল উপাদান ঘনতম-নিবদ্ধ হতে না পারলে সার্থক নাটকের রচনা, অভিনয় বা উপভোগ কোনোটিই সম্ভব নয়। নাট্যশিল্পের জগতে রস-স্ফুরণের বহিরঙ্গ উপাদান তিনটি,—(১) নাট্যকার, (২) মঞ্চ ও অভিনেতা, (৩)

দর্শকমণ্ডলী। এই ত্রিবিধ উপাদান যখন একান্ত-নিবিষ্ট জাতীয় ভাবনার দ্বারা যুগপৎ সামগ্রিক ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অখণ্ড ঐক্যে ধৃত হয়, তখনই নাটকের রস-প্রকাশ হয় সার্থকতম। প্রাচীন আলংকারিকেরা রস অর্থে চিত্তবৃত্তির আস্বাদনকেই বুঝেছেন। নাট্যকার যখন জাতির অখণ্ড-সাধারণ চিত্ত-প্রেরণাকে তাঁর রচনায় স্ফুটতম করে তোলেন, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যখন একই চিত্ত-প্রেরণার অংশীদার হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই নাট্য-বিষয়কে রূপায়িত করেন, কেবল তখনই দর্শক নিজ চিত্তবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলনকে চরমতম পরিমাণে আস্বাদন করতে পারে। এই কারণেই, জাতীয় চিত্তবৃত্তির অখণ্ড-পূর্ণ সমানধর্মিতার প্রভাবে পূর্বকথিত ত্রিবিধ বহিরঙ্গ উপাদান যখন একত্র-বন্ধ হতে পারে, তখনই নাট্যরস-স্ফুরণের অন্তর-বাহিরে সম্পূর্ণ চতুরঙ্গ ভিত্তি গড়ে ওঠে।

সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি ও নাটকের স্বর্ণযুগ

পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, প্রস্তুতি যুগের বাংলা নাট্য-সার্থকতার মূলে ছিল সর্বব্যাপী জাতীয় বিক্ষোভ। মধ্যযুগীয় সামাজিক অনাচারের দিকে দিকে তার উত্তেজনা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিচিত্রধর্মী অভিনয়-সফল নাট্য-নক্সা গড়ে তুলছিল। কুলীনকুলসর্বস্ব এই ধারার প্রথম পথিকৃৎ। বারে বারে বলেছি, শিল্পকর্মের বিচারে এই নাটকটির সার্থকতা উল্লেখ্য নয়। তবু, জাতীয় ভাবনার অখণ্ড ঘন-সন্নিবেশের প্রভাবে তা অভূতপূর্ব জন-প্রিয়তা ও অভিনয় সফলতা লাভ করেছিল। এর থেকেই বুঝি, নাট্যকলার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ভাবনার এক-কেন্দ্রিকতা কত অপরিহার্য।

প্রস্তুতি যুগের জাতীয় ভাবনা একটি নেতিমূলক মনোভাবকে আশ্রয় করে একত্র-বন্ধ হয়েছিল। এই কারণেই সফল-নাট্য-শিল্প রচনা সেকালে সম্ভব হয় নি। যে-কোনো সার্থক শিল্প-কর্মের জন্য একটি অখণ্ড অস্তি-বাচক জীবন-বোধের প্রেরণা অপরিহার্য। বয়ঃসন্ধি যুগের নাট্য সাহিত্যে নব জাতিত্ব-বুদ্ধির রূপে এই ইতিমূলক জীবন-চেতনা শিক্ষিত বাঙালির মনোলোকে ক্রমশঃ অবয়বান্বিত হয়ে উঠ্‌ছিল। মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্য-সাহিত্যে সেই নব-সৃজ্যমান যৌথ চেতনার প্রথম সার্থক শিল্পরূপ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু, পূর্বালোচনায় দেখেছি, বয়ঃসন্ধি লগ্নের সেই জাতীয়তাবুদ্ধি আবেগ-প্রধান ছিল, জাতীয় মানসে তার সর্বাবয়বপূর্ণ রূপ তখনো আকারিত হয়ে উঠতে পারে নি। তাই, কি মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'তে, কি দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে': সর্বত্রই নাট্যবিষয়ের সংঘাত-ময়তা স্থানকালের সীমাকে অতিক্রম করে দূরযানী হতে পারে নি।

তা ছাড়া, সমকালীন বাংলার জীবনলোকে ঐ সকল রচনার নাটকীয় আবেদনের পরিধিও ছিল সীমাবদ্ধ। বাংলা দেশে তখনও পারিবারিক

রঙ্গমঞ্চের যুগ চলেছে। কলকাতার নাগরিক সমাজেও গুটিকয় অভিজাত সমাজ-শ্রেষ্ঠের রুচি ও আস্বাদনের সীমায় আবদ্ধ হয়েছিল নাট্যাভিনয়ের উপভোগ। একদিকে আবেগাকুল জাতি-প্রেমের নিরঙ্গ-প্রায় চেতনা বৌদ্ধিক আভিজাত্যের মধ্যে সীমিত ছিল। অন্য দিকে তার সংগে আর্থিক আভিজাত্যের প্রয়াস যুক্ত হয়ে সেই জীবনোচ্ছ্বাসের নাট্যাবেদনকে নিতান্ত সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছিল। এই বদ্ধতা থেকে বাংলা নাট্যাভিনয় এবং নাটকীয় যৌথ জীবনাবেদনের প্রেরণা-উৎস যেখানে মুক্তি পেয়েছে, সেখানেই বাংলা নাট্য সাহিত্যের যথার্থ যৌবন-মুক্তি।

হিন্দুমেলা ও বাংলা নাট্যকলার মুক্তি

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই জাতীয় মুক্তিলগ্নে ধাত্রীত্ব করেছিল হিন্দু-মেলা। নবগোপাল মিত্র এই মেলার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মেলার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,—"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্রিত হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোন সাধারণ স্থানে একত্রে দেখা শুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয়, ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হয়।"১

অর্থাৎ, জনতার মাধ্যমে বাঙালির জাতিত্ব-বুদ্ধি, তথা 'স্বদেশানুরাগে'র অখন্ড-যৌথ সংগঠন ও সংবর্ধনই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টা নিছক নিরঙ্গ আবেগময় ছিল না। যৌথ ভাব-সম্মিলনের সম্পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে মেলার অনুষ্ঠানে বস্তুগত ভিত্তি আশ্রয় করা হয়েছিল। সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে সাংস্কৃতিক আলোচনা ও অনুষ্ঠান ছাড়াও কুস্তী, সংগীত, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। সেখানে "মহিলাদের হস্তনির্মিত সূচীশিল্প—আসন, জুতা, থলে, খরপোস, পশমের ও সূতির কার্য, কৃষ্ণনগরের সাড়ি, ঢাকার স্বর্ণকারের রূপা ও সোনার গড়ন, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, ভাস্করীয় প্রতিমূর্তি, ভারতীয় চিত্রকরদের পটচিত্র ও অন্যান্য ধরণের আঁকা ছবি প্রদর্শনী বিভাগে স্থান পেত এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ও মহিলা শিল্পী নিজ নিজ দ্রব্যের গুণানুসারে পুরস্কার পেতেন। প্রদর্শনীতে হস্তশিল্প ছাড়া ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্রব্য, এবং লাঙল, চরখা,

১। দ্রষ্টব্য—মুক্তির সন্ধানে ভারত।

প্রবল হয়েছে। এ সব কিছুর মূলে ছিল সুমিত-বলিষ্ঠ জীবন-চেতনার সর্বভূমিক অভিব্যক্তি। বাঙালির আত্মসচেতন জাতীয় সম্ভ্রমবুদ্ধির এই সর্বব্যাপকতার মধ্যে রেনেসাঁস যুগের জীবন-ভাবনা পূর্ণায়ত হয়েছে,—বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এখানেই ঘটেছে সার্থক যৌবন-মুক্তি।

এই মুক্তিপ্রভাবে সার্থক নাট্য রচনার সম্ভাবনা যেমন উৎসারিত হয়েছে, তেমনি নাটকের সংখ্যাপ্রাচুর্যের প্রয়োজনও হয়েছে অপরিহার্য। একের পর এক রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছে, সহরে এবং মফস্বলে অভিনয়ের উৎসাহ বেড়েছে। বিশেষ করে সহরের সাধারণ রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয়ের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নিত্যনূতন নাটকের প্রয়োজন হয়েছিল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন, অভাবে বাধ্য হয়েই তিনি নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।১ এই অভাব পূরণের চেষ্টায় বহু উৎসাহিজন অসংখ্য অনুল্লেখ্য নাটকের ভার সঞ্চয় করে গেছেন প্রত্ন-কৌতূহলীর জন্য। আমরা এবারে কেবল ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দিক্ থেকে সমুল্লেখ্য নাট্য-রচয়িতাদেরই আলোচনা করব।

নাট্য প্রেরণার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

হিন্দুমেলার ভাব-প্রেরণা অবলম্বনে জাতীয়তা প্রবুদ্ধ প্রথম নাট্যরচনা হরলাল রায়ের হেমলতা নাটক (১৮৭৩),—একথা জানিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন।২ এই নাটকে পরাধীনতার বেদনা প্রকট হয়েছে, কিন্তু নাট্যোৎকর্ষ উল্লেখ্য নয়। হরলাল বেণীসংহার অবলম্বনে শত্রুসংহার নাটক (১৮৭৪) লিখেছিলেন, ম্যাক্‌-ব্যাথ অবলম্বনে লিখেছিলেন রুদ্রপাল নাটক (১৮৭৪); কনকপদ্ম (১৮৭৫) নাটকের উৎস অভিজ্ঞান শকুন্তল। 'বঙ্গের সুখাবসান' হরলালের ইতিহাসাশ্রিত মৌলিক নাটক। সংগিনী নামে একটি উপন্যাস-ও ইনি লিখেছিলেন। কোনোটিরই সাহিত্যিক উৎকর্ষ উল্লেখ্য নয়।

হরলাল রায়

হিন্দুমেলা প্রবর্তিত নাগরিক বাংলার যৌথ জীবন-ভাবনা প্রথম সার্থক নাটকীয় মুক্তি পেয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮—১৯২৫) রচনায়। বাঙালির স্বাদেশিক ভাব, তথা হিন্দুমেলার মৌল কল্পনার জন্ম হয়েছিল সেকালের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। এদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও অন্তরতম ভাব-সংযোগ ছিল এই আন্দোলনের সংগে! তা ছাড়া, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পারিবারিক নাট্য-শালার অভিনয়াদি বিষয়েও প্রথমাবধি তাঁর উৎসাহ ছিল। কিন্তু, অন্দোলনের উল্লাস-বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর নাট্য

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। দ্রষ্টব্য—গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।
২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য়, সং।

সৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য সেকালের পক্ষে দুর্লভ আঙ্গিক-চেতনা, এবং স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন প্লট ও সংলাপের রচনায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প-মননের মধ্যে একটি আভিজাত্য ছিল, সে কেবল ঠাকুরবাড়ির জীবনযাত্রার ফল নয়, শিল্পীর ঘনিষ্ট ফরাসি সাহিত্য-চর্চার দ্বারাও তা প্রভাবিত হয়েছিল।

এই পরিচ্ছন্ন অভিজাত রুচির প্রথম প্রকাশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম প্রহসন কিঞ্চিৎ জলযোগ-এ (১৮৭২)। কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত স্ত্রী-স্বাধীনতার আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করেই প্রহসনটির কল্পনা। কিন্তু, বিদ্রূপের আঘাত কোথাও রুচির সীমা অতিক্রম করে নি। সংলাপের ভাষা যেমন সরল ও স্বাভাবিক, তার রুচিও তেম্নি পরিচ্ছন্ন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রথম নাটকটিই সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও একাধিকবার অভিনীত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। এঁর অধিকাংশ নাটকেরই মঞ্চ-সাফল্য সেকালে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল।

কিঞ্চিৎ জলযোগ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রহসন অলীক বাবু প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'এমন কর্ম আর করবো না' (১৮৭৭) নামে। ঠাকুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত একাধিক অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নাটকটির জনপ্রিয়তা বর্ধন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে আছে 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), এবং 'দায়ে পড়ে দার-গ্রহ' (১৩০৯ সাল)। শেষোক্ত দুটি রচনা ফরাসি লেখক মলেয়ার-এর দুটি প্রহসনের অনুসরণে লেখা।

অলীকবাবু ও অন্যান্য প্রহসন

পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার ক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ-নাট্যের সংখ্যাই সমধিক। "ভাসের নাটক-নাটিকাগুলি প্রথম প্রকাশিত হইবামাত্র তিনি বাঙালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।"[১] তাঁর অন্যান্য নাট্যানুবাদের মধ্যে আছে,—কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী; ভবভূতির উত্তরচরিত, মালতী-মাধব, মহাবীর চরিত; শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, নাগানন্দ; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস; শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক; আর্যক্ষেমীশ্বরের চন্ডকৌশিক; ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়; রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা, প্রিয়দর্শিকা, কর্পূরমঞ্জরী; এবং কাঞ্চনাচার্যের ধনঞ্জয় বিজয়।

অনুবাদ নাট্য

এই সুদীর্ঘ তালিকা থেকে অনুবাদ-নাট্যকারের স্বদেশীয় ঐতিহ্য-প্রীতি এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত-সাহিত্যে ব্যাপক অধিকারের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের অনুবাদ করবার সময়ে মূল

১। ঐ।

নাট্য গ্রন্থাদির আদর্শ পুঁথি ও পাঠ-নির্ণয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা ছিল সমধিক। বিভিন্ন নাটকের ভূমিকায় এ-বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় আছে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের দুটি সংস্কৃত সংস্করণ; গৌড়ীয় সংস্করণের তুলনায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংস্করণের প্রামাণ্য, ইত্যাদি বিষয়ে অনুবাদ-নাট্যকারের আলোচনা এ-কালের পাঠকের পক্ষেও কৌতূহলাবহ। বিক্রমোর্বশী নাট্যানুবাদের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল বোম্বাইএর শঙ্কর পণ্ডিত-সম্পাদিত সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সংস্করণ। শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ'-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে ভূমিকায় লেখক শ্রীহর্ষের বৌদ্ধ-ধর্মভাবুকতার প্রামাণ্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ফলে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যানুবাদ যেমন উপভোগ্য, তাঁর গ্রন্থভূমিকা-গুলিও হয়েছে তেমনি জ্ঞানোদ্দীপক। ফল কথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে অনুবাদকের নিষ্ঠাপূর্ণ মূলানুসারিতার সংগে শিল্পীর সহৃদয় জীবন-ভাবনা যুক্ত হয়েছিল।

মৌলিক নাটক :— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প-স্বভাব

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার সূচনা হয় পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪) নিয়ে। হিন্দুমেলার স্বদেশ-প্রেম এই নাটকে প্রথম মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। তাহলেও, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সকল নাটকেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাতে আবেগ আছে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই। এই প্রথম মৌলিক নাটকও সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। পুরুবিক্রম এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আরো তিনখানি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক ঐতিহাসিক রোমাণ্টিক নাট্যাদর্শে লেখা। আর, জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের রচনাতেই বোধ হয় বাংলা নাটকে প্রতীচ্য আঙ্গিকসম্মত কলা-বিন্যাস সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই, ঐতিহাসিক সংঘর্ষ-কাহিনীর সংগে রোমান্‌টিক্ প্রণয়-কথার জটিলতা পাকিয়ে অ্যাক্‌শন্‌কে ঘনবদ্ধ এবং সচল করে তুলেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অথচ, কি সংলাপে, কি ঘটনা-বিন্যাসে বা চরিত্রায়ণে, কোথাও আবেগ অতি-পরিমিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্য-প্রতিভার কথা মনে পড়ে। প্রতীচ্য নাট্যাঙ্গিকের-জ্ঞান দ্বিজেন্দ্রলালেরও ছিল গভীর। কিন্তু, অপরিমিত ভাবাবেগের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় নি বলে, তাঁর প্রায় সব কয়টি শ্রেষ্ঠ নাটকই প্রতীচ্য দৃষ্টিতে 'মেলোড্রামা।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ Melodrama একটিও লেখেন নি। এখানেই তাঁর সুমিত প্রতীচ্যাঙ্গিক অনুসরণের অনন্য-পূর্বতা।

পুরুবিক্রম নাটক গ্রীকবীর সেকেন্দার ও পুরুর বিক্রম-কথা নিয়ে রচিত। বিদেশীর উৎপীড়ন থেকে স্বদেশকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষায় পঞ্চ-নদের হিন্দু শাসকদের সংঘবদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছিলেন পুরু। তাঁর

প্রচ্ছন্ন অনুরাগিনী কুল্লু পর্বতের কুমারী রাজ্ঞী ঐলবিলাও এ-বিষয়ে ছিলেন অতি উৎসাহিনী। কিন্তু, রাজা তক্ষশীল ঐলবিলার প্রণয় প্রার্থী। আবার তার বোন অম্বালিকা সেকেন্দর-এর কাছে কিছুদিন বন্দিনী থাকবার সময় থেকেই গ্রীক-সম্রাটের প্রতি হয়েছিল প্রণয়াসক্ত। অতএব, একদিকে ঐলবিলার অনুরোধ, অন্যদিকে ভগ্নী অম্বালিকার নির্বন্ধ, উভয় সংকটে তক্ষশীল দোলায়মান হয়ে থাকে। শেষে Climax ঘনিয়ে আসে; সেকেন্দারের অতর্কিত আক্রমণে পুরুর সৈন্য পরাভূত হয়। আর দ্বৈরথ সমরে পুরু যখন সেকেন্দরকে পরাভূত প্রায় করেছেন, তখনই সেকেন্দরের কোন সেনানীর অতর্কিত আঘাতে তিনি মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। ঐলবিলা তখন তক্ষশীলের হাতে বন্দিনী। ঈর্ষাতুরা অম্বালিকা বন্দী পুরুর কাছে তক্ষশীলের প্রতি ঐল-বিলার প্রণয়ের মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করে পুরুকে প্রণয়িনীর প্রতি বিরূপ করে তোলে। মুমূর্ষুপ্রায় পুরুকে দেখতে গিয়ে তক্ষশীল তার হাতে নিহত হয়। অবশেষে সেকেন্দর পুরু-বিক্রম স্বীকার করেন, স্বাধীন রাজা বলে বরণ করেন তাঁকে। ভ্রাতৃহীনা অম্বালিকা সেকেন্দর কর্তৃকও প্রণয়-প্রত্যাখ্যাতা হয়। নিজ দুষ্কৃতি-ভারে আনমিতা, সর্ব-বঞ্চিতা অম্বালিকা এবার সচেষ্ট হয়ে পুরু-ঐলবিলার মিলন সাধন করে। কিন্তু, দুর্ভাগিনীর সর্ব-রিক্ততার মধ্যেও দেশদ্রোহের কর্মফল আজীবন তার চেতনাকে দগ্ধ করতে থাকে।

পুরু বিক্রম

অম্বালিকার ট্রাজেডি-ই নাটকটির সর্বাপেক্ষা হৃদ্য অংশ। বস্তুতঃ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সকল মৌলিক নাটকেই উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস-ধর্মী প্রণয়-মূল্যবোধ রোমান্টিক কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে। বীরত্ব, যুদ্ধদৃশ্য, উদাত্ততার উপস্থাপনা তাঁর নাটকে বহুল পরিমাণে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু, অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন হলেও সর্বাধিক হৃদয়-স্পর্শী হয়েছে তিতিক্ষু প্রেম ও সর্বস্ব-পণ দেশভক্তির জাতীয় জীবনাবেগ। যুদ্ধাদি বীর্যময় ঘটনা নাটকের 'অ্যাক্শনকে' চলমান রেখেছে, আর মনোধর্মী সংঘাত রচনা করেছে নাটকীয় সমস্যার সজীব আবর্ত। 'অ্যাক্শন্' ও 'ইমোশন্'-এর যুগপৎ সম্মিলন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকলাকে নিষ্প্রাণতা, অথবা অতি-আবেগে বিনষ্ট হতে দেয় নি।

পুরুবিক্রম প্রথম নাটক বলে এই উভয়বিধ সংমিশ্রণের পূর্ণতা বিহিত হতে পারে নি এখানে। তবু, অম্বালিকার প্রণয়-বিড়ম্বনার ট্রাজেডির সংগে দেশ-প্রীতির কালোচিত প্রেরণা যে পিনদ্ধতম হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এই নাটকের তিনটি দেশভক্তিমূলক সংগীত একদা ব্যাপক জন-প্রীতি লাভ করেছিল,—তার মধ্যে 'মিলি সবে ভারত সন্তান' গানটি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

দ্বিতীয় নাটক 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর (১৮৭৫) কাহিনী আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে গঠিত। মেবার-রাজ লক্ষ্মণসিংহের কন্যা রূপগুণবতী সরোজিনীর প্রণয়াধিকার নিয়ে বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ ও গারাধিপতি রণসিংহের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অথচ, এঁরা দুজনেই ছিলেন মেবারের শক্তিস্তম্ভ। এই আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের শেষে লক্ষ্মণ-সিংহ, তাঁর বারটি পুত্র ও বিজয়সিংহ সকলেই প্রাণ দিলেন, সরোজিনী সখীদের সংগে করল অগ্নি-প্রবেশ। এই মূল কাহিনীর ফাঁকে একটি উপকাহিনীও আছে, যার আবেদন নাট্য-সমাপ্তির পক্ষে কম নয়। মেবারে আত্মকলহ সৃষ্টি করার জন্য আলাউদ্দিন-অনুচর মহম্মদ আলি ছদ্মবেশে ভৈরবাচার্য নামে মন্দিরের পুরোহিত হয়েছিল। দৈবী আদেশের নামে রাজাকে ছলনা করে ভৈরবাচার্য দেবীমন্দিরে রাজকুমারী সরোজিনীকে বলি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, পরিণামে বলি হয় রোষিনারা নামে একটি মুসলমান যুবতী,—বিজয়সিংহের হাতে বন্দী হয়ে যে তাকে ভালবেসে-ছিল। তখন জানা যায়,—ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য অজ্ঞাতে নিজের কন্যাকে হত্যা করেছে।

সরোজিনী

সরোজিনী নাটকে 'অ্যাক্‌শন্'-এর সংগে 'ইমোশান'-এর যোগ নিবিড়তর হয়েছে; ইতিহাসকে অস্বীকার না করেও রোমান্স-সৌন্দর্য নির্বাধ প্রতিষ্ঠা পেতে পেরেছে। 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—এই বিখ্যাত গানটি নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা। ডঃ সুকুমার সেন বলেন,—"সরোজিনী নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেসের 'ইফিগেনেইয়া হে এন আউলিদি' নাটকের প্রবল ছায়াপাত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল গ্রীক্ পড়েন নাই, সম্ভবতঃ রেনাঁর ফরাসি অনুবাদই ইঁহার উপজীব্য।"১

অশ্রুমতী (১৮৭৯) জ্যোতিরিন্দ্রের মৌলিক নাটক কয়টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেশপ্রেমের আবেগ, রাষ্ট্রদ্বন্দ্বের জটিল সংঘাত ও নরনারীর বিচিত্র-গতি প্রেমের ত্রিধারা একত্র মিলিত হয়ে জীবনের ত্রিবেণীসংগম রচনা করেছে। ভাব-কর্মে উদ্দীপ্ত সেই জীবন-সংঘাত অশ্রুমতীতে একটি অখণ্ড-পূর্ণ নাট্য-সার্থকতা রচনা করেছে।

অশ্রুমতী

চিতোরের রাণা প্রতাপের কন্যাকে ভীল সর্দারের কাছ থেকে হরণ করে প্রতিহিংসাপর মানসিংহ তাকে মুসলমান সেনানী ফরিদের সংগে বিয়ে দিতে চান। কিন্তু, সম্রাট সেলিম অশ্রুমতীকে উদ্ধার করে স্ব-গৃহে আবদ্ধ করেন।

১। ঐ।

ক্রমে দুজনের মধ্যে প্রণয়াকর্ষণ নিবিড় হয়ে ওঠে। তখন, প্রতাপের বংশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য প্রতাপানুজ শক্তিসিংহ অশ্রুমতীকে উদ্ধার করে পৃথ্বীরাজের সংগে বিবাহ দিতে চায়। সেলিমের সংগে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে আততায়ী করিমের হাতে পৃথ্বীরাজ প্রাণ হারান। প্রতাপের মৃত্যুশয্যায় অশ্রুমতীকে আমরণ ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাস গ্রহণের শপথ নিতে হয়। শ্মশানে উদাসীনা অশ্রুমতী পৃথ্বীরাজ-প্রণয়িনী মলিনাকে দেখ্‌তে পায় পৃথ্বীরাজের মৃতদেহের পার্শ্বে। অন্যদিকে কামনামুক্ত প্রণয়বুভুক্ষু সেলিম শ্মশানে অশ্রুমতীর শেষ প্রণয়ের পরোক্ষ-পরিচয় নিয়ে ফিরে আসেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিটি নাটকেই ঘটনার বহুমুখী জটিলতা ও সংঘাতের নিয়ত-সচল নবীনতা বাংলা নাট্যসাহিত্যের পক্ষে প্রায় অভাবনীয়। নাটকগুলির অ্যাক্‌শন যেমন বিচিত্র, তেম্‌নি দূর-বিস্তারিত। সরোজিনী নাটক ছয় অঙ্কে শেষ হয়েছে। অশ্রুমতী পঞ্চাঙ্ক হলেও, কোনো কোনো অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা প্রায় বিশটির মত। কিন্তু, এই সমস্ত বিচিত্রতাই প্রতাপের সর্বস্বপণ দেশপ্রেম ও তাঁর কন্যা অশ্রুমতীর তিতিক্ষু-গোপন নারীপ্রণয়ের ভাব-সংঘাতের মূলে কেন্দ্রিত হয়েছে। সেই কেন্দ্রিত Climax-এরই পরিণামী ট্রাজেডি নাট্যশেষে উদাসিনী অশ্রুমতীর চির-বিদায়। অশ্রুমতীর স্বগতোক্তিতে সেই ট্রাজেডির নিভৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে ঃ—

"অশ্রু। (স্বগত) ভীলদের দেশ?—আমার বুড়্‌ঢাদাদার দেশ? আহা! তখন আমি কি সুখেই ছিলেম। হ্যাম্বা খ্যাম্বাদের সংগে পর্বতের শিখরে শিখরে কেমন খেলিয়ে বেড়াতেম—বরাহদের তাড়া করে কেমন ছুটোছুটি করতেম—হাত ধরাধরি করে ছুটোছুটি করতেম—হাত ধরাধরি করে কেমন সবাই মিলে নাচতেম—লুকোচুরি খেলবার সময় ঐ গুহায় আমি কতবার লুকিয়েছি—আহা! তখন কোন জ্বালাই ছিল না —এ মুসলমান, ও রাজপুত—সে সব কিছুই জানতেম না—কাকে ছলনা বলে,—কাকে সন্দেহ বলে কিছুই জানতেম না—হা! তখন কিছুই গোপন করবারও দরকার হত না—...............................।"

[চতুর্থ অঙ্ক, সপ্তদশ দৃশ্য]

আবেগাতুর মুহূর্তের মর্মজ্বালাও সুমিত স্বাভাবিক মাত্রাবোধের সহযোগে 'নাটকীয়' হয়ে উঠেছে! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিষয়-বিন্যাসের ও সংলাপ-রচনার যথাযথ স্বাভাবিকতার আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন অশ্রু-মতীর প্রতি ভীল সর্দারের উক্তি ঃ—

"মল্লু। খেল্‌বি না ক্যান্‌ রে বুড়ি [অশ্রুমতী]? তোর পাঁচ গন্ডা বয়স বই নয়, তু খেল্‌বি না? বলিস কি বুড়ি? তু ক্যামন্‌

ক্যামন্ পারা হয়েছিস, তু কি মোদের সে চেনি নোস্? তোরে যেত্তে দেখ্‌ছি তেত্তে মোর বুক চুর চুর ফাটি যাচ্ছে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ মৌলিক নাটক স্বপ্নময়ী-র (১৮৮২) প্রসঙ্গ ইতিহাসাশ্রিত হলেও মূল কাহিনীটিতে ঐতিহাসিক স্বভাব লুপ্ত হয়েছে ঃ—নাটকটি হয়েছে সম্পূর্ণ রোমান্টিক গুণান্বিত। লেখকের অপরাপর নাটকের মতই দেশপ্রেমের আবেগের সংগে প্রণয়ের প্রতিস্পর্ধিতা যুক্ত হয়ে নাট্যপরিণতি হয়েছে সকরুণ। পূর্বের নাট্যালোচনায় জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের বাস্তব-দৃষ্টি ও স্বাভাবিক চিত্রণ-দক্ষতার কথা বলেছি। এরই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বপ্নময়ী নাটকের জনতা-চিত্র। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে জন-সাধারণের স্বভাব-বর্ণনায় তাদের সরলতা, অস্থির-চিত্ততা, পরমুখা-পেক্ষিতা ইত্যাদি সহজ দুর্বলতা নিয়ে সস্নেহ কৌতুক করা হয়েছে।[১] স্বপ্নময়ীর 'ইতর লোক'-এর চিত্রণে এই রস-প্রকরণের সার্থক পূর্বসূত্র লক্ষিত হয়ে থাকে। আলোচ্য নাটকের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের রস-চিত্রণ সংক্ষিপ্ত হলেও, এ-বিষয়ের একটি সার্থক উদাহরণ।

স্বপ্নময়ী

গভীর বিষয়ক নাটক রচনা করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রচুর অনুবাদ করেছেন। তেম্নি, প্রহসন ও গল্প-উপন্যাস রচনায় প্রতীচ্য সাহিত্য, বিশেষ করে ফরাসি সাহিত্যের দ্বারা তিনি প্রবল-ভাবে উদ্বোধিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত ফরাসি গল্প-কবিতার অনুবাদ 'ফরাসি প্রসূন' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তা ছাড়া, অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ভারতবর্ষ, মধ্যযুগের ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ, সত্য, সুন্দর মঙ্গল, শোনিত সোপান, অবতার, মিলিতোনা। গদ্য-পদ্য-নাটক সর্বত্রই জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের অনুবাদ মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও বাংলা ভাষা ও জীবনের একান্ত সান্নিধ্যে এসে পৌঁচেছে। অনেক ক্ষেত্রেই বলে না দিলে, এ-সব যে বিদেশী লেখার দেশীয় অনুবাদ, সে কথা বুঝবার উপায় থাকে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে পিয়ের লোটি'র গ্রন্থানুবাদ 'মধ্যযুগের ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ'-এর স্বল্পাংশ উদ্ধার করি ঃ—

অপরাপর রচনা

"আমাদের বলদেরা অনবরত দুল্‌কি চালে চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সূর্য অস্ত গেল। সেই সংগে সিংহলের ন্যায় এখানকার বাতাসও গ্রীষ্ম-দেশ সুলভ আর্দ্রতায় পূর্ণ হইল। কবোষ্ণ বৃষ্টি ধারার পরম মিত্র নারিকেল বৃক্ষগুলি, অন্যান্য বৃক্ষকে অপসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে এখানে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। আমরা এখন সুবৃহৎ শাখাবৃক্ষ-বিস্তারিত

১। দ্রষ্টব্য—বিসর্জন, মুক্তধারা ইত্যাদি।

অফুরন্ত তালবৃক্ষের খিলান মণ্ডপতলে প্রবেশ করিয়াছি। ইহা পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী প্রদেশের মালাবার উপকূলের শত শত যোজন পর্যন্ত প্রসারিত।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ইংরেজি নাটক জুলিয়াস সিজার ও 'রজতগিরি'র-র অনুবাদ; ইংরেজির গদ্যানুবাদের মধ্যে আছে এপিক্‌টেটসের উপদেশ, মার্কস অলিরিয়াসের আত্মচিন্তা। তা ছাড়া, তিনি মারাঠি থেকে তুকারামের রচনার পদ্যানুবাদ এবং ঝাঁশির রাণীর গদ্যানুবাদ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক প্রবন্ধাবলী প্রবন্ধ-মঞ্জরী গ্রন্থে সংগৃহীত আছে।

হিন্দুমেলার আদর্শ-প্রবুদ্ধ অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখ্য উপেন্দ্রনাথ দাস। এঁর রচিত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর' (১৮৭৫) অভিনয় এককালে সরকারি নির্দেশে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই নাটকের সংগে সংশ্লিষ্ট বলে স্বয়ং নাট্যকার

উপেন্দ্রনাথ দাসের

এবং অমৃতলাল বসু প্রত্যেকে একমাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টের বিচারে অবশ্য দুজনেই মুক্তি পেয়েছিলেন। মূল গল্পটি রোমাণ্টিক্ প্রণয়মূলক। তার সংগে হুগ্‌লির ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের দুশ্চরিত্রতা ও অমানুষিক উৎপীড়নের কাহিনী যোগ করে জাতীয় বিক্ষোভ উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়েছিল। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপন'-এ হিন্দুমেলাদির প্রেরণা ব্যাজস্তুতির সরস আবরণে প্রকাশিত হয়েছে ঃ—

"একদিন সন্ধ্যার সময় সালকিয়া হইতে কলিকাতায় আগমন কালে এক বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকাধিকারী কে, তাহা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই। ইহার একপ্রান্তে হস্তাক্ষরে এই কয়েকটি মাত্র কথা লিখিত ছিল ঃ—"নবগোপাল মিত্র একটি প্রকাণ্ড জানোয়ার, বৎসর বৎসর হিন্দুমেলা

সুরেন্দ্রবিনোদিনী

করিয়া কি হইতেছে? মৃত ব্যক্তিকে কে পুনর্জীবিত করিতে পারে? আবার শুনিতেছি নাকি, কলিকাতা, এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। শিশির-কুমার ঘোষের শ্রাদ্ধ হইতেছে।—এদিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' করিতেছেন। আমার পিণ্ড চট্‌কাইতেছেন। কে পড়ে?"

নাটকের ভিতরেও পরাধীনতার গ্লানি তপ্ততার সংগে প্রকাশিত হয়েছে।

'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'র একটি গান সেকালের স্বদেশ-প্রিয়জনের প্রীতি আকর্ষণ করেছিল ঃ—

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল ॥
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব যশোরাশি কান্দিতেছে অবিরাম;
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল!"

উপেন্দ্রনাথ দাসের আরো দুটি রচনা শরৎ-সরোজিনী নাটক এবং 'দাদা ও আমি' নাটিকা (শেষেরটি ইংরেজি প্রহসনের আশ্রয়ে লেখা)।

আলোচ্য যুগের নাট্যসাহিত্যে প্রথম মুসলমান নাট্যকার হিসেবে মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) উল্লেখ্য। বসন্তকুমারী নামে একটি ত্র্যঙ্ক নাটক (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ নামক বাস্তবের "অবিকল ছবি" বিশিষ্ট একটি সামাজিক নক্সা নাটক (১৮৭৩), এবং 'এর উপায় কি?' নামে একটি প্রহসনের লেখক ইনি।

মশারফ হোসেন

এ-যুগের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে প্রমথনাথ মিত্র ও উমেশচন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখ্য।

কিন্তু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরে সমকালীন যৌথ জীবন-ভাবনার কেন্দ্রিত ফলশ্রুতি যাঁর নাট্য-সাধনায় পুঞ্জিত হয়েছিল, তিনি গিরিশচন্দ্র। আগে বলেছি, নাট্যরস প্রকাশের ভিত্তি রঙ্গমঞ্চ, আর তার আশ্রয় যুগ-জীবন-চেতনার ঘন সংসক্তি। গিরিশচন্দ্র বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একাধারে জন্মদাতা ও মুক্তি-বিধাতা বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। ন্যাশন্যাল থিয়েটার গঠনের আগে উদ্যোগপর্ব থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল;— তিনি ছিলেন সেই নট-গোষ্ঠীর অধিনায়ক। শেষ মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার অল্প আগে গিরিশ-চন্দ্র সেই প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু, আড়াই মাস সময়ের মধ্যেই তাঁকে আবার অভিনেতৃ-দলের কেন্দ্রভূমিতে লক্ষ্য করি ঐ ন্যাশন্যাল থিয়েটার-এরই মঞ্চে। বাংলার রঙ্গমঞ্চ তারপরে কিছুদিন ভঙ্গুরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পর বেঙ্গল থিয়েটার, তারপরে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার একের পর এক পর্যুদস্ত হয়ে যায়। অবশেষে পেশাদারী নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন প্রতাপচাঁদ জহুরী। এই নাট্যমঞ্চের অধ্যক্ষের পদাধিকারী হয়ে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্যাভিনয়ের ধারাকে শ্রেষ্ঠ নট-সম্মিলনে প্রথম ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব দান করেন। কালে অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দু মুস্তাফি, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বলবাবু) ইত্যাদি অভিনেতৃমণ্ডলী সেদিন গিরিশচন্দ্রকে মধ্যবর্তী করে একত্রবদ্ধ হয়েছিলেন।

মঞ্চে গিরিশচন্দ্র

রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যেই নাট্যকারের

ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অবতরণ। মধুসূদন-দীনবন্ধুর সব কয়টি নাটকের সফল অভিনয়ের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীকে নাট্যরূপায়িত করে মঞ্চস্থ করা হয়।

গিরিশচন্দ্র ঃ

অবশ্য, সে নাট্যরূপায়নের একক কৃতিত্ব ছিল গিরিশচন্দ্রেরই। তারপরে মঞ্চসফল উৎকৃষ্ট নাট্যরচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, অভিনয়যোগ্য ভাল নাটক না পেয়ে বাধ্য হয়ে গিরিশচন্দ্রকে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। অবশ্য, যাত্রা রচনায় তাঁর দক্ষতা পূর্বাবধি বহুল প্রশংসিত ছিল। থিয়েটার-এর ক্ষেত্রেও গীতিনাট্য নিয়েই তিনি নাট্যকারের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হন। তাঁর আগমনী ও অকালবোধন গীতিনাট্য রচনার কাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ; দোললীলা রচিত হয়েছিল আরো এক বছর পরে (১৮৭৮)।

গিরিশচন্দ্রের বিরাট নাট্যসাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ের আগে, কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। প্রথমতঃ গিরিশ-প্রতিভার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা নট-গুরু হিসেবে। অভিনয়-ব্রতের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই নাট্যকারের সৃজন ক্ষেত্রে তিনি অনিচ্ছা-প্রবেশ করেছিলেন। এদিক্ থেকে, তাঁর প্রত্যেকটি নাটক রচনারই একমাত্র না হলেও প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল অভিনয়-সাফল্য। অভিনয়-যোগ্য-উপাদানের যথাপরিমিতি রসোত্তীর্ণ নাট্যকলা-কর্মের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজন। অথচ, নিছক অভিনয়-সর্বস্বতা আবার সার্থক নাট্য-রস-রচনার পরিপন্থী। গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার মৌল ইতিহাস সন্ধান করলে এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হতে পারবে।

নট বনাম নাট্যকার

প্রথমতঃ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের হাতে একটি সুনির্দিষ্ট নটগোষ্ঠী ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট অভিনয়-দক্ষ হলেও, প্রত্যেকেরই উৎকর্ষ ছিল এক একটি বিশেষ শ্রেণীর চরিত্র-রূপায়নে। আবার, বিশেষ ধরণের সংলাপ বা বাগ্‌ভঙ্গি দিয়েই তাঁরা দর্শক-চিত্তকে সমধিক আকর্ষণ করতে পারতেন। অতএব, নাটকের কাহিনী কল্পনার সময়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধরণের চরিত্রাবলী ও সংলাপের সৃষ্টি-সীমার বাইরে গিরিশ-চন্দ্রের যাবার উপায় ছিল না। এতে চরিত্র রচনার সজীবতা ও বৈচিত্র্য বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তা ছাড়া, কোন্ কথা, কার মুখে কি ভাবে উচ্চারিত হলে দর্শকেরা সবচেয়ে খুশি হয়ে উঠবে, নিরন্তর এই চিন্তায় তন্ময় থাকার ফলে নাটকের প্লট প্রায়ই পূর্ণায়ত হতে পারে নি; ঘটনা-সংঘাত হতে পারে নি তীব্র-সংহত।

এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। গিরিশচন্দ্র নিজেও জানতেন, তাঁর নাট্যরচনার অতুল্য সফলতার ভিত্তি মঞ্চাভিনয়ে, নাট্যরসের পূর্ণাঙ্গ-

সংবন্ধ নয়, কিন্তু বাঙালির যৌথ জীবনচেতনা-সংপৃক্ত। এই কারণেই, বাঙালি-চিত্তে তাঁর নাট্য-রসাবেদন চিরন্তনতার দাবি রাখে।

এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে অনুভূত হওয়া উচিত, নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র 'অ্যাকশন'-এর চেয়ে 'ইমোশন্'-এর 'পরে জোর দিয়েছিলেন বেশি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, সখের দলের জন্য যাত্রা লিখেই গিরিশচন্দ্র নাট্যক্ষেত্রে প্রথম জনপ্রিয় হয়েছিলেন। উনিশ শতকের সাময়িক কারণ-প্রসূত যাত্রা-বিমুখতা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। কিন্তু, বাংলার নাট্যাস্বাদনে এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার খুব কমই আছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় বলেছি, বাঙালির স্বতন্ত্র নাট্য-স্বভাবের ঐতিহাসিক অনুবর্তন করেই যাত্রা সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল। এক বিশেষ অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ-সার্থক নাট্যকলা হিসেবে যাত্রার বিকাশ-সম্ভাবনাও প্রায় অসংশয়িত হয়েছিল। পরে, শিক্ষিত বাঙালির ইংরেজি নাট্যাঙ্গিক-প্রীতি সেই সম্ভাবনাকে বিধ্বস্ত করে। কিন্তু, পূর্বে দেখেছি, মনোমোহন বসু ইংরেজি নাট্যকলার বলিষ্ঠ আধারে বাঙালির আবেগ-স্বভাব নাট্য-প্রেরণাকে পুনর্নির্বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রেরও প্রথম চারখানি নাটকই গীতিনাট্য। এই সব গীতিনাট্য রচনায় 'অপেরা'র চেয়ে যাত্রার প্রভাব বেশি বলে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। য়ুরোপীয় আদর্শানুমত থিয়েটারের আধারে বাঙালির যাত্রাধর্মী নাট্য-স্বভাবকে গিরিশচন্দ্র পুনর্মুক্তি দিয়েছিলেন। নাট্য-শিল্পী,—নট এবং নাট্যকার হিসেবে এখানেই তাঁর যথাথ সফলতা। বিজ্ঞান-সম্মত সেই রূপাধারে বাঙালির অতিরেক-দুষ্ট আবেগ-স্বভাব আবার যথাপরিমিত, আত্মস্থ হতে আরম্ভ করেছিল। নাটকের ক্ষেত্রে এখানেই বাংলার শিল্পচেতনার যথার্থ যৌবন-মুক্তি। প্রতীচ্যের আঙ্গিক-চেতনার সংগে বাঙালির নাট্য-ভাবুকতার এই সুমিত-সমন্বয় ক্রমশঃ পূর্ণায়ত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়। এই অর্থেই এঁরা গিরিশচন্দ্রীয় ধারার উত্তরসূরী।

গিরিশের নাট্যাঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য :—

সবশুদ্ধ ৭৫ খানি সমাপ্ত এবং চারখানি অসমাপ্ত নাটক-প্রহসনের রচনা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র :—

১। আগমনী
২। অকাল বোধন
৩। দোল লীলা
৪। মায়াতরু
৫। মোহিনী প্রতিমা
৬। আলাদিন
৭। আনন্দ রহো
৮। রাবণবধ
৯। সীতার বনবাস
১০। অভিমন্যুবধ
১১। সীতার বিবাহ
১২। ব্রজবিহার

নাট্যপঞ্জী

১৩। রামের বনবাস
১৪। সীতাহরণ
১৫। ভোট মঙ্গল
১৬। মলিনমালা
১৭। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
১৮। দক্ষযজ্ঞ
১৯। ধ্রুব-চরিত্র
২০। নল-দময়ন্তী
২১। কমলে কামিনী
২২। হীরার ফুল
২৩। বৃষকেতু
২৪। শ্রীবৎস চিন্তা
২৫। চৈতন্যলীলা
২৬। প্রহ্লাদচরিত্র
২৭। নিমাইসন্ন্যাস
২৮। প্রভাসযজ্ঞ
২৯। বুদ্ধদেব চরিত
৩০। বিল্বমঙ্গল
৩১। বেল্লিক বাজার
৩২। রূপ-সনাতন
৩৩। পূর্ণচন্দ্র
৩৪। নসীরাম
৩৫। বিপদ
৩৬। প্রফুল্ল
৩৭। হারানিধি
৩৮। চণ্ড
৩৯। মলিনা-বিকাশ
৪০। মহাপূজা
৪২। মুকুল মুঞ্জরা
৪১। ম্যাক্‌বেথ
৪৩। আবুহোসেন
৪৪। জনা
৪৫। সপ্তমীতে বিসর্জন
৪৬। স্বপ্নে ফুল
৪৭। সভ্যতার পাণ্ডা
৪৮। ফণির মণি
৪৯। পাঁচকনে
৫০। কালা পাহাড়
৫১। হীরক জুবিলী
৫২। পারস্য প্রসূন
৫৩। মায়াবসান
৫৪। দেলদার
৫৫। পাণ্ডব গৌরব
৫৬। মণি হরণ
৫৭। নন্দদুলাল
৫৮। অশ্রুধারা
৫৯। মনের মত
৬০। অভিশাপ
৬১। শান্তি
৬২। ভ্রান্তি
৬৩। আয়না
৬৪। সৎনাম (বৈষ্ণবী)
৬৫। হরগৌরী
৬৬। বলিদান
৬৭। রাণা প্রতাপ (অসমাপ্ত)
৬৮। সিরাজদ্দৌলা
৬৯। বাসর
৭০। মীর কাসিম
৭১। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা
৭২। ছত্রপতি শিবাজী
৭৩। শাস্তি কি শান্তি
৭৪। শঙ্করাচার্য
৭৫। অশোক
৭৬। তপোবল
৭৭। গৃহলক্ষ্মী (অসমাপ্ত)
৭৮। মিলন কানন (”)
৭৯। সাধের বৌ (”)

তাছাড়া, তিনখানি উপন্যাস কিছু কবিতা, কয়েকখানি গল্প ও নক্সা এবং ধর্ম ও নাট্য সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ আলোচনাও লিখেছিলেন।

প্রাথমিক গীতিনাট্য কয়খানির কথা ছেড়ে দিলে গিরিশের নাট্য-পঞ্জীকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—(১) ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিষয়ের নাটক, (২) পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক নাটক, (৩) সামাজিক-পারিবারিক নাটক এবং (৪) প্রহসন। আঙ্গিক-বিচারে, "গিরিশের সর্বপ্রথম নাটক 'আনন্দ রহো' বা আকবর।"[১] ইতিহাসাশ্রিত এই নাটকটিতে প্রতাপসিংহের দুঃখ বরণ ও স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তাহলেও, আনন্দরহো জনপ্রিয় হতে পারে নি। এর পরেই প্রথম পৌরাণিক নাটক রাবণবধ লিখ্‌লেন গিরিশ। পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণা প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে একটি প্রবন্ধে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন, —"ঐতিহাসিক বা জাতীয়তা মূলক নাটকের সময় তখনও আসে নাই। সার্বজনীন না হইলে নাটক এখানে সমাদৃত হইবে না, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্মস্পর্শ করিতে পারিবে না। জাতীয়তা প্রণোদিত নাটক না হইলে জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূলে ধর্ম। ভারত ধর্মপ্রাণ। যাহারা লাঙল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে ক্ষেতে পরিশ্রম করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে। তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্বজনিকতার প্রয়োজন থাকে তবে কৃষ্ণনামেই হইবে।.........

গিরিশ নাট্য-সাহিত্য প্রকার ভেদ

"হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারিধারে উচ্ছেদ হয় নাই। আকবরের রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে।"[২]

প্রথম পৌরাণিক নাটক রাবণ-বধ-এই গিরিশচন্দ্র হিন্দুস্থানের মর্মাস্থিত এই ধর্ম চেতনার উদ্বোধনে পূর্ণ সচেতন হয়েছিলেন। সে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আর তাঁর জীবনে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাশ্রয় লাভ ঘটে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। মধ্যবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের মধ্যে নিরীশ্বরবাদী চেতনাই যে প্রবল ছিল, লেখকের কণ্ঠেই সে তথ্যের পরিচয় পেয়েছি। তাহলেও, রাবণ বধ রচনার সময়ে কিন্তু শিল্পী নিজের ব্যক্তিগত অবিশ্বাসের ছায়া-পাত ঘট্‌তে দেন নি নাটকের কোথাও; বরং জাতীয় ভক্তি-প্রণোদনাকেই

পৌরাণিক নাটক ঃ— রাবণ বধ

১। গিরিশ প্রতিভা—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত।
২। দ্রষ্টব্য—ঐ, পৌরাণিক-নাটক।

লালন করেছেন গভীর সহৃদয়তার সংগে। রাবণ-বধ-এ মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র ছায়াপাত ঘটেছে প্রচুর পরিমাণে,—বিশেষ করে রাবণ চরিত্রের পরিকল্পনায়। গিরিশচন্দ্রের মূল কাহিনীর আশ্রয় ছিল কৃত্তি-বাসের রামায়ণ। রাবণ সেখানে যথাপূর্ব বি-ভীষণ রাক্ষস। কিন্তু, মধুসূদনের আদর্শে গিরিশচন্দ্র রাবণকে এঁকেছেন আত্মমর্যাদায় দৃঢ় উদাত্ত বীর রূপে। এমন কি রামচন্দ্রকে দিয়েও শিল্পী এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন,—

"কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণরক্ষা হেতু।"

কিন্তু, মধুসূদন তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রাচীন জীবন মূল্যবোধকে আমূল পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। রাবণ তাঁর চোখে "Grand Fellow" ছিল,—তেমনি সপার্ষদ রাম ছিলেন তাঁর ঘৃণার যোগ্য। অপর পক্ষে, কোনো বিশেষিত প্রত্যয় না থাক্‌লেও, গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রকে চিত্রিত করেছেন 'গোলোকবিহারী' ব্রহ্ম-সনাতন রূপে। এমন কি চরম যুদ্ধের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েও রাবণকে এঁকেছেন রামসাধক রূপে; কেবল ত্বরান্বিত মুক্তির লোভে শত্রুভাবে ভজনা করেছিল রাবণ। এই চিরন্তন সংস্কার রক্ষা করতে নাটকীয় সংঘাতের তীব্রতা সহজেই শিথিল হয়েছে; কিন্তু ভারতের, তথা সমকালীন বাংলা দেশের স্বভাবগত ধর্মোচ্ছ্বাস আবেগস্ফীত হয়ে জাতির মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। আর, বস্তুতঃ এখানেই,—এই ভাব-উদ্বেল মর্মস্পর্শিতায়ই গিরিশচন্দ্রের নাট্যশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি, পরিচ্ছন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত নাট্যরূপ রচনার চেয়ে 'ইমোশন'কে দৃশ্য কাব্যান্বিত করার দিকেই গিরিশচন্দ্রের ঝোঁক ও সফলতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এদিক্ থেকে পুরাতন যাত্রা-শৈলীকে যেন আধুনিক থিয়েটার-এর উপযোগী করে তুলেছিলেন তিনি।

গিরিশের সুদীর্ঘ রচনাপঞ্জী থেকে প্রত্যেকটি নাটকের বিশেষিত বিচ্ছিন্ন আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। নাট্যকার হিসেবে তাঁর সৃজনধর্মের ঐতিহাসিক ধারাটুকুকে পরিচায়িত করতে পারলেই বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। এদিক্ থেকে লেখকের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'জনার' কথা উল্লেখ্য। গিরিশচন্দ্রের বহু পঠন বিষয়ে তাঁর জীবনীকার ও সমালোচকেরা বার বার আলোচনা করেছেন। নাট্যরচনা ও অভিনয়ের উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী নিজের সহজ প্রতিভাকে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সহায়তায় সু-কর্ষিত পারিপাট্য দান করতেন। এদিক থেকে নাট্যশিল্পী হিসেবে সেক্‌স্‌পীয়রের প্রতি সেকালের আপামর বাঙালির মতই গিরিশেরও শ্রদ্ধা ছিল উচ্ছ্বসিত। তাঁর প্রায় সব কয়টি শ্রেষ্ঠ নাটকেই সেক্‌স্‌পীয়রীয় আঙ্গিক প্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াস রয়েছে। এদের মধ্যে পারিবারিক সামাজিক নাটক হিসেবে

প্রফুল্ল সর্বশ্রেষ্ঠ, পৌরাণিক নাট্যপঞ্জিতে শ্রেষ্ঠ জনা (১৮৯৩)। জনা চরিত্রের পরিকল্পনায় মধুসূদনের বীরাঙ্গনাকাব্যের জনা-পত্রিকার আদর্শের দ্বারা নাট্যকার বহুল প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ জনা নাটকে নাট্য-ধর্ম যতটুকু রয়েছে, তা 'জনা-পত্রিকা'র নাট্য সম্ভাবনারই সূত্রানুবর্তন। কিন্তু, এখানেও জীবনদৃষ্টির বিচারে গিরিশচন্দ্র মধুসূদন থেকে আ-মূল পৃথক্। জনা-পত্রে মধুসূদন 'নরনারায়ণ'-বাদের আবহমান সংস্কারের প্রতিস্পর্ধিতা করেছেন; নতুন মানবিক মূল্যবোধে বৈপ্লবিক ইঙ্গিত করেছেন জনার মুখে অর্জুনের জন্ম থেকে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু, জনা নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রথমাবধি ভক্তি-আপ্লুত চেতন, ততদিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপা তাঁর চিত্তে সুদৃঢ় হয়েছে। ভারতবর্ষ, তথা বাঙালি জাতির মর্মস্থিত ধর্মালুতা ও আত্যন্তিক কৃষ্ণ-নিষ্ঠা গিরিশের মর্ম সম্পদ হয়ে উঠেছে ঃ—

"এক নামে মুক্তি পায় নরে,
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভবসাগর গোষ্পদ সমান তার।"

জনার বিদূষকের এই উক্তি আসলে ভক্ত গিরিশের মর্মবাণী। অন্যত্র বিদূষক বলেছে, "যদি ঐহিক সুখ চাও তো হরিনাম যেথা হয়, সেথা কানে আঙুল দাও, আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ ধরে বনবাসে যান্, হরি ভবনদীর কান্ডারী কি না!"

বস্তুতঃ সমগ্র নাটকে এই ভাবোদ্বেল প্রত্যয়কে রূপমূর্তি দেবার সাধনা করেছেন শিল্পী। ফলে, জনা ও স-রাজ্য নীলধ্বজের সংঘাতে,—বিদ্রোহিণী বীরাঙ্গনা ও বীর-জননীর উত্তপ্ত জ্বালার সংগে গতানুগতিক ভক্তি ও প্রত্যয়ের প্রতিস্পর্ধিতায় যে নাট্যতরঙ্গ আবর্তিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, তার সবটুকুই মিলিয়ে গেছে ভাবোচ্ছ্বাসের অপ্রতিহত স্রোতে। মধুসূদনের প্রস্তুতি এবং সেক্‌স্‌পীয়রের পূর্বাদর্শ লুপ্ত হয়েছে ভক্তি প্রবাহের যাত্রা সমুচিত উদ্বেলতায়। তাতেও গিরিশচন্দ্রের তৃপ্তি নেই। জাতির মর্মাশ্রয় করার উৎসাহে নাট্যদেহের পঞ্চাঙ্ক রূপ-সীমাকে পর্যন্ত তিনি অস্বীকার করেছেন। পঞ্চমাঙ্কের পরিসমাপ্তিতে ট্রাজেডির খুব দুর্বল সুর লেগেছিল গঙ্গাবক্ষে জনার আত্মবিসর্জনে!

কিন্তু, পঞ্চম অঙ্কের এই করুণা-বিষাদপূর্ণ পরিণতির শেষে ষষ্ঠ আর এক 'ক্রোড় অঙ্কের' অবতারণা করেছিলেন শিল্পী। তাতে, অগ্নির শক্তিতে উদ্বোধিত-চেতন নীলধ্বজ জনা ও প্রবীরের পরমাপরিণতি প্রত্যক্ষ করে আবেগে উদ্বেল, ভক্তি ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়েছেন।

এমন পরিবেশে, ভাব্‌তে বিস্ময় লাগে,—শিল্পী যেন গোটা পাঁচটি অঙ্কে ব্যাপ্ত করে য়ুরোপীয় নাট্যকলা ও পঞ্চাঙ্ক নাট্যদেহকে গড়ে তুলে-

ছিলেন পরিণামী ষষ্ঠ অঙ্কে সব কিছুকে ভেঙে বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে। নাট্যশিল্পের সু-গঠন ভেসে গেছে হরিভক্তির উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের মুখে। তাতে জাতীয় দর্শক দলের মতই শিল্পীর আত্মারও যেন তৃপ্তি ঘটেছে। আর কেবল ঐ নাট্য পরিণামেই নয়, আগাগোড়া প্লট্-এর বিস্তারে মূল ঘটনা সংঘাত, তথা জনা চরিত্রের ট্রাজিক সম্ভাবনার সংহতি বারে বারে শিথিল বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে, হরিভক্তির পৌনঃপুনিক আত্মপ্রকাশে। তাও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভক্তি-চিত্র বিদূষক-জীবন-বিলম্বী হয়ে লঘুতার সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক হাস্যরস সৃষ্টির গতানুগতিক মাধ্যম। আলংকারিক এই চরিত্রের সাধারণ স্বভাবধর্ম বিবৃত করে বলেছেন,—

"কুসুম বসন্তাদ্যাভিধঃ কর্মবপুর্বেষভাষদ্যৈঃ
হাস্য প্রিয়ঃ কলহরতি স্যাৎ বিদূষকঃ স্বকর্মজ্ঞঃ।"১

স্বকর্ম বল্‌তে সাধারণভাবে উদরতোষণ-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, নামকরণ (ক্লীবলিঙ্গ শব্দে পুরুষের নামকরণ হাস্যকর) থেকে আচার আচরণ অঙ্গ-ভঙ্গী সব কিছুতেই স্থূল ভাঁড়ামির মধ্য দিয়ে অট্টহাস্যের সঞ্চারই বিদূষকের স্বভাবধর্ম বলে কল্পিত হয়েছে। গিরিশ-চন্দ্রের বিদূষক চরিত্রে এ আলঙ্কারিক গুণাবলীর সংগে যুক্ত হয়েছে "প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের" লক্ষণ। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এম্‌নি একটি বাহ্যোন্মাদ অন্তঃসাধু মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভক্ত গিরিশ;—নিজের মহাপুরুষ লক্ষণকে খ্যাপামি-র অন্তরালে সংহরণ করে রাখতেন পরম-হংসদেব। বিদূষক চরিত্রে সেই পরমজ্ঞানী ভক্ত-প্রবরের মহিমাঙ্কন করেছেন গিরিশ প্রচ্ছন্ন লঘুতার অন্তরালে। কিন্তু লঘু চরিত্রই একাধারে ভক্তচরিত্ররূপেও পরিকল্পিত হওয়ায় ভক্তি-চিত্রণে গভীরভাবাত্মক রস-ঘনতা জমে উঠ্‌তে পারে নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে পঞ্চম অঙ্কে বিদূষক ও বিদূষক-পত্নীর সংলাপাংশ একটু তুলে দেওয়া যেতে পারে। পাছে হরিদর্শন ও মোক্ষলাভ ঘটে যায়, তাই বিদূষক নিজের দুটি চোখ বেঁধে রেখেছেন। তাঁর ব্রাহ্মণী তখন বল্‌ছেন ঃ—

"ওঃ! হরি এসে তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্‌নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মিন্‌ষের বায়ুত্তরে ধরেছে।"

বিদূষক। "আরে থাম্‌ থাম্‌, ওরে জানিস নে, ডাকলেই এসে উঁকি মারে।"

ব্রাহ্মণী। "উনি ভুলে কৃষ্ণ নাম মুখে আনেন না। কত যোগী ঋষিরা গাছের পাতা খেয়ে ধ্যান করে কিছু করতে পারে না, আর উনি হরির দেখা পাবেন।"

১। সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ।

বিদূষক। "আরে রেখে দে তোর ধ্যান, জপ! ও নামের ঠেলা জানিস্ নে!"

ব্রাহ্মণী। "তা তোমার কি, তুমি ত ভুলেও নাম কর না।"

বিদূষক। "আরে ঝক্‌মারি করে ফেলেছি বই কি? তোর মনে নেই, সেই যেদিন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য মোণ্ডা তুলে রাখ্‌লি, আমায় খেতে দিলে নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম, 'দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বাম্‌নীর হাতের খাড়ু খোল', সেই অবধি আমার গা ছম্‌ছমানি একদিনের তরে যায় নি।"

এই সংলাপ-অংশে, বিশেষ করে, বিদূষকের শেষ উক্তিতে বিদূষক চরিত্রের আলংকারিক গুণাবলী স্বভাবসিদ্ধ লঘু ভাঁড়ামির সংগে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। সে সংগে "এক নামে মুক্তি" এই অসংশয়িত প্রত্যয়ও স্পষ্ট ব্যঞ্জনা পেয়েছে। কিন্তু, প্রথমটির অতি ব্যাপ্তি ও শিথিল স্বভাবের দরুণ দ্বিতীয়টির আবেদন-গভীরতা নিজের যথার্থ মূল্য হারিয়েছে। এদিক্ থেকে সেক্‌স্‌পীয়র, তথা প্রতীচ্য নাট্যাদর্শের অনুমতে গিরিশচন্দ্রের এই রচনাশৈলীকে Melodrama বল্‌তে হয়। এই ধরণের সৃষ্টির স্বভাব নির্দেশ করে বলা হয়েছে,—"Derived from the Greek 'a song', it [Melodrama] orginally signified only a serious drama where in a number of lyrics were introduced, becoming in some respects ejuivalent to opera......With the operatic tendencies of the eighteenth century, however melodrama, as distinguished from tragedy tended to become increasingly more sensational, neglecting the characterisation of the true tragic spirit for the sake of mere effect. Song, show & incident became the prevailing characteristic in it."২

গিরিশ-নাট্যে Melodrama-র ধর্ম

সর্বপ্রসঙ্গ বহির্ভূত ভক্তি-প্রসঙ্গ, তথা যে-কোনো উপলক্ষ্যে ভক্তি-প্রসঙ্গকে আবেগ বিগলিত রূপদান করাই গিরিশ নাট্য স্বভাবের বিশিষ্টতা ছিল। এদিক্ থেকে প্রতীচ্য Melodrama ধর্মী রচনার জন্যই তিনি ছিলেন উনিশ-শতকের বাংলায় নাট্যকার শ্রেষ্ঠ।

আলোচনা দীর্ঘায়ত করে লাভ নেই। 'জনা'র শিল্প-প্রকৃতিই গিরিশ-রচনার সর্বাতিগ,—সর্বসাধারণ লক্ষণ, কেবল এই সিদ্ধান্তের পরিপোষকতার চেষ্টায় আরো একটি-দুটি বিভিন্ন বিষয়াশ্রিত নাটকের পরিচয় সন্ধান করা যেতে পারে। পাণ্ডব গৌরব (১৮৯৯) এই শ্রেণীর আর একটি নাটক,—

১। Theory of Drama—Allardyce Nicoll.

যেখানে নাটকীয় সংঘাত রচনার সম্ভাবনা উত্তুঙ্গতম হয়েছিল। দুই বিপক্ষ সংগ্রামী দলে সারা ভারতের ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর তার পরিণামে অষ্টবজ্র সম্মিলন এক অ-পূর্ব নাট্য প্রাচুর্যময় কাহিনী। কিন্তু প্লট্-এর বিন্যাসে যেমন, তেম্নি ভক্তিপ্লুত প্রসঙ্গের আতিশয্যে সে সম্ভাবনা চূড়ান্ত পর্যুদস্ত হয়েছে। নাটকের অ-পরিহার্য উপাদান সমূহের বিচার প্রসঙ্গে প্রতীচ্য নাট্যতাত্ত্বিক দাবি করেছেন,—"A drama........is also inconceivable without essential basis of carefully conceived situations designed (unlike the situations necessary for narrative fiction) to arouse and stimulate and startle by their strangeness, their peculiarity or their unconventionality."১

পান্ডব গৌরব

গিরিশচন্দ্রের অপরাপর নাটকের মত পান্ডবগৌরব-এও ঘটনার সংহত-চকিত আকস্মিকতার অপরিহার্য নাট্য উপাদান অ-লভ্য। বরং, সাধারণ বিবৃতিমূলক (narrative) রচনার মত গল্পের পরিণাম প্রায় প্রথম থেকেই জানা হয়ে যায়। একেবারে প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কেই নারদের সমাপ্তিক উক্তিতে অষ্টবজ্র সম্মিলন প্রসঙ্গে উর্বশীর মুক্তি-কথার পূর্ব সংকেত সংশয়াতীত প্রাঞ্জলতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অপরাপর গর্ভাঙ্কের অগ্রসৃতির মধ্যে প্রথম অঙ্কের ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর প্রত্যয়ের আকার ধরেছে। ফলে, প্রথম অঙ্ক শেষে প্লট্-এর সমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো উৎকণ্ঠা বা কৌতূহল, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

অবশ্য তারপরেও কেবলই ঘটনা আর সংঘাতকে তুঙ্গায়িত করবার ব্যর্থ প্রয়াস অতি বিস্তারিত হয়ে ফিরেছে গোটা নাটকে। গোটা গল্পটি নিঃশেষে ফাঁপিয়ে তোলার এই চেষ্টা যেমন অপ্রয়োজনীয় তেম্নি তার প্রকাশও হয়েছে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ। সব কিছু মিলে মনে হয় আগাগোড়া নাট্যাকৃতিতে ছড়িয়ে আছে সেক্স্পীয়রকে অনুকরণ করবার ব্যর্থ প্রয়াস। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র নাকি কোনো অন্তরঙ্গ পর্ষদকে বলেছিলেন, "মহাকবি সেক্স্পীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। তবে যেন আমার নিজেরও একটা স্বাধীন ভাব আছে।২ প্রতিভার এই দ্বৈধ গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাটকীয়তাকে জমে উঠ্তে দেয় নি। তাঁর অপরাপর নাটকের মত পান্ডবগৌরবেও অকারণ ঘটনা বিস্তারের নির্জীব বর্ণনামূলক সৃজন ধারায় প্রাণধর্মের একমাত্র সঞ্চার ঘটেছিল আবেগাত্মক ভক্তিরসের সিঞ্চনে। পরন্তু, কৃষ্ণভক্তির একমাত্র সম্বল নিয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ভীমসেনের আপাত কৃষ্ণ বিরোধিতা ও বিজয় কথা লীলাচতুর ভাগবতধর্মে অতি

১। ঐ।
২। গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন।

বিশ্বাসী বাঙালির চেতনায় এক চমৎকার স্বাদুতার সঞ্চার করে। ভীমসেনের ব্যাজস্তুতি ভরা কৃষ্ণবন্দনায় এই চমৎকার রসের মধুর অভিব্যক্তি রয়েছে ঃ—

"অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল;
তুমি লজ্জাহীন, তোমারে কি লজ্জা দিব!"

অপর আর এক পক্ষে কঞ্চুকী চরিত্রে কৌতুক-সহাস মাহাত্ম্যের চিত্রণ নাটকের মূলগত ভক্তিস্নিগ্ধতাকে নতুন কৌতূহলে চকিত করেছে। পান্ডব গৌরবের কঞ্চুকী একাধারে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কঞ্চুকী, বিদূষক ও গিরিশ-কল্পিত স্বভাব-সিদ্ধ প্রচ্ছন্ন ভক্ত মহাপুরুষ। কঞ্চুকীর স্বভাব পরিচায়ন উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে ঃ—

"অন্তঃ পুরচরঃ বৃদ্ধঃ বিপ্রগুণ-সমন্বিতঃ
সর্বকার্যেষু কুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।"

তার সংগে বিদূষক চরিত্রের হাস্য-কৌশল যুক্ত হয়েছে পান্ডব গৌরবের কঞ্চুকী চরিত্রে। সবার উপরে রয়েছে ভক্তি সমুত্থ কৃষ্ণ-প্রেম-স্নিগ্ধতার সুমহৎ উদাত্ততা ঃ—

"প্রভুভক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ
পাইয়াছে ভক্তাধীনে প্রভুভক্তি বলে।"

এই চরিত্রকে আশ্রয় করে অনন্য প্রভুভক্তির সংগে "শুদ্ধাভক্তির" বৈষ্ণবীয় স্বভাবের সংযোগও আভাসিত হয়েছে। কেবল আবেগ বা ভক্তি-সমুচ্ছ্বাস নয়, সহজবোধ্য আকারে ভাগবত তত্ত্ব প্রকটনের প্রতিও গিরিশ-চন্দ্রের সচেতনতা ছিল অতন্দ্র। প্রবীণ নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী "আমাদের জাতীয় নাট্যরীতি" তথা যাত্রাশৈলীর বিশিষ্টতার উপাদান হিসেবে "তত্ত্ব, সংগীত-প্রাধান্য, গানের দল (chorus)"[১] ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রয়াস,—বিশেষ করে তাঁর পৌরাণিক নাট্যাবলী এই জাতীয় রীতিকেই যুগোচিত প্রতিষ্ঠা দিয়েছে প্রতীচ্য রীতিসিদ্ধ বহিরঙ্গের আধারে।

ঠিক পৌরাণিক না হলেও জীবনীসমাশ্রিত ভক্তিমূলক সৃষ্টি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৮৮৬) নাটকে প্রতীচ্যানুসরণের প্রয়াস অপেক্ষাকৃত স্তিমিত। হয়ত এই কারণেই, গিরিশচন্দ্রের স্বতঃসিদ্ধ নাট্যস্বভাব এতে স্ফুটতর। এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর শিল্পি-

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

ব্যক্তিত্বকে নাটকের সৃজনভূমি থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি; যদিও শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা সফল নাট্যশৈলীর প্রধানতম উপাদান। আর গিরিশ ব্যক্তিত্বের

১। বাংলা নাট্য বিবর্ধনে—গিরিশচন্দ্র।

মূলে ছিল পরস্পর বিরোধী প্রবণতার দ্বৈধ। প্রথম জীবনে মদ্যপান ও অবৈধ সংসক্তি তাঁর স্বভাবে শৃঙ্খলার মূল ভিত্তিটি পর্যন্ত বিচূর্ণ করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর আবেগ-স্বভাব চৈতন্য যখন ধর্মানুরক্তির প্রবণতায় অতিস্ফীত হয়েছে, তখনও চারিত্রিক শৃঙ্খলার অভাব গিরিশচন্দ্রকে চির-আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বকলমা' দেবার মূলেও আছে ঐ একই কথা। দিনান্তে একটিবারও যে-কোনো সময়ে ইষ্ট স্মরণ করতে পারবেন, অতটুকু আত্মস্থতার ভরসাও নিজের সম্বন্ধে ছিল না গিরিশের;—অথচ, তখন তিনি পরমহংসদেবের ভক্তিতদ্গত শিষ্য।[১] অনুগতকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে অপার কৃপায় গুরু তখন উচ্ছৃঙ্খল শিষ্যের সকল 'ভার' গ্রহণ করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গ দীর্ঘ করে লাভ নেই। কিন্তু, পরম ধর্মান্বিত-চেতনার মধ্যেও গিরিশের অভিজ্ঞতার জীবনের ক্লেদ-ক্লিন্ন গলির স্মৃতি কখনো দূরগত হয় নি। তাঁর পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক নাট্যাবলীতেও এই পরস্পর বিরোধী জীবনানুভবের দ্বৈধ বিমোচিত হতে পারে নি।

জনা বা পাণ্ডবগৌরবের মত নাটকে পৌরাণিক ঐতিহ্য-মহিমা, তত্ত্ব-ব্যাখ্যা, ও ভক্তি ভাবালুতায় উদাত্ত প্লট্-এর সমান্তরালভালে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গাদূত, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী, সপত্নীক বিদূষক প্রভৃতির একান্ত স্থূল, বাস্তবানুগ, তরল উপকাহিনী। ফলে, বাস্তব অভিজ্ঞতা বা আদর্শ ভাবালুতা, কোনোটিই নাট্যদেহে পুরোপুরি দানা বাঁধতে পারে নি। পরস্পর-বিরোধী ঘটনার অভিঘাতে একে অপরের রস-প্রভাবকে শিথিল করেছে। এই ভাব দ্বৈধ জনিত শিথিলতা তীব্র হয়েছে বিল্বমঙ্গল-এর নাট্য দেহে। এই কাহিনীর সূচনা বিল্বমঙ্গলের বারবণিতাসক্তিতে, পরিণতি সকল পাত্র-পাত্রীর অধ্যাত্ম চরিতার্থতা লাভে। অতএব, প্লট-এর মূলেই রয়েছে পরস্পর-বিপরীত দুটি উপাদান সমাবেশের নাটকীয় সম্ভাবনা। এ-কাহিনী গিরিশের মৌলিক সৃষ্টি নয়, 'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে নেওয়া। কিন্তু, স্রষ্টার রচনা-প্রভাবে এর নাটকীয় সংঘাত-সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। প্রথমে, রাত্রিযোগে নদীপার হয়ে বারবণিতালয়ে যাবার প্রয়াসের মধ্যেই কেবল যা-কিছু নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল। তাও, পরবর্তী আবেগ এবং উল্লসিত বাগ্‌ভঙ্গির আতিশয্যে বিলুপ্ত হয়েছে। ভাববিহ্বল বিল্বমঙ্গল, পর-মার্থিক উন্মাদনাময়ী পাগলিনী, স-পত্নী সোমদেব, এমন কি প্রেমতাপিতা চিন্তামণি সবাই মিলে অতি-উচ্ছ্বসিত অধ্যাত্মভাবুকতায় এক অতি-নাটকীয় melodrama-র সম্ভাবনা ঘনীভূত করে তুলতে পারত। কিন্তু, সে-পথেও বাদ সেধেছে চিন্তামণি-সহচরী এবং চোর-ধূর্তের অতি-অমার্জিত, অশালীন-তরল সংলাপ ও ক্রিয়াকলাপে। এমন কি পাগ্‌লির বহির্লঘু,

---

১। দ্রষ্টব্য—গিরিশ-প্রতিভা।

অন্তর-গভীর বাগ্‌ভঙ্গিও নাটকে অধ্যাত্ম ভাবনাকে ঘনতর না করে বরং প্রকাশ্যতঃ-ই লঘু করেছে। অন্যপক্ষে, বিল্বমঙ্গলের সর্পাবলম্বনে চিন্তামণি গৃহে প্রবেশ, বণিক-পত্নী-লঙ্ঘন সম্ভাবনা, চোর-ধূর্ত সংবাদ ইত্যাদি দৃশ্যে নাটকীয় সিচুয়েশন সৃষ্টির চেষ্টাকৃত প্রয়াস-ও ভাব-পিনদ্ধতাকে অতিব্যাপ্ত শিথিলতায় তরল করেছে।

অর্থাৎ, একদিকে "মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের আদর্শ" প্রভাব, আর এক দিকে 'নিজের স্বাধীন' ভাবাবেগ-তীব্র যাত্রাধর্মী সৃজন-বাসনা,—এই দুয়ের পরস্পর বিরোধিতায় এ-কূল, ও-কূল দুকূলই হারিয়েছে গিরিশচন্দ্রের নাট্যশৈলী।

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এবারে পারিবারিক ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ক নাটকেও একই রচনাশৈলীর,—একই ধরণের সার্থকতা ব্যর্থতার সন্ধান করে বক্তব্য শেষ করা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক-সামাজিক নাটকের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ্য প্রফুল্ল (১৮৯১)। এই শ্রেণীর নাটকে হরিকথার আবেগ-উচ্ছলতা রচনার অবকাশ নেই। তাই, এই নাট্যদেহে গিরিশচন্দ্র একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে সেক্‌স্‌পীয়রীয় অঙ্গসজ্জা নিবদ্ধ করেছেন। তাতে কেবল,—(১) প্রারম্ভিক ঘটনা, (২) উত্থায়মান ঘটনা, (৩) ক্রান্তি লগ্ন, (৪) পতনশীল ঘটনা এবং (৫) সমাপ্তি,—সেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যাঙ্গিকের এই কাহিনী সংস্থাপনের রীতিই অনুসৃত হয় নি; মূল প্লট্‌-এ হত্যা-ষড়যন্ত্র-মৃত্যুর বান বয়ে গেছে যেন,—এখানেও সেক্‌স্‌পীয়রের শিল্পশৈলীর অনুসরণে তাঁকে যেন অতিক্রম করাই হয়েছে বেশি। কিন্তু, রোমাণ্টিক্‌ ঐতিহাসিক নাটক আর পারিবারিক নাট্য কাহিনীর মূল জীবনবাচ্যেই আগাগোড়া তফাৎ রয়েছে, গিরিশচন্দ্র একথা অনুভব করেন নি।

সামাজিক নাটকে প্রফুল্ল

রাজ্য ভাঙাগড়ার কঠিন ইতিহাসে অসূয়া, দুরভিসন্ধি, যুদ্ধ, হত্যা, নিপীড়নের রক্তগঙ্গা-প্রবাহ স্বাভাবিক। কিন্তু, পারিবারিক জীবন-ভূমিতে স্নেহমমতার স্বচ্ছতোয়া যেখানে নিত্য-প্রবাহিত, সেখানে অকল্পিত সামান্য ঘটনা বা অনুভাবনাও হৃদয়ের রক্তধারাকে উৎসারিত করে;—সচেতন দুর্ঘটনার বিনা স্পর্শেও সহজবাহিত হৃদয়-গঙ্গাকে রক্ত পঙ্কিল করে তোলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইব্‌সেন্‌-এর **A Doll's House**-এর শরণ নেওয়া যেতে পারে। চরম মুহূর্তের বিক্ষুব্ধ আশংকায় নোরা-র স্বামী তার 'পরে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। আকস্মিক দুর্যোগ-সম্ভাবনা প্রশান্ত হয়ে গেলে অনুশোচনা-তপ্ত হৃদয়ের আকুলতা নিয়ে নোরাকে সে আবার আহবান করেছে গার্হস্থ্যের কল্যাণস্নিগ্ধ ভূমিকায়। আপাত দৃষ্টিতে **Doll's House**-এর পরিণামী সংঘাত 'দাম্পত্য-কলহ'মাত্র,— এবং

'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া'তেই হতে পারত এর জ্ঞানিজন-নির্দেশিত পরিণতি। কিন্তু, মুহূর্তের ঐ বিক্ষোভের দর্পণে দীর্ঘদিন পরে স্বামীর গার্হস্থ্যে নিজের যথার্থ আসনটি প্রত্যক্ষ করতে পারে 'নোরা';—তাই, ভাঙা সংসার আর যোড়া লাগ্‌ল না। Doll's House-এর ট্র্যাজিক পরিণতির মূলে রয়েছে আপাত-ক্ষণিক দাম্পত্য কলহ,—কিন্তু পারিবারিক নাটকের সূক্ষ্ম জীবনতন্ত্রীতে এই আঘাতই হয়েছিল অমোঘ। এমন পরিবেশে জাতি ও রাজ্য-ধ্বংসী হত্যাদি ঘটনার অবতারণা 'মশা মারতে কামান দাগা'র মত নিরর্থকই কেবল হত না,—হত একান্ত রস-বিরোধী,—অসংগত।

'প্রফুল্ল' নাটকে আসলে তাই ঘটেছে। অত দুর্ঘটনা, ষড়যন্ত্র আর পৈশাচিকতায় রস-চেতনা যখন ক্লান্ত হতে থাকে, তখন কেবলই মনে হয়, —অতসব মহামারী কাণ্ডের সত্যিই প্রয়োজন ছিল কী কিছু! ভাল মন্দ সকল রকমের কাজের পেছনেই কিছু না কিছু কারণ থাকেই থাকে। কারণহীন কার্যের প্রেরণা প্রায়ই আসে উন্মত্ততা থেকে। রমেশ কী পাগল? যোগেশের মত দাদা যার,—চাইলেই ত সকল সম্পত্তির অনায়াস অধিকার পেতে পারত সে। নাটকের প্রতিটি আঘাত প্রতিঘাতের মুখো-মুখি হবার অপেক্ষা রাখে; তা না হলে নাট্য-সংঘাত,—নাটকের প্রাণবস্তু জমে ওঠে না। প্রফুল্ল নাটকের বহিরঙ্গের ক্লান্তিকর দুর্ঘটনাকে ছাপিয়ে অন্তরঙ্গে কেবলই জমে ওঠে সংঘাতহীন নিষ্প্রাণতা আর একঘেঁয়েমির ভার। কার বিরুদ্ধে অত নিরন্তর পৈশাচিক প্রয়াস,—বড়ভাই যোগেশ প্রথমে স্নেহান্ধ, পরে মাতাল; মা আর বৌদি কেবল স্নেহ করতে জানে,—তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্বুদ্ধি আর দুরভিসন্ধির এই খেলা নিরর্থক; সুরেশ নির্বোধ আদর্শবাদী। আশ্চর্য মনে হয়, রমেশ কেবল চক্রান্ত আর পৈশাচিক বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে প্রফুল্লকেও গলা টিপে মেরেছে। ট্র্যাজিক চরিত্রা-বলী ত বটেই, এমন কি 'ভিলেন্'-চরিত্রেও একঘেঁয়ে দুষ্কর্মসাধনের পেছনে কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থবুদ্ধি থাকে। কিন্তু,—রমেশের পৈশাচিকতা কার জন্যে! জাল, হত্যা, প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, কোনো কিছুর ঝুঁকি না নিয়েই যে সম্পত্তির অধিকার অনায়াসে পেতে পারত,—সেখানে অগ্রজকে মদ্যাসক্ত করে, ছোটভাইকে কারাগারে পাঠিয়ে, মা বৌদি-ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চনা করে রমেশ কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিল?—নিজের স্ত্রীকেও হত্যা করে, কাকে নিয়ে চরিতার্থ হতে চেয়েছিল সে?

আগাগোড়া নাটকে, মনে হয়, অপ্রতিরোধ্য দুষ্কর্মের একঘেঁয়ে ধারা বয়ে চলেছে অকারণে। কেবল, হত্যার জন্যেই হত্যা, বিনা কারণে জাল-জোচ্চুরি ষড়যন্ত্রের নারকীয়তা চলতে থাকে। শিল্পী অবশ্য রমেশকেও ট্র্যাজিক নায়ক বলে আঁকতে চেয়েছেন। তার মধ্যে মস্ত প্রতিভার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু, কেবলই পাপের পথে চলে চলে নিজেকে নষ্ট করে দিল

রমেশ।—কারণ,—মৃত্যুকালে প্রফুল্ল বলেছে,—"তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখনো আপন করো নি।" কাউকে আপন করতে না পেরে, তথা, আপন আত্মাকে প্রসারিত করতে না পারার ব্যর্থতার মধ্যে রমেশ নিজেকে, —নিজের মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভাকে ডুবিয়ে মেরেছে।

কিন্তু, কেবল ঐটুকুতেই ট্রাজেডি-সমুচিত অনুভাবনার জন্ম সম্ভব হয় না। Allardyce Nicoll বলেছেন,—"There is always something stern and majestic about the highest tragic art."১ কিন্তু, রমেশকে majestic বল্‌ব কি করে? যোগেশ সম্বন্ধেও একই কথা। ট্রাজিক চেতনার জন্ম প্রসঙ্গে Nicoll "Feeling of nobility and grandeur"-এর কথা উল্লেখ করেছেন। যোগেশকেও "grand" বলি কি করে?—শেষ পর্যন্ত 'noble'-ও বলা চলে কী? আসলে, প্রফুল্লর মৃত্যু বীভৎস, রমেশের পরিণাম বিরক্তিকর,—আর বাকি চরিত্রগুলো কিছু কারুণ্যে, কিছু বীভৎসতায় বিমিশ্র।

ভয়াবহ ঘটনাস্রোতের পৌনঃপুনিকতা জনিত শিথিলতা, আর একঘেঁয়েমির মধ্যে সামাজিক-পারিবারিক নাটকেও গিরিশের স্বভাববৈশিষ্ট্য সমান প্রকাশ পেয়েছে। পৌরাণিক নাটকের প্রসঙ্গে বলেছি, গিরিশ প্রতিভার সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আবেগ প্রধান আদর্শবাদ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যায়। এই নাটকের বিষাদান্ত পরিণতির দ্বারা যোগেশচরিত্রেই প্রধান তত্ত্বগুলি প্রকটিত হয়েছে।—"প্রথম সুরাপানের ভীষণ পরিণাম,—দ্বিতীয়—সংসারের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে শুধু নাম-যশঃ-প্রতিষ্ঠাকামী ঈশ্বরে আস্থাহীন কর্মময় নৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড কত দুর্বল,—তৃতীয়—দুর্বলতার প্রশ্রয় দিলে মানুষ দিন দিন অধঃপতনের চরমসীমায় কেমন করিয়া পতিত হয়।"২ অপর পক্ষে এ যেমন মানবিক দুর্বলতার ছবি,—তেম্‌নি অস্খলিত আদর্শ সাধনার মূর্ত রূপ রয়েছে প্রফুল্ল চরিত্রে,—তার "আত্মবলিদান,—পিশাচ স্বামীর জন্য এই গভীর অনুভূতি এবং তাহার প্রতি অকপট উদার প্রেম, এমন কি, মৃত্যুকালেও হত্যাকারী স্বামীর অপরাধ-ক্ষমার জন্য জগদীশ্বরের নিকট তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা—অনুপম। ইহা প্রেমের মহান পবিত্র আদর্শ,—জগতের চিরবরণীয়।"৩

আবেগাত্মক জীবন-কল্পনা,—শিথিল ভাবাতিশায়ী ঘটনাবিন্যাস এবং তত্ত্বপ্রতিপাদনের আকাঙ্ক্ষা,—সব কিছু মিলে প্রফুল্ল-ও যাত্রা স্বভাবিত Melodrama হয়ে উঠেছে। গিরিশের স্বতন্ত্র শিল্পধর্মের হয়েছে জয়।

আলোচনা দীর্ঘতর করে লাভ নেই, মায়াবসান (১৮৯৭), বলিদান

১। Theory of Drama.
২। গিরিশচন্দ্র—কুমুদবন্ধু সেন।
৩। ঐ।

(১৯০৫) ইত্যাদি সকল পারিবারিক সামাজিক নাটকেই এই শিল্পশৈলী অনুসৃত হয়েছে।

এবার ঐতিহাসিক নাটকের কথা। আগে দেখেছি, গিরিশচন্দ্রের প্রথম উল্লেখ্য নাট্যরচনা আনন্দরহো ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল। কিন্তু, সে রচনা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয় নি। এর পরে গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটক লিখ্‌লেন, বহুদিন পরে,—১৯০৫ ইংরেজি সনে। বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তা যজ্ঞের জন্মলগ্নে তখন প্রথম তুর্যনিনাদ ধ্বনিত হয়েছে; বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐটি প্রথম বছর। স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে সর্বস্ব সমর্পণের উন্মাদনা তখন আপামর বাঙালির রক্তে ফুট্‌ছিল। ঐ প্রেরণারই বশে স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব,—ইংরেজ ঐতিহাসিকদের হাতে কুৎসা-কণ্টকিত সিরাজদ্দৌলার নতুন দেশভক্তরূপ আবিষ্কার করলেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। একদিনকার স্বৈরাচারী, পরদারলোলুপ, অস্থিত-চিত্ত তরুণ সিরাজ নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার আদর্শ বিগ্রহে পরিণত হলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নবপর্যায়ের প্রথম ঐতিহাসিক নাটকে এই জাতীয় সশ্রদ্ধ-চিত্ততাকেই প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন, গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' অক্ষয়কুমারের রচনার "অ-পরতন্ত্রভাবেই" রচিত হয়েছিল।[১] এ-বিষয়ে ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে এবং স্বয়ং গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাটকের ভূমিকায় একাধিক আকর গ্রন্থালোচনার কথা বলেছেন।

সিরাজদ্দৌলা

যাই হোক্, এই প্রসঙ্গে গিরিশের রচনার শিল্প-প্রকৃতিই প্রধান আলোচ্য। আর, সে ক্ষেত্রে শিল্পী "জাতির মর্মাশ্রয়" করার মৌলিক-নীতিই অনুসরণ করেছেন নতুন প্রেক্ষিতে। অর্থাৎ, সিরাজদ্দৌলার নব-পরিচয়কে আশ্রয় করে সেকালের বিপ্লবী বাংলায় যে আবেগ প্রবাহ স্ফীত হয়ে উঠেছিল, তাকেই এক-কেন্দ্রিত পরিপুঞ্জিত রূপ দিলেন শিল্পী তাঁর নাটকে। এ-প্রসঙ্গে সেকালের জাতীয় উদ্বেলতাকে প্রামাণ্য রূপ দেবার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নাটকে এই প্রচেষ্টার দ্বিবিধ প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করি। প্রথমতঃ সিরাজদ্দৌলার সুকীর্তি ও স্বদেশ-সর্বস্বতা সম্বন্ধে সংশয়াতীত তথ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে গোটা নাটকের প্লট্-এ। দ্বিতীয়, যে-সব ক্ষেত্রে সিরাজের চারিত্র-দুর্বলতা অনির্মোচনীয়, সেখানে তার স্বাভাবিকতা ও সংগতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে,—মূল কাহিনীকে অতি বিস্তারিত করেও। দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে,—সিরাজ চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শন হিসেবে 'ফৈজী'-হত্যার কাহিনী প্রতীচ্য ইতিহাসে বহুল কীর্তিত হয়েছে। যুবরাজ সিরাজ-এর গণিকা-প্রণয়িণী

১। দ্রষ্টব্য ঃ—গিরিশ-প্রতিভা।

ছিল এই ফৈজী। এই ঘটনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের নব-পরিচয় নাটকে উল্লিখিত হয়েছে মীরজাফর ও 'করিমচাচা'র সংলাপেঃ—

"মীরজাফর। ফৈজী, আহা অবলা স্ত্রীলোক, তারে দ্যালে গেঁথে মেরে ফেল্‌লে, এমন নিষ্ঠুরও জন্মায়।

করিমচাচা। চাচা, তোমার কি কোমল প্রাণ দেখ্‌চি, তুমি চাচীর পার্শ্বে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পার। চাচা, একবার চোখ খুলে কথা কও, ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিল, চক্ষের উপর জোড়াগাঁথা দেখ্‌লে। তারপরে ফৈজীবেটি মেছুনীর অধম, মা তুলে গাল দিলে—নবাববাচ্ছা, অত বেইমানি বরদাস্ত হবে কেন? ও তো ছোঁড়া বয়সে দ্যালে গেঁথে মেরেছে, তুমি হলে এই বুড়ো বয়সে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে।"

সিরাজ চরিত্রের আর একটি বহু আলোচিত কলঙ্ক হোসেন কুলীর হত্যা,—সেও সিরাজের অপরিণত বয়সের ঘটনা। কিন্তু, ইতিহাসের চেয়ে নাটকের পক্ষেই এই ঘটনার মূল্য সবচেয়ে বেশি। কারণ, গোটা নাটকের সম্ভব-অসম্ভব সকল ঘটনা ও পরিণতির কেন্দ্র-শক্তি ছিল এই হোসেন-কুলীরই বিধবা,—জহরা।

হোসেনকুলী সিরাজের শিক্ষক ছিলেন। এই হত্যা প্রসঙ্গে করিম চাচা মানিকচাঁদকে বলেছিল,—"চাচা সকলের তো তোমার মত 'বরদাস্ত' নয়। আলেফ্‌ বে পে তে ছে পড়িয়ে, অন্দরে ঢুকে মা মাসীর মাঝে গিয়ে বস্‌বেন। বেকুফ্‌ নবাব বরদাস্ত করতে পারে নাই।"

সন্দেহ নেই, এই সব ব্যাখ্যানের মাধ্যমে সিরাজ চরিত্রের অকারণ-দুর্নৈতিকতা ও যথেচ্ছাচারের কলঙ্ক মোচিত হয়েছে,—সিরাজের অস্বাভাবিক জীবন-পরিবেশের সচেতনা, তার ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি জাগিয়েছে মানবিক সহৃদয়তা। তাহলেও, এই ধরণের তথ্য ও ব্যাখ্যাদির অতি-বিস্তারে নাটকীয় আঙ্গিকের সংহতি, তথা নাট্য রসের পিনদ্ধতা শিথিল হয়েছে। কিন্তু, মনে হয়, বিশুদ্ধ নাট্যরস পরিবেশন, তথা নিছক নাট্যশিল্পের জন্যেই গিরিশচন্দ্র কখনো হয়ত নাটক রচনা করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাকি গিরিশকে বলেছিলেন,—"তুমি যা কচ্চো তাই করো, ওতে-ও অনেক কাজ হবে, লোকশিক্ষা হবে।" অন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবোত্তর গিরিশ-নাট্য-প্রবাহে এই 'লোকশিক্ষা'র প্রণোদনা ছিল বিশুদ্ধ শিল্প সৃষ্টির চেয়েও মুখ্য।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের ভূমিকাতেও শিল্পীর এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রয়েছে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, সিরাজ-জীবনের যে পরিচয় তাঁর প্রতিপাদ্য, তার রূপায়নের জন্যে একই জীবনী নিয়ে দুখানি পৃথক্‌ নাটক রচিত হতে পারত। বলা বাহুল্য, সিরাজের এ-চরিত্র লোক-শিক্ষার আকর।

সিরাজের নৈতিক অধঃপতন ও বিচ্যুতি লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। কিন্তু, মানবিক সহৃদয়তা নিয়ে সেই ত্রুটির মানবিক উৎস তিনি আবিষ্কার করেছেন; স্বয়ং সিরাজ নাটকে বলেছে:—

"বাল্যাবধি আপনাদেরই [আলিবর্দি'র অনুচরগণ] আদরে আমার চিত্ত-দমন শিক্ষা হয় নি—তার দায়িত্ব আপনাদেরই।" (২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক) অর্থাৎ, মাতামহের অত্যাদরই ছিল সিরাজের প্রাথমিক স্খলনের কারণ, এই ঐতিহাসিক সত্যে গিরিশের আস্থা ছিল। ফলে, অপরিণত বয়সের স্খলনের তুলনায়, আদর্শ ব্রত সাধনার জন্য আজীবন সংগ্রামই তাঁর চোখে সিরাজের মহিমা প্রতিভাত করেছিল। বরং প্রাথমিক উচ্ছৃঙ্খলতা সিরাজ-চরিত্রের পরিণামী দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠাকে আরো যেন উজ্জ্বল করেছে। সিরাজ চরিত্রের এই মহনীয় স্বরূপ কবি তার নিজ কণ্ঠেই উদ্ঘাটিত করেছেন:—

"স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিল না বিচার,—
মদ্যপানে করিয়াছি
শত শত দুর্নীতি ব্যাভার।
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন
বসি বৃদ্ধ নবাবের[১] মরণ শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর,
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার।
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে,
প্রজার মঙ্গল সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।" [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

সমকালীন বাংলার বিপ্লব-চেতনার পক্ষে এই জীবনবাণী দ্বিমুখী প্রভাব নিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল:—(১) সেকালের স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ রাজ শক্তির প্রতি প্রবোধনের ইঙ্গিত ছিল এতে, (২) আর, বিপ্লবী বাংলার সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছিল এক মহত্তম আদর্শ মূর্তি। মীরমদন ও মোহনলালের আত্মাহুতি এই আদর্শের জ্যোতিকে আরো উজ্জ্বল করেছিল। সেকালের বাংলায় লোকহিত সাধনের মহৎ উত্তাপ যে গিরিশের এই সব ঐতিহাসিক নাট্যাবলীতে পুঞ্জিত হয়েছিল,—তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নাটকগুলিকে রাষ্ট্রদ্রোহকর বলে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন সেকালের বিদেশী শাসককুল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাসিম' আর 'ছত্রপতি

১। নবাব—আলিবর্দী।

শিবাজী', গিরিশের এই তিনখানি নাটকের প্রকাশ ও অভিনয় যুগপৎ বন্ধ হয়ে যায় রাজাদেশে।

কিন্তু, রাষ্ট্র-প্রমথনকারী বিদ্রোহের শুশ্রূষা করেই গিরিশের ঐতিহাসিক নাট্যকলা তৃপ্ত থাকে নি। চিরন্তন মানবিক মহিমাবোধ ও জীবন-মূল্য চেতনাকে এই সব নাটকেও তিনি প্রমূর্ত করেছেন,—পৌরাণিক, ভক্তিমূলক নাট্য-প্রবাহেরই মত। সিরাজদ্দৌলার 'করিমচাচা' চরিত্র সেই আদর্শ প্রেরণার শ্রেষ্ঠ বাহক। একদিক থেকে পান্ডব গৌরবের 'কঞ্চুকী'র সংগে তার সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ট। করিমচাচা প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ,—প্রভুভক্তি, তথা নিরুপায় প্রভুকে রক্ষা করবার প্রয়াসে সে অতন্দ্র। কিন্তু, পাগ্‌লামি আর বোকামির আপাত-আবরণের অন্তরালে মহৎ কর্মের মহত্তম গৌরবকে সে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। করিমচাচা কেবল নিষ্কাম নয়, জীবনের কর্ম-সাধনায় সে প্রশংসা-কাতর। এই স্বভাব-মাহাত্ম্যকে প্রচ্ছন্ন রাখতে বিদূষ-কোচিত লঘু আচরণের বহিরাবরণ সে গ্রহণ করেছে। করিমচাচার উদ্ধৃত সংলাপ অংশগুলিতে গভীর গম্ভীর বিষয়কে প্রকাশ করার লঘুভঙ্গি ও তারল্য ব্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এতে নাট্যকারের বাক্-কুশলতার প্রশংসনীয় পরিচয় থাক্‌লেও নাটকের 'সিরিয়াস্' পরিবেশ বি-ভগ্ন তরল হয়েছে। তাতে ঘটনা সংহতিও হয়েছে শিথিল।

ঘটনা-সংঘাতের এই চরম শিথিলতার পরিচয় পাই 'জহরা' চরিত্রের অবতারণায়। আগেই বলেছি, জহরা মুরসিদ্ কুলী'র বিধবা,—মুরসিদ্ কুলীকে সিরাজ হত্যা করেছিলেন,— তার ব্যভিচারের জন্য। গোটা নাটকে সিরাজের ভয়াবহ পরিণামের একমাত্র দায়িত্ব 'জহরা'র। স্বার্থপর প্রবীণ অমাত্যদের সকল চক্রান্তও বুঝি সিরাজকে,—স্বাধীন বাংলার সৌভাগ্যকে পর্যুদস্ত করতে পারত না। ষড়যন্ত্রকারী অমাত্যকুল, ইংরেজ সেনাধ্যক্ষগণ, —রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে,—এমন কি সিরাজের সুরক্ষিত অন্তঃপুরেও তার অবাধ গতি।—দুরূহ ষড়যন্ত্র, অকল্পনীয় অসাধ্য সাধন সব কিছু মিলে চরিত্রটিকে প্রায় অলৌকিক শক্তিতে দীপ্ত করে তুলেছে। জহরা যেন এক অপদেবতা,—নিজেকে সে "সয়তানী" বলে ঘোষণা করেছে,—আত্মপরিচয় বিশ্লেষণ করে বলেছে,—"আমি নারকীয় শক্তি সম্পন্না, সয়তানকে আত্ম-বিক্রয় করেছি।" নাটকে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে,—মুর্শিদ্‌কুলীর অতৃপ্ত আত্মা সিরাজের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার তপ্ত পিপাসায় পাগলিনী করেছিল জহরা-কে,—তারই প্রভাবে জহরার নির্বাধ অদৃশ্য গতি, —অলৌকিক-বিচিত্র কর্মতৎপরতা,—অসাধ্য সাধনের আশ্চর্য শক্তি। জহরার পার্থিব দেহে মুর্শিদকুলির অদৃশ্য আত্মাই যেন নারকীয় উল্লাসে ছুটে ফিরেছে নাটকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। সেক্‌স্-পীয়রের জুলীয়াস্ সীজার নাটকের পরিকল্পনারই এ আর এক রকম-

ফের। সীজার্-এর অদৃশ্য আত্মার রহস্যময় প্রভাবের আভাস ছড়িয়ে আছে ঐ নাটকের সারা দেহে। সেক্স্পীয়রের নাটকের রহস্য-সংকেত শিল্পীর রচনাগুণে অশরীরী আত্মার ব্যঞ্জনাকে রসানুভূতি-স্নিগ্ধ করেছে। কিন্তু, গিরিশচন্দ্রের নাটকে জহরার দেহময় মাধ্যমে বৈদেহ আত্মার প্রভাব বিস্তার স্বাভাবিক বা সহজ গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া, মুর্শিদকুলির মৃত্যুর প্রতিবিধান কামনায় জহরার এই সর্বস্ব-পণ ঝটিকাগতির কোনো স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর! সিরাজের মৃত্যুর পর আত্মসমর্থন করে সে বলেছিল,—"নারীর পতিই সর্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম পতি স্বর্গ, সেই পতির জন্য দুর্নীত কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।" কিন্তু, সেকালের মুসলমান রমণীর পক্ষে পাতিব্রত্যের এ উন্মত্ততা কতদূর স্বাভাবিক! বিশেষতঃ ইতিহাস এবং নাটকেও যখন স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, মুর্শিদকুলি কোনোদিন পত্নীর মমতা বা মর্যাদা দেয় নি জহরাকে,—বরং তার নারীত্বকে দুঃসহ অপমানে লাঞ্ছিত করেছে ব্যভিচার ও পর-দারাসক্তি দিয়ে। যেমন সিরাজের পক্ষে, তেম্নি জহরার পক্ষেও ত মুর্শিদকুলির জীবযাত্রা চরম লজ্জারই কারণ হয়েছিল!

এই ভাবনার অনুবর্তন অসংগত যদি না হয়, তাহলে গোটা নাটকের ঝটিকা-সংঘাতের মূল উৎসটিও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফল কথা, জাতীয়তা ও মানবিক জীবনাদর্শের আবেগাতিরেক পরিকীর্তন, ঐতিহাসিক সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়োগে আতিশয্য, এবং ঘটনা বিন্যাসের অতি বিস্তার, রোমাণ্টিক উপস্থাপনার অসংগতি,—সব কিছু মিলে সিরাজদ্দৌলা নাটক অতি নাট-কীয়তায় উচ্ছ্বসিত Melodrama-ই হয়েছে। তবু, গিরিশের হাতের একটি অতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি এই নাটক,—বাঙালি চেতনার পক্ষে নাট্যগুণেও অতি সমৃদ্ধ। নাটকীয়তার পক্ষে আবশ্যিক উপাদানগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে Nicoll প্রথমেই বলেছেন,—"A drama may be inconceivable with-out audiance and actors.................".১ দৃশ্যকাব্যের এই দ্বৈত-বন্ধন রচনায় সিরাজদ্দৌলা নাটকের সফলতা বাংলা দেশে আজও অতুল্য, —এর অভিনয় আজও মঞ্চগামীদের অভিভূত করে। ফল কথা, Melodrama হয়েও, গিরিশের অন্যান্য সার্থক সৃষ্টির মত সিরাজদ্দৌলাও সার্থক বাংলা নাটক। প্রসঙ্গ অতি বিস্তারিত না করে অন্যান্য ঐতি-হাসিক নাটক সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যশৈলীর সর্বশেষ উপাদান প্রহসন। সংখ্যায় প্রচুর হলেও এদের পৃথক্ আলোচনা করব না। কেবল সংখ্যাধিক্য ছাড়া,

---

১। Theory of Drama.

গিরিশচন্দ্রের প্রহসন

ইতিহাসের কাছে প্রতিষ্ঠা দাবি করবার আর কোনো যোগ্যতা নেই এই শ্রেণীর রচনাবলীর। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমকালীনতার সীমা এরা অতিক্রম করতে পারে নি, রুচির দিক্ থেকে মধুসূদন-জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ঐতিহ্যকে করেছে আবিল। গিরিশশিষ্য অমৃতলালের হাতে প্রহসন আবার সুরুচি-সুন্দর সাবলীল রূপ পেল,—প্রহসন প্রসঙ্গে সেই আলোচনাই করব এবার।

মঞ্চাভিনয় ও নাট্য-রচনায় গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ অনুবর্তী ছিলেন অমৃতলাল বসু। এককালে বাংলা দেশে তিনি রসরাজ নামে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। নট ও নাট্যকারের উভয় ভূমিকাতেই অমৃতলাল প্রসঙ্গে এই বিশেষণ সুপ্রযুক্ত। গিরিশচন্দ্র আবেগ-উদ্ভাসিত নাট্য রচনা করেছেন, তাঁর প্রহসনগুলিতেও আবেগের আতিশয্য রুচির অশালীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। গিরিশের প্রহসনগুলি প্রায়ই আদিরসাত্মক নক্সা। অমৃতলালের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ভাবগভীরতা ছিল না। তাই, গুরু-কে অনুসরণ করে গুরু-গম্ভীর নাটক যেখানেই তিনি লিখেছেন, সেখানেই চূড়ান্ত কৃত্রিমতার পরিচয় দিয়েছেন। কি চরিত্র-চিত্রণে, কি সংলাপ রচনায়, এমন কি নাট্য-কাহিনীর উপস্থাপনাতেও গুরু-গম্ভীর নাটকে অমৃতলাল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর রস-লঘু চিত্ত-স্বভাবের পক্ষে গাম্ভীর্যের প্রয়াস কত কৃত্রিম ছিল, নীচের সংলাপটি তার নিঃসংশয় পরিচয়ঃ—

অমৃতলাল বসু

> “ছিল দিন পৃথিবীতে সুপ্রাচীন যুগে
> স্বরাটে বিরাট প্রাপ্ত মানব-মানস
> ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল সবাকার।
> দুর্গকোট্য স্কন্ধাবার হয়নি গঠিত;
> কঠোর কুঠার করে রক্ষিত প্রত্যেক নরে
> নিজ নিজ কুটীরের দ্বার।”

পৌরাণিক নাটক যাজ্ঞসেনী-তে (১৩৩৫ সাল) সেকালের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির এই বর্ণনা দিয়েছেন অমৃতলাল। তাতে দুর্বোধ্যতাই কেবল বেড়েছে।

তাহলেও, অমৃতলালের রসবুদ্ধি গিরিশচন্দ্রের চেয়ে প্রখর ছিল,—তাঁর ব্যঙ্গ-দৃষ্টি ছিল তীর্যক-তীব্র। সমকালীন সমাজের অজস্র স্খলন-পতনকে নিয়ে তিনি সার্থক Satire রচনা করে গেছেন। রুচির দিক্ থেকে অধিকাংশ স্থলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উত্তরসূরী। ‘চোরের উপর বাটপাড়ি’-র (১২৮৩ সাল) মত স্বল্প সংখ্যক রচনায় ছাড়া অমৃতলাল

অমৃতলাল ও বাংলা প্রহসন

রুচিগত অশালীনতার পরিচয় কোথাও বড় একটা দেন নি। প্রহসন রচনায় তিনি অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে ফরাসি শিল্পী মলে'য়ার-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'কৃপনের ধন' (১৩০৭) ও 'চাটুয্যে বাড়ুয্যে'-র (১৮৮৬) কল্পনা ও বিন্যাসে এই প্রভাব সুস্পষ্ট।

জাতীয় দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ বা Caricature করাই অমৃতলালের প্রহসন রচনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। Satire-এর আঘাত-এর সংগে সংগে দর্শকের মনে গঠনমূলক চিন্তাধারার প্রেরণাও তিনি যোগাতে চেয়েছেন। বিবাহবিভ্রাট (১২৯১) এই শ্রেণীর প্রহসনের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গুরু-গম্ভীর নাটক-রচনায় অমৃতলালের প্রকাশ আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম। কিন্তু, প্রহসনের সংলাপ, গদ্য এবং পদ্য উভয়ক্ষেত্রেই তির্যক, পরিমিত এবং অর্থাবহ। বৌ-মা নাটকে (১৩০৩ সাল) রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রেম কবিতাকে[১] কটাক্ষ করে অমৃতলাল লিখেছেন,—

"সুরুচিসম্পন্ন কোনো কবির কথায়,
করে ধরে প্রাণনাথ বলে গো আমায়,
দাঁড়াতে বিশ্বের মাঝে ফেলিয়া বসন,
(ছাদেতে নিরালা নয় বুঝ বিচক্ষণ)
জ্যোছনা ঢালিবে অঙ্গে চাঁদ সারারাত
"লাজহীন পবিত্রতা" হেরিবেন নাথ।

পূর্বের উদ্ধৃত সংলাপ অংশের তুলনায় আলোচ্য রচনার শব্দ-প্রয়োগের স্বাভাবিকতা ও প্রকাশের সাবলীলতা লক্ষ্য করবার মত। কেবল পদ্য নয়, অমৃতলালের প্রহসনে প্রায় সর্বত্রই গদ্য-পদ্য সংলাপ যথাপরিমিত হয়ে তীর্যক্ অর্থব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক,—সমকালীন প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই রসরাজ রস-সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর প্রথম নাটক[২] হীরকচূর্ণ (১৮৭৫) রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে লেখা। বরোদার ইংরেজ রেসি-ডেন্ট্‌কে মদে হীরকচূর্ণ মিশিয়ে হত্যা করার অপরাধে তৎকালীন গাইকোয়াড় পদচ্যুত হন। ঐ সময়ে এ-বিষয়ে ভারতব্যাপী আন্দোলন চলেছিল,—হীরকচূর্ণ রচনার উপলক্ষ্য ঐখানে। অবশ্য, ইতঃপূর্বে সখের যাত্রাদলের জন্য 'ফার্স' লিখে লেখক হাত পাকিয়েছিলেন।[৩]

১। দ্রষ্টব্য—কড়ি ও কোমল।
২। দ্রষ্টব্য—বাঙালা-সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।
৩। দ্রষ্টব্য—পুরাতন প্রসঙ্গ—অমৃতলাল।

অমৃতলালের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে আছেঃ—

নাট্যপঞ্জী

নাটক

১। হীরকচূর্ণ
২। তরুবালা
৩। বিমাতা বা বিজয় বসন্ত
৪। হরিশ্চন্দ্র
৫। আদর্শ বন্ধু
৬। খাসদখল
৭। নব-যৌবন
৮। যাজ্ঞসেনী

চিত্রনাট্য

১। বিলাপ
২। সাবাস আটাশ
৩। বৈজয়ন্তবাস
৪। সাবাস বাঙালি
৫। নবজীবন

গীতিনাট্য

১। ব্রজলীলা
২। যাদুকরী

প্রহসন

১। তিলতর্পণ
২। চোরের উপর বাটপাড়ি
৩। বিবাহ বিভ্রাট
৪। ডিস্‌মিস্‌
৫। চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে
৬। তাজ্জব ব্যাপার
৭। রাজবাহাদুর
৮। সম্মতি সংকট
৯। কালাপানি
১০। বাবু
১১। একাকার
১২। বৌমা
১৩। গ্রাম্য বিভ্রাট্‌
১৪। কৃপণের ধন
১৫। অবতার
১৬। ব্যাপিকা বিদায়
১৭। দ্বন্দ্বেমাতনম্‌ ইত্যাদি

গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের পরে নাট্য-সাহিত্যের মুক্তিপথ আরো সুচিহ্নিত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাধনায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের ভাব-শিষ্য ছিলেন। কিন্তু, নাট্যকার হিসেবে গিরিশের উদ্বোধিত যৌথ জীবন-ভাবনার সংহতি বা পূর্ণতা-বিধানে তিনি সক্ষম হন নি। অবশ্য তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। গিরিশচন্দ্র-সমকালীন বাংলার ভাবনাকে, কৌতুক অথবা ব্যঙ্গের সরস আঘাত দিয়ে অমৃতলাল তির্যক্‌-স্পষ্ট করে তুল্‌তে চেয়েছিলেন। ফলকথা, গিরিশচন্দ্রের গভীর-গম্ভীর নাট্য-রচনার প্রচেষ্টা ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে সু-পরিণত, সার্থক রসাবহ হয়েছে।

বিশুদ্ধ নাট্যকলার প্রয়োজনবোধের দিক্‌ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনায় ক্ষীরোদপ্রসাদের (১৮৬৪-১৯২৭) শিল্পি-ব্যক্তিত্বই লোভনীয়তর ছিল বলে মনে হয়। আগে বলেছি, উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিক

গোষ্ঠি-জীবন-চেতনার পিনদ্ধতা সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। গিরিশচন্দ্রের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব অতি-উচ্ছ্বসিত আত্ম-সমুদ্বেল ছিল। ফলে, তাঁর নাট্য-সাহিত্যে অ্যাক্‌শন-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইমোশন-এর অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে ঘন ঘন। এদিক্ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিত্বে কবি-জনোচিত উচ্ছ্বাস সর্বাপেক্ষা কম ছিল। তা হলেও, আলোচ্য যুগের নাট্য-রচনায় তাঁর সফলতা দূরপ্রসারী হতে পারেনি। এর মূলে অবশ্য ছিল সমকালীন জীবন-স্বভাবের অন্তর্বদ্ধতা।

ক্ষীরোদ-নাট্য ও সমসাময়িক যৌথজীব্য

আগে বলেছি, একালের নাগরিক বাঙালির যৌথ জীবন-ভাবনা ধর্ম ও স্বদেশ-প্রীতির আবেগ-উচ্ছ্বাসে স্ফীত-সংহত হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের সুমিত ব্যক্তি-কল্পনা সেই উচ্ছ্বাস-তরঙ্গের শীর্ষবর্তী হতে পারে নি। তাই আবেগধর্মী বিষয়ে বিন্যস্ত নাটকে তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা প্রায়ই নিস্তাপ বলে মনে হয়েছে। অন্য-দিকে, নিজস্ব উচ্ছ্বাস-উদ্বেলতার অভাবে ভাবোল্লাসের প্রকটনের জন্য তাঁকে গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ করতে হয়েছিল। ফলে, তাঁর স্বাদেশিকতা বা পৌরাণিকতা-প্রবুদ্ধ নাটকে নাট্যবিষয় প্রায়ই শিথিল-বন্ধ হয়েছে; সংলাপও হয়েছে কৃত্রিম।

এই তথ্যের দুটি নিঃসংশয় প্রমাণ ক্ষীরোদপ্রসাদের দুই বিখ্যাত ঐতি-হাসিক নাটক,—প্রতাপ-আদিত্য (১৯০৩) আর আলমগীর (১৯২১)। এ-দুটি নাটক আরো একদিক থেকে ক্ষীরোদ-প্রতিভার ঐতিহাসিক পরিচয়-বহ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য

আগে বলেছি, গিরিশচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রাথমিক প্রয়াস অসার্থক হয়েছিল,—আনন্দ রহো-তে (১৮৮১)। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক্ নাট্য রচনায় অপূর্ব সাফল্য প্রকাশ করেছিলেন,—পূর্বপ্রসঙ্গে তা লক্ষ্য করেছি। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সফলতার মূলে ছিল হিন্দুমেলা-প্রবুদ্ধ স্বদেশ-প্রীতির রোমান্টিক উৎসার। বঙ্গভঙ্গ যুগের বৈপ্লবিক পটভূমিতে সেই নাট্যধারাকে পুনরুৎ-সারিত উচ্ছ্বসিত রূপদানের ভূমিকা রচিত হল ক্ষীরোদপ্রসাদেরই লেখা বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য-কে[১] আশ্রয় করে। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল একই বছরে (১৮৬৩) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রতাপ-আদিত্যের পরবর্তী উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাঙ্গিক দ্বারা ত প্রভাবিত হয়েছেন-ই; এমন কি তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিরও অনেক সময় অসার্থক অনুকরণের চেষ্টা করেছেন। তাহলেও, বাংলার জাতীয় চেতনায় নবপর্যায়ে স্বদেশ-প্রেমে-উদ্বোধিত নাট্যাস্বাদ সৃষ্টির গৌরব ক্ষীরোদ-প্রসাদেরই।

১। প্রথম সংস্করণে 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকের এই নামকরণ করা হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শুরু হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে,—আর প্রতাপ-আদিত্য রচিত হয়েছিল ১৯০৩-এ। সে ছিল অগ্নিদাহের পূর্ববর্তী প্রস্তুতি পর্ব। লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেছিলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ। এদেশে পৌঁছানোর সংগে সংগেই তাঁর উদ্দেশ্য আর মনোভাব প্রকাশ করে বল্‌তে কোনো অস্পষ্টতা রাখেন নি তিনি। এক বক্তৃতায় বলেছিলেন,—"ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের মূল উদ্দেশ্য দুটি—একটি, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করা; অন্যটি, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার।"১ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সচিবকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের পতন সন্নিকট, এবং আমার একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা হল, ভারতে অবস্থিতি কালেই একে শান্তিতে মরণের পথে এগিয়ে দেওয়া।"৩ এর থেকেই বোঝা যায়, প্রথমাবধি কার্জনের দুরভিসন্ধি কোন্ পথে চলেছিল; আর তার ফলশ্রুতিও সঞ্চিত হচ্ছিল জাতির মর্মমূলে একেবারে প্রথম থেকেই। সেই প্রস্তুতির প্রেরণা আর আকাঙ্ক্ষাই ক্ষীরোদপ্রসাদের কল্পনায় রূপ ধরেছিল প্রতাপ-আদিত্য নাটক হয়ে।

জীবন-ভূমি
প্রতাপ-আদিত্য

সার্থক শিল্পী কেবল কল্পনা-বিলাসী নন;—জাতির জীবনে তাঁর বরণীয় আসন অনাগত-বিধাতা'র ভূমিকায়। প্রত্যেক সফল স্রষ্টাকেই হতে হয় সার্থক দূরদ্রষ্টা। জাতির জীবনের যে কামনা-বাসনা অবচেতনার রহস্য-লোকে,—ইতিহাসের দুর্জ্ঞেয় দুর্গে মুকুলিত হতে থাকে,—তার নীহারিকা-রূপটি কবির ধ্যানেই হয় প্রথম প্রত্যক্ষ,—প্রথম রূপ পায় তাঁর রচনায়। আধুনিক বাংলার ইতিহাসে আনন্দমঠের শিল্পীর আসন সেই জীবন-স্রষ্টার অসংশয়িত ভূমিকায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্য জগতে সেই প্রতিষ্ঠা-সিংহাসনের সচেতন পদাঙ্ক-অনুসারী। সারা বাংলা দেশ যেদিন বন্ধন-মুক্তির মরণপণ জয়যাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুখ,—সেদিন প্রতাপ-আদিত্যের শিল্পী জাতির হাতে নবজীবন-চেতনার পাথেয় দিতে চাইলেন। তাই, প্রতাপ-আদিত্যের কাহিনীকে আশ্রয় করে সূচিত হল জাতীয় স্বভাবের অতীত অন্বীক্ষা,—ত্রুটিমুক্ত নব সম্ভাবনার স্বপ্ন-রচনা। এ স্বপ্ন নিছক মায়ামোহ নয়,—অতন্দ্র কর্মসাধকের ধমনীতে রক্ত প্রবাহকে করবে সে অগ্নি-তাপ-বিচঞ্চল।—অন্ততঃ শিল্পীর তাই আকাঙ্ক্ষা।

তাই, "প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস। বাঙালির শক্তি জগতে দুর্লভ, আবার বাঙালির

১। দ্রষ্টব্য—মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল।
২। দ্রষ্টব্য—ঐ।

দৌর্বল্যও চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙালি না পারে, এমন কার্যই জগতে নাই, অথচ বাঙালি-প্রবর্তিত কোনো মহাকার্যেরই শেষ রক্ষা হয় না, কোথা হইতে চরিত্রগত দুর্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া দেয়। এ দেশের উপর যেমন জগজ্জননীর কৃপা, এমন বুঝি আর কোথাও নাই। কিন্তু, অভাগা আমাদের দোষে মাকে পদে পদে মুখ ফিরাইতে হয়। বাঙালি জীবনের এই হর্ষ-বিষাদ ভরা, এই আলোছায়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, প্রতাপ-আদিত্যে অতি সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।"[১]

বাঙালি স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য নাটকে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত হয়েছে সেলিমের কণ্ঠে :—"[বাঙালি] শান্ত, শিষ্ট, ধীর মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ—কিন্তু বড় দুর্বল—দুর্বলতার জন্য বাঙালিতে একতা নেই—বাঙালিতে সত্য নিষ্ঠার অভাব,—বাঙালি পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা বাঙালি মহাশক্তি—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্যতৎপরতায় বাঙালি জগতে অদ্বিতীয়,...........। কিন্তু একত্র দশ বাঙালি অতি তুচ্ছ —হীন হতেও হীন। অন্য জাতির দশে কার্য, বাঙালির দশে কার্যহানি।" [৫ম অঙ্ক/১ম দৃশ্য]

মোগল যুগের সম্বন্ধে যত না হোক্, উনিশ শতকের অতি-স্বাতন্ত্র্যে বিচ্ছিন্ন বাঙালির এ এক আশ্চর্য সত্য জীবনায়ন! তবু, আকবর-এর মত শিল্পী নিজেও বিশ্বাস করেন,—"বাঙালি নিজের দুর্বলতা বোঝে"......। আর, বুঝে যদি কার্য করে, তাহলে বাঙালি কি হতে পারে",—তা কল্পনাতীত। এই মহৎ ভরসায়, বাংলার অতীত পরাভবের স্মৃতিমালা রচনা করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপ-আদিত্যে। এই প্রচেষ্টায় বঙ্কিমের আনন্দ-মঠ-এর স্বপ্ন-কল্পনার ছাপ রয়েছে প্রচুর। শংকর-কল্যাণী কথা, প্রসাদপুরের অধিবাসিগণের যশোরে আশ্রয় লাভ; তাদের সর্বস্বপণ সংগ্রাম-সাধনা, সব কিছুতেই আনন্দমঠ-এর সন্ন্যাস-ধর্মী স্বদেশ-হিত-সাধনার ভাবব্যঞ্জনা রয়েছে। সমগ্র রচনাশৈলীর মূলগত প্রেরণার গভীরেও যেন নিহিত রয়েছে আনন্দমঠ-এর শিল্পীরই ভরসা-বাণী। প্রথম সংস্করণ

প্রতাপ আদিত্য নাটক

আনন্দমঠ-এর সমাপ্তিতে বঙ্কিম লিখেছিলেন, "সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।" যে-কোনো কারণেই হোক্, বঙ্কিম সে কথা আর বলেন নি। কিন্তু, ক্ষীরোদপ্রসাদ স্পষ্টই জ্বালিয়ে তুল্‌তে চেয়েছেন প্রতাপ-আদিত্যের জীবনান্তকর বিপ্লব-আগুন। এখানে তাঁর প্রয়াস কেবল স্বদেশ-প্রেমে দীপ্ত নয়,—রোমাণ্টিক কল্পনায় মগ্ন।

১। মন্মথমোহন বসু-কৃত ভূমিকা।

এই স্বপ্ন-কল্পনারই রহস্য মধুর রচনা বিজয়া। বিজয়া প্রতাপ-আদিত্যের নাট্য ঘটনার প্রাণকেন্দ্র; আবার বিজয়া চরিত্রেই এর নাট্য সম্ভাবনার অবসান। "নাট্যোল্লিখিত ব্যাক্তিগণ"-এর পরিচায়ন প্রসঙ্গে নাট্যকার বিজয়া-কে জানিয়েছেন "যশোরেশ্বরীর সেবিকা" বলে;—কিন্তু, নাটকের পক্ষে ঐটিই তার একমাত্র, এমন কি, প্রধান পরিচয়ও নয়। কমল তার পরিচয় দিয়েছে 'লড়্‌কানি বিবি' বলে,—স্বয়ং প্রতাপাদিত্য বলেছেন "যশোরেশ্বরী।" চতুর্থ-অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের বিবৃতি,—এবং অপরাপর প্রসঙ্গ থেকে মনে হয় লেখকের মনোগত অভিপ্রায়ও তাই। বিজয়াকে তিনি কেবল যশোরেশ্বরীর সেবিকা নয়,—অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী করে অঙ্কিত করেছেন। একেবারে বাজপাখি হত্যার সময়ের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে কল্যাণী উদ্ধার, ইসাখাঁর পরাভব, রডা-বিজয়—সর্বত্রই, বিজয়ার লোক-দুর্লভ প্রত্যুৎপন্নমতি ও সূক্ষ্মাগ্রবুদ্ধির অবাধগতি তাকে লোকোত্তর মহিমার অধিকারিণী রূপে চিহ্নিত করেছে। ঐতিহাসিক নাটকের যুগান্তকারী ঘাতপ্রতিঘাতের উত্থানপতনের কেন্দ্রভূমিতে অলোক-সাধারণ নারীশক্তির একক প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য নাটকের তথ্য নির্ভর বাস্তব প্রেরণাকে শিথিল করেছে। প্রতাপ-আদিত্যকে তাই ঐতিহাসিক নাটক বলা কঠিন,—এটি ইতিহাসাশ্রিত রোমাণ্টিক নাটক।

ঘটনা-প্রপাতের মধ্যে এই রোমাণ্টিক কল্পচারিতার আকস্মিকতা ছেড়ে দিলে প্রতাপ-আদিত্যের সংঘাত ও সংসক্তি বাংলা নাটকের পক্ষে প্রায় দুর্লভ! সেক্‌স্‌পীয়রীয় পঞ্চাঙ্ক নাটকের আঙ্গিক অতিশয় সুমিতির সংগে অনুসৃত হয়েছে,—ঘটনা প্রবাহের মধ্যে বিরোধের উত্তুঙ্গতা এবং গতি ও দ্রুতি সফল নাট্যলক্ষণান্বিত।

আগে বলেছি,—ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতিভা নাট্যকার-সমুচিত অনুচ্ছ্বসিত পরিমিতি বোধে সঞ্জীবিত ছিল। তার সার্থক পরিচয় কেবল প্রতাপ-আদিত্যেই পাই। এই নাটকটিই পূর্বাদর্শের প্রভাব মুক্ত মোটামুটি তাঁর স্বাধীন রচনা। পরের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের রোমাণ্টিক আবেগস্ফীত উচ্ছ্বাসের অনুচিত আতিশয্য রয়েছে,—আর পৌরাণিক নাটকে রয়েছে গিরিশচন্দ্রীয় ভাব-বিহ্বলতার অনধিকার প্রবেশ।

আগেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রলাল আর ক্ষীরোদপ্রসাদ একই ইংরেজি সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন;—এঁদের দুজনেরই লেখা ঐতিহাসিক নাটকেরও প্রথম প্রকাশ হয় একই বছরে (১৯০৩ খৃীঃ)। ঐ বছরে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপ-আদিত্য প্রকাশিত হতে দেখেছি; দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই'-ও একই বছরে প্রকাশ পায়। পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে দ্বিজেন্দ্রলাল সংলাপ রচনার এক বিশেষ পূর্বাদর্শ স্থাপনা করেন। এ-বিষয়ে তিনি নিজে লিখেছিলেন,—"আমি আমার তারাবাই-এর

পরবর্তী নাটকগুলি (রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন, ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই।"১ বাঙালির আবেগ-ব্যাকুল স্বভাব এই অনুকূল রচনা ভঙ্গিকে দীপ্ত উৎসাহের সংগে গ্রহণ করেছিল। আগে বলেছি, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মঞ্চ-সফলতার মূলেও ছিল এই আবেগ-দীপ্ত কবিধর্ম। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথম থেকেই তাঁর স্বভাব-নাটকীয় প্রতিভার সংগে ভক্তি-ব্যাকুল গৈরিশ আবেগ-আতিশয্যকে অন্বিত করেছিলেন,—পৌরাণিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে। এবার, ঐতিহাসিক নাটকে,—প্রতাপ-আদিত্যের পর থেকে,—দ্বিজেন্দ্রলালীয় অতিকাব্যিক সংলাপ ভঙ্গির অনুবর্তন করলেন। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল বা গিরিশচন্দ্রের মত ক্ষীরোদপ্রসাদের "কবিতায় অত্যধিক আসক্তি" ছিল না। ফলে, প্রথমোক্তদের স্বভাব-কবিত্ব যেখানে সহ-জ মেলোড্রামা-র সৃষ্টি করেছে,—সেখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকীয় ঘটনাবিন্যাস ও বাগ্‌ভঙ্গির সংগে পরানুকৃত কবিত্বের সামঞ্জস্য বিহিত হতে পারে নি।

ক্ষীরোদপ্রসাদে পর-প্রভাব

ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আলমগীর নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকও এটি। এর রচনাকাল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। ততদিনে দ্বিজেন্দ্রলালের সব কয়টি ঐতিহাসিক নাটক রচনা শেষ হয়ে গেছে,—এই পর্যায়ের সর্বশেষ চন্দ্রগুপ্ত নাটক রচিত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন মঞ্চগামী বাঙালির অনুভূতিতে জনপ্রিয়তার শীর্ষভূমিতে। ফলে, ক্ষীরোদপ্রসাদও এবার তাঁর সকল ঐতিহাসিক নাটকে আবেগাতিশায়ী ভাবালুতার আবরণ রচনায় ব্রতী হলেন। বলাবাহুল্য, প্রতিভার স্বভাব-বিরোধী এই প্রয়াস ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার সংসক্তিকে শিথিল করেছিল,—ভাবের ঐক্যকে করেছিল বিস্রত।

আলমগীর নাটকের অতি বিস্তারিত দৈর্ঘ্য এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এর দীর্ঘাতিদীর্ঘ সংলাপ নাটকীয় সংসক্তি (Dramatic unity) রচনার পরিপন্থী; এ কথা বুঝে শিল্পী স্বয়ং সংলাপের অনেক অংশ বন্ধনী চিহ্নিত করে অভিনয় কালে বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ অংশগুলি লক্ষ্য করলেই দেখব,—এদের বর্জনে নাট্য ঘটনার অগ্রগতি বা পরম্পরতা কোথাও ব্যাহত হয় না। মানবিক আবেগের উত্তাপ রচনার জন্যেই কেবল ঐ সব

১। আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ [প্রবন্ধ]।

অংশের অবতারণা। আর, এই প্রয়াসে, বিশেষ ভাবে আলমগীর নাটকে, দ্বিজেন্দ্রলালই নাট্যকারের একমাত্র পূর্বাদর্শ ছিলেন না। এর কাহিনী অংশের সংগে একান্ত সাদৃশ্য রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের। বস্তুতঃ, দুটি প্লট্-এরই ঐতিহাসিক উৎস অভিন্ন। ফলে, এতে বঙ্কিমী শিল্প-কল্পনার ছাপও রয়েছে কমবেশি। তবে, ভাষাভঙ্গিতে দ্বিজেন্দ্রলালীয় melodramatic ভাবালুতার স্বপ্ন-কম্পন স্পষ্টতর লক্ষণীয়ঃ—"এ মমতার সংগীতে ও বিশ্বপথের পথিককে চলচ্ছক্তি হীন করো না। আমি আজ ধন্য! ভাগ্যে মেবারের তুচ্ছ সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করেছিলুম, তাই এই পথের মাঝে আমার মাকে কুড়িয়ে পেলুম। আমার জন্ম থেকে হারানো মা—শৈশব থেকে যাকে পাবার জন্যে হাত বাড়িয়েছি। ঐশ্বর্যে যাকে পাই নি। যখন ভিখারীর অঞ্জলি নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি দেবতাকেও গোপন করে আমার অঞ্জলির ভিতরে কোন্ স্বর্গরাজ্য থেকে আমার সেই মা এসেছে। দেবতা যদি জান্তো, আজ নন্দনের তরু শূন্য করে পুষ্প-রাশি এই প্রান্তরে স্তূপীকৃত করতো।"—দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চমদৃশ্যে ভীম-সিংহের এই মাতৃবন্দনা চন্দ্রগুপ্ত নাটকের একাধিক মাতৃস্তুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তার চেয়েও বেশি সাদৃশ্য রয়েছে,—"কাশ্মীরের সেই দেবতা বিরচিত উদ্যানে, পরীর চক্ষু-রঞ্জিত জলের সেই অপূর্ব আধার হ্রদের কথা আপনি স্মরণ করুন। যেদিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তার অঙ্গস্পর্শ করতে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হ্রদ তীরে আমার সম্বর্ধনা করত দেবতা প্রেরিত দূতের মত সারি সারি দেবদারু। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে পত্রাবগুণ্ঠনের অসংখ্য পরীর জয়গান।"—২/৩ দৃশ্যে উদিপুরী বেগমের এই কাশ্মীর-স্তব, দ্বিজেন্দ্রলালের নিসর্গ প্রেমস্নাত একাধিক বঙ্গ-প্রকৃতি বর্ণনার স্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে।

কেবল ভাষা-ভঙ্গিতেই নয়, চরিত্রের উপস্থাপনা, বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশ রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার ছাপ রয়েছে,—উদিপুরীর মধ্যে নূরজাহানকে, আলমগীরের মধ্যে শাজাহান নাটকের ঔরঙ্গজীবকে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব না করে উপায় থাকে না। কিন্তু, অতসব সত্ত্বেও নাটকটির সুগঠন অব্যাহত থাকে নি। উদ্ধৃত অংশ থেকেই বোঝা যাবে, দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বাভাবিক মানস-উদ্দীপ্তি নেই ঐসব কাব্যিক রচনাভঙ্গিতে। তাছাড়া, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে নাটকীয় প্রয়োজনে পুঞ্জিত করে তোলার সহজ দক্ষতা ক্ষীরোদপ্রসাদের ছিল।—কিন্তু, তার ফাঁকে ফাঁকে গার্হস্থ্য মাধুর্যের স্বপ্ন রচনা করতে গিয়ে নাটকের সংহতি ও দৃঢ়তা অপার বিস্তীর্ণ

জলধারায় বিলীন হয়ে পড়েছে। অথচ, গীতি কবিতার স্বভাব-কলোচ্ছ্বাসও লাগে নি সেই আবেগ জলতরঙ্গে।

ফলকথা, ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুচ্ছ্বসিত নৈর্ব্যক্তিক প্রতিভা বাংলা নাটকে দুর্লভ শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনায় ঋদ্ধ ছিল।—তবু, সে প্রতিভা কেবল পরানুকরণ মুক্ত আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ হতে পারল না বলেই, ক্ষীরোদপ্রসাদ না পারলেন সার্থক নাটক লিখ্‌তে,—তেম্‌নি পারলেন না বাংলার চিরাচরিত যাত্রাধর্মী মেলোড্রামা রচনাতেও সফল হতে।

পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসেও এই সত্যের স্পষ্টতর অনুবর্তন ঘটেছে নরনারায়ণ (১৯২৬) নাটকে। এই নাটকটি লেখক প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন 'কর্ণ' নামে। রচনার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন।—"কর্ণ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, সেইটাই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। এক দৈবনিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনী।"[১] কিন্তু, প্রায় এক বছর পরে নাট্য রচনার যখন শেষ হয়, তখন দেখা গেল, "দৈব নিগৃহীত মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী" সম্পূর্ণ হতে পারে নি; বরং কর্ণ-জীবন-কে কেন্দ্র করে 'নরনারায়ণ' কৃষ্ণের ভক্তি-সমুদ্বেল মহিমা গাথাই উচ্চারিত হয়েছে। ফলে, স্পষ্টই বোঝা যাবে, নাটকের কাহিনী অংশ প্রথম থেকেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। শিল্পীর চিত্তবৃত্তি ছিল কর্ণ-চরিত্রাভিমুখী,—রচনা এগিয়েছে কৃষ্ণবন্দনার পথ ধরে। প্রধান বক্তব্য সম্বন্ধে শিল্পি-চেতনার এই দ্বৈধ নাটকীয় সংহতিকে বিপর্যস্ত করেছে। ভাবেরও শৈথিল্য ঘটেছে এতে। কর্ণ মহাপুরুষ,—কৃষ্ণ 'নরদেহে নারায়ণ',—মহত্তম দেবতা। ফলে, কর্ণ ও কৃষ্ণের প্রতি নাটকের দ্বিমুখী প্রবণতা নরবাদ ও দেববাদের মধ্যে ভাব-দ্বৈধের শিথিলতা সৃষ্টি করেছে।

পৌরাণিক নাটক ঃ—
নরনারায়ণ

নাট্যকারের পুত্র সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে শিল্পী "কৃষ্ণ নাটকের প্রথম দৃশ্যমাত্র লেখেন।"[২] ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিণত বয়সের ধর্মাসক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু, তাঁর শিল্পি-চেতনা ছিল উনিশ শতকের মানবিকতাবোধে আমূল উদ্বুদ্ধ। তাই, মহাপুরুষ কর্ণের মানবিক দীপ্তির রূপায়নই তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল,—কৃষ্ণভক্তির আলোড়ন সেই স্বভাব-সৃষ্টির পথকে করেছিল নিরুদ্ধ। অথচ, গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত সর্বাতিশায়ী ভক্তি ভাবালুতাও সৃষ্টি করতে পারে নি।

ভীষ্ম নাটক (১৯১৩) সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। এটি

১। মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীকে লেখা নাট্যকারের পত্রাংশ। দ্রষ্টব্য ঃ—নিবেদন—নরনারায়ণ নাটক।

২। দ্রষ্টব্য—ঐ।

নরনারায়ণ-এর পূর্ববর্তী রচনা,—আঙ্গিকের দিক থেকেও আরো শিথিল অ-পরিণত। কিন্তু, নাট্য-প্রেরণা এখানেও অভিন্ন,—বরং শিল্পীর দ্বিধা এই অ-পূর্ণগঠিত রচনায় স্ফুটতর। দুটি রচনাতেই দেখি,—মহাভারতীয় শাশ্বত জীবন-মূল্যবোধকে উনিশ শতকের নব-মানবতা বোধের আদর্শে রূপায়িত করবার আকাঙ্ক্ষা একান্ত স্পষ্ট। ভীষ্মের মানবিক ব্যক্তিত্বের মহিমা কর্ণের চেয়েও দীপ্ততর। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের মহত্তম পুরুষ তিনি,—জাতি ও স্বদেশের হিতের জন্য জীবনের ভোগবাসনার অপার সম্ভাবনা নিজের ইচ্ছায় উৎপাটিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু, নাটকের পক্ষে এই চরিত্রের ব্যাপ্তি অতি দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এক দিকে মহাভারতীয় ভীষ্ম-কথার খুঁটিনাটি বর্ণনা করার ঐতিহাসিক প্রয়াস,—অপরপক্ষে কৃষ্ণ-মহিমা কীর্তনের আবেগ ধর্মিতা, দুয়ের টানা পোড়নে, নাটকীয়তাই কেবল ব্যাহত হয়েছে, কাব্যিক স্বাদুতা বা আদর্শগত উদ্দীপনা সৃষ্ট হতে পারে নি।

ভীষ্ম

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য-রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ—

নাট্যপঞ্জী

১। ফুলশয্যা
২। প্রেমাঞ্জলি
৩। আলিবাবা
৪। কুমারী
৫। প্রমদারঞ্জন
৬। জুলিয়া
৭। বভ্রুবাহন
৮। সপ্তমী প্রতিমা
৯। বেদৌরা
১০। সাবিত্রী
১১। বৃন্দাবন বিলাস
১২। রঘুবীর
১৩। রঞ্জাবতী
১৪। উলূপী
১৫। পদ্মিনী
১৬। প্রতাপাদিত্য
১৭। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত
১৮। রক্ষঃ ও রমণী
১৯। আলাদিন
২০। চাঁদ বিবি
২১। নন্দকুমার
২২। দাদা ও দিদি
২৩। দৌলতে দুনিয়া
২৪। বরুণা
২৫। ভূতের বেগার
২৬। বাসন্তী
২৭। পলিন
২৮। বাঙালার মসনদ
২৯। মিড়িয়া
৩০। খাঁজাহান
৩১। রূপের ডালি
৩২। ভীষ্ম
৩৩। নিয়তি
৩৪। আহেরিয়া
৩৫। রামানুজ
৩৬। বঙ্গে রাঠোর
৩৭। আলমগীর
৩৮। বাদ্‌সাজাদী
৩৯। নরনারায়ণ

ইত্যাদি

'হাসির গানের রাজা' হিসেবেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রতিষ্ঠা; ঐটুকুই বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়-ও। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির উৎস ছিল তাঁর বলিষ্ঠ পৌরুষের মর্মমূলে,—'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে কবি-পুত্র সেই পৌরুষ শক্তির ব্যাপক পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস সংক্ষেপে হলেও প্রাঞ্জল ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের স্বভাব বিশ্লেষণ করেছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলাল সবল সুস্থ পৌরুষের উপাসক ছিলেন। বিলাতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন দেশে ফিরিয়া সমাজ-প্রভুদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, তখন তাঁহার মনে একটা সুগভীর ধিক্কার জন্মিয়াছিল। ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ; বিলাতে যাত্রা করিবার দিন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি মনে মনে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়াছিলেন। আইনের বাধায় উহার সহজ প্রকাশ সম্ভব ছিল না। সুতরাং, স্বাভাবিক হাসির সহিত তাঁহার মনের এই ধিক্কার ও গ্লানিসঞ্জাত তীক্ষ্ন ব্যঙ্গরসের সংযোগ হইয়া এই ত্রিবেণী সংগমের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব।"১

কবি নিজে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাবলীর মৌল প্রেরণা ব্যাখ্যা করে 'ভক্ত' কবিতায় লিখেছিলেন,—

"ব্যঙ্গ-কবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু?—নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না। আসলে ভক্তি করি আমি, ঘৃণা করি শুধু নকলে।
যেথা আবর্জনা ধরি সম্মার্জনী, তাই বলে তো আমি অন্ধ না।
যেখানে দেবতা ভক্তি পুষ্প দিয়ে স্তুতিছন্দে করি বন্দনা।"

কেবল কবিতার ক্ষেত্রে নয়, নাট্য-রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলালের গভীরতম ভক্তি ও প্রবলতম ঘৃণা বিচিত্রচারী সৃষ্টির সফলতা অর্জন করেছে।

নাট্য জগতেও ব্যঙ্গ-সহাস প্রহসন হাতে করেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রবেশ। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত বলেছেন,—"হাসির গানগুলিকে আরো স্থায়িত্ব দেবার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসনের আকারে এগুলিকে গ্রথিত করবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলেই দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীতকার থেকে নাট্যকারের পদবীতে উত্তীর্ণ হন।"২ বস্তুতঃ একদিক থেকে, দ্বিজেন্দ্রলালের তীব্র-ব্যক্তিত্ব ঋদ্ধ কবি-চেতনাকেই তাঁর লঘু-গুরু সকল নাট্য সৃষ্টির প্রধানতম নায়ক বলে মনে করতে বাধা নেই। স্ব-রচিত গুরু গম্ভীর নাটকের রচনাশৈলী প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন,—"আমার কাব্যশক্তি যাহা

১। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ঃ—ভৈরব-পত্রিকা—শারদীয়া সংখ্যা—১৩৪০ বাংলা সন।

২। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল—পাথেয়—১৩৪৩ বাংলা সন।

কিছু ছিল, আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"১ তেম্‌নি প্রহসন এবং ব্যঙ্গ নাট্যগুলি সম্বন্ধেও শিল্পী বল্‌তে পারতেন যে,—সে তাঁর ব্যক্তি হৃদয়ের জ্বালা ও ধিক্কারকে নিংড়ে রূপ পেয়েছে। ফলে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য প্রবাহের মধ্যে মাঝে মাঝে নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের ছাড়িয়ে শিল্পী ব্যক্তিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি এখানে-ওখানে। সাজাহান নাটকে সাজাহান যখন বলেন,—"আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করব কোন্ প্রাণে জাহানারা।"

আবার,—"পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে, পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে!" তখন বাল্যে মাতৃহীন দিলীপ রায় ও মীরাদেবীর স্নেহ-আবেগাতুর পিতাকেই চোখের 'পরে ভেসে উঠ্‌তে দেখি।২

প্রসঙ্গান্তরে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সেকেন্দরের উক্তি—"কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়,......" ইত্যাদি সুদীর্ঘ ভারত-প্রশস্তির মধ্যে স্বদেশ-ভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রত্যক্ষ করি,—ব্যাকুল আবেগে যিনি প্রার্থনা করেছিলেন,—"আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন, এই দেশেতেই মরি।"

স্বয়ং কবি-পুত্র 'সীতা'র সমাপ্তিক প্রেমস্তোত্র রচনা-রত বাল্মীকির মধ্যে কবিরই প্রেমিক মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।৩

আবার, কল্কি অবতার ব্যঙ্গ-নাট্যে ভূতনাথ বলেন ঃ—

"আর্য ঋষিগণ—ছিলেন আর্যঋষি যাঁরা
বলো, প্রাণের ভ্রাতৃগণ! কী না জানতেন তাঁরা?
ধরণী যে—মহী, তড়াগ—নদী, আকাশ-ব্যোম
নক্ষত্র যে তারা, সূর্য—রবি, চন্দ্র—সোম,
সবই জানতেন—সবই এই হিন্দুশাস্ত্রে পাবে......"

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে মনের চোখে জেগে ওঠে মন্দ্র-এর জ্বালাতপ্ত কবি-ব্যক্তির অধীর কণ্ঠস্বর ঃ—

"লজ্জা নাই! 'আর্য' বলে চেঁচাই হাসিমুখে!
মুখে বলি তা, বাজে যে কথা বজ্রসম বুকে।
ছিলাম বা কী হয়েছি একী!—
এ কথা নাহি ভাবিয়া দেখি,

১। 'আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ' (প্রবন্ধ)।
২। দ্রষ্টব্য—'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল'—শ্রীদিলীপ রায় প্রণীত।
৩। ঐ।

নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে!
বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।"

এ-ধরণের উদ্ধৃতি প্রমাণ অনিঃশেষ হতে বাধা নেই। অতএব, আলোচনা আর দীর্ঘায়ত না করেও বলা যেতে পারে, প্রহসন ও ব্যঙ্গ-নাট্যের জগতেও দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরুষ-তীব্র কবি-ব্যক্তিত্বই স্বাদুতার প্রধান উৎস।

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে দুর্লভ দৃঢ়তা ছিল,—সেই সংগে ছিল গীতি-কবির সর্বাতিক্রমী আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্ফীতি। ফলে, ভাল এবং মন্দ সম্বন্ধে এক দিকে তাঁর অনুভব যেমন ছিল আবেগ-তরঙ্গিত, তেম্নি সেই ভাবনার মূলে ছিল বলিষ্ঠ পৌরুষের অবিচল গভীরতা। যুগপৎ উচ্ছ্বাস এবং তীব্রতার মিশ্রণে গড়া ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব। আর সে ব্যক্তিত্ব ছিল একান্ত আত্মসচেতন, আত্মকেন্দ্রিক। দিলীপকুমার রায় বার বার তাঁর পিতৃস্বভাবের এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। যাকে মন্দ ভাবতেন, নিতান্ত সুহৃদ্‌জনের মন রক্ষার জন্যেও তাকে অকপটে মন্দ বল্‌তে দ্বিধা বোধ করতেন না,—আবার যাকে একবার বরণীয় বলে স্বীকার করেছেন,—শত অনুরোধ উপরোধ নিন্দাতেও তা পরিহার করেন নি।[১] চেতনার এই সুদৃঢ় মন্ময়তা দ্বিজেন্দ্র-কবিতায় Subjectivism-এর সুর অবারিত করেছিল। সেই আত্মলীনতার সুর-ঝঙ্কার শুনি প্রথম প্রহসন, তথা প্রথমতম নাট্যরূপ-কৃতি কল্কি অবতার-এও (১৮৯৫)। বিলাত ফেরত, ব্রাহ্ম, নব্যহিন্দু, গোঁড়া এবং পণ্ডিত সমাজ,—এই পাঁচ দলের বিরুদ্ধে পঞ্চবানের আঘাত হেনেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল কল্কি অবতার নাটকে। আর, সেই নাট্য-রস-রচনায় তাঁর কবিধর্মই প্রধান সহায়ক হয়েছিল। এই নাটকের প্রায় আগাগোড়া সংলাপ এক ধরণের ভাঙা মিত্রাক্ষরে রচিত। তা-ছাড়া, স্থান-কালোপযোগী হাসির গানের উপস্থাপনাই ব্যঙ্গের ঝাঁঝ ও রসের ব্যঞ্জনা রচনায় সহায়তা করেছে।

এই প্রথম প্রহসন রচনার প্রসঙ্গে কবি লিখেছিলেন—"প্রথমতঃ [পূর্ববর্তীদের] প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে কল্কি অবতার নামে একখানি প্রহসন গদ্যে-পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই।"[২] পরবর্তী প্রহসন বিরহ-তে (১৮৯৭) এই প্রচেষ্টায় শিল্পী আরো সফল হয়েছেন। কল্কি-অবতার-এর শালীন ব্যঙ্গ-রসিকতা পূর্ণাঙ্গ প্রহসনের রূপ ধরেছে এই নাটকে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছিলেন,—"হাস্য দুই

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।
২। 'আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ'।

প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া।" বিরহ-তে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ফলে, ব্যঙ্গতাপহীন অনাবিল হাসির স্নিগ্ধতা রচনাটিকে প্রসন্ন করে রেখেছে।

আর একটি প্রহসন পুনর্জন্ম (১৯১১) দ্বিজেন্দ্র-রচনার ইতিহাসে উল্লেখ্য। এর আগে ত্র্যহ স্পর্শ (১৯০০) এবং প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২) নামে দুটি ব্যঙ্গ নাটক লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। একেবারে শেষে লিখলেন আনন্দ বিদায় (১৯১২)। এই সব রচনায় রুচির উচ্চমান বা বাচনরীতির শালীনতা দ্বিজেন্দ্রলালের সুদৃঢ় পৌরুষের উপযুক্ত হতে পারে নি। বিশেষ করে সর্বশেষ 'আনন্দ বিদায়' 'প্যারডি'-তে রবীন্দ্র-বিমুখতা যে-ব্যক্তিগত বিদ্বেষের অবাঞ্ছিত রূপ ধরেছিল, তাতে রচয়িতার চিরশুভ্র চেতনা কলঙ্কিতই হয়েছে চিরকাল।

কিন্তু, পুনর্জন্ম-তে সে অপরিচ্ছন্নতা নেই,—বরং জীবন-শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণাম-সচেতন চিত্তবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। গভীর বিষয়াত্মক নাটক সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন,—"আমার কাব্যশক্তি যাহা কিছু ছিল, আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"১ বস্তুতঃ প্রহসনের রসোত্তীর্ণতা সৃষ্টিতেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। পুনর্জন্ম-এর গদ্য সংলাপেও স্থূল রসিকতা দুর্লভ,—সরস বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যেও কবি-কর্মের স্বাদুতা রয়েছে। অধিকাংশ সংলাপের কথাগুলিই তীক্ষ্ণ ও সচ্ছন্দ,—Smart. তাছাড়া, কথার সংগে কথার যোগে সরসতার সংগে আশ্চর্য রসব্যঞ্জনারও সৃষ্টি হয়েছে। সবার উপরে রয়েছে হাসির-গানের রস-ঋদ্ধি। এই সব গানের ভাষা হাস্যরস রচনার উদ্দেশ্যেই কল্পিত; তাহলেও, এদের মধ্যে জীবনের বৃহৎ শাশ্বত সত্যের অসংশয়িত ব্যঞ্জনা রয়েছে,—সেকালের ক্লিষ্টপ্রাণ বাঙালি সমাজের পক্ষে তার জীবনমূল্য ছিল সবিশেষ।

গোটা প্রহসনের মধ্যেও তাই রয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিরস্কারের চেয়ে জীবনের কৌতুককর অব্যাপ্তি-অপূর্ণতার স্নিগ্ধ সহাস রূপায়নের গভীরে দুর্বলতা মুক্ত নবজীবনে পুনর্জন্ম লাভের আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে সুস্পষ্ট হয়ে। বস্তুতঃ নাটক শেষে অর্থগৃধ্নু, পরপীড়ক, কৃপণ যাদব চক্রবর্তীর পুনর্জন্মই ঘটেছিল নবীন জ্ঞান-লোকে। পরকে ঠকিয়ে উৎপীড়ন করে যে-অর্থ যক্ষের মত তিলে তিলে সঞ্চয় করছিল, নিজেকেও বঞ্চিত করে পরম কার্পণ্যে যে সঞ্চিত অর্থকে সে আগ্‌লে রেখেছিল, মৃত্যুর পরে তার ভয়াবহ বিনষ্টির সম্ভাবনা না মরেই সে চোখের 'পরে দেখ্‌তে পেলে।

১। 'আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ'।

পরে সঞ্চিত সম্পদের সদ্ব্যহার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। এই বিনষ্টি চিত্রের অংকনে প্রসংগতঃ জনমত, সংবাদপত্র ইত্যাদির আপাত মহৎ ভূমিকার অন্তরালে যে অসামাজিক দীনতা আছে, তার প্রতিও প্রহসনকারের কৌতুক কটাক্ষ রয়েছে।

'পুনর্জন্ম' দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর গম্ভীর সিরিয়াস ব্যক্তি স্বভাবের সফল পরিচয় বহন করে। বস্তুতঃ তাঁর প্রহসনগুলিও নিছক প্রহসন নয়, সিরিয়াস জীবন-রস-সঞ্চারের আকাঙ্ক্ষায় নাট্যগুণান্বিত-ও।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব-সুরভিত এই সিরিয়াস্ জীবনায়নের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যপ্রবাহে। প্রহসন ও ঐতিহাসিক নাটকের মাঝখানে ছিল দু'খানি 'গীতি-নাটিকা', বা 'নাট্যকাব্য'—সীতা (১৯০০) এবং পাষাণী (১৯০০)।

প্রথমোক্ত নাটকটির প্রথম গ্রন্থন সাল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু, কবির নিজের কথা থেকেই জানা যায় 'সীতা' 'পাষাণী'র আগে রচিত হয়েছিল,—আর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' (১৯০৩) পাষাণীর-ও পরের রচনা।[১] তাছাড়া, 'সীতা' নবপ্রভা নামক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই।

কবি নিজে ভূমিকায় সীতা-কে "কাব্যকলা হিসাবে মাত্র" বিচার করবার নির্দেশ দিয়েছেন। নাম-পত্রেও এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে "নাট্য-কাব্য" বলে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজি Opera-র শিল্প-শৈলীর সংগে সীতা-র রচনা-প্রকরণের তুলনা করা যায়। Opera-র রূপ-প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ—"Two qualities take precedence of dramatic power as conditions for success in opera ; one is the theatrical sense, and the other the histrionic sense. Third dramatic sense, the last is the sense of fine music."[২]—নাটকীয়তা opera জাতীয় রচনার প্রধান উপাদান নয়,—গীতিধর্মকেই নাটকের আঙ্গিক আধারে স্থাপন করতে পারার কলাকৌশল এর শিল্প-স্বভাব। opera অর্থে মূলতঃ বুঝি "A drama set to music, as distinguished from plays in which music is merely incidental."[৩]

এ-অর্থে সীতা-কে 'ওপেরা' বলা চলে না,—'ওপেরা' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে "গীতিনাট্য"। কবি কিন্তু, এই রচনাকে সংগীতের তরংগে বেঁধে তুলতে চান্ নি;—অপর পক্ষে,—একে 'নাট্য-কাব্য' বলেছেন। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভারই আর এক নূতনতর অভিব্যক্তি

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।
২। Encyclopaedia Britannica.
৩। ঐ।

'সীতা'র নাট্যরূপ। এদিক্ থেকে ভবভূতির কাব্য নাট্য 'উত্তররাম চরিত'-এর শিল্পশৈলী দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রভাবিত করেছিল। বিষয়-বিন্যাসে ও রামসীতার চরিত্রায়ণে ভবভূতির কল্পনার অনুবর্তন সম্বন্ধে শিল্পী নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন ভূমিকায়। কেবল, দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-স্বভাবে গীতি-প্রবণতা (Lyricism) যেটুকু ছিল,—ঠিক সেই পরিমাণেই সীতা গীতিধর্মী। তাছাড়া, কাব্য-স্বাদুতার ঘনতা বিধান করবার প্রয়াসে কবি বরং সংলাপ-অংশে অপরূপ ছন্দ-বিচিত্রতারই সঞ্চার করেছেন। একটি-মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ—

"লক্ষ্মণ। চতুর্দশ বর্ষ পরে—
ঊর্মিলা। পাইয়াছি প্রাণেশ্বরে
আজি যদি প্রভু;
নাহি ছিল অধীরতা হৃদয়ে বিরহ-ব্যথা
পাই নাই কভু।
জানিতাম, ঊর্মিলার তুমি, আর সে তোমার,
এ বিশ্ব ভিতরে;
জানিতাম, এই ভবে আবার মিলন হবে,
কিংবা জন্মান্তরে।"

এই অপূর্ব ছন্দ-শৈলীতে কাব্যের চেয়ে নাটকীয়তা-ও ("Theatrical quality") কম নেই। ফল কথা, দাম্পত্য জীবনের মধুময় পবিত্রতা-বোধের ব্যক্তিগত জীবন-সাধনায় উনিশ শতকের বাঙালি পারিবারিক জীবন-মূল্যায়নের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের মহিমা ছিল অতুল্য। রামায়ণের পুরাতন গল্পে, সেই নবীন জীবন-রসকে গীতিকাব্য রূপ দিয়েছেন তিনি সীতা নাট্যকাব্যে। সীতা যে-পরিমাণে নাটক, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ভাবোদ্বেল কাব্য। নূতন যুগের প্রাণ প্রেরণায় অতীত মূল্যবোধের নব-রূপায়ন এর শিল্প-ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আখ্যাপত্রে পাষাণীকে "গীতি-নাটিকা" নামে অভিহিত করা হয়েছে। আসলে এই নাটকেরও রূপ-প্রকরণ মূলতঃ সীতা-রই সমস্বভাবিত। রামায়ণের অহল্যা-কাহিনীকে উনিশ শতকের নারীবৎসল কল্যাণ-স্নিগ্ধ দৃষ্টির আলোকে নবমূল্যায়িত করবার প্রয়াস রয়েছে এতো। তবে, শিল্প-সফলতা সীতা-র তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর।

এই দুটি কাব্য-নাট্য রচনার পরে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন; 'তারাবাই' (১৯০৩) "টড্-প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত" কাহিনী অবলম্বনে লেখা হয়েছিল। এখানেও 'নাট্যকাব্য' রচনার স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল মুক্ত হতে পারেন নি। মোটামুটি নাটকটি অমিত্রাক্ষর পদ্যে লেখা। কিন্তু, সে সংলাপ যে সুখ-শ্রাব্য হয়নি, কবি

নবীনচন্দ্র সে কথা নাট্যকারকে জানিয়েছিলেন,—পরে তাঁর নিজেরও এ-বিষয়ে আর মোহ ছিল না। তাই, পরবর্তী নাটক রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন ও সাজাহান গদ্যেই রচিত হয়। তাছাড়া, কাব্য-গুণের মতো নাট্যগুণ-ও যে নাটকে অবশ্য কাম্য,—ঐ সময় থেকেই লেখক এই সত্য যথার্থ অনুধাবন করলেন। এ-সব কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন।১

সম্ভবতঃ তারাবাই-এর পরবর্তী নাট্যপঞ্জী সম্বন্ধেই দেবকুমার রায়-চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন,—"তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোনো স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।"২ তাহলেও ঐ সব নাটককেও যথার্থ অর্থে ঐতিহাসিক শিল্প সৃষ্টি বলা যেতে পারে না। স্বয়ং নাট্যকার একাধিক প্রসঙ্গে বলেছেন,—"ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়, কাব্য।" এ-সিদ্ধান্তের মৌল তাৎপর্য সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ কিছু নেই। ইতিহাস ও সাহিত্যিক নির্মিতির স্বভাব-পার্থক্য নির্দেশ করতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—যে-কোনো বিষয়ে মোটামুটি তথ্যের আহরণই প্রধানভাবে ইতিহাসের কাম্য,—সাহিত্যের সাধনা আসলে সত্য-প্রতিষ্ঠার। কবি বলেছেন,—"তথ্য, যাহাকে ইংরেজিতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনা-বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভা বলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহৎ ব্যক্তির কার্য বিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।"৩

ইতিহাসের সংগে সহিত্যের সম্পর্ক, তথা ঐতিহাসিক শিল্প সৃষ্টির আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট সংকেত রয়েছে এই উদ্ধৃতিতে। বিচিত্র প্রসঙ্গ থেকে আহৃত ইতিহাসের তথ্যমালার ভেতরকার ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করে, পাঠকচিত্তে তার চিরন্তন প্রতিষ্ঠা দেবার সাধনাই শিল্পীর ধর্ম। কিন্তু, এ-কথা ভুলবার উপায় নেই, ইতিহাসের উপাদান ও পরিবেশই ইতিহাসাশ্রিত শিল্প-রচনার ভিত্তি। অর্থাৎ, ইতিহাসের সঞ্চিত তথ্যাদি কোনো ব্যক্তি বা জীবন-পরিবেশ সম্বন্ধে যে বিশ্বাস বা ধারণার আভাস দেয়,—শিল্পী

১। দ্রষ্টব্য ঃ—আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ।
২। দ্বিজেন্দ্রলাল।
৩। কৃষ্ণচরিত্র ঃ—আধুনিক সাহিত্য।

তারই অখন্ড-পূর্ণ পরিচয় রচনা করেন তাঁর কল্পলোকের নিভৃত সাধনায়। এ-দিক থেকে, যে-যুগের ঐতিহাসিক কাহিনী রচনার আশ্রয়, শিল্পীকে সেই জীবন-প্রবাহের সংগে একাত্ম হতেই হবে,—নিজের দেশকালের স্মৃতি-অনুভবকে সৃজন-চেতনা থেকে করতে হবে একান্ত পরিহার। তাঁর রচনা পড়ে পাঠকও যেন অনুভব করে সে নিজের যুগ ছেড়ে ইতিহাসের যুগেই বাস করছে,—ইতিহাস-রসের ঐটুকু নিম্নতম দাবি;—শাজাহান-এর জীবন-নাট্য আস্বাদন করতে করতে যেন মনে হয় আমরা শাজাহানের যুগে বসে তাঁর জীবন-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে চলেছি। তা না হলে, আমাদের যুগের কবির ভাষায় আমাদের কল্পিত শাজাহানকে যদি দেখ্‌তে থাকি, তাতে সাহিত্যের স্বাদ পাব, কিন্তু ঐতিহাসিক জীবন আস্বাদনের স্বাদুতা কালাতিক্রমণ (anachrorism)-এর দোষে হবে ব্যাহত। কবি-কল্পনার মণি-হার রচনা ইতিহাসাশ্রিত শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়,—কবির মানস প্রত্যয়ের সূত্রে ইতিহাসের প্রণোদিত বিশ্বাসকে অখন্ড রূপদানই তার স্বাদুতার প্রধান অবলম্বন। এই প্রয়োজনে কবি-চেতনায় ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা (Historical Fidelity) আবশ্যিক উপাদান। আর, তার জন্যে অপরিহার্য-ভাবে চাই কবি-মানসের নৈর্ব্যক্তিক তদাত্মতা। দ্বিজেন্দ্রলালের আবেগাকুল, তীব্র-প্রখর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তা একেবারেই ছিল না,—নিজের দেশ-কাল-জীবনের মন্ময় ভাবনায় তাঁর আমূল চেতনা হয়েছিল ধ্যান বিলীন। তাই, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস সমর্থিত তথ্য-প্রবাহের পাত্রে শিল্পীর সমকালীন জীবন-প্রীতির subjective গীতি-স্বাদুতাকেই আস্বাদন করি,—কেবল সেই গীতিরস নাটকীয় অ্যাক্‌শন্‌-এর আধারে ধৃত হয়ে রয়েছে। এক কথায় জীবন-মর্মলীন অমিশ্র ইমোশন্‌কে 'অ্যাক্‌টি-ভাইজ্‌' করাই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সিরিয়াস্‌ নাট্য-শৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য। এখানেই তিনি বাঙালির নাট্য স্বভাবের সফল উদ্বোদ্ধা,—উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যকার-কুলচূড়ামণি।

প্রতাপসিংহ [রাণাপ্রতাপ] (১৯০৫) থেকেই এই শিল্পশৈলীর সূচনা ঘটেছে। গোটা কাহিনীটি,—কয়েকটি কল্পিত রোমাণ্টিক্‌ উপকাহিনী বাদে—ইতিহাসের উপাদান দিয়ে গড়া। কিন্তু, সংগ্রামী প্রতাপসিংহের সর্বস্বপণ স্বদেশ-প্রেম সাধনার তুলনায় এতে বাঙালি চেতনার স্বদেশ-হিতব্রতের অগ্নিতপ্ত বাসনাই যেন রূপ পেয়েছে। শক্ত সিংহের প্রতি দৌলৎউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসার প্রণয় কাহিনীতে সেকালের রোমান্‌টিক্‌ প্রেম-স্বপ্নাকুলতার মধুস্বাদ সঞ্চারের সফলতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু, সমসাময়িক জীবন-চিত্রায়ণের এই অতি সাফল্যই প্রতাপসিংহ-কে সফল ঐতিহাসিক নাটক হতে দেয় নি। এ-যেন হয়েছে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমকালীন বাঙালি জীবন-নাট্যের এক কাব্য-নির্যাস!

দুর্গাদাস (১৯০৬) নাটক সম্বন্ধেও একই কথা বল্‌তে হয়; যদিও ঐতিহাসিক উপাদানের অতিভারাক্রান্ততা এই নাটকের কাব্যগুণকেও মন্দীভূত করেছে।

নূরজাহান (১৯০৮) নাটককে কেন্দ্র করেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-স্বভাবের পূর্ণ প্রকাশ। তাঁর নাট্যশৈলীর বহিরঙ্গে সেক্‌স্‌পীয়রীয় আঙ্গিক অনুসরণের সচেতন চেষ্টা রয়েছে। এ-কথার স্বীকৃতি নাট্যকারের উক্তিতেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে,—একাধিক স্থলে। প্রতীচ্য নাট্য সাহিত্যে সেক্‌স্‌পীয়রের শ্রেষ্ঠ দান ঘটনা-প্রধান নাটকে মানব মনোধর্মের প্রতিফলন,—নাটকীয় চরিত্রাবলীর কর্মমুখর বহিরঙ্গ ঘাতপ্রতিঘাতের মর্মমূলে অন্তঃ-সংঘাতের সৃষ্টি। নাটক মূলতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্প-রূপ। চোখ দিয়ে যা দেখি এবং কান দিয়ে যা শুনি, তার অব্যবহিত আবেদনের সমষ্টি নিয়েই নাট্যরসের স্বাদুতা। এক কথায়, অভিনয় ও সংলাপের বাহ্য অভিব্যক্তিই নাট্য--কলার রসবাহন। নাটকের এই বহিরঙ্গ প্রকাশ-বাহনকে সেক্‌স্‌-পীয়র মানবের সংঘাত-জটিল মনোধর্মেরও দর্পণ রূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন;—প্রতীচ্যে নাট্যশৈলী নবজীবন লাভ করল, অন্তরমূল্যের নতুন দ্যোতনায়। বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম অন্তঃসংঘাতের মনোধর্মী স্বাদুতা সঞ্চার করলেন বহিরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাতের মর্মদেশে। আর, নাট্যশৈলীর অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও তিনি ছিলেন সেক্‌স্‌পীয়রের সচেতন অনুসারী।

কিন্তু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসরূপের আধার নাটকের দেহে কাব্যস্বাদুতাময় মন-কল্পনার সঞ্চারণে সেক্‌স্‌পীয়রের সংগে দ্বিজেন্দ্রলালের কারু-দক্ষতার পার্থক্য কেবল পরিমাণগত নয়,—গুণগত। এখানে তিনি বিশুদ্ধ বাঙালি জীবনধর্মের সার্থক রূপকার। সেক্‌স্‌পীয়র অন্তঃসংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল মানব-রস-স্নিগ্ধ কাব্য স্বাদুতার সৃষ্টি করেছেন, আর দ্বিজেন্দ্র-লাল আসলে জীবনমর্ম-নিহিত সকরুণ কাব্য-সুর-ঝঙ্কারকেই নাট্য রূপ দিয়েছেন। ফলে, তাঁর নূরজাহান নাটকেই নয়, সব সিরিয়াস্‌ নাটকেই কাব্য-ই কেবল নাটকের দেহাধারে ধৃত হয়েছে। এক অর্থে দ্বিজেন্দ্রলালের সব সিরিয়াস্‌ নাটকই নাট্যকাব্য।

নূরজাহান-এর ভূমিকায় শিল্পী নিজেই বলেছেন,—"নূরজাহানের মনের উপর দিয়া প্রবৃত্তির উপর প্রবৃত্তির ঢেউ চলিয়া যাইতেছে, পাঁচ ছয় প্রকার ভাব আসিয়া উপর্যুপরি তাহাকে অধিকার করিয়াছে। সেই জন্য চরিত্রটি বিশেষ জটিল হইয়াছে। জনসাধারাণের কাছে, বিশেষতঃ কোনো কোনো সমালোচকের এ-চরিত্রটি বোধ হয় একেবারে দুর্বোধ্য ঠেকিবে।" এখানেই নূরজাহান-এর নাট্য-রস-সীময়াতি সম্বন্ধেও পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। আগেই বলেছি, ঘটনাসংঘাতময় জীবন-চিত্রণের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য

স্পষ্টতা নাট্যরস-স্ফুরণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এই কারণেই নাটকের অন্তঃ-সংঘাত অর্থ মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম জটিলতার ব্যাখ্যা বা ব্যঞ্জনা নয়। বস্তুতঃ মনস্তাত্ত্বিক জীবন-সমস্যার চিত্রণ বিশেষভাবে কথাসাহিত্যের আঙ্গিকেই সফল হতে পারে। কথা-শিল্পীর লেখনী বর্ণনাশ্রয়ী। ব্যাপক বর্ণনার (narration) মাধ্যমে মনের গহন-নীল রহস্যময় স্পর্শকাতরতাকে অনুভব-বেদ্য করে তোলা তাঁর পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। নাটক অ্যাক্শন্-প্রধান শিল্প,—ন্যারেশন্-এর অবকাশ নেই তাতে। অতএব, মনস্তাত্ত্বিক অস্পষ্ট ব্যঞ্জনাই কেবল নাট্যদেহে রচনা করা যেতে পারে। তাতে প্লট্-এর প্রাঞ্জলতা একদিকে আচ্ছন্ন হয়; তেমনি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় অন্তঃ-সংঘাত বহির্ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বলে, নাট্যদেহের সংসক্তি হয় একান্ত শিথিল।

নূরজাহান এবং দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য সিরিয়াস্ নাটকেও এই ধরণের ঘটনা-শৈথিল্য ও ভাব-উদ্বেলতা সাধারণ লক্ষণ। বাঙালির নাট্যচেতনার কাছে অবশ্য এই পদ্ধতি গাঢ়তর কাব্যস্বাদুতার বাহন হয়েছে। বস্তুতঃ নাট্যগুণের ঘাট্তি যেটুকু পড়েছে, নারীচিত্তের রহস্য-দ্বন্দ্বের রোমাণ্টিক জটিলতা অপূর্ব স্বপ্নাবেশে তাকে করেছে পরিপূরিত। আর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, উনিশ শতকের নারীস্বাতন্ত্র্য-কেন্দ্রিক জীবন-চিন্তার অতল-তল থেকেই শিল্পী তাঁর কাব্য-ভাবনার উপাদান আহরণ করেছেন। বাংলা-দেশের কল্যাণব্রতী পরিবার-প্রেমলীনা নারী-স্বাতন্ত্র্যের রহস্য-সন্ধানী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে মধুসূদন-বঙ্কিমেরই উত্তরসাধক। নূরজাহান নাটকে নূরজাহানের স্বাতন্ত্র্যময় নারীত্বের অতলান্ত রহস্য-চিত্রণে বঙ্কিমের রোমাণ্টিক স্বপ্নময়তার প্রতিচ্ছবি-ই চোখে ভাসে। নারীমনের রহস্য-জটিলতার খবর মানুষ দূরের কথা, দেবতারাও জানেন না,—এমন প্রবাদ আছে। নূরজাহানের চরিত্রকে কেন্দ্র করে কবি সেই দুর্জ্ঞেয় জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।

টুকরো টুকরো কথা ও উপঘটনার (incident) সংকেত-সূত্র অনুসরণ করা সম্ভব হলে মনে হয়, কুমারী জীবনের সূচনায় নূরজাহান স্বেচ্ছায় শেরখাঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন। শেষ বিদায়ের ক্ষণে (প্রথম অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য) শেরখাঁ মেহের উন্নিসাকে বলেছিল,—"......আমায় দুষো না মেহের! মনে করে দেখ, সে কি প্রলোভন। যেদিন তুমি আমার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিপথে উদয় হয়েছিলে—হে সুন্দরি! যখন আমার উন্মুখ বাসনার মাঝখান দিয়ে তোমার রূপের শকট চালিয়ে দিলে; যখন জীবনের ধ্যান শরীরী হয়ে আমার জাগ্রত স্বপ্নে এসে দেখা দিলে; আমি আপনার মধ্যে আপনাকে ধরে রাখ্তে পার্লাম না!"

অথচ, এই স্বেচ্ছা-স্বীকৃত বিবাহ যখন সুস্থির, তখনই মেহের উন্নিসা

আকবরের অন্তঃপুরে গিয়েছিল,—পিতার নিষেধ অস্বীকার করেও,—সেলিমকে রূপে ভোলাবে বলে। এ-কথাও তার নিজেরই স্বীকারোক্তি (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)। এরপরেও সে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, "আমি সম্রাটকে কখনো ভালোবাসি নাই।"

এমন কি সম্রাটের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তিও নেই তার,—"সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। হয়ত উচ্চাশা—হয়ত অহংকার। কিন্তু আসক্তি নয়।"

নিজের দ্বিমুখী আকর্ষণের হিসেব নিকেশ করে শেরখাঁর মৃত্যুর পর স্বাগতোক্তিতে (২-৩ দৃশ্য) আবার নূরজাহান বলেছে,—"ঈশ্বর! ঈশ্বর! কেন আমি কখনো তাঁকে (শেরখা) ভালবাসতে পারি নাই? তাঁর চেয়ে ভালোবাসার যোগ্য পাত্র আর কে ছিল? দেবতার মত গঠন, সিংহের মত বীর্য, মাতার মত স্নেহ, শিশুর মত সারল্য!—তবু তোমায় ভালোবাসতে পারি নাই।......আমার উচ্চাশাই তোমার সর্বনাশ করেছে, আমারও সর্বনাশ করেছে।"

অতএব, নূরজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে নারী-হৃদয়ের পরস্পর-বিরোধী দুটি বৃত্তির তীব্র সংঘাত। এক, তার প্রেম-বাসনা;—মহৎ-কে, বলবান্-কে, প্রাণদীপ্ত স-হৃদয় পৌরুষকে সর্বস্বপণ করে ভালবাসতে পারার আকাঙ্ক্ষা। আর একদিকে রয়েছে তার অন্ধ বিজিগীষা,—নারীর 'উচ্চাশা',—তার "অহংকার'। তাই, শেরখাঁকে ভালবাস্‌বার পিপাসা যেমন প্রেমপিয়াসিনী মেহেরউন্নিসার যৌবনের আরাধনা,—তেম্‌নি রূপ-প্রমত্তার মদান্ধতা অ-নিরোধ্য হয়েছিল ক্ষমতার লোলুপতায়। প্রথম রূপে নারী কল্যাণী, পুরুষের রক্তাক্ত জীবন-সংগ্রামে স্নিগ্ধ মমতার প্রবাহ। দ্বিতীয় রূপে সে সর্বনাশী,—নূরজাহানের নিজের ভাষায় "রাক্ষসী" (৫-৮ দৃশ্য); —নিজের স্বার্থান্ধ বাসনার হলাহল দিয়ে নিজের-পরের সর্বনাশের অতলে তার অনির্বাণ বিনষ্টি!

প্রথমটির প্রভাবে সুন্দরী মেহের শেরখাঁর পূর্ণ-সুন্দর পৌরুষকে আত্মদান করতে যায়; দ্বিতীয়টির তাড়নায় ক্ষমতা-বুভুক্ষু মেহের পিতার বাধা অস্বীকার করে,—ভাইকে দিয়ে অনেক অনুনয় করিয়ে পিতার সম্মতি নিয়ে ছুটে যায় আকবরের অন্তঃপুরে; গভীর রাত্রে সবাই চলে আসার পরে উন্মত্ত নৃত্যে বিহ্বল করে তোলে কুমার সেলিমকে, নারী-দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিয়ে চরম ক্ষণে মুখাবগুণ্ঠন অসম্বৃত করে রূপোন্মত্ত সেলিমের হৃদয়কে বিবশ করে দিয়ে ছুটে পালিয়ে আসে। অথচ, "শেরখাঁর সংগে তখন বিবাহের কথা ঠিক হয়ে গেছে।"

প্রথমটির প্রভাবে, বর্ধমানের পবিত্র গার্হস্থ্যে স্বামি-প্রেমের পুণ্যধারায় স্নিগ্ধ হয়েছে তার অন্তর,—স্নিগ্ধ করেছে শেরখাঁর পরিবার-ধর্মকে। দ্বিতীয়টির প্রলোভন মেহেরকে শেরখাঁর পরিবার-জীবনের মমতাময় পরি-

বেগেও ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল করে তুলেছে,১—দ্বিতীয়বার দৈবাৎ ক্ষণিকের সাক্ষাতে দীর্ঘ পরিবার-জীবনের সকল বন্ধন,—মাতৃত্বের সকল মহিমাময় দাবিকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করেছে। তারপর মেহেরউন্নিসা যেদিন নূরজাহান হয়েছে, সেদিন থেকে বহির্জগতে চলেছে ক্ষমতা-ক্ষুধাতুরা রাক্ষসীর একচ্ছত্র অভিযান। নিঃসংগ নারীর সেই দুর্বার পথযাত্রার ধূলি-জাল প্রকীর্ণ হয়েছে পরবর্তী নাটকীয় ঘটনা প্রবাহে। ঘটনাস্রোত,—তার আবর্ত ও সংঘাত উপলক্ষ্য; একমাত্র লক্ষ্য প্রমত্তা নারীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অমানুষী চেষ্টা।

আর এই অগ্নিক্ষরা জীবন-যুদ্ধের বহিরঙ্গে যত জ্বালা আর তাপ জমেছে ঘটনা-সংঘাতের মাধ্যমে, অন্তরে অন্তরে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তা পুড়িয়ে দগ্ধ করছিল নূরজাহানের অন্তর্লীনা স্বভাব-মানবীকে। তার ভয়ংকর-করুণ পরিণাম লক্ষ্য করি সহায়-সম্বলহীনা উন্মাদিনী নূরজাহানের যন্ত্রণা-কর পরিণামের মধ্যে। আর,—এই জীবন-যন্ত্রণার সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত আগাগোড়া নূরজাহান নিঃসংগ-একক। তার প্রেমাতুর মনের নিভৃত লালিত্য, তার উদগ্র বিজিগীষা,—এককথায় তার গোপনতম প্রাণ-বাসনা,—তার দ্বন্দ্ব ও যাতনা কোনো কিছুর সংগেই শেরখাঁ বা জাহাঙ্গীর কারোই কোনো যোগ ছিল না। তাই, নূরজাহানের দু-দুটি স্বামীর জীবন্ত অস্তিত্ব নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহে অনস্বীকার্য হলেও, নূরজাহান নাটক আসলে নায়কহীন। বহিরঙ্গ নাটকীয়-ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত-ও নূরজাহানের এই নিঃসংগ জীবন-যন্ত্রণারই বাহক হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে। ফলে, নাট্য-দেহে অতিব্যাপ্তি তথা সংসক্তির অভাব জনিত শৈথিল্য দেখা দিয়েছে।

প্রথমতঃ শেক্সপীয়রীয় নাট্যঘটনার উপস্থাপনে যে ত্রিবিধ ঐক্যের কল্পনা করা হয়েছে, তার মধ্যে দেশগত ঐক্য প্লট্-এর কোথাও সুলভ নয়। নূরজাহান, তার দাম্পত্যজীবন, বা ক্ষমতামত্ত বাসনার অনুসরণে নাট্য-কাহিনী বর্ধমান থেকে দিল্লী,—দিল্লী থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল,—সেখান থেকে আবার দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, দাক্ষিণাত্য,—এমন কি ভারতের বাইরে কাবুল পর্যন্ত উল্কার মত ছুটে ফিরেছে। ঘটনা-প্রবাহের গতি নাটকীয় সংসক্তির পক্ষে হয়েছে দুর্নিরোধ্য।

অন্য দিকে কাহিনীর ব্যাপ্তি-ও ঐক্য-বিমুখ বিচিত্রচারিতায় ছড়িয়ে পড়েছে। মোগল-যুগের ঐতিহাসিক জীবনের বিশ্বস্ত প্রাণ-চুম্বক রচনার চেয়ে উনিশ শতকের নারী-জীবন-মাধুর্যের কৌতূহলী রসবাসনাই দ্বিজেন্দ্র-লালের মধ্যে প্রবলতর ছিল। ফলে, নূরজাহানের রহস্যময় জীবন-দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটনের সহায়তায় আরো দুটি মধুময়ী নারী-চরিত্রের জীবন-রূপ

১। প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য ঃ—শেরখাঁর সমাপ্তিক উক্তি।

অঙ্কন করেছেন। নূরজাহানের মধ্যে নারীর মধুরিমা উচ্চাশার আগুনে দগ্ধ হয়ে উন্মত্ত পৈশাচিকতার রূপ পেয়েছিল। তার পাশে ছিলেন গরিমা-ময়ী দেবী রেবা,—যিনি জাতীয় মিলনের মহত্তম বেদীতে নিজের রক্তাক্ত প্রাণ বলি দিয়ে চলেছিলেন,—প্রথম থেকেই,—কিন্তু নিজের বিবাহিত স্বামীকে প্রেম দিতে পারেন নি কখনো। দেবীর মত তিনি সর্বকল্যাণময়ী,—কিন্তু প্রেমময়ী মাধুরী নারী নন। নাটকে এই অভাব পূরণ করেছে নূরজাহান-কন্যা লয়লা। সে একাধারে কল্যাণী, প্রেমিকা, মমতাময়ী নারী। নাটকের সমাপ্তিলগ্নে (৫-৮ দৃশ্য) আসফ্-এর কণ্ঠে লয়লা-র এই পরিচয় সমুদ্ভাসিত হয়েছেঃ—"লয়লা! নারী দেবী হয় শুনেছি। সম্রাজ্ঞী রেবা সেই দেবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে স্বর্গের কাহিনী আমরা ভালো ধর্তে পারি না। কিন্তু, মর্ত্যের সংগীত যে স্বর্গের কাহিনীকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারে, সে তুমি দেখালে।"

ফলকথা—রস-স্বভাবে নূরজাহান যেমন নাটকের আঁধারে রোমাণ্টিক্ কাব্য, তেম্‌নি প্লট্-এর জীবন-মূল্যে মোগলযুগের ঐতিহাসিক তথ্যের আধারে উনিশ শতকের বাঙালি জীবন-বাসনার মধুসুরভিত। যেমন কাহিনীর প্রাণ-ধর্মে, তেমনি সংলাপের বিন্যাসে গোটা নাটকে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা রক্ষিত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলাল পদ্য ছেড়ে নাটকে গদ্য-সংলাপ রচনা করেছিলেন, "পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই"[১] বলে। বস্তুতঃ তাঁর নাট্য-সংলাপে গদ্যের স্বেচ্ছাগতির মর্মে পদ্যের ঝঙ্কারকে নির্বাধ করেছেন তিনি আগাগোড়া নাটকে,—নিজের কবি-প্রাণের ভাষায়। তাঁর নাটকে সংলাপ চরিত্রানুগ নয়; —নবাব থেকে নফর,—প্রেমিকা থেকে দুশ্চারিণী সবাই একই ভাষায় কথা বলে;—সে-কথা দ্বিজেন্দ্রলালের রোমাণ্টিক স্বপ্নাবিষ্ট কবিমনের সৌন্দর্য-পিপাসু ভাষা। সেই কবিকে,—স্বপ্নভ্রষ্টা শিল্পীকে কবি রচনা করেছেন শারিয়ার-এর মধ্যে;—তাঁর কণ্ঠে দিয়েছেন নিজের বিশ্বপ্রেমিক সুন্দর-পূজারী আত্মার ভাষাঃ—"আশ্চর্য! তোমাদের [শাজাহান ও পরভেজ] কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নেই? এ জগৎ কি একটা হত্যাশালা! ওসব ছেড়ে দেখ দেখি ভাই আকাশ কি নীল, ধরণী কি শ্যাম; শোন বিহঙ্গের কূজন, নদীর জলকলরব। প্রাণ দিয়ে অনুভব কর এই বিশ্বনিখিল।"

ফলকথা, নূরজাহান নাটকে ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের বিশ্বস্ত জীবনায়ন, অর্থাৎ নাট্যশিল্পের সফল স্বাদুতাকে ছাপিয়ে, উনিশ শতকের রেনেসাঁস-পরিণত বাঙালি জীবন-চেতনার অপূর্ব কাব্য-রূপ অঙ্কন করেছেন দ্বিজেন্দ্র-লাল,—সে-কবিতায় শিল্পীর সমকালীন জীবন-বাসনার দর্পণে নিত্য দিনের

১। আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ।

বাঙালি রূপ অক্ষয় রসমূর্তি লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-সাহিত্যের এটি সাধারণ পরিচয়,—বাংলা নাটকের সৃজনভূমিতে কবি-নাট্যকার তিনি!

নূরজাহান-এর পরের 'ঐতিহাসিক নাটক' মেবার পতন (১৯০৮)। কিন্তু, এর ইতিহাস-কথা দ্বিজেন্দ্রলালের উনিশ শতকীয় জীবন-কল্পনার রঙে নতুন রঙিন হয়ে উঠেছে,— ঐতিহাসিক কালাতিক্রমণ দোষে তার প্রাচীন জীবন-স্বভাব হয়েছে লুপ্ত; সেই সংগে পুরাতন গল্পের আধারে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির জীবনাদর্শ যেন পেয়েছে অখণ্ড কাব্য-রূপ। নাটকের ভূমিকায় শিল্পী স্বয়ং বলেছিলেন, "এই নাটকে আমি এক মহা-নীতি লইয়া বসিয়াছি; সে-নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জাতীয় প্রেম, এবং বিশ্ব প্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।"

বলাবাহুল্য মেবার-এর উত্থান এবং পতন, উভয় ইতিহাসেরই প্রাণবস্তু ছিল সর্বস্বপণ স্বদেশ-প্রীতির মধ্যযুগীয় উদাত্ততা। সেই রক্তাক্ত সংগ্রাম ও স্বেচ্ছাকৃত জীবন-বলিদানের অগ্নিময় ইতিহাসে মেবার-এর নারীদের ভূমিকাও কম ছিল না। কিন্তু সে ভূমিকা অগ্নিহোত্রীর যজ্ঞকুণ্ডে সমিধ যোগাবার ভূমিকা;—অথবা চরম মুহূর্তে নিজের নারী-জীবনকেও সেই যজ্ঞকুণ্ডে পুড়িয়ে ছাই করবার ভূমিকা। তাতে প্রেমের চেয়ে উৎসাহ, মমতার চেয়ে সাহস, স্নিগ্ধতার চেয়ে দীপ্ততাই ছিল রাজপুত নারীদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। কিন্তু শৌর্য ও উৎসাহের সেই জীবন-পরিবেশকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রেমস্নিগ্ধ চেতনায় সিক্ত করে এক স্পর্শকাতর ভাব-প্রবণতার রসে সিঞ্চিত করেছেন। যুদ্ধের বদলে প্রণয়, হত্যার বদলে প্রাণ-পণ আদর্শ-সাধনার রোমাণ্টিক্ মহিমা, ট্রাজিক সমাপ্তির বদলে দীপ্ত আদর্শবাদের উচ্ছ্বসিত উৎসাহ। অর্থাৎ, পুরাতন জীবনের সংগ্রাম-ময় জীবনাদর্শবাদের আধারে নবীন দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের রোমাণ্টিক স্বপ্ন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হয়, এই নাট্যরচনার কাল ব্রিটিশ বাংলায় মুক্তি-যজ্ঞের ঊষা-লগ্ন,—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১২) মধ্য-ভূমিতে। এ-কথাও মনে রাখতে হয়, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের সাধনায় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালির জীবনলোকে রেনে-সাঁসের যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল,—আলোচ্য স্বদেশী আন্দোলনেই তার সফল উদ্‌যাপন। এর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯), ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ ও পরবর্তী কালের পৌনঃপৌনিক অসহযোগ-আন্দোলন, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ এবং তার পরেরকার বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, সব কিছু মিলে ভারতের বৈপ্লবিক প্রয়াস তখন নাগরিক আভিজাত্যের কেন্দ্রচ্যুত হয়ে বাংলা ও ভারতের সর্বজনীন লোকজীবন-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে-ইতিহাস

বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। সে যাই হোক, ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক আদর্শবাদের সে ছিল মহত্তম পরিণতির যুগ। সে-কালের কবি-কল্পনা ঐ পরিণতির প্রত্যাশায় বর্ণাঢ্য রোমাণ্টিক স্বপ্ন-স্বর্গ রচনায় তন্ময় হয়েছিল। আর উনিশ শতকীয় বাংলায় সমাজ-নির্ভর রেনেসাঁসের উদ্ভব হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সম্পূর্ণ নারীর কল্যাণী রূপের সাধনা করে। স্বাতন্ত্র্য-বলিষ্ঠ নারীত্বের স্নেহ-প্রেম-মধুর পারিবারিক জীবনাদর্শ ছিল সেদিনের একমাত্র ধ্যানের সামগ্রী। সেই কল্যাণ-স্নিগ্ধ জীবন-রূপের বাসনাকে আশ্রয় করেই ক্রমশঃ জাতীয় ভাবনা ও স্বদেশ-প্রেমের উদ্ভব। আর, বিশেষ করে, আলোচ্য আন্দোলন কালে বাঙালির কল্পনা জাতি-প্রেমকে আশ্রয় করে বিশ্ব-প্রেমে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল। রামমোহনের প্রাথমিক স্বদেশ-চিন্তাতেই বিশ্ব-নীতি-কল্পনার স্পষ্ট অঙ্কুর-আভাস প্রত্যক্ষ করেছি। স্বদেশী যুগে পরিবার-প্রেম, জাতি-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্ভাবনা আদর্শবাদী বাঙালি-শিল্পীর স্বপ্ন-কল্পনাকে আন্দোলিত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের আবেগ-তীব্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে সেই জাতীয় স্বপ্ন-রূপই কাব্য-মূর্তি পেয়েছে মেবারপতন-এর নাটকীয় আধারে।

ফলে, প্রথম থেকেই নাটকের গল্প পৌরুষ-দীপ্ত রাজপুত-স্বভাব হারিয়ে, নারী-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালির পরিবার-প্রেমভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। গোটা প্লট্-এর মধ্যে পর পর তিনটি দুর্ধর্ষ যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে,—প্রথম দুটিতে যথাক্রমে হেদায়েৎ আলি এবং আব্দুল্লার নেতৃত্বাধীনে মোগল সেনা-সমুদ্রকে জয় করেছিল রাজপুত সেনাদল। তৃতীয়টিতে মহবৎখাঁর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মুখে মেবারের বি-ভীষণ পতন। কিন্তু, নাট্য-ঘটনার মধ্যে প্রথম দুটির প্রাসঙ্গিক সংবাদ (information) ছাড়া কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাত-প্রভাব (impact) নেই। বরং, প্রথম যুদ্ধ উপলক্ষ্যে মানসী ও অজয়সিংহের রোমাণ্টিক প্রণয়কথা ঘনতর হয়েছে মানসীর সেবা-ব্রতকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য, সেবাব্রতিনী মানসীর চরিত্রে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সম্বন্ধে সেকালের বাঙালি-মনের স্বপ্নমহিমা-বোধ আরোপিত হয়েছে। অপর পক্ষে যুদ্ধদৃশ্যে হেদায়েৎ-আলি প্রসঙ্গ রাজপুত জীবন-সংগ্রামের উদাত্ততার বদলে যুদ্ধ-প্রহসনের কৌতুককর ছবিই যেন এঁকেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধ-চিত্রের যে সংকেত আভাসিত হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে সায়েদ আবদুল্লার শিবির-চিত্রণে, তাতেও যুদ্ধঘটনার গুরুত্ব নেই মোটেই। বরং সেই যুদ্ধ-চিত্রকে পাশ কাটিয়ে সত্যবতী-সাগরসিংহ-অরুণ-সিংহ সংবাদে একটি দেশপ্রেমস্নিগ্ধ পারিবারিক মিলনরসই উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় এবং শেষ যুদ্ধেও, আগেই বলেছি, যুদ্ধের উদাত্ততা নেই, আছে হত্যার বিভীষিকা। সেই বীভৎস ধ্বংসচিত্রে রোমাণ্টিক করুণাঘন স্নিগ্ধ-

তার প্রলেপ দিয়েছে অজয় সিংহের মৃত্যু, মহবৎ-কল্যাণীর সাক্ষাৎকার; সবশেষে মৃত অজয় সিংহের উদ্দেশে প্রকাশ্য প্রেমনিবেদনান্তে মানসীর বিশ্বপ্রেমিকা মূর্তি ধারণঃ—"যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্।"—এ মানসীর উক্তি নয়; স্বদেশী আন্দোলন যুগের বাঙালি-জীবন-চারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মহামানবিক বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি। তা-ছাড়া, রাজপুত জাতীয়তার ঐতিহাসিক পরাভব সম্বন্ধে নাটকের উক্তিও আসলে নাট্যকারের আদর্শবাদী প্রত্যয়দৃঢ়তার সৃষ্টিঃ—"মুসলমান ধর্ম, আর যাই হোক্ তার এ-মহত্তটুকু আছে যে, সে যে-কোনো বিধর্মীকে নিজের বুকে করে আপনার করে নিতে পারে। আর হিন্দুধর্ম?—একজন বিধর্মী শত তপস্যায় হিন্দু হতে পারে না। এত গর্ব! এত অহঙ্কার!"—অন্ধ সংকীর্ণ জাতি-মত্ততার এই 'অহংকার'-কেই নাট্যকার হিন্দুত্বের,—রাজপুত হিন্দু-জাতীয়তার পরাভবের কারণ বলে ইঙ্গিত করেছেন। তাহলেও তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে মহবৎ-এর উক্তি আসলে দ্বিজেন্দ্রলালের উদার জীবনবাদের কাব্যরূপ!

প্রসঙ্গকে বাড়িয়ে লাভ নেই,—গোটা প্লট্-এর মধ্যে রাজপুত জীবনের ঐতিহাসিক প্রত্যয়-পরিচয়কে ছাপিয়ে রেনেসাঁস-উত্তর বাংলার জীবন-প্রশ্নের ছবিই আগাগোড়া রূপ পেয়েছে। চরিত্রায়ণের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্যই স্ব-প্রকাশ। কল্যাণীর আন্তর্ধর্মীয় প্রেম—মানসীর চির-অপূর্ণ পূর্বরাগ, সত্যবতীর দেশগৌরবদীপ্ত মাতৃত্ব, সব-কিছুর মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের স্বপ্ন-মাধুর্যময়ী কল্যাণী নারীকেই প্রত্যক্ষ করি; কেবল চরিত্র-স্বভাবে নয়, —বাচন-ভঙ্গীতেও। আগেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রলালের সব নাটকেই সংলাপের ভাষা চরিত্রানুগ নয়,—সবই তাঁর গীতি-কাব্যিক মনের রচনা। তাছাড়া, পুরুষ চরিত্রগুলিতেও দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ-চেতনার ছাপই প্রধান। অমর সিংহের মধ্যে একটি উদার, পূর্বাপর বিচারশীল, সৌন্দর্য-প্রেমিক শিল্প-স্বভাবকেই প্রত্যক্ষ করি। পিতারূপে, শাসকরূপে, দ্বিজেন্দ্রলালের অপ্রমেয় প্রেমময় কবি-ব্যক্তিত্বেরই প্রতিভাস বলে মনে হয় চরিত্রটিকে। অজয় সিংহের মধ্যে প্রেমিক ও দেশপ্রেমিক-এর রোমাণ্টিক কল্পমূর্তি একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। রাজপুত শৌর্য, আত্মত্যাগ ও উদাত্ততার মহিমা একটিমাত্র পুরুষ চরিত্রে প্রস্ফুট হতে দেখি,—সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ তিনি। আজীবন প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন,— বার্ধক্যে প্রতাপ-পুত্রের সাহায্য করতে কম্পিত হস্তে মৃত্যুবর্ষী তরবারি ধারণ করেছেন বার বার। আদ্যন্ত স্বভাবে জাতিগৌরব, রাজপুত ঐতিহ্যবোধের পরস্পরাবিরোধী সংকীর্ণতা, অন্তঃকোমল, বহিঃকঠিন করুণাঘন দৃপ্ততা, সবকিছুই আদর্শ মেবারী-সমুচিত হয়েছে। কিন্তু, তা হলেও রাজপুত ইতিহাসের দেশ-কালোচিত

জীবন-ভূমিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেনি, গোটা নাট্য-প্লটের স্বপ্নাচ্ছন্ন পরিবেশে গোবিন্দসিংহকে মনে হয় যেন, অতীতের পৃষ্ঠা থেকে মধ্যযুগের স্বপ্নলোকে অবতরণ করেছেন তিনি। স্বদেশবন্দনা করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন,—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" এই স্বদেশ-প্রেমিকের চরিত্রাঙ্কণেও আপন দেশপ্রেমের কবি-স্মৃতিকে মন্থন করে কল্পনার স্বপ্ন-উপাদান তৈরি করেছেন তিনি।

এ-পর্যন্ত আলোচনায়, একটা কথা বারবার অনুভব করেছি,—মেবার পতন-এ ঐতিহাসিক নাট্য-স্বভাব খণ্ডিত হয়েছে,—শিল্পি-চেতনার ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার অভাবে। কিন্তু, তাই বলে, মেবারপাতন অসার্থক সৃষ্টি নয় একেবারেই। ইতিহাসের গল্পের পাত্রে স্বদেশী আন্দোলন যুগের বাঙালিকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নবজীবন-রস পান করিয়েছেন। সে যেমন স্বপ্নমদির, তেম্‌নি মধুর জাতীয় উদ্দীপনায় ভরা। দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের ঐতিহাসিক জাতীয় প্রেরণার রসরূপ হিসেবে মেবারপতন আশ্চর্য সুন্দর;—কেবল কাব্য বিচারেই নয়,—নাট্যাঙ্গিকেও। নুরজাহানের মত এর কাব্য-কাহিনী বহুধাব্যাপ্ত শৈথিল্যে এলিয়ে পড়তে পারে নি। দেশ-কাল-ঘটনার ঐক্য কবি-কল্পনাকে এক আশ্চর্য সংহতি দিয়েছে। অন্য দিকে বহিঃসংঘাতের বদলে আন্তর মধুরিমার ব্যঞ্জনা-প্রভাবে এক ভাবময় কাব্য-সুষমার সৃষ্টি হয়েছে। সব কিছু মিলে মেবারপতন পূর্ণাঙ্গ নাটক হতে পারে নি যদিও,—তবু সত্যিই হয়েছে,—অপরূপ সুন্দর নাট্য-কাব্য।

মেবারপতন-এর পরে প্রকাশিত হয় সাজাহান (১৯০৯); এটি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক বলেও কথিত হয়ে থাকে। আর সাজাহান নাটকের এই মর্যাদা কেবল অকারণ জনশ্রুতিই নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-স্বভাবের পরিপূর্ণতা ঘটেছে এই নাটকে। আবেগদীপ্ত কাব্য-বাসনাকে নাটকের আধারে সংঘাতময় রূপ দেবার প্রবণতাই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সহজ নাট্যধর্ম। নুরজাহান নাটকে ঘটনার ব্যাপক ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে, রোমান্স সুন্দর মনোবিশ্লেষণের প্রয়াসও সহজে লক্ষণীয়। কিন্তু, ঘটনা ও কল্পনার সংসক্তির অভাবে নাট্য অবয়বের শিথিলতা ঘটেছে। মেবারপতন-এ রোমাণ্টিক স্বপ্ন-কল্পনার ঘনবদ্ধ সংহতি রয়েছে,—কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের উত্থানপতন তাতে স্তিমিত। তাই, মেবারপতন যেন একটি উৎকৃষ্ট কাব্য। সাজাহান নাটকে এই দ্বিবিধ উপাদান,—ঘটনা ও কল্পনা, সংঘাত ও আবেগ বিমিশ্র অখণ্ডতা পেয়েছে,—নাটকটি হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব-ঋদ্ধ নাট্য-স্বভাবের সফলতম প্রকাশ।

এই নাটকের সারা বহিরঙ্গ জুড়ে সেক্‌স্‌পীয়রীয় সংঘাতের শৈলী যেন মূর্তি ধরেছিল;—সেই সংগে ছিল অপরিহার্য অন্তর্দ্বন্দ্ব। চরিত্রায়ণেও

সেক্‌স্‌পীয়রের একাধিক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রসংগ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। অসহায়, বৎসল-হৃদয় অথর্ব সাজাহানের নির্জিত আক্রোশ ও জ্বালাতপ্ত পৌনঃপুনিক উন্মত্ততার চলমান ঝঞ্ঝা King Lear-এর আত্মান্ধ পিতৃত্বের পরিণামী চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আগ্রার দুর্গে উন্মাদ সাজাহানের অতন্দ্র সেবিকা জাহানারার মধ্যে Cordelia-র ছায়াপাত ঘটেছে। তাছাড়া, সাজাহান নাটকের তীব্রতম ব্যক্তিত্ব ঔরংগজীব,—তার চরিত্রে রয়েছে Macbeth-এর উচ্চাশা ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সংগে Iago-র ক্রূরতা,—নির্মম অভিসন্ধি পরায়ণতা। কিন্তু, সেই সংগে এ-কথাও স্মরণীয় যে, সাজাহান-এর চরিত্র চিত্রণ আগাগোড়া সেক্‌স্‌পীয়রের 'কপি' নয়। এই নাটকটি লিখ্‌বার সময়েই দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পি-মনে সেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যাঙ্গিকের ছাঁচ দৃঢ় হয়ে বসেছিল; ফলে প্রতীচ্য নাট্য-দেহের একটি পিনদ্ধ রূপায়ন চোখে পড়ে এই নাটকে;—দ্বিজেন্দ্রলালের সৃজন প্রবাহে এই রচনাটিই সব চেয়ে নাট্য-রস-ঘন। কেবল এইটুকুই আমাদের বক্তব্য। তা না হলে, একটি সংহত নাট্যরূপের সারা দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পারিবারিক কল্যাণ-চিন্তা-স্নিগ্ধ কবি-কল্পনার বিভা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন যথারীতি। বরং নাট্যরসের ক্রমবর্ধমানতার সংগে রোমাণ্টিক্‌ কাব্যস্বাদও ঘনতর সঞ্চারিত হয়েছে। এই সৃজনশৈলীর ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্য,—স্বকীয়।

প্রথমেই নাটকে এই কবি-ভাবনার ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করবার মত। সাজাহান নাটক ভারতের এক প্রচণ্ডতম রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাসকে বক্ষে ধারণ করে বিকশিত হয়েছে,—সেই বিধ্বংসী মৃত্যু-প্রবাহের প্রায় একতম রূপকার ছিলেন ঔরঙ্গজীব। এদিক থেকে সন্দেহ নেই, আদ্যন্ত নাটকে "সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা।"[১] নাট্য ঘটনায় সাজাহানের এই পরোক্ষ, দুর্বল ভূমিকাকে কেন্দ্র করে নাটকের নামকরণ দুর্বল হতে বাধ্য,—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, পরিবার-জীবন-স্বপ্নের কবি দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে সাজাহান-এর নাট্যদ্বন্দ্বের ভাবকেন্দ্র বিভীষিকাপূর্ণ রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে নয়,—সাজাহান নাটক প্রাণ-স্বভাবে "পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের" ইতিহাস।

পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে "এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎখাঁ" দিলদার ঔরঙ্গজীব-এর কাছে আত্মপরিচয় দিতে বলেছিলেন,—"আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে, ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম!" এ কেবল আকস্মিক উক্তি নয়, সাজাহান নাটকের ভাব-স্বভাব সম্বন্ধে নাট্যকারের অনুভব এখানে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে।

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত।

প্রথম অংক প্রথম দৃশ্যে এই পারিবারিক দ্বন্দ্ব, তথা রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃ বিরোধের আকারেই প্রাথমিক ঘটনাকে (Initial incident) উপস্থিত করা হয়েছে। সুজা বিদ্রোহ করেছে, মোরাদ গুর্জরে সম্রাট পদবী নিয়েছে, ঔরংগজীব তার সংগে যোগ দিয়েছে; দারা প্রস্তুত হয়েছে এ-সব কিছুর দমনের জন্য;—অর্থাৎ বারুদ স্তূপে আগুনের ফুল্‌কি প্রবেশ করেছে; তখন সাজাহান বলেন, "এই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাব্‌ছি। (ধূমপান; পরে সহসা) না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌বো। কাজ নেই। তাদের নির্বিরোধে রাজধানীতে আসতে দাও।"

জাহানারা যখন স্নেহ-দুর্বল সাহাজানকে পুত্রদের শাসন করতে বলেন, তখনো সাজাহানের একই কথাঃ—"আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারা মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার। তাদের শাসন করবো কোন্‌ প্রাণে জাহানারা!"

অতএব, দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-চিত্তে এ পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের,—ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার সংঘাতের কাহিনী,—"পারিবারিক বিগ্রহের" ইতিহাস। বিশেষ করে রাজপরিবারের ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব বলেই সারা ভারতের রাষ্ট্র ক্ষেত্রে তার অগ্নিতাপ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু, ভারত-বিপ্লবের ব্যাপক ভূমিতে কাহিনীকে টেনে এনেও তার পারিবারিক নিভৃতি ও মমতাময়তার স্নিগ্ধ পরিবেশটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কবি-নাট্যকার;—দারার পারিবারিক বিনষ্টির করুণাঘন কাহিনী, সুজা-পিয়ারার রোমান্স-করুণ স্বপ্ন-কথা,—সর্বত্রই পরিবার জীবন-রসের স্বাদুতা ঐতিহাসিক বিপ্লব-আবেদনকে অতিক্রম করে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাজাহান এই পারিবারিক সংঘাত-দুর্ঘটনার প্রাণ-সূত্র। প্রতিটি ক্ষয়ক্ষতি-বিনষ্টি তাঁর পিতৃ-চেতনার গহনে আলোড়ন-আবেদন রচনা করে তবেই যথামূল্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই, সারা ভারতের অগ্নিযজ্ঞে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে,—নাটকের সেই প্রতিটি বাহ্য সংঘাত চিত্রণের পরিণতি ঘটেছে সাজাহানের মানস-যন্ত্রণার দুঃসহতায়। চতুর্থ অংক পঞ্চম দৃশ্যে এই সত্যের স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে,—সাজাহানের নিজেরই উক্তিতেঃ—"আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা! আর কি বাকি আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক। মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা!"

একই কারণে নাটকের পরিসমাপ্তি-ও ঘটেছে সাজাহানের বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত পিতৃচিত্তের শেষ-পরিণাম প্রদর্শন করে। ঔরংগজীবের জীবনব্যাপী দুরভিসন্ধি আর বিবেকহীন আচরণের শেষে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ সাফল্য

পেয়েছে;—জয়ী হয়েছে,—নিষ্কণ্টক হয়েছে ঔরংগজীব! পঞ্চম অংক পঞ্চম দৃশ্যে বহির্ঘটনার নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটেছে এখানেই। কিন্তু, কেবল পারিবারিক-জীবন-নাট্যের পূর্ণতা বিধানের জন্যেই এর পরেও সাজাহানের সম্মুখে বিজয়ী সম্রাট অপরাধী পুত্রের স্নেহব্যাকুল ভিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয়ঃ—"আমি পাপী। ঘোরতর পাপী! সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দিবে।"

দিগ্বিজয়ী আলমগীর বাদশাহ উন্মাদ অথর্ব পিতার পা জড়িয়ে ধরে বলে, "আমায় ক্ষমা করুন পিতা!"

পিতা সাজাহান, উন্মাদ-অথর্ব সাজাহান এক মুহূর্তে সচকিত হয়ে ওঠেন,—আরো তিন পুত্রের হত্যাকারী নির্মম পাপাচরী পুত্রকে ক্ষমা করতে;—এমন কি জাহানারা-কেও ক্ষমা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর একমাত্র যুক্তি "তোরই মত মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাক্‌তো, সে কি কর্‌ত, জাহানারা। তার সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে জমা রেখে গেছে!"

ভারত ইতিহাসের বৈপ্লবিক সংঘাতময় বহির্ঘটনাপূর্ণ নাটকের স্বাভাবিক পরিণতি এ নয়। এ কবি-দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃ-সত্তা, প্রেমিক-সত্তার জীবন-বাণী। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পত্নী-বিয়োগের পরে 'হতভাগ্য' কবিতায় "একটি ছেলে একটি মেয়ের" মায়ের প্রসংগে কবি লিখেছিলেন,—

"ভালবাস্‌ত ছেলে মেয়ের—যেমন সব মা ভালবাসে—
প্রবল, গভীর, বিরাট, ঘন স্নেহে;
এখন তাদের রেখে গেছে, তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে,
এখন তাদের দেখেও নাকো চেয়ে!
তবে কিনা, যাবার সময় রেখে গেছে স্নেহটুকু
ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা;
হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সর্বস্বধন পুত্রটিরে,
দিয়ে গেছে কন্যা প্রিয়তমা।
এখন তাদের বাপই আছে, সে-ই বাবা, সে-ই মা,—
সে-ই তাদের
বাপের চিন্তায়, মায়ের যত্নে রাখে;"—

সাজাহান চরিত্র,—তাঁর পরিণাম,—দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-ব্যক্তিত্বের এই নিভৃত বেদনানুভবের নাটকায়িত রূপ। নাটকের আধারে সাজাহান প্রেমিক-কবির প্রাণ-রহস্যে ভরা কাব্য-ব্যঞ্জনা!

বলাবাহুল্য,—এতে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার পরিমণ্ডল আত্ম-উৎক্রমণ করে কবির কালের জীবন-ভূমিতে নেমে এসেছে। কিন্তু, সেই সংগে

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে মানবিক আবেদন হয়েছে স্নিগ্ধতর,—নিবিড়। এখানেই সেক্‌স্‌পীয়রীয় জীবনায়নের থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাতন্ত্র্য।—এমন কথা বল্‌বার স্পর্ধা কারো থাক্‌বার উপায় নেই যে সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে মানবিক আবেদনের স্বল্পতা রয়েছে। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য, তাঁর আবেগময় কবি-স্বভাব নিয়ে নাটকীয় চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালিধর্মী মানবিক ভাবালুতার (humanistic Sentiment-এর) এক অপূর্ব বৈভব তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে, ঔরঙ্গজীব-এর মত স্বার্থান্ধ, অভিসন্ধিপর, নির্বিবেক পাষণ্ড-ও পুরো পিশাচ হয়ে উঠ্‌তে পারে নি। অবচেতনার অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ জাগরিত বিবেকের দংশন তার মানব-চেতনাকে বিমথিত করেছে,—তাতে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘন-পিনদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার চেয়েও বেশি সঞ্চারিত হয়েছে মানব-রস-ভাবুকতার এক আবেগময় স্বাদুতা। সোলেমান ও মহম্মদ-এর পিতৃভক্তি, সিপার-এর আর্তদুঃসহ জীবন-পরিণাম, পিয়ারার প্রেম-স্নিগ্ধ করুণ ধাত্রী নারীত্ব, নাদিরার সর্বংসহ সতীত্ব-বেদনা,—জহরৎ-এর ক্ষিপ্ত প্রতিবিধিৎসা,—সব কিছুর মধ্যেই "পারিবারিক বিগ্রহের" নিভৃত মানব-রস-স্নিগ্ধতা আরো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অথচ, তার পাশে পাশে ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, হত্যা, দুর্ঘটনার নাটকীয় পিনদ্ধতাও হয়েছে উত্তুঙ্গ। তাই, বলছিলাম, বহিরঙ্গের নাটকীয় বলিষ্ঠতার সংগে অন্তরঙ্গের কাব্য স্বভাবের ভাবসামঞ্জস্য বিহিত হতে পারায়, দ্বিজেন্দ্র-নাট্য-প্রবাহে সাজাহান সর্বশ্রেষ্ঠতার মর্যাদা দাবি করে।

নাট্য পরিণামের মধ্যে নাটকীয়তা ও কাব্য-স্বাদুতার এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি স্বতোভাস্বর। পরিণামী আবেদনের বিচারে সাজাহান-কে Tragedy বা Comedy কিছুই স্পষ্ট করে বলা চলে না। অথচ, বহির্ঘটনার বিচারে, ঔরঙ্গজীবের সুনিশ্চিত সিদ্ধির মুহূর্তে নাটকটি Comedy হতে পারত। আবার, ঔরঙ্গজীবের নির্মম বিজয়ের পটভূমিতে উন্মত্ত, অথর্ব, অসহায় তিনটি নিহত পুত্রের জনক সাজাহানের জীবন-পরিণাম সহজেই Targic হতে পারত। কিন্তু, শেষ দৃশ্যে ঔরঙ্গজীবের ক্ষমা প্রার্থনা ও সাজাহানের অসহায় ব্যাকুল ক্ষমা দান,—এ করুণ, না, আনন্দ-পরিণামী! চরম মুহূর্তে জাহানারা যখন ক্ষমা-উন্মুখ সাজাহান-কে প্রশ্ন করে!—"পিতা! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা?" অসহিষ্ণু সাজাহান বলেন, "চুপ! জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিস্‌ নে। তাদের ত আর ফিরে পাবো না। সাত বৎসর দুঃখে কাটায়েছি, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছি। দেখ্‌ছিস্‌ ত, একদিন সুখী হতে দে!"

একদিন,—এক মুহূর্তের সুখ-সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে চিরদিনের হৃদয় যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার এই পলায়নপর বাসনার মধ্যে সুখের কূলে

কূলে ছাপিয়ে ওঠে বেদনার কারুণ্য। অথচ, চির-অপরাধী পুত্রকে চরণ-তলে ক্ষমাভিক্ষু দেখে ক্ষমা না করেও ত উপায় থাকে না! অক্ষমণীয়কে অপার যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষমা করতে পারার পেছনে পিতৃহৃদয়ের যে স্বতস্ফূর্ত তৃপ্তি আত্মগোপন করে থাকে, তাকেই বা অস্বীকার করি কি করে! যত দুঃখ এতে, যত বেদনা,—তৃপ্তি তত, তত চরিতার্থতা

অন্যদিকে পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে বিজয়ী আলমগীরের অন্তরলীন পরাভূত মানুষের যে করুণাঘন মূর্তি প্রত্যক্ষ করি, তাতে ঔরঙ্গজীবকেও একটি সার্থক-জীবন চরিত্র বলে মনে করতে পারি না। বরং বহিঃ সম্রাট অন্তর্ভিক্ষু মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণাই তাকে পিতা ও ভগ্নীর ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যাকুল করে তুলেছিল। ঐ একটি জায়গায় ঔরঙ্গজীব-এর সকল কূট অভিসন্ধিকে ছাপিয়ে অনাবৃত-করুণ মানুষটি স্বতোব্যক্ত হয়ে পড়ে। সেই পরাভবের যন্ত্রণা,—অবিবেকীর বিবেক দংশন তার বিজয়ী জীবনের নিত্য সংগী হবে,—জহরৎ-এর কণ্ঠে এই অভিশাপ-বাণী নাটকের চরম মুহূর্তকে সুখ-বিষাদের এক বিমিশ্র ভাবনায় ভরপুর করে। অতএব, কী সাজাহান-জাহানারা-জহরৎ, কি ঔরঙ্গজীব,—উভয়পক্ষের ভাবনাতেই বিমিশ্র সুখ-দুঃখের অনুভব অন্তর্লীন হয়ে থাকে। তাই, বলছিলাম, সাজাহান পরিণামী স্বভাবে Targi Comedy,—যার শিল্প স্বভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে:—"Beyond this major division [of tragedy and comedy] there are various admixtures of the two chief kinds, to which the term tragicomedy has vaguely been applied...."[১]

সাজাহানের পরের নাটক চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)। বস্তুতঃ এখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাট্য-রচনার স্বর্ণযুগ অবসিত হয়েছে;—এর পর থেকে নাটক রচনার সকল দিকেই প্রতিভার অবসাদ লক্ষিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত নাটকেও প্রতিভার কোনো বিশেষ নূতনতর অভিব্যক্তি ঘটে নি। দ্বিজেন্দ্র-লালের কাব্য-স্বাদী রোমাণ্টিক কল্পনা নাটকের আধারে শরতের বিস্রস্ত মেঘের মতই যেন উড়ে বেড়িয়েছে। নাটকীয় সংহতি তথা সংঘাতের উত্তুঙ্গতা আবেগতীব্র ভাব-স্বপ্নে বিলীন, শিথিল হয়ে পড়েছে। সন্দেহ নেই, এই নাটকেও অপরাপর ঐতিহাসিক রচনার মত ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্যের মোটামুটি ভিত্তির 'পরেই কবি তাঁর কল্পনার সৌধ নির্মাণ করেছেন। তাহলেও, ইতিহাসের চেয়ে স্বপ্নভাবুকতা, নাটকের চেয়ে কবিতার প্রতিই শিল্পীর ঝোঁক ছিল একান্ত বেশি;—নাটকের শুরুতে প্রথম অংক প্রথম দৃশ্যের পরিবেশ নির্দেশ থেকেই সেই রোমাণ্টিক কল্পনাধর্মিতার উৎসার

১। Theory of Drama by A. Nicoll.

অবারিত হয়েছেঃ—"স্থান—সিন্ধু-নদ-তট; দূরে গ্রীক জাহাজ-শ্রেণী। কাল সন্ধ্যা।

নদতটে শিবির-সম্মুখে সেলুকস্ অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়াছিলেন;
হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা
সূর্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পাড়িয়াছিল।"

এই পটভূমিতে সেকেন্দার-এর ভারতবন্দনা স্বপ্ন-মথিত পরপারের বাণী বহন করে আনে যেন। মূল নাটকের দুটি প্রায় সমান্তরাল গল্প-ধারা;—এক ভারত-ইতিহাস-সম্ভূত; চন্দ্রগুপ্ত-মুরা-চাণক্যের সাধনার ফল-শ্রুতি। আর এক ধারা গ্রীক জীবনের কাহিনী, সেলুকাস-হেলেন-আণ্টিগোনাস্-কথা। দুটি গল্পই যেন অতীতের স্বপ্ন জগৎ থেকে মধু-সুরভিত জীবনের আভাস বয়ে উঠে এসেছে কল্পনার আকাশে। ইতিহাস-কথাশ্রিত সেই রোমান্টিক্ গল্প লোকে কবিভাবনার মোহমদির স্বপ্ন-ঘনতা সঞ্চারিত হয়েছে যথাক্রমে মলয়াধিপতি চন্দ্রকেতু ও তার বোন ছায়ার প্রীতি-প্রণয়-কাহিনীতে, আর আণ্টিগোনস্-এর মাতৃসান্নিধ্য-লাভের উপাখ্যানে।

একদিকে অতীত স্বপ্নচারী রোমাণ্টিক বিহ্বলতা, অপর দিকে কাহিনীর দ্বিধা-বিভক্তি নাটকীয় সংহতিকে শিথিল করেছে। তাছাড়া, একাধিক যুদ্ধ সংঘটন ও জয়পরাজয় চিত্রিত হলেও ঘটনাসংঘাতের অন্তরালে কোনো মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নেই,—এমন কি চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রেও। এদিক থেকে চন্দ্রগুপ্ত বরং অনেকটা নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্প্রাণ। আগাগোড়া নাটকের উত্থানভূমিতে চাণক্যের হাতের ক্রীড়নক তিনি। চাণক্যই তাঁকে বড় করছে,—চাণক্য সরে যেতেই তিনি সর্বনাশের মুখে গিয়ে পেণছেছেন। অন্য পক্ষে নায়কোচিত ধীরতা বা উদাত্ততা নেই চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রে। দুর্বল স্বভাব, নারীসুলভ অভিমান, আত্মাদর ও ভাবালুতায় পরিস্ফীত তিনি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে নন্দ সম্বন্ধে আবেগ-করুণা প্রকাশের ভঙ্গিতে দুর্বল ভাবালুতাই প্রকাশ পেয়েছে। অবিমৃষ্যকারী আত্মাদর ও অভিমানের প্রকাশ ঘটেছে চন্দ্রকেতু-বিচ্ছেদের দৃশ্যে। এই চরিত্রায়ণ একদিকে চন্দ্রগুপ্তের ঐতিহাসিক শৌর্য সম্বন্ধে কালজয়ী প্রত্যয়কে খণ্ডিত করে। অপর পক্ষে কেন্দ্রবর্তী চরিত্রের এই দুর্বলতা নাট্য-সম্ভাবনাকে দুর্বল Melodrama-ধর্মিতার অভিমুখী করেছে।

তাছাড়া, নায়ক-শক্তিও এতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে নাট্য-সংহতিকে শিথিল করেছে। চন্দ্রগুপ্ত এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র,—অর্থাৎ, তাঁর জীবন-কথাকে কেন্দ্র করে নাটকের সূচনা; আবার হেলেন ও ছায়াপরিণয়ের স্নিগ্ধ পরিবেশে নাট্য-কাহিনীর পরিসমাপ্তি। অন্যান্য ঘটনা ও চরিত্রাবলী চন্দ্রগুপ্ত-

জীবনের অভিমুখী। কিন্তু, তাহলেও চন্দ্রগুপ্ত এ নাটকের নায়ক নন,—নায়কত্বের সে একক গৌরব কেবল চাণক্যেরই প্রাপ্য। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'নায়ক' বল্‌তে বুঝি নিয়ামক শক্তি ("নয়তি ইতি")। অর্থাৎ বিচিত্র বাহ্য এবং আন্তর সংঘাতে জটিল ঘটনা ও চরিত্র-প্রবাহকে একটিমাত্র উদ্দিষ্ট পরিণামের পথে যে চরিত্রশক্তি বয়ে নিয়ে চলে, তাকেই বলি নায়ক। চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত নাটকের সেই নায়ক শক্তি। চন্দ্রগুপ্তকেই কেবল তিনি পুনঃ পুনঃ জড়তা ও বিপদ থেকে মুক্ত করে বিজয়ের পথে চালিত করেন নি,—তাঁর নিজেরই কথায়,—"আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার করে দিয়েছি। এক ঊষর প্রান্তরকে উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করেছি।" শুধু তাই নয়, পরিণামী ছায়া-চন্দ্রগুপ্তের সুস্থির মিলন-সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে হেলেন ও চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ মাধ্যমে গ্রীস ও ভারতের মিলনের চিরন্তন সেতু তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন। নাটকের গতি থেকে পরিণতি, সব কিছুই মহানায়ক চাণক্যের সৃষ্টি।

কেবল তাই নয়,—এই স্বপ্ন-রস-মদির রোমাণ্টিক কাহিনী ও আদর্শ-চ্ছায়া-সুন্দর চরিত্র-প্রবাহের মধ্যে একমাত্র চাণক্যই নাটকীয় স্বভাব বিশিষ্ট। একদিকে তীব্র ব্যক্তিত্ব-শক্তির প্রচণ্ড দাবদাহে নাটকের বহিঃ শরীরে ঘটনা-প্রবাহের দাবানল রচনা করেছেন,—অপর দিকে অন্তঃসংঘাতের তীব্র যন্ত্রণায় নিজের চিত্তকেই সেই আগুনে করেছেন দগ্ধ। চাণক্যের মধ্যে এক ধরণের উন্মত্ততা রয়েছে,—কিছুটা যেন অতিপ্রাকৃত চারণের উন্মন-স্কতাও! এর সংগে সেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যধারার ভৌতিক প্রভাবের সাদৃশ্য পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র-কল্পনা এদিক থেকে অধিকতর বাস্তব এবং স্বাভাবিক। চাণক্যের মধ্যে যে আপাত উন্মত্ততা রয়েছে, তা দুর্দমনীয় প্রতিভা-শক্তির আত্মসংবরণের অক্ষমতা জনিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"প্রতিভা খেপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্‌ পালট্‌ করিতেই আসে,.........।

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।.........ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইঁহার নহে, পিনাক ঝংকৃত হয়, বিধি-বিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারই কীর্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারই কীর্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব সুরে বাজিয়া উঠে সে হইল প্রতিভাবান্‌।"[১]

চাণক্য ছিলেন যথার্থ প্রতিভাবান্‌,—কিন্তু সৃষ্টির মূলীভূত ছন্নছাড়া

১। পাগল—বিচিত্র প্রবন্ধ।

পাগলটি একদিনের দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের তার দিলেন ছিঁড়ে। এই "অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা" চাণক্যের মধ্যে হয়ে উঠল উন্মত্ত! এক-দিকে ভারত সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করল তাঁর প্রতিভা, —"কিন্তু এই বিরাট শান্তি পর্বতের মত স্থির, নিষ্প্রাণ।" কারণ চাণক্য নিজেই বুঝেছেন,—"হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না।" তাঁর "হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা গৈরিক নিস্রাবের মত উঠে, ভস্ম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্র-জ্বালা স্পর্শে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়!" তখনই চাণক্য হয়ে ওঠেন উন্মাদ। সৃষ্টির মূলীভূত যে পাগল তাঁর জীবনের মহত্তম সম্ভাবনাকে ভয়াবহ বিনষ্টি-জ্বালায় তপ্ত করে তোলেন, চাণক্য সেই "অদৃশ্য মহাশক্তি"কে কখনো সম্বোধন করেছেন "সুন্দরী" বলে, কখনো বলেছেন "প্রেয়সী", আবার কখনো বা 'পিশাচী' বলেছেন তাকেই।

চাণক্যের মধ্যে খেপামি' এবং প্রতিভার এই আন্তর ও বহির্দ্বন্দ্ব এক আশ্চর্য-জটিল প্রাণ-শক্তির উত্তাপ সৃষ্টি করেছে গোটা নাটকে। চাণক্যের জীবনের ছেঁড়া তার যখন জোড়া লেগেছে, তখন ক্ষিপ্ত প্রতিভার প্রশান্ত স্তব্ধতার মধ্যে আত্রেয়ীর স্নেহরাজ্যে চাণক্যের আত্মসমর্পণে গোটা কাহিনীর নাটকীয়তা অপরূপ পরিণতি লাভ করেছে। তার পরে চন্দ্রগুপ্ত-হেলেন-ছায়া-আণ্টিগোনস কথায় রোমাণ্টিক্ গল্পের পরিসমাপ্তি,—ঐটুকু Melodrama-র 'উপসংহৃতি'।

এক কথায় আগাগোড়া চন্দ্রগুপ্ত নাটক একটি সুন্দর নাট্যকাব্য,—রোমাণ্টিক্ স্বপ্ন-কল্পনার মোহমদির Melodrama। এর নাটকীয় উপাদান যা-কিছু চাণক্যের চরিত্রের মধ্যেই সংহত হয়ে আছে। তাতেও নাট্য সংঘাত আশ্চর্য মানব-মহিমাময় কাব্যব্যঞ্জনায় বিভান্বিত হয়ে উঠেছে। সংলাপেও,—এমন কি চাণক্যের উক্তি সমূহতেও,—সেই কাব্য-স্বাদ্ তাই প্রবল,—নাটকীয় আকৃতিটুকু কেবল উপলক্ষ্য,—লক্ষ্য দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-স্বপ্নের ছন্দোময় রূপায়ন।

এর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রবাহ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে হয়ে অনুল্লেখ্য-তার সীমায় এসে পৌঁচেছে। ইতিহাসাশ্রিত আরো একটি রোমান্স-কথাকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন; সিংহল-বিজয় (১৯১৫) নামে। বিষয়-বস্তু বাঙালিসন্তান বিজয় সিংহের "হেলায় লঙ্কা জয়" করার জাতীয় গৌরব কথা। বিজয়সিংহ বাঙালি ছিলেন না,—এ ধারণা এখন সর্বজন-বিদিত। এ-ছাড়া সোরাব রোস্তাম-এর গল্প নিয়ে লেখা আর একটি নাটক রয়েছে (১৯০৮),—একে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। শিল্পী নিজেই একে বলেছেন "নাট্যরঙ্গ"।

পরপারে নামক সামাজিক নাটকে (১৯১২) সামাজিক জীবন-চিত্রও

নেই,—বাস্তবতাও না। দাম্পত্য জীবনাদর্শ, পিতাপুত্রীর সম্পর্ক, মহৎ উদার দানশীল মনুষ্যত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের উত্তুঙ্গ স্বপ্ন-কল্পনা শিথিল-বন্ধ কাহিনীমালার মাধ্যমে গ্রথিত হয়েছে নাটকের আকারে। কি গল্প, নাট্যশৈলী, কি সংলাপ-সংগ্রন্থন, কোনোদিক থেকেই এই নাট্য-রচনা সফলতার দাবি করতে পারে না।

বঙ্গনারী নামে আর একটি সামাজিক নাটক কবির মৃত্যুর (১৯১৩) পর কবি-পুত্র প্রকাশ করেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ভীষ্ম নামে পৌরাণিক নাটকটিও (১৯১৪) কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি

আলোচ্যযুগের আরো বহু নাট্যকারের উল্লেখ পর্যন্ত না করে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল, এই প্রতিভা-ত্রয়ীর আলোচনাতেই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে যৌবনমুক্তির পরিচয় স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করি। বাঙালির নাট্য-স্বভাব আমূল আবেগে উচ্ছ্বসিত। কৃষ্ণকীর্তনের যুগ থেকে ক্রম-বিকশিত হয়ে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত যাত্রা সাহিত্যের পূর্ণ পরিণতিতে বাঙালি নাট্যাঙ্গিকের মুক্তি-সম্ভাবনা আয়ত্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। এমন সময়ে সেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যাঙ্গিকের বিশ্ব-বিমোহন সৌন্দর্যে মুগ্ধ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির নাট্য রসবুদ্ধি প্রতীচ্যাভিমুখী হয়ে পড়ে। যাত্রার সিদ্ধি-সম্ভাবনা হয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। স্বদেশ ও বিদেশের নিত্যনূতন উৎকর্ষকে আয়ত্ত,—স্বী-কৃত করতে পারাতেই সজীব সাহিত্যের সার্থকতা। কিন্তু, ইংরেজির সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ-চিত্ত বাঙালি স্বদেশের নাট্য-স্বভাবকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। তারাচরণ-যোগেন্দ্রচন্দ্র-হরচন্দ্র এই কারণেই ব্যর্থ। মধুসূদনের নাট্য রচনার কাল থেকে প্রতীচ্য আঙ্গিক-সচেতনার সংগে বাঙালি ভাবনা বাংলা নাটকে প্রথম অভিব্যঞ্জিত হতে থাকে। সেখান থেকেই আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সার্থক অগ্রসৃতির সূচনা। আলোচ্য যুগের নাট্যকার-ত্রয়ীর সাধনায় ইংরেজি আঙ্গিক-ঋদ্ধ মঞ্চে বাঙালি স্বভাব পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে,—এখানেই বাংলা নাট্যকলার যৌবনমুক্তি। এ নাটক বহিরঙ্গে আধুনিক, অন্তরঙ্গে শাশ্বত বাঙালিধর্মী,—যাত্রাভাব-বিভাবিত।

বিংশ অধ্যায়

গীতিকবিতার মুক্তি

বাংলা কবিতায় গীতি-স্বভাবের মুক্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিহারীলাল প্রবন্ধে লিখেছেন,—"বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্য-শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ-বর্ণনা সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না,—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত-উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভা-মনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই-জন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।"১

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের মধ্যে বাংলা কবিতার যৌবন-মুক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় দ্ব্যর্থহীন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। উনিশ শতকের সুদীর্ঘকাল রঙ্গলাল থেকে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পর্যন্ত যে সকল কবি "যুদ্ধ-বর্ণনা সংকুল মহাকাব্য" বা "উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগ মূলক" সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের কাব্য-কবিতাকে নিকৃষ্ট বা দুর্বল বলে কল্পনা করার ধৃষ্টতাও অপরাধ। এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে দেখেছি, জীর্ণ পুরাতনের 'পরে সমাগত নূতনের প্রাণ-প্রবাহকে বহন এবং ধারণ করবার ভগীরথ-তুল্য সাধনায় এঁরা আত্ম-বিসর্জন করে-

গীতিকাব্যের মুক্তি

ছিলেন। কিন্তু, বাংলা কাব্যে সে ছিল এক জীবন-যন্ত্রণার কাল। প্রাচ্যের উদ্বোধন ও প্রতীচ্যের অবধারণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার অক্লান্ত প্রয়াসে সেকালের কবি-চিত্ত ছিল চির-উন্মথিত। পূর্বে দেখেছি, কবি মধুসূদন মেঘনাদবধ রচনার শীর্ষ পর্যায়ে থেকে রাজনারায়ণকে তাঁর মর্মপীড়ার সংবাদ জানিয়েছিলেন,—"Probably I have got a tendency in the lyrical way."। সেই গীতি-প্রেরণার অন্তর-নিবদ্ধ ধারাকে মধুসূদন অতঃপর মুক্তি দিয়েছিলেন; বীরাঙ্গনা এবং চতুর্দশপদী কবিতার অনেক স্থলে মধুসূদনের ব্যক্তি-ভাবনা সফল মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু, সেখানেও তাঁর গীতিধর্মী কবিমানস যন্ত্রণা-বোধে দগ্ধ, এবং তপ্ত জীবনের দুঃখ-অভিমান-ভারে আপ্লুত। সেই আবরণ অতিক্রম করে মধুসূদন তাঁর কোনো কবিতাতেই

১। আধুনিক সাহিত্য।

নিভৃত মনের গোপনতম বাসনার খবর খুঁজে পান নি,—তাঁকে পারেন নি সফল প্রকাশে মুক্তিদান করতে।

বর্তমান প্রসঙ্গে মধুসূদনের কবি-স্বভাবের অসম্পূর্ণতা বা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভাবগত অব্যাপ্তির ইঙ্গিত আমাদের উদ্দিষ্ট নয়। এ-আলোচনা সফলতার পরিমাণ-বিষয়ক নয়,—রচনার গুণগত পার্থক্য নির্ণয়ই এর উদ্দেশ্য। রেনেসাঁস-যুগের তপ্ত যন্ত্রণা মধুসূদনের কাব্যে কবি-ব্যক্তির স্বচ্ছ প্রকাশকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর, বিহারীলালের রচনাতে "সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর" ধ্বনিত হয়েছে।১

হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের গীতিকবিতায়, এবং ঈশানচন্দ্রের কাব্য-কবিতায় স্থানে স্থানে কবির নিভৃত ব্যক্তিত্বের পরিচয় চকিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু, সমকালীন জীবন-প্রচ্ছদের সমস্যান্ধতা, এবং তার অভিঘাতে ব্যক্তি-চিত্তের বেদনা বা অনুশোচনাবোধের তীব্রতা এই কবি-কুলের নিভৃত-গোপন "নিজের কথার" উৎস-মূলকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। এ-দিক থেকে, বয়ঃসন্ধি যুগের যন্ত্রণার মূলে রয়েছে নিভৃত কবি-আত্মার অবরুদ্ধতা-জনিত পীড়াবোধ। শিল্পি-ব্যক্তিত্ব এই পীড়া-মুক্ত আত্মস্থতার পথ খুঁজে পেয়েছে বিহারীলালের কবিতায়। রেনেসাঁস-যুগের পরস্পর-বিরোধী কাব্য-ভাবনার অন্ধ-আলোড়ন থেকে কবিসত্তার এই মুক্তিতেই বাংলা কাব্যের যৌবন-মুক্তিও আভাসিত হয়েছে।

বিহারীলালের ক্ষেত্রে এই মুক্তি অর্থে বুঝি জাতীয়তা-ঘনিষ্ট বস্তু-নির্ভর (objective) জীবন-প্রয়োজন-বোধের হাত থেকে স্পর্শকাতরতার

ও কবি বিহারীলাল

মর্মলোকে কবির মন্ময় (Subjective) ভাবনার স্বভাব-মুক্তি। জনাকীর্ণ জীবনে সংগ্রামরত বাংলার কাব্য-ভাবনার জগতে মন্ময় কল্পনার প্রথম সংবাদ মৃদুকণ্ঠে তিনি বহন করে এনেছিলেন। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষিত অভিধা বিহারীলাল সম্বন্ধে একান্ত স্পষ্টার্থে প্রযুক্তব্য। দূরের আকাশে নূতন আলোকের বার্তা যখন আভাসিত হয়, ভোরের পাখি কলকণ্ঠে তার আনন্দ-সংবাদ সর্বপ্রথম বহন করে আনে মানুষের জগতে। পক্ষি-কণ্ঠ-লগ্ন সেই আনন্দের ব্যঞ্জনাটুকুই মানুষের মনোলোকে এসে পৌঁছায়। তার ভাব-ভাষার অবয়বান্বিত পরিচয় মানব-ভাবনার পক্ষে রহস্যময়। বিহারীলালের কাব্যেও কবির নিভৃত কথার গূঢ় ভাব-ব্যঞ্জনাটুকু পাঠকের মর্মলোকে রসহ্যাবরণের সৃষ্টি করে। কিন্তু, তাঁর বক্তব্যের সবটুকু অর্থ নিঃশেষে প্রকাশ করতে পারে

১। দ্রষ্টব্য—ঐ।

না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে বিহারীলালের কবি-কর্মকে স্বগতোক্তি নামে অভিহিত করেছেন।

তাঁর প্রখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গলে' নিজের অন্তর-নিহিত ধ্যানী কবিসত্তাকে উদ্দেশ করে কবি জিজ্ঞাসা করেছেনঃ—

"হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু নয়নে
কাহারে ধেয়াও।"

সমগ্র কাব্যটিতে কোথাও এ-প্রশ্নের উত্তর বোধগম্য হতে পারে নি। তাই, এক রস-বিদগ্ধ পাঠিকা এই প্রশ্নের উত্তরযুক্ত নূতনতর কাব্য দাবি করেছিলেন কবির কাছে। কবি নূতন কাব্যে আবার সেই পুরাতন কথাই লিখ্‌লেন তাঁর 'সাধের আসন'-এঃ—

"কাহারে ধেয়াই, দেবি,
নিজে আমি জানি নে।"

'সাধের আসন' কাব্যের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী,—এ-কথা আজ সর্বজন-জ্ঞাত। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধানতম লক্ষিতব্য বিষয়,—কবি বিহারীলাল নিজেই তাঁর কাব্য-ধ্যানের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট অবহিত ছিলেন না। কবির মনের গভীরে ভাবের উচ্ছ্বাস সর্বদাই তরল চপল ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়েছে; কিন্তু প্রায় কোনো মুহূর্তেই তা ঘনবদ্ধ কাব্য-ভাবনার (Poetic emotion) অবয়ব লাভ করতে পারে নি। ফলে, বিহারীলালের ভাবনা যেমন অন্বয়হীন, তাঁর প্রকাশ তেমনি অস্ফুট-ব্যক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"প্রকৃত পক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্টবোধ হয় না।"১ অথচ, কবি নিজে গোটা কাব্যটিকে অখণ্ড-রূপে কল্পনা করেছেন। সারদা তাঁর কাছে "কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া, স্নেহ, প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন।"২ জগতের মূলীভূত সৌন্দর্যকে কবি তাঁর আত্মার ব্যক্তিগত প্রেমসূত্রে গেঁথে তোলার প্রয়াস করেছেন। আর, জননী-প্রেয়সী-কন্যার প্রতিটি স্বরূপে এই সৌন্দর্য-স্বভাব সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি ছিল নিবিড়ঃ—

"হিমাদ্রি শিখরে 'পরে,
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবন।

১। ঐ।
২। ঐ।

বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন!
কিরণে ভুবন ভরা
হাসিয়ে জাগিল ধরা;
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণ।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস সরে কমল কানন।"

কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু, নিরঙ্গ সৌন্দর্যের এরূপ বিচিত্র রূপ-কল্পনায় কবি-ভাবনা প্রায়ই পরম্পরা-বদ্ধ থাকে নি। 'কুমারী'-কল্পনা থেকে হঠাৎ কখন 'প্রেয়সী' কল্পনায় তিনি উত্তীর্ণ হচ্ছেন, কখন আবার ফিরে আস্‌ছেন নূতন কল্পনার জগতে, অধিকাংশ সময়েই তা আকস্মিক এবং দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। অথচ, একই কবিতা ছুটে চলে স্তবকে স্তবকে। সারদা মঙ্গলের এই অ-বিন্যস্ত ভাবনা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে হয়ত অর্থাবহ করা চলে। কিন্তু, অপরাপর একাধিক কাব্যে কবির প্রসঙ্গ-পরিবর্তন, কল্পনা-বিবর্তন কোনো পূর্ব-প্রস্তুতির অপেক্ষা রাখেনি বলে দুর্বোধ্য হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিসর্গ-সন্দর্শনের একাধিক কবিতার উল্লেখ করা চলে। সারদামঙ্গলেও ভাবনা ও প্রকাশের খণ্ড-বিচ্ছিন্নতা কবি-চেতনার 'পরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি;—গোটা কাব্যটিকে তিনি যেখানে সেখানে সর্গবদ্ধ করেছেন। আবার মধ্যপথেও তাঁর ভাবনা যে বারে বারে বিষয়ান্তরিত হয়েছে, কবির সে বিষয়ে কোনো খেয়ালই নেই। ফল কথা, বিহারীলালের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিভৃত ভাবনার নির্বাধ প্রবহমানতা ছিল, কিন্তু কোথাও তা সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি। অথচ, সার্থক ভাবুক মাত্রই সফল কবি নন। ভাবনার সহজধারাকে আত্মীকৃত,—আয়ত্ত করে, তার স্বতো-নিয়ন্ত্রিত সুমিত রূপ-রচনাই সার্থক কবিতার ধর্ম। কিন্তু, বিহারী-লালের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবনার মুক্তি ছিল,—তার সুনিয়ন্ত্রণ ছিল না কোথাও।

এই প্রসঙ্গে কবির ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করতে হয়। বয়ঃসন্ধি যুগের ক্ল্যাসিক্যাল কাব্য রচনার প্রয়াসে সুমিত ভাষণের সংগে ওজো-গুণান্বিত ঝঙ্কার সৃষ্টিও আবশ্যিক বলে মনে হয়েছিল। মধুসূদনের কাব্য এ-বিষয়ে নূতন প্রেরণার স্রষ্টা। বিহারীলাল তাঁর কাব্যে মনের কথাকে প্রথম মনের মত করেই বল্‌লেন,—রবীন্দ্রনাথ তার সার্থক নিদর্শন হিসেবে উদ্ধার করেছেন,—"সর্বদাই হু-হু করে মন......।" মনের "হু হু" করাকে কবি অনাবৃত প্রকাশ দিয়েছেন। এই অনাড়ম্বর

স্বভাব-প্রকাশ গীতিকবিতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু, সেই সংগে একথাও স্মরণ করব, বিহারীলালের সহজভাষণ অমিত আবেগের প্রভাবে যথেচ্ছভাষী হয়ে উঠেছে।

ফল কথা, বিহারীলালের কাব্য তাঁর কবি-ভাবনার শিল্প-বাহক হিসেবে সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারে নি।

বিহারীলালের কাব্য-রচনার প্রয়াস ছিল আবাল্য; আর তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। কবির প্রথম রচনার প্রকাশ হয়েছিল পূর্ণিমা পত্রিকায়। "নিজের ও বন্ধু-বান্ধবের রচনা প্রকাশের সুবিধার্থ" ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের প্রবর্তনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বৎসরাধিক কাল চলে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন কবি ও তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ দাস মিলে 'সাহিত্য সংক্রান্তি' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৬৩)। এই পত্রে বিহারীলালের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে ১৮৬৩ এবং আবার ১৮৬৭ থেকে অবোধবন্ধু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমে পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক এবং পরে স্বত্বাধিকারী রূপে বিহারীলাল এখানে তাঁর রচনাকে অবাধগতি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবোধবন্ধুতে বিহারীলালের রচনা পড়ে মুগ্ধ হন।

রচনা-পরিচয়

কবির প্রথম রচিত গ্রন্থ গদ্যরূপক কাব্য স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮)। তার পরে ক্রমশঃ তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকেঃ—সংগীতশতক (১৮৬২); বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ ও প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০); সারদামঙ্গল (১২৮৬ সাল)। এ ছাড়াও বিহারীলালের রচনাবলীতে আরো আছে মায়াদেবী, শরৎকাল, ধূমকেতু, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন।

বিহারীলাল নিরঙ্গ সৌন্দর্যকে তাঁর নিভৃত মানসলোকে বিচিত্র রূপান্বিত করতে চেয়েছিলেন, রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ দিয়ে। সেই সংগে ছিল গভীর নিসর্গ প্রীতি। তাঁর স্পর্শকাতর কবি-মন বস্তু-জগৎ থেকে মুক্তি কামনায় প্রকৃতির নিভৃত জীবন-লোকে স্বেচ্ছাবিচরণ করেছে। প্রকৃতির জগৎ-কেই কবি তাঁর আপন জগৎ করে নিয়েছিলেন, প্রকৃতির প্রসঙ্গেই আর সব কিছুর অস্তিত্বকে করেছেন অনুভব,—এমন কি মানুষকেও। সারদামঙ্গলে তাঁর নিসর্গ-চেতনা স্থানে স্থানে নিবিড় হয়েছে। নিসর্গ-সন্দর্শন খণ্ডিত হলেও প্রায়ই প্রাণগম্ভীর। কবির প্রকৃতি-ভাবনার অন্যনিরপেক্ষ আন্তরিকতার পরিচয় পাই একটি চিঠিতেঃ—

নিসর্গ-প্রেমিক বিহারীলাল

"ভাই অনাথ,

.........আমি যখন তোমার প্রথম পত্র পাই, তখন আমার শোবার ঘরের সম্মুখের ছাদের আলসের উপর, টবে, দাড়িম গাছে একটি দাড়িম ধরিয়াছিল। তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইবার সময় সেটি পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে; তৃতীয় পত্র পাওয়ার পর অবধি সে রক্ত বর্ণ, ক্রমে আপেলের ন্যায় রক্ত বর্ণ হইয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল। আমি প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিবামাত্র দাড়িমটি আমার চোখে পড়িত, অমনি তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে; আমোদে, আহ্লাদে, পীড়ায়, চিন্তায়, রচনায় সর্বদাই তুমি সংগে সংগে থাকিতে—সর্বদাই তোমার হাসি হাসি মুখশশী চেহারায় খুসি ফুটিয়া উঠে। * * * দুই চারিদিন হইল টুকটুকে চুকচুকে দাড়িমটি ঝরিয়া পড়িয়াছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তোমাকেও আর তেমন দেখিতে পাই না। প্রাণ কাতর, মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

বিহারীলালের কবি-স্বপ্নে যে মনোলোকের মুক্তি, সুরেন্দ্রনাথের (১৮৩৮—১৮৭৮) কাব্য-কবিতায় তারই ঘটেছে সংসক্তি লাভ। বিহারীলাল প্রসঙ্গে দেখেছি, তাঁর ব্যক্তিত্বময় কবি-ভাবুকতা যেমন স্পর্শ-কাতর, তেমনি ছিল নির্ভেজাল, নিবিড়। কিন্তু, ভাবালুতার আতিশয্যে তাঁর কবি-মানস সর্বদাই ছিল স্রস্ত-এলায়িত। তাই, কোনো ভাবনাই তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ দানা বাঁধে নি; কোনো কল্পনাই পায় নি পূর্ণ অবয়বান্বিত স্পষ্ট প্রকাশ। তার কারণ, আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার পথে তিনি ছিলেন প্রথম যাত্রী,—পথিকৃৎ। নিজের আবেগ-আকূতি দিয়ে তিনি পথের বাধা দূর করেছেন, তাকে সু-গঠিত করতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহারীলালের পথকে সুদৃঢ় অবয়বে গঠিত করে গেছেন। বাংলা আত্মলীন কাব্য-ধর্মের ইতিহাসে তিনি বিহারীলালের উত্তরসূরী। তাঁর সর্বাপেক্ষা খ্যাত কাব্য 'মহিলা' "বিহারীলালের 'বঙ্গ সুন্দরী' পাঠের ফল।"[২] বিহারীলাল তাঁর কাব্যে বঙ্গ-মহিলার বিচিত্র রূপ ও ভূমিকাকে বিস্রস্ত কল্পনার ভাব-মূল্যে নূতন করে মূল্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথও কাব্য-সূচনায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঃ—

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

মহিলা কাব্য

"গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী'কে নয়টি বিচিত্র রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে-

১। দ্রষ্টব্য—সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২৫।
২। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২য় সং।

ছিলেন।[১] সুরেন্দ্রনাথও বঙ্গ-মহিলাকে চতুর্বিধ বিচিত্র ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে দেখতে চেয়েছেন। ভগ্নস্বাস্থ্য কবি "মাতা, জায়া, ভগ্নী ও নন্দিনীর মমতার ঋণ" শোধ করবার উদ্দেশ্যে কাব্যটির কল্পনা করেছিলেন। মাতা ও জায়া অংশ সম্পূর্ণ করে ভগ্নী অংশের সূচনা করেই তিনি লোকান্তরিত হন। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ কাব্যটি দুই অংশে বিভক্ত হয়ে (১৮৮০ ও ১৮৮৩) প্রকাশিত হয়েছিল, কাব্যের নামটিও কবির কল্পিত নয়।

যাই হোক, আমাদের বক্তব্য, রোমান্টিক কাব্য-ভাবনার জগতে সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলালের অনুসারী। বিহারীলালের নিভৃত ব্যক্তিগত কল্পনার মুক্তি যেমন সুরেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, তেমনি তাঁর কাব্য-ভাবুকতার বিস্রস্ততা করেছিল অতি-সাবধানী। তাই, রূপ-কল্প রচনা, ছন্দো-বিন্যাস, শব্দ-প্রয়োগ, সর্বত্র সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকাশ পিনদ্ধ-সন্নদ্ধ। 'মহিলা' কাব্যে দৃঢ়বদ্ধ ক্লাসিকাল রূপাধারের অন্তরালে স্পর্শকাতর রোমান্টিক ভাবুকতা ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলা হয়ে আছে। আলোচ্য কাব্যের জায়া অংশে প্রেম-পরিচয় ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন,—

কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য

"হে প্রেম—হে সুধাময় প্রবাহ আত্মার!
অবিচিন্ত্য অবিতর্ক্য মহিমা তোমার!
মানব-বামন-কর-আকর্ষণী প্রায়!—
যার যোগে মর্ত্য 'পরে,
স্বর্গ ফল পাই করে;
যার আকর্ষণ বলে কেহ না এড়ায়;—
কি বারুণ পাশ!—বিশ্ব বাঁধা যায় যায়!"

অন্যত্র, পূর্বরাগের বস্তু-ভারহীন অতুলনীয়তার ভাব-ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন,—

"স্পর্শ হতে দৃশ্য চারু যেমন মণির
লেপন অধিক প্রিয় ঘ্রাণ কস্তুরীর,
প্রাপ্তি তৃপ্তি হতে রম্য শোভন আশয়;
তৃপ্তি গুরু তুষ্টি ভরে
ক্লান্তি বাসে কলেবরে;
কুতূহল চপল বিলাস লালসায়;—
সম্ভোগ-অধিক রম্য পূর্বরাগ তায়!"

প্রেমের অরূপ স্বভাবের ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গেও কবির এই রূপাভিমুখিতা, দৃঢ় সংহত এই চিত্র-কল্প, রোমান্টিক ভাবনাকে যেন ক্লাসিকাল অবয়বের

১। পরে ১০টি হয়েছিল।

আধারে তুলে ধরেছে। বিহারীলালের এলায়িত কল্পনা এখানে হয়েছে দৃঢ়-সংসক্ত।

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য ষড়ঋতু বর্ণনা (১৮৫৬) বাল্য-রচনা। তা ছাড়া, সবিতা সুদর্শন (১৮৭০) এবং ফুল্লরা নামে দুটি ক্ষুদ্র গাথা-কাব্যও কবি লিখেছিলেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত (১৮৭২-১৮৭৩) টড্ এর রাজস্থান-এর গদ্যে বঙ্গানুবাদ। বিশ্বসন্দর্ভ (১৮৭৭) নামে আরো একটি গদ্য সন্দর্ভ লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। গদ্য-পদ্যে তাঁর আরো ছোট-বড় বিচ্ছিন্ন রচনা আছে। কিন্তু, তাঁর সাহিত্যিক স্বভাব একটি অপূর্ণ কাব্যের মধ্যেই পূর্ণ দীপ্ত হয়ে আছে।—সে কাব্য 'মহিলা'।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের

বিহারীলালের কলকণ্ঠের কাকলি প্রথমে পরিপুষ্ট অবয়ব পেয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের কবিতায়; আর তাঁর রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনা যুগপৎ স্বচ্ছ এবং সহজ সরল অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছিল দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর (১৮৫৮—১৯২০) কাব্য সাধনায়। সুরেন্দ্রনাথের কবিতার ক্লাসিকাল রূপাবয়ব তাঁর কবি-মননের একান্ত ব্যক্তিগত প্রকাশকে বাধাহত করেছে। তাঁর একান্ত "নিজের কথা" কে তিনি রূপ ও রূপক-চিত্রের অবয়বে দেহ দান করেছেন। সেখানে হৃদয়ের নিরঙ্গ গোপন আকূতি প্রকাশ-কুণ্ঠ। দেবেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে বিহারীলালের কবি-স্বভাব যেন সুপরিণত হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। নিজ জীবনের, একান্ত আপনার ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান অনাবৃত নিবিড়তায় ধরা পড়েছে দেবেন্দ্রনাথের কবিতায়। তাঁর কবি-ভাবনা ছিল প্রধানতঃ গার্হস্থ্য প্রেম-সুখ-তন্ময়। নিজের কবি-স্বভাবকে পরিচায়িত করে তিনি লিখেছেন,—

"চিরদিন, চিরদিন, রূপের পূজারি আমি,
রূপের পূজারি!
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ,
কিশোর তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী!
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কারি,—
নগনা, দোলনা-কোলে, মগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উঘারি!
আমি সে অমৃত-বিষ, পান করি অহর্নিশ
সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী!

কবি-স্বভাব

গীতের ঝঙ্কারে তোর; মাধুর্যের নাহি ওর;
কি যাদু মাখান আছে, যাই বলিহারি,
(তোর) কঙ্কন তাড়না-মাঝে, অয়ি বর নারি!"

রূপের মধ্যে ডুব দিয়ে রূপ-সার আহরণের রোমান্টিক প্রণয়াকাঙ্ক্ষা এখানে উদ্দীপ্ত হয়েছে; দেবেন্দ্রনাথের কবি-ভাবনা ও কাব্য প্রকাশের এটিই মৌল ধর্ম। বিহারীলালের অতি-হিল্লোলিত আবেগ সুরেন্দ্রনাথের ক্লাসিকাল সংযমের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, সেই সংগে হয়েছিল মৃদু-মন্দ ঘন-গতি। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর সৌন্দর্য-উৎকণ্ঠা ও রূপ-ভাবনা যুগপৎ মিলিত হয়ে স্রোতস্বিনীর ধারাবেগে নিয়ত প্রবাহিত হয়েছে; অথচ তার মধ্যে ছিল সহজ-নিয়মের সুমিত সৌন্দর্য। তাঁর কাব্য-স্রোতস্বিনী শরতের ধারাবেগে কল-প্রবাহিত হয়েছে। রূপ-সম্ভোগের সংগে সংগে সহজে রূপোৎক্রমণের এই স্বভাব রবীন্দ্র-কবিতায় কালে কালে পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। হয়ত, এই সমধর্মিতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী'র উৎসর্গ-পত্রে দেবেন্দ্রনাথকে 'কবি-ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। বিহারীলালের গীতি-ভাবুকতা, তথা কবির আত্মলীন "নিজের কথা" বলার ভঙ্গি প্রথম স্বস্থ রূপ পেয়েছে দেবেন্দ্রনাথে,—বাংলা কবিতায় তিনি যৌবন-মুক্তির স্বভাব-কবি।

দেবেন্দ্রনাথের রূপ-সৌন্দর্য-প্রীতি কেবল মানব-লোকেই নিবদ্ধ হয়ে নেই। বিহারীলালের মত,—প্রত্যেক যথার্থ গীতি-কবির মত মানুষের জীবনের সংগে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে জড়িয়ে ভাব-কল্পনার মালা গেঁথেছেন তিনি। আর এখানেও দেবেন্দ্রনাথ অ-ভূতপূর্ব। বাংলা কাব্যে ফুলের কবিতা রচনায় সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে তিনি অনন্যতুল্য। কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ ফুলবালা-র (১৮৮০) সব কয়টি কবিতাই ফুল বিষয়ক,—আর তার মধ্যে আছে,— গোলাপ, কদম, সূর্যমুখী, অপরাজিতা, দোপাটি, করবী, রজনী-গন্ধা, কুন্দ, কামিনী, অশোক, সেফালিকা ইত্যাদি ১৮টি ফুল-সৌন্দর্যের সম্ভোগ-সুষমা। তাছাড়া, অশোকগুচ্ছ (১৯০০), শেফালিগুচ্ছ (১৯১২), পারিজাতগুচ্ছ (১৯১২), গোলাপগুচ্ছ (১৯১২) ইত্যাদি কাব্য-নামও কবির নিবিড় পুষ্প-প্রীতির পরিচয় বহন করে।

কাব্যে পুষ্প-প্রীতি

দেবেন্দ্রনাথের এই পুষ্প-প্রীতি তাঁর সৌন্দর্য-সম্ভোগেরও স্বভাব নির্ণয় করে। পুষ্পের সৌন্দর্য তার বর্ণে, গন্ধে, অথবা বর্ণ এবং গন্ধে। সেই নিরঙ্গতা ভেদ করে পুষ্পের সৌন্দর্যকে পুষ্প-দেহের মধ্যে আঁকড়ে ধরতে চাইলে সে ফুল মলিন হয়,—ঝরে পড়ে। আগেও বলেছি, রূপের মধ্যে অরূপের আস্বাদ করেছে তাঁর কবি-মন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি "অশোক মঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণ-ঝঙ্কার হইতে

তাহার রহস্য চুরি করিয়া লইতে পারেন।"[১] দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সেই 'তরুণতা'; সেই 'রহস্য'-কে,—সেই অরূপ সৌন্দর্যকে রূপ-বিভায় ব্যঞ্জিত করতে পেরেছেন সার্থক ভাবে। এখানেই তাঁর কবি-কর্মের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। দেবেন্দ্রনাথের সনেট্‌গুলি এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে অনন্যপূর্ব। প্রেম ও রূপ-সৌন্দর্যাতুরতা সনেটের দৃঢ়-কঠিন সীমায় বন্ধ হয় নি, বরং মুক্তি পেয়েছে অপরূপ সুষমায়।

শিল্পরূপের সৌন্দর্য

"ফেলিয়া দিয়াছ বাসি মালতির মালা—
চম্পক অঙ্গুলি গুলি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
গাঁথিছ বকুল হার বিনায়ে বিনায়ে!
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ বালা,
তোমার অলকগুচ্ছ হয়েছে উতলা!
মালা গাঁথা হলে শেষ পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ
সরসে নলিনীসম হয়েছে চঞ্চলা?
আমিও কুসুম সখি; সারাটি যামিনী
সঞ্চিয়াছি তব লাগি রূপ ও সৌরভ!
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব গৌরব,
হ্যাদে দেখ, কি উতলা হয়েছি সজনি!
চিকনিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা;
আমারেও সেই সাথে গেঁথে ফেল বালা।"

দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলী ভারতী, সাহিত্য, প্রবাসী ইত্যাদি বিখ্যাত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে পূর্বোক্ত কয়টি ছাড়া আরো আছে, ঊর্মিলা কাব্য (১৮৮১), নির্ঝরিণী (১৮৮১), হরিমঙ্গল (১৯০৫) জ্ঞানদা-মঙ্গল, অপূর্বনৈবেদ্য, অপূর্ব শিশুমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীগৌরাঙ্গমঙ্গল, অপূর্ব বীরাঙ্গনা, শ্যামামঙ্গল, জগদ্ধাত্রী মঙ্গল, কার্তিকমঙ্গল, গণেশ-মঙ্গল, ও খ্রীষ্টমঙ্গল (১৯১২) এবং অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩)। দেব-বিষয়ক রচনাগুলি দেবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অধ্যাত্মভাবুকতার পরিচায়ক।

রচনাপঞ্জী

দগ্ধকচু (১৯১২) নামে একটি রস-রচনাও তিনি ছদ্মনামে লিখেছিলেন।

বাংলা কবিতায় বিহারীলালের ধারার শ্রেষ্ঠ অনুকারী অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬১—১৯১৯)। "বয়সে কিছু ছোট হইলেও অক্ষয়কুমারকে রবীন্দ্র-পূর্ব কবি বলিয়া ধরা হয়। তাহার কারণ, ইঁহার রচনায় বিহারী-

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৬১।

লালের অনুবর্তন।"[১] সুরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ বিহারীলালের সচেতন অনুসরণ না করেও, যৌবন-মুক্তির পথে বাংলা কবিতার ইতিহাসকে পুষ্ট করেছেন। অক্ষয়কুমারও সেই ধারার কবি। তবে, বিহারীলালকে তিনি সচেতনভাবে গুরু বলে বরণ করেছিলেন। বিহারীলালের বিস্রস্ত অরূপ সৌন্দর্যের পিপাসা অক্ষয়কুমারের কাব্যে রূপ-সংসক্ত হয়েছে, কিন্তু আবেগ-শুষ্ক হয়ে পড়েনি। অক্ষয়কুমারের ভাবনার অন্তরঙ্গে 'কৈশোরক' রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে আছে, ডঃ সুকুমার সেন তা লক্ষ্য করেছেন।[২] তাছাড়া, নারীর গার্হস্থ্য-সৌন্দর্যের-পিপাসায় তিনি দেবেন্দ্রনাথের সমধর্মী। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্য 'এষা' (১৯১২) রচিত হয়েছিল পত্নী-বিয়োগ উপলক্ষ্যে। এষা বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য।

অক্ষয় বড়াল

অক্ষয়কুমারের কবিতা রোমান্টিক উৎকণ্ঠায় তীব্র; কোথাও বা তা বিষণ্ণতায় উদাস হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথের মতই তিনি প্রেমের জগতে গৃহ-সুখ-পিপাসু। কিন্তু, তাঁর প্রণয়তৃষ্ণা গৃহাশ্রয়ী হলেও, গৃহ-সীমাতেই তৃপ্ত হতে পারে নি। ঘরের প্রেমকে অক্ষয়কুমারের কবি-কল্পনা বিশ্বাভিসারী করেছে। এক দিকে গৃহের নির্জন নিভৃত সৌন্দর্য-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বিশ্বাভিমুখিতা তাঁর সম্ভোগের মধ্যে তৃষ্ণাকে, আস্বাদনের মধ্যে অতৃপ্তিকে উৎকণ্ঠিত করে রেখেছে।—

'নারীবন্দনা' কবিতায় কবি বলেছেন,—

"রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা।
সৌন্দর্যের মেরুদণ্ড তুমি,
বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা 'পরে
তপণের আকর্ষণে ঘুরে যথাগ্রহগণ,
তালে তালে গেয়ে সমস্বরে।"

কবিবৈশিষ্ট্য

এই রমণীকে কবি নিভৃতে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন, নিত্য দিনের সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে। তখনই পরবর্তী কবিতায় উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, অতৃপ্ত অস্বস্তি ঃ—

"দূরে—দূরে—কতদূরে এ কল্পনা সদা ঘুরে,
চাহিলে ধরার পানে পড়ে দীর্ঘশ্বাস!

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড ২য় সং।
২। ঐ।

সুখ দুঃখ আত্মপর,—সীমারেখা ক্ষীণ তার—
কোথা সত্য—কোথা মিথ্যা—সন্দেহ বিশ্বাস।”

[অভেদ-প্রভেদ]

'প্রতিভার-নিবর্তন' কবিতায় এই রোমান্টিক আর্তির বিষণ্ণ রূপের একটি পরিচয় পাই ঃ—

“কেন এই শূন্য অনুভব!
কাতরে কাঁদিছে মন প্রাণ।
কি অব্যক্ত যন্ত্রণার রব—
শ্বাসে শ্বাসে মরণ-আহ্বান!”

অক্ষয়কুমারের কবিখ্যাতি বহুব্যাপ্ত হলেও তাঁর কাব্য-সংখ্যা স্বল্প। প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭) ও শঙ্খ (১৯১০) অক্ষয়কুমারের কাব্য-সংকলন গ্রন্থ। 'এষা'র কথা আগে বলেছি।

বাংলা কাব্যে বিহারীলালের সমকালীন হয়েও একটি নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলেছিলেন রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিহারীলালের কাব্যে ভাবের আবেগ ভাবালুতার সৃষ্টি করেছিল; ভাবনার পিনদ্ধতা তার মধ্যে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্ময় (Subjective) ভাবকে, তাঁর দার্শনিক ভাবনার

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ

স্রোতে পরিশুদ্ধ করে বাংলা গীতিকবিতায় প্রবহ-মানতার সংগে গভীরতার যোগ সাধন করলেন। এদিক থেকে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) আলোচ্যকালের কাব্য-ধারায় একাই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্রোত। ঠাকুরবাড়িতে স্বপ্নপ্রয়াণ রচনার বিস্তৃত পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে। স্বপ্নপ্রয়াণে রোমান্টিক রহস্যাতুরতা রূপকের অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই রূপক সবন্ধে লিখেছেন,—“স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারু-নৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র, তাহার চারিদিকের বাগান বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সে'ত সহজ নহে” ঃ—

“দূত বলে অল্পই আমার বাণী;
অপ্সরা প্রমদা নামে, ছাড়িয়া পাতাল রাজধানী,
করিল প্রস্থান;
পাইনু সন্ধান,
বিলাস-নগরী-মাঝে আছে সে ইদানী॥

রসাতল-রাজের মানস এই
(কাড়ি লইতে যদিও পারেন তিনি ইচ্ছা করিলেই),
ভেসে-যাওয়া ফুলে
ফিরাবেন কুলে
মৃদু বাক্য সমীরণে; আসিয়াছি তেঁই।"

যৌতুক না কৌতুক (১৮৮৩) দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত গাথাকাব্য। তাছাড়া, "বাঙালায় রেখাক্ষর বর্ণমালা বা শর্টহ্যান্ড লিপির উদ্ভাবনের প্রথম প্রচেষ্টা দ্বিজেন্দ্রনাথেরই।"[১] পয়ার ও ছড়ার ছন্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ রেখাক্ষর বর্ণমালা লিখেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী

মহর্ষি-কন্যা স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস রচনার কথা পূর্বে বলেছি। 'গাথা' নামক (১২৯৭) কাব্যে এঁর চারটি কবিতার সংকলন আছে। তাঁর বহু রচনা কবিতা ও গান (১৩০২) গ্রন্থে সংকলিত আছে। এঁর রচনায় বিহারীলালের ছান্দসিক অনুকৃতি ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর অন্তরঙ্গতার ছাপ আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) আলোচ্যকালের মহিলা-কবিদের মধ্যে প্রখ্যাত। বাংলাদেশের গ্রামের বালিকা গিরিন্দ্রমোহিনী বাঙালির গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থেকে কাব্য রচনা করেছেন;—"তাঁহার আবেগের কেন্দ্র প্রধানতঃ তাঁহার স্বামী।"[২] সেই আবেগ নারীসুলভ অন্তরঙ্গতায় নিবিড় হয়ে আছে তাঁর স্বভাব-কবিত্ব-সুন্দর রচনার মধ্যেঃ—

"তুমি কি গিয়াছ চলে? না না, তা ত নয়।
যদ্দিন বাঁচিব আমি, তদ্দিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো সুধু তোমা-ময়।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম প্রকাশিত রচনা গদ্য;—জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী (১৮৭২)। পাঁচখানি পত্রের মধ্যে চারখানিই স্বামীকে লেখা। সেকালের গৃহস্থ মহিলার পক্ষে এ-রকম পত্রের প্রকাশ দুঃসাহসিক ছিল, সন্দেহ নেই। অবশ্য গ্রন্থ-মধ্যে লেখিকার নাম ছিল না।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে আছে,—কবিতা-হার (১৮৭৩), ভারতকুসুম (১৮৮২), অশ্রুকণা (১৮৮৭), আভাষ (১৮৯০), শিখা (১৮৯৬), অর্ঘ্য (১৯০২), স্বদেশিনী (১৯০৬), সিন্ধু গাথা (১৯০৭)। একদা লেখিকার রচনাবলীর মধ্যে 'অশ্রুকণা' সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করে-ছিল। সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ (১৮৯২) নামে একখানি ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যও ইনি লিখেছিলেন।

১। ঐ।
২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৫৫।

আলোচ্য যুগের মহিলা কবিদের মধ্যে আরো আছেন মানকুমারী বসু ও কামিনী রায়। মানকুমারী (১৮৬৩-১৯৪৩) মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। ইনি বাল্যকাল থেকেই কাব্যরচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। বিবাহের পর স্বামীর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সে অভ্যাস সুগঠিত হয়েছিল। বালবৈধব্যের হেতু এঁর কবিতা মহিলা-সুলভ অন্তরঙ্গতার সংগে সহজ ভগবৎভক্তি ও শোকার্তির করুণায় মণ্ডিত হয়েছে।

মানকুমারী বসু

প্রথম প্রকাশিত গদ্য-পদ্য রচনা প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় (১৮৮৪) গ্রন্থে পতিহীনতার শোক-বেদনা অবারিত হয়েছে। এঁর কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে কাব্যকুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি (১৮৯৬), বীরকুমার বধ (১৯০৪), বিভূতি (১৯০৪), সোনার সাথী (১৯২৭)। মানকুমারীর লেখা সন্দর্ভ, উপন্যাস এবং গদ্যপদ্য রচনাও রয়েছে।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) আলোচ্যযুগের মহিলা কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত উচ্চশিক্ষার সংযোগ ঘটাতেই তাঁহার রচনা মার্জিত ও শিল্প-সুষমামণ্ডিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।"[১] প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ আলোছায়ার (১৮৮৯) কবি-রূপেই একদা কামিনী রায় বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য কাব্যের মধ্যে আছে নির্মাল্য (১৮৯১), পৌরাণিকী (১৮৯৭), গুঞ্জন (১৯০০), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯০৩), অশোক সংগীত—সনেট (১৯০৪), ঠাকুমার চিঠি (১৯২৪), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবন পথে—সনেট, গুচ্ছ (১৯৩০)। তাছাড়া, ইনি গদ্য নাটিকা, সন্দর্ভ, গল্প, জীবনী ইত্যাদিও লিখেছিলেন। সুকর্ষিত-চিত্ততার ফলে কামিনী রায়ের অকপট নারীস্বভাব যে-কোন বিষয়ের কবিতাতেই কাব্যিক সুষমা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে :—

কামিনী রায়

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি,—মা আমার, মা আমার।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদা নাট্যকারের চেয়েও "হাসির গানের রাজা" রূপে সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা-গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে আর্যগাথা, ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৮২, ১৮৯৩) আষাঢ়ে (১৩০৫), হাসির গান (১৩০৭), মন্দ্র (১৩০৯), আলেখ্য (১৩১৪), ত্রিবেণী (১৩১৯)।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

১। ঐ ৫৮।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনার গুরু হিসেবে বিহারীলালকে স্মরণ করেছিলেন। সে তাঁর কৈশোর-রচনার কথা। স্ব-স্থ,—আত্মস্বরূপে বিকশিত রবীন্দ্র-রচনা পরিণত-তর পর্যায়ের নিশ্চিত বিভায় ঋদ্ধ। গোমুখী উৎসের সংগে ভাগীরথীর অনন্তধারার সংযোগের মতই বিহারীলালের ভাব-সূত্রের সংগে রবীন্দ্রভাবনার উৎস-বন্ধন। এখানে সেই মৌল সূত্রটিকে স্বীকারমাত্র করে রবীন্দ্র-সৃষ্টি-প্রবাহের সন্ধান করব সাহিত্য-ইতিহাসের ভিন্নতর পর্যায়ে।

নির্ঘণ্ট

সংশোধন

ছাপার ভুল যেখানে তথ্যকে বিকৃত বা অবোধ্য করেছে, কেবল সেই সব অংশের সংশোধন দেওয়া হয়েছে ঃ—

পৃষ্ঠা সংখ্যা	ছত্র সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৯-১০	what he is an individual,,—	what he is as an individual,—
৫	১৯	অতিশয় প্রীতি-দ্বন্দ্ব-প্রবণ,—	অতিশয় প্রীতি দ্বন্দ্ব-প্রবণ,—
৯	২০	(1557-1675)	(1575-1675)
১৫	২৬-২৭	সুযোগ দেখা দিয়েছিল ফরাসী ভাষা......	সুযোগ দেখা দিয়েছিল ফরাসী ভাষা......
২১	৩০	মুর্শিকুলীর ঐতিহ্যই	মুর্শিদকুলীর প্রবর্তিত ঐতিহ্যই
২৭	১০	গদ্য-ভাষা গদ্য-গ্রন্থিকা	গদ্য-ভাষার গ্রন্থ-গ্রন্থিকা।
৩০	১৩	বিপর্যস্ত রূপ।	বিপর্যস্ত রূপ চোখে পড়ে।
৩১	৬-৭	"কবির আসরে বিষয় বিচিত্রতা প্রথতঃ ভবানী বিষয়ে	"কবির আসরে প্রথমতঃ ভবানী বিষয়ে,
৩৯	৮	১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে	১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে
৪১	১৭	বল্‌ব এণ্টুনি ফিরিঙ্গি	বল্‌ব এণ্টুনি ফিরিঙ্গির কথা।
৪৬	২৯	পরমায়ু অতিশয় অল্প	ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প।
৫৭	১৭	asss	assa
৫৭	৩১	সম্প্রদান	সম্প্রদান লোহারে
৫৭	৩২	লোহারে বা লোহাকে	কর্ম লোহারে বা লোহাকে
৬৪	৮	The system of mopolies	The system of monopoli[illegible]
৭২	১৮		একেবারে বাদ
৭২	৩৬	If it had bed been	If it had been
১৫৩	ফুটনোট —২	তাহা	২।
১৬৬	২৫	কিন্তু যে যাত্রা সাহিত্য	কিন্তু যাত্রা সাহিত্য যে
১৬৭	৮-৯	ছত্র দুটি ভুল সাজানো হয়েছে	নবম ছত্র অষ্টম ছত্রের ওপর যাবে
১৭৭	১৯-২১	এক কৃত্রিম পর্যায়।...... মনের অতলে	এক কৃত্রিম পর্যায়। মঞ্চাভিমুখী প্রবণতা জাতির চেতনামূলে অঙ্কুরিত হয়েছে, স[illegible] নাট্যরচনার উপাদানও স[illegible] হয়েছে মনের অতলে।
২২১	২৬	বিবাহিত এই গল্প নিয়েই	এই গল্প নিয়েই
২৫১	১৫	...ঘেঁষে...	...বেঁধে...
২৬৭	২৩	Manedaus	Manelaus
২৭৫	২৪	Ceatain	Certain
৩০৯	১৭	গোলাপক	...গোপালক...
৩৫৯	২০	অবলুপ্ত দেয় করে।	অবলুপ্ত করে দেয়।